মহাভারত

নীতি অনীতি দুর্নীতি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

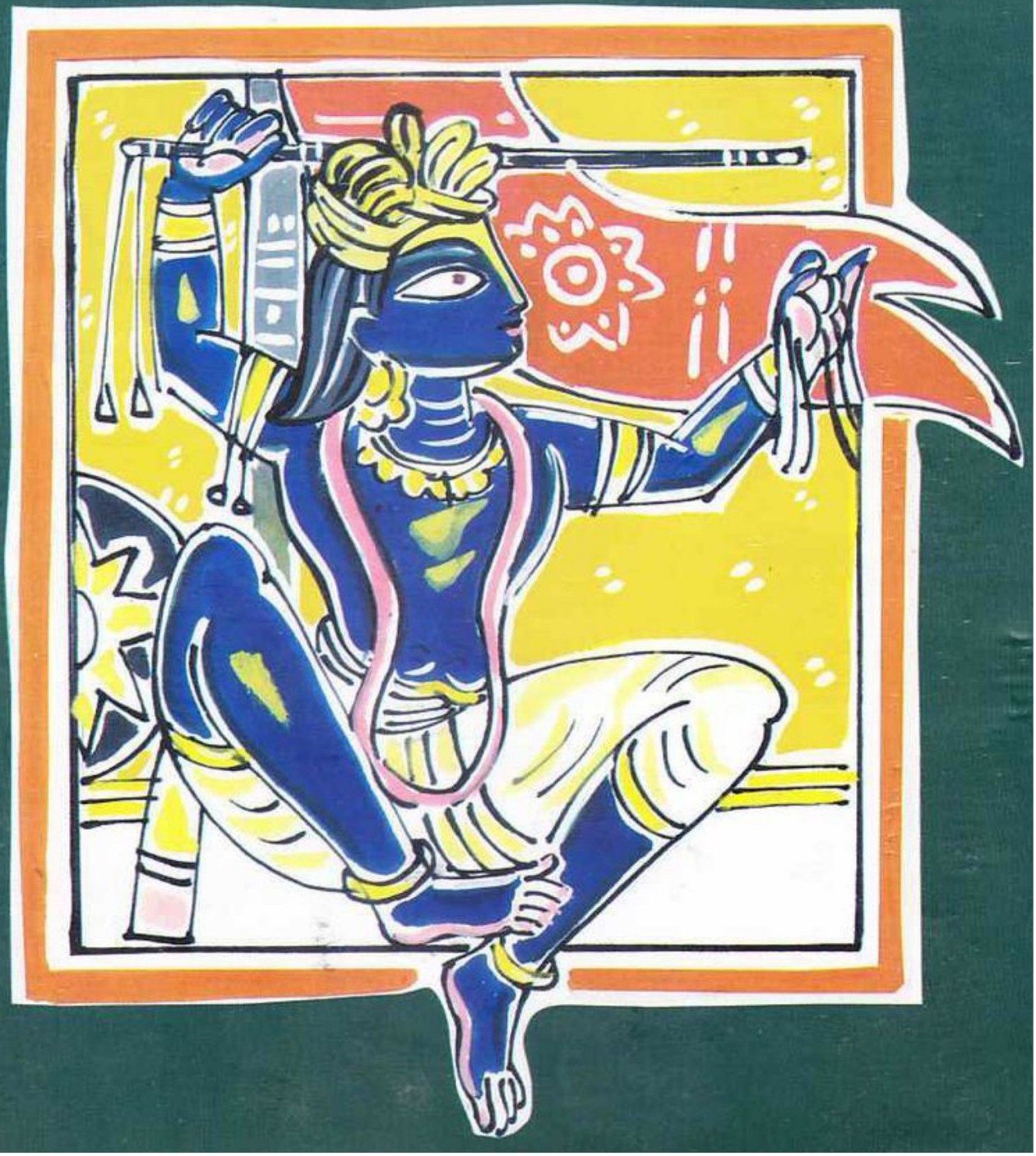

চলমান সমাজ কখনও সম্পূর্ণ সাধু এবং সৎ হতে পারে না। ধর্ম কখনও অধর্মের রূপ ধারণ করে। আবার কখনও অধর্ম ধর্মের রূপ ধারণ করে। ঘটনা পরম্পরার ওপর নির্ভর করে নীতি ও অনীতি। বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজনে পূর্বাপরিভূত ব্যাপারগুলি বিচার বিবেচনা করে নীতির কাঠিন্যের পরিহারে ব্যক্তি-জীবনে বৃহত্তরের শ্রেয় সাধন ঘটে। মানুষের জীবন-নীতির প্রসন্নতা লাভ হয়। সেই নীতি শাস্ত্রীয় শব্দপাঠের প্রমাণে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেই নীতি প্রতিষ্ঠা হয় মহাকাব্যিক চেতনায়। এই গ্রন্থ সেই মহাভারতীয় নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিত-মাত্র।

মহাভারত
নীতি অনীতি দুর্নীতি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

পুস্তকবিপণি

MAHABHART
NETI ANETI DURNETI

Published by
PATRALEKHA
10B College Row
Kolkata 700 009

Price 400.00
ISBN 978-93-81858-20-4

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা ২০১৪

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
চলভাষ ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপক ও মুদ্রক
অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন

মুদ্রক
ভারতী প্রিন্টার্স
কলকাতা ১২৮

প্রচ্ছদ
মৃণাল শীল
দাম
৪০০.০০

শিথিল-নীতি মানুষের নীতিনিষ্ঠ স্ত্রীর প্রতি
যে সকারণ দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বলতায়
সুষমার জন্য

সূ চী প ত্র

প্রাচীন রাজতন্ত্র বনাম আধুনিক গণতন্ত্র ১৩
মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব ৯৫
জমি-অধিগ্রহণ : তৎকাল ১৮৪
নীতিকথায় রাজনীতি ১৯৫
দ্বিচারিতা ছলনা এবং মহাভারত ২০৯
মহাভারতের রাজনীতি ২২৭
প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি ৩১৪
রামায়ণের নীতি-ধর্ম ৩৮৩

প্রারম্ভিক

আমি নিজে সম্পূর্ণ সাধু এবং সজ্জন ব্যক্তি নই বলেই এটা বুঝতে পারি যে, জীবন্ত এক চলমান সমাজ কখনো সম্পূর্ণ সাধু এবং সৎ হতে পারে না। ঠিক এই কারণেই নীতি-বস্তুটা আমার কাছে পাথরে লেখা কোনো কঠিন সীমাবদ্ধ ভাবনা নয়। মহাভারত যেহেতু প্রাচীনকালের এক চলমান সমাজের কথা বলে এবং সেখানে যখন এই কথাটা পেলাম যে, ধর্মও কখনো অধর্মের রূপ ধারণ করে, আবার অধর্মও কখনো ধর্মের রূপ ধারণ করে, কখনো আবার ধর্ম বস্তুটাকে ধর্মের মতোই দেখা যায়, কিন্তু এই যে বিচার, সেটা শেষ জায়গায় এসে বুদ্ধি দিয়েই করতে হয় — বিদ্বাংস স্তং সংপ্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা। ফলত বুদ্ধি দিয়েই আমি বিচার করে বুঝেছি যে, মহাভারত যে ধর্মনীতির কথা বলে, সেখানে সকালে উঠে সন্ধ্যা-আহ্নিক না করলেই 'প্রত্যবায়' বা দোষ হয় না, সেখানেও দেশ, কাল, পাত্র কিংবা 'সিচুয়েশনে'র বিচারটুকু জরুরী হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কিনা সকালের সন্ধ্যা-আহ্নিকটা কেন করতে পারল না, সে বিচারটাও চাই।

নৈতিকতার ব্যাপারে শুধু এই সাধারণ স্মৃতি-শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুনই নয়, জীবনের আরো অনন্ত গভীর ব্যাপার আছে, অনন্ত ভাব-বিকার আছে ঘৃণা, জুগুপ্সা, প্রেম, ভালবাসা এবং যুদ্ধ — এখানে অনন্ত ঘটনা-পরম্পরা আছে, যার ওপরে নির্ভর করে সত্য, সততা এবং ধর্মের বিচার হবে। খুব ভাল একটা কথা বলেছিলেন বৈয়াকরণ পতঞ্জলি। বলেছিলেন — যে কোনো ক্রিয়াই কিন্তু একটা ক্রিয়ামাত্র নয়। যে কোনো ক্রিয়াই অনেকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি — পূর্বাপরীভূত : ব্যাপার-কলাপঃ। অর্থাৎ কিনা ভাত রান্না করছি — এই 'রান্না করা'র মধ্যে চাল ধোয়া থেকে আরম্ভ করে হাঁড়িতে চাল চাপানো, চাল উল্টানো, তাকে সামাল দেওয়া, সিদ্ধ হয়ে গেলে হাঁড়ি নামানো, মাড় গালার পর হাঁড়ি সুস্থিত করে রাখা পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি নিয়ে তবে ভাত রান্না হয়। নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রগুলিও কিন্তু একই রকম। একটি বাচ্চা ছেলে যখন লোভের খাবার চুরি করে খায়, তখন তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করার আগে দশবার ভেবে দেখা উচিত তার বয়স এবং তার পূর্বতন ব্যবহার, তার সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক অবস্থা।

মহাভারতে অনীমান্ডব্যের কাছে স্বয়ং ধর্মকেও অভিশাপ লাভ করতে হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছিল — একটি নির্দিষ্ট বয়সের আগে একটি বালককে কখনোই তার অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে দেবযানীর সঙ্গে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সম্পর্কের মধ্যে প্রায় জোর করে ঢুকে পড়েই শর্মিষ্ঠা যখন তাঁর যৌবনের প্রাপ্য আদায় করে নেন তখন এমনই মহান উদারতায় তাঁর বিচার করেছেন মহাভারতের কবি যে, বৈবাহিক শাস্ত্রীয়তার চেয়েও ভালবাসা এখানে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে— এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কালিদাসের মৃত্যুঞ্জয়ী নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলে কণ্ব-মুনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করে বলেন— মহারাজ যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠা যে গৌরব লাভ করেছিলেন, তুমিও তেমনই গৌরব লাভ করো দুষ্যন্তের কাছে।

আসলে এই গ্রন্থসূত্রে আমরা জানতে চাই যে, নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো উদার দেশ খুব কমই আছে। বিশেষত পরিস্থিতির প্রয়োজনে 'পূর্বাপরীভূত ব্যাপার'গুলির বিচার বিবেচনা করে নীতির কাঠিন্যের জায়গাটুকু পরিহার করাটা আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম-বিগর্হিত মনে হতে পারে, কিন্তু সমাজ, ব্যক্তি এবং ব্যক্তি-জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে কাঠিন্যের আবরণভঙ্গটুকুও যে ধারণাত্মক ধর্মের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন থেকেই বকল্পিক ধর্মের সৃষ্টি হয়, সেখানেই ভারতবর্ষের জীবন-দেবতার আবাস।

আমি দুটি ঘটনার উল্লেখ করবো এখানে। আমার পিতাঠাকুর খুব কড়া ধাতের নৈতিক মানুষ ছিলেন। আমার অতিবাল্যে পৈতের সময় সারা দিন স্মার্ত ক্রিয়াকর্মের পর সন্ধে গড়িয়ে যেতেই রাত্রির ভাত খাওয়া বন্ধ হল। তেমন খাওয়া নাকি নিয়ম নয়। ভাগ্যবশত আমাদের কুলপুরোহিত মহামান্য পণ্ডিত ছিলেন এবং ছিলেন পরম উদার। তিনি শুধু এক বালকের উপনয়নের 'অর্থ' না বোঝা বুভুক্ষা দেখেও কোনো তিরস্কার করলেন না। আমার পিতার নাম ধরে ডেকে তিনি বললেন — একটা বিকল্প আছে শোনো। আট রকমের পরিস্থিতি কোনো ব্রত নষ্ট করে না — অষ্টৈতদ্ অব্রতঘ্নানি। জল, মূলজাতীয় বস্তু শাকালু ইত্যাদি, ফল, দুধ এবং ঘি — এগুলোর উপবাসের অনুকল্প, এগুলো খাওয়ায় দোষ হয় না। দোষ হয় না শরীর খারাপের জন্য ওষুধ খেলে, এমনকী ব্রতবিরোধী পথ্য খেলেও। এই ছয়ের সঙ্গে আর দুটি বিকল্পের উচ্চারণ ছিল চরম মানবিক। কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছে করেন, কিংবা আদেশ দেন গুরু, তাহলেও ব্রতের অন্যথা করা যায়, ব্রতভঙ্গও করা যায় — হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনম্ ঔষধম্। আমি সেদিন ব্রাহ্মণের কামনায়, কুলগুরুর আদেশে রাত্রিবেলায় সুন্দর রাত্রিভোজন করেছিলাম, সেটা যদিও হবিষ্যান্ন ছিল। কিন্তু তার স্বাদ এবং ব্রতভঙ্গের তথাকথিত অনৈতিক স্বাদ একত্রে বড়ো মধুর ছিল।

আর একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর চিতায় চিরশায়িত ছিলেন এক পিতা, পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার নয় বছরের পুত্র, শোকাহত, নিষ্পন্দ। আত্মীয়-স্বজন শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতায় ওই ছেলেটির হাতে পাটকাঠি ধরিয়ে দিল প্রিয় পিতার মুখাগ্নি করার জন্য। সেই অবস্থায়

শ্মশান-পুরোহিত, যিনি মৃত্যু দেখে-দেখে, মৃতদেহ দেখে-দেখে সাধারণত ভাবলেশহীন থাকেন তিনি বললেন — ওঁর নিকট-আত্মীয় কেউ মুখাগ্নি করুন, ছেলেটিকে এই বীভৎস কষ্টের মধ্যে রাখবেন না, ওকে বাড়ি নিয়ে যান কেউ। আমার ভারী ভাল লেগেছিল শ্মশান পুরোহিতের এই তথাকথিত অশাস্ত্রীয় অনুশাসন।

আমি শুধু বোঝাতে চাই, নীতির এই শাস্ত্রীয় অতিক্রম মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও এইরকম দেশ-কাল-পাত্র এবং পরিস্থিতি-নির্ভর। বস্তুত সেই সব অতিক্রমের মধ্যে যদি বৃহত্তরের শ্রেয়োসাধন ঘটে, যদি দলিত-বঞ্চিতের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে, ন্যায়-রূপী অন্যায়ের প্রতিবিধান ঘটে, তবে সেই অতিক্রমও কিন্তু মানুষের জীবন-নীতির প্রসন্নতা লাভ করে। অথচ সেই নীতি শাস্ত্রীয় শব্দপাঠের প্রমাণে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; সেই নীতির প্রতিষ্ঠা হয় মহাকাব্যিক চেতনায়, মহত্তরের অনৃশংস বৃত্তিতে। এই গ্রন্থ সেই মহাভারতীয় নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিত-মাত্র। বহুকাল আগে লেখা সেই রাজীব গান্ধীর জমানায়— সে কালের রাজতন্ত্র এবং এ-কালের গণতন্ত্র থেকে দুবছর আগে লেখা 'মহাভারতের নীতিদ্বন্দ্ব' পর্যন্ত এই একই পরিপ্রেক্ষিতের বিস্তার।

১২ জানুয়ারি ২০১৪

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

প্রাচীন রাজতন্ত্র বনাম আধুনিক গণতন্ত্র

এক

রাজা বললেন—আবার কবি? দ্বারী বলল—হ্যাঁ মহারাজ। আপনি কবিতা শুনতে ভালবাসেন। দেশ-বিদেশের কবি এলে আপনি তাঁদের কত সমাদর করেন, তাই খবর দিতে এলাম। রাজা বললেন—সেটা তো ঠিকই। তবে কিনা আজ সকাল থেকেই তো নানা কবির নানা গতের কবিতা শুনলাম, কিন্তু মনটা ভরছে না। সে যাক—কবি যখন এসেই পড়েছেন, পাঠিয়ে দাও এখানে।

কবি এলেন—উসকো-খুসকো চুল, মলিন বসন, একেবারে ভিক্ষার্থীর মতো চেহারা। রাজা ভাবলেন—এ আবার কেমন কবি, এর বুঝি চালচুলো কিছুই নেই। দু-চারটে জব্বর সংকৃত শব্দ ইধার উধার করে কবিতা বানাবে, আর পয়সা চাইবে। সকাল থেকেই আজ এই চলছে। রাজা আগে থেকেই একটু সাবধান হলেন। বললেন—দেখ কবি। ওই বস্তাপচা শৃঙ্গার রস আর হাস্যরসের কবিতা অনেক শুনেছি। যদি নতুন কিছু থাকে তো শোনাও। তার ওপরে তোমার যা অবস্থা দেখছি—জামাকাপড়, চেহারা—সবই ভিক্ষার্থীর মতো। তা বাপু, তোমার যদি কবিতার থেকে ভিক্ষাটাই বেশি প্রয়োজন হয়, তাহলে দু-চার মুদ্রা দিয়ে দিচ্ছি, তুমি আর কবিতার অমর্যাদা করো না। গম্ভীর কবি রাজার কথা শুনে গম্ভীরতর হলেন। তবু যথোচিত মর্যাদা সহকারে নিজের বক্তব্য নিবেদন করে বললেন—মহারাজ! পরমেশ্বর শিব মারা গেছেন বলেই আজ আমার এই দুরবস্থা, নইলে আজ আপনিও আমাকে কটাক্ষ করছেন।

রাজা ভাবলেন—এ আবার কী বলে রে। দরিদ্রতা, ভিক্ষাবৃত্তি—এসব বোঝা যায়, কিন্তু এ কাকে নিয়ে এল দ্বারপাল, এ কবি তো বদ্ধ পাগল। নইলে এই বিশ্বের কারণ, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী শিবকে কেউ মৃত বলে? পাগল পর্যন্ত তার পুরাতন সংস্কারে শিবকে মৃত প্রমাণ করতে সাহস পায় না, সেখানে এই অর্বাচীন কবি বলে কিনা—শিব মারা গেছেন! রাজা একটু অধৈর্য হয়ে বললেন—কী আজেবাজে বকছ? খোলসা করে বলো তোমার বক্তব্য কী? কবি বললেন—মহারাজ। ওইখানেই আমার কবিতা। আপনি অবহিত হয়ে শুনুন। কবি এবার গম্ভীর স্বরে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে বলতে আরম্ভ করলেন—মহারাজ! আপনার জানা আছে—ভগবান শ্রীহরি লীলাবশে

শিবের অর্ধঅঙ্গ হরণ করে হরিহর মূর্তি ধারণ করেছেন, কথায় বলে হরিহর আত্মা। তা শিবের অর্ধেক শরীর এখানে চলে গেল। বাকি অর্ধেক হরণ করেছেন স্বয়ং তাঁর স্ত্রী, গিরিসুতা পার্বতী। পার্বতী সবসময় শিবের আলিঙ্গনসুখ পাবার জন্য শিবের অনুমতি নিয়েই তাঁর অর্ধঅঙ্গ হরণ করে শিবকে অর্ধনারীশ্বরে পরিণত করলেন।

কবি বললেন—শরীরের দুই অর্ধ এইভাবে চলে গেলে শিবের আর বাকি থাকল কী মহারাজ! তাই বলছিলাম—শিব মারা গেছেন। রাজা এতক্ষণে কবির কল্পনাতে কিঞ্চিৎ খুশি হয়েছেন এবং উন্মুখ হয়ে আছেন—পরবর্তী প্রস্তাবে কবি কী বলেন শোনার জন্য। কবি বললেন—শিব-শরীরের দুই অর্ধই যখন এইভাবে চলে গেল, তখন আস্তে আস্তে পরিষ্কার বোঝা গেল শিব মারা গেছেন। এই জগতে কর্তাব্যক্তি কেউ মারা গেলে মৃত্যের সম্পত্তি ভাগ হয়, আশ্রিত জনেরা নতুন আশ্রয় খোঁজে, তা তেমনই শিব মারা গেলে হরমস্তক বিলাসিনী গঙ্গা নতুন নায়কের খোঁজে সাগরের সঙ্গে মিলিত হলেন, বাঁকা চাঁদখানি চলে গেল আকাশে—গঙ্গা সাগরম্ অম্বরং শশিকলা। শিবের অঙ্গভূষণ শেষ-নাগ শিবের অঙ্গ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন পাতালে।

কবি বললেন—এ তো গেল অস্থাবর সম্পত্তির কথা। শিবের স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আছে তাঁর গুণগুলি। শিব সর্বজ্ঞ এবং সবার প্রভু। কিন্তু এই সর্বজ্ঞত্ব এবং প্রভুত্ব কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? কবি এবার বললেন—ওই সর্বজ্ঞতা এবং প্রভুত্ব শিবের অভাবে এখন আপনাকে এসে আশ্রয় করেছে, মহারাজ! আর শিবের যে আরেক রূপ—সর্বেশ্বর হয়েও তিনি ভিখারি—সেই ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করেছে আমাকে—তাই আমি ভিক্ষা করছি—সর্বজ্ঞত্বম্ অধীশ্বরত্বম অগমত্ ত্বাং মাং চ ভিক্ষাটনম্। মরমী কবির বক্রোক্তি মাখা অসাধারণ কবিতা শুনে মহারাজ ভারী খুশি হলেন, এবং কবিকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন।

কবির কবিতা এবং পুরস্কারে আমরাও খুশি. কিন্তু আমরা যে গোরুর রচনা লিখতে শ্মশানের রচনা লিখছি—তার কী হবে? সত্যি, আমি যে কেন মরতে রাজনীতি নিয়ে লিখতে বসলাম—তা আমিই ভাল জানি না। তবে কিনা, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও আমি বেশ টের পাই যে, রাজতন্ত্রের রাজাই হোন, অথবা গণতন্ত্রের মহান্ মন্ত্রীরা—ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণির সঙ্গে শাসিত জনগণের চিরন্তন পার্থক্যটা কিন্তু ঠিক তাই—যা আমাদের কবি বলে গেছেন, অর্থাৎ রাজা কিংবা মন্ত্রীরা হলেন সবজান্তা সর্বজ্ঞ, তাঁরাই শাসক অধীশ্বর, আর জনগণ চিরকাল ভিক্ষাবৃত্তি করে যাবে। আজকাল সমাজতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকেরা পুরাতন ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেকালের রাজাদের শাসন এবং শোষণ প্রতিনিয়তই সুব্যক্ত করছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর চুয়াল্লিশ বছর ধরে গণতন্ত্রের নাম-মাহাত্ম্যে আমরা এতই পুলকিত এবং গর্বিত বোধ করেছি যে, গণ-নায়কদের শাসন, শোষণ এবং স্বেচ্ছাচারও যে প্রায় রাজাদের মতোই—সেটা আমরা কখনও তলিয়ে দেখি না, বা দেখিনি। হয়তো ভবিষ্যতের সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লিখবেন যে, আধুনিক ছোট, বড়, মাঝারি

গণনেতারা নিত্যি নিত্যি কেমন কল্পতরুর মতো সব-বিলানো বাণী নিয়ে উপস্থিত হন জনগণের সামনে। নির্বাচন হয়ে যায়। নিরীহ জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভোলেন, একটি ভোট দেওয়ার গর্বে পরম আত্মতুষ্টিতে নিজের নেতা নির্বাচন করেন। তারপর লোকসভার নায়কেরা লোকের কথা ভুলে যান, বিধানসভার বিধাতারাও গণতন্ত্রের বিধিবিধান সব ভুলে যান। সর্বজ্ঞতা এবং প্রভুত্ব আশ্রয় করে নির্বাচিত নেতাকে আর ভিক্ষাবৃত্তি ভর করে জনগণের ওপর, মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতিমূর্তি শিব মারা যান।

বিজ্ঞজনেরা বলবেন—আমি কি তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের মূল্য বুঝতে পারছি না, অথবা সর্বজনীন ভোটাধিকারের সুফল কতখানি, তা গণ্য করছি না? আমরা বলব—সবই বুঝতে পারছি, সবই গণ্য করছি। সেই সঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল—পুরাতন রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের কুফল দেখেই যেমন আমরা রাজতন্ত্রের নিন্দেমন্দ করি, তেমনই গণতন্ত্রের কুফলগুলি দেখেই তো তার ভালমন্দ বিচার করব। রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের কুফল যদি পরিণামে একই হয় তাহলে শুধুমাত্র নীতিগত এবং পুথিগত সুফল তথা ভোটাধিকারের আত্মতৃপ্তির জোরে একটির বর্জনীয়তা এবং অন্যটির গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে কেন?

আমাদের দেখার কাজটা এইখানেই। আমাদের দেখার বিষয় হল—একমাত্র সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া গণতন্ত্রের সুফল আর কী আছে যা প্রাচীন রাজতন্ত্রের মতো নয়, অথবা রাজতন্ত্রের কুফলগুলি গণতন্ত্রের কুফলগুলির মতোই কিনা। যদি বলেন—সর্বজনীন ভোটাধিকারই একমাত্র জিনিস যেটি গণতন্ত্রকে অন্য কোনও তন্ত্র থেকে প্রিয়তর করে তোলে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা দরকার—শুধুমাত্র ভোট দেওয়া ছাড়া গণতন্ত্রের কাছে আমাদের আর কিছু পাওয়ার আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের কাছে তা পেয়েছি কিনা? যদি তা পেয়ে থাকি, তাহলে কি সর্বজনীন ভোটাধিকার আমাদের স্বকল্পিত গণস্বর্গে আত্মরতিমাত্র? সেই সঙ্গে এটাও আমাদের দেখতে হবে যে, প্রাচীনকালে ভোটের তৃপ্তি ছাড়া গণতন্ত্রের আর কোনওরকম চেহারা আমরা দেখেছি কিনা? যদি তা দেখে থাকি, তাহলে আজকের গণতন্ত্র এবং আজকের গণনেতাদের সঙ্গে সেদিনের গণতন্ত্র বা সেদিনের গণ-নেতাদের তফাতটা কী? হয়তো এত প্রশ্নের উত্তর আমরা কড়ায় গণ্ডায় পাব না, কিন্তু যা পাব—তাতে বক্রোক্তিজীবী কবির কথাটাও আমাদের যাচাই করে নিতে হবে, অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা এবং ঈশ্বরত্ব—প্রভুত্ব রাজার এবং গণনেতার দু'জনেরই একান্ত গুণ কিনা, অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিই জনগণের চিরকালের আশ্রয় কিনা?

আমরা এসব কথা অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে আলোচনা করব না। কেন না, আমাদের আজকের সমাজকে সে যুগের ছাঁচে ফেলতে পারি না, ঠিক যেমন পারি না সে যুগের সমাজকে এ যুগের ছাঁচে ফেলতে। মনুষ্যজীবনের হাজারো সমস্যা, হাজারো বিধি-বিধান—যা আমাদের চিন্তিত করে, আন্দোলিত করে, তারই একটা পূর্ব-পরম্পরা অথবা সমান্তরাল ঐতিহ্য দেখাতে চাই আমরা। দেখাতে চাই—আজকের সমাজের

শিক্ষা, বাণিজ্য, যুদ্ধনীতি, সম্পত্তির অধিকার, কৃষি অথবা নিদেনপক্ষে স্ত্রীলোকের অবস্থা, নারী-নির্যাতন—যা কিছু নিয়ে রাজনৈতিকভাবে ভাবিত হই আমরা—তার কোনও পূর্ব-পরম্পরা আমরা প্রাচীন রাজনীতিতে পাই কিনা?

শব্দ-ব্যবহারে প্রথম 'প্যারাডক্স্'—যেটা লক্ষ করার মতো, সেটা হল, 'রাজনীতি' শব্দটাই। আজকের দিনের উদার ছোট-বড় মাঝারি নেতারা যেখানে গণতন্ত্রের উদার নীতির প্রবচন দিয়ে জনগণের মনোহরণ করছেন, সেখানে সারা জীবন ধরে তাঁরা যা করছেন—সেটা কিন্তু রাজনীতি—রাজাদের অনুসৃত নীতি—গণনীতি নয়। কোনও সমস্যার সমাধান করতে হলে, তাঁরা রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করেন, গণনৈতিকভাবে নয়। অবশ্য রাজনৈতিক সমাধানে যেমন সেকালে ব্যক্তি রাজারই বেশি সুবিধে হত, তেমনই এখনকার রাজনৈতিক সমাধানেও ব্যক্তি নেতারই বেশি সুবিধে হয়, গণনৈতিক সমাধানে যা হবার কথা নয়। আমার কথাটা অবশ্য এখানে নয়। আমার চিন্তা—আধুনিক কালে শিশুপাঠের মতো পাঠ্যপুস্তকে যেখানে মারণ, পীড়ন, অত্যাচার অথবা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ-সূচক শব্দগুলি, সরকারি উদ্যোগে সযত্নে পরিহার করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে এই উদার জনদরদী নেতারা 'রাজনীতি' করছেন—এটা বড়ই বিপরীত কথা। বলা উচিত তাঁরা গণনীতি করছেন। প্রাচীন রাজারা যেখানে সবসময় একক শোষণের প্রতীকে চিহ্নিত, সেখানে আধুনিক গণতন্ত্রের গণ-নায়কদের 'রাজনীতি' শব্দের ব্যবহারটি আইন করে বন্ধ করা উচিত।

ধরে নিলাম—প্রথাগতভাবে একটা শব্দ চলে আসছে—গণ-সচেতন নেতারা ওটা পালটাতে পারেননি। কিন্তু রাজনীতি করলেও তাঁরা রাজা নন। তাঁরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রী, রাজার ক্ষমতা কি মন্ত্রীর থাকে? আমরা বলব—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী থাকে না বটে, কিন্তু বাস্তবে তাই থাকে, নির্বাচনের পর পাঁচ বছর যে কোনও মন্ত্রীই রাজা। আপনারা মনে মনে যে কোনও মন্ত্রীকে কল্পনা করে নিন, আমি রাজধর্মের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রাচীন মনুসংহিতা অথবা মহাভারত ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছি—মন্ত্রীরা রাজা কিনা? সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিতেরা এই জায়গাটুকু বাদ দিয়ে যেতে পারেন অবলীলায়, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সামগ্রিকতার নিরিখে এই অংশটুকু জরুরি।

দোষের মধ্যে মনু বলেছিলেন—রাজারা হলেন ঈশ্বরের অংশ। বড় বড় দেবতা—ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ—এদের শক্তি দিয়েই নাকি রাজা তৈরি—সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ। সন্দেহ নেই, পণ্ডিতেরা এই সব কথার মধ্যেই রাজার ঐশ্বরিক উদ্ভবের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, ঈশ্বর মানে শুধু দেবতা নয়, যেমন ঈশ্বরত্ব মানে শুধু দেবত্ব নয়, ঈশ্বরত্ব মানে প্রভুত্ব, ক্ষমতা, তেজ 'লিডারশিপ' যা সেকালের ক্ষত্রিয়মাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ ছিল। গীতা বলেছে—ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের সহজাত—ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্। কাজেই মনু যে ইন্দ্র-চন্দ্র, যম-বরুণের তেজ দেখেছেন রাজার মধ্যে তা এই প্রভুত্ব বা 'লিডারশিপ।' এই প্রভুত্ব বা 'লিডারশিপ' আমাদের গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যেও আছে

বলে, তাঁদেরও আমরা রাজাই মনে করি। আরও মনে করি এই জন্য যে, মনু বলেছেন—আগুনের থেকেও রাজার ক্ষমতা বেশি, কারণ—যে মানুষ ভুল করে আগুনে পড়ে, আগুন তাকেই শুধু পোড়ায়, কিন্তু রাজা যদি কারও ওপর ক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি সেই মানুষের পুত্র-পরিবার, ভাই-বন্ধু-সবাইকে তাঁর ক্রোধের আগুনে পোড়ান—কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ—সেই মানুষের ধন-সম্পত্তির সব ছারখারে যায়।

এই নিরিখে মন্ত্রী কেন, সরকারে অধিষ্ঠিত দলের যে কোনও সাধারণ নেতাকেই আমাদের রাজা বলা উচিত। কেন না কোনও কারণে ক্ষমতাসীন দলের কেউ কারও ওপর ক্ষিপ্ত হলে তার ভাই-বোন, মা-বাবা কারও রক্ষা থাকে না, ঘর-বাড়ি ছাড়া হওয়ার কথা তো সাধারণ ব্যাপার। আমরা বাম-সরকারের আমলে এটাই দেখেছি। মনু বলেছেন—রাজা নাকি দেশ, কাল, পাত্র এবং তার শক্তি বুঝে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য বিশ্বরূপ ধারণ করেন। বিশ্বরূপ মানে বহুরূপী। নিজের যখন শক্তি নেই, তখন অক্ষম রাজা শত্রুর প্রতি বেশ সহিষ্ণুতা দেখান, কিন্তু ক্ষমতা পেলেই তার দফা-রফা করে ছাড়েন। গণতন্ত্রে এই ছবি দেখবেন—ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে। দল যখন নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা হারিয়ে কোনও রকমে ক্ষমতায় আসে, তখন মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নেতা বিরোধী দলের সঙ্গে কত যে আলোচনা করেন, গণতান্ত্রিক কায়দায় বিরোধী দলের প্রতি কত যে সমীহ দেখান, তার ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু দল যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তখন বিরোধী গোষ্ঠীকে তাঁরা কিভাবে উৎখাত করার চেষ্টা করেন, তা ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রে বহুবার টের পাওয়া গেছে। মনুর টীকাকার বলেছেন—ক্ষমতা পেলে রাজা বিরোধীশক্তির গোড়া উপড়ে দেন। সংসদীয় গণতন্ত্রেও প্রায় সেই চেষ্টা হয়। এই বিরোধী শক্তির মূলোৎপাটনে রাজার সহায় হল, দণ্ড; আর মন্ত্রী বা দলের সহায় হল 'হোম-ডিপার্টমেন্ট—পুলিশ অর্থাৎ সেই দণ্ড।

দেখুন, রাজা আর মন্ত্রীর একাত্মতার উদাহরণ ভূরি ভূরি টেনে এনে এই প্রবন্ধটিকে আমি বেশি সরল করতে চাই না। রাজা কিংবা এখনকার মন্ত্রীমশাই খুশি হলে কী হয় এবং অখুশি হলেই বা কী হয়, তার সারচিত্রটি মনু থেকে উদ্ধার করেই আমরা আপাতত মনু মহারাজকে বিশ্রাম দেব। মনে রাখবেন—রাজার যে খুশি-অখুশির হিসাব মনু-মহারাজ দিয়েছেন, সেটাকে আমি এখনকার মন্ত্রী-মহোদয়ের ওপর আরোপ করে থাকি। মনু বলেছেন—রাজা যদি কারও ওপর প্রসন্ন হন—তার টাকা-পয়সার আমদানি এমন হবে যে, ভাবা যায় না। আবার ধরুন—আমি হয়তো কাউকে শত্রু বলে মনে করি—তাকে ঠাণ্ডা করতে হলে আমার যদি জানা-শোনা থাকে, তাহলে রাজা বা মন্ত্রীর 'হোম ডিপার্টমেন্টই' তার ব্যবস্থা করবে—আমার নিজের কিছুই করতে হবে না। এর জন্য দরকার শুধু রাজা বা মন্ত্রী আমার ওপর খুশি আছেন কিনা, সেইটা খেয়াল করা। টীকাকার বলেছেন—যস্য শত্রবঃ সন্তি তানপি সন্তোষিতো হন্তি। 'সন্তোষিতঃ' মানে ভাল করে তেল খাওয়ানোর পর।

গণতন্ত্রের তত্ত্বে বিশ্বাস-করা ব্যক্তি মাত্রেই এতক্ষণে আমার ওপর যতখানি ক্ষিপ্ত হবার হয়ে গেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেই নিজের ওপর ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত এই জন্য যে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে জন্ম নিয়ে আমি কিনা শেষে আদিম রাজতন্ত্রের কুফল আবিষ্কার করলাম গণতন্ত্রের মধ্যেই। আসলে ঘটনাটা হল স্বাভাবিকতার। রাজতন্ত্রে রাজার একার হাতে যে অপার ঐশ্বরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, গণতন্ত্রে সেই ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত হয় বিশেষ কয়েক জনের হাতে এবং সেইটাই স্বাভাবিক। কথাটা একটু অন্যভাবে জানালেন আমার এক বন্ধু যিনি কর্মসূত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি আমায় রবার্ট মিচেল্‌সের লেখা 'পোলিটিক্যাল পার্টিজ' নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান দেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা অভিজাত তাত্ত্বিক বলে পরিচিত, অর্থাৎ কিনা যাঁদের লেখায় অন্যেরা 'বুর্জোয়াসি'র গন্ধ পান, মিচেল্‌স কিন্তু তাঁদেরই একজন। মিচেল্‌সের ধারণা—রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক চেহারা যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, এবং তাদের ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে যতই গণতান্ত্রিকতা থাকুক না কেন—তাদের মধ্যে কেমন একটা 'অলিগার্কিক্যাল' ঝোঁক এসে যায়, অর্থাৎ কিনা গণতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যেও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির শাসনতন্ত্র জারি হয়ে যায়। এর কারণ প্রধানত দুটি। এক নম্বর কারণ—প্রত্যেক সংগঠনেই বিশিষ্ট নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সংগঠনের সকলেই তো আর নেতা হয় না, অথবা নেতা হওয়ার গুণও সবার থাকে না। ফলে এক একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনে বিশিষ্ট কয়েকজনই নেতা হয় এবং স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক অথবা সরকারি ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয় সেই বিশিষ্ট কতিপয়ের মধ্যেই। দ্বিতীয়ত, যে কোনও গণতান্ত্রিক সংগঠনেই অধিকাংশ সদস্য বাস্তব ক্ষেত্রে নিরুদ্যমী এবং উদাসীন থাকেন। ফলত যাঁরাই সেখানে উদ্যমী পুরুষ অথবা যাঁরাই বাস্তবক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে সোৎসাহে দলের গুরু কার্যভার নির্বাহ করেন—রাজনৈতিক এবং সরকারি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তাঁদের মধ্যেই। এর অবধারিত ফল—বিশিষ্ট কতিপয়ের শাসন।

এই জিনিসটা আমাদের বৃহত্তম গণতন্ত্রেও ঘটেছে। মিচেল্‌স্‌কে অভিজাত তাত্ত্বিক বলে যতই গালাগালি দিন না কেন, বাস্তবের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এই মত কোনওভাবেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর বিশিষ্ট কতিপয়ের শাসনকে যদি আপনি 'অলিগার্কি না বলে গণতন্ত্র বলতে চান, তাহলে বলব—ওরকম গণতন্ত্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগ থেকে ছিল। না, আমি অতখানি আহাম্মক নই যে বলব—আজ যেমন আছি সেদিনও তেমনই ছিলাম, কিংবা যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার আজ পাচ্ছি প্রাচীন রাজাদের আমলেও তাই পেতাম। যাঁরা অ্যাটম বোমা থেকে আরম্ভ করে রকেট, এরোপ্লেন সবই প্রাচীন যুগে দেখতে পান, আমি তাঁদের মতো বিদ্বান নই। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটুকু দেখতেই পারি যে, কুফলের দিক দিয়ে গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের মতোই হয়ে পড়ল কিনা। এটাও দেখতে পারি—সেকালের স্বৈরতান্ত্রিক রাজারা

কতখানি গণতান্ত্রিক ছিলেন, অপিচ এখনকার গণতান্ত্রিক মন্ত্রীরা স্বৈরভাবে কতটা রাজতান্ত্রিক।

দেখুন- একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী পাদপ্রতি এবং নির্বাচনের পর মন্ত্রীদের যে শপথগ্রহণ—এ দুটোই হাস্যকর। আমি তো বলি এ দুটোই চলে অনেকটা প্রাচীন ভারতীয় রাজতান্ত্রিক কায়দায়। এটা ঠিকই যে, এখনকার মতো না হলেও, অন্তত বেদের যুগে রাজাদের একটা ইলেক্‌শন হত। পরবর্তী কালে রাজা হওয়ার ব্যাপারটা বংশগত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু খ্রিস্ট জন্মের অন্তত আটশো-ন'শো বছর আগে সাধারণ লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের প্রধানকে নির্বাচন করেছিল এবং তার উপাধি দিয়েছিল 'রাজা।' তারা বলেছিল—তোমাকে সবাই এই এই রাজ্যের প্রধান হিসেবে পছন্দ করুক, বরণ করুক—বিশ স্তা সর্বা বাঞ্ছন্তু, ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায়। যে জায়গায় মিলিত হয়ে সাধারণ মানুষেরা 'বিশঃ'—তাদের রাজাকে নির্বাচন করত, তাকে বলা হত 'সমিতি'। রাজা হবার পরেও তাঁকে মাঝে মাঝেই এই সাধারণের আলোচনার আসরে হাজিরা দিতে হত। ব্যাপারটা এতই সাধারণ ছিল যে, সোমরস কলসিতে ঢেলে সাজানোর সময় ঋষি মন্ত্র পড়েছেন—প্রকৃত রাজা যেমন সমিতিতে যান, তেমনই শোধিত হতে হতে সোমরস কলসীতে যাচ্ছে—রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ! এই সমিতিতে সবাই কথা বলতে পারত। শুধু তাই নয়, ভাল 'পার্লামেন্টেরিয়ানে'র মতো যাতে ভাল কথা বলা যায়—সে জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাত বৈদিক পুরুষেরা। বলত—নিজের গ্রামে হোক কিংবা বনে, এই পৃথিবীতে যে সব সভা আছে, যেখানে যেখানে লোকে এক জায়গায় মিলিত হয়ে কথা বলে, সে সব জায়গায় আমরা যেন বেশ ভাল করে কথা বলতে পারি—যে সংগ্রামাঃ, সমিতয় স্তেষু চারু বদেম তে।

ওপরের মন্ত্রবর্ণে 'সংগ্রাম' শব্দটি দেখে যুদ্ধ-টুদ্ধ ভাববেন না, 'সংগ্রাম' মানে একজোট। সেই জোটে নাই বা এলেন রাজা, তবু লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য এক জায়গায় মিলিত হত—সংগ্রামে সংযত্তে সময়কামঃ। অথর্ববেদ বলেছে—সভা আর সমিতি নাকি প্রজাপতির দুই মেয়ে। সমিতিতে যেমন সাধারণের আলোচনা চলত, সভা ব্যাপারটা কিন্তু ততখানি সাধারণ নয়। সভা আরও একটু উঁচু দরের জায়গা, একটু 'অফিসিয়াল' গোছের। হ্যাঁ, এটাও একটা আলোচনার জায়গা বটে,তবে এখানকার সিদ্ধান্তে আইন-টাইনের ব্যাপার আছে। সভায় ভাল বলার জন্য বৈদিক পুরুষেরা রীতিমত বাপের নাম স্মরণ করে যেতেন—চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু। এই সভার এক নাম হল 'নরিষ্টা'। টীকাকার সায়নাচার্য এই শব্দটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—সভায় আলোচনা করে সবাই যে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, সে সিদ্ধান্ত কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না বলেই সভার এক নাম 'নরিষ্টা'—বহবঃ সম্ভূয় যদ্যেকং বাক্যং বদেয়ু স্তদ্ধি ন পরৈ রতিলঙ্ঘ্যম্ অতঃ অনতিলঙ্ঘ্যবাক্যত্বাৎ নরিষ্টেতি।

বৈদিক 'সভাতে' যে বেশ গুরুতর আলোচনা হত—সে কথাটা বৌদ্ধ কথাকারদের

স্মৃতিতেও ছিল। জাতকে বলা হয়েছে—সভায় কথা বলতে গেলে নিজের পক্ষপাত এবং বিদ্বেষের ওপরে উঠে—রাগং চ দোসং চ পহায় মোহং—ন্যায় কথাটি বলতে হত এবং যে সভায় সজ্জন ভদ্রলোকেরা ন্যায়নীতির কথা বলত না—সেটা নাকি সভাই নয়।

সভা আর সমিতির কাজ-কর্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কল্পে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তাতে কেউ গদগদ হয়ে এমন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বৈদিক পুরুষেরা রাজা নির্বাচন করত। আবার অন্য বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা বলেছেন—ওসব কিছুই নয়। সভা সমিতিতে সাধারণ জনের আলোচনাটা স্বাধীনভাবে চলত বটে, তবে সভাটা ছিল রাজার নিকট-জনের মত বিনিময়ের আখড়া আর সমিতিটা হল একেবারেই সাধারণের মত প্রকাশের জায়গা। সমিতির মতামত রাজা শুনতেন কিনা খুব সন্দেহ। আমরা আধুনিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিরিখে এই দুটি ভিন্নমুখী মতই মেনে নিয়েছি। আমরা পণ্ডিত জয়সোয়ালের মত মেনে বলি বৈদিক সমিতিগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রাজা নির্বাচন করত, ঠিক যেমন আমরা জনগণ মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্বাচন করি। আবার ঐতিহাসিক ইউ এন ঘোষালের মত মেনে জয়সোয়ালের মত ফর্দাফাঁই করে দিয়ে বলি—ওসব কিছুই নয়। সিংহাসনে বসা রাজাকে সবাই মেনে নিতে বাধ্য হত, যেমন আমরাও মন্ত্রীদের মেনে নিতে বাধ্য হই। সভাটা হল একটা 'narrow royal council', ঠিক যেমন আমাদের প্রসারিত মন্ত্রিসভাও মুখ্য কিংবা প্রধানমন্ত্রীর 'কাউন্সিল।'

বৈদিক যুগে রাজার যখন অভিষেক হত, তখন পুরোহিতেরা নাকি মন্ত্র পড়তেন—এই রাজ্য এখন তোমার—ইয়ং তে রাট্। তুমিই একে চালাবে, তুমিই একে ধারণ করবে। ভাল কৃষির জন্য, উন্নতির জন্য, রাজ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এই রাজ্য তোমাকে দেওয়া হল—ইয়ং তে রাট্। নির্বাচনোত্তর ভূমিকায় আমরাও আমাদের দেশের উন্নতি এবং বৃদ্ধির জন্য আমাদের এই রাজ্য নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিই। বলি-ইয়ং তে রাট্। মন্ত্রীরা প্রত্যেকে সবিনয়ে বলেন—আমি কে? জনগণ আমাকে এখানে এনেছেন। আমার কাজ—জনগণের সেবা করা এবং তা যদি না করতে পারি, তাহলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব। মুখে এ কথা বলেন বটে, তবে কাজে কী করেন—সেটা জানতে হলে আমাদের আর বৈদিক মন্ত্রের ধূসর জগতে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদের উপস্থিত হতে হবে রামায়ণ-মহাভারতের পরিষ্কার রাজনৈতিক সংসারে। অবশ্য তারও আগে একটা সংবাদ আপনাদের জানানো দরকার।

ব্রহ্মপুরাণে দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রের বিধি বিধান অনুযায়ী সিংহাসনে অভিষিক্ত রাজা খানিকক্ষণের জন্য হাতিতে চড়ে নগর পরিক্রমায় বেরতেন। এই সময়ে তাঁরা পুরবাসী জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসতেন। সংস্কৃতে ব্যাপারটা আছে এইরকম—রাজা পৌরমুখ্যদের কায়িক এবং বাচিক পূজা অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের ছেড়ে দেবেন—কৃত্বা পূজাং বিসর্জয়েৎ। এই 'বিসর্জয়েৎ' অর্থাৎ বিসর্জন দেওয়ার কথাটা মাথায় রাখবেন।

আধুনিক কালে ব্রহ্মপুরাণের এই কায়দাটাকে বিজয়-মিছিল বলা চলে। অর্থাৎ নির্বাচনের পরে পরেই (সাধু ভাষায় অভিষেকের পরে পরেই) সাংসদরা হাতিতে, গাড়িতে কিংবা আরও জনদরদী দেখাতে হলে, পায়ে হেঁটে কিঞ্চিৎ পুর-প্রদক্ষিণ করে নিজের গৃহ-পুরে প্রবেশ করবেন—প্রদক্ষিণীকৃত্য পুরং প্রবিশ্য চ পুরং গৃহম্। এই পথ-পরিক্রমা বা বিজয় মিছিলের সময় তিনি কী করবেন? নির্বাচিত বা অভিষেক করার জন্য পুরবাসীদের হাত জোড় করে পূজা-অভ্যর্থনা করবেন। তারপর কী করবেন? 'বিসর্জয়েৎ'। সংস্কৃত শব্দটির ভাব হল—জনগণকে ছেড়ে এইবার রাজা ঘরে আসবেন। কিন্তু 'বিসর্জয়েৎ' মানে যেহেতু ত্যাগ করাও বোঝায়, এবং পুনর্নির্বাচন পর্যন্ত রাজা কিংবা মন্ত্রী—কেউই যখন জনগণের কাছে আর কখনও যান না, তাই বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা বিসর্জন মানে ত্যাগ করাই বুঝব। এই বিজয় মিছিলের পর্ব চুকলেই শপথ-গ্রহণ।

শোনা যায়—এই পৃথিবীর প্রথম সফল রাজা হলেন পৃথু। বস্তুত তাঁর নাম থেকেই এই ধরণীর নাম পৃথ্বী বা পৃথিবী। তা ওই পৃথু রাজা হবার সময় ঋষি-মুনিরা তাঁকে বরণ করে একটি শপথ-বাক্য পাঠ করালেন। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেছেন—শপথগ্রহণ রাজার অভিষেকক্রিয়ার একটি অঙ্গ। হতেও বা পারে, কারণ শপথ না নিলে যেখানে আমাদের মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব সিদ্ধ হয় না, সাংসদের সাংসদত্ব সিদ্ধ হয় না, সেখানে প্রাচীন রাজাদের এইসব ঘটা-পটা থাকবে না—তা কি হয়? অতএব শপথ একটা করতেই হত। দুনিয়ার প্রথম রাজা পৃথুকে নাকি বলা হয়েছিল—তুমি প্রতিজ্ঞা করো—শুধু তাই নয় মনে, কাজে এবং কথার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করো—আমি সব সময় এই পৃথিবীর মানুষকে এবং এই ভূমিজাত সমস্ত সম্পদকে ভগবান বলে মনে করব। ন্যায়-নীতি-ধর্ম ইত্যাদি যেমনটি শাস্ত্রে বলা আছে এবং যেমনটি রাজনীতি-বিগর্হিত নয়—সে সব আমি নির্দ্বিধায় নিঃশঙ্কচিত্তে পালন করব অপিচ কখনই আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে স্বৈর-ব্যবহার করব না—স্ববশো ন কদাচন।

সেকালের দিনের রাজারা ভগবানের নামে যে সব কর্তব্য কার্যের অঙ্গীকার করতেন, এখনকার মন্ত্রীরা সেটা করেন সংবিধানের নামে। তবে আর্থসামাজিক তত্ত্ববাদী ঐতিহাসিকেরা নানা বিচার আচার করে বার করেছেন রাজা, অথচ স্বৈরতন্ত্রী নন—এমনটি হতেই পারে না। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র—এগুলি সবসময়ই জনগণের সার্বিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে। এর প্রমাণ আছে হাজার হাজার, এবং সেই প্রমাণের নিরিখে আমরা মেনে নিতে বাধ্য, যে, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র—এসব মোটেই ভাল কথা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা হয়—যাঁরা সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলেন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার করেন, তাঁদের কাজের মধ্যে জনমনের সামগ্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন কতটা হয়?

এ কথাটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার যে, 'সংবিধান' বলে যে গণতান্ত্রিক নীতি-নিয়মের গ্রন্থখানি আমাদের নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের পূর্বাহ্নেই

পাচ্ছেন, সে রকম সংবিধান আমাদের প্রাচীন কালের রাজারাও পেয়েছেন। মহাভারত রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত—সবকটি গ্রন্থই একবাক্যে স্বীকার করে যে, রাজারা তাঁদের ইচ্ছেমত চলতে পারতেন না। তাঁদের সামনে থাকত দণ্ডনীতির সংবিধান, যাকে এক ধরনের 'কনস্টিটিউশন' বলতে কোনও বাধা নেই। 'দণ্ড' শব্দটিকে বলতে—পাঁচ বছরের সশ্রম কারাবাস অথবা পুলিশের লাঠিপেটা বুঝবেন না। দণ্ডনীতি প্রজা, রাজা—সবার কাছেই সংবিধানের মতো। যে শাস্ত্রের বলে সাধারণ লোকেরা তাদের মৌলিক অধিকারগুলি লাভ করতে পারত এবং যে শাস্ত্রের বলে রাজারা প্রজাদের অধিকার রক্ষা করতে পারতেন—সেটাই হল দণ্ডনীতি। মহাভারত বলেছে—এই দণ্ডনীতির শাস্ত্র তৈরি হয়েছিল, রাজা তৈরির অনেক আগে, ঠিক যেমন কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান তৈরি হওয়া উচিত মন্ত্রিসভা গঠনেরও আগে। এই দণ্ডনীতির শাস্ত্র ছিল বিরাট যার পরিকল্পনা করেছিলেন ভগবান শংকর, কৌটিল্য যাঁর নাম বলেছেন বিশালাক্ষ। মহাভারতের মতে—এত বিরাট বিধি-বিধান অনুসারে এ জগতে চলা দায় বলে সেই বিরাট শাস্ত্র নাকি সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রথমে ইন্দ্র নাকি এটা সংক্ষেপ করেন, তারপর করেন বৃহস্পতি, তারপর শুক্রাচার্য। তারপর অন্যান্য মুনি ঋষিও এই কাজে হাত দেন।

আমাদের মতে এই সংক্ষিপ্ত করার কাজটা একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের ধারণা—বিরাট দণ্ডনীতি শাস্ত্র একটু একটু করে 'অ্যামেন্ডেড' হতে থাকে, সংক্ষিপ্ত নয়। এর প্রমাণ পাবেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য নিজে প্রথমে স্বীকার করেছেন যে, তিনি পূর্বাচার্যদের সমস্ত শাস্ত্র দেখেই অর্থশাস্ত্র লিখতে বসেছেন। কিন্তু কৌটিল্য যখন বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যায় আসছেন, তখন কোথাও বিশালাক্ষ শিবের মত উদ্ধার করে, তারপরেই হয়তো বৃহস্পতির মত উল্লেখ করলেন, কিংবা উদ্ধৃতি দিলেন শুক্রাচার্যের মত থেকেও। বিষয়টা একই, কিন্তু মত ভিন্ন ভিন্ন। অপিচ, সবার শেষে কৌটিল্য সব আচার্যর মত উড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমি কৌটিল্য—এঁদের কারও মতই মানি না—নেতি কৌটিল্যঃ। এই বলে সমস্যার কী সমাধান হওয়া উচিত—কৌটিল্য সেটা সবার মতের দোষ দেখিয়ে 'অ্যামেন্ড' করলেন।

বস্তুত রাজনীতি বা দণ্ডনীতি শাস্ত্র যদি সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততরই হত, তাহলে বিশালাক্ষ কিংবা বৃহস্পতির ইন্দ্র কিংবা শুক্রাচার্যের মতের ঐক্য থাকত। কিন্তু কৌটিল্যে দেখেছি—এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মতানৈক্য আছে, এবং এঁরা কেউই দেবতার মতো অমোঘও নয়। ভাবে বুঝি—সময় এবং পরিবর্তিত অবস্থা বুঝে—যাকে মহাভারত বলেছে—এবং লোকানুরোধেন—এক এক সময়ে এক এক আচার্য দণ্ডনীতির সংবিধান সংশোধন করেছেন—যার চরম পরিণতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। যাইহোক, এই দণ্ডনীতির শাস্ত্র একেবারে শুক্রাচার্য—মানে দেবতাদের বিরোধী গোষ্ঠী অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের হাতে সংশোধিত হওয়ার পর নাকি

দেবতারা ভগবান বিষ্ণুকে বলেন—এইবার আপনি মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে, অর্থাৎ রাজাকে এই দণ্ডনীতির উপদেশ দিন। তার মানে রাজার আগে রাজার কর্ম-নির্দেশক, সংবিধান রচনা করা হয়েছে—যাকে মনু বলেছেন—অসৃজৎ পূর্বম্ ঈশ্বরঃ। এই সংবিধানের প্রয়োগ করতে হবে কী করে? না, নিজের পছন্দ-অপছন্দ শিকেয় তুলে রেখে—প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য—নিজের কামনা, লোভ এবং ব্যক্তিগত ক্রোধ দূরে সরিয়ে রেখে, সবার প্রতি সমদৃষ্টিতে—সমঃ সর্বেষু জন্তুষু।

যদি বলেন—ও সব মুখের কথা রাখুন তো! রাজার আবার সংবিধান? শাস্ত্রে, কাব্যে, ব্যবহারে সব সময়ই দেখেছি,—রাজাদের অপছন্দ হলেই শূলে চড়াচ্ছেন, খুশি হলেই স্বর্গে ওঠাচ্ছেন, কামনা হলেই মেয়েছেলে তুলে আনছেন—তাদের আবার সংবিধান? আমরা বলি—অত উত্তেজিত হবেন না। অনেস্টি ইজ্ দ্য বেস্ট পলিসি—এটা 'পলিসি-ম্যাটার' হিসেবে খুবই ভাল, কিন্তু ব্যবহারে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন। রাজাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতা যেহেতু একজনের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকত, তাই দণ্ডনীতি সংবিধানের অপব্যবহারও তাঁদের হাতে কোথাও কোথাও হয়েছে, ঠিক যেমন আধুনিক গণতান্ত্রিক নেতাদের সামনে বা পেছনে ভারতীয় সংবিধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দে কেউ ওপরে উঠছেন, অপছন্দে কেউ লাঞ্ছিত হচ্ছেন, আবার উদাসীনতায় কেউ মুছে যাচ্ছেন। তাছাড়া একটু ওপর মহলে গতায়াত করলে—সি. এম. চাইছেন পি. এম. চাইছেন—এ সব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে সি এম, পি এমের সামনে সংবিধান নেই তা তো নয়, ঠিক যেমন সেকালের রাজাদের সামনে নানাজনের লেখা রাজধর্মের সুসমাচার ছিল না—তাও তো নয়।

দুই

যে কথা বলছিলাম—সংবিধান গোছের একটা জিনিস রাজাদের সামনেও ছিল—যাকে কখনও বলা হয়েছে নীতিশাস্ত্র, কখনও দণ্ডনীতি অথবা অর্থশাস্ত্র। এই শাস্ত্র-প্রণেতারা—যাঁদের আমরা 'পলিসি-মেকার' ও বলতে পারি—তাঁরা সব সময় বলেছেন—রাজা যেন কোনও ব্যাপারে পূর্বাচার্যদের শেখা শাস্ত্র অতিক্রম না করেন। রাজদণ্ডের বিধান থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী, অমাত্য অথবা দূত নির্বাচন, শিল্প কৃষি অথবা পরিবেশ চিন্তা—সব কিছুতেই সিদ্ধান্ত হবে শাস্ত্র অনুসারে। ইতর বিশেষ যা ঘটবে, তার আলোচনা হবে মন্ত্রিসভায় এবং সেখানেও সিদ্ধান্ত হবে আলোচ্য বিষয়ে নির্ধারিত শাস্ত্র-নীতি অনুযায়ী। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা হলে সেকালের রাজ্য শাসনের নীতি-নিয়ম, সংবিধান একটু বলে নিই, তারপর আবার গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা করব।

যুধিষ্ঠির যখন প্রথম রাজা হয়ে বসলেন ইন্দ্রপ্রস্থে, তখন নারদ এলেন তাঁকে উপদেশ দিতে। নারদকে তো লোকে ঝগড়া লাগানোর 'মাস্টার' বলেই জানে, কিন্তু

আমরা তাঁকে একজন বড় ধরনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলে মানি। আপনারা বলবেন—পাখা থাকার ফলে আরশুলাও পাখি হল, আর দুটো বাণী দিয়ে নারদও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেন। আমরা বলব—নারদ ঠিক অধুনা পাখা-গজানো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়েন না। বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং 'অল-রাউন্ড' জ্ঞান ছিল—প্রত্যক্ষদর্শী লোকস্য তির্যগূর্ধ্বমধস্তথা। শুধু তাই নয়, অনেক গুণের মধ্যে মহাভারতকার তাঁর একটি গুণের উল্লেখ করে বলেছেন—নানাত্ব-সমবায়-বিশারদঃ—অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। তা এমন লোককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলব না, তো কী বলব? নারদ অনেক কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, রাষ্ট্রনীতির অনেক উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"তাহাতে এমন তত্ত্ব আছে যে, রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমন কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্বত্র সর্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।'

আমাদের বক্তব্যও ঠিক তাই। সেকালের রাজারা ওই নীতি-নিয়ম অনুসারে সব সময় চলেননি, ঠিক যেমন এখনকার নেতারাও সব সময় আইন আর সংবিধান অনুসারে চলেন না। কাজেই তাঁদের কথা শুনতে দোষ কী? বঙ্কিম নারদ-বাক্যের কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করে তাঁর আমলের শাসনতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন; আমরা আরও কয়েকটি উপদেশ উদ্ধার করে আমাদের আমলের গণতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে নারদের কথার সমন্বয় দেখানোর চেষ্টা করব।

নারদের মতে রাজার গুণ হল ছ'টি—রাজগুণৈঃ ষড়ভিঃ। আমাদের যুগে সেগুলি অবশ্য মন্ত্রীমশাইদের গুণ। প্রথম গুণ হল—ভাল বক্তৃতা করার ক্ষমতা। সেকালে এই গুণে রাজা মন্ত্রী, অমাত্য, চরদের তাক লাগিয়ে দিতেন আর একালে ওই বক্তৃতার গুণে মুর্খ বুদ্ধিমান, ধনী-দরিদ্র সকলেই মোহিত হয়। রাজার দ্বিতীয় গুণ—প্রগল্‌ভতা—এটাকে প্রাচীনেরা যে যাই ব্যাখ্যা করুন আজকের দিনের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রগল্‌ভতা হল—সপ্রতিভভাবে অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা। তৃতীয় গুণ—মেধাবিত্ত, যাকে টীকাকার বলেছেন তর্ক কৌশল। এই গুণে রাজারা যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, তেমনই এই গুণেই আজকাল আমরা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলে বুঝতে পারি। চতুর্থ গুণ—স্মৃতি। এটি একটি অসাধারণ গুণ, যা বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে রাজা বা মন্ত্রী কারওরই কাজে লাগে না, কিন্তু বিরোধী গোষ্ঠীর ছিদ্রান্বেষণে এই গুণ সাল-তারিখ সহ অতি দ্রুত মস্তকে ক্রিয়া করে। পঞ্চম—নীতি অর্থাৎ শাস্ত্র, আধুনিক ভাষায় সাংবিধানিক জ্ঞান। রাজার আরেকটি, মানে, ষষ্ঠ গুণটি নাকি কবিত্ব। এই কবি কিন্তু সে কবি নয়, কবিত্ব মানে ভবিষ্যতের অনুমান ক্ষমতা। এই গুণের ফলে যেটা হওয়া উচিত ছিল—সেটা হল—স্মৃতি গুণে রাষ্ট্রনায়ক

অতীতের দোষ সংশোধন করবেন এবং ভবিষ্যতের আগাম অনুমানে, বর্তমানের কর্মপন্থা নির্ণয় করবেন। কিন্তু রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্রে কোনওখানেই আত্মসংশোধন ঘটে না, সেখানে আগাম অনুমানের ফল কী?

এই ছয়টি রাজগুণের সাহায্যে রাজারা যা যা করতেন, তা সব আমাদের কাজে লাগবে না, কারণ সেকালে রাজারা ছিলেন পররাষ্ট্রের আগ্রাসকামুক সাম্রাজ্যবাদী। এ কালে তো আর নীতিগতভাবে কেউ পররাষ্ট্রলোভী নয়, শুধু গালাগালি দেওয়ার সময় একে অপরকে সাম্রাজ্যবাদী বলে মাত্র। যাই হোক, মহাভারতে ছয় গুণের গুণী যুধিষ্ঠিরকে নারদ প্রথম যে মোক্ষম প্রশ্নটি করলেন, সেটা হল—আপনি আটটি কাজ ঠিক ঠিক দেখেন তো—অষ্টৌ ভারত সেবসে। শ্রমিক-কৃষকের দরবারি নেতারা খুশি হবেন শুনে যে, সেকালের সাম্রাজ্যবাদী রাজাকে আটটি কাজের কথা জিজ্ঞাসা করার মানেই হল—তিনি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত আটটি কাজ ঠিকমত করেন কিনা তারই জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে। এই আটটি কাজ এতই চেনা, এতই জানা যে, সেগুলি আর স্পষ্ট করে আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না, অথচ প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ওই আটটি কাজকে প্রাচীন রাষ্ট্রশাসনের পরিভাষায় বলে—'সন্ধানকর্ম'—অর্থাৎ এগুলি রাজার নিত্য অনুসন্ধানের বিষয়। প্রথম কাজটাই হল—কৃষি।

কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় কৃষির কথাই যে প্রথমে আসবে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। তারপরেই হল বাণিজ্য—অন্তর্দেশীয় এবং বহির্দেশীয়। তৃতীয় সন্ধানের বিষয় হল দুর্গ—শত্রুর আক্রমণের মুখে যেটি শেষ আশ্রয়। চতুর্থ বিষয়ের ভাবনাটি কত আধুনিক, ভাবতে পারবেন না। এটা হল সেতু-নির্মাণ। কথাটা শুনে মনে হবে যেন পৌর এবং জনপদবাসীদের চলাফেরার সুবিধের জন্যই রাজাদের 'ব্রিজ' বানানোর চিন্তা হচ্ছে। তা মোটেই নয়। এর মূলে ছিল কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। তাছাড়া সেতু নির্মাণ ব্যাপারটা রাজার অষ্ট সন্ধানকর্মের মধ্যে পড়ায় আমরা বিশ্বাস করি—রাজারা রীতিমত খবরাখবর নিয়ে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতেন। নারদের মুখে এই সেতুবন্ধনের উপদেশ শুনে কেউ যেন না ভাবেন—সেতু বন্ধন মানে 'ব্রিজ' বানানো। কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত বিশদ অর্থে, ইংরেজিতে একে বরং 'ইরিগেশন ওয়ার্কস্' বলা যেতে পারে। সেতুবন্ধন হল—সব সময় জল থাকে এমন নিত্যতোয়া নদী (পেরেনিয়াল্ রিভার্স) থেকে অথবা বর্ষার সময় ভরা-জল নদী থেকে কৃত্রিম উপায়ে জল কেটে এনে চাষের সুবিধের জন্য বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রের আশেপাশে জলাশয় বানানো। ব্যাপারটা এখনকার ভাষায় 'ক্যানাল' তৈরি করা।

এখন 'ক্যানাল' তৈরি করতে যে জমি লাগে—অর্থাৎ জল ঢোকার পথ, জল বেরিয়ে যাবার পথ, মাঝখানে জল স্থায়ী করার জন্য জলাশয়ের ভূমি, জল আটকানোর জন্য গাছ ফেলা, সম্পূর্ণ কাজটি করার জন্য কাজের লোক এবং তার মজুরির ব্যবস্থা—সবই রাজা করবেন। অর্থাৎ জমি দেবেন রাজা, ক্যানালের দুধারে উঁচু করে গাছ-ফেলার ব্যবস্থা করবেন রাজা—ভূমি-মার্গ-বৃক্ষোপকরণানুগ্রহং কুর্যাৎ।

সেতুবন্ধনের এই বিবরণ দিয়েছেন কৌটিল্য। আপনারা ভাবতে পারেন—মহাভারতের যুগে এসব বিলি-ব্যবস্থা ছিল না, এগুলো কৌটিল্যের যুগের আগে আগে হয়েছে। আমরা প্রমাণ দিয়ে বলব—কৃষিব্যবস্থা উন্নতির জন্য এই নিত্যতোয়া নদী থেকে এই 'ক্যানাল' বানানোর কায়দা নারদ প্রমুখ মুনি-ঋষিদেরও জানা ছিল, নারদ সেতুবন্ধনের কথাটা আটটি সন্ধানকর্মের মধ্যে সূত্রাকারে পরিভাষায় জিজ্ঞাসা করেছেন। এখন এর পরেই নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করবেন—মহারাজ! আপনার রাজ্যের কৃষিকর্ম তো আবার বৃষ্টির দেবতার ওপর ভরসা করে চলে না—ন কৃষি দেবমাতৃকা? সেকালে ঠাকুর-দেবতার ওপর অসীম ভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রজ্ঞানী নারদ কিন্তু কৃষির জন্য যজ্ঞ-হোমের ব্যবস্থা দেননি। তিনি বলেছেন—চাষ-বাসের বেলায় যাতে বৃষ্টির ওপর ভরসা না করতে হয় তার জন্য আপনি আপনার রাজ্যের ভাগে ভাগে ছোট-বড় পুকুর-টুকুর কাটিয়েছেন তো? কাজেই উন্নত সেচ-ব্যবস্থা তৈরির ব্যাপারে মহাভারত-এবং কৌটিল্যে কোনও তফাৎ নেই। চিরন্তনী নদী বা বর্ষার জল 'ক্যানালাইজ' করে সম্পূর্ণ আধুনিক এক সেচ ব্যবস্থা তৈরি করতে এখনকার কৃষক-দরদী সরকার সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে কি না?

যাই হোক, কৃষিকর্মের সম্বন্ধে পরে আবার কথা আসবে। আপাতত বলতে হবে—আট সন্ধানকর্মের মধ্যে পঞ্চমটির কথা। সেটি হল—কুঞ্জর-বন্ধন অর্থাৎ হাতি পোষা। রাজার যুদ্ধের জন্য হাতি লাগত। একটা নয়, দুটো নয়, অনেক হাতি। এত হাতি হাতি শালে পুষতে গেলে দুদিনেই রাজা ফতুর হয়ে যাবেন। এজন্য রাজারা করতেন কী—লোক দিয়ে এক সময় এক একটা হাতিকে এক একটা গ্রামে বেঁধে রেখে আসতেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই হাতি দেখে আনন্দও পেত, আবার কলাগাছ থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের খাবারও খেতে দিত। গ্রামীণদের পয়সাতেই রাজার হাতি-পোষা সম্পন্ন হত। ষষ্ঠ কাজ—খনি থেকে মণি-রত্ন, দামি পাথর যা ওঠে তার বিধি ব্যবস্থা, এবং ট্যাক্সের ব্যবস্থা করা। আর সপ্তম কাজ—আকরিক অবস্থায় যে সোনা, লবণ ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাকে ঠিকঠাক করে তার ওপর ট্যাক্সের ব্যবস্থা করা।

অষ্টম কাজটির গুরুত্ব আরও বেশি, যদিও সেটাও কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজনীতিশাস্ত্র বলেছে—রাজার অষ্টম কাজটি হল—শূন্যানাঞ্চ নিবেশনম্— অর্থাৎ শূন্যের ব্যবস্থা করা। সাধারণ্যে প্রশ্ন উঠবে—শূন্যের ব্যবস্থা আবার কী? আসলে এখানে শূন্য মানে হল পতিত জমি। পতিত জমিতে কৃষিকর্মের ব্যবস্থা করলে একদিকে যেমন ভূমিহীন চাষীদের পুনর্বাসন করা যায়, অন্যদিকে তেমন জমির আয় থেকে দেয় শুল্কে রাজার কোষও বৃদ্ধি পায়।

যুধিষ্ঠিরকে এই আটটা কাজ এবং রাজ্যশাসন বিষয়ক আরও কয়েকটি কাজের কথা সূত্রাকারে জিজ্ঞাসা করেই নারদ বললেন আপনি একা একা কোনও 'ডিসিশন' নেন না তো—ক্বচিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ ক্বচিন্ন বহুভিঃ সহ—আবার অনেক লোকের সঙ্গে

আলোচনায় বসেন না তো? সেকালের দিনে অনেক লোকের সঙ্গে আলোচনার কুফল ছিল—গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বাইরে ফাঁস হয়ে যাওয়া। আর এ কালের দিনে গণতান্ত্রিক সরকার তখনই সবার সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখনই সর্বদলীয় বৈঠক করেন—যখন আলোচ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে অথবা যে কাজটার দায় সরকার নিজের ঘাড়ে নিতে চান না।

নারদ বললেন—যে সব কাজে খরচা কম, অথচ লাভ বেশি—লঘুমূলান্ মহোদয়ান্—সেই সব কাজের পূর্বাপর বিবেচনা করে সেগুলিই তাড়াতাড়ি আরম্ভ করেন তো? দেরি করেন না তো?

বঙ্কিমচন্দ্র নারদমুনির এই বাক্যটি সোনার অক্ষরে বাঁধিয়ে ইংরেজদের কার্যালয়ে টাঙিয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা বলি—আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদেরা এই উপদেশের মর্ম খানিকটা বোঝেন বলেই স্বল্পব্যয়ী শিল্পনীতির ওপর বেশি জোর দেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য 'স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রির' কথা জানতেন না, অতএব কম খরচে বেশি লাভের ব্যবসা বলতে তিনি প্রথমত কৃষি বুঝেছেন, তারপর বুঝেছেন অন্যান্য অল্পব্যয়সাধ্য ব্যবসা-বাণিজ্য। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই শ্লোকে নীলকণ্ঠের টীকা মাথায় না রেখে যে টীকা এবং যে অর্থ করেছেন, সবিনয়ে জানাই—সে অর্থ অসম্ভব নয়, তবে অদ্ভুত বটেই। তবে এর পরবর্তী শ্লোকের অর্থটি আবার এতই যুক্তিযুক্ত হয়েছে সিদ্ধান্তবাগীশের হাতে যে, আমাদের সমস্ত ক্ষোভ চলে যায়। সেই অর্থ প্রথমে ধরলে, নারদের কথা দাঁড়ায় এইরকম—মহারাজ। সমস্ত কাজের শেষটা আপনার অজানা থাকে না তো? নীলকণ্ঠের অর্থ ধরলে—নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত লোকগুলির সবাই আপনার অচেনা নয় তো—ক্বচিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ পরোক্ষাস্তে মহীপতে।

আমরা দুই অর্থ ধরেই বলি—এই শ্লোকটিই, (থুড়ি, সংস্কৃত এখন উঠে যাওয়ায় এই শ্লোকের অর্থটিই) বরং আমাদের সরকারি কার্যালয়গুলিতে টাঙিয়ে রাখা উচিত। কারণ আমাদের মন্ত্রী-বাহাদুরেরা বৎসরে কটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন, তা তাঁরা নিজেরাও জানেন না। তা সেই সব প্রকল্পের কাজ শেষ হল কিনা—সে সব কথা আবার কেন? প্রকল্পের উদ্বোধনেই জনগণরূপ আপদের শান্তি, শেষ কথা কে জানে? শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? আর নীলকণ্ঠের ভাবনা ভাবতে গেলে বলতে হবে—গণতন্ত্রের দেশে যে কোনও কাজে নিযুক্ত সমস্ত লোকই মন্ত্রীদের পরোক্ষ। তার ওপরে এখন আছে 'কন্ট্রাক্ট'ও সাব্‌কন্ট্রাক্ট। ফলে সমস্ত কাজেই মন্ত্রীর পক্ষে এখন পরোক্ষেরও পরোক্ষ। হ্যাঁ, মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে কাজ প্রত্যক্ষ করেন—তবে তাতে আড়ম্বর রাজা-রাজড়াদের থেকেও বেশি। আমরা অনেক রাজার খবর জানি, যাঁরা ছদ্মবেশে লুকিয়ে জনপদে আসতেন আপন শাসন প্রত্যক্ষ করার জন্য। কিন্তু মন্ত্রীরা আসেন দামামা বাজিয়ে, তুরী-ভেরী বাজিয়ে। ফলে রেলের মন্ত্রী যখন রেলে চড়েন, তখন—রেলের সময় ঠিক, সিগন্যাল ঠিক এবং অফুরান পুলিশি ব্যবস্থায় ভিড়ও থাকে

কম। হাসপাতালের মন্ত্রী যখন হাসপাতালে আসেন—তখন ছিন্ন-শয়ন টেনে এনে আঙিনা সাজান হাসপাতালের কর্মীরা। মহাভারত বলেছে—সমস্ত কাজে রাজার 'ইনভলভ্‌মেন্টই' সমস্ত উন্নতির কারণ-সংসৃষ্টিশ্চৈত্র কারণম্। আমরা বেশ জানি—সমস্ত কাজে রাজার পক্ষে মাথা ঘামানো সম্ভব হত না। মাথা ঘামাতেন রাজার মন্ত্রীরা, আমলারা। কিন্তু এখন এত মন্ত্রী, এত আমলা, এত কর্মকর—কিন্তু কেউই নিজের কাজ নিয়ে মাথা ঘামান না। দরকার কী—সরকারকা মাল গাড়্‌ডেমে ঢাল।

এহো বাহ্য। নারদ বললেন—যে সব কাজে খরচা কম অথচ লাভ বেশি, সেই সব কাজ আপনি বিশ্বস্ত, নির্লোভ এবং অভিজাত ব্যক্তিদের দিয়ে পরীক্ষা করে নেন তো? তা ছাড়া যে সব কাজ হয়ে গেছে, কিংবা হওয়ার মুখে অথবা যেগুলি আরম্ভই হয়নি—সেগুলি সবই তাঁরা পরীক্ষা করে দিয়েছেন তো?

এই শ্লোকের আমরা যা অর্থ করলাম, সেটাই বিবেচ্য। এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি শ্লোক পুরো বাদ দিয়ে একটি চরণের অর্থ করেছেন আর সিদ্ধান্তবাগীশ এমন বাংলা করেছেন, যা কষ্টকল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র সিংহমশায়ের অনুবাদে একান্ত প্রভাবিত হয়ে প্রায় তাঁর অনুবাদই হুবহু তুলে দিয়ে বলেছেন—"অনারব্ধ কার্যের পরীক্ষার্থ ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়া থাকেন?" বঙ্কিম আরও লিখেছেন—'ইংরেজরা এই কথার সম্যক্‌প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্যের পূর্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য করিবার পূর্বে ইংরেজরা এক একটা কমিটি নিযুক্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে।"

ভাবুন একবার—আজ থেকে আড়াই-তিন হাজার বছর আগে সাধারণ মানুষের সুবিধের জন্য যে কোনও কাজের আরম্ভে বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হত—সেই কাজের ক্ষতি বৃদ্ধি বিবেচনা করার জন্য। নীলকণ্ঠ অবশ্য বলেছেন যে, প্রধানত কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারেই এই বিচক্ষণ অভিজ্ঞগোষ্ঠীকে নিয়োগ করা হত। কিন্তু 'প্রভৃতি' বলতে নিশ্চয়ই ব্যবসা-বাণিজ্য, খনি-আকর—এইসব প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়াও আরও কিছু বোঝাত, যা মহাভারতীয় রাজতন্ত্রকে বিশেষজ্ঞের সম্মুখীন করত। 'কমিটি' অথবা বিশেষজ্ঞ এখনও এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ। তবে এটি এখন গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার ধামা-চাপা দেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ করে দেখবেন, অনেক ক্ষেত্রেই এই 'কমিটি' নিযুক্ত হয় কোনও অন্যায় অবিচার, বা জনরোষের উত্তরকল্প হিসেবে। আর যেখানে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই 'কমিটি' বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হয়, সেখানে এই বিশেষজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে 'কমিটি'-তে ঢুকে পড়েন অল্পাভিজ্ঞ এবং সরকারি দলমতপুষ্ট কতকগুলি শিক্ষিত পদলেহী—যাঁদের রায় সরকার বাহাদুর বিশেষজ্ঞের রায় হিসেবে সাধারণ্যে ব্যবহার করেন, এবং এই কৌশলে স্বমতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক শাসনে 'কমিটি'র আরও উপকারিতা আছে।

যেমন, আমাকে এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন—তুমি যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ একেবারে গণতান্ত্রিক উপায়ে না করতে চাও, তা হলে গণতান্ত্রিক কায়দায় খুব বড় অর্থাৎ উনিশ-কুড়িজনের 'কমিটি' করে দেবে। তারপর দেখবে—সে কাজ কোনওদিন আর হবে না। অথচ 'কমিটি' গড়ার মধ্যে আপাত গণতান্ত্রিকতা এবং সদিচ্ছা অবশ্যই বজায় রইল।

নারদ বললেন—মহারাজ! আপনি হাজারটা মূর্খের বদলে একজন পণ্ডিতকে কিনে নেবার চেষ্টা করেন তো—কচ্চিৎ সহস্রৈ মূর্খাণাম্ একং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্? কেন না, ঝামেলায় পড়লে পণ্ডিতরাই আপনার ভাল করবে, আপনাকে বাঁচাবে।

পণ্ডিতদের 'কিনে নেওয়া' শব্দটা কিন্তু লক্ষণীয়। একালের দিনে পণ্ডিতেরা অনেকেই যেমন বিশিষ্ট দল অথবা সরকারের কাছে আপন স্বার্থে বিক্রীত হন, সেকালের দিনেও তাহলে তাই ছিল! আমরা দেখেছি—কুরুদের রাজসভায় দ্রোণাচার্য, এবং কৃপাচার্যের মতো পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতের নিজস্বতা বজায় রেখেও শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য নিরপেক্ষ বোদ্ধারা পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে এই 'ক্রয়' শব্দটার ওপর অত জোর দেন না। তাঁরা মনে করেন—পণ্ডিত কেনার মানে হল জোগাড় করা; অথবা সব কিছুর ওপর—বিশেষত সহস্র মূর্খ মোসাহেবের ওপর—সেই পণ্ডিতের মতের মূল্য দেওয়া। আসলে 'ক্রয়' কথাটার মধ্যে কিনে নেওয়ার ব্যাপারটা ছাড়াও একটা বিনিময়ের অর্থও আছে। নারদ এই অর্থটাই বোঝাতে চেয়েছেন—যার প্রমাণ ওই লাইনটার মধ্যেই আছে—'সহস্র মূর্খের বদলে একজন পণ্ডিত'। এই বিনিময়ের প্রসঙ্গেই পণ্ডিত কেনার কথাটা আলংকারিকভাবে ব্যবহৃত। এই পণ্ডিতেরা কখনই স্বসুখলোভে রাজা বা নেতার কাছে মান পাওয়ার ভিখারী নন, রাজকীয় সম্মান বা যশ তাঁদের কাছে তুচ্ছ। ওই একই কুরুসভায় আমরা বিদুর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ব্যাস অথবা অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দেখেছি, যাঁরা কোনও কিছুর 'কেয়ার' না করে, স্বার্থবুদ্ধির ওপরে উঠে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়েছেন। এখনও নারদকে দেখছি—তিনি তাঁর সর্বতোভদ্র রাজনৈতিক উপদেশ যুধিষ্ঠিরের সভায় বিতরণ করছেন অযাচিতভাবে, এবং যুধিষ্ঠির অবহিত হয়ে সে-সব কথা শুনেছেন। নারদের ভাষা এবং ভাব এইটাই—আপনি হাজারটা মূর্খের বদলে একজন পণ্ডিতকে কিনে নেবার চেষ্টা করেন তো? কেন না ঝামেলায় পড়লে পণ্ডিতরাই আপনার ভাল করবে, তাঁরাই আপনাকে বাঁচাবে—পণ্ডিতো হি অর্থকৃচ্ছেষু কুর্যান্নিঃ শ্রেয়সং পরম্।

তির্যগ্‌ভাবে বঙ্কিম লিখেছেন—'আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য হইতেছে—পণ্ডিত কোন্ কাজে লাগে? মিল পার্লামেন্টে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না—ওয়েস্ট মিনিষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য বন্ধ্যা ভার্যার

বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী আত্মমতভক্ত পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যাক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।' এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ; দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

ব্যঙ্গ করে লাভ নেই। গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই মূর্খের শাসন—এ রকম একটা কথা তো এক নামী দার্শনিকই বলে রেখেছেন। আরও স্পষ্ট কথায়—গণতন্ত্র হল—Government, in large measure, by the ignorant, the untrained and the unfit. এমনকি গণতন্ত্রকে কেউ কেউ যেখানে 'mobocracy'বলতেও কসুর করেননি, সেখানে পণ্ডিতের মূল্য হবে কেন? তবে হ্যাঁ, বঙ্কিমের অত খেদের কোনও কারণ নেই, 'আজিকালি' এক শ্রেণির পণ্ডিতের উদয় হয়েছে, যাঁরা আর 'অপ্রিয়বাদী' নন 'আত্মমতভক্ত' তো ননই। সরকারের অন্যায় নীতি সমর্থন করার জন্য মাঝে মাঝে এই বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের ডাক পড়ে। তাঁরা মিটিংএ বসে, 'কমিটি'তে ঢুকে সরকারের অথবা সরকারি দলের সুখ কামনায় 'আত্মমত' বিসর্জন দিয়ে সরকারের মত প্রতিষ্ঠিত করেন। সুফল হিসেবে এই বিক্রীত বুদ্ধিজীবীরা সময়মত শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উচ্চাসন লাভ করেন।

পণ্ডিতদের কথা থাক, বুদ্ধিজীবীদের কথাও থাক। সেকালের দিনের রাজাদের প্রজাতোষণের প্রধান একটা উপায় ছিল সন্দেহ। সবাইকেই তাঁরা সন্দেহ করতেন। নিজের রাজ্যে এই সন্দেহের আওতা থেকে বাদ যেতেন শুধু প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত এবং যুবরাজ, যদিও এই তিনজনেই রাজসভায় জায়গা পাওয়ার আগেই উপযুক্তভাবে পরীক্ষিত হতেন। এর আগেই নারদ সে বিষয়ে প্রশ্ন সেরে নিয়েছেন যে, আপনার মন্ত্রী-পুরোহিতেরা কেউ লোভী নয় তো—ন লুব্ধা ভারতর্যভ। এই তিনজন ছাড়া রাজার অধীনে আর যে সব প্রধান দপ্তর ছিল—তার সংখ্যা ছিল মোটামুটি পনেরোটা। জেলমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী, নগরপাল 'মেয়র' থেকে বনমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে বিচারবিষয়ক মন্ত্রী—এঁরা সবাই ঠিক ঠিক মতো কাজ করছেন কিনা কিংবা এইসব মন্ত্রকে বিধিবহির্ভূতভাবে টাকা-পয়সার আদান-প্রদান চলছে কিনা সেটা বোঝার জন্য প্রত্যেকটি মন্ত্রকের পেছনে তিনটি তিনটি করে চর লাগানো থাকত—যে চরেরা একে অন্যকে চেনে না—ত্রিভিস্ত্রিভিঃ অবিজ্ঞাতৈঃ। নারদমুনি এই চর লাগানোর ব্যাপারটা যুধিষ্ঠিরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের খাতায় কলমে মন্ত্রীরা সবাই জনগণের আস্থাভাজন নির্বাচিত মন্ত্রী। কিন্তু জনগণ এটাও জানে যে, একবার কেউ কোনও দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পেলে সেই মন্ত্রীর পুত্র-পরিবার অধস্তন তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিন্ত। শাস্ত্রে আছে—কোনও বংশে সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্মালে নাকি তাঁর অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যায়—মন্ত্রিত্বের ব্যাপারটাও গণতন্ত্রে সেইরকম।

নারদ বললেন—আপনার মন্ত্রকগুলিতে যেগুলি বড় বড় জায়গা—যেমন ধরুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অথবা অর্থমন্ত্রক—এ সব জায়গায় আপনি বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রবীণ লোককে নিয়োগ করেন তো? নারদের মতে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি মন্ত্রক হল মধ্যম-বুদ্ধি মন্ত্রীর কাজ, আর নিচু কাজে থাকবে সমাজের নিচু তলার লোকেরা। গণতন্ত্রে উচ্চ নীচ ভেদ নেই। উত্তম, মধ্যম এবং অধমের মধ্যে ভেদাভেদ রচনা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক; ফলে গণতন্ত্রে উত্তম স্থানে অধম, অধমের জায়গায় মধ্যম অথবা মধ্যমের জায়গায় উত্তমের নিযুক্তি কিছু আশ্চর্য নয়। ফলে যা ঘটে, তা আমরা গণতান্ত্রিকভাবে টের পাচ্ছি।

নারদ বললেন—মহারাজ! আপনি উগ্র দন্ড দ্বারা প্রজাগণকে উদ্বিগ্ন করেন না তো?

সেকালের দিনে—দেশ, কাল, পাত্র এবং তার ক্ষমতা-অক্ষমতা বুঝে বিচার করার রীতি ছিল। দণ্ডও দেওয়া হত সেইভাবে। একালের দিনেও যারা বিচারালয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার হয় বটে। কিন্তু সেকালের দিনে রাজপুরুষ অর্থাৎ পুলিশদের হাতে যে তাৎক্ষণিক দণ্ডের ব্যাপারটি ছিল, সেখানে অতশত বিচার ছিল না, ঠিক যেমনটি এখনও নেই। তবে একালের দিনে গণতান্ত্রিক কায়দায় দণ্ড দেওয়ার আরও একটি উপায় বেরিয়েছে, যা নিষ্পন্ন হয় অলিখিতভাবে—দলীয় ধৃষ্ট পুরুষদের মাধ্যমে। এই ধৃষ্ট-পুরুষেরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতায় এরা পুলিশের পদ-মর্যাদার অনেক ওপরে। এদের জবাব দেওয়ার দায় শুধু দলীয় নেতার কাছে। নারদ যে উগ্র দণ্ডের কথা বলেছেন—সেই উগ্র দণ্ড যেহেতু আজকাল আদালতের মাধ্যমে দেওয়া যায় না, তাই দণ্ডের উগ্রতা সম্পাদনের জন্য এই তৃতীয় শ্রেণির ধৃষ্ট পুরুষদের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়।

এই ধরনের উগ্রদণ্ড জনসাধারণের কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে—তার একটা উপমা দিয়েছেন নারদ। নারদ বলেছেন—উগ্রদণ্ড রাজাকে প্রজারা অবজ্ঞা করে, ঘেন্না করে। কেমন করে? নারদ বলছেন—ঠিক যেমন ঘরের বউ গরম মেজাজের কামুক স্বামীকে ঘেন্না করে সেই রকম—কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ। এই লাইনটার মধ্যে একটা জিনিস বোঝার আছে, যেটা গণতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে পুরো মিলে যায়। কথা হল—সুস্থ, প্রকৃতিস্থ গৃহবধূ চণ্ড বেগ কামুক স্বামীকে যতই ঘেন্না করুক, তবু তাকে যেমন গৃহকর্তা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হন, তেমনই রাজতন্ত্রের প্রজা এবং গণতন্ত্রে জনগণকে যথাক্রমে রাজা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারি দলের এই উগ্র দণ্ড নিয়তির মতো মেনে নিতে হয়। এর মধ্যে একটা অসহায়তার ব্যাপার যেমন আছে, তেমনই আছে ঘেন্নার ব্যাপারটাও। ঘেন্না কেন? টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—ভ্রষ্টত্বাৎ—অর্থাৎ এই ধরনের উগ্রদণ্ড রাজা ন্যায় নীতির বিচারে ভ্রষ্ট বলে। আর অসহায় কেন? নীলকণ্ঠ বলেছেন—কামুকের অতিকামুকতায়, গৃহবধূ যেমন নাচার অথচ তার নিজের রতিসুখের বালাই নেই—অর্থাৎ তার সুখের দিকটা কামুক দেখে না—উগ্রদণ্ড রাজাও প্রজার কাছে সেই রকম—অরতিপ্রদত্বাচ্চ। এই প্রসঙ্গে গণতন্ত্রের কথা টানলে গণধর্ষণের তুলনা আসবে বলে সেই আলোচনায় বিরত থাকলাম।

নারদ বললেন—মহারাজ! হৃষ্ট, উৎসাহী, বীর, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশালী, পরিষ্কার মন,

ভাল বংশে জন্ম এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত একজন মানুষকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছে তো?

দেখুন ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সেনাবাহিনীর প্রধানেরা এখন রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ। তবে 'সেনাপতি' শব্দটাকে যদি অতি সংকুচিতার্থে ব্যবহার করা যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এঁকে পুলিশ-প্রধান ধরে নিতে পারেন। যে সব গুণের কথা নারদমুনি শোনালেন, সে সব গুণের মধ্যে একমাত্র ভাল বংশে জন্মের কথাটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রীতিতে আপত্তিজনক। অপিচ ধৈর্য উৎসাহ, বীরত্ব, বুদ্ধি—এগুলিও গণতন্ত্রের দেশে পুলিশ-প্রধানদের কোনও ঐকান্তিক গুণ নয়। কিন্তু যে দুটি প্রধান, সে দুটি ঠিক ধরেছেন নারদ মুনি। তাঁর মতে—প্রধান গুণ হল—সেনাপতি 'হৃষ্ট' কিনা, আর শেষ গুণ হল তিনি অনুরক্ত কি না। এ ব্যাপারে আমাদের পুলিশ-প্রধানেরা একেবারে মহাভারতীয় পরম্পরায় বিশ্বাসী। নীলকণ্ঠ বলেছেন—হৃষ্ট মানে ধনে মানে তুষ্ট—হৃষ্টো ধনমানাদিনা। কী রাজতন্ত্র, কী গণতন্ত্র—সব তন্ত্রেই যে 'ধন' বলতে ভাল মাইনে, গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি বোঝায়, আর 'মান' বলতে, যে 'প্রোমোশন' বোঝায়—সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর 'অনুরক্ত' শব্দটির মানে রাজতন্ত্রে রাজার বশংবদ আর গণতন্ত্রে মন্ত্রীর বশংবদ। ব্যাপারটা একই। রাজতন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে—দু জায়গাতেই যেটা বৃত্তাকারে চলে, সেটা হল—ধন-মান যত, বশংবদতাও তত। আবার বশংবদতা যত, ধন-মানও তত। রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের ফারাক এইটুকু যে, রাজতন্ত্রে বিপক্ষীয় রাজা রাজ্য দখল করলে সেনাপতি বা পুলিশপ্রধান কারও চাকরি থাকত না। কিন্তু গণতন্ত্র যেহেতু অনেক মনীষীর মতে—everybody's mistress, তাই বিরোধী গোষ্ঠী মন্ত্রিসভা দখল করলে পুলিশ প্রধানেরা স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করেন এবং আপন মত পালটে ফেলেন। অর্থাৎ পুনরায় বশংবদতা এবং বৃত্তাকারে ধন-মান।

নারদ বললেন—আপনি সৈন্যদের বেতন এবং ভাতা সময়মত ঠিক ঠিক দেন তো? যারা বেতন এবং ভাতা নিয়ে কাজ করে, তাদের প্রাপ্য সময়ে না দিলে নিজের দুর্গতি হেতু প্রভুর ওপরেই ক্ষেপে যায় এবং তাতে যে অনর্থ সৃষ্টি হয়, সে অনর্থ বড় সাংঘাতিক।

খোদ মহাভারতের মধ্যে এমন সুচিন্তিত ধারণা যে থাকতে পারে, সে কথা আমরা ভাবতেই পারি না। এখানেও আপনারা লক্ষ করুন—রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের একটুও তফাৎ আছে কিনা? আমি আবারও বলছি—সেনাপতি বলতে যেমন আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুলিশ প্রধান বুঝেছি, সৈন্য বলতেও তেমনই সাধারণ পুলিশদের বুঝব। আর যদি বলেন—যারা বেতন এবং ভাতা নিয়ে কাজ করে—ভক্ত বেতনয়োর্ভৃতাঃ—এই বাক্যে আমরা রাজার ভৃত্যমাত্রকেই বুঝব তাহলে আধুনিক কালে আপনার সরকারি কর্মচারীদেরও এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নারদের মতে—আর সব চুলোয় যাক, শুধু সৈন্য (আধুনিক পুলিশ) এবং সরকারি কর্মচারীদের

বেতন এবং ভাতা—ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ—যদি ঠিক ঠিক দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই রাজার কোনও অনর্থপাতের সম্ভাবনা নেই। আমাদের অকর্মণ্য পুলিশ এবং ততোধিক অকর্মণ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিপুল পরিমাণ পয়সা খরচা করা হয়, তার সমানুপাতিক হারে কাজ আদায় হলে আমাদের আর গণতন্ত্র নিয়ে দুঃখ থাকত না। নারদ বলেছেন—আপনার শাসন অতিক্রম করে কোনও স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুসারে আদেশ করে সৈন্যবর্গকে পরিচালনা করে না তো?

বস্তুত গণতন্ত্রে তাই হওয়া উচিত ছিল। দেশে যেহেতু আইন আছে, অতএব শাসকবর্গ আইনমাফিক নিজের ইচ্ছেতেই চলতে পারেন। কিন্তু এখানেও গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের অনুবর্তী, অর্থাৎ শাসক-পুলিশেরা সরকারি মন্ত্রীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই কিছু করেন না—শাসন অতিক্রম করে নিজের ইচ্ছায় চলা তো দূরের কথা বিশেষত সাধারণ মানুষের চোখে গণতান্ত্রিক পুলিশের স্বভাব অনেকটাই একটি প্রবাদের মতো। সংস্কৃত একটি প্রবাদ আছে—অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ অর্থাৎ ন্যায়-নীতির সূক্ষ্ম বিচারে পুলিশের মনে যেখানে শাক্ত কাপালিকের মতো রাগ হয়, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না বলে 'অন্তঃশাক্ত' সোজা কথায় মনে মনে শাক্ত। আর বাইরের ব্যবহারে পুলিশ হল শৈব—আত্মভোলা দিগম্বর ধরনের। সময়ে অনুপস্থিত, অসময়ে উপস্থিত। যেখানে শাসন করার দরকার সেখানে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, আবার যেখানে শাসনের প্রয়োজনই নেই সেখানে খুব তৎপর ভাব। কোনও কিছুরই কোনও ঠিক নেই—আত্মভোলা শৈব ভাব। কিন্তু দৈবাৎ ভ্রমবশত পুলিশ যদি সরকার অথবা সরকারি দল-বিরোধী কাজ কিছু করে বসে, তাহলে 'সভায়াং বৈষ্ণবো মত' অর্থাৎ তখন একেবারে তৃণাদপি সুনীচ বিনয়ী বৈষ্ণবের ব্যবহার প্রকাশ করে। এর পরে নারদ বলেছেন—যে কোনও রাজপুরুষ অসাধারণ পুরুষকার দেখিয়ে যদি তোমার কাজ করে দেয় তাহলে তাকে বেশি সম্মান বেশি ভাতা এবং বেশি বেতন দাও তো—লভতে মানমধিকং ভূয়ো বা ভক্তবেতনম্। ভারতবর্ষীয় গণতন্ত্রে অবশ্য একমাত্র বিরোধী দলের ওপর এই পুরুষকার দেখালে, তবেই তাকে বেশি সম্মান বেশি ভাতা এবং বেশি বেতন দেওয়া হয়। এইখানে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের একটু প্রভেদ হয়ে গেল।

নারদ বললেন—মহারাজ। আপনি জ্ঞানবান এবং বিদ্যাবিনীত ব্যক্তিদের গুণানুসারে দান-মান দিয়ে পুরস্কৃত করেন তো—যথার্হং গুণতশ্চৈব দানেনাভ্যুপপদ্যসে। নিরপেক্ষ এবং সহৃদয় ব্যক্তিরা এখন ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিভিন্ন সংস্কৃতির কেন্দ্রে নিযুক্ত তথাকথিত মহোদয় পুরুষের অভিজ্ঞানপত্রগুলি দেখলেই উল্লিখিত নারদোক্তির মর্ম বুঝতে পারবেন। বিশেষত 'গুণানুসারে' কথাটি এখন এমন যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, 'গুণ' বলতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই নির্ভেজাল স্নেহ-পদার্থ বোঝেন।

দেখুন, সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশের ভরণপোষণ সম্বন্ধে নারদ যেমন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, তেমনই তাদের পুত্র-পরিবারবর্গকে নিয়েও নারদের যথেষ্ট

উদ্বেগ ছিল। তিনি বলেছেন—মহারাজ! যারা আপনার উপকারের জন্য কালকবলে নিপতিত এবং যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত, তাদের পুত্র-পরিবারকে আপনি ভরণ-পোষণ করেন তো? লক্ষণীয়, আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার রাজতন্ত্রের এই নির্দেশ অনুসারেই চলে, এবং এর উপযোগ করেন দুভাবে। প্রথমত সরকারি কর্মচারী, সরকার অধিকৃত ব্যাঙ্ক কর্মচারী, রেলের কর্মচারী এবং এরকম অনেকেই যদি সরকারি কাজ করতে করতে কালকবলে নিপতিত হন, তবে তাঁর পুত্র-পরিবারের দুর্ভাবনা আজকাল অনেক কম। ফলত বিধবা এবং নিষ্পিতৃক হওয়ার জ্বালার মধ্যেও আজকাল চাকরি পাওয়ার একটা সান্ত্বনা থাকে। এই সমবেদনাজনিত কারণে চাকরি পাওয়া অযোগ্য মানুষের হার আগামী দশ বছরে পঞ্চাশ শতাংশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অনেকেই আপাতত অত্যন্ত খুশি। শুধু অখুশি তাঁরাই, যাঁরা সরকারি চাকরি করেও অকালে কালকবলিত হন না এবং অখুশি আমার মতো কিছু হতভাগ্য লোক, যারা সরকারি চাকরি করে না। আমার জীবৎকালেই আমার এই করুণ অবস্থা দেখে হঠাৎ চাকুরিরতা অনেক বিধবাই আমার স্ত্রী এবং পুত্রের জন্য বড়ই মায়া বোধ করেন।

চাকরি ছাড়াও সরকারের জন্য দুর্দশাগ্রস্ত পুরুষের পুত্র-পরিবার আরেকভাবে ভরণ-পোষণ পেতে পারেন—যদি তিনি বাম শাসক দলের স্থায়ী কর্মী হন। চাকরি না করেও কীভাবে তাঁদের ভরণ-পোষণ চলে তা জলবৎ পরিষ্কার—তবে লক্ষণীয়, রাজতন্ত্রের উপদেশ গণতন্ত্রেও খাটে।

আর কত বলব। নারদের অসংখ্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তার পরিচয় আমরা যথাস্থানে দেব। তবে একটা উপদেশের কথা না বলে আপাতত শেষ করতে পারছি না, সেটা হল—নারদ বললেন—হে নরশ্রেষ্ঠ, যে বদমাশ চুরি করেছে, কিংবা যে বামাল সমেত ধরা পড়েছে—তাকে তোমার লোকেরা ঘুষের লোভে ছেড়ে দেয় না তো—ক্বচিন্ন মুচ্যতে স্তেনো দ্রব্যলোভান্ নরর্ষভ?

এরপরেও কি আপনাদের কাছে প্রমাণ দিতে হবে রাজতন্ত্রে আর গণতন্ত্রে কত মিল? আমি এই মুহূর্তে সেকালের অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য গভীর বিষয় নিয়ে নারদের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করছি না। কিন্তু সেগুলি এতই সুচিন্তিত এবং এতই কালাতিক্রমী যে, সেগুলিকে রাজধর্ম বলতে কোনও দোষ নেই। বস্তুত রাজধর্ম এবং রাজনীতিতে তফাৎ আছে। রাজ্যশাসনের উপযোগী যে আদর্শ গুণগুলি রাজার মধ্যে থাকলে রাজা প্রজারঞ্জন করতে পারেন, সে অভীষ্ট গুণগুলির যথাযথ উপদেশই রাজধর্ম। এই রাজধর্ম সংক্রান্ত বিধিবিধানকেই আমরা এক অর্থে সংবিধান বলতে চাই, কেন না, সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের যথাযথ রূপায়নেই আমরা আদর্শ গণতন্ত্রের সার্থকতা খুঁজে পাই। রাজধর্ম অনুসারে ঠিক ঠিক চলার ফলে রাজা যেমন আদর্শ একটি রাষ্ট্রের সন্ধান পেতে পারতেন, তেমনই সংবিধান এবং গণতন্ত্রের নানা আইন ঠিক ঠিক পালন করে একটি সুগঠিত মন্ত্রিসভাও আদর্শ গণতন্ত্রের হদিশ পেতে পারে। বাস্তবে কিন্তু কোনওটাই সম্ভব নয়—ফলে দুয়ের নিট কুফলগুলি একইরকম।

তিন

একথা ঠিক যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রে রাজ্যশাসন বা প্রজাপালন—সবটাই ছিল রাজকেন্দ্রিক। তবে স্বেচ্ছানুযায়ী যে রাজা রাজ্য শাসন করতেন, তাঁর প্রথম এবং শেষ প্রয়োজন ছিল—আনুগত্য—অমাত্য, মন্ত্রী, সেনাপতি, পুলিশ: এবং এই ধরনের সমস্ত রাজযন্ত্রের একান্ত আনুগত্য। মনু থেকে মহাভারত, কৌটিল্য থেকে কামন্দক—সবাই মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের একান্ত আনুগত্য রাজার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কোনও কারণে পারস্পরিক ভেদকে রাজার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক বলে বর্ণনা করেছেন। এই যে আগে আমরা নারদের নানা উপদেশ শুনলাম, তার মধ্যে মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাগার, রাজার বাসস্থান, অস্ত্র, আয় এবং ব্যয়—এই সব জায়গায় অনুরক্ত এবং রাজভক্ত মানুষেরা নিযুক্ত আছে কিনা—এ কথা বারবার নারদকে উদ্বিগ্ন করেছে। এই উদ্বেগ রাজধর্ম এবং অর্থশাস্ত্র প্রণেতাদের প্রত্যেকেরই আছে। অবশ্য সবার ওপরে আছে প্রজার আনুগত্য অর্থাৎ প্রজারা সম্পূর্ণরূপে তাদের রাজাকে বিশ্বাস করছে কিনা—অনভিশঙ্ক্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা—সেটার বিচার। শত্রুদের পাল্লায় পড়ে পৌর এবং জনপদবাসীরা এককাট্টা হয়ে রাজার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা—ক্বচিৎ পৌরা ন সহিতা যে চ তে রাষ্ট্রবাসিনঃ—সে বিষয়ে রাজাকে সদা-সজাগ থাকতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে—সমস্ত সামন্ত রাজা, অন্তত বেশির ভাগ সামন্ত রাজা প্রধান রাজার প্রতি অনুরক্ত কিনা—দরকারে তারা প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজি কিনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কৌরব পক্ষের দুর্যোধন এই কথাটা বলেছিলেন—মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। তবে এত আনুগত্যের চেষ্টা করেও যদি রাজা সফল না হন, তবে কিন্তু নির্দেশ হল—রাজা নিজের প্রিয় কে এবং অপ্রিয়ই বা কে, সেটা পরীক্ষা করে একজনকে মাথায় তুলবেন এবং অন্যতরকে যমদণ্ড দেবেন।

তবে এও তো রাজধর্মের কথা। বাস্তবিক রাজনীতিতে কিন্তু শুধুমাত্র দণ্ডের দ্বারাই কাজ হাসিল করা হত না। সেখানে কাজ করত কৌশল। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

পাণ্ডবরা যখন দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রপরীক্ষায় দারুণ ফল করলেন, বিশেষত অর্জুন যখন তাঁর অস্ত্র কৌশলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন, অপি চ দ্রুপদ রাজাকেও তিনি জ্যান্ত বেঁধে আনলেন গুরুদক্ষিণা দিতে, তখন পাণ্ডবদের ওপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন একেবারে বিষিয়ে গেল। সেখানে রাজনীতির উপদেষ্টা কণিক ধৃতরাষ্টকে উপদেশ দিলেন পাণ্ডবদের একেবারে সাবাড় করে দিতে। ধৃতরাষ্ট্র দোনামোনা করছেন, এমন সময় দুর্যোধন এসে বুদ্ধি দিলেন—মহারাজ! আপনি কায়দা করে পাণ্ডুর ছেলেদের একেবারে বারণাবতে পাঠিয়ে দিন। ভাবটা এই—তারপর আমি বুঝে নেব। ধৃতরাষ্ট্র দ্বিধাচিত্ত হয়ে বললেন—সেটা কী করে হয়। পাণ্ডুর ছেলে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছেলে। নিজে তিনি যথেষ্ট গুণী এবং পাঁচজনে তাঁর সুখ্যাতি করে। সবচেয়ে বড় কথা এই বিখ্যাত বংশের সম্মানী পুরুষেরা তাঁর ওপর

যথেষ্ট ভরসা রাখে—পৌরবাণাং সুসম্মতঃ। তাঁকে জোর করে এখান থেকে তাড়াই কী করে? ধৃতরাষ্ট্র আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন—যুধিষ্ঠির পিতৃ-পিতামহক্রমে যে সমস্ত মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য সহায় লাভ করেছে—তারা সবাই পূর্বতন রাজা পাণ্ডুর দ্বারা এতটাই উপকৃত যে, তারা ছেলেপিলে সহ যুধিষ্ঠিরের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছে। এর ওপরে আছে নগরের সাধারণ মানুষেরা। পাণ্ডু তাদের এতটাই তোশানি দিয়ে রেখেছিলেন যে, এখন যদি পাণ্ডবদের আমি বারণাবতে নির্বাসন দিই, তাহলে তারা সবাই কৃতজ্ঞ মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে মিলে আমাদেরই সবান্ধবে হত্যা করে কিনা—সেটা ভাববার কথা—

তে পুরা সৎকৃতাস্তাত পাণ্ডুনা নাগরা জনাঃ।
কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্।।

পৌর-জনপদবাসী জনগণের আনুগত্য এবং মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুগত্য—এই সবই একজন রাজার পক্ষে কত জরুরি তা ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বোঝা গেল। এখন এই আনুগত্য অন্য দিকে কিভাবে ঘোরাতে হয়, সেটা শুনুন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধনের মুখে—এবং সেটা রাজধর্ম নয়, রাজনীতি। দুর্যোধন বললেন—ছোঃ! মন্ত্রী, অমাত্য, আর জনগণ! আপনি যে কথা বলেছেন—অর্থাৎ ধনে-মানে যেভাবে তাদের তুষ্ট হতে দেখেছেন—দৃষ্ট্বা প্রকৃতয়ঃ সর্বা অর্থমানেন পূজিতাঃ—এই কথা তো? কিন্তু সে কায়দা কি আমি জানি না? ওইসব মন্ত্রী, অমাত্য আর সাধারণ লোকে দুদিনে আমার পক্ষে চলে আসবে—ধ্রুবম্ অস্মৎসহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি প্রধানতঃ। কারণ, রাজকোষ এবং অমাত্যরা সব এখন আমারই হাতে—অর্থবর্গঃ সহামাত্যো মৎসংস্থো'দ্য মহীপতে।

দুর্যোধন যেটা পরিষ্কার করে বললেন না, সেটা হল—তাঁর হাতে রাজকোষ আছে বলেই অমাত্যরা তাঁর অনুগত হয়ে পড়েছে। দুর্যোধনের কাছে ভরসা পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন, এবং পরে দেখা যাচ্ছে এই বারণাবতে যাওয়ার কথা তাঁকে নিজে থেকে বলতেও হয়নি। দুর্যোধনের টাকা খেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অর্থাৎ পূর্বতন পাণ্ডুর মন্ত্রীরাই পাণ্ডবদের সামনে বারবার বলতে লাগল—আঃ! বারণাবতের মতো অমন সুন্দর জায়গা হয় না, তার ওপরে আবার সেখানে পশুপতির মেলা বসছে—যা জমবে না....। এত কথা শুনে পাণ্ডবরা নিজেরাই বারণাবতে যাওয়ার টোপ গিলেছেন, জতুগৃহের টোপ তো বটেই! মন্ত্রী-অমাত্যদের বশে এনে দুর্যোধন আরও বড় যে কাজটি করেছিলেন, সেটি হল—পৌর-জনপদবাসীদের টাকা-পয়সা দিয়ে ভোলানো। দুর্যোধনেরা সব ভাই মিলে জনগণের মধ্যে এমন টাকা ছড়িয়েছিলেন এবং কিছু কিছু অযোগ্য লোককে এমন উঁচু পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন, যে দুদিনে সমস্ত জনগণ, মন্ত্রী-অমাত্য সহ দুর্যোধনের অনুকূলে চলে এল—সর্বাঃপ্রকৃতয়ঃ শনৈঃ। অর্থমানপ্রদানাভ্যাং সঞ্জহার সহানুজঃ।

অনুগত জনের এই অসাধারণ শৃঙ্খলা, এই যে ঐকতান, এই যে আনুগত্য—সেটা

টাকা পয়সা খাওয়ানোর ফলেই আসুক অথবা সুশাসনের জোরে—এই সুশৃঙ্খল আনুগত্যই রাজার রাজত্ব এমনকি স্বেচ্ছাচারও টিকিয়ে রাখতে পারে। একইরকম ভাবে ওই শৃঙ্খলা এবং আনুগত্য, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেটা বলা যায় দলীয় আনুগত্য এবং বিশিষ্ট দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা—সেটাও শাসক দলের রাজত্ব এবং স্বেচ্ছাচার সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখতে পারে। এরই মধ্যে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেন বড় বড় কিছু মানুষ, জনসমাজে যাঁদের অনুগত কিছু মানুষজন চিরকালই থাকে। ধৃতরাষ্ট্রের মাথাতেও এই চিন্তা ছিল। দুর্যোধনকে তিনি বলেও ছিলেন—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু সমস্যা হল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, এবং বিদুর তো পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানো মোটেই পছন্দ করবেন না। দুর্যোধন বলেছিলেন—কোনও সমস্যাই নেই। পাণ্ডবেরা এবং কৌরবেরা ভীষ্মের কাছে দু' পক্ষই সমান—ফলে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে পাণ্ডবদেরও বেশি মাথায় তুলবেন না, আবার আমাদের বিপক্ষে গিয়ে আমাদেরও কোনও ক্ষতি করবেন না। আর দ্রোণাচার্য। তাঁর কান বাঁধা আছে আমার কাছে, কারণ দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা আমার হাতের মুঠোয়—দ্রোণপুত্রো ময়ি স্থিতঃ। ফলে তাঁর ছেলে যেখানে, দ্রোণও সেখানে। কৃপাচার্যও তাঁর জামাইবাবু দ্রোণাচার্য এবং ভাগ্নে অশ্বত্থামাকে ছেড়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যাবেন না। তাহলে বাকি রইল একমাত্র ক্ষত্তা বিদুর। সে যদিও আমাদেরই খায়-পরে, তবু তলায় তলায় শত্রুর সঙ্গে হাত মেলায়—প্রচ্ছন্নং সংযতঃ পরৈঃ। কিন্তু সে একা পাণ্ডব পক্ষে থেকে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

আপনারা লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই—যাঁদের টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করা যাচ্ছে না, সেই বড় মানুষদের কী করে কায়দা করে অন্যের মাধ্যমে হাতে রাখা যায়, সে চেষ্টা রাজাকে করতেই হয়। বিদুরকে ছোট করে দেখার মধ্যে দুর্যোধনের 'স্ট্যাটেজি'র ভুল ছিল, যেমন গণতন্ত্রেও অন্য দলীয় বা স্বদলীয় কোনও নেতাকে ছোট করে দেখার মধ্যে কখনও কখনও 'স্ট্র্যাটেজি'র ভুল থেকে যায়। বুদ্ধিকামী রাজাকে যেমন দেখছি যে, তিনি যে কোনও প্রকারে মন্ত্রী, অমাত্য জনগণ তথা বড় বড় মানুষকেও কৌশলে তথা টাকা পয়সা খাইয়ে স্ববশে নিয়ে আসতে চান, তেমনই গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের নেতারাও একইভাবে দলীয় পরিপোষকদের পাইয়ে দেবার রাজনীতির ফাঁসে ফেলে, তথা বড় বড় মানুষদের অর্থমানপ্রদানাভ্যাং—নিজের অনুকূলে টেনে এনে একটা সুশৃঙ্খল আনুগত্যের পরিমণ্ডল তৈরি করেন, যে আনুগত্য ছাড়া রাজার আসনও টলমলো, বড় বড় মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্বের আসনও টলমলো। রাজতন্ত্র এবং গণ-সমাজতন্ত্রে অন্যদের সুশৃঙ্খল আনুগত্যই রাজা এবং নেতাদের স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ দেয়।

আমার কথাগুলি আপাতত একটু বাণীসুলভ লাগতে পারে। কিন্তু আমার কথা আপনারা শুনবেন কেন? আপনারা শুনুন তাঁদের কথা যাঁরা নানা দেশের দলীয় প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন, শুনুন তাঁদের কথা—যাঁরা তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ে বিচার করেছেন।

এইরকমই একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেন ফরাসি দেশের মরিস দুভারজার (Maurice Dueverger)। দুভারজার বলেন—যে কোনও দলের সংগঠনই নির্ভর করে কতগুলি অলিখিত বিধি বিধান এবং অভ্যাসের ওপর। দলের নিজস্ব যে সংবিধান বা নিয়মাবলী থাকে, তার মধ্যে—দল যেভাবে বাস্তবে চলে, তার আংশিক রাজনৈতিক আভাস থাকে মাত্র। সেগুলি—never give more than a partial idea of what happens.

বস্তুর কমিউনিজম অথবা সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষ যে নিজেদের অনেকটা মুক্ত এবং স্বাধীন মনে করে, তা শুধু তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সংঘশক্তির জোরে। দলীয় নেতারাও এই শৃঙ্খলার ওপর জোর দেন, এবং তাঁদের দলীয় সদস্যদের আনুগত্য চান পুরোপুরি। এর পেছনে কারণ আছে দুটি। দুভারজারের মতে—first of all the taste of power. যার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সে আবার সেটা বাড়াতে চায়। কর্তৃত্ব করার এই স্বাভাবিক ঝোঁক নাকি আবার শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বেশি—A leader who has risen from the people is generally more authoritarian than one of aristrocratic or middle class origin. যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সৌভাগ্যে পূর্বাহ্ণেই অভিজাত, সেই নেতা দলের ওপর কর্তৃত্ব ফলান অনেকটাই নিজের অধিকারে, যেন সেটাই স্বাভাবিক। ছোট জায়গা থেকে উঠে-আসা গণনেতা কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব খাটান শুধুমাত্র অন্যের ওপরে তাঁর কর্তৃত্বের জোরেই। তাঁর ক্ষেত্রে অনুগত জনের একান্ত শৃঙ্খলা তাই বেশি জরুরি।

দুভারজার আরও লিখেছেন—সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে যে সব নেতা আভিজাত্যের চিহ্নে পূর্বাহ্ণেই চিহ্নিত, তাঁরা শৃঙ্খলা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামান না, এবং তাঁরা যে কোনও সমালোচনা, এমন কি বিরুদ্ধতাও নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ গণনেতা কিন্তু শৃঙ্খলাপন্ন জনগণের আনুগত্যকেই বেশি মূল্য দেন, কারণ একমাত্র সেইটাই তাঁদের অন্যের থেকে বড় ভাবতে সাহায্য করে। একজন অভিজাত নেতার কর্তৃত্ব তৈরি হয় তাঁর একান্ত স্বাভাবিক মর্যাদা বোধ থেকেই—তাঁর যুক্তিবাদিতা অনেকটা সেই পর্যায়ের স্বাভাবিক—যে স্বাভাবিকতায় একজন দোকানদার খরিদ্দারকে বোঝায়, একজন আইনজীবী আদালতকে প্রভাবিত করে অথবা একজন যথার্থ শিক্ষক ছাত্রকে। কিন্তু তৃণভূমি থেকে উঠে আসা শ্রমিক নেতার এই স্বাভাবিকতা থাকে না, ফলত তাঁর কর্তৃত্ব তৈরি হয়—from a kind of inferiority, or rather equality, complex. এমন এক জগতে তিনি বাস করেন যেখানকার ব্যাপার-স্যাপার—resistant to rhetoric and only yield to force. সাধারণের আনুগত্য এই নেতাদের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ, যে সেটা হারালে তাদের কিছুই থাকবে না, কর্তৃত্ব তো নয়ই।

রাজাদের দণ্ডনীতির কথাটা যদি সীমায়িত অর্থে ধরেন তাহলে দেখবেন প্রাচীন পণ্ডিতেরাও মনে করেন যে জনগণের আনুগত্যই রাজার কাছে সব। কিন্তু প্রজাদের এই অনুগতি মানী রাজার পক্ষে জনে জনে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না। এই আনুগত্য

ঠিক রাখার জন্য তাঁকে দুটো জিনিস করতে হত। এক হল, যেটা মনু বলেছেন—নিজের কাজের জন্য রাজা যাকে বা যাদের প্রয়োজন বলে মনে করবেন, তাদের যথাসম্ভব পালন করবেন, আর যারা অনিষ্ট আচরণ করবে তাদের প্রতি রাজা অনিষ্ট ব্যবহার করবেন—তস্মাদ্ ধর্মং যমিষ্টেষু....অনিষ্টং চাপ্যনিষ্টেষু। দলগুলিও তো এইভাবেই চলে আজকাল—যে তোমার মতে মত দিচ্ছে তাকে বাড়াও আর যে মত দিচ্ছে না তাকে হটাও। আনুগত্য চাই, অনুগতদের সংখ্যা—এবং তাদের আনুগত্যের মাত্রা বেশি চাই। আর এই আনুগত্যের ভিড় বাড়ানোর জন্য রাজাকে আরও একটি কাজ করতে হত—সেটা হল—তাঁর মন্ত্রী এবং আমলাদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অনুগত রাখা। মন্ত্রী-অমাত্যদের যত গুণই থাক, তাঁদের সভায় রাখা বা না রাখার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি কিন্তু রাজার প্রতি অন্ধ অনুরক্তি। এই মন্ত্রীরা সেকালে যে কাজ করতেন, এখনকার বড় বড় নেতারা সেই কাজই করেন। নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন—এখন সেই নেতা বা মন্ত্রীরই বেশি কদর, যার পেছনে যত বেশি জন-সমর্থন আছে। মহাভারতও একই কথা বলছে। বলেছে—মন্ত্রীর সমস্ত গুণের শেষ গুণ হল—যার ওপরে পৌর এবং জনপদবাসীদের বিশ্বাস আছে—শুধু বিশ্বাস নয়, একেবারে সঠিক, সযৌক্তিক বিশ্বাস—পৌরজানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্মতো গতাঃ। জিজ্ঞাসা হতে পারে—পুরবাসী অথবা গ্রামবাসীরা কেন এই মন্ত্রীদের ওপর বিশ্বাস রাখবে? রাখবে—কারণ, সেকালের মন্ত্রী মাত্রেই জনগণের চরিত্র সঠিকভাবে জানতে হত—মহাভারত বলেছে—মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুঃ। ঠিক যেমন আজকের দলনেতারা জনগণের চরিত্র, তাদের দুর্বলতা এবং তাদের মানসিক গঠন বুঝে ঠিক সময়ে তাদের অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দলে ভেড়াতে পারেন—এ গুণ সেকালের রাজা এবং মন্ত্রী—সবারই ছিল।

তাহলে একদিকে জনগণের মন্ত্রী-আমলার মাধ্যমে রাজার প্রতি আনুগত্য আর অন্যদিকে মন্ত্রীদের রাজার প্রতি আনুগত্য—এই দ্বৈত আনুগত্যই রাজাকে বেশিরভাগ সময়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এবং তাঁর স্বৈরাচারেও সাহায্য করেছে। আর যদি মন্ত্রী-আমলা বা জনগণের তরফ থেকে একান্ত আনুগত্যের অভাব থাকত, তাহলে রাজার নির্ভর হয়ে উঠত দণ্ড—যা কর্তা-ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ের সবচেয়ে বড় উপায়—মহাভারত বলেছে—উক্তো যশ্চাপি দন্ডো'সৌ ভর্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ। এখনকার দিনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দণ্ডের ভার থাকে পুলিশ এবং জনপদবাসী মাস্তানদের ওপর। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা—শৃঙ্খলাবদ্ধ দলগুলি আছে সেই দণ্ডের পেছনে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেখেন—

A party which has an organized mass of members, capable of following blindly the order or their leaders (আপনারা এই মুহূর্তে কাদের কথা স্মরণ করবেন—আপনারাই জানেন!) in the most varied fields, of launching strike because they say so, of stopping it because that is their order; of

organizing on orders from the centre campaigns and demonstrations in support of their claims, and of ending them just as automatically when the orders are countermanded; of starting, if necessary, sabotage, disorders and riots because its leaders wish it, and of returning to legality at the appointed time (এই সময়ে নেতারা বলেন—আপনারা শান্ত হোন, আইন নিজের হাতে নেবেন না—যেন আইনের প্রতি কত দরদ!)—this party constituted through its power a formidable weapon : even in opposition, even in minority it can weigh heavily enough on the life of a regime to destroy it or transfrom it radically.

খাতায়-কলমে এবং কথায় গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বড় বড় নেতারাও যেমন জনগণের সেবক, খাতায়-কলমে এবং কথায় রাজারাও ছিলেন তাই। শুক্রাচার্যের নামে যে বই চলে, সেই নীতিসারে একটা দারুণ যুক্তিপূর্ণ কথা আছে। তাঁর মতে সাধারণ লোকেরা সবাই যেহেতু রাজাকে কর দেয়, তাই রাজাকে লোকের সেবা করতে হয় ক্রীতদাসের মতো—দাসবৎ স্যাত্তু রক্ষণে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যাকার অপরার্ক। তিনি বলেছেন—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে প্রতিদানে কিছু আশা না করে এমনি এমনিই কাউকে টাকা দেয়। লোকেরা যে রাজাকে কর দেয়—তাও তেমনই করের টাকার পরিবর্তে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য। এছাড়া কর দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই—ন চ করদানস্য স্বগুপ্তেরন্যৎ প্রয়োজনমস্তি। অপরার্কের মতে—সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ তাই কবভুক্ রাজার একান্ত কর্তব্য। করের বদলে রাজাকে তাই প্রজার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে—স্বভাগভৃত্যা দাস্যত্বে প্রজানাঞ্চ নৃপঃ কৃতঃ। এই প্রসঙ্গে জানাই—অপরার্ক স্বয়ং কোঙ্কন প্রদেশের রাজা ছিলেন, এবং নানা বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।

খাতায়-কলমে রাজাও তাই জানতেন যে, তিনি জনগণের সেবক, ঠিক যেমন আমাদের গণতান্ত্রিক নেতারাও সব সময় বলেন—জনগণ আমাদের এখানে এনেছেন, অতএব জনগণকে আমরা সেবা করে যাব—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বক্তৃতা এবং সাধাসিধে জনগণের মনোহরণ বাণী সমস্ত গণতান্ত্রিক নেতাদের এতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, যখন তাঁরা কোনও অন্যায় কাজও করে বসেন, তখনও বলেন—দরকার পড়লে আমরা জনগণের কাছে যাব। এই জনগণের কাছে যাওয়া মানে কিন্তু মাঠে ময়দানে মিটিং করে নিজের দলের লোকের কাছে সাফাই গেয়ে বক্তৃতা দেওয়া। ব্যস, জনগণের সঙ্গে দরবার হয়ে গেল। আমি একটা গল্প বলি। সংরক্ষণশীল লোকের কাছে গল্পটা রুচিকর হবে না, আর নারীমুক্তিকামীদের কাছে গল্পটা কষ্টকর হবে। তবু জনগণের দোহাই দিয়ে নিজেকে চরিতার্থ করার উদাহরণ হিসেবে গল্পটি কাজে লাগতে পারে।

বারবার করে গুরুদক্ষিণা মেটানোর প্রস্তাব দেওয়ায় বিশ্বামিত্র ঋষি একটু রেগেই কপর্দকহীন শিষ্য গালবকে বলেছিলেন—খাসা জাতের আটশো সাদা ঘোড়া নিয়ে এস

আমার জন্য। হতবাক গালব শেষ পর্যন্ত গরুড়ের সহায়তায় মহারাজ যযাতির কাছে ঘোড়া চাইতে এলেন। যযাতি বললেন—অসম্ভব। অত ঘোড়া আমার নেই। তবে যেভাবে তোমার ঘোড়া আদায় হবে, তার একটা উপায় করে দিচ্ছি আমি। আমার মাধবী নামে একটি মেয়ে আছে। দারুণ দেখতে। যাকে দেখাবে, তারই পছন্দ হবে। এই মেয়ের জন্য বড় বড় রাজারা নিজের রাজ্য পর্যন্ত দিতে চাইবে, ঘোড়া তো কোন ছার। তুমি মাধবীকে নিয়ে যাও, আমারও নাতির মুখ দেখা হবে, তোমারও কাজ হবে।

মাধবীর গুণ ছিল—উপভুক্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি দৈববরে পুনরায় কুমারীত্ব লাভ করতেন। গালব প্রথমেই মাধবীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা মহারাজ হর্যশ্বের কাছে। বললেন—আমাকে কিছু জিনিস দিতে হবে, তার বদলে ছেলের বাবা হবার জন্য এই মেয়েটিকে পাবে তুমি, বৎসরান্ত উপভোগের জন্য তো বটেই। আমার ধারণা ছিল—যাঁরা পুত্রার্থে ভার্যা-গ্রহণের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা বোধহয় স্ত্রীলোকের রূপ নিয়ে চিন্তা করতেন না। কিন্তু এখানে দেখছি—মহারাজ হর্যশ্ব পুত্রজন্মের মতো মঙ্গলের জন্য অপরিচিতা মাধবীর শরীরের উচ্চাবচ স্থানগুলি দেখে নিয়ে বুঝলেন—মাধবী সুলক্ষণা বটে এবং সে উপযুক্ত পুত্রের জন্ম দিতে পারবে।

যাইহোক রাজা মাধবীকে স্বীকার করতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু গালবের ঘোড়া জুটল মোটে দুশোটা। উপায় কী? পুনরায় কুমারীভূতা মাধবীকে নিয়ে গালব পৌঁছালেন কাশীর রাজা দিবোদাসের কাছে। অবশ্য মাধবীরও সম্মতি ছিল ওই গুরুদক্ষিণা কার্যকরী করার ব্যাপারে। আবার সেই প্রস্তাব, দিবোদাসের স্বীকার এবং দুশো ঘোড়া জোগাড় করে বৎসরান্তে গালবের প্রস্থান। এবার গালব উপস্থিত হলেন ভোজরাজ উশীনরের কাছে। মুনি বললেন—মহারাজ! আপনি তো অপুত্রক তা এই কন্যাকে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। আপনি সাদরে এই কন্যার গর্ভে দুটি পুত্রের জন্ম দিন এবং সেই সুখের পরিবর্তে আমাকে দিন চারশো ঘোড়া। উশীনর সব শুনে বললেন—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ওই খাসা জাতের ঘোড়া আমিও দুশোর বেশি দিতে পারব না। অথচ আপনার প্রস্তাবে আমার মনটা এতক্ষণে বেশ উৎসুক হয়ে উঠেছে—প্রবণং হি মনো মম। তা বেশ তো, আমার দুই ছেলে লাগবে না; একটি ছেলের জন্ম দিলেই হবে। আর তার বদলে দুশো ঘোড়ার মূল্য চুকিয়ে দেব আমি। আমার যা সঞ্চিত ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা আছে, তা তো আর আমার নিজের ভোগের জন্য নয়, সবই আমার পৌর-জনপদবাসী জনগণের জন্য—পৌরজনপদার্থন্তু মমার্থো নাত্মভোগতঃ।

ঠিক এই লাইনটার জন্যই আমি এতক্ষণ এই আপাতত-অপ্রাসঙ্গিক গল্প ফেঁদে বসেছি। গল্পটা না বললে আপনারা বুঝতে পারতেন না—ঠিক কোন অবস্থায় রাজা অথবা গণতান্ত্রিক নেতারা বলেন—জনগণের টাকা তো আর আমার নিজের ভোগের জন্য নয়, সবই জনগণের সেবায় লাগবে। আমার জিজ্ঞাসা—এই যে দুশো ঘোড়া দিয়ে মাধবীকে ঘরে তুললেন রাজা—এটা কোন পুরবাসী বা জনপদবাসীর উপকারের

জন্য? যদি বলেন—গালব ঋষির জন্য, তাহলে জিজ্ঞাসা—গালব কি তাঁর প্রজা, না তাঁর পুরবাসী? রাজা বলেছিলেন—যে রাজা পৌর-জনপদবাসীর উপকারের জন্য সঞ্চিত ধন নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করেন, তিনি ধর্ম এবং যশ থেকে বঞ্চিত হন। তো, রাজা যে মাধবীর পরিবর্তে গালবকে দুশো খাসা ঘোড়া দিলেন—সেই ঘোড়াগুলো কাদের টাকায় কেনা? যদি বলেন—অপুত্রক রাজার বংশরক্ষার জন্য রাজা এই দানধর্ম করেছেন, তাহলে জিজ্ঞাসা হয়—রাজার বংশরক্ষাও কি পৌরজনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, না কি সেটাও পৌর-জনপদবাসীদের অর্থে হওয়া উচিত?

আমরা বেশ জানি—এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। কিন্তু মাধবীকে নিয়ে উশীনর রাজাকে আমরা পর্বত-কন্দরে, নদীর নির্ঝরে ঘুরতে দেখেছি। ওপরের সুচিন্তিত বাণীটি অনেক পণ্ডিতেরা গুরুদক্ষিণার খাতিরে, পুত্রজন্মের মতো ধর্মের খাতিরে সুব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অনেকে এটাকে 'পলিসি-ম্যাটার' হিসেবে রাজারা যে পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের জন্যই রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করার অর্থ খুঁজে পেতেন, তাও বলেছেন। কিন্তু আমরা বলি—এটা হল সেই চিরাচরিত বাণী—যা রাজা থেকে আরম্ভ করে গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী নেতা সবাই ব্যবহার করেন। মন্ত্রীরা যে বাড়ি, গাড়ি এবং অন্যান্য হাজারো সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন, তা পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের উপকারার্থে। আর যখন খুব বড় রকমের আর্থিক অন্যায় করে ফেলেন—যাতে নিজের দলের সুবিধা হয়, তখন তাঁরা যা বোঝান, তাতে এই প্রতিপত্তি হয় যে, তাঁরা যেন গালবের মতো ঋষির জন্য, পরার্থে দান করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন। এই উপায়ে পরোক্ষে আত্মভোগের জন্য ঘরে আসে মাধবী অথবা গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের উপযুক্ত অন্য কোনও ভোগ্যবস্তু, যা আমরা আন্দাজও করতে পারি না।

এই যে কথাটা রাজা উশীনর গালব ঋষিকে বোঝালেন—অর্থাৎ আমার যে টাকা-পয়সা সম্পত্তি—এ তো আর আমার নিজের ভোগের জন্য নয়, সবই জনগণের জন্য—সেই কথাটা গালব যেমন করে বুঝেছেন, আমরাও তেমন করেই এতদিন বুঝেছি। রাজার ইচ্ছে, রাজার ভোগ-সুখ, বংশরক্ষা—সেটা যেমন সবই পৌর-জনপদবাসীদের জন্য—এ কথাটা সেকালের মানুষদের যেমন বোঝানো গেছে, একই রকমভাবে গণ কিংবা সমাজতান্ত্রিক দলের নেতাদের স্বৈরাচারও জনগণকে বোঝানো যায়। বোঝানো যায় যে, সবই একভাবে জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে। দলীয় কর্মীদের মাথাতেও এ জিনিসটা কেমন করে গেঁথে যায়। সর্বোচ্চ ক্ষমতাও ওই একই সূত্র ধরে কয়েকটি নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলত অন্যায়কেও তখন ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করা যায়, দুর্নীতিও করা যায় সযৌক্তিকভাবে। "This is the case in Fascist parties and in Communist parties as far as Stalin is concerned, The leader is omniscint omnipotent, infallible, and infinitely good and wise: every word that falls from his mouth is true; every wish emanating from him is party law"—এই হচ্ছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মন্তব্য।

রসভঙ্গের ভয়ে পুরো মন্তব্যের অল্পই আমি উল্লেখ, করলাম। মনে রাখা দরকার—আমাদের সোনার ভারতে শুধু ফ্যাসিবাদ বা সমাজতন্ত্র নয়, যে কোনও তন্ত্রের নেতাদেরই স্বক্ষেত্রে একটা রাজা-রাজা ভাব আছে এবং যে নেতা সর্ববাদিসম্পন্ন প্রধান, তিনি তো রাজাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মন্তব্যের সঙ্গে সর্বাংশে এক না হলেও প্রায় একই রকমের কথা আমরা মহামতি বাণভট্টের লেখায় পেয়েছি। বাণভট্ট রাজসভার কবি; রাজাদের চরিত্র তিনি বেশ ভাল করেই জানেন। বাণভট্টের ধারণা—কিছু কিছু রাজা যে নিজেদের দেবতা বলে ভাবতে থাকেন—তার কারণ, প্রতারণায় কুশল কিছু ধূর্ত মানুষ—আজকের ভাষায় যাদের মোসাহেব বলা যায়—তাদেরই পৌনঃপুনিক স্তাবকতায় রাজাদের দৈব-সম্ভাবনা ফুটে ওঠে—অমানুষোচিতাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রতার্যমানাঃ সদৈবতমিব অতিমানুষম্ আত্মানম্ উৎপ্রেক্ষমানাঃ.....। শৃঙ্খলাবদ্ধ দলীয় কর্মীরা তাঁদের নেতাদের প্রতি একই ব্যবহার করেন। বাণভট্টের ভাষা নকল করলে বলা যায়—গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের নেতারাও তাকেই পছন্দ করেন, তার সঙ্গেই আলাপ করেন, তাকেই পাশে পাশে রাখেন, আপন সাহায্যে তাকেই মাথায় তোলেন, তার সঙ্গে নিজেও সময় কাটিয়ে সুখ পান, তাকেই পাইয়ে দেন, তাকেই বন্ধু বলে মনে করেন, তার কথাই শোনেন, সেখানেই টাকা-পয়সা ছাড়েন, তাকেই সমাদর-প্রশংসা করেন, তাকেই সব থেকে বিশ্বাসের পাত্র বলে মনে করেন—যে নাকি দিন-রাত নিজের কাজকর্ম বাদ দিয়ে হাতজোড় করে উপাস্য দেবতার মতো নেতার স্তব করে অথবা তার নেতার নিত্য-নতুন মাহাত্ম্য উদ্ভাবন করে—সর্বথা তম্ অভিনন্দন্তি, তম আলপন্তি, তম্ পার্শ্বে কুর্বন্তি, তং সংবর্ধয়ন্তি তেন সহ সুখম অবতিষ্ঠন্তে, তস্মৈ দদতি...তএ বর্যন্তি....যো' হর্নিশম্ অনবরতম্ উপরচিতাঞ্জলিঃ অধিদৈবতমিব বিগতানাকর্ত্তবাঃ স্তৌতি, যো বা মাহাত্ম্যম্ উদ্ভাবয়তি।

আর এই অমানুষিক স্তুতিবাদের ফলে রাজা কিংবা নেতারা কী ব্যবহার করেন? তাঁরা যে কখনও জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে দর্শন দেন, সেটাই যেন অনুগ্রহ, তাঁরা যদি কারও দিকে একবার ফিরে তাকান, সেটা মনে হবে যেন কত উপকার করছেন, আর দৈবে যদি কারও সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে মনে হবে যেন সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন, তাঁরা যে 'অর্ডার' দেবেন—সেটা মনে হবে যেন বরদান করলেন—সম্ভাষণমপি সংবিভাগমধ্যে কুর্বন্তি, আজ্ঞামপি বরপ্রদানং মন্যন্তে। এর সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভাষার তফাৎ কোথায়—every word that falls from his mouth is true, every wish emanating from him is party law.

চার

সাধারণতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতার এই যে আত্মীকরণ, যাকে স্পষ্ট করে 'personalisation of power' বলা যায়—সেটা একই ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে, যা ডেকে

আনতেন স্বেচ্ছাচারী রাজা। তবে এ সব কথা আরম্ভ করার আগে একটা গল্প বলে নিই। বলতে পারেন—মহাভারত, পুরাণ—এই ধরনের পুরনো ঘুণধরা বই থেকে গল্প ফেঁদে লাভ কী? সত্যিই লাভ নেই। তবে কিনা কোনও এক পিতামহপ্রতিম লোক বলেছিলেন— পুরনো ইতিহাস ঘাঁটলে পরে নাকি নতুনটাকে তৈরি করতে সুবিধে হয়। সত্যি কথা বলতে কী আমরা নতুন কিছু গড়ার মানসিকতা থেকেও এসব পুরনো কথা বলছি না। যেহেতু আমি বেশ জানি যে, সেই প্রাচীন সমাজের ব্যবহারটুকু এই সমাজের ওপর আক্ষরিকভাবে ফেলে কোনও সমাধান পাওয়া যাবে না। সমাধানটা পেতে হবে আজকের নতুন আলোয় নতুন দৃষ্টিতে। বলতে পারেন—সে আমলটা ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। সেই রাজা-রাজড়াই নেই, আর তুমি রাজতন্ত্রের মশলা দিয়ে আধুনিক সভ্যতার আদিসৃষ্টি গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে বসেছ। আমরা বলি—একটু ধৈর্য ধরুন। আমরা প্রাচীন গ্রন্থকারদের আয়নায় আজকের গণতন্ত্রের ছায়া দেখতে বসিনি। আমাদের কাজ হল শুধু এইটে দেখানো যে, সে যুগের রাজতন্ত্রের বদভ্যাস, কু-অভ্যাস গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের মধ্যেও এসে গেল কিনা। সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস-প্রণেতারা স্বীকার করেন যে, দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রও পালটাতে থাকে। সেক্ষেত্রে এটা তো আমাদের দেখতেই হবে যে, মহাভারত-রামায়ণের যুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে আমাদের চরিত্র কতটা পালটেছে। সেকালে রাজা ছিলেন, একালে গণতন্ত্রের সুনামধন্য মন্ত্রীরা আছেন। অর্থাৎ রাজা ছিলেন সমাজ এবং রাষ্ট্রের একক হর্তা কর্তা, বিধাতা, কিন্তু এখনকার মন্ত্রীরা, অন্তত আধুনিক নিয়ম-মতে জনগণের ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত অধিকারী ব্যক্তি। কিন্তু জনগণের রায় মিলে যাবার পর মন্ত্রীরা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করেন, নাকি 'ভূক্ত্বা রাজবৎ' আচরণ করেন—সেটা তো দেখতেই হবে। গল্পটা সেই প্রসঙ্গেই এবং এটা তাঁদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, যাঁরা আজকেও তথাকথিত রক্ষকরূপে পরিচিত, কিন্তু আত্মদোষে বা কালস্রোতে সমাজের ভক্ষক হয়ে গেছেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই রক্ষক-ভক্ষকের গল্পটি বলেছিলেন। বলেছিলেন এই কারণে যে, ভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা হতে চলেছেন। অতএব রাজা হিসেবে রাজ্যের বিপন্নতার রন্ধ্রপথগুলি তাঁর জানা থাকা দরকার। মহাভারতের মধ্যে এই গল্পটার মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, সেটা হল—ভীষ্ম সব সময় মন্ত্রীদের সম্বন্ধে রাজাকে সজাগ থাকতে বলেছেন। মন্ত্রীরা নাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভীষণ চোর হন, এবং সেই চৌর্য নাকি জনগণের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে—অমাত্যা হ্যপহর্ত্তারো ভূয়িষ্ঠং ঘ্নন্তি ভাবত। ছোটবেলায় আমি ভাবতাম—রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, তাঁর কত ধন কত দিকে যাচ্ছে, তা মন্ত্রী অমাত্যরা তো একটু ইধার-উধার করবেনই। আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রে এসব জঘন্য ঘটনা হয় না। পরে ভেবে দেখেছি—সেকালের রাজাই থাকুন আর একালের মন্ত্রীরাই থাকুন—কারোরই নিজস্ব টাকায় রাজকোষ বা সরকারি তহবিল ভরা থাকত না বা থাকে

না। রাজকোষের টাকা চিরকালই সাধারণ জনগণের কর-জমা টাকা, 'ট্যাক্সের' টাকা। সে টাকা—যেমন আগে বলেছি—সে টাকা নীতিগতভাবে যেমন রাজার নয়ছয় করার অধিকার ছিল না, তেমনই এখনকার মন্ত্রীদেরও সে অধিকার নেই।

কিন্তু আশ্চর্যটা এখানে নয়। আশ্চর্যটা হল—সেকালে না হয় মাথার ওপরে রাজারা ছিলেন আর মন্ত্রীরা না হয় তাঁদের প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ করতেন। কিন্তু একালে তো মন্ত্রীরাই মাথার ওপরে আছেন, তবু কেন যে নিন্দুকেরা ওই মন্ত্রীদেরই দোষী সাব্যস্ত করে—সে কথা ঈশ্বর জানেন। জনগণের টাকায় ভোগ-বিলাসের কথা ছেড়েই দিন, নিন্দুকেরা বলে—মন্ত্রী হলেই নাকি তার চোদ্দো পুরুষ টাকা-পয়সার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। গণতন্ত্র—সমাজতন্ত্রের দেশে কেন যে লোকে এমন বলে—তা আমার আশ্চর্য লাগে। আরও আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে যে, মন্ত্রী শব্দটা চিরকালই কি চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ যুক্ত?

এই তো আরেক মুশকিল হল। এখন দেখছি গল্পের মধ্যে আবার গল্প বলতে হয়। তাহলে দ্বিতীয় গল্পটার সার কথাটা আগে শুনে নিন। গল্পটা 'হরি বিনে দিন' কাটাতে চান না এমন একজন বৈষ্ণব কবির লেখা। তবে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব হলে কী হবে, তিনি রাজসভার কবি বলে তাঁর গল্পের একটা সমাজতান্ত্রিক টিপ্পনি থাকতে পারে। গল্পটার মোদ্দা কথা হল—এক চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, এবং রাজা তাকে শূলে চড়ানোর আদেশ দেন। বধ্যভূমিতে পৌঁছেও চোরটি শেষে আপন বুদ্ধিবলে রাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল। সে বলল—মহারাজ আমাকে মারবেন না, আমি দারুণ এক বিদ্যা জানি, সোনার চাষ জানি। রাজা প্রথমে বিশ্বাস করেননি, কিন্তু চোরের প্রত্যয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। চোর বলল—সরষের মতো সোনার বীজ তৈরি করে চাষ করতে হবে—আপনি জমি-জায়গা দিন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। একমাস পরে চোর এসে বলল—মহারাজ! সব তৈরি। কেবল সোনার বীজগুলো বুনে দেবার লোক দিন একটা। রাজা বললেন—সে আবার কী? তুমি নিজেই বুনে দাও। চোর বলল—আমিই যদি বুনতে পারতাম, তাহলে কি আজ আমাকে চুরি করে খেতে হয়? এই সোনার বীজ সেই মাটিতে রোপণ করবে—যে কোনওদিন কিছু চুরি করেনি। চোর হঠাৎ বলল—মহারাজ! আপনি বুনে দিন না কেন? এক ধাক্কায় সবাই কুপোকাৎ। রাজ', 'চিফ জাস্টিস্' সবাই কে কবে, কোন অবস্থায়, কখন চুরি করেছিলেন তার বর্ণনা দিলেন। দেখা গেল—সবার ক্ষেত্রেই চুরির ব্যাপারটা আকস্মিক মানসিক চাপে সংঘটিত হয়েছিল। শুধু মন্ত্রীরা যে জবাব দিলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—চুরিটা তাঁদের জীবনে কোনও আকস্মিকতা নয়, চুরিটা তাঁদের স্বভাবগুণ। তাঁরা বলেছিলেন—আমরা রাজার ওপরেই জীবিকা নির্বাহ করি, আমরা কি চোর না হয়ে পারি—বয়ং রাজোপজীবিনঃ, কথম্ অস্তেয়িনো ভবামঃ।

এই গল্পের চোর শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছিল, কিন্তু বিদ্যাপতির দৃষ্টিতে বুঝতে পারি—রাজা অথবা সরকারের ওপরেই যাঁদের জীবিকা, সেই মন্ত্রীরা চোর না হয়ে পারেন না। সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যেমন পেশা জানাতে গিয়ে

বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ, তেমনই মন্ত্রীদের পেশাই হল সরকার চালানো। আর সরকার চালাতে গেলে অধিকারী ব্যক্তির কী কী প্রয়োজন হয়, তার একটা ফিরিস্তি মহাভারতে আছে। তবে সেগুলি চুরি কিনা তা সহৃদয়ের বিচার্য।

পুরাকালে নাকি যখন কেউ আর কাউকে মানছে না, তখন উৎপীড়িত জনগণ নাকি সেই অরাজক অবস্থা ঘোচানোর জন্য ব্রহ্মাকে অনুরোধ করে। ব্রহ্মা তখন আদি মানব মনুকে আদেশ করলেন মর্ত্যলোকে রাজা হয়ে বসবার জন্য। মনু বললেন—এ অসম্ভব। রাজ্য-পাট বড় ভয়ানক জিনিস, এতে পাপ হবেই। তাতে মানুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যাচারী। সত্যি কথা—মানুষ সম্বন্ধে মনুর ধারণা ভাল নয়, তাঁর মতে সৎ লোক দুনিয়ায় পাওয়া খুব মুশকিল—দুর্লভো হি শুচির্নরঃ। অতএব মনু তাদের রাজা হতে অস্বীকার করলেন। জনগণ মনুর চিন্তা বুঝে বলল—আপনাকে ভাবতে হবে না, আমরা আমাদের উপার্জিত ধনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স হিসাবে দেব, উৎপন্ন ধানের দশভাগের এক ভাগও দেব।

বুঝতে পারি—রাজ্য চালাতে গেলে এগুলি প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু এরপরেই জনগণ বলল—এসব তো দেবই, তার সঙ্গে খুব সুন্দরী একটা মেয়েও দেব—এমন মেয়ে দেব—যার বেশ বিয়ে-বিয়ে মন হয়েছে—কন্যাং শুক্লে চারুরূপাং বিবাহেযূদ্যতাসু চ। দেখুন রাজ্য চালাতে গেলে ধান-চাল, ট্যাক্স লাগবেই, কিন্তু বিয়ের জন্য একটি মেয়েও লাগবে—এ কেমন ব্যাপার। তা বুঝলাম রাজকীয় ব্যাপার। রাজার বিয়ে হলে রাজার মনও ভাল থাকবে, অতএব বিবাহের জন্য একটি সুলক্ষণা কন্যার ব্যবস্থাও না হয় জনগণ করল।

কিন্তু এরপরেই দেখছি মনু রাজত্বে রাজি হয়ে গেলেন এবং বেশ গুরুগম্ভীরভাবে রাজত্ব শুরু করে দিলেন। মনুর ভাব দেখে নিরপেক্ষ মহাভারতকার বললেন—যখনই মানব সমাজের কল্যাণের প্রয়োজন হবে, তখনই আগে রাজা করবে একজনকে। এরপর আরও নানা উপদেশ দিয়ে মহাভারতের কবি বললেন—দেখ বাপু। রাজাকে কোনও ঝামেলায় ফেলো না, কষ্টও দিও না। তোমরা প্রজারা সব সময় রাজাকে—ছাতা, গাড়ি, কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার (আধুনিক অর্থে বিভিন্ন বৈদ্যুতীন যন্ত্রাদি এই অলঙ্কার শব্দের অন্তর্ভুক্ত), খাদ্য (আধুনিক অর্থে খানাপিনার 'পার্টি' এই শব্দগ্রাহ্য), পেয় (বিলাতীয় মদ্যাদি), গৃহ (উজ্জয়িনীপ্রতিম স্থানে), আসন (সোফা-সেটাদি), শয্যা এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকার উপকরণ (আধুনিক কালে সমস্ত প্রকার হাই-ফাই, হাই-টেক যন্ত্রাদি এই উপকরণের মধ্যে পড়ে) রাজাকে উপহার হিসেবে দেবে—রাজ্ঞে দদ্যুঃ।

দেখুন এই শুরু—জনগণ এই নিয়ম এখনও মেনে চলেছে। অতএব এগুলিকে আমরা চুরি বলতে পারি না। কেন না মহাভারতের মতে উৎসাহী জনগণের দেওয়া গাড়ি-বাড়ির উপহার তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরাই রাজ্য কিংবা সরকার চালাবেন। অপি চ এই সব উপহার পাবার পর রাজারা কিভাবে ব্যবহার করবেন—তার ইঙ্গিত যেমন

মহাভারতে পাওয়া যাবে, তেমনই, এখনকার মন্ত্রীদের মুখমণ্ডলেও পাওয়া যাবে। মহাভারত লিখেছে—'তস্মাৎ', সিদ্ধান্তবাগীশ অর্থ করেছেন—পূর্বে বলা ওই সব উপহার দান করার পর যে রাজা অতি দুর্ধর্ষ, তিনিও ঈষৎ হাস্য করে দাতাদের সঙ্গে আলাপ করবেন—স্মিতপূর্বাভিভাষিতা। এই আলাপের কী ফল আমরা জানি, লাইসেন্স, পারমিট, টেন্ডারের কৌশল, জমে থাকা বিল, বড় অর্ডার, মায় অন্য অনীপ্সিত মানুষকে বংশদণ্ড দেওয়া পর্যন্ত এই স্মিতহাস্যময় আলাপচারিতার পরিবেশ থেকে ফলপ্রসূ হয়।

তবু বলব—এসব চলেই, চিরকাল চলে আসছে, শুধুমাত্র রাজা শব্দের বর্তমানে প্রচলিত প্রথার ব্যত্যয় হবে কেন? কিন্তু এত কথার পরেও ভীষ্মের সেই গল্পের কথা আসে, কেন না যিনি রাজা হবেন বা মন্ত্রী হবেন, তাঁকে 'পলিসি-ম্যাটার' হিসেবে ভীষ্মের উপদেশ শুনতেই হবে। আরও শুনতে হবে এইজন্য যে, আমারও তো ভয়ডর বলে কিছু আছে। ভীষ্ম বলেছেন—যারা মন্ত্রীদের চুরির সম্বন্ধে রাজার কাছে সত্য ঘটনা নিবেদন করবে তাদের 'প্রোটেকশন' দিতে হবে তোমাকে, নইলে মন্ত্রীরা তাকে মেরে ফেলবে। আমরা এইটুকু যোগ করি যে, শুধু চুরি নয়, যে কোনও ব্যাপার যা মন্ত্রী কিংবা তাঁর দলীয় নেতার প্রসঙ্গে সত্য অথচ অপ্রিয়, তা প্রকাশ করলে—সত্যবক্তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য সে যদি বিরুদ্ধ দলের ডাকসাইটে নেতা হয়, তবেই শুধু বাঁচার রাস্তা আছে নচেৎ সাধারণ লোক অথবা সাধারণ দলকর্মী হলে তার রক্ষা নেই। এবারে গল্পটা।

পুরাকালে কোশলদেশে ক্ষেমদর্শী বলে এক রাজা ছিলেন। কোনও এক সময়ে কালকবৃক্ষীয় নামে এক মুনি এসে হাজির হলেন রাজার কাছে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল—এই দুটি নামই রূপকের ধাঁধায় বাঁধা আছে মনে হয়। কারণ 'ক্ষেম' কথাটার মানে প্রাপ্ত জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেই রক্ষাবিধানের ব্যাপারে যার বহুদর্শিতা আছে—তিনিই হলেন ক্ষেমদর্শী। আবার কালকবৃক্ষীয় মানেটা এমন হতে পারে যে মানুষটা গাছের মতো একটা উঁচু জায়গা থেকে সব কিছু দেখতে পায়—স্থানু সাক্ষীর মতো, কারণ 'কল' ধাতু মানে দেখা। অথবা মহাকালের বৃক্ষ বললেও কালকবৃক্ষীয় শব্দের অর্থ একটা আসে। যাইহোক, ক্ষেমদর্শী রাজার অবস্থা দেখে কালকবৃক্ষীয় আজ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। কথা বলার প্রসঙ্গ—যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক। কালকবৃক্ষীয় প্রথমেই একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি একটি কাককে খাঁচায় পুরে জনগণকে বোঝাতে লাগলেন—তোমরা এই কাকের বিদ্যা শিক্ষা করো—কেন না কাকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব বলতে পারে—অধীধ্বং বায়সীং বিদ্যাং শংসন্তি মম বায়সা। অনাগতম্ অতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ত্ততে।

তা আপনারা কি কেউ বিশ্বাস করেন যে, কাক সব জানে, কাক সব বুঝতে পারে, সব বলতে পারে? আমাদের আধুনিক শিক্ষায় বুঝি মুনি কাক নিয়ে এসেছিলেন—রাজ্যের ওপর মহলে যে সব চুরি-চামারি চলছিল—তার সম্বন্ধে

জনগণকে অবহিত করার জন্য—সর্বং পর্য্যচরদ্ যুক্তঃ প্রবৃত্ত্যর্থী পুনঃ পুনঃ। সাধারণ বুদ্ধি থেকে আমরা জানি—একটি কাক কোনও খবর পেলে কা-কা করে সব কাককে খবর দেয় এবং এটাও প্রমাণিত যে, পক্ষী হিসেবে কাকেরা অত্যন্ত গোষ্ঠী সচেতন তথা যে কোনও সামান্য 'ইস্যুতে'ই তারা একজোট হয়। মুনি তাই জনগণকে 'বায়সী বিদ্যা' শেখাচ্ছেন—অর্থাৎ জনগণ যাতে একজোট হয়ে কাজ করতে পারে। ফল কী হল—মুনি একজন নিরপেক্ষ দলনেতার মতো কয়েক দিনের মধ্যেই বহু লোক এক জায়গায় করে—বহুভিঃ পুরুষৈঃ সহ বিভিন্ন জায়গায় হঠাৎ হানা দিয়ে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের অন্যায় কাজকর্ম সব বুঝে ফেললেন—সর্বেষাং রাজযুক্তানাং দুষ্করং পরিদৃষ্টবান্।

এবারে একটা নতুন ঘটনা ঘটল। সব জেনে বুঝে নিয়ে মুনি তাঁর খাঁচার কাকটি সঙ্গে করে রাজার কাছে গেলেন। খেয়াল করবেন—জনগণ, যারা এতদিন ধরে 'বায়সী বিদ্যা' শিখল, কিংবা যারা এতদিন মুনির সঙ্গে সঙ্গে সব গোপন আস্তানায় গেছে—তারা কেউই কিন্তু এখন মুনির সঙ্গে রাজার কাছে গেল না। গেল শুধু কাকটি, যাকে খাঁচায় পোরা হয়েছিল। মুনি রাজার কাছে সটান উপস্থিত হয়ে খাঁচার কাকটিকে তাঁর সামনে রাখলেন। এর পর মুনি কাকটিকে সাক্ষী মেনে একেকজন মন্ত্রীর দিকে আঙুল দেখাতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন—অমুক জায়গায় এই কৌশলে তুমি এত টাকা মেরেছ; এই এই লোক জানে—অসৌ চাসৌ চ জানীতে, আর আমার কাকটি এ ব্যাপারে সাক্ষী আছে, সেও তাই বলছে—এবমাখ্যাতি কাকো'য়ম্। মুনি এইভাবে আরও গোটা কয়েক মন্ত্রীকে ধরে রাজার সামনেই তাদের টাকা-মারার দায়ে অভিযুক্ত করলেন। শনাক্ত করার কাজ করল আবার সেই কাক।

আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—এই পঞ্জরস্থ কাকটির জন্য আমার খুব মায়া হয়। কারণ এই কাকটি অনেকাংশে আমাদের পাড়ার হাবু, জগু, কালীনাথ মণ্ডল অথবা নিদেন পক্ষে সত্যধন মিত্রের মতো। আমাদের হাবু শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা একজনকে পরিষ্কার বোমা মারতে দেখেছিল। পুলিশের তাড়ায় কবুল করতে গিয়ে পরে সে মারা পড়ে। জগু রেশন দোকানের মালিককে রাতের আঁধারে চাল পাচার করতে দেখে পুলিশে খবর দিয়েছিল। পরের দিন সে পুলিশের হাতেই মারা যায়। কালীনাথ মণ্ডল পোর্টের চোরা-চালানের কথা জানত। পুলিশের বড় কর্তার চাপে সে কথা বলে ফেলায়, বড় কর্তা সহ সেও দু'চার দিনের ব্যবধানে মারা যায়। আর সত্যধন মিত্র এক মন্ত্রীকে দেখেছিলেন—এক ব্যবসাদারের টাকা খেয়ে কী অন্যায়ভাবে সেই ব্যবসাদারকে কতগুলি পারমিট আর লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিতে। এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাগজপত্র তাঁর হাতে এসে পড়ে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ তিনি তার কিয়দংশ জমা দেন খবরের কাগজের অফিসে। দিন দুয়েক বাদে সত্যধনের লাশ পাওয়া যায় কাঁটাকালের কাছে।

হাবু-জগু অথবা কালীনাথ-সত্যধনের সমগোত্রীয় কাকটিকে খাঁচায় নিয়ে বিরোধী

গোষ্ঠীর নেতার মতো কালকবৃক্ষীয় মুনি সরকার গোষ্ঠীর প্রধানের কাছে গেছেন। কাক জানে—সে না গেলে খাঁচার অধিকারী বিরোধী নেতা ছাড়বে না, আবার কাক এও জানে যে, একবার সেখানে গেলে পরে সত্য প্রকাশিত হবেই, এবং তখন রাজকোষ-অপহারক মন্ত্রীরা তাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। যাই হোক, আপাতত নিম্ন অথবা মধ্যবিত্তের সাময়িক সাহসিকতা দেখানোর লোভে, নিরপেক্ষতা এবং সততার একটা দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য একটি কাক আপাতত বিরোধী নেতার পঞ্জরস্থ হয়ে বুক ফুলিয়ে সত্যপ্রকাশ করতে ব্যস্ত।

ফল যা হয়, তাই হল। পরদিন সকালেই খবরটা পাওয়া গেল। পঞ্জরের অধিকারী রাত্রে ঘুমিয়েছেন, যেমন সব বিরোধী নেতাই সারা দিন অন্তহীন বিপ্লবের পর রাত্রিতে ঘুমান। কিন্তু পূর্ব দিনের অভিমানাহত রাজমন্ত্রীরা রাতের অন্ধকারে সেই ঘুমন্ত মুনির পাশেই কাকটিকে তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে মেরে রেখে গেল—তম্ অস্যাভিসুপ্তস্য নিশি কাকম্ অবেধয়ন্। এরপর যা হয়। মৃতের শরীর সহ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে 'পলিটিক্স্' আরম্ভ হয়ে গেল। মুনি কালকবৃক্ষীয় কাকের ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে—বায়সস্তু বিনির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা বাণেন পঞ্জরে—আবার রাজার কাছে গেলেন। তারপর বিরোধী নেতা যেমন তারই কারণে মৃত ব্যক্তির দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বলেন—আপনার রাজ্যের এই তো অবস্থা, জনগণ এবং সরকার বিরোধী মানুষের তো কোনও 'সিকিউরিটি'ই নেই—ঠিক সেইরকমভাবেই মুনি বললেন—আপনার রাজ্যে আছি, আপনি অভয় দিন। আপনার রাজ্যে যে সত্য কথা বলবে, তারই এই অবস্থা হবে। এই কাক যেমন আপনার এবং আপনার রাজ্যের ভাল করতে গিয়ে সত্য কথা বলে মারা পড়ল, তেমনই আমাদেরও তো সেই হাল হবে।

মুনি অনেক কথা বললেন—রাজার হিতের কথা, রাজমন্ত্রীদের রাজকোষ আত্মাসাৎ করার কথা এবং কী করে তাদের থেকে রাজ্যটিকে মুক্ত করা যায় তার কথা। অনেক যুক্তি, তর্ক, উপদেশের শেষে মুনি বললেন—আপনার রাজ্যটা হল ভয়ঙ্কর সব জলজন্তু সমন্বিত নদীর মতো, যেখানে হাঙর, কুমীর আর তিমি-তিমিঙ্গিলের ছড়াছড়ি। কিন্তু তবু আমি মূর্খ কাকের সাহায্যে এই দুস্তীর্ণা নদী পার হয়েছিলাম—কাকেন বালিশেনেমাং যাম্ অতার্ষমহং নদীম্।

দেখুন, আমি যে এতক্ষণ ধরে কাক এবং মুনিকে মূর্খ জনগণ এবং বিরোধী নেতার প্রতীকে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা কি খুব অন্যায় হয়েছে মনে হচ্ছে? অন্তত এইরকম অভিযোগ তো উঠতেই পারে। তাহলে এক্ষুনি যে শ্লোকটা বললাম—মহারাজ! আপনার রাজ্যটা হল হিংস্র সব জলজন্তুতে ভরা, কিন্তু তবু মূর্খ কাকের সাহায্যে আমি এই নদী পার হয়েছিলাম—এই শ্লোকটা ভাল করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে এই জন্য যে, এখনও পর্যন্ত মূর্খ কাক-সদৃশ জনগণের সাহায্যেই সরকারি এবং বিরোধী নেতারা রাজনীতির নদী পার হন। আমার কথার মধ্যে যে প্রতীকি ব্যাপারগুলো ছিল, তা একেবারে পরিষ্কার করে খুলে বলেছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ টীকাকার কালকবৃক্ষীয় মুনির কথা নিজের মুখে বসিয়ে নিয়ে রাজাকে বলছেন—রাজ্য নয় বাপু, এই নদীটা হল রাজনীতির নদী, যে নদী হাঙর-কুমীরের স্বভাবযুক্ত সজাতীয় এবং বিজাতীয় দুর্বলগ্রাসী রাজপুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। মূর্খ কাক দুর্বল হলেও সব দেখতে পায়, এবং সে এতটাই মূর্খ যে, নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও আমাকে এই দুস্তীর্ণা রাজনীতির নদী পার হতে সাহায্য করেছে। নীলকণ্ঠের সংস্কৃত থেকে আমি একেবারে হুবহু অনুবাদ করে দিলাম।

লক্ষণীয়, এখানে দুটি কথা ভীষণ ভীষণ প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ আজকের রাজনীতিতেও এই দুটি কথার উপযোগ আছে। এক—সজাতীয় এবং বিজাতীয় দুর্বলগ্রাসী অধিকারী রাজপুরুষ—নীলকণ্ঠ যাকে বলেছেন—সজাতীয়-বিজাতীয় দুর্বলগ্রাসিভিঃ নক্রাদিতুলৈঃ অধিকারিপুরুষৈ :। আমাদের আজকের রাজনীতিতেও এই দুই ধরনের রাজপুরুষই দেখতে পাবেন। সজাতীয় এবং বিজাতীয়। সজাতীয় কারা? সরকার গোষ্ঠী, তার সজাতীয় কর্মকর্তা, সরকারি দলের পক্ষপাতী আমলারা, স্বজাতীয় দলনেতারা। আবার বিজাতীয় বিরোধী গোষ্ঠী, বিরোধী কর্মকর্তারা, সরকারি শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বিরোধী দলের মতবাদ-পুষ্ট আমলারা এবং বিরোধী দলনেতারা। বলাবাহুল্য, নীলকণ্ঠের অধিকারী-পুরুষ, যাকে আমি রাজপুরুষ বলেছি—সেই অধিকারী পুরুষ বলতে কিন্তু আমি মোটেই পুলিশ বা আমলাদের বুঝি না, যদিও ওই শব্দের সোজা অর্থ তাই বটে। কিন্তু নীলকণ্ঠ যেহেতু শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভেই নদীটাকে 'রাজনীতির নদী' বলেছেন—ইমাং রাজনীতিনদীম্—তাই অধিকারী পুরুষ বলতে আমরা রাজনীতিকই বুঝি—স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় রাজনীতিক।

গণতন্ত্রের নিয়ম মতে বিরোধীরা গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য সূচনা করেন। কিন্তু বিরোধীরা যদি জনস্বার্থের মূল্যে নিজেদের আত্মোন্নতিকে বেশি মূল্যবান মনে করেন, তাহলে তাঁদের খাঁচাকলে পড়ে দুর্বলের প্রাণ যায়—যেমন এখানে কাকের গেল। আর সরকারগোষ্ঠী বা শাসক দলের তো কথাই নেই। তাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাজকোষ ব্যবহারের সুযোগ পান—কাজেই তাঁরা যে কিভাবে দুর্বলকে গ্রাস করেন, সেটা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না।

আমার দ্বিতীয় জরুরি কথাটা ছিল—মূর্খ কাক, যার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কালকবৃক্ষীয় মুনি ওই রাজনীতি নদীকে অতিক্রম করেছেন বলে মনে করেছেন—নীলকণ্ঠ লিখেছেন—কাকেন বালিশেন স্বমৃত্যুং সম্পাদয়তা সহায়েন অহম্ অতার্যং তীর্ণবানস্মি। কালকবৃক্ষীয় মুনি সত্য কথা বলেন বলে সাহায্যকারী কাকটিকে মূর্খ বলতে দ্বিধা করেননি। মজা হল, গণতন্ত্রের সরকারি এবং বিরোধী দলনেতারা জনগণকে আড়ালে মূর্খই ভাবেন, কিন্তু সামনাসামনি অতীব জ্ঞানী বলে সম্বোধন করেন। একটি ছোট্ট সভায় এক নেতা নিজের বচন-কৌশলে জনগণকে প্রভাবিত করছেন দেখে, আমি বলেই ফেলেছিলাম যে—আপনি জনগণের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে, তাঁদের রাজনৈতিক অচেতনতার সুযোগ নিয়ে নিজের মতটি গিলিয়ে দিচ্ছেন।

আমি আহাম্মক অতএব আমার মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে তিনি জনগণের সামনেই আমাকে বলেছিলেন—জনগণকে মূর্খ বলার অধিকার আপনাকে কে দিল? জনগণকে আপনি আপনার থেকে কম বুদ্ধিমান ভাবছেন কী করে? জানেন, জনগণের বুদ্ধি আছে বলেই আজকে তাঁরা দেশের শুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তির মধ্যে পার্থক্য করে শুভ শক্তিকে (অর্থাৎ সেই নেতার দলকে) নির্বাচিত করেছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্ষমা করবেন, বক্তৃতায় আমি যৎপরোনাস্তি অপদস্ত হলেও এখনও মনে করি বেশির ভাগ জনগণ ওই মহাভারতীয় মূর্খ কাকের মতো, যারা নিজেদের অনুভবের আকাশে উড়ে শাসকের দোষ গুণ মনে মনে সব বুঝতে পারে, কিন্তু আপন মূর্খতার জন্যই দলের ফাঁদে আটকা পড়ে আপন প্রাণ দেয়—যার ফায়দা তোলে কখনও বিরোধী নেতা, কখনও শাসকদলের নেতা। মনে রাখবেন, যে সভায় আমি অপদস্থ হয়েছিলাম, সেই সভার শেষে উপরিউক্ত নেতা আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলেন—দেখুন, আপনার কথায় আমার আরও সুবিধে হল। 'পাবলিক' আবার মূর্খ ছাড়া কী? তবু যদি এদের মন ভিজিয়ে দুটো ভোট পাই, তো আপনি তাতে বাদ সাধেন কেন? সেই মুহূর্তে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে পড়ল মহাভারতের কথা—এই সেই রাজনীতি নদী, যেখানে সজাতীয় বিজাতীয় রাজনীতিকের ছড়াছড়ি, তবু এই দুস্তীর্ণা নদী আমি মূর্খ কাকের সহায়তায় পার হয়েছিলাম—কাকেন বালিশেনেমাং যাম্ অতার্ষম্ অহং নদীম্।

পাঁচ

মহাভারতের এই একটিমাত্র জায়গা নয়, বহু জায়গায়, বহু প্রসঙ্গে রাজা, মন্ত্রী, তাঁদের ব্যবহার, কতটা তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত, কতটা নয়—এ সব নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। আধুনিকমনা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের কাজ হল অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে এগুলির বিচার করা। এতক্ষণ স্বজাতীয় বিজাতীয় রাজনীতির কথা শুনে এবং সেই প্রসঙ্গে রাজতন্ত্রের সমভূমিতে বারংবার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের উল্লেখ শুনে আপনাদের তো একবারের তরেও মনে হতে পারে যে, সেকালের রাজতন্ত্রের অনেক পরম্পরাই যেহেতু আমরা আমাদের গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে বহন করছি, অতএব গণতন্ত্রের মতো একটা কিছু সে যুগেও কোথাও ছিল কিনা।

আপনারা আমার প্রস্তাব শোনামাত্রই ভ্রূকুঞ্চন করবেন। বললেন—এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সেকালে আবার গণতন্ত্র কোথায়? ঠিক এইখানেই সংবেদনশীলতার প্রয়োজন। আপনি যদি অক্ষরে অক্ষরে পাঁচটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান খুলে মহাভারত অথবা বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির সঙ্গে মেলাতে চান, তাহলে মিলবে না। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে 'কনসেপ্টটা' ছিল কিনা, গণতন্ত্র থাকলে পরে কিভাবে ছিল—এগুলির—এক একটা সূত্র কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ, মহাভারত কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যেতে পারে।

একথা প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, প্রাচীন ভারতীয় গণরাজ্যগুলি সম্বন্ধে গণতন্ত্র শব্দটা ব্যবহার না করে প্রজাতন্ত্র বা 'রিপাবলিক' শব্দটা ব্যবহার করা অনেক ভাল, যদিও সেটাও ব্যবহার করতে হবে এতটাই সীমিত অর্থে, যে অর্থে আমরা প্রাচীন গ্রিস অথবা ইতালির প্রজাতন্ত্রী দেশগুলিকে বুঝি। এখানে দেশের সার্বভৌমত্ব কোনও একজন মানুষ বা রাজার ওপর ন্যস্ত থাকত না, বিশিষ্ট দেশের কতগুলি শক্তিধর গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত হত ক্ষমতা। অবশ্য এই শক্তিধর গোষ্ঠী-প্রধানেরা আপন শ্রেষ্ঠতা বোঝানোর জন্য 'রাজ' শব্দটি ব্যবহার করতেন মাত্র, কৌটিল্য পরবর্তী সময়ে এঁদের বলেছেন 'রাজশব্দোপজীবী'। এক একটি গণরাজ্যে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষত্রিয় পরিবারই রাজা শব্দ ব্যবহার করতেন, বিধি-নিয়ম অনুসারে তাঁদের অভিষেক-টভিষেকও হত, অথচ এঁরা কেউই আসল রাজা নন—মানে যে অর্থে আমরা রাজা বলি আর কি—তা নন। পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থ পেয়ে রাজসূয় যজ্ঞের মতো এক বিশাল যজ্ঞ করার জন্য মেতে উঠলেন, তখন মহামতি কৃষ্ণ জরাসন্ধ—ইত্যাদি নামী রাজারা ভয় দেখালেন যুধিষ্ঠিরকে। ভয় পেয়ে যুধিষ্ঠির এত শান্তিকামী হয়ে উঠলেন যে, 'আঙুর ফল টকে'র কায়দায় বলে বসলেন—সবাই কি আর সম্রাট হয়! এমন জায়গাও তো আছে যেখানে ঘরে ঘরে রাজা দেখা যায়—গৃহে গৃহে হি রাজানঃ স্বস্য স্বস্য প্রিয়ঙ্করাঃ—তারা নিজের নিজের রাজ্যে ভালই তো করে যাচ্ছে, অথচ তারা কেউই সম্রাট নয়।

পণ্ডিতেরা বলেন—এই যে যুধিষ্ঠির ঘরে ঘরে রাজা দেখতে পেলেন—এটা গণরাজ্যের কথা মনে করে। আমরা টিপ্পনি কাটি—ওই গণরাজ্যের কথাটা আবার যুধিষ্ঠিরের মনে পড়েছে সামনাসামনি কৃষ্ণকে দেখে, কেননা কৃষ্ণ ছিলেন এক বিশিষ্ট প্রজাতান্ত্রিক দেশের জাতক। এটা সত্যিই আশ্চর্য লাগে—যে মহাপুরুষ বা ধর্মীয় নেতাকে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতেই যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং ব্রহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই শাক্যসিংহ বুদ্ধ কিন্তু প্রজাতন্ত্রের জাতক। আবার উলটোদিকে যে নেতাকে আমরা মহাভারতের সূত্রধার বলে জানি এবং যাঁকে অহোরাত্র 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' বলে নমস্কার করছি—সেই কৃষ্ণও কিন্তু প্রজাতন্ত্রের জাতক। বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রের জাতক বলেই এই দুই নেতার মধ্যে—সময়, দর্শন এবং মতবাদের পারস্পরিক পার্থক্য পাহাড়-প্রমাণ হলেও—তাঁরা নিজস্ব ক্ষেত্রে দুজনেই অত্যন্ত প্রগতিশীল, কৌশলী, বাগ্মী এবং কালাতিক্রমী। অতএব কৃষ্ণ যখন কথা বলছিলেন যুধিষ্ঠিরের সমানে, তখন তিনি যে কৃষ্ণের রাজ্যের কথাই স্মরণ করে ঘরে ঘরে রাজা দেখতে পাচ্ছিলেন—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার শাক্যসিংহ বুদ্ধের দেশের কথা ভাবুন। সেখানে নাকি প্রত্যেকেই নিজেকে রাজা বলে মনে করত। ললিত বিস্তর নামে প্রাচীন গ্রন্থটি ঠাট্টা করে বলেছে যে, বৈশালীতে সবাই নিজেকে রাজা মনে করে—একৈক এব মন্যতে—অহং রাজা, অহং রাজেতি। জাতকের গল্প অনুসারে বৈশালীর মতো ছোট্ট একটা দেশে সাত হাজার সাতশো সাত জন রাজা ছিল।

গল্পের কথা গল্পে থাক। তবে এটা ঠিকই যে, একটা রাজ্যে সবাই যখন নিজেকে রাজা মনে করছে, তখন সেই রাজ্য যে এক অর্থে 'অরাজক', তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পণ্ডিত জয়সোয়াল একসময় 'অরাজক' রাজ্য বলতে প্রজাতন্ত্রী রাজ্য বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমরা অতদূর যেতে চাইছি না। তবে অরাজক না হলেও 'বিরাজক' বলতে যে সাধারণতন্ত্র বোঝাত—এটা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য 'বিরাজক' শব্দটাও প্রাচীনেরা ব্যবহার করেননি। তাঁরা বলেছেন—বৈরাজ্য—অর্থাৎ যেখানে একক রাজার কোনও স্থান নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—যে সব জনপদ হিমালয়ের ধারে, যেমন উত্তর কুরু, উত্তর মদ্র—এইসব জনপদে একক রাজা বলে কেউ ছিল না—বৈরাজ্যায় এব তে অভিষিচ্যন্তে। এই 'বৈরাজ্য' সংবিধানে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটিকে 'বিরাট' নামে ডাকা হত এবং মহাভারতেও দেখা যাচ্ছে 'বিরাট' শব্দটি রাজা শব্দের প্রতিরূপ। ঠিক একই রকমভাবে আমরা পাব 'ভোজ্য' সংবিধান। ভোজেরা, মানে—আমাদের ভগবান কৃষ্ণের পিতৃগোষ্ঠী, মাতুল গোষ্ঠী, জ্ঞাতিগুষ্টি এবং বৈবাহিক শ্বশুরগুষ্টির প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বংশপরম্পরা ছিল। কিন্তু পরিচয় দেওয়ার সময় এঁরা সবাই ছিলেন ভোজ। মহাভারতের কবি একেবারে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, গণ-প্রজাতন্ত্রী রাজ্যে সবার জাতি কুল একই রকম—জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্বে কুলেন সদৃশাস্তথা।

কিন্তু তাই বলে কি রাষ্ট্রপ্রধান বলে কেউ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সবাই 'রাজা'-র দেশে 'রাজা' নাম নিতেন তাঁরাই, যখন অন্য ছোট ছোট রাজারা তাঁকে রাজা বলে মেনে নিত; যাকে তারা মানত না সে রাজা নয়—শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—যস্মৈ বৈ রাজানো রাজ্যমনুমন্যতে স রাজা ভবতি, ন স যস্মৈ ন। এই ধারণা থেকে বেশ বলা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগুলিতেও যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হতেন অর্থাৎ যুদ্ধ কিংবা বিপৎকালীন সময়ে অন্তত যিনি সর্বেসর্বা হয়ে উঠতেন, সেই রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করতেন যাঁরা, তাঁরা কিন্তু একেবারে সাধারণ লোক নন। তাঁরা হলেন একেকটি ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রধান, যাঁরা বহুকাল ধরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত। আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে এইখানেই যা তফাৎ। কিন্তু সঙ্গে এটুকুও ভেবে রাখবেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রেও অর্থাৎ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং ভারতবর্ষেও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য ভোট কবে থেকে চালু হয়েছে? তদুপরি শতেক কায়দায় 'ইলেকটোরাল রোল' তৈরি করেও সমগ্র দেশে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কতজন ভোট দেন—তাও লক্ষ করবেন।

যাক গে, আধুনিক গণতন্ত্রে যা ইচ্ছে হোক, সেকালের সাধারণতন্ত্রগুলির কথা মনে রেখে পরবর্তীকালে গুপ্তরাজার নবরত্নের এক রত্ন অমর সিংহ তাঁর শব্দকোষে দুই কিসিমের গণরাজ্যের কথা বলেছেন—রাজন্যক-গণ আর রাজক-গণ। রাজন্যক-গণে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট পরিবার প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় বংশজদের মধ্যে। আর রাজক-গণে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পরিবার নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে।

প্রাচীন কালের গণতন্ত্র বুঝতে গিয়ে রাজন্য-রাজকের কূট কচালিতে আমি এই প্রবন্ধকে বেশি গুরুভার করতে চাই না। আমরা শুধু এটুকু জানাই যে, সেকালের ভারতবর্ষে জনসাধারণেরা রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের পার্থক্য বেশ বুঝত। বিশেষত আধুনিক গণতন্ত্রেই যেখানে 'অলিগার্কিক্যাল' ঝোঁক সবসময় আছে, সেখানে ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজন্যবর্গের শক্তির বিন্যাসটাও যে খোদ রাজতন্ত্রের থেকে আলাদা অথবা কিঞ্চিৎ সুখপ্রদ—সেটা তখনকার পাবলিকও বুঝত। বৌদ্ধ গ্রন্থ অবদান শতকে দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধ তখনও বেঁচে, এবং সেই সময় উত্তর ভারতের মধ্যদেশ থেকে কিছু ব্যবসাদার দাক্ষিণাত্যে গেছে। তারা উপস্থিত হল দক্ষিণ দেশের রাজা মহাকপফিণের সামনে। রাজা বললেন—বাপু হে! তোমরা যেখানে থাক, সেখানকার রাজা কে? বণিকেরা বলল—আমরা সবাই যারা এখানে এসেছি, তাদের সবার দেশ তো একরকম নয়, মহারাজ! আমাদের কারও রাজ্য গণের অধীন, আবার কারও বা রাজার অধীন—দেব কেচিদ্দেশা গণাধীনাঃ কেচিদ্‌রাজাধীনা ইতি।

এইরকম গণাধীন রাজ্যের পরিচয় অনেকগুলি পাওয়া যাবে প্রাচীন ইতিহাসে। সেই সব রাজ্যের নাম কিন্তু সংশ্লিষ্ট গণের নামেই চলত। কেউ ক্ষুদ্রক, কেউ মালব, কেউ বা যৌধেয়, কেউ বা মদ্রক। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধশাস্ত্র এবং অন্যান্য তথ্যপঞ্জি ঘেঁটে পণ্ডিত জয়সোয়াল অন্তত একাশিটা 'রিপাবলিকে'র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তার অনেকগুলিই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের কুটিল তথ্য প্রমাণে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলি প্রজাতন্ত্রের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা খুব কঠিন। যেমন ধরুন—ক্ষুদ্রক মালবেরা। এঁরা থাকতেন চেনাব এবং রবি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার যখন বালুচিস্তানের পথ ধরেছেন ফিরে যাওয়ার জন্য তখন এই ক্ষুদ্রক মালবদের সঙ্গে তাঁর দেখা। এদের পাশেই ছিল শিবিদের প্রজাতন্ত্র। দিওদোরাস পরিষ্কার লিখেছেন—এদের কোনও রাজা ছিল না, রাজ্যের কাজ যা হত সবই করত নাগরিকেরা। ক্ষুদ্রক মালবের একাংশ অর্থাৎ মালবের একটি দুর্গ আক্রমণ করে আলেকজান্ডার প্রায় মরতে বসেছিলেন, এবং ক্ষুদ্রক-মালব্যদের সৈন্যসমাবেশ দেখে কার্টিয়াস লিখেছেন The Macedonians lost their heart at the prospect of meeting this army.। এরপরে যদিও দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রক মালবদের একশোজন বড় মানুষ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছেন আলেকজান্ডারের কাছে, তবু তাদের ভাবভঙ্গি মোটেই বিজিতদের মতো লাগে না। অনেকে তো মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির উদাহরণ দিয়ে বলেন—খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ শতাব্দীতে এক বৈয়াকরণের কাছেও ক্ষুদ্রকদের জেতার কথাটা এত স্মরণীয় হয়ে আছে যে, ব্যাকরণের সূত্র বোঝানোর জন্য তাঁকে লিখতে হয়েছিল—ক্ষুদ্রকেরা একাই জিতে নিয়েছিল—একাকিভিঃ ক্ষুদ্রকৈ র্জিতম। মুশকিল হল ক্ষুদ্রকেরা কাদের জিতে নিয়েছিল—সে কথা পতঞ্জলি বলেননি। এইখানে আমরাও বিপদে পড়েছি।

কিন্তু কার্টিয়াস ওদিকে লিখছেন—আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রক-মালবদের যে

যৌথবাহিনী আক্রমণ করেছিল, তার সেনাপতি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ক্ষুদ্রক।

যা হোক আপনারা শুধু এইটা খেয়াল করুন—যারা গ্রিক নায়কের সঙ্গে হাত মেলাতে গেল, তারা কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে ক্ষুদ্রক এবং মালবদের যৌথ প্রতিনিধি। একজন নয়, দুজন নয়, পঞ্চাশ একশো এবং তারা কারা? আরিয়ানের জবানীতে—Leading men of their cities and their provincial governors, আলেকজান্ডার দারুণ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন—সোনার আসনে বসে মহার্ঘ পাত্রে দামি সুরার অভ্যর্থনা। গ্রিক লেখকদের লেখায় দেখা যাচ্ছে—আলেকজান্ডার অনেক ভারতীয় রাজ্যই দেখেছিলেন, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম ভারতে—যারা মূলত প্রজাতন্ত্রী ছিল, রাজতন্ত্রী নয়। ঐতিহাসিকেরা আবার এমন কতগুলি সাধারণতন্ত্রের নাম করছেন—যেগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে পরিচিত—যেমন ধরুন—অর্জুনায়ন, যৌধেয় ইত্যাদি। অর্জুনায়নেরা রাজত্ব করত আগ্রা-জয়পুর অঞ্চলে। তারা নিজেদের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর বলে মনে করত এবং টাকা ছাপাত নিজেদের গণের নামে, কোনও রাজার নামে নয়। কোন রাজ্য জয় করে মহোল্লাসে তারা মুদ্রায় অঙ্কিত করেছিল—অর্জুনায়নদের জয় হয়েছে—অর্জুনায়নানাং জয়ঃ। 'অর্জুনায়ন' শব্দটা খুব যত্ন করে মনে রাখবেন। এই শব্দটা আমাদের আরেক কাজে লাগবে।

অর্জুনায়নদের যেমন দেখলেন, তেমনই ছিলেন যৌধেয়রা, অবশ্য তাদের রাজ্যটা ছিল আরও অনেক বড়—ওদিকে লুধিয়ানা থেকে এদিকে দিল্লি পর্যন্ত। এদের যে মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাতে এরা শুধু এইটুকু খোদাই করে তুষ্ট হয়নি যে, 'যৌধেয় গণতন্ত্রের জয় হয়েছে—যৌধেয়গণানাং জয়ঃ; উপরন্তু একটি মুদ্রায় পরিষ্কার করে তারা উৎকীর্ণ করেছে—'যৌধেয় দেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর জয় হয়েছে'—যৌধেয়ানাং জয়ঃ মন্ত্রধরানাম্। এর থেকে বড় কথা আর কী হতে পারে। রাজা নয়, সম্রাট নয়, একেবারে সমবেত মন্ত্রিসভার জয় হয়েছে।

এতক্ষণ যে সব প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের নাম উল্লেখ করলাম, তাতে মনে হতে পারে যে, ওই ধরনের প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের অবস্থিতি শুধু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশগুলিতেই ছিল। ঘটনা কিন্তু তা নয়। মনে আছে নিশ্চয়ই সেই মধ্যদেশীয় বণিকটির কথা, যে বলেছিল—আমাদের কারও রাজ্য গণাধীন, কোনটা বা রাজার অধীন। এটাও নিশ্চয়ই মনে আছে—বুদ্ধ তখনও বেঁচে। বুদ্ধ যখন বেঁচে ছিলেন সেই সময়ে তাঁর নিজের রাজ্য তো বটেই, অর্থাৎ শাক্যরা তো বটেই এবং তার পাশাপাশি লিচ্ছবিদেশ, মল্লদেশ এবং বিদেহ—এইসব রাজ্যেই সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সব মিলিয়ে এই চার রাজ্যের সম্পূর্ণ জায়গাটা হবে হয়তো ২০০×১০০ বর্গমাইল অর্থাৎ পূর্বে দ্বারভাঙ্গা থেকে পশ্চিমে গোরখপুর আর দক্ষিণে গঙ্গার পার থেকে উত্তরে একেবারে হিমালয় পর্যন্ত। শাক্যরা রাজত্ব করতেন মোটামুটি গোরখপুরের খানিকটা জুড়ে।

বুদ্ধ এই শাক্য গণতন্ত্রের জাতক এবং তাঁর পিতা শুদ্ধোদনই ছিলেন গণরাজ্যের

রাষ্ট্রপতি। সাধারণভাবে এই শাক্য গণতন্ত্রীদের ছোট্ট রাজ্যটি কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং বুদ্ধের জীবৎকালেই এই রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করেন কোশল রাজ্যের রাজা। কেউ কেউ বলেন—বুদ্ধের আমলে বুদ্ধেরই এই জ্ঞাতিভাই ভদ্দীয় ছিলেন শাক্যগণের রাজা বা রাষ্ট্রপতি। অবশ্য 'রাজা' শব্দটি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই কেননা, আমরা আগেই বলেছি এবং পরেও বলব যে, রাজা শব্দটা নেহাতই গণমুখ্যের পরিচায়ক। শাক্যদের শাসন এবং বিচার বিভাগীয় কাজের নিষ্পত্তি হত কপিলাবস্তু রাজধানীর সংসদে, যার নাম ছিল 'সন্থাগার'—কেউ বলেন সংস্থাগার অথবা সংখ্যাগার। অধ্যাপক রিজ ডেভিডস লিখেছেন যে, ওই সংসদে যুবক এবং বয়স্কেরা সবাই অংশ নিত। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—অম্বষ্ঠ যখন নিজের প্রয়োজন জানাতে কপিলাবস্তু গিয়েছিলেন—তখন তাঁকে ওই সংস্থাগার অর্থাৎ সংসদে যেতে হয়েছিল। একইভাবে মল্লগণের যে সংস্থাগার ছিল, সেইখানেই বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে যেতে হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ সরকারিভাবে জানানোর জন্য। দুই সময়েই সংসদের 'সেশন' চলছিল। সবাই মিলে সংসদভূমি সংস্থাগারে এসেই যে গভীর বিষয়ের মীমাংসা করতে হত—একথা বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর থেকেও প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে—রাজা শুদ্ধোদন সমস্ত শাক্যর সঙ্গে বসে মীমাংসা চালাচ্ছেন—অর্থাৎ 'সেশন' চলছে—সর্বং শাক্যগণং সন্নিপত্যৈব মীমাংসতে রাজা শুদ্ধোদনঃ....শাক্যগণেন সার্ধং সংখ্যাগারে নিষণ্ণো' ভূৎ।

শাক্যদের গণতন্ত্রের কথাটা অনেক পন্ডিত মানতে চান না। আসলে কোশল রাজ্যের প্রভুত্ব শাক্যগণের মাথার ওপর থাকার ফলে তাদের শাসন-ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের মিশ্রক্রিয়া বর্ত্তমান। কিন্তু মহামতি বুদ্ধ যে গণরাজ্যের বিচার আচার ভালরকম জানতেন সেটা নিয়ে বিবাদ করার সাহস অনেকেরই নেই। নিজের রাজ্য ছাড়াও লিচ্ছবি, মল্ল, বিদেহ—এইসব প্রজাতন্ত্রী রাজ্যে চিরকাল তাঁর যাতায়াত ঘটেছে, এবং অনেকে বলেন—গণতন্ত্রী রাজ্যের সংসদীয় আদব-কায়দা তিনি পুরোপুরি চালু করেছিলেন বৌদ্ধ-সংঘগুলির মধ্যে। একটা জিনিস জানবেন—'সংঘ' কথাটাই মূলত একটা গণের দ্যোতক, কৌটিল্য সংঘ কথাটা ব্যবহার করেছেন 'করপোরেশন' অর্থে। রাজনৈতিক সংঘ বা গণের ক্রিয়াকানুন বুদ্ধ লাগিয়েছিলেন—ধর্মসংঘের কাজে। একটা ঘটনা বলি।

মগধের রাজার রাষ্ট্রপাল বুদ্ধের কাছে এলেন মগধ-রাজের দূত হয়ে। তাঁর বক্তব্য-মগধরাজ বজ্জি, লিচ্ছবি এবং বিদেহের গণরাজ্যগুলি আক্রমণ করতে চান। তিনি এ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের পরামর্শ চান। বুদ্ধ রাজদূতকে কিছুই বললেন না। তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, যদিও সব কথাই তিনি সেই রাজদূতকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন। বুদ্ধ বললেন—আনন্দ!.তুমি তো জান—বজ্জিরা প্রায়ই সবাই মিলে একসঙ্গে সংসদে অধিবেশন করে। আনন্দ বললেন—জানি।

অন্য কথার আগে বজ্জি জায়গাটার একটা পরিচয় দরকার। বজ্জি অর্থাৎ পাণিনি যাকে বলেছেন বৃজি—সেই বজ্জি এদিকে গঙ্গার উত্তর পার থেকে আরম্ভ করে নেপালের পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে। পশ্চিমে গণ্ডক নদী আর পূর্বে কোশী-মহানন্দার মেখলা। অন্তত আটটি গণের প্রতিনিধিত্ব ছিল এই গণরাজ্যে। পুরাতন বৈদেহ এবং লিচ্ছবিরাও এই গণের মধ্যেই পড়ত। পরে অবশ্য তাদের গণরাজ্য আলাদা হয়ে গেছে। লিচ্ছবিদের সঙ্গে বৈশালী নগরীর যেমন চিরন্তন যোগাযোগ, তেমনটি না হলেও বৈশালী বজ্জিদেরও ভারী পছন্দের জায়গা ছিল। এখনকার মুজফ্‌ফরপুরের বেসরই যে সেকালের গণতন্ত্রের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র বৈশালী—একথা এখন কে ধারণা করবে? মোট কথা এই 'স্বর্গোপমা', 'সুরম্যা' নগরীর সমস্ত সুযোগ যেমন লিচ্ছবিরা পেত, তেমনই বজ্জিরাও পেত। বুদ্ধ এবার সেই প্রজাতন্ত্রী বজ্জিদের সংবিধান আউড়ে গেলেন প্রায়, যাতে সেই রাজদূত শুনতে পান। বুদ্ধ বললেন—

আনন্দ! যতদিন বজ্জিরা তাদের সংসদে বারবার মিলিত হয়ে পূর্ণ অধিবেশন করবে—যতদিন তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে মিলিত হবে, ঐকমত্যের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে বজ্জি রাজ্যের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম—বজ্জি করণীয়ানি—চালিয়ে যাবে—যতদিন তারা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান অনুযায়ী চলবে এবং যতদিন তারা সেই বিধিবিধান বাতিল না করে, এবং যতদিন তারা বজ্জিদের চিরন্তন প্রথায় চালিত নিয়ম-কানুন অনুসারেই চলবে—যতদিন তারা তাদের মেয়েদের অন্যায় জোর খাটিয়ে বেঁধে না রাখবে অথবা কন্যাহরণ ইত্যাদি না করবে—এবং যতদিন তারা অভিজ্ঞ বজ্জি-বৃদ্ধদের সম্মান করবে এবং তাঁদের কথা শুনবে—ততদিন বজ্জিদের কোনও ধ্বংস নেই, তারা উন্নতিই করে যাবে।

এর মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত কথাও দু-একটা ছিল, সেটা আমরা বাদ দিলাম। কিন্তু যেটুকু শুনলাম, তাতে এটা বেশ বোঝা যায় যে, বজ্জিরা যে কোনও গভীর বিষয়ের মীমাংসায় একত্রিত হত এবং পূর্ব-প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে চলত। মেয়েদের ব্যাপারেও তাদের ভাবনা-চিন্তা খুবই আধুনিক। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হল যে, বজ্জিদের সম্বন্ধে কথাগুলি বলেই বুদ্ধ নিজের সংঘকে সেই একই কথাগুলি বললেন, যা তিনি বলেছিলেন বজ্জিদের সম্বন্ধে। এও বললেন যে, পূর্বপ্রবর্তিত বিধি-নিয়ম অনুসারে চললেই তার বৌদ্ধ সংঘগুলি চলবে; নইলে নয়।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—বৌদ্ধ সংঘে যে গণতান্ত্রিক নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, তা বুদ্ধের সমসাময়িক কালে প্রচলিত গণরাজ্যের নিয়ম-কানুন অনুসারেই তৈরি হয়েছিল। দু-একজন পণ্ডিত অনেক যত্ন করে বৌদ্ধ সংঘগুলির কার্যাবলী উদ্ধৃত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে—সংঘে এক একটা বিষয় আলোচনা করার জন্য রীতিমত 'মোশন' আনা হত, যাকে তাঁরা বলছেন, 'ঞত্তি' এবং এই 'মোশন' আনা হত 'রিসোলিউশন' বা 'প্রতিজ্ঞা'র জন্য। যাঁরা 'রিসোলিউশন' সমর্থন করতেন, তাঁরা চুপ করে থাকতেন, আর যাঁরা সমর্থন না করতেন, তাঁরা কথা বলতেন। 'মোশনে'র বিষয়টা চেঁচিয়ে বলা হত

অন্তত তিনবার। তারপর আলোচনা এবং শেষে 'কোরাম'। বৌদ্ধসংঘে যে কোনও বিষয়ের আলোচনায় অন্তত কুড়িজন লোক না থাকলে 'কোরাম' হত না। হয়তো এই কথা স্মরণে রেখে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে খ্রিস্টপূর্ব দেড়শো শতাব্দীতে লিখতে হয়েছে—বিংশিকঃ সংঘ। যদি কোনও অধিবেশনে 'কোরাম' না হত, তাহলে পরের অধিবেশনে যাতে 'কোরাম' হয়, তার জন্য একজন সদস্যকে 'হুইপে'র মতো কাজ করতেও দেখা যায়। সে বলে—গণপূরকো বা ভবিষ্যামি—সাহেবদের অনুবাদে যা দাঁড়ায়—'Or I will help to complete the quorum'.

পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূক্ষ্ম গণতান্ত্রিক বিচার-বিবেচনা যদি বুদ্ধের সমসাময়িক কালে রাজনৈতিক স্তরে প্রচলিত না থাকত, তাহলে বৌদ্ধ সংঘগুলিতে এত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হতে পারত না। রকহিল সাহেব তো বুদ্ধের জীবনী লিখতে গিয়ে স্বয়ং শাক্যদের গণতান্ত্রিক ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে, তাঁর মনে হয়েছে—গভীর কিছু বিষয়ে শাক্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভোটাভুটির চিন্তাও বাদ দিতেন না। কোশলের রাজা যখন শাক্যদের রাজ্য আক্রমণ করে তাদের খুব কাবু করে ফেললেন, তখন আত্মসমর্পণ নিয়ে শাক্যদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ হল। কোশলের রাজা বলে পাঠালেন—'আপনাদের সঙ্গে আমার মিত্রতাও নেই, শত্রুতাও নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। আপনার দুর্গের দুয়ার খুলে দিন।' শাক্যরা হেরে গেছে--সেই অবস্থাতেও ঠিক করল যে, ওই বিষয়ে সবাই মিলে আলোচনায় বসতে হবে, এবং সেখানেই ঠিক হবে—দুর্গদুয়ার খোলা হবে কিনা। তারপর তারা সমবেত আলোচনায় বসল এবং মতান্তর দেখা গেল। কেউ বলে দরজা খুলে দাও, কেউ বলে—মোটেই না, খুলো না। তখন কয়েকজন বলল—মতান্তর যখন হচ্ছে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠের মত কী—সেটা জানা দরকার। Rockhill লিখেছেন—So they set about voting on the subject.

ভোটে দরজা খুলে দেওয়ার কথাই ঠিক হল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ভোটাভুটি, 'মেজরিটি', 'কোরাম'—এত যাদের জানা ছিল, সেখানে আজকের মতো সর্বজনীন ভোটাধিকার না থাকলেও প্রাচীনদের কিছু কিছু গণরাজ্যে ব্যক্তি-মতের প্রাধান্য ছিল। প্রাধান্য ছিল এতটাই যে, কোনও ব্যক্তি বাইরে থেকে এসেও একটি গণরাজ্যের নাগরিক হিসেবে নিজের রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করতে পারত—যা অন্য কোনও রাজ-শাসিত অঞ্চলে সম্ভব ছিল না। একটা ঘটনা বলি। কিন্তু মনে রাখবেন, এ ঘটনা ঘটতই না, যদি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এর প্রতিরূপ না থাকত। মূলসর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের একটি গ্রন্থে এই ঘটনা পাওয়া যাবে।

ছয়

বিদেহ দেশের অগ্রামাত্য অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খণ্ড, যদিও সে রাজ্যে মন্ত্রী ছিলেন আরও অনেকে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খণ্ডের মর্যাদা এতই বেড়ে যাচ্ছিল যে অন্য মন্ত্রীরা তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা রাজার কাছে গিয়ে বললেন—মহারাজ!

রাজা কে, খণ্ড না আপনি? আসলে খণ্ডই রাজ্য চালাচ্ছে। দেখবেন—আপনাকে না আবার উলটে দিয়ে পাগড়ি বেঁধে নিজেই সিংহাসনে বসে পড়ে। রাজা চিন্তিত হলেন এবং খণ্ডের ওপর লক্ষ রাখতে আরম্ভ করলেন। যদিও আশঙ্কার কিছুই ছিল না, তবুও শত শত প্রার্থী পরিবৃত, ক্ষুদ্র রাজাদের দ্বারা তৈলাক্ত খণ্ডকে দেখে রাজার ভাল লাগল না। কারণ রাজারা কাকের মতো শংকাপ্রধান। ওদিকে অন্যান্য লোকের মাধ্যমে খণ্ডও জানতে পারলেন যে, রাজা সন্দেহ করছেন তাঁকে। খণ্ড এবার রাজ্য ছেড়ে, প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভাবলেই তো আর হল না, যাবেন কোথায়? খণ্ড ভাবলেন—"যদি শ্রাবস্তীতে যাই, তাহলে এই একই হাল হবে, কেননা সে রাজ্যটাও বিদেহ রাজ্যের মতো একক রাজার অধীন। যদি বারাণসী, রাজগৃহ কি চম্পায় যাই, সে সব জায়গাতেও ওই একই অবস্থা।" এবারে খণ্ডের মাথায় এল বৈশালীর কথা, তিনি ভাবলেন—একমাত্র বৈশালীতেই যাওয়া যেতে পারে, কারণ বৈশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেখানে যদি দশজন একটা মত সমর্থন করে—তো বিশজন তার বিপক্ষে যায়। অতএব বৈশালীতেই যাব—যদ্ দশানাম্ অভিপ্রেতং তদ্ বিংশতীনাং নাভিপ্রেতম্। সর্বথা বৈশালীং গচ্ছামি।

এই কথা ভেবে খণ্ড বৈশালীতে দূত পাঠালেন, সেখানে গণরাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল লিচ্ছবিরা—যে লিচ্ছবিরা একটা চিঠি লিখতে গেলেও লিখত—আমরা বৈশালীর লিচ্ছবিদের মত অনুসারে জানাচ্ছি—বৈশালকণাং লিচ্ছবীনাং বচনেন। খণ্ড লিখলেন—আপনাদের বাহুচ্ছায়ায় থাকতে চাই, তাই আপনাদের ওখানেই চলেছি। লিচ্ছবিরা জানালেন—স্বাগতম্। খণ্ড চলে এলেন। ওদিকে যখন যেমন বৈশালক লিচ্ছবিদের গণের অধিবেশন বসতে লাগল। খণ্ডকে তাঁরা একদিন ডাক লেন—। সংসদে সবাই একত্রিত হয়েছে, আপনি আসেন না কেন? খণ্ড বললেন—একসঙ্গে অনেক লোকের একটি জোটের সঙ্গে ছিলাম বলেই আমার যত ঝামেলা হয়েছে। আমি আর বহু লোকের সম্মেলনের মধ্যে নেই। বৈশালক লিচ্ছবিরা বলল—সমস্ত লোক এক জায়গা হলে তোমার ব্যক্তিগত কোনও ঝামেলা হতে পারে না—খণ্ড, সন্নিপাতে কো'ত্র আদীনবো ভবিষ্যতি। এই কথা শুনে খণ্ড বৈশালকদের অধিবেশনে যেতে আরম্ভ করলেন কিন্তু কোনও ব্যাপারেই তিনি কোনও মত দেন না। বৈশালক লিচ্ছবিরা বলল—এ কী কথা খণ্ড! কোনও ব্যাপারেই তো আপনি মত দেন না। খণ্ড বললেন—মত দিয়েছিলাম বলেই তো আমার পূর্বে ঝামেলা হয়েছিল। লিচ্ছবিরা বলল—কোনও ঝামেলাই নেই, আপনি আপনার মত প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রকাশ করবেন। এবার খণ্ড মত দিতে আরম্ভ করলেন—স চ নিগমে সংনিপততি মতং চানুপ্রযচ্ছতি।

খণ্ড ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত গুণী মানুষ। ফলে তিনি যখন লিচ্ছবিদের অধিবেশনে মত দিতে লাগলেন, তখন থেকে লিচ্ছবিদের ভাবনাচিন্তা আরও উন্নততর হতে থাকল, ঠিক যেমন আধুনিক গণতন্ত্রে গুণী এবং উপযুক্ত সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে

এবং বাগ্মিতায় সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়ে, সেই রকম। পূর্বে বৈশালক লিচ্ছবিদের সরকারি চিঠি-চাপাটির ভাষা ছিল অত্যন্ত কর্কশ এবং রূঢ়। কিন্তু যখন থেকে খণ্ড তাঁর মতামত দিতে থাকলেন, তখন থেকে সেই ভাষায় মার্জনা এল, ভদ্রতা এল। অন্য দেশীয় এবং স্বদেশীয় শাসনাধিকারীরা এই পরিবর্তনটা বুঝতেও পারল।

এইভাবেই চলছিল। তারপর একসময়ে বৈশালীর সেনাপতি মারা গেলেন। বৈশালকদের সবার অনুমতিক্রমে খণ্ডকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। বেশ কিছুদিন সেনাপতিত্ব করে খণ্ডও মারা গেলেন। লিচ্ছবিরা আবার সবাই মিলে অধিবেশনে বসল—বৈশালকো গণঃ সংনিপতিতঃ। অ্যাজেন্ডা—কাকে সেনাপতি নিয়োগ করা যায়। বেশ কিছু সংসদ সদস্য বললেন—খণ্ড এতদিন এই গণতন্ত্রের সেবা করেছেন। অতএব তাঁর ছেলেকেই সেনাপতিত্ব দেওয়া হোক। অন্যেরা বলল—খণ্ডের বড় ছেলে, যার নাম গোপ—সে মোটেই সুবিধার লোক নয়। তাকে সেনাপতিত্ব দিলে এই গণতন্ত্রের মূল সংহতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য খণ্ডের ছোট ছেলে—যার নাম সিংহ—সে সবারই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং এই বৈশালকগণকেও সে খুশি করতে পারবে। সবাই একথায় রাজি হলেন—সর্বেষাম্ অভিরুচিতম্। এই 'ইউন্যানিমাস ডিসিশন' সিংহকে জানানো হল। সিংহ বললেন—আমার বড়ভাই বর্তমান! অতএব সেই গোপকেই আপনারা সেনাপতি করুন। বৈশালকরা সঙ্গে সঙ্গে জানাল—আমাদের এখানে সেনাপতির পদটি বংশানুক্রমে আসে না, জনগণের হয়ে বৈশালক গণতন্ত্র যাকে সেনাপতি মনোনীত করবে, তিনিই সেনাপতি হবেন। আপনার যদি এতে অমত থাকে তো অন্য কাউকে আমরা সেনাপতি নিযুক্ত করব—সিংহ! ন যুষ্মাকং কুলক্রমাগতং সেনাপত্যং, যো গণস্যাভিরুচিতঃ স সেনাপতি র্ভবতি। যদি ভবতো নাভিরুচিতং বয়মন্যং সেনাপতিং স্থাপয়াম ইতি।

দেখুন—বৌদ্ধ-গ্রন্থের এই কাহিনি আর আমি বাড়াতে চাই না। বাড়ালে গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ আরও জানা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্য—সংসদীয় পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য—যেটাকে আমরা খুব বড় বলে মনে করি তার একটা পূর্বকল্প প্রাচীন ভারতের কোথাও কোথাও ছিল। এখনকার দিনে যেসব গণতান্ত্রিক শব্দ আমরা প্রতিনিয়তই শুনতে পাই—মেজরিটি, ভোটাভুটি, কোরাম—এগুলোর অল্পস্বল্প কোথাও কোথাও যদি থেকে থাকে, তাহলে শুধু 'পার্টিবাজি' ব্যাপারটা ছিল না—এটা বিশ্বাস করা আমার মতো লোকের পক্ষে কঠিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গণতন্ত্রের পার্টিবাজিও একভাবে আমাদের দেশে ছিল। কিভাবে ছিল—তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

খানিকক্ষণ আগে আমি আপনাদের 'অর্জুনায়ন' শব্দটা স্মরণে রাখতে বলেছিলাম। আমার তো ধারণা—এরা একটা দল, যারা অর্জুনের নামে নিজেদের নামকরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন ইন্দিরা গান্ধীর নামে ইন্দিরা কংগ্রেস। আপনারা বলবেন—ওই একটা নামে কি আর গণতন্ত্রের পার্টির কথা প্রমাণ হয়ে যায়? আমরা বলব—প্রমাণ

আছে আরও, একে একে দাখিল করছি। ব্যাকরণের সূত্রকার পাণিনির একটি সূত্র আছে—'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্।' এই সূত্র অনুসারে বাসুদেব এবং অর্জুন শব্দের সঙ্গে 'বুন্' প্রত্যয় হবে এবং সেই প্রত্যয়ের ফলে শব্দগুলি হবে—বাসুদেবকঃ এই সূত্রের জোরে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেন যে, পাণিনির পূর্বকালেই কৃষ্ণ ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন এবং তখনই তাঁর ভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

ধর্মের কথা যখন বলব, তখন না হয় এ মত মেনেই নেব। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠবে—কৃষ্ণ বাসুদেবের না হয় ভক্ত-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই অর্থে অর্জুন আবার ভগবান হলেন কবে, আর তাঁর ভক্তদের অস্তিত্বই বা কবে কোথায় ছিল? আমাদের অনুমান—এ ভক্তি হল রাজনৈতিক ভক্তি, যে ভক্তি প্রত্যেক দলনেতার প্রতি দলীয় কর্মীদের থাকে। বিশেষত সেই নেতা যদি এমন লোকোত্তর চরিত্রের হন যে, সারা ভারত জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি আছে, সেক্ষেত্রে জনমানসে তাঁর প্রভাব দেবতার মতোই হয়। আধুনিক গণতন্ত্রে এরকম নেতা আমরা অনেক দেখেছি। তাই 'বাসুদেবক' বলতে আমরা বাসুদেবের দল বুঝি, অর্জুনক বলতে বুঝি অর্জুনের দল, একটু আলাদা করে যাদের অর্জুনায়নও বলা যায়। বলা যেতে পারে—ভক্তি শব্দটায় দেবতার প্রতি ভক্তি না বুঝে আমরা যে রাজনৈতিক ভক্তি বুঝে নিচ্ছি—এটা পাণিনির ওপর অবিচার হয়ে যাচ্ছে না কি? আমাদের বক্তব্য—খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম/ চতুর্থ শতাব্দীতে শুষ্করুক্ষ পাণিনি ফুল-বেল-তুলসীপাতায় এত গদগদ ছিলেন না যে, ভক্তি বলতে তিনি শুধু দেবতার প্রতি ভক্তি বুঝতেন। ভক্তি শব্দ তাঁর কাছে অত্যন্ত সাধারণ—ভজনা করলেই ভক্তি, সেবা করলেই ভক্তি, সে যাকেই ভজনা কর অথবা সেবা কর। 'ভক্তি' বলেই পাণিনির একটি সূত্র আছে, যার উদাহরণে মথুরা দেশের প্রতি ভক্তি থাকলে একটা লোককে 'মাথুর' বলা হবে, এবং রাষ্ট্রের ওপর ভক্তি থাকলে বলা হবে 'রাষ্ট্রিয়'। বলতে পারেন—এতে তো দেশভক্তি বোঝা গেল, কিন্তু রাজনৈতিক ভক্তি? পাণিনি বৈয়াকরণ; দেশে কালে তিনি যা দেখেছেন, তাই ধরেছেন। তিনি পরের সূত্রে লিখেছেন—মহারাজের প্রতি যার খুব ভক্তি আছে, তাকে বলা হবে 'মহারাজিক'। এতে বোঝা যাচ্ছে নেতা কিংবা রাজার প্রতি ভক্তির আতিশয্যটা পাণিনি বেশ বুঝতেন, তাই ঠিক তার পরের সূত্রেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন গণনেতার প্রতি ভক্তির ব্যাপারটা—বাসুদেবক, অর্জুনক।

অর্জুনের সমসাময়িক কালে অর্জুনের অনুগত ব্যক্তিরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল—ইতিহাস তার খবর দেয়নি, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের দেশে বাসুদেবক দলের যে ভালরকম প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ আমরা দেব। সেই সঙ্গে কথা আসবে তাঁর বিরুদ্ধে দলগুলিরও, যারা তাঁকে ঝামেলায় ফেলত।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ করেছেন সংঘমুখ্য বলে। বস্তুত কৃষ্ণ যে অঞ্চলের বাসিন্দা, সেই মথুরা-দ্বারকা অঞ্চলে কৃষ্ণের আগে থেকেই বিভিন্ন রাজপরিবারের প্রতিনিধিত্বে প্রজাতান্ত্রিক রাজত্ব চলত। কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টি যে সব রাজ

পরিবারের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা কেউ ছিলেন ভোজ, কেউ যাদব, কেউ অন্ধক আবার কেউ বৃষ্ণি। আজকের গণতন্ত্রেও যেখানে আমরা কোনও নেতাকে যাদব-নেতা, জাঠ-নেতা বলে মেনে নিচ্ছি, তেমনই সেইকালে মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—যাদবেরা, কুকুরবংশীয়রা, ভোজেরা এবং সমস্ত অন্ধক-বৃষ্ণি তোমাকে নেতা বলে মানে, তোমাকেই ভালবাসে—যাদবাঃ কুকুরাঃ ভোজাঃ সর্বে চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ। ত্বয্যাসক্তা মহাবাহো . . .। কিন্তু এই শ্লোকে কৃষ্ণকে যাদব-ভোজ অথবা অন্ধক-বৃষ্ণিদের যত বড় নেতাই বানানো হোক না কেন, তাঁর প্রতিপক্ষীয় নেতারাও ছিলেন অনেকে, যাঁরা ওই একই যাদব-ভোজ বা অন্ধক-বৃষ্ণিদের একাংশের সক্রিয় পক্ষপাত লাভ করেছেন।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধবাদী গণনেতাদের খবর মহাভারত থেকে পরে দেব, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের যে এক একটা পার্টি ছিল তার পরিচয় পাবেন পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। বর্গ শব্দটার মানে তিনি ধরেছেন 'পার্টি' এবং উদাহরণে বলছেন যেমন অক্রূরের 'পার্টি' বুঝতে লিখতে হবে 'অক্রূরবর্গ্যঃ' অথবা 'অক্রূরবর্গীণঃ'। পতঞ্জলি উলটো পার্টির উদাহরণ দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। বলছেন—বাসুদেবের 'পার্টি' অর্থাৎ বর্গ বলতে প্রয়োগ হবে 'বাসুদেববর্গ্যঃ' অথবা 'বাসুদেববর্গীণঃ'। অন্ধক—বৃষ্ণিদের গণরাজ্যে অক্রূরের পার্টির হাতে কৃষ্ণ—যাকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলা হয়—সেই কৃষ্ণ যে কত নাকাল হয়েছেন—তা শুনুন স্বয়ং কৃষ্ণের মুখ থেকেই। মুনিবর নারদের কাছে মনের দুঃখ জানিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন—

"তোমাকেই বন্ধু বলে বিশ্বাস করে বলছি নারদ! লোকে বলে আমার এই ক্ষমতা, ওই ক্ষমতা, আসলে কিচ্ছু না, আমি আসলে আমার জ্ঞাতিদের চাকর। ঐশ্বর্যের নামে দাসত্ব করে যাচ্ছি--দাস্যম্ ঐশ্বর্যবাদেন জ্ঞাতীনাং নঃ করোম্যহম্। 'ঐশ্বর্য' কথাটা যদি টাকা-পয়সার হিসেবে ধর তাহলে ওই একই কথা। যা টাকা-পয়সা আসছে আমার নামে—তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হচ্ছে আর অর্ধেক খাচ্ছি আমি। কিন্তু এতেও রেহাই নেই, দিন রাত কথা শুনতে হচ্ছে এর জনা এবং সে সব জঘন্য কথা ক্ষমাও করে দিতে হচ্ছে।"

কথাগুলি খেয়াল করবেন। আমাদের বিশেষ ধারণা—কৃষ্ণ যে সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে কৃষ্ণকে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাজ্যের দেখভাল করতে হচ্ছিল। ফলত আয়ের অর্ধেক পেয়ে অর্ধেক দিয়ে দিলেও, যে অর্ধেক তিনি ভোগ করছিলেন—তার জন্য বিরুদ্ধ-পার্টির কথা শুনতে হচ্ছিল, এবং গণতান্ত্রিক ভদ্রতায় সে সব কথা ক্ষমাও করে দিতে হচ্ছিল। কিন্তু সে কথার জ্বালা এমনই যে, সব সময় তা ঐশ্বর্যশালী কৃষ্ণকেও পীড়িত করছিল। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনার ভার কৃষ্ণের হাতে থাকায় কৃষ্ণের অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর ঘরের লোকদের অবস্থা কী রকম হয়েছিল—তা যেমন এখনকার শাসকদলের মুখ্য বা প্রধান নেতার ঘরের ছবিতে টের পান, ঠিক তেমনটিই পাবেন কৃষ্ণের ঘরে। কৃষ্ণ দুঃখ করে বলছেন—দেখো নারদ।

আমার বড় ভাইকে দেখো—তিনি নিজের ক্ষমতা, বাহুবলে সর্বদাই মেজাজে রয়েছেন, ছোটভাই গদ-কে দেখো—সব সময় সে তার 'ফিগার' নিয়ে ব্যস্ত, আর ছেলে প্রদ্যুম্নকে দেখো—সব সময় নিজের সুন্দর রূপ নিয়ে ব্যস্ত—অথচ আমি কী রকম অসহায়। এই হল আমার ঘরের চেহারা, অন্যদিকে অন্ধক-বৃষ্ণিরা অর্থাৎ যাদের নিয়ে আমায় চলতে হয়—তারা কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত, এবং যখন তখন গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিতে পারে—নিত্যোত্থানেন সম্পন্না নারদান্ধকবৃষ্ণয়ঃ। মনে রেখো নারদ! এরা যাদের পক্ষে নেই, তারা থাকবে না, আর এরা যাদের পক্ষে আছে, তারাই টিকবে। কিন্তু কপাল মন্দ, এমন প্রবল পরাক্রান্ত জনতার সুযোগ আমি কিছু পাই না। পাই না, তার কারণ আহুক এবং অক্রূর এদের 'কন্ট্রোল' করছে। আমি একের পক্ষ নিই বটে, কিন্তু অপরজনকে চটাই না। কিন্তু এখানে হেঁয়ালিটা কী জান নারদ! আহুক আর অক্রূর যার পক্ষে আছে তারও দুঃখের শেষ নেই আবার আহুক আর অক্রূর যার পক্ষে নেই তারও দুঃখের শেষ নেই।

একটু পরিষ্কার করে বলি—আহুক হলেন উগ্রসেন, কংস মারা যাবার পর যিনি অন্ধকবৃষ্ণিদের নামে রাজা হয়েছেন, আর অক্রূর হলেন কৃষ্ণের জ্ঞাতিভাই, যিনি পূর্বে কংসের মন্ত্রিসভাতেও মন্ত্রী ছিলেন। কংস মারা যাবার পর আহুক এবং অক্রূর দুজনেই অন্ধকবৃষ্ণিদের জনতা হাত করে সমান শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণও টিকে আছেন ওই অন্ধকবৃষ্ণিদের জোরেই। কাজেই আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য কখনও আহুকের সঙ্গে হাত মেলাতে হচ্ছে, কখনও বা অক্রূরের সঙ্গে। কিন্তু এঁদের দুজনকে একসঙ্গে হাতে না রাখলে কৃষ্ণ উড়ে যাবেন, আবার যদি একসঙ্গে হাতে রাখেন তাহলে বিপদ বাধে। বিপদ এই—আহুক ভাবেন—কৃষ্ণ অক্রূরের দিকে বেশি ঝুঁকছেন, আর অক্রূর ভাবেন—কৃষ্ণ আহুকের দিকে বেশি ঝুঁকছেন। কৃষ্ণ বলছেন—আমার অবস্থা হল সেই মায়ের মতো—যার দুই ছেলে নিজেরাই জুয়ো খেলে। জুয়াড়ি ছেলে দুটির মা যেমন একজনের জয় চায়, অপরজনের হার চায় না, তেমনই কৃষ্ণও আহুক-অক্রূর—একজনকে হাতে রাখেন অপরজনকে চটান না—একস্য জয়মাশংসে অপরস্য অপরাজয়ম্। আমাদের এখনকার পালার্মেন্টে শাসকদলের কায়দা কানুন দেখলেই কৃষ্ণের রাজনৈতিক ক্ষমতাটা টের পাবেন।

নারদ অনেকক্ষণ কৃষ্ণের কথা শুনে একটু উপদেশ দিলেন। নারদ বললেন—তোমার নিজের দোষেই তোমার এই আহুক-অক্রূরের বিপদ। বলরাম, অক্রূর, আহুক—সবাই তোমার জ্ঞাতি। এরা কেউ টাকার আশায়, কেউ স্বেচ্ছায়, অথবা কেউ উস্কানি খেয়ে তোমার বিরুদ্ধে চলে গেছেন। তাছাড়া যে ঐশ্বর্য তুমি নিজেই অন্যের হাতে দিয়েছ—বমি করা ভাতের মতো—সে ঐশ্বর্য এখন আর তুমি আত্মসাৎ করতে পারবে না। অন্যদিকে বভ্রু এবং উগ্রসেনকে যে রাজ্য দিয়েছ তুমি, সে রাজ্য কেড়ে নিতে গেলেও নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে।

নারদের কথাগুলি আপাতত ধরা যাচ্ছে না বটে, তবে মহাভারত, হরিবংশ এবং

অন্যান্য পুরাণের প্রমাণে এ কথা সপ্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয় যে, নারদ স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে কৃষ্ণ এবং অক্রূরের মধ্যে যে বিরাট বাদ-বিতণ্ডা চলেছিল—তারই প্রসঙ্গ তুলছেন এখানে। সম্যন্তক মণি ঘটনাক্রমে এক সময় অক্রূরের হাতে গিয়েছিল কৃষ্ণের মাধ্যমে। এতে কৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম পর্যন্ত কৃষ্ণের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। এই ঝগড়ার জের কৃষ্ণের বুড়ো বয়স পর্যন্ত চলেছিল, এবং তাতে নানাভাবে তিনি কলঙ্কিত হয়েছিলেন। আমি সবিস্তারে সে সব ঘটনা এখানে আলোচনা করব না, কারণ সম্প্রতি প্রকাশিত "মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ" শীর্ষক গ্রন্থে আমি সেসব কথা সবিস্তারে জানিয়েছি। আপাতত আমাদের যেটা বক্তব্য এবং নারদের যেটা উপদেশ, সেটা হল—সমবেত অন্ধক বৃষ্ণিদের মধ্যে কোনওভাবেই ভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। কেন না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিজেদের মধ্যে ভেদই হল সর্বনাশের কারণ—ভেদাদ্ বিনাশঃ সংঘানাম্। আর কৃষ্ণ নিজেই যেখানে একজন 'সংঘমুখ্য' অর্থাৎ 'পার্টি-লিডার', তাঁর পক্ষে এই ভেদ ডেকে আনা সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক। কাজেই নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধে হলেও কৃষ্ণের মতো মানুষের পক্ষে এ কাজ সাজে না। অতএব কৃষ্ণ এবং অন্ধক-বৃষ্ণিদের গণরাজ্যের পক্ষে যেটা সবচেয়ে জরুরি—তা হল অস্ত্রশস্ত্রহীন শব্দরাশি—মৃদু এবং অনায়াস শব্দরাশি—যা দিয়ে অন্যের জিহ্বা স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। একদিকে ধৈর্য দিয়ে, সহাশক্তি দিয়ে, ঋজুতা এবং মৃদুতা দিয়ে, অন্যদিকে বিরোধীদের কোনও কোনও জায়গায় খুশি করে এবং বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের মাথায় রেখেই বিরোধীদের মূকীভাব সম্পন্ন করা যায়—এটাই নারদের উপদেশ—জিহ্বামুদ্ধর সর্বেষাং পরিমৃজ্যানুমৃজ্য চ।

আমাদের ধারণা—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এর থেকে বড় উপদেশ আর হতে পারে না। 'কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব।' আমাদের আজকের গণতন্ত্র এবং সেকালের গণতন্ত্র ওই একই সুরে বাঁধা। এই যে কৃষ্ণের বিরোধী জ্ঞাতিগুষ্টির কথা শুনলেন, আমাদের গণতন্ত্রে এঁরাই বিরোধী দল। বিরোধী দল কখনও শাসকদলের ঋদ্ধি সহ্য করতে পারে না, এক রাজ্যের উপরাজা যেমন রাজাকে সহ্য করতে পারে না, ঠিক তেমন। বিরোধীরা ঠিক জ্ঞাতির মতো, উপরাজার মতো—মহাভারত বলেছে—উপরাজেব রাজর্দ্ধিং জ্ঞাতি র্ন সহতে সদা। গণতন্ত্রে বিরোধী শক্তি থাকবেই, তাদের সঙ্গে নিয়ে ঋদ্ধির পথে এগোনোটাই গণতন্ত্রের মর্যাদা। রাজ্য পাওয়ার মুহূর্তে মহারাজ যুধিষ্ঠির গণরাজ্যের গতিবিধি ভীষ্মের কাছে শুনতে চেয়েছেন। গণতন্ত্রের নানা সমস্যার মধ্যে যে দুটি বিশিষ্ট বিষয় নিয়ে যুধিষ্ঠির চিন্তিত ছিলেন—তা হল—গণতন্ত্রে এক দলের সঙ্গে আরেক দলের ভেদ এবং মতান্তর; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সবার মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়। দুটি সমস্যা নিয়েই মহামতি ভীষ্ম আলোচনা করেছেন, যা আজও স্মরণীয়।

ভীষ্ম বলেছিলেন—সবচেয়ে সফল গণতন্ত্রের ভিত্তি হল জনগণ এবং নেতাদের জাতি-কুল-মানের সমতা—জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্বে কুলেন সদৃশহাস্তথা। ভারতের মতো বিচিত্র দেশে সত্যি এই সমতা সম্ভব নয়, এবং সমস্ত আধুনিকতার মধ্যে এখনও যেখানে জাতপাতের ভিত্তিতে আমাদের ভোট চিহ্নিত হয়, সেখানে গণতন্ত্রের সাফল্য দাবি করব কোন আহ্লাদে? ভীষ্ম বলেছিলেন—গণরাজ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিস হল নেতাদের লোভ এবং রাগ। শাসক গোষ্ঠী যদি লোভাতুর হন, তখন অপর পক্ষ অবশ্যম্ভাবী ক্রোধাবিষ্ট হয়ে পড়েন—লোভমেকো হি বৃণুতে ততো'মর্ষম্ অনন্তরম। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—গণরাজ্যে শাসক নামে পরিচিত রাজা নামক ব্যক্তিটি যদি লোভী হন, তখন জনগণ ভাবে—এ তো আমাদের কিছুই দিচ্ছে না, তাই তারা ক্রোধাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

আমাদের গণতন্ত্রেও তাই। শাসকগোষ্ঠী যখন ক্ষমতা অধিগত করে, তখন জনসাধারণের বিরোধী প্রতিনিধিরা যে জনগণের সেবা করার জন্য বড় লালায়িত হন—তা মোটেই নয়। কোনও দল প্রশাসনে নিযুক্ত হলে বিরোধী দলেন নেতারা ভাবেন—অন্তত নিন্দুকেরা বলেন যে, বিরোধীরা এইরকম ভাবেন—প্রশাসনে থেকে ব্যাটারা কীরকম লুটছে, কী রকম সুবিধা পাচ্ছে, সরকারি শাসনযন্ত্র নিজের কাজে কিভাবে লাগাচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ভেবেই বিরোধীদের রাগ হয়। দার্শনিক শঙ্করাচার্য ক্রোধের মূল খুঁজতে গিয়ে লিখেছিলেন—আমরা যা চাই, সেটা প্রতিহত হলেই আমাদের রাগ হয়—কাম এব প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে। অতএব এই বিশ্লেষণে বিরোধী গোষ্ঠীর ক্রোধের কারণ যে ওই লোভই, সেটা কে বোঝাবে!

ভীষ্ম বলেছেন—গণরাজ্যে একে অপরকে সবসময় প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করে—প্রকর্ষন্তি ইতরেতরম্ অথবা টেনে নামানোর চেষ্টা করে। ভীষ্ম আধুনিক গণতন্ত্রের চিহ্নিত বিরোধী গোষ্ঠীকে চিনতেন না। তাঁর আমলে শাসকদের মধ্যেই বিরোধীরা থাকতেন এবং তাঁরা চর লাগিয়ে, উলটো পালটা বুঝিয়ে, দরকারে শক্তি প্রয়োগ করে—ক্ষয় করে হোক, ব্যয় করে হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, একে অপরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতেন—ক্ষয়-ব্যয়-ভয়োপায়ৈঃ প্রকর্ষন্তি ইতরেতরম্। এর মধ্যে যদি আবার শাসকদের তরফ থেকে কর বা ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়, তাহলেই বিরোধীদের আরও পোয়া বারো—তখন নাকি আপনিই ভেদ সৃষ্টি হয়। অনেক শক্তিধর মানুষই তখন শত্রুপক্ষের ছত্রচ্ছায়ায় চলে আসে। অতিরিক্ত কর চাপলে বিরোধীরা যে কত সুবিধে পান, তা যে কোনও সময়, যে কোন গণতন্ত্রে লক্ষণীয়। এত দূর যেতে হবে না। কোন গণতান্ত্রিক দেশে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও বাজেট তৈরি হয়নি, যাকে বিরোধীরা দরিদ্র জনগণের সহায়ক বলে মনে করেছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত বিরোধিতা গণতন্ত্রে থেকেই যায়।

ভীষ্ম বলেছেন—একটি গণরাজ্য ভালভাবে চালাতে হলে সমস্ত গণনেতাকে মান দিয়ে চলা উচিত, কেননা গণরাজ্যের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, ভালমন্দ—সবই এই নেতাদের

হাতে। এটা অবশ্যই ঠিক যে, একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জনগণের সঙ্গে বসে নেওয়া সম্ভব নয়—ন গণাঃ কৃৎস্নশো মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ভারত। যুদ্ধ-শান্তি, পর রাজ্য আক্রমণ—ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, তবে তা নেবেন গণ-নেতারা, অন্য কেউ নন। ভীষ্ম আরও একটা দামি কথা বলেছেন এবং সেটা এখনকার বিক্ষুব্ধ গণনেতার সম্বন্ধে খুব খাটে। ভীষ্ম বলেছেন—গণমুখ্যদের মধ্যে যিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে নিজের মত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেন, মুখ্য নেতার মাধ্যমে তার অতি শীঘ্র বিধান করা উচিত—কারণ গণরাজ্যে বহিঃশত্রুদের থেকেও আভ্যন্তর শত্রুর বিপদ অনেক বেশি। এই নীতি এখনও পর্যন্ত চলছে এবং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতাকেও এই নিয়মে শান্তি পেতে দেখি। সত্যি কথা বলতে কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিপদ হল নেতাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা। এই মতভেদ যত সৃষ্টি হবে, ততই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তৈরি হবে আর তাতেই গণরাজ্যের সর্বনাশ। গণতন্ত্র বা গণরাজ্য—যাই বলুন—এর স্থিতিশীলতার একমাত্র লক্ষণ হল সংহিত এবং ঐকমত্য—তস্মাৎ সঙ্ঘাতমেষাং গণানাং শরণং মহৎ।

সাত

আপনারা বলতে পারেন—কী সব নারদ-ফারদের কথা আপনি বলেছেন? এই ভীষ্ম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব—এঁদের কথা কি আজ আর চলে? কোথায় আজকের এই কম্পিউটার-যুগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর সমস্যাগুলি, আর কোথায় ওই দু-হাজার, আড়াই হাজার বছর আগের বাণীসুলভ কথাবার্তা। আজকের দিনের রোগীকে কি আর দু-হাজার বছরের পুরনো দাওয়াই দিয়ে সারানো যায়?

সত্যি কথা, প্রাচীন রাজতন্ত্র আর আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধিতা এইটুকু বই আর কিছু নয়। আমরা তো হাজার হাজার পুরনো লতাপাতা দিয়ে আজও ওষুধ তৈরি করছি; গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আজকাল 'হারবাল' ওষুধের জন্য যথেষ্ট আবেগ এবং উৎসাহও বোধ করেন এবং অসুখও যে কিছু সারছে না—তা তো নয়। আসলে কালস্রোত এখন আমাদের অনেক বুদ্ধিমান করে তুলেছে। ফলে পুরাতন খল-দন্ডে ওষুধ ঘষা ছেড়ে দিয়ে লতাপাতা-জড়িবুটি মিহি করে আমরা আধুনিক 'ক্যাপসুলে' পুরেছি, দরকার হলে 'সুগার কোটিং দিয়েছি এবং আরও দরকার হলে কাঁচা রসুনের দুর্মদ গন্ধ মুক্তোর কিংখাবে আবদ্ধ করে জনসমক্ষে এমনভাবে প্রচার করেছি যাতে জনগণ আর কাঁচা রসুনের গন্ধ পায় না। পায় না—কেননা জনগণ এখন আর দাঁত দিয়ে কিছু চিবোতে চায় না, রসুনের দানা তাই মুক্তোর দানার রূপ নিয়ে এক ঢোক জলের সঙ্গে জনগণের পেটে চলে যায়।

আমার ব্যক্তিগত মতে রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের তফাৎটাও ওই একই রকম। রাজতন্ত্রের মধ্যে যে কাঁচা রসুনের গন্ধটুকু আছে, রাজা-রাজড়ার অহংকার, শোষণ এবং অত্যাচারের যে পঙ্কিল অপবাদ আছে—সে সমস্তই অন্য নামে এখনকার গণতন্ত্র

বা সমাজতন্ত্রের মধ্যেও আছে। তবে গণ বা সমাজতন্ত্রের মুক্তো পানা 'ক্যাপসুলটি' এতই সুন্দর যে 'পাবলিক' পরম বিশ্বাসে এক ঢোক প্রচার-জলের সঙ্গে কোঁৎ করে তা গিলে ফেলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে অর্থাৎ কিনা ভালভাবে চিবিয়ে দেখলে রাজতন্ত্রের অভব্যতাগুলি অর্থাৎ কাঁচা রসুনের সেই দুর্মদ গন্ধ ঠিক পাওয়া যাবে। অপিচ সেই গন্ধই যদি পাওয়া যায়, তাহলে আর নারদ, ভীষ্ম কিংবা ব্যাসের উপদেশ শুনবেন না কেন?

আজকে যাঁরা ভিন্নদেশীয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময় মুকুলিত নেত্রে অর্থনীতিকেই সমগ্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বলে মনে করেন, তাঁরা জানবেন যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আমরা এই তত্ত্বের মূল কথা বুঝতে পেরেছি এবং অখণ্ড রাজনীতিশাস্ত্রকে আমরা অর্থশাস্ত্র নামে অভিহিত করেছি। যদি বলেন—ওটা কথার কথা, এর পেছনে ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই, তাহলে আমাদের কৌটিল্যের প্রমাণ দিয়ে বলতে হয় যে—কৌটিল্য সেই যুগে বড় জোর গলায় এই কথাটি বলে গেছেন। কৌটিল্য বলেছেন—আমি বলছি—সমস্ত কিছুর মধ্যে অর্থই হল প্রধান—অর্থ এব প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ। সেকালের দিনে মনুষ্যলোকের প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাবৎ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মোদ্দা চারভাগে ভাগ করা হত—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এর মধ্যে রাজনীতিতে মোক্ষের কোনও স্থান নেই, কারণ মোক্ষকামী রাজার দ্বারা রাজ্যশাসন হয় না। বাকি থাকল ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিন নিয়েই সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, উন্নতি। কৌটিল্যের মতে—ধর্ম বল, কাম বল—সব কিছুর মূলে আছে অর্থ—টাকা পয়সা, অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে যাকে বলা যায় অর্থনীতি—অর্থমূলৌ হি ধর্মকামৌ।

শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কেন, এই যে মহাভারত—লোকসমাজে ধর্মগ্রন্থ বলেই যার মান মর্যাদা বেশি—সেই মহাভারতকে খোদ মহাভারতের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্র, তারপর ধর্মশাস্ত্র—অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ। যদি বলেন—এও কথার কথা, এবং এর দ্বারা কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না, তাহলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের ভয়ংকর বৈরাগ্যের কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে। যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে অস্থির হয়ে কিছুতেই আর রাজ্য নিতে চাইলেন না। নানা রকম বৈরাগ্যের কথা বলে ভাইদের তিনি অনেক বোঝাতে চাইলেন। কেউই অবশ্য সে কথা বুঝতে চাইলেন না। অর্জুন তো রীতিমত কড়া ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবাদ জানালেন এবং পরিষ্কার বললেন—যারা বেদবিদ্যা, অর্থনীতি এবং পুত্র পরিবার ত্যাগ করে সাধু হয়, আর গেরুয়া পরে, তারা মূর্খ—অবুদ্ধয়ঃ। অর্থনীতি শব্দটা অবশ্য অর্জুন ব্যবহার করেননি, তিনি প্রাচীন অর্থনীতির একটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। শব্দটির নাম 'বার্ত্তা', যাকে বিস্তারিতভাবে টীকাকারেরা কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্যের একার্থবোধক একটি শব্দ মনে করনে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কিন্তু 'বার্ত্তা' বলতে সোজাসুজি বুঝেছেন 'অর্থনীতিবিদ্যা। বাস্তবে কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্যেই সেকালের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ছিল পণ্য বেচা-কেনা, যেটা বাণিজ্যের মধ্যে

পড়লেও এই 'পণ্য' কথাটির স্বতন্ত্রতা আছে। হয়তো শিল্প অথবা 'ম্যানুফ্যাকচারিং" এরই মধ্যে পড়ে। সোনা-তামার আকরগুলিও ছিল রাষ্ট্রগত আয়ের বড় পথ। এইসব কিছু নিয়েই কিন্তু বার্তা—পণ্যকরবণিজ্যাভিঃ কৃষ্যাগো'জাবিপোষণৈঃ। বার্ত্তয়া ধার্য্যতে নিত্যং...। এমন একটা শব্দকে নীলকণ্ঠ অর্থনীতির অভিধায় চিহ্নিত করে আধুনিকতার মাহাত্ম্য দান করেছেন।

অর্জুন অনেক কথার মধ্যে এই অর্থনীতির কথা যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির তবু বুঝতে চাননি। কিন্তু সেই মহতী সভায় উপস্থিত আরও অনেকের মধ্যে মহর্ষি দেবস্থান অর্জুনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। অর্জুনের কথাটাও বড় স্পষ্ট করে বললেন মহর্ষি দেবস্থান। তিনি বললেন—যুধিষ্ঠির! অর্জুন যে মত প্রকাশ করেছেন—এ জগতে টাকা-পয়সার থেকে বড় জিনিস কিছু নেই—ন জ্যায়ো'স্তি ধনাদিতি—আমি সেই মতের সমর্থনেই কথা বলব।

বস্তুত এত বড় এবং এত কটু কথা—টাকা পয়সার চেয়ে জগতে বড় কিছু নেই—এই সাংঘাতিক কথাটা একজন মহর্ষির মুখ দিয়ে বেরনোর ফলে প্রাথমিকভাবে আমাদের যেন কেমন ধাক্কা লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি মহর্ষি দেবস্থান যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি অবিলম্বেই রাজা হবেন এবং রাজা হলে রাজ্যের অর্থ বা অর্থনীতিই যে রাজার কাছে সব—এ কথা একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির মুখে শুনলে অর্থের তত্ত্বগত ভাবনাটাই বড় হয়ে ওঠে। অর্জুন বা দেবস্থান যুধিষ্ঠিরকে যা বলেছেন, অথবা কৌটিল্য যে ভাবে অর্থনীতিকেই রাষ্ট্র ও মনুষ্যজীবনের মূল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আধুনিক প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে যে, মহাভারতের সামাজিক পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে অর্জুন যে ভাবে অর্থনীতির মূল্য বুঝেছেন, সেটা বিস্ময়কর। বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য যত জোরালোভাবে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির অবিচ্ছিন্ন যোগ প্রতিষ্ঠা করে গোটা রাজনীতি শাস্ত্রটাকেই 'অর্থশাস্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন, সেটা এ যুগে একমাত্র 'দাস্ ক্যাপিট্যালের' সঙ্গে তুলনীয়। আবারও বলছি—সেটা কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী, কাজেই প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে অন্তত প্রাচীনকালে মহামতি মার্কসের পূর্বসূরিতার দাবি আমাদের থাকতেই পারে।

এ কথা শোনামাত্র আমাদের কমিউনিস্ট পিতামহেরা আমার ওপর ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাঁরা বলবেন—কোথায় আমাদের আন্তর্জাতিক ভাবনার ভাবুক পুরুষ মার্কস আর কোথায় ওই প্রতিক্রিয়াশীল কৌটিল্য? কোথায় আমাদের মুক্তির হাওয়ায় দোলা শ্রেণিবিহীন সমাজ, আর কোথায় ওই বর্ণাশ্রমের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্রাচীন ভারতের জাতিগুষ্টি? আর রাজা কী? না, যাঁর একটা প্রধান কাজ হল চতুর্বর্ণ কিংবা চতুরাশ্রমের লোকেরা ঠিক ঠিক স্বধর্ম করছে কি না—সেইটা দেখা—বর্ণানাম্ আশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃস্টো'ভিরক্ষিতা। স্বধর্ম বলতে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যের ধর্ম বোঝায় না। বোঝায়—বামুন তার স্বধর্ম যজন-যাজন-অধ্যায়ন ঠিক ঠিক মতো করছে কি না?

ক্ষত্রিয় পুরুষেরা তাদের স্বধর্ম রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং শাসনকর্ম ঠিক ঠিক করছে কিনা। বৈশ্য তার স্বধর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি পশুপালন ঠিক ঠিক মতো করছে কি না, এবং সর্বোপরি শূদ্র তার ওপরের তিন বর্ণের পরিচর্যা ঠিক ঠিক মতো করছে কি না?

সমাজ-সচেতন আধুনিক পুরুষেরা এই ধরনের বর্ণ বিন্যাসে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন জানি, এবং এর মধ্যে ঘোরতর অন্যায় যে আছে, তাতে সন্দেহ কি? বিশেষত বংশগতভাবে জন্মসূত্রে যে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সমাজে—তার দুরপনেয় কলঙ্ক নিয়ে কোনও প্রশ্নই তোলা যায় না। আমি জানি—আমি খুব স্পর্শকাতর একটা বিষয় খুঁচিয়ে তুলতে চাইছি। তবু কথাটা তুলছি এইজন্য যে, পুরাতন বর্ণ ধর্মের বিচার আধুনিক আলোকে তো হওয়াই উচিত এবং তা হচ্ছেও। কিন্তু যা হচ্ছে—তার মধ্যে উলটো রথের টানটাই বেশি, নিরপেক্ষতা কম।

শত শত বছর ধরে শূদ্রদের ওপর যে নিপীড়ন, অত্যাচার হয়েছে, সে ইতিহাস জানে না—এমন বোকা লোক এখন আর নেই। উলটো দিক দিয়ে ব্রাহ্মণরা কত সুখে ছিলেন, সমাজে তাঁরা কত প্রতিপত্তি ভোগ করতেন—এ তথ্য আজ নথিপত্র সহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যাঁরা এই প্রমাণের ভার নিয়েছেন—সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট মমতা আছে, অন্তরে আছে সমতার মহিমা। এঁরা ঐতিহাসিক : সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক, যাঁরা ইতিহাসের নীচের দিক থেকে মেলে ধরছেন, অর্থাৎ আর রাজা-রাজড়ার কাহিনি নয়, ইতিহাস শুরু হবে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ এবং মেহনতি জনতার অবস্থা বিবৃত করে।

আমার সমস্যা হল—আমি প্রাচীন রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের আন্তরিক মিল দেখাতে বসেছি। সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজের ব্রাহ্মণ-শূদ্রের স্থান নির্দেশ না করে নিলে লেখাটার বনিয়াদ পাকা হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাচীন সমাজের বর্ণ বিন্যাসে যে বৈষম্য রয়েছে—সে যেমন সমাজের উচ্চ কোটির মানুষ এবং রাষ্ট্রের তৈরি, তেমনই গণ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজে যাঁরা ইতিহাস লিখে, প্রচার করে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ মুছে দিতে চাইছেন, তাঁরাও প্রায়শই উচ্চ কোটির মানুষ এবং রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মদত আছে এই ভেদ নিরসনের ব্যাপারে। আমার কথা কিন্তু এই মর্মে নয়। আমি বলতে চাই—সমতা শব্দটা বড় বেশি রকমের রহস্যজনক শব্দ। নীচ, ক্লিষ্ট, দরিদ্র, নিপীড়িত—এঁরা প্রত্যেকেই সমতা চান। নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের সমতা চায়, ক্লিষ্ট ব্যক্তি বিলাসীর সমতা চায়, দরিদ্র ধনীর সমতা চায়। নিপীড়িত মানুষ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সমতা চায়। উলটোটা কখনওই হয় না। কিন্তু যে অবস্থায় ধনী, বিলাসী, প্রতিষ্ঠিত অথবা উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি নিম্ন তথা নিম্নতরের সামাজিক সমতার কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে অন্যতরের প্রতি তাঁদের মমতা আছে, যে মমতা সামাজিক সীমাবদ্ধতা তুচ্ছ করে সাধারণের দিকে ধাবিত হয়।

এ কথাটা এক দমেই বলে ফেলা ভাল যে, এইমাত্র উচ্চতরের দিক থেকে যে সামাজিক উদারতার কথা বললাম—এই উদারতা ভারতবর্ষীয় ধর্মে এবং সমাজে মাঝে

মাঝেই দেখা গেছে। ব্যাসদেব থেকে আরম্ভ করে চৈতন্যদেব, বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সুফি সাধক—সবার মুখেই শোনা গেছে। আজকাল যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ছাল ছাড়িয়ে জুতো মারা হচ্ছে, সেই ধর্মে পরব্রহ্মে স্থিত ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ হল—তিনি সবার প্রতি সমান ব্যবহার করেন—সমঃ সর্বেষু ভূতেষু। এই সমানদর্শিতার উদাহরণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমস্ত মৌলিক গ্রন্থ থেকে আমি শত শত উদ্ধার করতে পারি এবং তাতে আপনাদের মনে হবে—এমন দয়ার্দ্র, সহৃদয় ধর্ম বুঝি পৃথিবীতে কোথাও নেই। যদি বলেন—ওগুলি ধর্মের নামে বাগাড়ম্বরমাত্র, যদি বলেন—ব্রাহ্মণ্যধর্মে সমদর্শিতার প্রসঙ্গ আসলে আচরণহীন মৌখিকতা, তাহলে বলব—পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই তাহলে ওই একই বাগাড়ম্বর এবং মৌখিকতাই চলে। বস্তুত আদর্শ এক জিনিস, বাস্তব আরেক জিনিস। নইলে যে সময় থেকে আমরা 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্' অথবা সমতার মন্ত্র পড়ে 'সমান-মন' এবং 'সহচিত্ত' হওয়ার চেষ্টা করছি, তাতে এতদিনে ভারতের সমস্ত মানুষেরই ব্রহ্মভূত হয়ে পর-ব্রহ্মে মিলিয়ে যাবার কথা। তা যখন হয়নি, তখন আদর্শ এবং বাস্তবে ফারাক আছে এটা বুঝতে হবে। একই কথা অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধেও। সেখানেও ইউনিভার্সাল ব্রাদ্‌ারহুড অথবা বেরাদরির কথা আদর্শগত ভাবে বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে সেই 'ব্রাদারহুড' বা 'বেরাদরি' দেখা যায় না।

ধর্ম এবং দর্শনের নিয়মই তাই। যুগে যুগে মহাত্মা পুরুষেরা বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁদের উদার নীতি-দর্শন প্রচার করে জনগণকে অভিভূত করেন। পরবর্তী সময়ে ওই উদার নীতি-নিয়মের সূত্র ধরেই অন্য মানুষেরা পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন এবং আরও পরবর্তী সময়ে জন-সাধারণের এতদিনের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ গড়ে তোলেন। সাধারণ মানুষের তখন হাঁস-ফাঁস অবস্থা—তারা পুরনো আদর্শের কথা ভুলতেও পারে না, আবার বাস্তবের সঙ্গে তাকে মেলাতেও পারে না। অন্য মতাদর্শের লোকেরা তখন গালি দেয়। বলে—এই তো তোমার ধর্ম, এই তো তোমার আচার!

আমাদের ধারণা—সমস্ত ধর্ম এবং দর্শনেই এই ঘটনা ঘটে। ধর্মগতভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে এই কায়েমী স্বার্থ যেমন গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রগতভাবে তেমনই গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রেও এই কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠে। হ্যাঁ, আদর্শের দিক দিয়ে গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র যথেষ্ট লোভনীয়, কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র উপযুক্ত হাতে কিছুদিন চলার পরেই অযোগ্য ব্যক্তির স্বার্থ সাধনের যন্ত্র হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের আবার সেই ফাঁপর তৈরি হয়, তারা নীতিগতভাবে গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা উলটে দিতে পারে না, আবার বাস্তব অভিজ্ঞতাও সইতে পারে না। অন্য মানুষ তখন স্বার্থসাধনের দৃষ্টান্তগুলি একত্র করে গালি দেয় আর বলে—এই কি তোমার গণতন্ত্র, এই কি তোমার সমাজতন্ত্র!

আপনারা ভারতের সবচেয়ে কুৎসিত প্রথা বর্ণাশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই প্রথার উৎস এবং বিবর্তন লক্ষ করলে সামাজিক রাজনৈতিক অনেক বিবর্তনেরই রহস্য

ভেদ করতে পারবেন। এ কথা তো কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাচীন বর্ণবিন্যাস জন্ম অনুসারে হত না অর্থাৎ কি না ব্রাহ্মণের ছেলে মাত্রই ব্রাহ্মণ হত না, অথবা ক্ষত্রিয়ের ছেলে মাত্রেই ক্ষত্রিয় হত না। পুরাণে, ইতিহাসে কত ক্ষত্রিয়ের বংশ-তালিকায় দেখবেন—অমুকের এক ছেলে রাজা হল, আর তার ভাই, কি দাদা ব্রাহ্মণ হয়ে গেল। ভগবদ্‌গীতা, যা না কি হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, সেই গীতাতেও কিন্তু বার বার বলা হয়েছে যে, সমাজে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের গুণ এবং কর্ম অনুসারে—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ। অর্থাৎ গুণ এবং কাজ অনুসারে জাতের বিচার। বর্ণ বিভাগের ক্ষেত্রে যাঁর মধ্যে যত সাত্ত্বিক গুণ, তিনিই ব্রাহ্মণ বলে সমাদর পেতেন। যার যত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ক্ষমতা, যার যত শুচিতা সেই ব্রাহ্মণ। সরলতা, জ্ঞান, ধর্মে বিশ্বাস, যজন-যাজন, বেদ-পড়া—এইগুলিই ব্রাহ্মণত্বের মানদণ্ড ছিল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে মহাদেব প্রজাপতি ব্রহ্মাকে 'কোট্' করে বলছেন যে, ব্রহ্মার মতে শূদ্রও যদি ভাল কাজ করে, শূদ্র যদি শুচিতা, পবিত্রতা রক্ষা করে, তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলেই মানতে হবে। কেননা জন্ম দিয়ে, সংস্কার দিয়ে তো আর ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র কারণ শুদ্ধ চরিত্র। সে চরিত্র শূদ্রের মধ্যে দেখা গেলে তিনি ব্রাহ্মণ।

এই একই ধরনের কথা পুরাণ-ইতিহাসের বহু জায়গায় আছে। বস্তুত ভারতের উদার মানুষেরা এমন একটা সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন এই ব্যাপারে—যার প্রত্যেকটি শব্দই আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। মহাভারতকার লিখেছেন—মানুষের মধ্যে বর্ণের কোনও ইতর বিশেষ নেই। সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণে ভর্তি—সর্বো'য়ং ব্রাহ্মণো লোকে—শুধু চরিত্র আর কাজের রকম ফেরে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। এই মত অনুসারে সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণের সংস্কারে, ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপে বাঁধা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোককে দেখা গেল তাদের সাহস বেশি, এমন কী সাহসী কাজ করতে তারা ভালওবাসে। স্বভাবের তেজ, প্রাকৃতিক উগ্রতা—এগুলিও যেন এদের একটু বেশি—তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। এরা যে বাহুর জোরে নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবে, বিলাসী হবে—তাতে আশ্চর্য কী!

মহাভারতকার লিখেছেন—ব্রাহ্মণেরা এইভাবে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ক্ষত্রিয় হয়ে গেল। একইভাবে যে সব ব্রাহ্মণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজে মন দিল, তারা হয়ে গেল বৈশ্য। আর যারা হিংসা, মিথ্যাচার, নোংরা কাজে মন দিল, যখন যে কাজ পেল, তাই করেই পেট ভরাতে লাগল, তারা হয়ে গেল শূদ্র—তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।

সমাজে বর্ণভেদের এই ছিল প্রাথমিক পরিস্থিতি। আসলে ব্যাপারটা আরও সহজ করলে দাঁড়ায়—মানুষ তার জ্ঞান এবং সত্ত্বময় পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে যখনই স্বার্থপর হয়ে উঠল, কামনা-বাসনা, লোভ-দ্বেষ যত তাকে জর্জরিত করতে থাকল ততই ব্রাহ্মণত্ব থেকে সে সরে আসতে আরম্ভ করল। এরই শেষ পর্যায় হল অকর্মণ্যতা, মিথ্যাচার, নোংরা কাজ—এক কথায় যার অভিধান হতে পারে শূদ্রত্ব। এই কর্ম-শূদ্রত্বকেই অর্থাৎ শূদ্র-গুণকেই সেই সমাজ ঘৃণা করত, শূদ্রকে নয়। সমাজমুখ্য

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বড়জোর বৈশ্যগুণ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন, বেদে তাঁদের অধিকার দিয়েছেন, পৈতের ব্যবস্থাও করেছেন, আর বলেছেন—যা করছ করো, এর থেকে নীচে নেমো না—স্বধর্ম ত্যাগ কোরো না।

কিন্তু প্রাথমিক সমাজের এই সরল পরিস্থিতি কতদিন চলতে পারে? ব্রাহ্মণেরা দেখলেন—তাঁদের ভালই চলছে। সমাজে জ্ঞানীগুণীদের খুব মান। বুদ্ধি খোলসা বলে যখন তখন রাজারা তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছেন, সম্মান দিচ্ছেন, মন্ত্রিসভায় স্থান করে দিচ্ছেন—টাকা-পয়সার তো কথাই নেই। মনু মহারাজ বিধান দিলেন—রাজাদের প্রথম কর্তব্য হল—ব্রাহ্মণের সেবা করা। এমন যজ্ঞ যেন রাজারা করেন, যাতে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আর বললেন—ব্রাহ্মণের মুখে যে আহুতি দেবে তার ফল হল অক্ষয়।

অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞে আহুতি দিলে যে ফল হয়, তার চাইতে অনেক বেশি ফল হবে ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি দিলে। অজ্ঞ লোকেরা ভাববে, বুঝি তাহলে বামুনের মুখেই ফল, ঘি আর আতপ চালের আহুতি দিতে হবে। মনুর টীকাকার লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—আরে বাপু! অত সোজাসুজি অর্থ কর কেন, ব্যঞ্জনা বোঝ না? বামুনের মুখ হল তাঁর হাতখানি—পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ। যা দেবে, ওই হাতেই দাও। সেটাই আহুতি। আর কী দিতে হবে—তা তো আর টীকাকারকে বলতে হবে না, স্বয়ং মনুই বলে দিয়েছেন। বলেছেন—ভোগের সামগ্রী দেবে, টাকা-পয়সা দেবে—দদ্যাদ্ ভোগান্ ধনানি চ। রাজাদের কাছে, বড়-মানুষের কাছে এইভাবে পেতে পেতে ব্রাহ্মণ তাঁর চিরায়ত ত্যাগের আসন হারাল, সে লোভী হয়ে পড়ল। শুধু লোভ নয়—কায়েমী স্বার্থ জন্মাল। বামুন তখন ভাবল—তোমার আছে, দিতে হবে, কিংবা, আছে, তো দেবে না কেন?

কায়েমী স্বার্থ কীরকম? মনু বললেন—তুমি যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে দান কর, তাহলে তোমার বাড়তি কোনও ফল নেই। অর্থাৎ কি না পরের উপকার করায় যতটা ফল, ওই ততটাই ফল পাবে, বাড়তি কিছু ফল পাবে না। কিন্তু তুমি যদি এমন একজনকে দাও—যে নামেই বামুন, কামে কিছু নয়, অর্থাৎ যে বামুন যজ্ঞ-হোম, তপস্যা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কিছুই করে না, কিন্তু কাঁধে তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলসটুকু বয়ে বেড়ায়—যদি এমন বামুনকেও কিছু দাও, তাহলে দানের ফল হবে দ্বিগুণ—দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। আচরণহীন ব্রাহ্মণনামধারীকে দান করার ফলই যখন দ্বিগুণ, সেখানে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করলে যে অনন্ত ফল হবে—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? শুধু এই নয়, যে বালক আজ থেকে বেদপাঠ আরম্ভ করল, সেই বালককে দান করার ফলও না কি লক্ষগুণ—প্রাধীতে শতসাহস্রং অনন্তং বেদপারগে। এই যে বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দানমান দেওয়ার বিধি প্রচলিত হল—এই চলেছে। রাজারাও যে এই নীতি সর্বতোভাবে মেনে চলেছেন—তা প্রাচীন রাজাদের দান সংক্রান্ত দলিলগুলি দেখলেই বোঝা যাবে।

এর বদলে ব্রাহ্মণেরা কী করেছেন? তাঁরাও রাজাদের পিঠ চুলকে দিয়েছেন। বলেছেন—রাজার সেবা করো, রাজা মানুষ না, দেবতা। মান, মর্যাদা, টাকা-পয়সা, শরীর—যা আছে, সব দিয়ে রাজার সেবা করো এবং খবরদার। রাজার পেছনে লেগো না, সর্বনাশ হবে। ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রগুলিতে যেখানে যেখানে রাজার প্রসঙ্গ আছে, সেখানে সেখানেই একদিকে প্রজারঞ্জনের মতো গভীর শর্ত থাকছে ঠিকই কিন্তু পরিবর্তে অভিজাত শ্রেণির অকুণ্ঠ সহায়তা তার আসন শক্ত করেছে। এইটুকু বাচ্চা বামুন যেখানে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দান-মান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, সেখানে একটি বাচ্চা রাজাও যাতে কারও কাছে অবহেলিত না হয়, সে ব্যবস্থাও পাকা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—রাজার বয়স অল্প হলেও তাকে যেন অপমান কোরো না, কেন না রাজা মানুষরূপী দেবতা—মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।

এই যে পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডূয়ন—যাকে শাস্ত্রকারেরা 'দ্ব্যর্থহীন' ভাষায় বলেছেন 'মাখামাখি'—'সংসৃষ্টি', এই মাখামাখির মধ্য দিয়েই পরস্পরের কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। ঠিক যেমন এখনকার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্রের মন্ত্রীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় দুজনেরই কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। সেকালের রাজা কিংবা এখনকার মন্ত্রীদের দেখে আমি আশ্চর্য হই না, তার কারণ—যাঁরা ক্ষমতার আসনে বসে আছেন, তাঁরা যে আপন গদি রক্ষার জন্য কটা ব্রাহ্মণকে হাতে রাখবেন—এটাই তো রাজনীতি। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কী হল? তাঁরা যে রাজনীতির চালে গলে গিয়ে সমতার আদর্শ ভুলে গেলেন এবং রাজার হয়ে প্রচার করতে থাকলেন—এটা কেমন কথা হল? আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিকেরা কায়েমী স্বার্থের কথা তুলে ব্রাহ্মণদের কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কিন্তু আজকে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের যুগে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীর যা সমাজিক অবস্থান এবং দেশ নেতাদের সঙ্গে তাঁদের যা মাখামাখি, তাতে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের এক প্রাচীন গল্পের অবতারণা করতে হবে। গল্পটা বলি।

পশুজগৎ ও জীবনের নানা রোমাঞ্চ দেখে উটদের বড় বিয়ে করার সাধ জাগল। যাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হবে, সেই উটিনীরাও তো সব সেই রকম—সব মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা। বিয়ের সময় রোমাঞ্চ আনার তাই একটাই উপায় বার করল উটেরা। সেটা গান বাজনার আয়োজন। অবশ্য গাধা ছাড়া অন্য কোনও চৌকস গাইয়ে উটদের নজরে পড়ল না। সেই গাধাদেরই তারা নেমন্তন্ন করল বিবাহবাসরে গান গাইতে। নির্দিষ্ট দিনে আসর বসল। গাধারা গলা ছেড়ে গান গাইতে আরম্ভ করল। গানের কথা এবং বিষয়বস্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগের থেকেও মধুর, এবং তা হল—উটদের রূপবর্ণনা। ব্যাপারটা এইখানেই থামল না—একেলা গায়কের নহে তো গান—এই নিয়মে সমঝদার উটরাও বলে উঠল—বাহা, বাহা! কী খাসা গলা! আসর শেষ হল অনাবিল এক পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে। গাধারা বলে—আহা! উটদের রূপ! লাবন অবনী বহিয়া যায়। আর উটরা বলতে লাগল—আহা কী গলা—সুরের

শুরু হল এই গাধারা। এইভাবে পরস্পরে পরস্পরের প্রশংসায় মেতে উঠল—পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপম্ অহো ধ্বনিঃ।

আজকের গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে মন্ত্রী-নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের যা পারস্পরিক প্রশংসা শুনছি, তথা তাঁদের পারস্পরিক তত্ত্ববোধের সমতা এতই বেশি যে, কখনও একপক্ষের আধুনিক রাজশক্তির প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের তত্ত্ববোধের ধন্যধ্বনিতে তাবৎ জনসাধারণ আপ্লুত বোধ করছেন। মজার কথা হল—এখনকার রাজনীতি কোনও ব্যক্তিগত উদারতা বা তৎপরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা রীতিমত দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারও গান্ধীবাদ, কারও মার্কসবাদ, কারও জাতীয়তাবাদ—ইত্যাদি বিভিন্ন দার্শনিকবাদের ওপর নির্ভর করে এক একটি রাজনৈতিক দল তাদের মতাদর্শ প্রচার করে। লক্ষণীয় বিষয় হল—দলীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে সব দার্শনিক তত্ত্ব রাজনীতিবিদেরা আজকাল প্রচার করেন, তাঁদের নিজস্ব জীবনে বা কাজে সেই দর্শনের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। অর্থাৎ গান্ধীবাদীর জীবনে বা কাজে গান্ধীর মতাদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না, কমিউনিস্টদের জীবনে বা কাজে মার্কসবাদের কোনও সামান্য সূত্রও পাওয়া যায় না কিংবা জাতীয়তাবাদী নেতার জীবনে বা কাজে পাওয়া যায় না ন্যূনতম জাতীয়তাবোধ। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে গান্ধী, মার্কস বা আপন মাতৃভূমি—সবই বিশিষ্ট নেতার রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত, ব্যবহৃত এবং শুধুই ব্যবহৃত।

অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা কী করেন? সময় বুঝে উদয় হন। কংগ্রেস আমলে আমার মনে হত—এই বড় সব গান্ধীবাদ বোদ্ধা এতকাল কোথায় লুকিয়ে ছিলেন! আবার কমিউনিস্ট সরকারের আমলে মনে হয়—এত সব সমাজতন্ত্র বোদ্ধা কোন বাগানে ছিলেন? শ্রমিক-কৃষকের পাশে, মাঠে, ময়দানে, মিছিলে যাঁদের কোনও দিন দেখিনি, তাঁরাই শ্রমিক, কৃষক আর মেহনতি শক্তির বুলি ছুটিয়ে মৌখিক বিপ্লব করেন। যেহেতু এঁরা কিঞ্চিৎ পড়াশুনো করা বুদ্ধিমান মানুষ, তাই রাজনৈতিক দর্শনটি রপ্ত করতে এঁদের সময় লাগে না। কিন্তু এঁরা সেই রাজনৈতিক দর্শন এবং তত্ত্ববোধকে পণ্য করেই ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের নজরে আসেন। তারপর আর কী? সেই উট আর গাধার ব্যাপার। একজন নিজস্ব রাজনীতির স্বার্থে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে ব্যবহার করেন আর অন্যজন ব্যক্তিগত স্বার্থে বিশিষ্ট দলের রাজনৈতিক দর্শনকে ব্যবহার করেন। রাজনীতিবিদের লাভ—ওই বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সমাজের সাক্ষর শিক্ষিতদের ওপর অধিকার লাভ আর বুদ্ধিজীবীর লাভ—সারা জীবন পরিশ্রম করে কোনও বিপ্লব না করেও পরিণত বয়সের মৌখিকতায় বিভিন্ন সাম্মানিক পদ এবং মর্যাদা লাভ।

আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে খুব অল্প বয়স থেকেই জানি—সারা জীবন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দূরে থাকুক, গান্ধী এবং মার্কস—দুজনেই যে খুব বড় পার্টি করতেন—এটাই তিনি জানতেন। হঠাৎ তাঁর পরিণত বয়সে দেখা গেল, তাঁর বাড়িতে দু-একটি রক্তিম বর্ণ পুস্তকের আবির্ভাব ঘটেছে। মাথা-মুণ্ডু, ছাই-ভস্ম—তিনি কী

বুঝলেন জানি না, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি দু-একজন মাঝারি সাইজের অধ্যাপক-নেতাদের সঙ্গে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করলেন। মুখে তাঁর বুলি ছুটতে লাগল—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনও বিকল্প নেই। নিজে লেখাপড়ায় সারা জীবন ভাল ছিলেন এবং নিজ গুণেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে 'প্রফেসর' পদের বেশি কিছু পাওয়া যায় না। মাঝখানে পরিশ্রম করে শুধু এখানে সেখানে 'পেপার' লিখতে হয়। অথচ অন্যদিকে রামা-শ্যামা দুদিন অধ্যাপনা করেই বিশিষ্ট দলের রাজনৈতিক মতের গুণগান করে মন্ত্রী-রাজন্যের ডাক পায়। অতএব এবার তিনিও সেই রামা-শ্যামাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন এবং এক চান্সেই তাঁর উপাচার্যের পদ লাভ হয়ে গেল। এই পদলাভের পর আরও একবার তিনি জনান্তিকে—এবং আমি সেটা শুনেছি—কবুল করেছিলেন, যে মার্কসবাদের কোনও বিকল্প নেই। উপাচার্য থেকে সাধারণ লোক—সবাই এখন মার্কসবাদ খুব সহজে বোঝেন এবং আরও সহজে বোঝেন যে, জীবনে কিছু পেতে হলে মার্কসবাদের কোনও বিকল্প নেই। বিকল্প যদি বা কোনওকালে আসেও—অসীম সময় আছে, ব্রহ্মাণ্ড বিপুল—তাহলে সেই বিকল্প গান্ধীবাদই হোক অথবা জাতীয়তাবাদ, তাঁরা বামপন্থীদের এই পাইয়ে-দেওয়া রাজনৈতিক শিক্ষা "পারফেকশনে' নিয়ে যেতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এই যে ঘটানাটার কথা এক্ষুনি বললাম—এ ঘটনা এখন সমাজের সর্বত্র। তত্ত্ববোধ, দর্শন, রাজনৈতিক শিক্ষা-এর থেকেও তোষামোদ এখন অনেক বেশি কার্যকরী। মন্ত্রী, নেতা, পার্টির দাদাদের তোষামোদ করলে সমস্ত কাজই এখন এত তাড়াতাড়ি নিজের অনুকূলে সম্পন্ন করা যায়, যে সকলেই এখন সেই পথ ধরেছেন। নইলে ভাবতে পারেন—একজন উপাচার্য, অথবা একজন বুদ্ধিজীবী, যিনি আপন মাহাত্ম্যে এবং পাণ্ডিত্যে সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত, তিনি দলীয় স্বার্থান্বেষী নেতাদের কথায় ওঠেন বসেন, কর্তব্য অথবা অকর্তব্য করার জন্য মন্ত্রীর মুখ চেয়ে বসে থাকেন। এই ধরনের মানুষকে সংস্কৃত ভাষায় বলে 'সেবক', চাটুকারী, পাদলেহীর দল, তিনি যত বড় মানুষই হোন না কেন।

আমাকে অনেকে বলেন—আপনার সংস্কৃত ভাষায় রাজা-রাজড়াদের স্তুতিগানেই তো একটা বিশিষ্ট সাহিত্য গড়ে উঠেছে, যাকে স্তুতিকাব্যও বলা যায়। এইসব স্তুতিগীতের বেশিরভাগই রচনা করেছেন ব্রাহ্মণরা। একথা অবশ্যই ঠিক যে, সে কালের রাজাদের অনেকেরই ঘুম ভাঙত মাইনে-করা বন্দনা গায়কের স্তুতিগীতে, গায়কের আহির-ভৈরোঁ সুরে, আর ব্রাহ্মণের বেদ-মন্ত্র উচ্চারণে—বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীত-মঙ্গলৈঃ। বাণভট্ট ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—অনেক রাজাই আছেন—যাঁরা নাকি মোসাহেবদের তেলে ভিজে এই বন্দনা-গায়কদের অমূলক স্তুতি-গানকেই যশ বলে মনে করেন—বন্দিজনখ্যাতি র্যশ ইতি।

আমরা বলি—এখনকার দিনের চিত্রটাও কি একই রকম নয়? তখনকার লোকেরা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় গান লিখত, পদ বানাত, আর এখনকার লোকেরা তাও পারে না। তারা শুধু দলের দাদার হুকুমে মেশিনের মতো নিষ্প্রাণভাবে মহান নেতার নাম উচ্চারণ করে আর জয়কার দেয়—অমুক তমুক জিন্দাবাদ। কবিরা বলতেন—'জীয়াৎ', মানে, বেঁচে থাকুন, আর এঁরা বলেন জিন্দাবাদ। মানে, নিশ্চয়ই একই। লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় কতগুলি মানুষের জিন্দাবাদ-শব্দেই পার্টির মহান নেতারাও নিজেদের যশ মেপে নেন—বন্দিজনখ্যাতি র্যশ ইতি। যত বড় জমায়েত, তত বেশি যশ। এখনকার সমাজের বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের বড় বড় জমায়েতে সেভাবে জড় হন না। তাঁদের জন্য আছে—অন্যান্য কেতাদুরস্ত সভাসমিতি যেখানে তাঁরা বিশিষ্ট দলের অথবা দলীয় সরকারের অধিগৃহীত নীতিগুলির ধর্ম-মর্ম সম্বন্ধে স্তুতিগীত রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় এঁরাও সেবক, চাটুকারী, পাদলেহী।

এইসব উচ্চ-নীচ স্তব-গায়কের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কী—তা একটি প্রাচীন শ্লোকের বিশেষণে ধরা আছে। শ্লোকটি বলেছে—তৃষ্ণান্ধদৃক্ সেবকঃ। 'তৃষ্ণা—মানে, ব্যক্তিগত লোভ, টাকার লোভ, আরও পাওয়ার লোভ, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি। এই লোভের জন্য এরা কী করে? কবি বলেছেন— উন্নতির জন্য এরা প্রভুর পায়ে পড়ে। বুঝতেই পারছেন, এরা তত মানী লোক নয়, কাজেই নিজের উন্নতির জন্য পায়ে পড়তেও এদের বাধে না। সেকালে এরা রাজা, অমাত্য, রাজকর্মচারীর পায়ে পড়ত, এখন এরা মন্ত্রী, আমলা এবং পার্টির দাদাদের পায়ে পড়ে। সেবকদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে দেখা যাচ্ছে—একদল লোক, যাঁরা প্রভুর গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—প্রভু কখন বাইরে বেরবেন সেই আশায়—দ্রষ্টুং বহিস্তিষ্ঠতি। এই দলে আজকাল উপাচার্য, বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে এম. পি, এম. এল. এ, পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ লোক সবাই আছেন। এঁরা নিজেরা মনে করেন— এঁরা কোনও তোষামোদ-টোদ করেন না, এঁরা শুধু মন্ত্রী কিংবা বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে 'দেখা' করেন। এই দৃষ্টি-বিনিময়ের সুফল যাই হোক, এর জন্য সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করে যে অপেক্ষা করতে হয়, সেই অপেক্ষার লজ্জা এখন বড় বড় মানুষেরও গায়ে লাগে না।

গায়ে লাগবেই বা কেন? রাজদ্বারে রাজদর্শনার্থী হয়ে যারা আসে—তাদের কথা বাণভট্ট লিখেছেন—তারা যেন লালমুখো বানর, প্রচণ্ড গালাগালি দিলেও তাদের মুখের রং বদলায় না। তারা যেন ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া—এক গ্রাস খাবারের লোভ দেখিয়ে যে দিকে ইচ্ছে তাদের চালনা করা যায়। ত্রিশঙ্কুর মতো স্বর্গ-মর্ত্য দুই লোক থেকেই তাঁকে দূরে সরে থাকতে হয় এবং মাথাও নিচু করে থাকতে হয় দিবারাত্র।

বাণভট্টের কথায় সায় দিয়ে অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের ত্রিশঙ্কু-অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। সত্যি কথা বলতে কি, বুদ্ধিজীবীদের স্বক্ষেত্র এবং স্বর্গক্ষেত্র হল তাঁদের একান্ত আপন বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্র। তাঁরা যখন সেই ক্ষেত্র ছেড়ে রাজানুগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন স্বক্ষেত্রে তাঁরা নিন্দিত হন, সার্থক বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের উপহাস করেন।

আবার সে সব মানুষ মাটির কাছাকাছি, শ্রমিক-কৃষক অথবা খেটে-খাওয়া মানুষ—তারাও এই বুদ্ধিজীবীদের নাগাল পায় না বা পেতে চায়ও না—স্বর্গ মর্ত্য—উভয় লোক থেকেই রাজভক্ত বুদ্ধিজীবীরা তাই দূরে থাকেন।

বাণভট্ট অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে এই কথাগুলি বলেননি, রাজ-অনুগ্রহপ্রার্থী যে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধেই তাঁর এই কথাগুলি খাটে। কিন্তু আজকালকার তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের একাংশ যেহেতু সাধারণ মানের মানুষের থেকেও চাটুকারিতায় নীচে নেমে গেছেন, তাই বাণভট্টের কথার সার্থকতা পাদলেহী বিশিষ্ট দলমত ভক্ত বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধেও সর্বাংশে খাটে।

যাই হোক বাণভট্ট লিখেছেন—রাজ অনুগ্রহপ্রার্থী মানুষটি বিদ্বান হলেও রাজার সামনে মূর্খের মতো তাঁর কথা জড়িয়ে যায়, সে উলটোপালটা বলতে থাকে—বিদ্বাংসোপি বৈধেয়স্যেব অপশব্দমুখস্য—শক্তিমান হলেও শ্বেতী হওয়া কুষ্ঠরোগীর মতো তার হাত দুটি সংকুচিতই হয়ে থাকে।

বস্তুত এই উদাহরণ আপনারা প্রায়ই দেখবেন। যে পণ্ডিত বিদ্বান, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী নিজের মহলে বাক্যজালে সকলকে স্তম্ভিত করেন, তিনিই যখন রাজনীতির আশ্রয়ে এসে মন্ত্রীমহোদয়দের ভিক্ষা দেওয়া পদে বসেন, তখন আর তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। অবস্থা বেগতিক হয়ে গেলে মন্ত্রী মহোদয়ের ধমকানি খান মাথা নিচু করে, নিজেকে প্রত্যয়িত করার চেষ্টা করতেই মূর্খের মতো তাঁর কথা জড়িয়ে যায়।

কিন্তু কেন এমনটি হয়, কেনই বা সব জেনেশুনেও এই হ্যাপা-পোয়ানোর পদ তাঁরা নিতে যান? এর পেছনে মনস্তত্ত্ব কী? একটু আগে আমি এক উপাচার্যের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম—তিনি যখন দেখলেন—রাজনীতির আশ্রয়ে সাধারণ রামা-শ্যামা পর্যন্ত দলনীতির গান গেয়ে উতরে গেল, নানা পদ পেল, তখন এত পরিশ্রম করে পড়াশুনা করে তিনিই বা বসে থাকবেন কেন! বাণভট্ট এই মনস্তত্ত্বটাই ধরেছেন। তিনি বলেছেন—মানুষ যখন দেখে, তার সমান অবস্থার লোক হঠাৎ করে পদোন্নতি ঘটিয়ে ফেলল, সে তখন বিনা আগুনেই ঈর্ষায় সিদ্ধ হয়ে যায়—সমসমুৎকর্ষেষু নিরগ্নি-পচ্যমানস্য। নীচের কেউ তার সমান পদে উঠলে সে যেন না মরেও লজ্জায় মরে যেতে থাকে—নীচসমীকরণেষু নিরুচ্ছ্বাসং ম্রিয়মানস্য। আর কে না জানে, রাজতন্ত্রের আমলে রাজার ইচ্ছামত তাঁর অনুগৃহীত অযোগ্য জনকেও যেমন উচ্চপদে বসানো হত, মধ্যম ব্যক্তিকে যেমন উচ্চের সম-মর্যাদায় স্থাপন করা হত—দলের রাজনীতিতে তেমনই দলমতের পোষক ব্যক্তিকে একইভাবে ওপরের পদে বসানো হয়। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্র এই দলমতভক্ত, অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনারা অধিকারীর ভূমিকায় দেখতে পাবেন। এমনটি দেখেও যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বসে থাকেন কী করে? বাণভট্ট লিখেছেন—সে যে ভক্ত, ভক্ত হয়েও আপন ভাগটি না পেলে সে তো জ্বলতে থাকবেই—জ্বলতো ভক্তস্যাপি অভক্তস্য—মহামতি পি. ভি. কানে এই পংক্তির ইংরেজি করেছেন—he is devoted

and yet not endowed by his master with gifts—এই চিন্তাতেই সে জ্বলে মরে। আমরা বলি—ওই চিন্তাতেই আজকাল বড় মানুষ, বিদ্বান বুদ্ধিজীবীরাও বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের মত পোষণ করেন।

আট

আজকের দিনে নেতা মন্ত্রী এবং বুদ্ধিজীবীদের এই যে পারস্পরিক অবস্থান এর সঙ্গে প্রাচীন রাজন্য এবং ব্রাহ্মণ্যের তফাৎ কোথায়? এই মুহূর্তে আপনারা মহাভারতের দ্রোণাচার্যকে স্মরণ করুন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাও যে সে ব্রাহ্মণ নয়—স্বয়ং ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র। কিন্তু শৈশব থেকে বেদ-বেদাঙ্গ নানা শাস্ত্র পড়েও তাঁর যজন-যাজন, স্বাধ্যায় ভাল লাগল না। আপনারা জানেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সঙ্গে তাঁর বাল্যবন্ধুত্ব ছিল এবং যুবক বয়সে রাজা হয়ে দ্রুপদ সেই বন্ধুত্ব অস্বীকার করেন। কারণ বন্ধুত্ব স্বীকার করতে হলে তাঁকে অর্ধেক রাজ্য দিতে হত দ্রোণকে—সেই রকমই নাকি প্রতিজ্ঞা ছিল দ্রুপদের। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা—দ্রোণ ভরদ্বাজের ছেলে, ব্রাহ্মণ মানুষ, তাঁর তো 'যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট' হওয়ার কথা। বিশেষত তিনি ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের কাজ, অস্ত্র বিদ্যা শিখেছিলেন কীসের আশায়? দ্রোণ নিজ মুখেই পরে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়ের যোগ্য অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন বলে তাঁর প্রতিবেশী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে একঘরে করে দিয়েছিলেন। নিজের কুলোচিত ধর্মত্যাগ করার ফলে প্রতিবেশীরা তাঁকে নিন্দেমন্দও করত যথেষ্ট—অপি চাহং পুরা বিপ্রৈর্বর্জিতো গর্হিতো ভৃশম্। বুঝতে পারছেন তো—দ্রোণাচার্যের এখন সেই ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা।

প্রশ্ন হতে পারে—ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীরা দ্রোণকে একঘরে করেছিলেন কেন, নিন্দেই বা করতেন কেন? একথা জেনে রাখা ভাল, সেকালের ব্রাহ্মণদের উদরপূরণ বা জীবিকা নির্বাহ হত যজন-যাজন এবং অধ্যাপনার সূত্রেই। গৃহস্থের জন্য তাঁরা যে যজ্ঞ-হোম করতেন, যজমান রাজাদের জন্য তাঁরা যে যাগ-যজ্ঞ করতেন, তার বদলে তাঁরা দক্ষিণা পেতেন এবং গৃহস্থের দান-গ্রহণ করতে পারতেন। এতেই তাঁদের পেট চলত। তাও আবার কি, তাঁরা নিন্দিত প্রতিগ্রহ করতে পারতেন না অর্থাৎ যে কোনও জায়গায় নীচ-গৃহে, শূদ্র-অন্ত্যজদের দান গ্রহণ করতেন না। একথা আজকের দিনে খুব খারাপ শোনাতে পারে বটে, কিন্তু সেকালের ভাবনা-চিন্তা আজকের প্রগতিশীল মানসিকতার ছকে ফেলে বিচার করলে তো চলবে না। তাঁদের বিচারটা কী ছিল, সেটাও বুঝতে হবে।

ধর্মে, শাস্ত্রে নীচ ঘরের দান গ্রহণ করলে এটা হয়, সেটা হয় বলে অনেক কিছু বলা হয় এবং এখনকার সামাজিক ঐতিহাসিকেরা এসব কথায় খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, বুঝতে পারি। কিন্তু এর পেছনে যুক্তি ছিল একটাই—ব্রাহ্মণ যাতে লোভী হয়ে না পড়ে। লোভী হয়ে পড়লে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চুলোয় উঠবে, শুধুই

টাকা-পয়সার ধান্দা করবে। সম্ভবত এই জন্যই ধর্মশাস্ত্রকাররাও গ্রামযাজী, রাজযাজী ব্রাহ্মণকে হীন বলে গণ্য করেছেন—কারণ যে লোক নির্বিচারে পাড়ার সকলের পূজা করে বেড়ায়, তার যে পূজার বাসনার থেকে লোভটাই কালে প্রবল হয়ে উঠবে তা সহজেই বোঝা যায়। এছাড়া আরও একটা বিচার তাঁদের মাথায় কাজ করত। সেটা হল—যার ধন-দক্ষিণা বা অন্নপান তাঁরা গ্রহণ করছেন—সে যদি অপকৃষ্ট ঘরের মানুষ হয়, তাহলে তার অর্জিত ধন এবং খাদ্যের বিশুদ্ধতা কতখানি? আপনারা বললেন—বামুনের আবার টাকার শুদ্ধি, তার আবার খাদ্যের শুদ্ধতা! কথায় বলে—লুচির ওপর পড়ল ডাল। বামুন নাচে তালে তাল।। সংস্কৃতের প্রবাদ—নৃত্যান্তি ভোজনে বিপ্রাঃ, অর্থাৎ খাবার দেখলেই বামুন নাচে।

কথাটা এক হিসেবে মিথ্যে নয়। ব্রাহ্মণের এই যে অবস্থাটা হয়েছে তার কারণও আছে বহু, তবে এটা তার আলোচনার পরিসর নয়। আমি সময় মতো সেসব ইতিহাস আলোচনা করব। আপাতত ব্রাহ্মণের এই অধঃপতন স্বীকার করে নিয়েই বলি যে, লোভ জিনিসটা সমস্ত মানুষের সাধারণ মানসিক বিকার। সে বিকার ব্রাহ্মণের মধ্যেও যথেষ্ট ছিল এবং তার উদাহরণ পুরাণে ইতিহাসে প্রচুর আছে। কিন্তু উলটো দিক দিয়ে লোভশূন্যতা অথবা ধনাকাঙ্ক্ষাহীনতাও যে ব্রাহ্মণের আত্মিক গুণ ছিল তার উদাহরণও পুরাণে ইতিহাসে প্রচুর আছে। বস্তুত নীতিগতভাবে এই নির্লোভ আচার এবং যদৃচ্ছাতুষ্টির ওপরেই কিন্তু ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ভর করত। এই সংজ্ঞাতেই দ্রোণ তাঁর ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন; কারণ, তিনি যে কোনও উপায়ে, টাকা-পয়সা উপায়ের ফন্দি করেছিলেন। এই লোভ অথবা এই ফন্দি সেই সমাজে যে নিন্দিত ছিল, তার উদাহরণ দ্রোণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ঘটনা থেকেই প্রমাণ করা যায়।

গুরুদক্ষিণা হিসেবে পাঞ্চাল দ্রুপদকে অর্জুন বন্দি করে নিয়ে আসার পর দ্রোণাচার্য দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য কেড়ে নিলেন। দ্রুপদ তাতে রাগ করে এমন একটি পুত্র লাভের চিন্তা করলেন, যে পুত্র হবে যজ্ঞসম্ভূত এবং যে দ্রোণকে উচিত শিক্ষা দেবে। এমন সাংঘাতিক একটি যজ্ঞের জন্য সেই রকম একটি ব্রাহ্মণ দরকার। কয়েক দিন তিনি গঙ্গা-যমুনার উভয় তীর তোলপাড় করে খুঁজলেন—সেই রকম একটি ব্রাহ্মণ জোগাড় করার জন্য। শেষে সেইখানেই এক জায়গায় যাজ এবং উপযাজ নামে দুটি ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষির সন্ধান পেলেন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ উপযাজকেই বোধহয় দ্রুপদের পছন্দ হল। তাঁকেই গিয়ে দ্রুপদ বললেন—আপনি যা চান তাই দেব, অনেক গরু দেব, আমি দ্রোণবধের জন্য একটি পুত্র চাই, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

দ্রুপদের উদ্দেশ্যের মধ্যে উপযাজ শুদ্ধতা দেখতে পেলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্জি নাকচ করে দিলেন। টাকা-পয়সা আর গরুর লোভে কারও বধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তিনি রাজি হলেন না। দ্রুপদ তবু তাঁকে ছাড়েন না। গোটা এক বছর ধরে তাঁর সেবা করে গেলেন। উপযাজ কিন্তু একটুও তেলে ভিজলেন না। তিনি তাঁর আবাহন প্রত্যাখ্যান করে বললেন—আপনি আমার দাদার কাছে যান। তিনি বস্তুর

দোষ-গুণ বিচার করেন না, কাজেই যজমানের ধনের লোভে আপনার যজ্ঞক্রিয়া সমাধা করে দেবেন। সত্যি কথা, দ্রুপদের টাকার লোভে উপযাজের বড় ভাই যাজ কিন্তু রাজি হয়ে গেলেন দ্রুপদের যজ্ঞ করতে।

তাহলে দেখুন—প্রথমেই যে দুজন ঋষিকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলা হয়েছে, ব্রহ্মার মতো প্রভাবশালী বলা হয়েছে এবং সমগুণান্বিত বলা হয়েছে—তাঁদের জ্যেষ্ঠজন কিন্তু অর্থলোভী, কনিষ্ঠটি নির্লোভ। বিশেষত এ দানটা কোনও শূদ্র-অন্ত্যজদের কাছ থেকে নেওয়ার প্রশ্নটা আসেনি। দান করবেন পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ, সমাজে যাঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও ঈর্ষণীয় ছিল। আর দান যিনি নিচ্ছেন, তিনি ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি। আসল ব্যাপারটা হল— ব্রহ্মিষ্ঠ হোন, আর যাই হোন, মানুষোচিত কুপ্রবৃত্তি কারও মধ্যে থাকবে না—এটা কে বলল? তবে নির্লোভ হওয়াটাই ছিল ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা, যে কারণে দ্রোণ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন। দ্রোণের টাকা-পয়সার লোভও ছিল, ক্ষমতার লোভও ছিল। কতখানি ছিল সেটা বলি। দ্রোণ তখন পিতার আশ্রমে থেকেই ধনুর্বেদ শিখছেন। সেই সময় তিনি শুনতে পেলেন—ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম ব্রাহ্মণদের প্রচুর টাকা-পয়সা দিচ্ছেন। দ্রোণ ভাবলেন—এক ঢিলে দুই পাখি মারব। পরশুরামের কাছে সুকঠিন অস্ত্র বিদ্যার পাঠও নেওয়া হবে, আবার টাকা-পয়সাও পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাত্মা পরশুরামের কাছে পৌঁছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং প্রথমেই বললেন—আমি কিন্তু কিছু টাকা-পয়সা পাব বলে এসেছি—আগতং বিত্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজোত্তম।

পরশুরাম বললেন—আপনি বড় 'লেটে' এসেছেন, টাকা-পয়সা, সোনা-রুপো যা দেওয়ার, তা সবই আমি ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরিষ্কার হয়ে বসেছি। থাকার মধ্যে এখন আছে এই শরীরটা, আর আছে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। দ্রোণ দেখলেন—যা পাওয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্রই সই। এতো যে সে অস্ত্র নয়, একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন-করা প্রাণান্তক অস্ত্র। দ্রোণ সমস্ত অস্ত্রচালনার কৌশল শিখে নিয়ে এবার উপস্থিত হলেন দ্রুপদের কাছে। টাকা-পয়সা আপাতত হল না বটে, কিন্তু দ্রুপদ যদি অর্ধেক রাজ্য দেয়—সব পুষিয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্রুপদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

এইবার দেখুন সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবী কীভাবে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেন। প্রত্যাখ্যাত দ্রোণ সোজা চলে গেলেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু সেখানকার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি সোজাসুজি কিছু বললেন না। কিছু বললেন না হস্তিনাপুরের রাজ্যপাল ভীষ্মকেও। তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন নিজের শালা কৃপাচার্যের ঘরে। তারপর সেই খেলার মাঠের ব্যাপারটা আপনারা জানেন। পাণ্ডব-কৌরবদের খেলার বলটি কুয়োয় পড়ে গিয়েছিল। দ্রোণাচার্য নলখাগড়ার তীর বানিয়ে, তীরের পর তীর গেঁথে রাজকুমারদের বল তুলে আনলেন। পুনরায় নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন এবং ফের সেটা তুলেও আনলেন। রাজকুমারদের তাক লেগে গেল। তারা বলল—বলুন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি—বয়ং কিং

করবামহে? দ্রোণ বললেন—কিচ্ছুটি করতে হবে না বাপু। তোমরা শুধু গিয়ে পিতামহ ভীষ্মের কাছে আমার চেহারার বর্ণনা দাও আর আমি কী করেছি, আমার কী গুণ সেটা বল—আচক্ষধ্বঞ্চ ভীষ্মায় রূপেণ চ গুণৈশ্চ মাম্। কুমাররা এসে ভীষ্মকে সব বলল, ভীষ্ম বুঝতে পারলেন—তিনি দ্রোণ। ভীষ্ম তখন কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য 'টিউটর' খুঁজছেন। দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয়বিদ্যায় গুণী মানুষ, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তিনি ডেকে পাঠালেন দ্রোণকে।

দ্রোণ তখন ভীষ্মের কাছে আপন দারিদ্র্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস বলে গেলেন। তবে দারিদ্র্যের ইতিহাসটা তিনি একটু বাড়িয়ে বললেন বলে আমাদের বিশ্বাস। নিজ পুত্র অশ্বত্থামার দুধ বলে পিটুলিগোলা খাওয়ার ঘটনাটা বলেই দ্রোণ বলেছিলেন—বিশ্বাস করুন! ব্রাহ্মণদের নিন্দিত প্রতিগ্রহ করা অর্থাৎ নীচগৃহে যজনযাজন করে টাকা-পয়সা কামানো অন্যায় বলে, ধর্মসঙ্গত প্রতিগ্রহের জন্য নগরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়িয়েছি, তবু একটা গরু কেউ দেয়নি—অন্তাদন্তং পরিক্রম্য নাধ্যগচ্ছৎ পয়স্বিনীম্।

দ্রোণ এটা ভাবলেন না যে, পিতার আশ্রমেই ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর্বেদ অভ্যাস এবং স্বধর্ম, যজন-যাজন-অধ্যাপনা ত্যাগ করেছেন বলে ততদিনে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে হেয়ই হয়ে গেছেন। লোকে তাঁকে বামুন বলে দুধেলা গরু দেবে কেন? নইলে অঙ্গিরস কুলে জাত মহর্ষি ভরদ্বাজের ছেলে সেকালে একটা দুগ্ধবতী গাভীর দক্ষিণা পান না—এ কি হতে পারে? যাই হোক, অশ্বত্থামার পিটুলিগোলা খাওয়ার পর নিজের ওপর ঘৃণায় দ্রোণাচার্য দ্রুপদের কাছে গিয়েছিলেন রাজ্য পাবেন বলে। দ্রুপদ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্রোণ বললেন—এ ঘটনার পর রাগে আমার গা জ্বলে গেল—মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ এবং দ্রুপদকে আমি কী শাস্তি দেব—ঠিক করেই এখানে হস্তিনাপুরে এসেছি। আমি গুণবান্ শিষ্য চাই এবং নিজের অভিলাষ পূর্ণ করতে চাই অর্থাৎ 'টিউশনি' চাই এবং টাকা পয়সা চাই।

পিতামহ ভীষ্ম পোড় খাওয়া লোক। সব বোঝেন। তিনি বললেন—আপনি তীরধনুককে বিশ্রাম দিন। রাজকুমারদের শিক্ষা দিন আর সানন্দে যত ইচ্ছে ভোগ করুন—ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ ভৃশং প্রীতঃ...। কুরুদের যা ধনসম্পদ আছে, রাজ্য আছে, তার সব কিছুরই মালিক হবেন আপনি। বস্তুত আপনি এখানে রাজা হয়েই থাকবেন—ত্বমেব পরমো রাজা, কৌরবরা সবাই আপনার অধীন থাকবে। হয়তো এ কথাটার মধ্যেও অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু এটা ঠিকই যে, দ্রোণাচার্য যে অতঃপর রাজার হালে থাকবেন—সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকল না। এর পরের ঘটনা সবার জানা। অর্জুনের সাহায্যে দ্রুপদের রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার মতো গুরুদক্ষিণা ছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন হস্তিনাপুরের মতো বিরাট সাম্রাজ্যের মন্ত্রিত্ব। ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত পরামর্শ-দাতা। বিভিন্ন সময়ে কৌরব সভায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, যেসব গম্ভীর আলোচনা হয়েছে, তার সবেতেই তিনি মাননীয়

অংশীদার। কিন্তু এই সুবাদে পাণ্ডবদের প্রতি যে অন্যায়গুলি হয়েছে—জতুগৃহের ঘটনা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবদের বনবাস—সবই তাঁকে দেখে যেতে হয়েছে। কৌরবদের রাজনীতিতে আত্মসমর্পণ করে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে তাঁকে কৌরবদের পক্ষে যোগ দিতে হয়েছে। উপরন্তু নিজের প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনের বালক-পুত্র অভিমন্যুবধের ষড়যন্ত্রে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে কৌরবদের পৃষ্ঠকণ্ডূয়নের জন্যই।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য কৌরব-ঘরের রাজনীতিকে পণ্য করে নিজের কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুললেন। অবশ্য এইভাবে রাজনীতিতে না এলে দ্রোণাচার্যকে কে চিনত? শত শত অগ্নিহোত্রী স্বাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মতো বড় জোর তিনি ব্রহ্মদর্শন করে মারা যেতেন, তাঁকে চিনত কে? ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের রাজনীতির লাভ ওইটুকুই।

আজকের সমাজে শিক্ষক-অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের উপমাটা জমে খুব ভাল। শিক্ষক-অধ্যাপকের বেশির ভাগ আজকাল দুটি কাজ নিয়ে প্রধানত ব্যস্ত থাকেন। এক, প্রাইভেট টিউশন। দুই, পলিটিক্স্। প্রথমটার কারণ অর্থের লোভ, দ্বিতীয়টার কারণ ক্ষমতার লোভ। প্রাইভেট টিউশনের দিকে শিক্ষক অধ্যাপকের যে ঝোঁকটা দেখা যায়—তার একটা অর্থনৈতিক ইতিহাস আছে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। তবু ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলা যায়। এক সময়ে শিক্ষক-অধ্যাপকেরা দানে-মানে খুবই বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের আগের যুগেই এই পরিবর্তনটা আমরা দেখেছি। দেখেছি—সমাজের তাবৎ লোকের হাতে যখন প্রচুর টাকা-পয়সা এসে গেছে, তখনও শিক্ষক-অধ্যাপক সমাজ প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগছেন। সরকারের কোনও নজর তাঁদের ওপর ছিল না এবং অর্থহীনতার কারণে সামাজিক মর্যাদাও তাঁদের কিছুই ছিল না। আমাদের না-দেখা আরও আগের যুগে শুধুমাত্র শিক্ষক—এই পরিচয়েই সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে যে সম্মান পাওয়া যেত, আমাদের আগের যুগেই শিক্ষকরা আর তা পাচ্ছিলেন না। ধনী পিতারা শিক্ষক-অধ্যাপকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পিছু পা হতেন। হয়তো রিক্ত, দরিদ্র দ্রোণাচার্যের মতো নগরীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত তাঁরা ঘুরেছেন, একটিও দুগ্ধবতী গাভী বা ক্ষুধার অন্ন-পান তাঁরা পাননি। ঠিক এই অবস্থায় তাঁদের প্রাইভেট টিউশনের দৌড় শুরু হয়। প্রথম প্রথম দু-একটি ভাল ছাত্র, উত্তম যজমান। তারপর আরম্ভ হল নিন্দিত প্রতিগ্রহ—যেখানে সেখানে যাকে তাকে পড়ানো—কারণ, পড়ালেই পয়সা। এরই চরম পরিণতিতে এখনকার শিক্ষক-অধ্যাপকের ঘরে মাদুর বিছানো হয়। দলে দলে ছাত্র আসে, কে ফেল করল, কে পাশ করল—সেটা বড় কথা নয়। শিক্ষক-অধ্যাপক পড়াচ্ছেন, টাকা রোজগার করছেন। এই হল এক প্রকার। কিন্তু শুধু টাকা হলেই তো হল না, ক্ষমতা চাই। অতএব শিক্ষক-অধ্যাপক এবার রাজনীতিতে নামলেন। বুদ্ধিমত্তা থাকার দরুন রাজনীতির মুখ্য জায়গাগুলিতে স্থান পেতে এঁদের সময় লাগে অনেক কম। ফলত দীর্ঘ সংগ্রাম বা প্রবল

রাজনৈতিক ভিত্তি না থাকলেও শুধুমাত্র বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন বা মতের অনুকূলতা পোষণ করেই তাঁরা সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী বনে যান। পড়াশুনো, বিদ্যাচর্চা অথবা জ্ঞানগর্ভ লেখা-জোকা মাথায় ওঠে। তাঁরা তখন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রচার করেন, পরিবর্তে যথোচিত তথা রাজোচিত ভোগবিলাস লাভ করেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ এবং তাঁদের ছত্রছায়ায় থাকার ফলে জনসাধারণ যখন জতুগৃহের আগুনে পোড়ে, তখন তাঁদের স্বাধীন মত থাকে না, সকলের সামনে যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়, তখন তাঁদের চুপ করে থাকতে হয়, যখন সরকারের সপ্তরথী মিলে অভিমন্যু বধ করে, তখন তাঁদের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিতে হয়—সাক্ষীর মতো, উদাসীন চৈতন্যের মতো। উটের সঙ্গে উটিনীর বিয়ে হয়। গাধারা গান গায়।

আসলে যে ব্যাপারটায় সবচেয়ে বড় গোলমাল হয়ে গেছে—সেটা হল স্বধর্ম-ত্যাগ। আমি বলেছিলাম—চতুর্বর্ণের লোকেরা তাঁদের বর্ণোচিত কাজকর্ম ঠিকঠাক করছে কিনা সেটা দেখা রাজার একটি প্রধান কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আমি আবারও বলছি—স্বধর্ম বলতে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যর ভক্তিভাব বোঝায় না। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম যজন-যাজন অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, বৈশ্যের ব্যবসা, আর শূদ্রের শ্রমজীবিতা। এরা প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম অর্থাৎ কাজটি ত্যাগ করবে বলে শাস্ত্রকার এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সব সময় একটা ভয় ছিল। পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি—যে গ্রন্থই বলুন, সব জায়গাতেই ওই এক কথা—স্বধর্ম ত্যাগ কোরো না, নিজের ধারায় আপন কাজটি করে যাও। এমনকি স্বধর্মত্যাগীদের জন্য প্রয়োজনে রাজদণ্ডও ব্যবহার করা যেতে পারে।

দেখুন, আজকাল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শব্দগুলি শুনলেই সবাই কেমন যেন এক প্রতিক্রিয়াশীল গন্ধ পান। আমি বলব—আমাদের কথাটা একটু ভেবে দেখুন। একটা জিনিস প্রথমে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেকটা আমাদের পূর্বতন পিতা ঠাকুর কিংবা প্রপিতামহের মতো। তাঁরা এক কথা বার বার বলেন, নিজের মতে বড় বেশি একগুঁয়ে হয়ে পড়েন এবং সে মত না মানলে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয় দেখান। আমি বলব—এ সবই ঠিক। বিরাট 'জেনারেশন গ্যাপে' আজকে যেমন তাঁদের কথাটা আমাদের কটু লাগে, তেমনই এটা যেন ভাববেন না যে, আমরা ভীষণ প্রগতিশীল, ভীষণ 'মডার্ন' অতএব আমাদের পুত্র-পৌত্র কিংবা প্রপৌত্রদের সঙ্গে আমরা বেশ মানিয়ে যাব। বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন—একই রকম একটা 'গ্যাপ' আবারও তৈরি হয়ে গেছে, যা আমার সঙ্গে আমার বাপ-ঠাকুরদার ছিল। বস্তুত এই নিরিখে আমাদের আরও একটু সহনশীল হওয়া প্রয়োজন এবং এই দৃষ্টি থাকলে নতুন যুগের নতুন আলোকে পুরাতন শাস্ত্রকারদের কথা আমরা সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব। এবারে স্বধর্ম এবং স্বধর্ম ত্যাগের কথাটা বলি।

আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন—এতটা আশা করি না, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবুন। লক্ষ করে দেখুন, আজকাল কেউ তার কাজটি ঠিক মতো করছে না।

শিক্ষক-অধ্যাপকেরা মন দিয়ে পড়ান না, তাঁরা হয় টিউশন করেন, নয় পলিটিকস্ করেন। আমি সবার কথা বলছি না, কিন্তু বেশির ভাগের অবস্থা এই রকম। তাঁদের টাকা চাই, আরও টাকা; ক্ষমতা চাই, আরও ক্ষমতা। আর আমাদের পূর্বতন মাস্টারমশাইরা কী করে গেলেন? সারা জীবন অল্প মাইনেতে চাকরি করে, ডাইনে-আনতে বাঁয়ে ফুরিয়ে যখন গিন্নির কাছে গঞ্জনা খাচ্ছেন, তখন সন্ধের সময় ছাত্রের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ঘুরে গেল। মাস্টারমশাই বললেন—তুই ইংরেজিটা ভালই লিখছিস বটে, কিন্তু তোর 'প্রিপোজিশন' তো ঠিক হচ্ছে না, যেখানে সেখানে 'টু', 'অন' আমদানি করছিস, আবার যেখানে সেখানে বাদও দিচ্ছিস। গিন্নিমা, যিনি এতক্ষণ স্বামীকে গালাগাল দিচ্ছিলেন, নিমেষে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন—অ! প্রদোষ এসেছিস—যা তো বাবা! মুড়ি নিয়ে আয়, আমি একটু চা করি, সবাই মিলে খেয়ে নে।

এই চিত্র দেখলে আজকাল কী ব্যাখ্যা হবে? মাস্টারমশাইটি ভাবালু, বোকা, কল্পরাজ্যে বাস করেন। মাস্টার গিন্নি স্বার্থপর, বাড়িতে পড়া বুঝতে-আসা ছাত্রটিকে খাটিয়ে নিচ্ছেন। আর ছাত্রটি গাধা। আমি বলব—এর কোনওটাই নয়। শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মাস্টার তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করছেন না। মাস্টারগিন্নি অশিক্ষিত হলেও ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক সৃষ্টির মুহূর্তেই নিজের জায়গায় জননীত্বের পরিসরে দাঁড়িয়ে পড়ছেন এবং এই প্রদোষ নামক ছাত্রটি পরীক্ষায় চরম নম্বর পেয়ে বেরয়। আজকে মনে পড়লে চোখে জল আসে। আমার স্বর্গীয় অধ্যাপক ভবণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পার্ক সার্কাসে পড়তে গেছি। শীতের রাতে ন'টার সময় যখন বাড়ি ফিরব, তখন তাঁর মনে হল আমি বেলা সাড়ে বারোটার সময়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। আমার আর কিছু খাওয়া হয়নি এবং শীতের গরম-জামাও গায়ে কিছু নেই। খাবার ব্যবস্থা তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের গা থেকে নামিয়ে নিজের চাদরখানি আমার গায়ে চড়িয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন এই ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি, তিনি তখন বললেন—'আমরা ছাত্রদের জন্য কিছুই করতে পারি না। আমার মাস্টার মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ফনিভূষণ তর্কবাগীশের বাড়িতে থেকেই আমি ছোটবেলায় পড়তাম। শীতের দিনে তর্কবাগীশের স্ত্রী আরও একটি ছেলে এবং আমাকে তাঁর ছেঁড়া কাঁথার তলায় নিয়ে শুতেন। প্রবল শীতে বাড়তি পাওনা ছিল তাঁর স্নেহের উষ্ণতা।' উল্লেখ্য, আমার সঙ্গে আমার অধ্যাপকের এবং আমার অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর অধ্যাপকের কোনও টাকা পয়সার সম্পর্ক ছিল না। যা ছিল—তা শুধুই লেখাপড়ার সম্পর্ক এবং ওই উষ্ণতা।

আজকাল এই সম্পর্ক এবং উষ্ণতা ভাবালুতা বলে গণ্য হতে পারে। তা হোক। কিন্তু আজও যে ছাত্ররা পয়সা দিয়ে পড়তে চায় এবং বলে—অমুক স্যারের পড়া বুঝতে পারছি না, তমুক স্যারের লেকচার বুঝতে পারছি না—আমি তাদের বলি—তোমরা যাঁদের পড়া বুঝতে পারছ না, তাঁদেরকেই ভালভাবে ধরো। তাঁরা

নিশ্চয় তোমাদের সমস্যা বুঝবেন। এরপরেই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি—যে ছাত্র বা ছাত্রীকে এই সদুপদেশ দিচ্ছিলাম—তারা নিজেরাই টাকা-পয়সা ছাড়া মাস্টার মশায়ের কাছে পড়তে দ্বিধা বোধ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবারও কেমন যেন আজকাল টাকা-পয়সার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষকের কাছে ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে অসম্মানিত বোধ করেন। আসলে সেই যে কথাটা বলছিলাম—কেউ তাঁর স্বধর্মে স্থিত নেই। শিক্ষক-অধ্যাপক সেই পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারছেন না, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়েই অথবা বিদ্যালয় ছাড়াও তাঁদের সাহায্য পেতে পারে। আবার ছাত্রছাত্রীদেরও নিজের অহংকার অথবা তাদের অভিভাবকদের আত্মসম্মান এত বেড়েছে যে, তাঁরা শিক্ষকদের কাছে নির্দ্বিধায় নিজের জোরে যেতে পারছেন না বা অভিভাবকরাও তাঁদের নির্দ্বিধায় পাঠাতে পারছেন না। অভিভাবকদের আমি আরও দোষী মনে করি কেন না, তাঁদের সন্তানেরা এখন প্রায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দুধের বাছা থাকে। কিন্তু সেই বাছাদের যদি কোনও কারণে—সে কারণ শিক্ষার অল্পতাই হোক অথবা অসভ্যতা, অপব্যবহার—যদি সেই কারণে শিক্ষকের কাছে উলটো অপব্যবহার জোটে, তাহলে অভিভাবকেরা এত বেশি সংপৃক্ত এবং জড়িত হয়ে পড়েন যে, তাতে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়।

আবার বিদ্যালয়ের পরিসর ছেড়ে মহাবিদ্যালয়ের স্তরে আসুন। সেখানে শিক্ষক যেমন আত্মলাভের জন্য হয় টিউশন করেন নয় পলিটিকস্ করেন, তেমনই ছাত্রও তার অধ্যয়ন-তপস্যা ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ ছাত্রের যা স্বধর্ম সে তা ত্যাগ করেছে। সে প্রতিপদে শিক্ষকের জীবন এবং আচরণ নিয়ে চিন্তিত। অপিচ সংঘশক্তির জোরে তারা এমন সব মুষ্টিযোগ অবলম্বন করে, যাতে অধ্যাপনার অনাবিল ইচ্ছে যাঁদের মধ্যে একটুও যা ছিল, তা সবই অন্তর্হিত হয়।

স্বধর্ম ত্যাগ শুধু এখানেই নয়। আপনি যে কোনও অফিসে যান—করণিকেরা তাঁদের আপন কাজ করেন না। তাঁরা ঊর্ধ্বতন অফিসারের সময়মত হাজিরা নিয়ে যতখানি চিন্তিত, নিজেদের কাজ নিয়ে ততটা নয়। সরকার থেকে যখন সময়মত হাজিরা দেওয়ার জন্য 'সার্কুলার' আসে, তখন একাধিক করণিক রাজ কর্মচারীকে সকাল ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়—কখন কোন অফিসারেরা আসছেন—তার নজরদারি করার জন্য। এঁরা অফিসে আসেন, থাকেন ইউনিয়ন রুমে, আর ঊর্ধ্বতন অফিসারের গুণাগুণ বিচার করে জীবনের বিপ্লব সমাধা করেন। অন্যদিকে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা এখন বেশির ভাগ সময় যে কাজটি করেন, সেটা হল করণিকের কাজ। না করে উপায় নেই, সরকারি অফিসার, ব্যাঙ্ক অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ—সবাইকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর পারেন—তাঁদের সারা দিনের অর্ধেক সময় যায় করণিকের কাজে, আর অর্ধেক অধস্তনদের সমস্যা শ্রবণে।

পিতা-মাতার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁদের বেশির ভাগ আত্মজ সন্তানদের

যতখানি স্নেহ দান করেন, তার থেকে অনেক বেশি তাঁরা নিজেদের জন্য চিন্তিত। নিজেদের 'কেরিয়ার', 'প্রেস্টিজ', 'স্টেটাস' এবং বহির্বিলাস নিয়ে তাঁরা এত ব্যস্ত যে, শিশুর শৈশব খুব তাড়াতাড়ি যৌবন-রসে জারিত হয়। বাচ্চাদের তাঁরা বেশি সময় দিতে পারেন না বলেই তাঁদের এক ধরনের অর্ন্তদাহ থাকে, যার ফলে শিশুরা আজকাল অনেক ভোগ-বিলাস আগে থেকেই পায় এবং সত্যি বলতে কি অনেক কিছুর স্বাদ পূর্বাহ্নেই হারায়। এই সব পিতা-মাতা—যাঁরা জনক-জননীর প্রাপ্য সমীহ থেকে যুবক-যুবতীর প্রাপ্য রোমাঞ্চ অনেক বেশি পছন্দ করেন—তাঁরা যদি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের পুত্রেরা মা-বাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে এবং তাঁদের মাথায় করে রাখবে—তাহলে ভুল ভেবেছেন। উচ্চতরের স্বধর্মত্যাগ নিম্নতরকে স্বধর্মত্যাগে প্ররোচিত করে।

ছাত্র-শিক্ষক, পিতা-পুত্র অফিসার-করণিক—কেউ যে আজ নিজের কাজ করছেন না, স্বধর্মত্যাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে এই যে অধস্তনেরা উর্ধ্বতনের সমতা চাইছেন—এই জিনিসটাকেই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—একে অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করেন, শূদ্র ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করেন ইত্যাদি। মনু মহারাজ এই কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—প্রবর্ত্তেতাধরোত্তরম্, অর্থাৎ ওপরের মানুষ নীচে চলে আসেন, নীচের মানুষ ওপরে। এরফলে ছাত্র শিক্ষকের ওপর খবরদারি করে, পুত্র পিতার অভিভাবকত্ব করে, করণিক অফিসারকে তাড়ন করে। আমি একথা বলছি না যে, পুরনো দিনে অফিসার, শিক্ষক বা সংসারের কর্তা-বাবাটি খুব যথাযথ ব্যবহার করেছেন; বরঞ্চ বলব—তাঁদের স্বার্থপরতা এবং কায়েমী মনোভাবের জন্যই আজকের সমাজে এই সাংঘাতিক উলটো টান এসেছে। এটাই স্বাভাবিক ছিল। তীব্র রাজনৈতিক মদতে এই উলটো টান ত্বরান্বিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সভ্য-ভব্য নেতারা কয় বছরের মধ্যেই বুঝে গেছেন যে, এই বিপ্লব সবার মধ্যেই এক অদ্ভুত বিপন্নতা তৈরি করেছে, তৈরি করেছে নতুন এক নির্বিঘ্নতা—সবাই বলছে—কাজ করে কী হবে, কাজের পরিবেশ নেই।

মহাভারতে ব্যাস লিখেছিলেন—ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ। কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্মনিরতাঃ প্রজাঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এঁদের লক্ষণ আমি করেছি। সত্য যুগে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করতেন। শ্লোকটিতে ব্যাসের একটি নঞর্থক ইঙ্গিত আছে অর্থাৎ সত্যযুগে করত বটে, কিন্তু এখন আর করে না। অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রাহ্মণ যজন যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়ে থাকত, কিন্তু এখন আর থাকে না। সত্যযুগে ক্ষত্রিয় পুরুষেরা প্রজাদের মনোরঞ্জন করত, এখন আর করে না। সত্যযুগে বৈশ্যরা ঠিকঠাক ব্যবসা বাণিজ্য করত, কিন্তু এখন আর করে না। আবার সত্যযুগে শূদ্রেরা সবার সেবা করত, কিন্তু এখন আর করে না।

কথাগুলো আমরাও একভাবে বলি। মহাভারতের ব্যাস যদি প্রথম কলির মানুষ হন, তো আমরা হলাম শেষ কলির। ব্যাস যে কথাটা সত্যযুগ আর কলিযুগের রূপকে

বলতে চেয়েছেন আমরা সেই কথাটাই বলি এইভাবে যে—সে যুগে যা দেখেছি, এখন আর তা দেখি না। দেখেছি—ভোর সকালে কর্পোরেশনের লোকেরা জল দিয়ে রাস্তা ধুত, এখন আর ধোয় না। দেখেছি—জমাদার রাস্তা পরিষ্কার করত এখন আর তেমনটি করে না। দেখেছি—বশংবদ কাজের লোক মন দিয়ে সেবা করত, এখন আর করে না। দেখেছি শিক্ষককে, ছাত্রকে, মাকে, বাবাকে, মন্ত্রীকে, নেতাকে—কিন্তু কেউই এখন যেন তাঁর নিজের কাজটি করছেন না। অথচ সমাজে যে ভেদাভেদ ছিল, তা রয়েই গেছে।

আসলে জন্ম বা বংশপরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞাতেই আমাদের সমাজে যত গণ্ডগোল বেধেছে। এই সংজ্ঞার মধ্যে যদি গুণ এবং কর্মের জোরটাই বেশি থাকত, তাহলে আমাদের সমস্যা হত না, ঠিক যেমন সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় সত্যি সত্যিই যদি 'ডিকটেটরশিপ অব্ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস' সঠিক রূপ নিত, তাহলে সমাজতন্ত্রেরও কোনও সমস্যা হত না। সমস্যা হয়েছে 'ডিকটেটরশিপ অব দ্য পার্টি অথবা পার্টি লিডার' নিয়ে। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় তো এটা প্রত্যাশিত নয়। ফলে যে সমস্যা বা যে কায়েমী স্বার্থ ব্রাহ্মণ-রাজন্যের ধারায় দেখা গেছে, ঠিক একই ধরনের সমস্যা বা একই ধরনের কায়েমী স্বার্থের ধারা সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের ধারাতেও লক্ষ করা যায়। আমরা যখন ভগবদ্গীতায় অথবা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মুখে অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মপদে বুদ্ধের মুখে চরিত্র গুণ এবং কাজের নিরিখে ব্রাহ্মণ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে দেখি, তখন আমরা খুশি হই, ঠিক যেমন পনেরো দিনের পারি-কমিউনে সমাজতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ দেখে স্বয়ং মহামতি মার্কস খুশি হয়েছিলেন এবং আমরাও খুশি হয়েছি।

কার্যত কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল অথবা কায়েমী স্বার্থের চাপে আদর্শ সমাজতন্ত্রের প্রতিরূপ পারি-কমিউন যে রকম টেকেনি, তেমনই বংশপরম্পরায় স্বার্থ-সাধনে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্যের চাপে আদর্শ গুণ-কর্মগত ব্রাহ্মণ্যও টেকেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-রাজন্যের ধারণাটাই খারাপ তা আমরা মনে করি না, বিশেষত ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য যে কোনও মানুষের স্বধর্মত্যাগও আমরা সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যেই গণ্য করি। আমি বারবারই বলছি ফোঁটা-তিলক-টিকি দেখে ব্রাহ্মণের বিচার হয় না। এখনকার নতুন আলোকে দেখতে গেলে বুদ্ধিজীবিতাই ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক হওয়া উচিত, যদিও স্বয়ং বুদ্ধিজীবীরাই এখন স্বধর্ম এবং স্বকর্ম ত্যাগ করে বুদ্ধিজীবিতার পথ থেকে সরে এসে বৈশ্য বা রাজার বৃত্তি অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ তাঁরা এখন পলিটিক্সেই অভ্যস্ত অথবা ব্যবসাতে। অন্যদিকে রাজশক্তি এখন প্রজারঞ্জনের স্বধর্ম থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ভাবে দলবদ্ধতার সূত্রে দলগত কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলেছে। এখন সামাজিক শোষণ চলে দলগতভাবে। তাঁরা মদত পাচ্ছেন তাঁদেরই মতান্বয়ী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে।

আবার বৈশ্যশক্তির দিকে তাকান। যাঁরা যে কোনও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত, তাঁরা এখন সার্বিক অর্থনীতির দিকে তাকান না। কারণ বিশিষ্ট

রাজনৈতিক দলের পোষণা করেই তাঁরা তাঁদের মুনাফা লুটছেন আর গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের দলগুলি সরকারে এলেও মুনাফাবাজ ধর্মত্যাগী ব্যবসায়ীদের কিছু বলেন না। কারণ প্রধানত ব্যবসায়ীদের অর্থ খরচা করেই তাঁরা গণতন্ত্র বা সমাতন্ত্রের নেতৃপদে আসেন।

শ্রমিক-কৃষক বলে যাঁদের আমরা আজকাল মৌখিক সম্মান দেখাই, তাঁদেরই প্রাচীনেরা শূদ্রশক্তির মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁদের অবস্থা সেকালেও যা ছিল, একালে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের যুগেও তাই আছে। মাঝখান থেকে যেটা লাভ হয়েছে, সেটা হল তাঁরা স্বকর্ম ত্যাগ করেছেন, উৎপাদনের হার নামিয়ে দিয়েছেন। আমি জানি—শূদ্র শব্দটার মধ্যে হাজার হাজার বছরের জন্মগত ঘৃণা নিহিত আছে এবং এই শব্দ ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে ন্যক্কারজনক। কিন্তু এভাবে ভাবলে শ্রমিক, কৃষক—ইত্যাদি শব্দও কোনও সম্মানের দ্যোতনা করে না, বরঞ্চ 'ওয়ার্কিং ক্লাস' কথাটা অনেক ভাল। যদি বলেন—রাজশক্তি এখন শ্রমিক-কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছেন, তাহলে বলব—সেটা একেবারেই কথার কথা। সরকার বা সরকারি দলগুলি তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ বা কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই তাঁদের ব্যবহার করছেন মাত্র। না, তাঁদের শ্রম বা উৎপাদনী ক্ষমতা তাঁরা ব্যবহার করেন না, ব্যবহার করেন তাঁদের জনশক্তি, সংঘশক্তি। একথা অবশ্যই ঠিক যে, সংঘশক্তির দৌলতে শ্রমিক-কৃষকের নিজেদের ব্যক্তিগত আত্মসম্মান বোধ বা আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়েছে, কিন্তু সেই আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস বেশির ভাগ সময়েই কাজে লাগছে যথার্থ সম্মানিতের সম্মানহানির কাজে, সংঘশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে নিরুদ্যমে এবং কর্মত্যাগে।

নয়

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন—আমি বুঝি সামাজিক অচলায়তনে বিশ্বাসী কোনও জড়বুদ্ধি বৃদ্ধ, যে নাকি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র ইত্যাদি বর্ণভেদের সাফাই গাইতে বসেছে। মোটেই তা নয়। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল—আমরা রাজতন্ত্রের যে কুফলগুলি দেখেছি তা আজও দেখছি কিনা? বস্তুত, আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখছি—তাতে সেকালের রাজা যেমন ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন করে, ব্যবসাদার বৈশ্যদের হাত করে, শূদ্রদের কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ গুছোতেন—এখনকার নেতারাও তেমনই বুদ্ধিজীবীদের হাত করে, বিশিষ্ট ব্যবসাদারদের আনুকূল্যে, শ্রমিক-কৃষকের সংঘশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখছেন। নইলে দেশের এই দৈন্যদশা কেন? অথবা হতে পারে, নেতাদেরই সে যোগ্যতা নেই। অথবা যে জনসাধারণকে অবলম্বন করে নেতারা গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই জনগণের গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ধারণের যোগ্যতা নেই ভারতবর্ষে। এককালে যে সামাজিক অচলায়তন ভাঙার জন্য শিক্ষককে রাজনীতিতে সামিল করা

হয়েছিল, করণিককে কলম ছাড়তে বলা হয়েছিল, শ্রমজীবীকে ধর্মঘট করতে বলা হয়েছিল—সেই শিক্ষক এখন ক্লাস করতে চান না, মাইনে চান; সেই করণিক আর কলম ধরতে চান না, শুধুই মাইনে চান; আর সেই শ্রমজীবীরা এখন আর উৎপাদনশীলতার মধ্যে নেই, কিন্তু হপ্তা চান ঠিক ঠিক। গণ-সমাজতান্ত্রিক নেতাদের এখন বারে বারে বলতে হচ্ছে—আপনারা আপনাদের নিজের কাজ ঠিক ঠিক মতো করুন। দাবি-দাওয়া নিশ্চয়ই আছে, তা থাকবেও, কিন্তু তা মীমাংসা করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে, কর্মত্যাগ করে নয়, উৎপাদন হানি করে নয়।

মহাশয়! প্রাচীনেরাও তো ওই একই কথা বলেছেন—নিজের কাজটি ঠিক মতো করো, স্বধর্ম, স্বকর্ম ত্যাগ কোরো না—তাতে সমাজে উলটো টান আসবে—প্রবর্ত্তেতাধরোত্তরম্। বস্তুত, রাজাদের মধ্যে যদি সত্যিকারের প্রজারঞ্জনের অসাধারণ গুণ থাকত, তাহলে যেমন সেকালেও তাঁরা নিঃস্বার্থ গুণী রাজা বলেই গণ্য হতেন, তেমনই একালেও যদি সেইরকম সর্বগুণসম্পন্ন নেতা থাকতেন, তাহলে তিনি, গণতন্ত্রীই হোন আর সমাজতন্ত্রীই হোন, তিনিও আদর্শ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে নিয়ে যেতে পারতেন। একজন রাজা, রাজা হিসেবে কতটা সফল হবেন, তা যেমন নির্ভর করত মানুষ হিসেবে তিনি কতটা ভাল, কতটা স্বার্থহীন—তার ওপর—তেমনই একজন গণ বা সমাজতান্ত্রিক নেতা কতটা সফল হবেন তাও নির্ভর করে মানুষ হিসেবে তিনি কতটা ভাল, কতটা স্বার্থহীন তার ওপর। এই স্বার্থহীনতাই রাজধর্মে রাজার সফলতার মাপকাঠি এবং এই স্বার্থহীনতাই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বিশিষ্ট নেতার সাফল্যের মাপকাঠি। এই স্বার্থহীনতা যদি রাজতন্ত্রের যুগে না থেকে থাকে, তাহলে এখনও নেই। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

শেষ করার আগে একটা কথা আবার বলি। আমি প্রাচীন ভারতের গণরাজ্যের ধ্যানধারণায় এমন কিছু আশ্চর্য হচ্ছি না, ঠিক যেমন এখনকার গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে এমন কিছু পুলকিত হই না। এ কথা আমি আগেও বলেছি এবং আবারও বলি—যে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার রুখতে আমরা আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছি, সেই গণতন্ত্রের মধ্যে যদি বিশিষ্ট কতিপয় নেতার রাজসুলভ শাসনই চলতে থাকে, তাহলে আর গণতন্ত্রের অর্থ রইল কী? তাছাড়া সমান্তরালভাবে কতগুলি প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, সময়ে শুধু তার নাম বদল হয় মাত্র। যেমন ধরুন—সেকালের দিনে ব্রাহ্মণেরা অনেকেই রাজা হতেন না, কিন্তু রাজা তৈরির ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা থাকত। তাঁদের বলা হয়েছে—রাজকর্ত্তার:—কিংমেকার্স্। রাজত্ব চলাকালীন রাজাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও দিতেন ব্রাহ্মণেরাই। সেকালের রাজধর্মপ্রণেতারাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, রাজা মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি—যত বড় বড় মানুষের সঙ্গেই আলোচনা করুন না কেন, সব বিষয়েই তাঁর চরম আলোচনার চূড়ান্ত পাত্রটি হলেন একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—সর্বেষাম্ত বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন

বিপশ্চিতা। মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং ...। আমি সবিনয়ে জানাতে চাই এখনকার গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে এই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হলেন পার্টি-সেক্রেটারি। সমস্ত সামাজিক- রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজার পাশাপাশি যে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণটি নিরুপাধিকভাবে রাজ্যের শাসনবিধি পরিচালনা করতেন, তাঁরই পূর্ণ অংশে অবতার গ্রহণ করেছেন এখনকার দলীয় সম্পাদকেরা। এই একজন স্বনিযুক্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরও অনেক ব্রাহ্মণই রাজাকে যথাযোগ্য বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং রাজাকে তাঁদের সবার পরামর্শ অনুসারেই চলতে বলা হয়েছে—তিষ্ঠেৎ তেষাঞ্চ শাসনে। এখনকার গণতন্ত্রে সেই ব্রাহ্মণেরাই 'কলিমাশ্রিত্য' পার্টি-মেম্বার হয়ে জন্মেছেন।

যদি বলেন—তখনকার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন 'প্রিভিলেজড্ ক্লাস' আমি বলব এখনকার দলীয় সদস্যরাও তাই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা ত্রিবেদজ্ঞ ছিলেন তাঁদেরকে আপনি দেখতে পাবেন দলীয় দর্শন-জানা সদস্যদের মধ্যে। অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিক নেতারা হলেন এই গোষ্ঠীভুক্ত। সুযোগসন্ধানী দক্ষিণাকামী ব্রাহ্মণদের দেখতে পাবেন সরকারে না-আসা বিভিন্ন গণনেতা এবং দলের সর্বক্ষণের কর্মীর মধ্যে। ব্রাহ্মণের আচার পালন করেন না, অথচ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করে যে সমস্ত ব্রাহ্মণব্রুব ব্যক্তি সেকালে নিজের সুবিধে আদায় করতেন—তাঁদের পরিচয় পাবেন আরও অসংখ্য দলীয় কর্মীদের মধ্যে। সেকালের অন্যায়কারী ব্রাহ্মণকে পুলিশ কিংবা রাজপুরুষ ধরতে পারত না, এখনকার দিনেও পার্টি-ক্যাডারদের পুলিশ কিংবা রাজপুরুষ কিছুই করতে পারেন না। একই অপরাধে অন্য জাতি-বর্ণের যে দণ্ড বিহিত ছিল, ব্রাহ্মণকে তার থেকে কম দণ্ড পেতে হত। এখনকার দিনে একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি শাসক দলের কর্মী হন, তবে তাঁর যা শাস্তি হবে, তার থেকে অনেক বেশি শাস্তি হবে—যিনি শাসক দলের লোক নন, তাঁর। মনু বলেছেন—যাগ-যজ্ঞ করে, হোম করে যে ফল হবে, তার থেকে অনেক বেশি ফল হবে, যদি রাজা ব্রাহ্মণের মুখে বা হাতে তাঁর ধনসম্পত্তির আহুতি দেন।—বরিষ্ঠম্ অগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—যাঁরা উৎসব করেন, পার্টি দিয়ে নানাভাবে ধনসম্পত্তির সদ্ব্যয় করছেন, তাঁরা ঢের ঢের বেশি ফল পাবেন, যদি তাঁরা পার্টির মুখে বা হাতে অথবা আরও আধুনিক পরিভাষায় 'পার্টি ফান্ডে' ধনাহুতি প্রদান করেন।

আমি বিশেষ সুবিধা-পাওয়া এই ব্রাহ্মণ শ্রেণির কথা তুলতাম না। কিন্তু আজকাল প্রায়ই একশ্রেণির রাজনীতিবিদ এবং অজ্ঞ পণ্ডিতম্মণ্যের মুখে ব্রাহ্মণদের নানা সুযোগ-সন্ধানী এবং বিশেষ সুবিধাভোগী ভূমিকার কথা শুনি। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধও নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আছেন—সে কথাটা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়। আমি এই চতুর্বর্ণের ক্রিয়াকলাপ এবং স্বধর্মের পরিচয়ের মধ্যে আর

যাচ্ছি না। আপাতত বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং ভূসুর ব্রাহ্মণ দলের আধুনিক পরিচয় সূত্রাকারে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি মাত্র।

ভাগবত মহাপুরাণে কৃষ্ণ ভগবান এক জায়গায় তাঁর অবিনীত সন্তানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—বাবা সকল! ব্রাহ্মণেরা যদি রেগেও যান, তবু কদাপি তাঁদের প্রতি দ্রোহ প্রকাশ কোরো না। তাঁরা যদি তোমাদের পেটান, মেরে ফেলেন, গালমন্দ করেন, তবু তাঁদের সব সময় বিনীত হয়ে নমস্কার করবে—ঘ্নন্তং বন্ধ্নপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ। ঠিক একই ভাবে আমরাও আমাদের প্রগল্‌ভ জনসাধারণকে বলি—শাসক দলের নেতা, সদস্য, এমনকি কর্মীরা যদি রেগেও যান, তবু তাঁদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ো না। তাঁরা যদি পেটান, মেরে ফেলেন অথবা গালমন্দ করেন, তবু তাঁদের উদ্দেশে বিনীত নমস্কার জ্ঞাপন করা উচিত। যদি তা না করো তবে সমূহ বিপদ হবে।

এই শাসকদলের ব্রাহ্মণ-রূপ প্রতিটি সদস্যই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। জন্মের পর উপযুক্ত সময়ে দলীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দ্বিজত্ব লাভ হয় দলীয় নেতা এবং তাত্ত্বিকদের যে জ্ঞানই থাকুক না কেন, দলের সাধারণ কর্মী-ব্রহ্মচারীরা প্রত্যেকেই শ্রুতিপরম্পরায় নির্ভর করেন এবং শ্রুতিকেই পরম প্রমাণ বলে মনে করেন অর্থাৎ দলের অগ্রজ দাদাদের কাছে যা তাঁরা শোনেন, সেই শ্রুতিই তাঁদের কর্তব্যবিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাছাড়া কখনও যদি শ্রুতি এবং আপন বই-পড়া স্মৃতিতে বিরোধ ঘটে, সেখানে শ্রুতিকেই তাঁরা দলের ধর্ম এবং কর্ম বিষয়ে অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কথাটা বোধহয় ভাল বোঝা গেল না, একটু বুঝিয়ে বলি।

আপনারা ভালভাবেই জানেন যে, সেকালের দিনে বেদমন্ত্র লিখে লিখে পড়ার রীতি ছিল না; সব ব্রাহ্মণই বেদ পড়ার জন্য গুরুকুলে যেতেন এবং গুরুর মুখ থেকে বারংবার বেদমন্ত্র শুনে এবং আবৃত্তি করেই বেদাভ্যাস করতে হত। গুরুর মুখে শুনতে হত বলেই বেদকে শ্রুতি বলা হয়। পরবর্তীকালে এই অখণ্ড বেদ অনেকের পক্ষেই ধারণ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় বেদার্থ সংকলন করে প্রাচীন আচার্যরা কতগুলি নিবন্ধ রচনায় মন দিলেন। এই রচনাগুলিকেই 'স্মৃতি' বলা হয়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, অত্রি—এইসব মুনি-ঋষির নামেই এই স্মৃতি গ্রন্থগুলি পরিচিত। শাস্ত্রচর্চায় এই স্মৃতি-নিবন্ধগুলির মূল্য অসীম এবং বেদের অর্থ বুঝবার ব্যাপারে স্মৃতি-রচনাগুলির প্রামাণ্য আচার্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বীকৃত। কিন্তু একটাই এখানে ব্যাপার আছে। বেদবিহিত কর্ম এবং আচার প্রসঙ্গে কোনও বিষয়ে যদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদের সঙ্গে স্মৃতির বিরোধ ঘটে, তাহলে স্মৃতির বচন বাদ দিয়ে শ্রুতির অক্ষরকেই চরম প্রমাণ বলে মেনে নিতে হবে; কারণ, শ্রুতি এবং গুরুপরম্পরায় যে বেদ আমাদের মধ্যে নেমে আসছে, তার 'অথরিটি' নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যায় না। কথায় বলে—শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী।

এইবারে মূল প্রস্তাবে আসি। দলের মন্ত্রে নবদীক্ষিত কর্মী ব্রহ্মচারী যাঁরা, তাঁরা কিন্তু মহান নেতাদের মুখনিঃসৃত সমস্ত বাণীই ছোট-বড়-মাঝারি অগ্রজ নেতাদের পরম্পরায় শুনে আসছেন। এই বাণীকেই তাঁরা শ্রুতির মর্যাদা দেন এবং শ্রুতির 'অথরিটি' যেমন 'চ্যালেঞ্জ' করা যায় না, তেমনই নেতাদের 'অথরিটি' ও 'চ্যালেঞ্জ' করেন না ব্রহ্মচারী কর্মীরা। কিন্তু মুশকিল হয় দলগত দর্শনের গ্রন্থাদি নিয়ে। যে সমস্ত দলীয় ব্রহ্মচারী রাজনৈতিক শিক্ষার বনিয়াদ পাকা করার জন্য মূল দর্শন এবং তাত্ত্বির গ্রন্থগুলি পড়েন, তাঁরা অনেক সময়েই দেখেন আদর্শনির্ণায়ক গ্রন্থগুলির সঙ্গে দাদা-নেতাদের মুখনিঃসৃত শ্রুতিপরম্পরার বিরোধ ঘটছে। এইসব ক্ষেত্রে ব্রহ্মচারী দল কর্মী নিজেদের পড়া তাত্ত্বিক বই বা স্মৃতি শাস্ত্রের থেকে দাদাদের, থুড়ি, গুরুদের পরম্পরায় নেমে আসা শ্রুতিকেই অব্যর্থ প্রমাণ বলে মনে করেন এবং সেই কথাগুলির চরম মূল্য দেন। আমি সেই জন্যই বলেছি সেকালের পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণদের মতো দলীয় কর্মীরাও একান্তভাবে শ্রুতিনির্ভর। যদি আমার পুনরাবৃত্তি দোষ ক্ষমা করেন, তাহলে সেই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কথা আরও একবার উল্লেখ করে দলীয় কর্মীদের শ্রুতিপরায়ণতা প্রকাশ করা যায়। তিনি লিখেছেন—

This is the case in fascist Parties and in Communist Parties as far as Stalin is concerned. The Leader is omniscient,omnipotent, infallible, and infinitely good and wise: every word that falls from his mouth is true: every wish emanating from him is party law.

লক্ষণীয় ফাসিস্ত পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই লেখায় একই পংক্তিভুক্ত।

মহাভারত বলেছে—রাজার বল যদি ক্ষীণ হয়ে যায়, ওই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই তখন রাজার প্রধান আশ্রয় হবেন—রাজ্ঞো হি ক্ষীয়মানস্য ব্রহ্মৈবাহুঃ পরায়ণম্। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিদের আমরা ক্ষত্রিয় রাজা বলে মনে করি। কোনও কারণে সরকার গোষ্ঠী বিপাকে পড়লে দলের ব্রাহ্মণরাই সরকারি প্রতিনিধিদের প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠেন। ফলে দেবতারা যেমন আত্মশক্তিতে ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি করেন, দলস্থিত ব্রাহ্মণেরাও তেমনই গণতন্ত্রের শাসক-মুখ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। রাজা-হওয়া যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বারবার বলেছেন—ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য সকলেরই অস্ত্রগ্রহণ করা উচিত। গণতন্ত্রে দল এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া এখন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে গণ্য হয়েছে। মনু বলেছেন—যাঁরা ব্রাহ্মণদ্বেষী লোকদের বিনাশ করার জন্য নিজ নিজ শরীরগুলিকে সমরানলে আহুতি দেন, আমি তাঁদের নমস্কার করি। আমরা পাড়ায় পাড়ায় শত শত আত্মদানকারী যুবককে দেখতে পাই যাঁরা দল-বিদ্বেষী লোকদের বিনাশ করার জন্য উদ্দীপ্ত সমরানলে আত্মাহুতি দেন—আমরাও তাঁদের নমস্কার করি।

মহামহর্ষি কশ্যপ মহাভারতে বলেছেন—রাজা! ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় যদি সব

সময় পরস্পরকে রক্ষার জন্য সম্মিলিত থাকেন, তাহলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ হন, আবার ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের উন্নতির কারণ হন। গণতন্ত্রে সরকারে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও যদি দলীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরস্পর সম্মিলিত থাকেন, তবে সরকার দলের উন্নতির কারণ হন এবং দলও সরকারের উন্নতির কারণ হয়ে থাকেন—এতৌ হি নিত্যং সংযুক্তৌ ইতরেতরধারণে। যদি বলেন—সরকার এবং সরকারপন্থী দলের শক্তির উৎস পৃথক, তাহলে আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। ধনাধিপতি কুবেরকে মুচুকুন্দ রাজা এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ব্রহ্মা একই উপাদান থেকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন সরকার এবং সরকারপন্থী দল একই উপাদানে গঠিত—ইদং সৃষ্টম্ একযোনি স্বয়ম্ভুবা। এঁদের শক্তি এবং কাজ যদি, পৃথক পৃথক হত, তাহলে তাঁরা এই জগৎ প্রতিপালন করতে পারতেন না—ন লোকং প্রতিপালয়েৎ। দলীয় তপস্যা এবং দলমন্ত্রের বল দলীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে অবস্থিত, আর সরকারে অধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় ব্যক্তিতে পুলিশাদি অস্ত্রবল তথা ক্যাডারাদি বাহুবল অবস্থিত। অতএব ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—দুয়ে মিলে এই জগৎ শাসন করার বিধান থাকায় দল এবং সরকার দুয়ে মিলেই এই জগৎ শাসন করছেন অথবা করবেন—তাভ্যাং সম্ভূয় কর্ত্তব্যম্।

বস্তুত, যে দলের নেতারা সরকারে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই দলের সমস্ত কর্মীই যে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—একথা আমি আরও সহস্র প্রমাণ দিয়ে বলতে পারি, কেননা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দলের মহিমাকীর্তনে আমার রসনা কখনই তৃপ্তিলাভ করে না। বিশেষত চিরকালের শূদ্র-স্বরূপ জনগণও এখন এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ে অবধারণ করেছে যে, ব্রাহ্মণ-স্বরূপ দল এবং ক্ষাত্রতেজঃসমন্বিত 'ক্যাডার' প্রভৃতি ব্যক্তির সেবা করে তাঁরা শুধু আপন ধর্ম, অর্থ এবং কাম বিষয়েই সফলতা লাভ করবেন না, চাই কি স্বধর্মোচিত সেবার দ্বারা স্বর্গ লাভ করে পুনর্জন্মে নানাবিধ পদমর্যাদাও লাভ করতে পারেন। অতএব জনগণ! ধর্ম যদি মান, তবে দলধর্মের নিয়মানুসারে নিজের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্ম-স্বরূপ দলের প্রতি নিবেদন করো—সর্বশ্রেষ্ঠং বিশিষ্টঞ্চ নিবেদ্যং তস্য ধর্মতঃ। যদি বল—এই নৈবেদ্য-নিবেদনের রীতিনীতি, পূজাপদ্ধতি আমরা তেমন জানি না, তাহলে বলি—ভারতবর্ষে দেবতা হতে সময় লাগে না, পূজাপদ্ধতিও সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার হয়। সন্তোষী মাতা পূর্বে দেবতা ছিলেন না, কিন্তু যদবধি চলচ্চিত্রপ্রসাদাৎ দেবতা হয়েছেন, তখন তাঁর পূজাপদ্ধতিও আবিষ্কার করা গেছে। একইভাবে এই দলের পূজার রীতিনীতি পূজাপদ্ধতিও পার্টি-পুস্তিকার মতো পুরোহিত দর্পণে লেখা আছে। অনুসন্ধিৎসু এবং আগ্রহী পাঠক ইচ্ছে করলেই সেগুলি দেখে নিতে পারেন। এছাড়াও মাঠে-ময়দানে অগ্রজ নেতা-গুরুরা যে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, তার মধ্যেও আপনারা পার্টির দেবতা-বন্দনা থেকে আরম্ভ করে দলের দেবতা

বিষয়ে বহুজন রচিত বহুবিধ স্তোত্রপাঠ শুনতে পাবেন। শূদ্রস্বরূপ জনগণের তো কোনও কালেই বেদে অধিকার নেই, তাই তাঁদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখ নিবারণের জন্য পুরাণ-মুনির মতো নেতারা নৈমিষারণ্যের মতো ময়দানে সমাবেশ করে সেই বিচিত্র পুরাণ কথা শোনান। আপামর জনসাধারণ সেই কাহিনি এবং দেবতা বন্দনা শুনে 'অহো' 'অহো' ধ্বনি দিয়ে সহজেই দলের বেদার্থ হৃদয়ে অবধারণ করতে পারেন, অপিচ তাতে ঐহিক পারমার্থিক—দুই ধরনেরই সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

মহাভারতে নীতির দ্বন্দ্ব

গাঁয়ে-গঞ্জের বারো-তেরো বছর বয়সে গাছে ওঠা ব্যাপারটা বেশ সড়গড় হয়ে যায়। আর ওই বয়সেও যারা এই বিষয়ে অপটু ছিল, তারা কিশোর-পরিবারে ঘৃণ্য বলে গণ্য হত। গাছে ওঠার অভ্যাসটা প্রথমে খেলাচ্ছলেই আরম্ভ হত এবং এই অভ্যাসের প্রক্রিয়ায় বহুবার গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার মতো শুদ্ধ গর্দভীয় আচরণও যেমন উন্নতির চেষ্টা হিসেবে গণ্য হত, তেমনই অন্য কাউকে গাছ থেকে ফেলে দিলে অনৈতিকতার চরম দৃষ্টান্তের চেয়েও নিক্ষিপ্যমান বালক নিজেকে কতটা সামলে হাত-পা না ভেঙে মাটিতে দাঁড়িয়ে বা বসে পড়তে পারত, তা নিজের কাছে নিজেরই প্রমাণ করার দায় ছিল। পরবর্তীকালে নীতিবিগর্হিত ভাবেই বুঝেছি যে ভাই-বেরাদরেরা ওইভাবে গাছ থেকে ফেলে দেবার পরেও নিজেকে সামলে নিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়তে পারাটাও একটা ক্ষমতা এবং তার জন্য যথেষ্ট অভ্যাস করা দরকার, আর সে অভ্যাসটা আমার তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণ ভাইরাই করিয়ে দিত। বারো-তেরো বছরে এইভাবে গাছে ওঠার অভ্যাস পরীক্ষিত হবার পর কোনও কোনও অত্যুৎসাহী নারকেল গাছ এবং খেজুর গাছে ওঠার সাহস করতেন। তবে নারকেলের থেকে খেজুর অনেক সোজা, তার কারণ অনেক খেজুর গাছই নারকেলের তুলনায় কম লম্বা, আর এই গাছে ওঠার যখন প্রয়োজন হয়, তখন গৃহস্থ শীতের প্রাককালে উপযুক্ত লোক ডাকিয়ে গাছের প্রসারিত সমস্ত আবর্জনা এবং কাঁটা মুক্ত করে রাখেন। রসের কলসি মুখে খেজুর গাছ সমস্ত পরিমার্জন ভোগ্যা হয়ে ওঠে রীতিমতো।

তেমনই এক শীতকালে আমাদের গ্রামের স্কুলের মাস্টারমশাইকে দেখলাম—তিনি কলসি বসানোর জন্য কামিন দিয়ে খেজুর গাছ পরিষ্কার করছেন। আমার এক বছরের বড় খুড়তুতো দাদা—যিনি আমাকে বার বার গাছ থেকে নিচে ফেলে দেবার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আমার চিরশত্রুর মধ্যে গণ্য ছিলেন, অথচ সমস্ত গ্রামীণ দুষ্কর্মে আমাকে সাথী করার দুরূহ সৌভাগ্য দান করে আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন, তিনি মাস্টারমশাইয়ের খেজুর গাছ পরিষ্কার করা দেখেই আমাকে বললেন—কবে যাবি? আমি বললাম—দাঁড়া। আর কদিন পরে। শীতটা আরও পড়ুক। রসটা আরও মিষ্টি হবে। তাছাড়া মাস্টারমশাই আমাদের দেখল, তুই তো গাছের ডালগুলোও আবার ধরে ধরে সরালি, তো আজে-কালে গেলে সন্দেহ করবে না? ভাই-দাদার অবশ্য তর সয় না, তবু কিছুদিন সে থামল। কিছুদিন পর শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। আমরা একটু বড় হওয়ার সুবাদে একটু দূরে একটা ঘরে থাকি, রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করি। গাঁয়ে

সাড়ে এগারোটা-বারোটা মানে নিশুতি রাত। আমরা একটি টর্চ নিয়ে খেজুর-রস চুরি করতে বেরলাম।

এখন ভাবি—কী বোকা আহাম্মকই না ছিলাম। সামান্য খেজুর-রসের জন্য শীতের লেপ-কাঁথা ছেড়ে অন্ধকার পথে সেই অভিযান। তবে এটাও বুঝি যে, খেজুর রসের লোভটা সেখানে বড় কথা ছিল না। যেটা ছিল, সেটা হল অন্যায় করার ইচ্ছা। চুরি যাওয়া দেখে মাস্টারমশায়ের ঘৃতেন্ধনী ক্রোধ, বোকা বনে যাবার জন্য তাঁর অসহায় আন্দোলন—এগুলিই যদি বড় না হয়ে উঠত, তাহলে খেজুর গাছের কী অভাব ছিল গাঁয়ে? মানুষের জন্মান্তরীণ বাসনালোকের মধ্যেই বোধহয় এ-রকম অন্যায় করার অসদিচ্ছা থাকে, বড় কোনও উদ্দেশ্যহীন, অকারণ। যাই হোক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে রস চুরি করতে গিয়ে আমরা পুরো সফল হলাম না। আমার ভাইদাদা নিঃশব্দে কাজ সেরে দড়ির আংটা ছাড়িয়ে আমার হাতে যেই দিতে গেল, আমি পুরো গ্রিপ পেলাম না। কলসি পড়ে ভেঙে গেল, রসসুদ্ধু কলসি ভাঙার শব্দ বেশ জোরে হতেই আমি ছুট লাগিয়েছি, কিন্তু ভাইদাদা যেহেতু গাছ থেকে নেমে পালাবে, সে খানিক তরতরিয়ে নেমে লাফ দিল মাটিতে, কিন্তু সামান্য দেরির মধ্যে মাস্টারমশাই জাগলেন। কিন্তু দরজা-টরজা খুলে বাইরে এসে টর্চের আলোয় তিনি যেটুকু দেখলেন তাতেই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। পরের দিন ভাইদাদাকে বাংলা-ক্লাসে ইংরেজির চারটে বাক্য দিয়ে বলা হল—অ্যানালাইজ দ্য সেনটেনসেস্। দাদা পারল না এবং বেদম মার খেল, অবশেষে মাস্টারমশাই বলেও দিলেন তোর খেজুর-রস খাওয়ার রস মিটিয়ে দেবো পরেরদিন, যদি সন্ধ্যার মধ্যে আমার বাড়িতে কলসি না লাগিয়ে দিয়ে আসিস।

দাদা মার খেল, প্রতিবাদ করল না, শুধু আমি পালিয়ে এসেছিলাম বলে আমাকে খানিক মারল এবং সন্ধ্যাবেলার মধ্যে কলসি জোগাড় করে লাগিয়ে দিয়ে এল এবং আমার কাছে এসে বলল—আমি শোধ নেব। যেদিন সে শোধ নিতে গেল সেদিন সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। এবং খেজুরের কলসী থেকে খানিক রস খেয়ে কলসির মধ্যে প্রস্রাব করে রেখে এল—নিঃশব্দে অভিযান শেষ হল এবং আপন কৌতূহলে দূরের আড়াল থেকে দেখেও এল যে, সকালবেলায় বাড়ির দাওয়ায় বসে মাস্টারমশাই কলকাতা থেকে আনা কাচের গেলাসে সেই শিবাম্বুমিশ্রিত খর্জুর-রস পরম স্নিগ্ধতায় পান করছেন। দাদা আমাকে সদ্যশিক্ষিত অঙ্কবিদ্যার পাঠ দিয়ে বলল—অনুপাতটা এমন দিয়েছি, যাতে রসের স্বাদ পুরো পাবে না, কিন্তু ফেলে দিতেও পারবে না। ব্যাটা রস খেতে খেতে বাড়ির লোকদের বলছে—আর একটু আগে দিতে পারলি না, বেলা হয়ে গেলে খেজুর-রসের কিছু থাকে? কেমন যেন ফিকে নোনতা হয়ে গেছে।

আমরা ঠিক এই মুহূর্তেই প্রশ্ন তুলব যে, প্রথম যেদিন চুরি করার ইচ্ছায় কার্যত অতি-নিকট এক মাস্টারমশাই, যিনি আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁর বাড়িতে এমন

অকিঞ্চিৎকর কারণে চুরি করতে যাবার কোনও নৈতিকতা ছিল কি না! আবার গেলামই যদি, তাহলেও কী শাস্তি হিসেবে ওইরকম বেদম মার একজন শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে আমার ভাইদাদার নৈতিকভাবে প্রাপ্য ছিল! আবার মার যখন খেল, তখনও ভাইদাদা তার নিজকৃত অন্যায়ের জন্য এতটুকুও অনুতপ্ত না হয়ে যা করল তার মধ্যেই বা নৈতিকতা কতখানি? আমি দাদাকে এ-কথাও বলেছিলাম যে, দ্যাখ দাদা! তুই তো খেজুর-কলসিতে অমন কাণ্ডটা করে এলি, আর মাস্টারমশাইও বেশ পান করলেন, কিন্তু খানিক বিস্বাদ হলেও তিনি তো আর জানতে পারলেন না যে, তোকে তিনি বেদম মারার জন্যই তুই এই শাস্তিটা তাঁকে দিলি? কিংবা তিনিও না হয় নাই জানলেন, কিন্তু অন্যেরাও যদি জানত, নিদেনপক্ষে আমাদের স্কুলের বন্ধুরাও যদি জানত, তাহলেও তো এই শাস্তি দেবার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। দাদা বলল—হ্যাঁ, কাউকে বলি, সে আবার বলে দিক মাস্টারমশাইকে, আমি আবারও আচ্ছা করে মার খাই, আর তুইও সময়-মতো পালিয়ে চলে এসে ভাবতে থাক—ব্যাটা কেমন খাচ্ছে। তার চেয়ে এই ভালো, আর কেউ না জানুক, ভগবান তো জানলেন যে, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

আমি এখনও এই বয়সে এসে মনে মনে ভাবি এসব কথা। ভাবি, কী বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ, যেখানে ইস্কুলে মাস্টারমশাইয়ের প্রহারের প্রতিবাদে ছাত্র তাঁকে নিশ্চুপে যে শাস্তি দিচ্ছে, তার সাক্ষী থাকছেন একমাত্র ভগবান—সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। ভাবি বসে বসে—এ কী ধরনের ছেলেমানুষি চলত বঙ্গদেশে গাঁয়ে-গঞ্জে—যেখানে খেজুর গাছের অন্ত নেই, খেজুর-রসেরও না, কিন্তু এক হাড়-জ্বালানো মাস্টারকে শাস্তি দেবার জন্য তাঁরই সদ্যকাটানো খেজুর গাছ থেকে রস চুরি করে খেতে হবে, আবার চুরি হল না, শুধু সামান্য রস চুরির ব্যর্থ প্রয়াসেও প্রচণ্ড মার জুটে গেল অনভ্যস্তবিদ্য বালকের কপালে। কিন্তু সেখানেও শেষ হল না, শেষ পর্যন্ত ভগবানকেও সাক্ষী হিসেবে অন্তরীক্ষলোকে দাঁড়িয়ে দেখতে হল কীভাবে এক অন্যায়ের প্রতিশোধ-স্পৃহায় আর এক অন্যায় তৈরি হয়, খর্জুর-রসে মিশ্রিত হয় শিবাম্বু-বর্জনের প্রস্রুত ধারা। তবে কিনা এই দুই অন্যায়ের অন্তর্গত মৌল কারণ যখন খুঁজি, তখন কতকগুলি অকারণের কারণও মনে আসে আমার—তবে সে অনেকটাই রসশাস্ত্রের পরিসর, যেখানে অকারণের আনন্দে সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

সেই কল্পান্তরের যৌবন-গন্ধী বয়সে যে মেয়েটিকে দেখে তুমি অকারণে পুলকিত হয়েছিলে, কী যেন বলিবার ছিল তাহা বলোও নাই, তবু বলব, এখানে কারণ ছিল, কেননা তোমার বয়স ভালো ছিল না, হৃদয় বিকারিত হতে চাইছে এবং তোমার সামনে ছিল সেই মুখ। অনেক কারণ ছিল। কিন্তু ধরা যাক, সেই যে শহর ছেড়ে একবার গ্রামে গিয়েছিলাম, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী, রাস্তায় কত গাছ নুয়ে নুয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দেখছিলাম তার পত্রমুখর ফুল, কখনও বা ছুঁয়েছিলাম লম্ফমান গোবৎসের গলা—সেখানে কী কারণ ছিল। এমন যে মনের অবস্থা হয়,

তা শুষ্ক বৈয়াকরণ পর্যন্ত জানতেন। তিনি বলেছেন—দ্যাখো! তুমি যে আনমনে চলতে-চলতে গাছের গায়ে ছুঁয়ে চললে, কখনও ছুঁয়ে গেলে কুঁড়েঘরের নুয়ে পড়া চাল—সে কাজটা ঈপ্সিতও বটে, আবার অনীপ্সিতও বটে, কিন্তু ধরে নিতে হবে—কাজটা তোমার সম্পূর্ণ অভীষ্টই, তা নইলে গাছের গায়ে হাত লাগাতে না তুমি—গ্রামান্তরম্ অয়ং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্যুপসর্পতি, কুড্যমূলান্যুপসর্পতি। আমরা শুধু বলব—সেই বালক বয়স থেকে অনেক কাজই আমরা করতে থাকি, যার মধ্যে অভিসন্ধি থাকে না সব সময়, এমনকী ইচ্ছাও থাকে না, কিন্তু দুরভিসন্ধি থাকে কখনও, থাকে দুরাগ্রহ, এমনকি দুশ্চেষ্টাও, কিন্তু সেই দুরভিসন্ধি, দুরাগ্রহ বা দুশ্চেষ্টার পিছনে ন্যায়-অন্যায়ের সচেতনতা তেমনভাবে কাজ করে না। এটা বিশ্বজনীন বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরের বাস্তব। মহামতি চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী কিশোর বয়সটাকে ষোলো বছর পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন—কৈশোরং ষোড়শাবধি—এবং এই বয়স পর্যন্ত যদি যুক্তি-তর্ক, শম-দমের বিচিত্র নৈতিকতা থাকত, তাহলে সেই মহাকবিকে এমন আক্ষেপ করে লিখতে হত না—বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম/মোর অনুনয়ে/তব চুরি-অপবাদ নিজ-পরে লয়ে/সঁপেছে আপন প্রাণ।

আমরা এ-সব কিশোর-প্রেম বা বাল্য-প্রেমের অভিশাপ ইত্যাদি চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয় নিয়ে আলোচনাই করতে চাইছি না। শুধু জানাতে চাইছি—নৈতিক বা অনৈতিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনার বয়স কোনটা? আমাদের বৃদ্ধ পিতা-পিতামহেরা পাঁচ-ছয়-সাত বছর থেকেই যথেষ্ট নীতির উপদেশ দিয়েছেন, সোজা উপায় না থাকলে কথামালার গল্প শুনিয়েছেন, ঈশপ'স ফেবল শুনিয়েছেন এবং সুযোগ মাত্রেই 'ডাইরেক্ট' নীতি উপদেশ দিয়েছেন। ইস্কুলের নীতিশিক্ষায় উপদেশ পরে আসত, আগে আসত মার এবং আমাদের মাস্টারমশাইরা যে বিচিত্র-কূট-কুশলতায় ছাত্রদের মারতেন, সেটা নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার মধ্যে পড়ে। সেই নিরন্তরাভ্যাস-লালিত প্রহার-কৌশলের মধ্যেও যতখানি নীতিজ্ঞান থাকা উচিত ছিল, তা কিন্তু আমরা কখনও ভাবিনি। স্কুল-জীবনে মার ব্যাপারটা এমন তর্কযুক্তিহীন 'নেমেসিস'-এর মতো নেমে এসেছে এবং তা এসেছে এমনই দৈনন্দিন অভ্যাসের মতো যে, একদিন মার না খেলে বৈকালিক সন্ধ্যায় সারাদিনের রোমন্থনে কী যেন খাওয়া হয়নি বলে মনে হত। নীতি-নৈতিকতার কোনও 'ডিলেমা'-র মধ্যে না গিয়েও কিন্তু এটা বলা যায় যে, স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রদের মারতে হবে এবং বাড়িতে কিশোর বয়সের পুত্রদের খুব মারতে হবে—এ-কথা নীতিজ্ঞ প্রাচীনেরা খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—পুত্র এবং শিষ্যকে প্রশ্রয় দিয়ে লালন করার মধ্যে হাজারো দোষ আছে, আর তাদের মারধর করে সঠিক পথে আনার মধ্যে হাজারো গুণ আছে—লালনে বহবো দোষা তাড়নে বহবো গুণাঃ। অতএব পুত্র এবং শিষ্যকে সব- সময় কড়া তাড়না করবে, মোটে প্রশ্রয় দেবে না—তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ।

ওঁরা আবার কৈশোর বয়স পর্যন্ত সময়টাকে খানিক পর্যায়-বিভাগ করে কখন প্রশ্রয় দিতে হবে, আর কখন মারতে হবে, তার একটা নিয়ম তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তি-শিশুর সতত-প্রসরমাণ একান্ত ব্যক্তিগত বৃত্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন কোনও ভাবনা নেই, তেমনই নেই কিশোর বয়সের সতত বৈকারিক মনের ভাঙা-গড়া, উথাল-পাথাল নিয়েও। ওঁরা বলেছেন—পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত লালন কর, ঠিক আছে; কিন্তু তারপর ষোলো বছর পর্যন্ত দশ বছর সময় শুধুই নিগ্রহ-তিরস্কার-তাড়না করে যাও—লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। ছেলের ষোলো বছর বয়সে পা পড়ার পরেই বাবাকে ছেলের বন্ধু হয়ে যাবার কথা বলেছেন বটে, শাস্ত্রকার, কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখেছি—দশ বছর ধরে যে পিতা ছেলেকে নিগ্রহ-তাড়না করে এলেন, তাঁর পক্ষে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র উপেক্ষা করে হঠাৎই ভর্ৎসকের ভূমিকা থেকে বন্ধুর ভূমিকায় নেমে আসাটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। যদি বলেন, এ পর্যায় বিভাগের মধ্যে অভিভাবকের একটা নাটক করার ভূমিকা আছে অর্থাৎ কিনা তিনি কিশোর-মনের হিতার্থে মিছিমিছি একটা নাটক করবেন, তাহলে বলব—দশ বছর ধরে একই নাটক করতে করতে অনেক সময় স্বভাবটাই নাটুকে হয়ে যায়। অতএব প্রাচীনদের এই বয়োবিভাগ-নিয়ম অনুসারে লালন-তাড়নের কল্পনাটা একেবারেই বৈজ্ঞানিক বা নীতিসম্মত নয় এবং সত্যি বলতে কী—এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদটা তৈরি হয়েছে মহাভারতেই।

ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নিয়মের দুরূহ ভাবনাগুলি বোঝার জন্য যে একটা যথানির্দিষ্ট বয়সের প্রয়োজন, তার সম্বন্ধে মহাভারতের আদিপর্বেই একটি বহুশ্রুত অথচ অসম্ভব সুন্দর উপাখ্যান আছে। ঘটনাটা এইরকম—মাণ্ডব্য নামে এক মহাতপস্বী ঋষি ছিলেন। তিনি একদিন তাঁর তপোবনের আশ্রমে মৌনব্রত ধারণ করে তপস্যা করছিলেন, সেই সময় কতকগুলি চোর রাজরক্ষীদের তাড়া খেয়ে সেই মুনির আশ্রমে ঢুকে পড়ল। চোরেরা তাদের জিনিসপত্র এদিক-ওদিক লুকিয়ে রেখে নিজেরাও লুকিয়ে রইল। রাজরক্ষীরা একটু পরেই ঢুকল সেই আশ্রমেই এবং সামনে মুনিকে দেখে চোরদের গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। মৌনী মুনির কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে নিজেরাই খোঁজাখুঁজি করে চোরদের পেয়ে গেল এবং পেয়ে গেল অপহৃত দ্রব্য, ধন। এবারে মুনির ওপরেও তাদের চোর বলে সন্দেহ হওয়ায় চোরদের সঙ্গে মুনিকেও তারা বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। মৌনবৃত্তিতার জন্য রক্ষী বা রাজা কেউই মাণ্ডব্য মুনিকে পৃথকভাবে চিনতে পারলেন না। রাজা চোরদের সঙ্গে মাণ্ডব্য মুনিকেও শূলে চড়িয়ে মারার আদেশ দিলেন। রক্ষীপুরুষেরা রাজার আদেশে সবাইকে শূলে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। মাণ্ডব্য মুনি শূলের ওপরে বসেই তাঁর তপস্যা-কর্ম চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি স্নানাহার কিছুই করছেন না, কিন্তু তপস্যার বলে জীবন ধারণ করে আছেন।

রাজরক্ষী পুরুষেরা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল—শূলে দেবার পর চোরেরা সবাই মারা গেল, কিন্তু এই লোকটি এখনও নিশ্চিন্তে বেঁচে আছে কী করে? তারা রাজাকে ঘটনা বিবৃত করে জানাতেই রাজা নিজে বধ্যভূমিতে এসে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং তাকে শূল থেকে নামানোর আদেশ দিলেন। আদেশ পালন করা অত সহজ হল না। মাণ্ডব্য মুনির দেহ থেকে শূল বের করতে না পেরে তারা শূলের বহিরংশ কোনও মতে কেটে নিল এবং শূলের অগ্রভাগ—যেটাকে অণী বলে, সেটি প্রবিষ্ট হয়ে রইল মাণ্ডব্যের শরীরে। মাণ্ডব্য আপাতত নির্বিকার রইলেন এবং কাউকে দোষারোপ না করে সেই শূলাগ্রভাগ অণী দেহে নিয়ে নানা স্থানে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর নাম হয়ে গেল অণীমাণ্ডব্য। তপস্যার প্রভাবে অণীমাণ্ডব্য স্বর্গলোকও জয় করে ফেলেছেন।

স্বর্গে গতিবিধি সহজ হওয়ায় অণীমাণ্ডব্য একদিন ধর্মরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। মনে রাখবেন, এই ধর্মরাজ কিন্তু ধর্মরাজ যম নন, মহাভারতে বিচিত্রভাবে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ন্যায়-অন্যায়ের একটা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' রূপ হলেন এই ধর্মরাজ—তিনি ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, উচিত-অনুচিতের মহাকাব্যিক প্রতিভূ। অণীমাণ্ডব্য এহেন ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন—আমি না জেনে এমন কী দুষ্কর্ম করেছি যার জন্য এত যাতনা ভোগ করছি, আমি শূলাগ্রভাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি নিজের শরীরে। আপনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিন এবং দেখুন আমার তপস্যার প্রভাবে আমি কী করি—শীঘ্রমাচক্ষ্ব মে তত্ত্বং পশ্য মে তপসো বলম্।

ধর্মরাজ বললেন—আপনি কোনও সময়ে ফড়িংজাতীয় কতকগুলি পতঙ্গিকার পুচ্ছদেশে নলখাগড়ার শিষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জন্য আপনার এই দুর্ভোগ—পতঙ্গকানাং পুচ্ছেষু ত্বয়েষীকা প্রবেশিতা। ধর্মরাজ একটু টিপ্পনী কেটে বললেন—শুনুন ঋষি! অল্প একটু দান করলেও তার ফল যেমন বহুগুণ হয়, তেমনই সামান্য পাপ করলেও তার ফল অনেক গুণ বেশি হয়। অণীমাণ্ডব্য এবার ঠাণ্ডা মাথায় ধর্মরাজকে প্রশ্ন করলেন—আমি কোন বয়সে এই অন্যায় কাজটা করেছিলাম, একটু ভেবে বলুন। ধর্মরাজ বললেন—আপনি নিতান্তই বাল্যবয়সে এই কাজ করেছিলেন। অণীমাণ্ডব্য ঝাঁঝিয়ে বললেন—একটি বালক তার জন্মকাল থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত যদি অন্যায় কাজ করেও, তাহলেও তা পাপ বলে গণ্য হতে পারে না—'বালো হি দ্বাদশাদ্ বর্ষাজ্জন্মতো যৎ করিষ্যতি'। ন ভবিষ্যত্যধর্মো' এ—এমনকী দেবতারাও সেটাকে পাপ বলে গণ্য করেন না।

এবারে ধর্মরাজের টিপ্পনীর উত্তরে প্রতি টিপ্পনী কেটে অণীমাণ্ডব্য বললেন—আমি অপরাধ করেছিলাম সামান্যই, কিন্তু লঘুপাপে বড় গুরুদণ্ড দিয়েছেন আপনি—'অল্পে' পরাধেঽপি মহান্ মম দণ্ড ত্বয়া কৃতঃ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি আপনাকে—আপনি মানুষ হয়ে শূদ্রদের ঘরে জন্মাবেন। আর অন্য একটা বিষয়ও আমি নিশ্চিত করে দেব

এই মুহূর্তেই। আমি আইন করে বলছি—জন্ম থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত সময় বালক-কিশোরেরা দোষ করবে, তা যেন পাতক বলে গণ্য না হয়—আচতুর্দশকাদ্ বর্ষান্ন ভবিষ্যতি পাতকম্। চোদ্দ বছর বয়স হয়ে যাবার পরেও যদি মানুষ অন্যায় করে, তখন নিশ্চয়ই সেটা দোষ বলে গণ্য হবে।

এখানে দুটো-তিনটে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিতে হবে। এক, প্রথমে অণীমাণ্ডব্য বলেছিলেন—জন্ম থেকে বারো বছর পর্যন্ত সময়ে যদি কেউ অন্যায় করে, তবে সেটা অধর্ম বলে গণ্য হবে না। আমাদের ধারণা মাণ্ডব্য বারো বছরের মধ্যেই পতঙ্গ-পুচ্ছে-তৃণের শিষ ঢুকিয়েছিলেন, অতএব সেই পর্যন্ত তো তিনি অন্যায়ের ছাড় চানই। কিন্তু নিয়ম করার সময় তিনি উদার হয়ে আরও দুবছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। পণ্ডিত টীকাকার নীলকণ্ঠ জানিয়েছেন যে, পুরাণকারদের ধর্মশাস্ত্রীয় সংবিধানও তাই যে, চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত—অর্থাৎ কিনা যে বয়স পর্যন্ত পুণ্য-পাপের বোধ তেমন তৈরি হয় না, সেই পর্যন্ত পাপ করার বা পাপ হওয়ার প্রশ্ন নেই। আর একটা ব্যাপার হল—বারো বছরের কথাটা হয়তো প্রাচীন মত ছিল, চোদ্দো বছর পর্যন্ত সেটা বাড়িয়ে নেওয়াটা মাণ্ডব্য মুনির নিজের মত—এটা সিদ্ধান্তবাগীশের বক্তব্য। আমরা বলব—হ্যাঁ, এগুলো সবই ঠিক, ধর্মশাস্ত্রকারেরা তাঁদের প্রাচীন আইনের বইগুলিতে বালক-কিশোরদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে অপরাধীর বয়সটা মাথায় রাখতে বলেছেন বটে, কিন্তু মহাভারতের মতো এমন উদারতায় একটা নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ কিন্তু করেননি, তবে তাঁদের কাছে মহাভারতের মর্যাদা কিছু কম নয় বলে মাণ্ডব্যের কথাটা তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হবেন। তবে প্রসঙ্গত জানাই—আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্রহ্মচর্যের উপদেশ দেওয়া হত সাত-আট বছর থেকেই, সেখানে নীতি-নিয়ম কিছু কম ছিল না এবং স্বয়ং মনু ব্রহ্মচারী ছাত্রদের জন্য পুরো একটা অধ্যায় লিখে ছাত্র-জীবনে যত বিধি-নিষেধের কথা উচ্চারণ করেছেন, তাতেই হয়তো অমন প্রবাদ-বাক্য তৈরি হয়েছে যে, পাঁচের পর, দশ বছর ধরে পুত্র এবং শিষ্যদের শুধু তাড়না করে যাবে। অণীমাণ্ডব্যের কথা কতটা কতটুকু মনে রাখলেন এঁরা, কে জানে! তবু এটা ঠিক যে, তাঁর প্রতিবাদ অযৌক্তিক ছিল না, যার জন্য আধুনিক কালেও জুভেনাইল ক্রাইম বা জুভেনাইল ডিলিংকোয়েনসি নিয়ে আমরা পৃথকভাবে চিন্তা করি। কিন্তু জুভেনাইল ক্রাইমে শাস্তি নিয়ে আমরা বোধহয় এখনও অণীমাণ্ডব্যের মতো উদার হতে পারিনি এবং তাঁর অভিশাপের কথাও মনে রাখিনি।

তিনি বলেছিলেন—অধর্ম হবে না। এখানে ধর্ম মানে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মও নয়, ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যের ধর্মও নয়। ধর্ম শব্দের প্রধান অর্থ এখানে নীতি এবং এটা প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার যে, এত বিচিত্র অর্থে মহাভারত ধর্ম-শব্দটা ব্যবহার করে, যাতে এখনকার দিনে যাঁরা ধর্ম-ধর্ম করে মাথা খারাপ করেন, তাঁদের মাথাটা খারাপ বলেই প্রমাণিত হবে। বস্তুত একটা ভদ্র সমাজে চলার পথে যে-সব সমস্যা

হয় এবং যেখানে ব্যক্তি, পরিবেশ এবং সমাজ-মঙ্গলের সমাধানটাও বড় অভীষ্ট যুক্তিতে আসে, সেটাই মহাভারতে 'ধর্ম' বলে চিহ্নিত হয়েছে। এটা অবশ্যই ঠিক যে, মহাভারত তার পূর্বপরম্পরায় আসা ধর্মের সংজ্ঞাকে কখনওই অতিক্রম করে না, কিন্তু তার পরম্পরার মধ্যেই যেহেতু ধর্মের অনেকানেক সংজ্ঞা তৈরি হয়ে গেছে, তাই মহাভারত আপন মহত্ত্ব এবং ভারবাহী প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্মকে 'পারকোলেট' করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে, যাতে প্রত্যেক পরম্পরাগত মানুষই নিজের সত্তা খুঁজে পায়। আমার মনে হয়, কত বিচিত্র জায়গায় এবং কত বিচিত্র প্রয়োজনে 'ধর্ম'-শব্দটাকে মহাভারতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার দু-একটা উদাহরণ দিয়ে নিলে বোঝা যাবে যে, নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা তো বটেই, সময়-বিশেষে আপাতদৃষ্ট অধর্মও ধর্ম হয়ে ওঠে মহাভারতে এবং সেখানেই মহাভারত এই অত্যাধুনিক কালেও ভীষণ রকমের 'রেলেভেন্ট'।

আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই মহাভারতের বিদগ্ধা প্রবীণা সত্যবতীর কথা। তাঁর জীবনও বিচিত্র, জীবনীশক্তিও ততোধিক বিচিত্র। কুমারী অবস্থাতেই পরাশর মুনির তাড়নায় তাঁর সঙ্গে সংগত হয়েছিলেন সত্যবতী এবং কন্যা অবস্থাতেই তাঁর যে পুত্র জন্মেছিল পরম অভ্যুদয়ের মতো, তিনি মহামুনি ব্যাস—স্বয়ং মহাভারতের লেখক। তারপর সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ে হয় ভীষ্মের পিতা শান্তনুর। এক অর্থে দুইজনেই 'ডিভোর্সী'। পরাশর পুত্রের জন্ম দিয়ে সত্যবতীকে ছেড়ে চলে গেছেন এবং পুত্রটিকেও নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে। আর শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গা বেশ কিছুকাল শান্তনুর সঙ্গ থেকে পুত্র দেবব্রত ভীষ্মকে শান্তনুর কাছে রেখে ছেড়ে গেছেন স্বামীকে। বিধির বিধায় শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হল সত্যবতীর, কিন্তু রাজা শান্তনু এই প্রতিজ্ঞায় তাঁকে বিয়ে করতে পারলেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই হস্তিনাপুরীতে রাজা হবেন এবং তাঁর পূর্বজাত সন্তান দেবব্রত-ভীষ্ম আর বিয়েই করবেন না, যাতে সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশপরম্পরাতেও রাজা হবার কোনও বাধা না ঘটে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, সত্যবতীর দুটি পুত্রই অকালে মারা গেলেন এবং বিখ্যাত ভরত-কুরু বংশের ধারা লুপ্ত হবার জোগাড় হল। যাঁর কারণে এত বড় প্রতিজ্ঞা, সেই সত্যবতী কিন্তু এবার মনে-মনে যথেষ্টই অনুতপ্ত হলেন, বিশেষত জীবনে সর্বভাবে বঞ্চিত বলে ভীষ্মের জন্যও তাঁর খুব মায়া হল। ঠিক এই অবস্থায় সত্যবতীর মুখে ধর্মের প্রবচন উচ্চারিত হচ্ছে।

সত্যবতী ভীষ্মকে কুরু-ভরত বংশের গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে, কুমার! সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা তোমার মধ্যে ঘটেছে বলেই তোমাকে বলছি—তোমার ভাই বিচিত্রবীর্য মারা গেছেন এবং তুমি তাকে যথেষ্টই ভালোবাসতে—মম পুত্রস্তব ভ্রাতা বীর্যবান্ সুপ্রিয়শ্চ তে। আর তুমি তো জানোই, তোমার ভাইয়ের দুই স্ত্রী অম্বিকা এবং অম্বালিকা। তারা যথেষ্ট বড় ঘরের

মেয়ে এবং রূপ যৌবনও তাদের যথেষ্ট। কিন্তু হলে হবে কী, ওদের স্বামী মারা গেল, অথচ এমনই কপাল—একটা একটা ছেলেও রইল না ওদের কোলে, ওরা কীভাবে জীবন কাটাবে বলো? আর আমি যা বলছি, তাতে ওদেরও আপত্তি নেই, ওরাও একটা একটা ছেলে চায় আপন বাৎসল্য তৃপ্ত করার জন্য—রূপযৌবন-সম্পন্নে পুত্রকামে চ ভারত। সত্যবতী এবার প্রকৃত প্রস্তাবে এসে বললেন—আমি বলছিলাম কী, তুমি এই দুই রানির গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো। হ্যাঁ, এই ধরনের প্রথাগত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুজনদের অনুমতি লাগে। আমি নিজেই গুরুজন হিসেবে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি আমার দ্বারা নিযুক্ত হয়েই এই কাজ করো এবং এটা ধর্মসম্মত কাজ, এই ধর্ম তোমাকে করতে হবে—মন্নিয়োগাৎ মহাবাহো ধর্মং কর্তুমিহার্হসি। এই দুই মহিষীর কোলে তোমার যে পুত্র হবে, তাদের কাউকে তুমি এই ভরত-কুরু-বংশের পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজসিংহাসনে বসাবে। আমারও ভালো লাগবে, নিশ্চিত ধর্মানুসারে তোমার স্ত্রী হয়ে উঠুক এরা, তুমি আর না বোলো না, বংশলুপ্তির কারণে তোমার পরম-সম্মানিত বাপ-ঠাকুরদাদের তুমি কোনও নরকের গহনে ডুবিয়ে দিতে পারো না—দারাংশ্চ কুরু ধর্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।

সত্যবতীর বক্তব্যে আবেগ ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, উপদেশ ছিল, আদেশ ছিল, এমনকী রাজমহিষীদের রূপ-যৌবনের কথাটা বলে ভীষ্মের মনে কিছু আকর্ষণও তৈরি করতে চেয়েছেন সত্যবতী। কিন্তু এসব কিছুই তিনি করতে চেয়েছেন একটা মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বৃহত্তর স্বার্থে, রাষ্ট্র এবং সমাজের জন্য। ভীষ্মের জবাবে পরে প্রসঙ্গত জানাই—একটি বিদ্বৎসভায় মহিলারা নীতির প্রশ্ন তুলে আমাকে বলেছিলেন—আচ্ছা! সত্যবতী তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মহিলা বলে আমরা জানি। কিন্তু এটা তাঁর কীরকম বিচার যে, নিজের ছেলের দু দুটি বউকে তিনি অন্য একটি পুরুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এ বিষয়ে তিনি সেই অসহায়া, বধূ দুটির অনুমতি নিয়েছিলেন কী? আমি বললাম—হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে, তবে একবিংশ শতাব্দীর এই স্ত্রী-সমাজ-সচেতন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যদি মহাভারতের কবিও খানিক অবহিত থাকতেন, তাহলে ঘটনার আগে সত্যবতী অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নিতেন দুই পুত্রবধূকে। তবে কিনা সত্যবতীকে আমি এখনকার প্রগতিবাদিনীদের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক মনে করি। তাঁর দুটি শব্দক্ষেপণ থেকেই সদ্যবিধবা দুই পুত্রবধূদের সম্বন্ধে তাঁর 'কন্‌সার্ন'টুকু বোঝা যায়। সত্যবতী ভীষ্মকে বলেছিলেন—ওদের এই বয়েস! এই রূপ-যৌবন! তুমি ওদের বিয়ে করো—দারাংশ্চ কুরু ধর্মেণ।

আমার এই অপ্রতুল জীবনে আমি অনেক প্রগতিবাদিনী মৃতপুত্রা শাশুড়ি দেখেছি কিন্তু নিজপুত্রের মৃত্যুর পর বউমাদের যৌবন বৃথা যাচ্ছে, অতএব তাদের বিয়ে দেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—এইরকম ভাবিত শাশুড়ি আমি প্রায় দেখিইনি। বিধবা বউমার জন্য শাশুড়িকে চাকরির চেষ্টা করতে দেখেছি, জমি-বাড়ি লিখে দিতে দেখেছি, নিজের

বাড়িতে রেখে যথাসম্ভব ভরণ করতে দেখেছি, কিন্তু তাদের রূপ-যৌবনের সার্থক ব্যবহার নিয়ে ভাবতে দেখিনি। সত্যবতী নীতিগতভাবেই দুটি বিকল্প পথ খোলা রেখেছিলেন— প্রথমটি বউদের বিয়ে দেওয়া এবং সেটা ঘরের লোকের সঙ্গেই দেওয়া। কারণ, তাতে 'ফ্যামিলিয়ারাইজেশন' ব্যাপারটা অনেক সহজে ঘটে, আর এই 'টারগেট' হিসেবে ভীষ্মই যে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ছিলেন, তার একটা বড় অনুকূল যুক্তি হল—ভীষ্মই কিন্তু তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে কাশীরাজ্য থেকে নিজের রথে তুলে এনেছিলেন। মহাভারতের 'সেক্সুচুয়াল এথিকস্' নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা বুঝবেন—এই বিষয়ে সত্যবতীর তর্কযুক্তি ছিল সবচেয়ে সহৃদয়, সমাজ ভাবনায় ভাবিত। সত্যবতীর চিন্তায় বিবাহের বিকল্পটা যদি শেষ পর্যন্ত রূপলাভ না করে, তাহলে স্বামীর মৃত্যুর পরেও বউরা যাতে অন্তত দুটি সন্তান পায় কোলে, সেই চিন্তা তিনি করেছেন। বৃহত্তর রাজনীতির স্বার্থভাবনা, সত্যবতীর ব্যক্তিগত লাভ—এ সবই হয়তো এখানে মিশে আছে, কিন্তু সেগুলির সবার ওপরে কৌরব-বংশধারায় সুস্থিতি এবং বিধবা পুত্রবধূদের জীবন-যাপনের বিকল্প-ব্যবস্থাপনা—এই দুটি নীতিকেই 'ধর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন সত্যবতী—তয়োরুৎপাদয়াপত্যং...ধর্মং কর্তুমিহার্হসি।

সত্যবতী যখন ধর্মের নিদর্শনায় তাঁর শ্বশুর-বংশের মর্যাদা এবং পুত্রবধূদের পুত্রকামনা পূরণ করতে চাইছেন, তখন মানতেই হবে যে, এই ভাবনাটা এমন এক সহৃদয়, নীতি-বোধের কোথাও পড়ে, যাকে বিশদ অর্থে ধর্ম বলতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু এই নৈতিকতার উত্তরে আরও এক 'ধর্ম' উপস্থাপিত হচ্ছে এখানে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—সত্যবতী-কথিত এই ধর্মের উত্তরে মহামতি ভীষ্মও কিন্তু ধর্মসম্মত অন্য এক ধর্মের কথা বললেন—প্রত্যুবাচ স ধর্মাত্মা ধর্ম্যমেবোত্তরং বচঃ। অর্থাৎ এক ধর্মের উত্তরে অন্যতম এক পৃথক ধর্মের প্রত্যুত্তর আসছে। ভীষ্ম বলেছেন—তুমি যে ধর্মসঙ্গত কথা বলছ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই—অসংশয়ং পরো ধর্মস্ত্বয়া মাতরুদাহৃতঃ। কিন্তু এই সন্তান লাভের ব্যাপারে আমার প্রতিজ্ঞাও তো তুমি জানো। তোমারই বিবাহের সময় কন্যাপণ হিসেবে আমাকে যে সত্য উচ্চারণ করতে হয়েছিল, সেই সত্য থেকে আমি চ্যুত হই কী করে? আমি সব ত্যাগ করতে পারি কিন্তু সত্য-প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করতে পারি না। ভীষ্ম অসামান্য দৃঢ়তায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং সেখানে বস্তুর স্বভাবধর্ম সূর্যের আলোকধর্ম, বহ্নির উষ্ণতা, চাঁদের শীতলতা—এরাও আপন স্বভাব ছাড়তে পারে, কিন্তু ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞাত সত্য থেকে সরে আসবেন না—ন ত্বহং সত্যমুৎসৃষ্টুং ব্যবস্যেয়ং কথঞ্চন।

ভীষ্ম এখানে তাঁর প্রতিজ্ঞাত সত্যের কথা বলেছেন, সেটা তখনকার দিনের প্রজাপালক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। মহাভারত-রামায়ণে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের এটা একটা বিশেষত্বই বটে যে, প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যাপারটাকে তাঁরা ধর্মপালনের মাহাত্ম্যে

দেখেছেন। ভীষ্মের কথা শুনে সত্যবতী কিন্তু দমে যাননি। তিনি মেনে নিয়েছেন ভীষ্মের কথা যে, হ্যাঁ তোমার প্রতিজ্ঞা একটা ছিল বটে এবং তুমি সেটা প্রাণ দিয়ে মেনে চলবে তাও জানি আমি। কিন্তু এই কি সেই কাল, যখন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকবে! এটা তো একটা চরম বিপদের সময়! আমার স্বামী মারা গেছেন, দু-দুটি ছেলে মারা গেছে—আর কবে কখন তোমার পিতার বিবাহের সময় তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে বিয়ে করবে না বলে, সেই সম্পূর্ণ সমীকরণটাই তো পালটে গেছে। সত্যবতী বললেন—চরম বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, তখন নূতনতর ধর্মের দায় আসে, এটাকে আপদ্‌ধর্ম বলে, তোমাকে এই দায় বইতে হবে এই বংশের উপযুক্ত সন্তান হিসেবে—আপদ্ধর্মম্ অবেক্ষস্ব বহৈতাং মহতীং ধুরম্।

তার মানে, সত্যবতী আরও অন্যতর এক ধর্মের কথা বলছেন, যা পরবর্তী সময়ে মহাভারতে বেশ বিশদভাবে আলোচিত হবে। শুধু সত্যবতীর তর্ক বোঝানোর জন্য এখন এইটুকু বলি যে, এই ধর্ম হল বিপদকালের আশ্রয়। এ এমন বিপদ, যখন ক্ষুধার তাড়নায় বিপন্ন হয়ে শুধু প্রাণরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র মুনিকে চণ্ডালের ঘরে এসে কুকুরের মাংস চেয়ে খেতে হয়। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—নিজেই যদি তেমন বিপদে পড়ো, তাহলে সে-অবস্থা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য খারাপ-ভালো সব কাজই করা যায়, তারপর যে মুহূর্তে সমর্থ হবে, তখন শাস্ত্রীয় ধর্মানুসারে চলবে—কর্মণা যেন তেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ। ...: সমর্থো ধর্মমাচরেৎ। সত্যবতী সেই বিপদেই পড়েছেন। তাই সব জেনেশুনেও, ভীষ্মের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখেও আপদ্ধর্মের কথা বলে ভীষ্মকে অনুকূল করতে চাইছেন এবং সত্যবতীর মতে এটাই এখন ধর্ম।

ভীষ্ম কুরুরাষ্ট্রের অবস্থা বুঝে আপদ্ধর্মের যুক্তিটা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর কথামতো নিজের ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিয়োগ প্রথায় ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে রাজী হলেন না এবং তিনিও ধর্মের নামে শপথ করে সত্যবতীকে বললেন —রাজ্ঞী! তুমি ধর্মের দিকে তাকাও, আমাদের সবাইকে এইভাবে এক অন্তহীন সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়ো না—রাজ্ঞী ধর্মানবেক্ষস্ব মা নঃ সর্বান্ ব্যনীনশঃ। আমার মতো এক বীর ক্ষত্রিয় কখনও প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হতে পারে না, সেটা ধর্ম নয়—ন ধর্মেষু প্রশস্যতে। তবে হ্যাঁ, এই বিখ্যাত কুলের ভীষণ বিপদের নিরিখে মহারাজ শান্তনুর বংশ যাতে লুপ্ত হয়ে না যায়, তার জন্য আমি তোমাকে ধর্মের কথাই বলছি শোনো—তত্ত্বে ধর্ম প্রবক্ষ্যামি ক্ষাত্রং রাজ্ঞি সনাতনম্। ভীষ্ম বলেছিলেন—উপযুক্ত সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে কোনও অধিগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করো এবং তাঁকে নিয়োগ প্রথায় স্বীকৃত করিয়ে সন্তানের জন্ম নিশ্চিত করো।

আমরা জানি এরপর কী ঘটেছিল। স্বয়ং মহাভারতের কবি, যিনি কিনা—সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ—তিনিই আপদ্ধর্মের নিয়মে আহূত হয়েছিলেন ভ্রাতৃবধূদের

গর্ভাধানের জন্য। এই ঘটনা ভালো না মন্দ সেই কূটতর্ক পরে হতে পারে, আপাতত আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, একটা ছোট্ট ঘটনার মধ্যে তিন-চার রকমের ধর্মের কথা হল। ধর্মের উত্তরে অন্যতর এক ধর্মের নিয়ম আসছে, তদুত্তরে অন্যতর ধর্ম এবং প্রতি-উত্তরে অন্যতর আরও এক ধর্ম। তাহলে প্রশ্ন তো একটা ওঠেই—কেমন গ্রন্থ এই মহাভারত—ধর্মপুরুষরা যে গ্রন্থটা থেকে বারবার ধর্মের উদাহরণ দেন, তার তো ধর্ম সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত একটি প্রতিশ্রুতিই নেই। যেখানে একটা রাজপরিবারের বংশরক্ষার মতো একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে ধর্মের এতগুলো 'প্রেমিসাসে' তৈরি হচ্ছে, সেখানে কোনটাকে সঠিক ধর্ম বলব?

সত্যি বলতে কী, এই প্রশ্ন খোদ মহাভারতেই উঠেছে। আর সেটা উঠেছে এই কারণেই যে, ধর্ম বলতে মহাভারত কোনও নির্দিষ্ট ব্রত-চর্যা বা নিত্য-নৈমিত্তিক দেবপূজা বা ততোধিক কোনও ধর্মদার্শনিক বিশ্বাসকেও বোঝাচ্ছে না। আবার হ্যাঁ, তা বোঝায়ও বটে। তার মানে, মহাভারতে ধর্ম বলতে কোনও 'রিলিজিওসিটি' বা 'রিচ্যুয়াল' বোঝায় না, আবার একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা বোঝায়ও বটে, কখনও আবার ধর্ম—যদিও এটা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে যে, ধর্ম একটা নির্দিষ্ট দার্শনিক বিশ্বাসকে বোঝায়—যেমন আমি বেদান্তী, কিংবা আমি যাজ্ঞিক ইত্যাদি। বরঞ্চ ধর্ম শব্দের ব্যবহার অনেক বিপুল পরিমাণে ঘটেছে ভারতবর্ষীয় সমাজের জাতি-বর্ণ-ভিন্নতায় এক একটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশাগত কর্ম সংস্থান নিয়েও। তবে মহাভারতে সবচেয়ে 'ইনটারেস্টিং' হল ধর্মশব্দের তাৎপর্য যেখানে নীতি নিয়ম-লৌকিকতার মধ্যে নেমে আসে—হয়তো বা এইখানে অধুনা-ভাবিত 'সিচুয়েশনাল এথিকস'-এর সবচেয়ে উপযোগী উদাহরণগুলি পাওয়া যাবে মহাভারতে। স্বভাবতই ধর্মভাবনার এতগুলি তাৎপর্য মহাভারতে ছড়িয়ে আছে বলেই সংস্কৃত কোষকারদের এতগুলি অর্থ দিতে হয়েছে ধর্মের মানে বোঝানোর জন্য—ordinance, usage, duty, right , justice, morality, virtue, religion, good works, function, characteristic.

আসলে এই ভিন্নতার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে মহাভারতেই। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মহামতি ভীষ্মকে বলেছেন—এই পৃথিবীতে তাবৎ মানুষই ধর্ম নিয়ে নানা সংশয়ে ভোগে—কোনটা আসলে ধর্ম, সেই ধর্ম এল কোথা থেকে—কো'য়ং ধর্মঃ কুতো ধর্মঃ—এ সব নিয়ে সব সময় মানুষের মনে নানান শঙ্কা আছে—ইমে বৈ মানবাঃ সর্বে ধর্মং প্রতি বিশঙ্কিতা—তা আপনি এবার বলুন তো পিতামহ ভীষ্ম—ধর্ম ব্যাপারটা ঠিক কী? সেই কালেও কিন্তু এই বিশালবুদ্ধি মানুষটি বুঝেছিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন, বিশেষত মানুষের জীবনে অনন্ত সুখ ভোগ করার ইচ্ছা এবং সেই সুখলাভ তথা দুঃখ-নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মের সঙ্গে ধর্মপালন করাটা যেহেতু প্রায় চিরন্তনী এক প্রবৃত্তি, তাই প্রথাগত ভাবে আনুষ্ঠানিক আচার-বিচার সহ ধর্ম যাজনের প্রক্রিয়াটাই যে লোকচক্ষুতে ধর্ম—এটা ভীষ্ম প্রথমে স্বীকার করে নিলেন। বললেন—হ্যাঁ,

বেদ, স্মৃতি, সদাচার—এই তিনটেই ধর্মের লক্ষণ, আর ধর্মের চতুর্থ লক্ষণটা হল প্রয়োজন—সদাচারঃ স্মৃতির্বেদস্ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্। চতুর্থমর্থমিখ্যাহুঃ।

বস্তুত মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং মনের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ধর্মের এই লক্ষণটার কথা বলতেই হবে এবং মহাভারতও তা বলেছে। এটা তো ঠিকই যে মানুষের যা নেই, তা মানুষ অলৌকিক দেবতার কাছে চায়। ভয়, বিপদ, বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্যও দেবতাই তার আশ্রয় হয়ে ওঠে। আর এটাও খুব ঠিক যে, অভীষ্টলাভের জন্য দেবতার আশ্রয় নিতে গেলে তার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার, কিছু ব্রত, নিয়ম, সংযম আর কিছু বস্তু উপহারের মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টাটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। আমাদের বৈদিক সনাতন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত এই ভাবনা থেকেই। বেদে দেবতা অনেক, মানুষের চাওয়াও অনেক, সেই গৃধ্নুতাকে একটা সংযত রূপ দেবার জন্যই বহুতর যাগ-যজ্ঞ, নিয়ম-সংযমের প্রক্রিয়া। নিজের চাওয়া-পাওয়ার জন্য সেই যে বিশাল নিয়ম-আচার-কর্মের প্রথা তৈরি হয়েছিল, তা আজও শেষ হয়নি। আজ হয়তো দেবতা পালটে গেছেন, পালটে গেছে যাগ-যজ্ঞের রাজকীয় আয়োজন, কিন্তু মানুষের চাওয়া পালটায়নি—যদি পালটাত, তাহলে বাৎসরিক মহালয়ার দিনে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি-র গান শুনতাম না।

এই চণ্ডী গানে 'দ্বিষোজহি'—মানে, আমার শত্রুকে মেরে দাও—এই প্রার্থনাও আছে, যেমনটি বেদের মধ্যেও অজস্র ছিল। অর্থাৎ শত্রুকে নিজে মেরে শেষ করতে গেলে আইন আদালত দণ্ডের চাপ যদি সইতে না পারি, তাই নিজের অনন্ত ক্রোধকে দেবতার মাধ্যমে 'রিলিজ' করে দেওয়াটা আমরা দেবীপূজার মাধ্যমে চেয়েছি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি'-র পরে প্রতি পুরুষের সেই সকাম উক্তিটুকু—আমাকে একটা মনের মতো বউ দাও যে শুধু আমার মন অনুসারে চলবে—ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্—এই উক্তিটুকু বাদ দিয়েছেন মহিষাসুরমর্দিনীতে, কিন্তু জানবেন—পুরুষের এই জৈব জীবনের জন্যও কিন্তু দেবতার পূজাই বিহিত হয়েছে। তাহলে এই দাঁড়াল—বৈদিক কালের ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি দেবতার জায়গায় বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, কালীর মতো দেবতারা যেমন এলেন, তেমনই বেদের যাগ-যজ্ঞের বদলে পূজা, ব্রত, নিয়ম, আচার—এগুলিরও প্রতিষ্ঠা হল। আবার এত পূজার কাঁসর ঘণ্টার মধ্যে যদি একটু হোম যজ্ঞ করেন পুরোহিত, তাহলে পূজো করার আড়ম্বরের শান্তিটা আরও বাড়ে—তাতে বৈদিক যজ্ঞের স্মৃতিটুকু পুষ্ট হয়ে যায় বলেই ধর্ম যেন বেশি বেশি হয়। হোম-যজ্ঞ করার জন্য পুরোহিতও একটু বেশি দক্ষিণা পান।

আমাদের বক্তব্য হল—যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে মহামতি ভীষ্ম যে বেদকে ধর্মের লক্ষণের মধ্যে বসিয়ে দিলেন, তার কারণ—মানুষের চিরকালীন প্রবৃত্তিগুলিকে সংযম, নিয়ম, আচার এবং দেবারধনার মধ্যে স্থাপন করা। মনু মহারাজ সমস্ত ধর্মের মূলে বসিয়েছেন

বেদকে—বেদো'খিলধর্মমূলম্—আর ধর্মের লক্ষণ করার সময় তিনি ভীষ্মের লিস্টি থেকে বেদ, সদাচার, স্মৃতি তিনটিকেই অবিকল গ্রহণ করে চতুর্থ প্রয়োজনের জায়গাটায় বলেছেন—আত্মনস্তুষ্টিরেব চ—অর্থাৎ নিজের তুষ্টি হল কিনা—সেটাও ধর্মে একটা প্রমাণ বটে। মনুকথিত এই 'আত্মতুষ্টি'র সঙ্গে মহাভারতে বলা 'মানুষের প্রয়োজন' -এর যে কোনও তফাত নেই, সে কথায় পরে আসব। কিন্তু সর্বাগ্রে জানাই—মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে যাগ-যজ্ঞ-পূজা-ব্রতের ভাবনাটা চিরন্তনভাবে যুক্ত হয়েছে বলেই বেদের সব কিছুই এমন ধর্মের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে এবং হয়তো বা সেইজন্যই, বেদোক্ত বিধি-নিষেধগুলি শাশ্বত সনাতন ধর্মপন্থাও বটে। স্মৃতি—শব্দটার তাৎপর্যও কিন্তু এইখানেই।

বস্তুত ধর্মের লক্ষণ কী, এই মহাভারতীয় প্রশ্নে মীমাংসক দার্শনিকদের কথা আসবেই এবং মহাভারতে উত্তরও আছে সেই ধারাতেই। কিন্তু সেসব এখানে বোঝাতে গেলে আমার পাঠক-কুলের বিরক্তি তৈরি হবে। তবে এইটুকু না বললেই নয় যে, মীমাংসাকরাও ইহলোকে পরলোকে নিজের কল্যাণের জন্য বেদবিহিত কর্মগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কাজটাকেই ধর্ম বলেছেন। এতে যে কাজের ফলে মানুষের অনিষ্ট হবে তা বেদবিহিত হলেও ধর্ম নয়। যেমন শত্রুবধের উদ্দেশে 'শ্যেনযাগ' বেদবিহিত হলেও সেটার মধ্যে হিংসা আছে বলেই সেটা ধর্ম নয়, কেননা তাতে হিংসার পাপ লাগে। আর স্মৃতি কথাটাকে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণ নেই, কেননা যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি নিয়ম আচার শেখানোর জন্য যে শাস্ত্র উপদেশ দেয়, তাই স্মৃতি। পরবর্তী সময়ে স্মৃতি ধর্মের বাড়াবাড়ি যত হয়েছে ব্রাহ্মণদের অনুকূলে এবং স্বার্থান্বেষিতায়, তা মহাভারতের কালে হয়নি বলেই স্মৃতি মহাভারতের ধর্মলক্ষণের মধ্যে এসেছে। কিন্তু সদাচারের জায়গাটা মহাভারতে যেভাবে ধর্মের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত সেটা ভীষ্মের ব্যাখ্যায় অসাধারণ।

ভীষ্ম বলেছিলেন—দ্যাখো বাছা যুধিষ্ঠির! ধর্ম ব্যাপারটাকে তুমি মানুষের জীবনযাপনের বাইরে অন্যতর কোনও অলৌকিক উপাসনা বলে ভেব না। বরঞ্চ ভালোভাবে, সুন্দরভাবে জীবন কাটানোর জন্যই ধর্মের নিয়মগুলি করা হয়েছে—লোকযাত্রার্থম্ এবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ। ধর্ম নিয়ে চললে তুমি এই জীবনেও ভালো থাকবে, মরার পরেও ভালো থাকবে। সত্যি বলতে কী, মৃত্যুর পরে ভালো-মন্দ কী আছে, তা বলতে পারব না, কিন্তু এই জীবনটা ভালোভাবে কাটানোর জন্য যে ধর্ম-নিয়মের প্রয়োজন—সেই ধর্মটা যতখানি ঈশ্বর-উপাসনার পরিসর, তার চাইতে অনেক বেশি নীতি-নিয়ম-আচারের পরিসর। দার্শনিক মননে যাঁরা ধর্মের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন, পরলোকের ব্যাপারটা তাঁরা 'ট্যানজেনশিয়্যালি' স্পর্শ করেছেন শব্দ-মাহাত্ম্যে এবং বলেছেন—পরম মঙ্গল এবং পরম অভ্যুদয়ের হেতু হল আমাদের ধর্ম। পণ্ডিত টীকাকারেরা এই শব্দ দুটি নিয়ে পরম মঙ্গল (নিঃশ্রেয়স্) এবং অভ্যুদয়ের ব্যাপারে

কতই না মোক্ষানুসন্ধান করেছেন, কিন্তু শেষাশেষি অভ্যুদয় কথাটার মধ্য থেকে জাগতিক লাভ এবং ঐহিক সুখের অর্থটা কেউই হরণ করে নিতে পারেননি। মহাভারত তার চরম স্থানে মুক্তি-ভক্তির ধর্মকথা অনেক বলবে, কিন্তু জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তার ধর্মের প্রয়োগ-পরিসর প্রেমের বৈচিত্রের চেয়ে কিছু কম নয়, আর সেখানেই মহাভারতে বড় হয়ে ওঠে ধর্ম-ভাবনার অন্তরালে মানসিক অনুভূতিগুলি।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—আচারের মধ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, আচারের মধ্যে দিয়েই তুমি ধর্মকে জানতে পারবে—ধর্মস্য নিষ্ঠা ত্বাচারঃ। প্রথমেই জানিয়ে রাখি—এই আচার কোনও হাত-ধোয়া, কাপড়-ছাড়ার বাতিক নয়, স্বভাব-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই প্রধানত এই আচারের তাৎপর্য। ভীষ্ম উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—মানুষ পরের অন্যায়, পরের পাপ ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে, কিন্তু নিজের অন্যায়, নিজের পাপটা একেবারেই বুঝতে চায় না। একজন চোর, যে নাকি পুজো-আচ্চার ধর্মের কাজ করে অথচ পরের টাকা, পরের সম্পত্তি চুরি করেও বেশ আনন্দ পায়। কিন্তু যেদিন তার নিজের ধন চুরি যায়, তখন সে রাজার কাছে গিয়ে চুরির হিল্লে করতে চায়—যদাস্য তদ্ হরন্ত্যন্যে তদা রাজানমিচ্ছতি। বন থেকে বেরিয়ে আসা হরিণ যদি হঠাৎ গ্রামে ঢুকে পড়ে, তখন সে সব লোককেই ভয় পায়, চোরও তেমনই অন্যায় কাজ করে বলেই সব লোককেই ভয় পায়, আর নিজের বৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না বলেই অন্য সব লোকের মধ্যেই অন্যায় পাপ দেখতে পায়—বহুধা চরিতং পাপম্ অন্যত্রৈবানুপশ্যতি।

এ হল—নিজের অন্যায়কে জাস্টিফাই করার জন্য পরকৃত অন্যায়ের লিস্টি দেওয়া—যা আমরা হামেশা করে থাকি। যাঁরা রাজনৈতিক দলের সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কূট চালাচালি করেন অথবা যাঁরা তর্কযুদ্ধে জিতবার জন্য যুক্তি সাজান, তাঁরা অন্যায়ের উল্লেখমাত্রেই প্রসঙ্গ থেকে সরে যান এবং সুনিপুণ যুক্তিতে দোষপ্রবক্তার দোষগুলি বার করে তাঁকে এমন কদুকলে ফেলে দেন, তাতে যেন তাঁর নিজের দোষটা ভীষণ সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। মহাভারত এই কূট পন্থায় বিশ্বাস করে না। মহাভারত বলে—যে নিজে অজস্র অন্যায় করছে তার অন্যকে দোষারোপ করার মুখ থাকাই উচিত নয়। যে লোক নিজেই এক পরস্ত্রীর উপপতি, সে অন্যকে কোন মুখে দাম্পত্য-সততার উপদেশ দেবে—যো'ন্যস্য উপপতিঃ স কং কিং বক্তুর্মহতি—আর সে যদি উপদেশ দিয়ে অন্যকে নিন্দা করে, তাতে লোকে মোটেই তাকে সহ্য করবে না। ভীষ্ম তাঁর সমস্ত যুক্তি দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছেন, সেটা হল—অন্যায় এবং অধর্মের ব্যাপারটা সবার আগে নিজেকে দিয়ে বোঝা দরকার। যে মানুষ বিনা ব্যথায়, বিনা আঘাতে নিজে বেঁচে থাকতে চায়, সেই মানুষ অন্যকে কী করে ব্যথা দেয়, আঘাত দেয়, কী করেই বা মেরে ফেলে? ধর্মের ব্যাপারে ভীষ্ম তাই সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন—যেটা তুমি নিজের জীবনে ঘটুক বলে চাও না, অথবা নিজের হলে যেটা ভালো লাগত না, সেটা যাতে পরের জীবনে না ঘটে, পরের জীবনে যাতে না হয়, তুমি সেই চেষ্টা

করবে যুধিষ্ঠির—ন তৎ পরেষু কুর্বীত জানন্ অপ্রিয়মাত্মনঃ। আর যা তুমি নিজের জীবনে ঘটাতে চাইবে, তা পরেরও যদি হয়, সেই চিন্তা করতে হবে—যদ্ যদ্ আত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ।

আমরা বুঝতে পারি—এই ভাব অতি মহৎ, অতি সূক্ষ্ম মননের বিষয় এবং ভাব অবলম্বন করেই মহাভারত-পুরাণগুলিতে কতকগুলি 'ক্যাটিগরিক্যাল' বিষয় দিয়ে ধর্মের লক্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—ধর্মের লক্ষণ দশটা—ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, চুরি না করা, অন্তরে-বাহিরে শুচি থাকা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধশূন্যতা। বস্তুত এই দশটির একটি যদি থাকে তাতেই নীতি-নৈতিকতার দিকে প্রবৃত্তি হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবজীবনে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষ যেভাবে জীবন-যাপন করছে, লোভ-মোহ-মাৎসর্যের যে বিচিত্র আস্ফালন দেখছি সমাজ-জীবনে, সেখানে উপরি উক্ত ওই ভালো ভালো গুণগুলো নিজের অন্তরে আধান করাটা কী সোজা কথা। মানুষ যদি ভালো থাকতেও চায়, তাকে ভালো থাকতেও তো দেয় না অন্য লোক। এবং এ জিনিস আজ নয়, বেদের আমল থেকে চলে আসছে।

বৈদিক যুগে সমস্ত ধর্মের মূল প্রতিভূ হচ্ছে 'ঋত'। সাধারণভাবে ঋত-কে শুধুমাত্র সত্য বললে ভুল হবে, এমনকী ঋতের বিপরীত যে 'অনৃত' বা 'অসত্য', তার উলটোটাই 'ঋত'—এমন ভাবাটাও খুব সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। যদিও ধর্ম বলতে বেদের মধ্যে 'ঋত', 'সত্য', 'ব্রত' ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবুও অন্য শব্দগুলি বাদ দিয়ে 'ঋত'-ই হল সেই ব্যাপ্ত-গভীর বাহক শব্দ যেটাকে পরবর্তীকালে ধর্ম এবং নীতির প্রকৃত প্রকাশক শব্দ বলে মনে হয়। ঋত-শব্দটি বৈদিক কালে 'মর‍্যালিটি' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার স্পষ্ট উদাহরণ আছে যম-যমী সংবাদে। সভ্যতা তৈরি হওয়ার প্রথম প্রকরণে যম-যমীর মতো ভাই-বোনের মধ্যে 'ইনসেসচুয়াস' সম্পর্ক যেখানে যৌনতার নিয়ম-নৈতিকতা স্পষ্ট করে তুলছে, সেখানে যম এই সম্পর্কের বাধা হিসেবে প্রথমে ঋতের কথা বলছেন। বলছেন—আমরা সত্য কথা বলি, কিন্তু সত্য উচ্চারণ করতে গিয়ে এটা তো মিথ্যা আচরণ করছি যেন—ঋতা বদন্তো অনৃতং রপেম। যমের কথা থেকে বোঝা যায় যে, এমন একটা অবিহিত সম্পর্কের মধ্যে অন্যায় আছে, সেই অবিহিত যৌনতার নিরাকরণের প্রশ্নেই ঋত-শব্দের প্রসঙ্গ। যম বলছেন—এটা পাপ, বোনের সঙ্গে এই সম্পর্কের মধ্যে পাপ আছে—পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিযচ্ছাৎ।

এখানে যেমন এক অবিহিত যৌন সম্পর্কের নিষেধক হিসেবে ঋত-শব্দের প্রয়োগ ঘটছে, তাতে অবশ্যই এটা নীতি-নৈতিকতার পরিসর এবং সেটা যে একান্তভাবে নীতি-নৈতিকতাই তা অন্যতর এক বৈদিক প্রয়োগে স্পষ্ট হয়ে যায়। বেদ বলেছে—ঋতের পথ কখনও এক দুষ্কৃতী পাপী লোকের পথ হতে পারে না—ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ। ঋতের পবিত্র তন্তু সর্বত্র প্রসারিত হলে পণ্ডিতেরা তার চারপাশে

ঘিরে থাকেন। তার মানে বেদের মধ্যে ঋত যেন এক সর্বশক্তিমান নিয়ামক শক্তি, তার জোরেই পৃথিবী চলছে, তার জোরেই দেবতারা পাপী দুষ্কৃতীদের শাস্তি দিচ্ছেন—ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বিরাজথঃ। জীবন এবং সমাজের সমস্ত ভালোর মধ্যে বৈদিক ঋত এমনভাবেই প্রোথিত হয়েছে যে ঋত বৈদিক সভ্যতার প্রথম পর্যায়েই দেবতা সম্মান পেয়ে গেছেন, ঠিক যেমন মহাভারত-রামায়ণে ধর্মও দেবতার পর্যায়ে উন্নীত। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা যে ধর্ম, তাঁর কোনও রূপ নেই, ইন্দ্র-বায়ু বা অশ্বিনীকুমারদের মতো ধর্মের কোনও আকারিত বৈশিষ্ট্য নেই, অথচ সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

দুই

এটা বোধহয় স্বীকার করাই ভালো যে, অন্যায় করা, পাপ করা এবং তা থেকে অন্যায়-বোধ এবং পাপ-বোধ—এটাই বোধহয় এখনও পর্যন্ত যত মানুষের চেতন-অবচেতনের সবচেয়ে বড় মানসিক ব্যায়াম, যা মানুষকে বিব্রত করে। বেদে ঋত-ধর্মের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণের কাছে পাপ-স্বীকার করার একটা মন্ত্রণা আছে, আর আছে পাপমুক্তির জন্য তাঁর আনুকূল্য-প্রার্থনা। মন্ত্রগুলির দু-একটা উল্লেখ করছি এইজন্য যে, নীতিধর্মের যে মানস-লোক সেইকালে তৈরি হয়েছিল, সেটা বেশ জটিল। অথবা বলা উচিত—জটিল না হলেও সেটা জটিল হয়ে ওঠে। কেননা অন্যায়-অধর্ম করার পরেও মানুষ অন্তহীন যৌক্তিকতায় নিজেকে অযৌক্তিকভাবেই সমর্থন করতে থাকে এবং সত্যি বলতে কী, সেই অযুক্তির মধ্যে কুযুক্তিও যেমন এসে যায়, তেমনই কখনও বা তর্কলালিত যুক্তিও থাকে। ঠিক সেই জন্যই বৈদিক বশিষ্ঠের এই প্রার্থনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আধুনিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

বশিষ্ঠ বলেছেন—আমি খুব ভালো মনে কখন, কোন সময়ে সেই সুখপ্রদ বরুণকে দেখতে পাব? তোমার দেখা পেলে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কী পাপ করেছি—পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো...। কী সরল মানুষ এই বৈদিক বশিষ্ঠ—তিনি নিজের পাপবোধ নিয়ে পাঁচজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথাও বলেছেন। আর বাহিরিক মানুষের যা স্বভাব—পঞ্চায়েতের মোড়ল অথবা অজ্ঞানী বিদ্বান—তাঁরা তো সহজেই বিধান দেন। বশিষ্ঠ বলেছেন—আমি নানান প্রশ্ন নিয়ে বিদ্বান মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা ক্রান্তদর্শী, তাঁরা আমাকে বলেছেন—এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন—সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে। এখনও পর্যন্ত গ্রাম্য সাধুবাবা, সশ্মশ্রু কাপালিক এবং স্বার্থান্বেষী জ্যোতিষী এইভাবে দেবতার ক্রোধ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু অন্যায়ী ব্যক্তি সব সময় নিজের মন থেকে নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করতে চায় না বা স্বীকার করতে পারে না। ঠিক সেইভাবেই বশিষ্ঠ বলছেন—কী এমন করেছি আমি, যাতে বন্ধুর মতো এতকালের

স্তাবক আমাকে তুমি হত্যা করতে চাইছো—কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং/যৎ স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্? তুমি বলো আমি কী পাপ করেছি, যাতে তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে পারি তোমার কাছে।

বশিষ্ঠ তাঁর পাপমোচনের সূত্রে তৎকালীন দিনের কতকগুলি পাপের নমুনা দিয়েছেন। যেমন শরীরের মাধ্যমে করা পাপ—যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ। পশুখাদক চোরেরা খাবার জন্য যে পশু চুরি করে নিয়ে যায়—এটা একটা পাপ। গোরুর বাচ্চা বা বাছুরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা—এটা একটা পাপ। আর এই লিস্টিতে শেষ পাপের কথাটা এখনও ভীষণ বাস্তব। ইচ্ছে না থাকলেও যে পাপ কখনও কখনও অন্যের প্রভাবে তৈরি হয়, সে-কথা জানিয়ে বশিষ্ঠ বলেছেন—এমনও তো পাপ আছে, যা আমি নিজে করিনি, বা করতে চাইনি, হয়তো সে পাপ ভ্রমবশত ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়েছে, অথবা হঠাৎ মাথা গরম করে রেগে গিয়েছি বলে হয়েছে, মদ খেয়েছি বলে যে পাপ হয়েছে অথবা হয়েছে পাশা-জুয়ো খেলতে গিয়ে—ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যু র্বিভীতকো অচিত্তিঃ। তাছাড়া এমনও তো হয় যে, অনেক সময় বড়রা ছোটদের অন্যায়-পথে নিয়ে যায়। আর আছে স্বপ্ন, ঘুম—সেখানেও তো কত পাপ করি মনে মনে—অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে/স্বপ্নশ্চনেদ্ অনৃতস্য প্রযোতা।

বশিষ্ঠের প্রাচীন মানসিকতাতেও যদি অন্যায়-পাপগুলির বিচার করি, তাহলেও বলব—চুরি করার পাপটা মূলত লোভ এবং পরশ্রীকাতরতার ফসল, কিন্তু বাছুরটাকে গাভীমাতার দুধ খেতে না দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মধ্যে যে অমানবিকতা আছে, সেটাও তো পাপের মধ্যে গণ্য হয়েছে। আবার মদ খাওয়া, জুয়া খেলা বা হঠাৎ ক্রোধের পরে অবসন্ন পরিসমাপ্তির মধ্যে একটা পাপবোধের মতো পশ্চাত্তাপ খুব স্বাভাবিকও যদি হয়, তাহলেও বাস্তবতার চূড়ান্ত জায়গা হল—বড়রা যখন ছোটদের পাপের পথে নিয়ে যায়—অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে—অথবা যে অন্যায় আমি করতে চাইনি, কিন্তু পরিস্থিতি এবং অন্যজনের প্ররোচনায় সেই অন্যায়টা করতে বাধ্য হলাম—এই অদ্ভুত বাস্তবতা দার্শনিকের তার্কিক সংকট বাড়িয়ে তোলে শতগুণ। পরবর্তীকালে আমাদের যে নীতিশাস্ত্র তৈরি হয়েছে যাকে আমরা সাধারণ নীতি বলি, সেখানে এক নাম না-জানা কবি মানুষের খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ দেখিয়ে বলেছেন—কেউ অজ্ঞানবশত না জেনে, না বুঝে অন্যায় কাজ করে, খারাপ হয়ে যায়। কেউ খারাপ হয়ে যায় প্রমাদবশত—মদ খেয়ে, জুয়া খেলে। আর কিছু লোককে খারাপ করে দেয় খারাপ লোকেরা—কেচিন্নষ্টৈস্তু নাশিতাঃ।

সত্যি বলতে কী, খারাপ লোকেরা খারাপ করে দিচ্ছে, এই উদাহরণ কিন্তু পৃথিবীতে খুব কম নেই। তার মধ্যে আছে নিজের শক্তি, ক্ষমতা, অর্থ, বংশগৌরব, অহংকার—এগুলিও অদ্ভুত পরোক্ষতায় মানুষকে খারাপ হতে সাহায্য করে—এগুলি মানুষকে, বিশেষত মানুষের মনকে এমন ভঙ্গুর, নরম এবং গরম করে রাখে যে, ইন্ধন পাওয়া

মাত্রেই অন্যায়ের জায়গা তৈরি হয়ে যায়। লক্ষ করে দেখবেন—পূর্বে অহিংসা, সত্য ইত্যাদি দশবিধ ধর্মের যে একটা প্যাকেজ দেওয়া হল, সেটা নিজে চাইলেই ধরে রাখা যায় না, অন্যের কারণেও সেটা নষ্ট হয়। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে তো ওই দশ রকমের ধর্মযুক্তি স্থিরভাবে বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই ছোটবেলা থেকে অন্যায়ী দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভ নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে পাণ্ডবদের ওপরে যে অন্যায়গুলি করে গেছেন, তাতে একসময় যুধিষ্ঠিরের মতো ধৈর্যশীল মানুষেরও বংশগৌরব, শক্তি, বলবত্তা চেতিয়ে উঠেছে। তাঁকে যে শুধু নষ্ট লোকেরাই নষ্ট করল, তা নয়, পরিস্থিতি তাঁকে সেই দিকে নিয়ে গেছে, যেদিন তাঁকে শুধু ক্ষত্রিয়ের সদাচার পালনের জন্যই যুদ্ধ করতে হয়েছে।

অনেক দুঃখের মধ্যেও অনন্ত ক্ষমাবৃত্তির মধ্যেও যুধিষ্ঠির জানিয়েছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই বিরাট লোকক্ষয়ের পিছনে আমরাই হয়তো নিমিত্ত কারণ, কিন্তু সমস্ত দোষটাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের, তাদের ওপরেই যুদ্ধ লাগার প্রধান দোষগুলি বর্তায়—ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেষু তৎ সর্বং প্রতিপৎস্যতে। এখানে ধৃতরাষ্ট্রের নাম উচ্চারণ 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র' কথাটা বলায় ধৃতরাষ্ট্রকেও পরোক্ষে জড়িয়ে নিয়েছেন যুধিষ্ঠির এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন বৈদিক বশিষ্ঠের সেই আপ্তবাক্য—কখনও বড়রাও ছোটদের পাপে প্রবৃত্ত করে। যুধিষ্ঠির বলেছেন—আমরা কোনও অন্যায় না করা সত্ত্বেও দুর্যোধন চিরকাল আমাদের সঙ্গে ছলনা করেছে, বিদ্বেষ এবং শঠতার প্রয়োগও করেছে আমাদের ওপরেই—সদৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা মায়োপজীবনঃ—অথচ আমরা তাদের কোনও অপকার করিনি কখনও, চিরকাল ওপর ওপর একটা মৌখিক ভদ্রতা, দেখিয়ে তারা অসভ্যতা করে গেছে আমাদের সঙ্গে—মিথ্যাবিনীতঃ সততমস্মাসু অনপকারিষু। পাণ্ডবদের ওপরে দুর্যোধনের চিরকালীন তথা জন্মগত বিদ্বেষ, রাজসূয় যজ্ঞের ঋদ্ধি দেখে তাঁর অসূয়া, পাশাখেলার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃত অনুমোদন এবং পক্ষপাত এবং অবশেষে কৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাবে এতটুকুও সাড়া না দেওয়া—ক্রমান্বয়ে এই খারাপ হয়ে ওঠাটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের খারাপ হয়ে ওঠার পরিণতি যুগিয়েছে। যুধিষ্ঠির বলেছেন—দুর্যোধনের জন্যই আমাদের সমস্ত বংশটাই শেষ হয়ে গেল। তার জন্যই আমাদের যুদ্ধ করতে হল এবং যে-সব মানুষকে হত্যা করা উচিত ছিল না তাঁদেরও আজ হত্যা করতে হল। ফলত নিন্দিত মনে হচ্ছে নিজেকেই। ঘটনা যেটা ঘটল—দুর্যোধন সবাইকে নিয়ে নিজেও শেষ হয়ে গেল, আমাদেরও শেষ করে গেল—অশংসয়ং ক্ষয়ং রাজা যথৈবাহং তথা গতঃ।

যুধিষ্ঠিরের এই বক্তব্যে আমার মনে হচ্ছে—এক সময় কলকাতায় একটা সামান্য গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করার পর এক 'ট্রাফিক সার্জেন্ট' আমাকে বলেছিলেন—একটু সাবধানে চালাবেন, স্যার! আমি উলটে বলেছিলাম—আপনি সঠিক কথা বলেছেন,

আমিও সাবধানেই চলতে চাই। কিন্তু কী জানেন, আমি সাবধানে চললেও আমার পিছনের মিনিবাসটি যদি সাবধানে না চলে, কুড়িটা গাড়িকে ড্রিবল করে একটি স্কুটার যদি আপনার গাড়ির সামনে স্পিডে এসে ঝুপ করে 'ব্রেক' কষে, অথবা হাওড়ায় ট্রেন ধরানোর ট্যাক্সি যদি আস্তে-চালানো আমার গাড়ি পাশ থেকে ঘষটে দিয়ে যায়, তাহলে আমার সাবধানতায় লাভ কী? পুলিশ সার্জেন্ট স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ এরকম পরিস্থিতি হতেই পারে এবং হয়ও, যেখানে সাবধানী ভদ্রজনের কিছু করার থাকে না।

এই ঘটনা উল্লেখ করে আমি শুধু বোঝাতে চাইছি—অহিংসা, সত্য, অনসূয়া, ক্ষমা, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদি দশবিধ ধর্মের 'প্যাকেজ'ই হোক, অথবা ঐতিহ্যবাহিত সদাচার, স্মৃতি, বেদ ইত্যাদি চতুর্বিধ সংক্ষিপ্ত 'প্যাকেজ'ই হোক, পরিস্থিতি অনুযায়ী, স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধর্মের সংজ্ঞা পালটে যায়। আর ধর্মের সংজ্ঞা যে পালটায় সে-কথাটা এখনকার ধর্মকোবিদগণও তেমন করে বোঝেন বলে আমার মনে হয় না; বিশেষ করে মাঝে মাঝেই যাঁরা শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করে এক-একটা বিধান দিয়ে দেন, তারা এ-কথা অনেকে জানেনই না যে, জীবনকে বুঝে নিয়ে শাস্ত্রের বিধান দেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি, যার জন্য মহাভারতে মনুর মত অনুযায়ী সদাচার, স্মৃতি এবং বেদকে ধর্মের লক্ষণে প্রাধান্য দিয়েও—ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্—প্রয়োজন বা অর্থকেও ধর্মের লক্ষণ হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে এবং স্বয়ং মনু মহারাজও সেটা অস্বীকার করেননি, তিনি আরও সুবিধা দিয়ে বলেছেন—স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ—অর্থাৎ তোমার পরিশীলিত মনে যেটা প্রিয় বলে মনে হচ্ছে সেটাও ধর্ম। এখানে প্রশ্ন উঠবেই যে, তাহলে তো বিশাল সুবিধা হয়ে গেল, আবার ধরুন—পরের বউকে দেখে খুব তার সঙ্গলিপ্সা হচ্ছে—আত্মতুষ্টি হচ্ছে, তাহলে তো সেটা ধর্মই। ঠিক এইভাবে পৃথিবীর যত অপকর্মে যেখানে আত্মতুষ্টি ঘটছে, সেটাও তো তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমাণ।

পণ্ডিতজনেরা বলবেনই যে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ওঁরা বলবেনই যে, এই ধরনের আত্মতুষ্টির ক্ষেত্রে তোমার মনটা কেমন সেটা আগে বোঝা দরকার। মনটা যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, সংযমের মাধ্যমে পরিশীলিত হয়, তবে সেই মন যদি বলে—এটা ভালো কিংবা এটা মন্দ, তবে ধর্মলক্ষণে সেটা প্রমাণ বলেই গণ্য হবে। এই ব্যাপারটা খুব জব্বর করে ধরেছেন সে-কালের মীমাংসা-দর্শনের ধুরন্ধর দার্শনিক কুমারিল ভট্ট। ঐতিহ্য-পরম্পরার বাইরে এসে আত্মতুষ্টি-ব্যাপারটাকে ধর্ম-প্রমাণ হিসেবে মানতে গেলে অন্তর্গত ব্যক্তি-হৃদয় এবং বুদ্ধির চিরায়ত পরিশীলন অপেক্ষিত থাকবে, এই কথা বলাটা কুমারিল ভট্টের মতো সংরক্ষণশীল দার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মতুষ্টির ধর্মপ্রমাণে তিনি যখন কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম নাটক থেকে দুষ্মন্তকে টেনে আনলেন, তখন বুঝলাম কুমারিল ভট্টের মনও নরম হয় কখনও কখনও। দুষ্মন্ত তো তপোবনবাসিনী এক সরলা রমণীকে গাছের আড়াল থেকে

দেখছিলেন, শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর দুই সখীর মেয়েলি ঠাট্টা-ইয়ার্কিও শুনছিলেন গাছের আড়াল থেকেই। রাজার যখন শকুন্তলাকে দেখে মনে মনে বেশ পছন্দ হয়ে গেল এবং তাঁকে বিয়ে করতে মন চাইল, তখন তিনি শকুন্তলার জাত-বিচারও করতে থাকলেন মনে-মনে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলেন।

দুষ্মন্ত ভাবছিলেন—এমন সুন্দর চেহারা যাঁর, সে কি এই বামুন ঋষি কণ্বের ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত হবেন, নাকি ইন্টার কাস্ট বিয়ের ফলে কণ্বমুণির কোনও অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে এই মেয়ে জন্মেছে—অপি নাম কুলপতেরিয়ম্ অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা স্যাদ? কিন্তু এই ক্ষণিক সন্দেহের পরেই দুষ্মন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে মনে বললেন—বেকার ভাবছি এত! এ-মেয়ে নিশ্চয়ই আমার মতো এক ক্ষত্রিয়ের বিয়ে করার যোগ্য মেয়ে। আমার পরিশীলিত ভদ্র মন যেহেতু এই মেয়েকে আপন করে পেতে চাইছে, তখন এই মেয়ে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের ঘরের বউ হবার উপযুক্ত—অসংশয়ং ক্ষত্র-পরিগ্রহ-ক্ষমা/ যদার্যমস্যাম্ অভিলাষি যে মনঃ। নিজের আত্মতুষ্টির জায়গাটায় আপন পরিশীলিত মনের অধিকার যুক্তিসিদ্ধ হতেই দুষ্মন্ত সার্বিক একটা সমর্থনের ভাষা তৈরি করে বলেছেন—যে পরিসরে ভদ্র-সজ্জনের সংশয়-সন্দেহ তৈরি হয়, সেখানে তাঁদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি যে দিকে ঝুঁকে থাকবে, সন্দেহ-নিরসনে সেটাই প্রমাণ-সতাহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু। প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।

'অন্তঃকরণ'। সৎ, সাধু, পরিশীলিত ভদ্রজনের 'অন্তকরণ'। কুমারিল ভট্টের মতো সংরক্ষণশীল দার্শনিক নিশ্চয়ই এই শব্দগুলির ওপর জোর দিয়েছেন, তা না হলে নিজের দার্শনিক যুক্তি-সিদ্ধির জন্য কবির মতামত তুলে আনতেন না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, মহাকবির নায়কের মুখে একখানি, তাবড় বাক্য শুনেই দার্শনিক ভাবলেন—শুধু আমি কেন, কবিরাও আমার মতোই ভাবে। কিন্তু দার্শনিক এটা বোঝেননি যে, কবিরা কত বিপরীত বস্তুকে কত বিচিত্র শাস্ত্র-সমর্থনে গড়ে তুলতে পারেন। বস্তুত মৃগয়াবিহারী মহারাজ দুষ্মন্তের 'অন্তঃকরণ', তাঁর 'মন-বুদ্ধি-চিত্ত—অহংকারে'র পরম্পরা-প্রাপ্ত বাসনালোক তত আর্যজনোচিতভাবে পরিশীলিত কিনা সেটা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। আর সেটা উঠবেও, দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্তের অপচরিত্র যতই ঢেকে যাক, প্রথম শকুন্তলাকে দেখার পর দুষ্মন্ত যখন লতা-পাদপের অন্তরাল থেকে শকুন্তলাকে দেখছেন, তাঁর বল্কলোদ্ভেদী বক্ষ নিয়ে দুই সখীদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুনছেন অথবা তাঁর অঙ্গ-সন্নদ্ধ যৌবনকে ফুলের মতোই লোভনীয় বলছেন, তখন যেহেতু অপরিচিতার ব্যাপারে রাজার দৃষ্টিরমণ, শ্রবণ-রমণ এবং মানসিক আসঙ্গলিপ্সা তৈরি হয়েই যায়, তখন তাঁর অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে কতটা আর্যজনোচিত কতটা সাধু, কতটা পরিশীলিত বলা যায়, সেটা চতুরবুদ্ধি মহাকবি স্পষ্টতঃ এবং শব্দতঃ সামনে আনেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই এই দুষ্মন্তের মুখে যখন শাস্ত্রকথিত আত্মতুষ্টির ধর্মপ্রমাণতা উচ্চারিত হয়, তখন বুঝতে

হবে—মহাকবি বোঝাচ্ছেন—এই ধরনের মানুষই পৃথিবীতে বেশি, যাঁরা আপন প্রয়োজনে আত্মতুষ্টির ধর্মপ্রমাণতা ব্যবহার করে বসেন। মীমাংসাশাস্ত্রে ধুরন্ধর হলেও সরল দার্শনিক কুমারিল নাট্যগ্রন্থনার বিচিত্র পুটকে রাখা বিষামৃতের ব্যঞ্জনাগুলি তেমন বোঝেননি বলেই মনে করি। বিশেষত দুর্বাসার শাপে দুষ্মন্তের চরিত্রে নাগরিক ভদ্রতা সুরক্ষিত করে রাখলেও পঞ্চম অঙ্কে যখন স্ত্রীলোকের বিষয়ে রাজার মুখ দিয়েই তাঁর আপন চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়—'আমরা একবার মাত্র প্রণয় করেই তো ছেড়ে দিই—সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ'—তখন কিন্তু কুমারিল ভট্টের জায়গায় সার্ধশতবৎসরের সেই সমালোচনাটা মনে আসে—পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে দুষ্মন্তের স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

আমাদের বক্তব্য—শকুন্তলার আসঙ্গলিপ্সু দুষ্মন্ত যখন তাঁকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন নিজেকে আর্যজন হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আত্মতুষ্টির এই ধর্মপ্রাণ সংগ্রহ করাটাও কাব্যের খাতিরে আকস্মিক এবং তা তাঁর নিজের প্রয়োজন সাধন করে; সেই দিক থেকে ব্যাপারটা প্রাকৃতিকও বটে। অন্যদিকে বেদ, স্মৃতি, সদাচার—এই তিনটি ছাড়াও পরিশীলিত মনের আত্মতুষ্টি (মহাভারতের মতে সেটা 'প্রয়োজন')—এই চতুর্থটিকে যদি না মানা যায়—কখনও কখনও কুশলী ব্যক্তি এটাকে স্বপ্রয়োজনে ব্যবহার করলেও—এটাকে যদি না মানা যায় তাহলে সমাজের 'মোবিলিটি', 'ডাইনামিজম্' সবটাই বেদ-স্মৃতি-সদাচারের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে যাবে। হয়তো বা ধুরন্ধর দার্শনিক এই কারণেই আত্মতুষ্টির জায়গায় 'ধর্ম-ধী-সংস্কৃত' ব্যক্তির আত্মতুষ্টিকেই ধর্মে প্রমাণ বলে মেনে নিয়েও মহাকবির থেকেও বেশি চতুরতায় কালিদাসের শ্লোক উদ্ধার করেছেন এবং এই জায়গাটাকে শিথিল করে রেখেছেন সমাজের প্রয়োজনে।

মহাভারত কিন্তু এ-বিষয়ে অনেক বেশি উদার, হয়তো বা যুধিষ্ঠির তার চাইতেও বেশি, তিনি অনেক বড় এবং এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিভূ। তাই ভীষ্ম যখন বললেন—বেদ, স্মৃতি, সদাচার—এই তিনটেই সমস্ত ধর্মসংশয়ে প্রমাণ, তখন যুধিষ্ঠির বললেন—এটা কেমন কথা হল পিতামহ? ধর্মের বিষয়ে সদাচারকে প্রমাণ বললেন আপনি, খুব ভালো কথা। বেদকে ধর্মপ্রমাণ বললেন, সেটাও বেশ ভালো কথা। কিন্তু আমার মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে, আর এই পৃথিবীা জীবন দেখে আমারও তো কিছু অনুমান হয়, কেননা বাস্তব জীবনটা একেবারেই আলাদা—প্রতিভা ত্বস্তি মে কাচিত্তাং ব্রুয়াম্ অনুমানতঃ। যুধিষ্ঠির বললেন—সব বুঝলাম। বুঝলাম যে ধর্মই সৃষ্টি করে এই প্রাণীকুল, ধর্মই তাদের জীবিত রাখে; কিন্তু কী জানেন—শুধু শাস্ত্রের বচন উগরে দিয়ে, বেদ-পুরাণ পড়ে পাঁচটা বাণী শুনিয়ে দিয়েই কিন্তু ধর্ম বোঝা যায় না—ন ধর্মঃ

পরিপাঠেন শক্যো ভারত বেদিতুম! যে মানুষের সব কিছু ঠিক আছে, সব দিক মানিয়ে যিনি বিনা সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁর ধর্ম একরকম। কিন্তু যে মানুষ সুস্থির অবস্থায় নেই, জীবনের বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র চেহারা যাকে দেখতে হচ্ছে, সে মানুষের আচরণীয় ধর্মও হবে অন্যরকম—অন্যে ধর্মো সমস্থস্য বিষমস্থস্য চাপরে। তারপর ধরুন না কেন, বিপদে-আপদে পড়লাম, আর সে বিপদ-আপদও আবার সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়, প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনে বিপদ-আপদের ধরন একান্তভাবে পৃথক, সেখানে শাস্ত্র তো বাণী দিয়েই খালাস—সত্য কথা বলো, চুরি কোরো না, পরস্ত্রীর দিকে তাকিয়ো না—আমার তো মনে হয়, পিতামহ! এসব জায়গায় শাস্ত্র আউড়ে কোনও লাভ নেই, কেননা শাস্ত্র পড়ে এমন স্বতোবিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায় না—আপদস্তু কথং শক্যা পরিপাঠেন বেদিতুম!

এ কথা ভীষণ রকমের সত্যি যে, মনুষ্য জীবন এমনই বিচিত্র এক মানবিক সমাহার, যেখানে পরিবার, পরিজন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থ, দেশধর্ম, জাতিধর্ম এবং কালোচিত বিধেয় এমনভাবে ক্রিয়া করে যে, অনেক সময়েই শাস্ত্র-বিহিত উদ্ধৃতি দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। ভেবে দেখুন, অমন যে রামায়ণ-মহাকাব্য, যেখানে বনযাত্রার চরম সংকটের মধ্যেও রামচন্দ্র সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ভোলেন না, সেখানেও কিন্তু শুধু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে জীবন চলেনি। শাস্ত্রবিহিত নীতিনৈতিকতা মহাসংকটকালে কেমন অদ্ভুতভাবে উলটে যায়, তা রামায়ণের মতো শাস্ত্রনীতিপ্রবণ গ্রন্থের মধ্যেও ভীষণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। ঠিক ধর্ম এবং ধর্মসংকট বলতে যা বোঝায়, তা যেহেতু রামায়ণ- মহাভারত—দুই জায়গাতেই বস্তুত নীতি এবং নৈতিকতার সংকট, তবু এটা বুঝে নেওয়া ভালো যে, রামায়ণের নীতি-নৈতিকতার সংকট তেমন গহন এবং বিচিত্র নয়, যেমনটা মহাভারতে। তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয়, রামায়ণে প্রধানত পারিবারিক এবং ব্যক্তিসম্পর্কগুলির মধ্যেই নৈতিক সংকট আবর্তিত হয়, মহাভারতে তা খাদ্য-পানীয়ের মতো সাধারণ বিষয় থেকে আরম্ভ করে বিবাহ-পূর্ব কামনা, ধর্ষণ কিংবা পরস্ত্রীবিলাসের মতো গভীর এবং কঠিন বিষয়কেও অনায়াসে স্পর্শ করে। সবচেয়ে বড় কথা, রামায়ণের নৈতিক সংকটগুলি সমাহিত হয় ব্যক্তি-মানুষের চরম আত্মনিগ্রহ এবং 'স্যাক্রিফাইসে'র মাধ্যমে, কিন্তু মহাভারতে তা অনেক সময়েই বিকল্প অনুসন্ধানের সুব্যাখ্যায় সামাজিক চলমানতা তৈরি করে এবং তা করে পরম ঔদার্যে। আরও পরিষ্কার করে বলা উচিত, নৈতিকতার সংকটে রামায়ণে কোনও ক্ষমার প্রশ্ন নেই, মহাভারতে সেটা জীবন-বৃত্তির অনন্ত প্রসারণের মধ্যে জীবনের প্রয়োজন সমাধান করে বৈকল্পিক ধর্মভাবনায়।

একটা সাধারণ কাহিনি, যা রামায়ণেও আছে এবং মহাভারতেও আছে, সেই কাহিনিতে অন্যায়ের প্রতি যে 'অ্যাটিটুড' তৈরি হচ্ছে, সেটা খেয়াল করলেই নৈতিকতা বা ধর্মের প্রশ্নে দুই পক্ষের মৃদু-কঠোর দার্শনিকতাটুকু ধরা পড়বে। ধরা যাক, অহল্যা,

মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা গৌতমের অবর্তমানে একাকিনী আশ্রমে ছিলেন। এই সময়ে অহল্যার রূপমুগ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম-ঋষির রূপ ধারণ করে অহল্যার কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে শরীর-মিলন প্রার্থনা করলেন। হয়তো বা অহল্যা শাস্ত্রোচিত মর্যাদা রক্ষার জন্য ঋতুকালীন প্রতীক্ষার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কামনার তীব্রতায় ইন্দ্র তা মানতে চাননি এবং সেটা তাঁর কথা শুনেই বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন—কামপ্রার্থী পুরুষ কখনও ঋতুকালের অপেক্ষা করে না। আমি এই মুহূর্তেই তোমার সঙ্গে সংগম প্রার্থনা করছি—সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।

অহল্যা গৌতমবেশী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলেন—মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সংগম-কৌতূহল তিনি প্রত্যাখান করতে পারলেন না বলেই দেবরাজের ঈপ্সিত মিলনে রাজি হলেন অহল্যা এবং মিলনের পর তাঁর আত্মচরিতার্থতাও জ্ঞাপন করলেন সোচ্চারে। ইতোমধ্যে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে-প্রবেশ, আপন বেশধারী ইন্দ্রকে চিনে ফেলা এবং তাঁর প্রতি অভিশাপ—তুই আমারই রূপ ধারণ করে এই অপকর্ম করলি, তোর অণ্ডকোষই খসে পড়ে যাক—অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি। গৌতম অহল্যাকেও শাপ দিলেন—তুমি এই আশ্রমে হাজার বছর ধরে উপবাসে থাকো এবং তোমাকে থাকতে হবে একা, সকল প্রাণীর অলক্ষে। গৌতমের শাপমুক্তির শর্ত ছিল ভগবান রামচন্দ্রের দর্শনলাভ।

রামায়ণের এই কাহিনিতে রামচন্দ্রের দর্শনলাভে অহল্যার শাপমুক্তি ঘটেছে—এই পরম অলৌকিকতা এবং ভগবৎ-সত্তায় রামচন্দ্রের করুণা-গুণ যত প্রকট হয়ে উঠছে, তার অনেক বেশি উদার ভাবনায় অহল্যার কথা ভেবেছে মহাভারত। এখানে প্রসঙ্গ ছিল—একটা কাজ কীভাবে করতে হবে—ধীরে? খুব ভেবেচিন্তে? নাকি খুব তাড়াতাড়ি? ভীষ্ম বললেন—এ ব্যাপারে একটা পুরানো ঘটনা তোমাকে শোনাবো এবং সে ঘটনার মর্মগ্রন্থি এইটাই যে, খুব ভেবেচিন্তে সময় নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া উচিত। এবারে ঘটনাটা শোনো। মহর্ষি গৌতমের একটি ছেলে ছিল, তাঁর নাম চিরকারী। যে কোনও কাজই সে করত, সেটা সে এতই ভাবনা করে, সময় নিয়ে করত যে, তার নামই হয়ে গেল চিরকারী। তবে কাজ বলেই নয়, সে যখন ঘুমোত, তখন অনেক বেশি সময় ঘুমিয়ে থাকত, আবার যখন সে জেগে থাকত, তখন অনেক বেশি সময় ধরেই জাগত, আর যে কোনও কাজ শেষ করত বড় দীর্ঘ সময় নিয়ে—চিরং কার্য্যাভিপত্তিশ্চ চিরকারী তথোচ্যতে। এইরকম একটা লোককে যে মানুষ ভীষণ বোকা বলবে, অলস বলবে এটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, আসল কথায় আসি। ইন্দ্র আর অহল্যার সেই ব্যভিচার ঘটনা ঘটার পর একদিন গৌতম-মহর্ষি পুত্র চিরকারীকে ডেকে বললেন—তুমি তোমার জননীকে হত্যা করো আমার আদেশে—জহীমাং জননীমিতি। গৌতম ঋষি পুত্রকে আদেশ দিয়েই

আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন তপস্যায়, আর ওদিকে চিরকারী বসলেন ভাবনার তপস্যায়। চিরকারী ভাবলেন পিতার আদেশই বা তিনি পালন করবেন কী করে, আবার ছেলে হয়ে মাকেই বা তিনি হত্যা করবেন কী করে—দু'দিকেই তাঁর ধর্মসংকট, এ অবস্থায় তিনি মুক্তই বা হবেন কী করে—কথং ধর্মচ্ছলেনাস্মিন্ নিমজ্জেয়ম্ অসাধুবৎ? চিরকারী তাঁর পিতার সম্বন্ধে রীতিমতো শাস্ত্রীয় সম্ভ্রম পোষণ করে এবং একই সম্ভ্রম পোষণ করে মাতার সম্বন্ধেও। বহুতর শ্লোকরাশি, যা কিনা পিতার মাহাত্ম্য এবং পূজ্যতা প্রমাণ করে সেগুলি চিরকারী গভীরভাবে আলোচনা করলেন মনে মনে। আবার মায়ের ব্যাপারে যত শাস্ত্রীয় বিচার আছে, সেগুলিও তিনি পরম যৌক্তিকতায় ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ব্যভিচার এবং পর কামুকতার ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষরা যত দায়ী, স্ত্রীলোকেরা তত নন। এমনকী নিজের মায়ের ক্ষেত্রেও—অহল্যার দোষ কতটুকু। ইন্দ্র তাঁর স্বামী গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন অতি নিপুণভাবে, ফলত অহল্যা তাঁকে স্বামী বলে ভেবে নিয়েছিলেন বলেই নিজেকে সর্বাত্মকভাবে সমর্পণ করেছিলেন—তস্যাত্মনা তু সদৃশম্ আত্মানং পরমং দদৌ।

চিরকারী পিতা মাতার গুণ এবং মাহাত্ম্য নিয়ে যে তুল্যমূল্য বিচার করেছিলেন, তাতে শেষের দিকটায় মায়ের পাল্লাটাই যেন একটু ভারী হয়ে গেছে। এর ওপরেও জীবনের বিচিত্র অভিসন্ধি মাথায় রেখে তিনি যখন নিজের জননীকে একজন স্ত্রী হিসেবে বিচার করছেন, সেখানে ব্যভিচারের প্রসঙ্গ ওঠার পরেও উদার সামাজিক শুভৈষণায় চিরকারী ভেবেছেন—ব্যভিচারের ঘটনা পৃথিবীতে যত ঘটে, সেখানে পরম প্রবৃত্তিটা পুরুষের তরফ থেকেই দেখা যায় এবং মেয়েদের যেহেতু শারীরিক শক্তি কম অতএব বলাৎকার, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা প্রধানত পুরুষের ইচ্ছাধীন এবং অন্যায়টা সে-ই প্রথম করে মেয়েরা করে না—সর্বকার্যাপরাধ্যত্বান্ নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ। চিরকারী শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকেই তাঁর পুরুষপ্রবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে তাঁর মা অহল্যার দিকটা বুঝে নিতে চাইলেন সেই পুরুষ-প্রবৃত্তির বলি হিসেবে। পিতার আদেশ মান্য করে তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা, চিরকারী মনুষ্য-জীবন-যাপনের গার্হস্থ্য বিচারেই অহল্যা-জননীকে সমস্ত অন্যায় থেকে মুক্তি দিয়ে বসে রইলেন। সব কাজেই চিরকারী দেরি করেন, এটাতেও দেরি করলেন।

অনেক কাল পরে আশ্রমে ফিরে এলেন মহর্ষি গৌতম। অনেক কাল তপস্যার পর যখন তাঁর মন প্রশান্ত হয়েছে, ঈর্ষা, অসূয়া, ক্রোধ সব যখন তাঁর মন থেকে দূরীভূত, তখন সেই তপস্যার অন্তরে গৌতমের মনে প্রচণ্ড অনুতাপ তৈরি হল। তিনি ভাবলেন এটা আমি কী করলাম। দোষটা তো আমারই ছিল। আসলে ঘটনাটা এইরকম যে, দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ-পথে যেতে যেতে অহল্যার রূপ দেখে মহামুগ্ধ হয়ে পড়েন। তখন তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে একেবারে অতিথি হয়ে এলেন গৌতমের আশ্রমে। ঋষি গৌতম নিজেই পূর্বকথা রোমন্থন করে বলছেন—যখন ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে আমার

কাছে এলেন দেবরাজ, তখন আমিই তো তাঁকে মধুর বাক্যে আসন-অশন দিয়ে বসিয়েছি, পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছি—স ময়া সান্ত্বিতো বাগ্‌ভিঃ স্বাগতেনাভিপূজিতঃ। তাঁকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়ে এমন কথাও বলেছি যে, আপনি এই আশ্রমে আসার ফলে আমাদের একজন অভিভাবক জুটল, আমরা অনাথ ছিলাম, আপনি আসার ফলে সনাথ হলাম। আমি এটাই ভেবেছিলাম যে, একজন অতিথিকে এইভাবে মর্যাদা দিলে তিনি খুশি হবেন এবং তিনি হয়েওছেন সেটা—পরবানস্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয়িষ্যতি তেন চ। গৌতম স্থিরবুদ্ধিতে এবার ভাবলেন যে, এইভাবে এক ব্রাহ্মণবেশী দেবতা-পুরুষকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িতে রেখে দেওয়াটার মধ্যেই তাঁর চরম অকৌশল তৈরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে এমন অতিথিকে বিশ্বাস করে তিনি বাইরে চলে গেলেন— কৌশলহীনতার চরম বিন্দু সেখানেই, অহল্যাকে সেখানে দোষ দিয়ে কী হবে—অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ। গৌতম অনুতাপগ্রস্ত হলেন অহল্যার জন্য, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের জায়গায় তিনি নিজেকেও বেশি দোষ দিতে পারলেন না। বললেন— বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা করব এটাই স্বাভাবিক, আবার ইন্দ্র-হাজার হলেও সে রাস্তার লোক, তার স্বভাবের মধ্যে এই অতিক্রম থাকবে, এটাও স্বাভাবিক, আর অহল্যার কী দোষ, সে তো পরিস্থিতির শিকার। তাহলে ধর্মের কাছে কার প্রমাদ ঘটল? কেউই তো আমরা তেমন দোষী নই—এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাধ্বগস্ত্রিদশেশ্বরঃ।

টীকাকারেরা বলেছেন—অনুতাপগ্রস্ত এই সিদ্ধান্তে গৌতম ইন্দ্রকে যে শেষ পর্যন্ত প্রায় নির্দোষ বলেই ছেড়ে দিলেন, সেটা মৌখিক তর্কযুক্তির খাতিরে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তিনি তাঁকে নির্দোষ ভাবছেন না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটে গেছে, সেখানে তাঁর অনবধানতা এবং অকৌশলই যে প্রধানত দায়ী, সেটা তিনি বুঝেছেন। —প্রমাদস্তু অপরাধ্যতি। তার মানে, সিচুয়েশন, পরিস্থিতি এবং বেখেয়াল। ইন্দ্রকে তিনি বলেছেন—রাস্তার লোক-(অধ্বগ), সে লোকটাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে সুন্দরী বউকে একলা রেখে তিনি বাইরে গেলেন—এই বেখেয়াল 'অনবধান—এটাই অধর্মটা ঘটিয়ে দিল। অতএব অনুতাপের বিষয় এটাই যে, তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী অহল্যা, কামনার ক্ষেত্রে যিনি গৌতম ঋষিকেই চান, সেই স্ত্রীকে হত্যার আদেশ দিয়ে এলেন তিনি—হত্বা সাধ্বীঞ্চ নারীঞ্চ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্। এখন তার ভরসা একটাই—চিরকারী; সব কাজই যে দেরি করে করে, বিবেচনা করে করে।

গৌতম আশ্রমে ফিরে দেখলেন—চিরকারী আপন সুচিরায়ত বিবেচনায় মাতৃহত্যা করেননি। তিনি পরম আনন্দে পুত্রকে অনেক আশীর্বাদ করলেন এবং অহল্যাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন বিনা বাক্যে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি সচেতন হলেন—সুন্দরী বউকে আর অরক্ষিত রাখলেন না। চিরকারীকে তিনি বলেছিলেন—আমি প্রয়োজনে বাইরে গেলে তুমি অস্ত্রধারণ করে জননীকে সুরক্ষা

দেবে। কিন্তু ক্রোধান্বিত আদেশটুকু—মাকে তুমি মেরে ফেল এই আদেশটা চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল—হন্যা ইতি সমাদেশঃ শস্ত্রপাণৌ সুতে স্থিতে। আমরা শুধু বলতে চাই—অহল্যার কাহিনিটা হয়তো রামায়ণ থেকে এখানে একটু আলাদা, কিন্তু ধর্ম এবং নৈতিকতার জায়গাটা এখানে অনেক মানবিকভাবে প্রসারিত। গৌতমও যেমন—'আমি আদেশ দিয়েছি, কেন মানা হয়নি' বলে চেপে ধরে বসে নেই, তেমনই তাঁর পুত্রও চিরকারিত্বের স্বভাবে বিনা বিবেচনায় পিতৃসত্য পালন করেনি। তার মানে, মহাভারত শাস্ত্রীয় সত্যধর্মকে পাষাণ-রেখায় লিখিত অনতিক্রমণীয় সত্য বলে মনে করে না। সমাজের প্রয়োজনে, বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে সেই সত্য বা ধর্মকে মহাভারত পুনর্বিবেচিত করে।

বস্তুত সত্যরক্ষার এই ভয়ংকর দুরাগ্রহ রামায়ণ মহাকাব্যে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, মহাভারতে হয়তো নিতান্ত ধর্মীয় কারণে এমনটা ঘটত না। শম্বরাসুরকে বধ করার পর দশরথ রাজা ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন, রানি কৈকেয়ী এই অবস্থায় চরম শুশ্রূষা করে দশরথের প্রাণ বাঁচিয়ে তুললেন। কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের এমনিই দুর্বলতা ছিল, তার ওপরে এই ঘটনায় তিনি এতই বিব্রত হয়ে পড়লেন যে, অসীম কৃতজ্ঞতায় তিনি দু-দুটি ইচ্ছাপূরক বর দিতে চাইলেন কৈকেয়ীকে। প্রিয়ত্বের মর্যাদায় সেদিন সেই বর কৈকেয়ী গ্রহণ করলেন না কিন্তু সেটাই কুচক্রী মন্থরার প্ররোচনায় অন্যভাবে ফিরে এল রামচন্দ্রের রাজা হবার সময়। এইখানে দশরথের প্রতিজ্ঞাত সত্য এত বড় হয়ে উঠল যে, দশরথ কোনও ধর্মযুক্তিতে এই সত্য থেকে সরে আসতে পারলেন না এবং কামুক পিতার সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বনে যেতে হল। দশরথ অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন কিন্তু কৈকেয়ীর চাপে কোনও যুক্তিকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বিশেষত দশরথের শেষ যুক্তি যেটা ছিল—তিনি রাজসভায় মন্ত্রী-অমাত্য- পুরোহিতের সামনে রামচন্দ্রের অভিষেক ঘোষণা করেছেন এবং পুর-জনপদের সকল প্রজা এই অভিষেক চাইছে—এই রাজনৈতিক এবং রাজধর্ম সংক্রান্ত যুক্তি মহাভারতের কোনও ভ্রষ্টা রমণীও অস্বীকার করতেন না; আর যদি বা করতেন তাহলে বৃহত্তর মঙ্গল এবং প্রজাকল্যাণের কারণে কৈকেয়ীকে অন্য উপায়ে শান্ত হতে হত।

হ্যাঁ, এটা মানছি, রামায়ণে দশরথ রাজার এতাদৃশী মতিচ্যুতি না ঘটলে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সমস্ত মহাকাব্যিক পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে যেত এবং আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে বঞ্চিত হতাম। কিন্তু সামাজিক সংকট তথা ধর্মসংকটের জায়গায় রামায়ণের 'রিজিডিটি' অনেক ক্ষেত্রেই সংকট আরও বাড়িয়েছে, এ কথা মানতেই হবে। দশরথের উদ্দেশে কৈকেয়ীর যে যুক্তি ছিল—সত্যই সব, ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, সত্যমেকপদং ব্রহ্ম—এই যুক্তি মহাভারতেও আমরা বহুবার শুনেছি; শুনেছি যুধিষ্ঠিরের মুখে, বিদুরের মুখে, ব্যাসের মুখে এবং ভীষণভাবে ভীষ্মের মুখে, যে কারণে

তাঁর নামটাই ভীষ্ম হয়ে গেছে। কিন্তু খেয়াল করবেন—সত্যবতীর কথায় প্ররোচিত হয়ে ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞাত সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও কিন্তু একটা 'অলটারনিটিভ' বার করেছেন। কিন্তু রামায়ণে কোথাও কোনও 'অলটারনিটিভ' হয় না—হয় সত্য, নয়তো মিথ্যা। হয় লাল, নয় নীল। হয় ধর্ম, না মানলেই সেটা অধর্ম—ধর্মের আর কোনও 'শেড' নেই, নেই বিচিত্র বর্ণাঢ্যতা। হনুমান সাগর পার হয়ে লংকায় এলেন এবং সীতার সঙ্গে দেখার পর অনেক কথার শেষে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমার পিঠে চড়ুন, আমি আপনাকে রামচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেব—ত্বান্তু পৃষ্ঠগতাং কৃত্বা সন্তরিষ্যামি সাগরম্। এর উত্তরে সীতা প্রথমত অনেক ভয়ালু যুক্তি দিয়েছিলেন এবং বোঝা যাচ্ছিল সেগুলো হনুমানকে এড়িয়ে যাবার জন্যই বলা। কিন্তু শেষে তাঁর মধ্য থেকে সেই সতীতমা বেরিয়ে এলেন এবং পুত্রপ্রতিম হনুমানকে বললেন—স্বামী ছাড়া আর কোনও পুরুষের শরীরে আমার স্পর্শ ঘটুক, এ রকমটা আমি চাই না—নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রম্ ইচ্ছেয়ং বানরোত্তম। সীতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই রাবণের প্রসঙ্গ উচ্চারণ করে বলেছেন যে, রাবণ তাঁকে জোর করে রথে তুলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী-শরীরে রাবণকে প্রতিহত করার শক্তি ছিল না।

আমরা ভাবি, শুধু পুরুষ-স্পর্শদোষের কথা হলে মহাভারতের নায়িকাদের কী অবস্থা হত? সত্যবতী এবং কুন্তি তো কন্যাকালেই পুত্রবতী হয়েছেন, আর বিবাহের পরে স্বামী ছাড়াও কুন্তির পুরুষ আরও তিনজন আর দ্রৌপদীর পাঁচজন তো একেবারে বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত। কিন্তু এই স্বামীবৃত্তের বাইরে যদি স্পর্শদোষে সতীত্ব নষ্ট হয়, তো কতবার দ্রৌপদীর সতীত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে—দুঃশাসন তাঁকে স্পর্শ করেছেন, দুর্যোধন তাঁকে উরু দেখিয়ে বসাতে চেয়েছেন কোলে, জয়দ্রথের সঙ্গে তো এমন ধস্তাধস্তি হয়েছে যে দ্রৌপদী তাঁকে ঠেলে মাটিতে ফেলেও দিয়েছেন একবার, তারপর তো দ্রৌপদীহরণ। বনবাসে গিয়েও তাঁর কম ঝামেলা হয়নি, সেখানেও কীচকের শরীর স্পর্শ ঘটেছে। কিন্তু এতগুলি পুরুষ-স্পর্শ সত্ত্বেও মহাভারত তাঁকে এমন অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতেই সতীত্বের মর্যাদা দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে তাঁদের জন্য প্রাতঃস্মরণিকা লিখতে হয়েছে— অহল্যা, দ্রোপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী তথা। সবার উপরে, যে সব মুখর লোকের কথায় সাধ্বী-সতীকে পরিত্যাগ করলেন রামচন্দ্র। কী? না তারা বলেছিল—রাবণ সীতাকে কোলে করে রথে তুলেছিল—অঙ্কম্ আরোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ ধৃতাম্। তো এর উত্তর তো সীতা সেই প্রথম বার অগ্নিপরীক্ষার আগেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তো যে, আমি কী করব? আমার নিজের কোনও ইচ্ছা থাকত তো সেটাকে খারাপ বলতে পারতে, কিন্তু আমাকে জোর করে ধরে রথে ওঠাচ্ছে, আমার হাত-পা শরীর কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, সেখানে আমার দোষটা কী হল—পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা।

এই কথার উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তি ছিল গ্রাম্য গোঁয়ার দোলগোবিন্দ পুরকায়েতের মতো। সে বলেছিল—ওসব জানিনে, তোরে ছুঁল কেন ওডা। ওডা কোন্ ভাতার তোর? সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল কিন্তু আবারও সেই একই যুক্তি উঠে এসেছিল প্রজাহিত-মুখর রামচন্দ্রের মুখে। এই বাবদে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখুন—জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রাবণের মতো করেই রথে তুলেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া কী? ভীম দ্রৌপদীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জয়দ্রথকে মেরে ফেলার ভাবনা নিয়েই জয়দ্রথকে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রস্থান-মুহূর্তেই পরে কী হতে পারে সে কথা ভেবে যুধিষ্ঠির চেঁচিয়ে বলছেন—ভগিনী দুঃশলার কথা মনে রেখো, সে যেন বিধবা না হয়, জননী গান্ধারীর কথা মনে রেখো, তিনি যেন জামাতৃহীন না হন। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এসব এক ধরনের যৌধিষ্ঠিরী বাড়াবাড়ি, কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখুন, যুধিষ্ঠির কিন্তু একবারও এ বাবদে দ্রৌপদীর দিকে আঙুল তুলছেন না। বরঞ্চ এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অসহায়তা স্বীকৃত ধরে নিয়েই জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণ নিয়ে যখন মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে প্রশ্ন তুলছেন, তখন পরপুরুষ-স্পৃষ্ট দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ তো দূরের কথা, এমনকী জয়দ্রথকে নিয়েও তিনি কথা বলছেন না। বলছেন—এই বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর কী ঝামেলা বলুন তো মুনিবর! কেমন অতর্কিতে আমাদের স্ত্রীকেই তুলে নিয়ে গেল জয়দ্রথ, এমন দুর্ভাগ্য কারও হয়! এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি রামায়ণের রামচন্দ্রের কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সব শোনার পর যুধিষ্ঠিরের প্রতিক্রিয়া ছিল—আপনি কি আমাদের পতিব্রতা সীমন্তিনী দ্রৌপদীর মতো আর একটা সতী-সাধ্বী রমণীর কথা শোনাতে পারেন—অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্...যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা?

মার্কণ্ডেয় এবার সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন দ্রৌপদীর সমতায়। আমরা বলতে চাই—রামায়ণের নীতি-নৈতিকতার সমস্ত স্থানগুলি এমন এক অনমনীয় তথা অনতিক্রম্য সত্যের দৃঢ়রজ্জুতে আবদ্ধ যে, কখনও তার আবরণ ভঙ্গ হয় না। ফলে দশরথের মতো স্নেহপ্রবণ রাজা নিজের স্ত্রৈণ প্রতিজ্ঞাকে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য উলটে দিতে পারেন না, সীতা পারেন না পুত্রপ্রতিম হনুমানের পিঠে চড়তে এবং ভগবৎপ্রমাণ রামচন্দ্র সাধারণ জনবাদ পর্যন্ত সযৌক্তিকভাবে প্রতিহত করতে পারেন না বিশ্বস্তা স্ত্রীকে সুরক্ষা দেবার জন্য। যুধিষ্ঠির মহাভারতে কিন্তু এটাই বলেছিলেন পিতামহ ভীষ্মকে। বলেছিলেন— আপনি বলছেন—ধর্মের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে সদাচার, সদাচার দিয়েই সাধুসন্তদের চেনা যায়, কিন্তু সমস্যাটা হল—এক-একজন এক-একটা আচার পালন করছেন, সেই আচারটা ধর্মসংগতভাবে পালনীয় হয়ে ওঠার পরেই সেটা সদাচার হয়ে ওঠে। ফলে সদাচারই ধর্ম, আবার ধর্ম হলেই সেটা সদাচার হবে—এই দুটির পরম্পরাপেক্ষা মহা সমস্যা তৈরি করে। যুধিষ্ঠির বলেছেন—আমরা তো দেখি—অনেক সাধারণ লোক যেটাকে ধর্ম বলে মানছে, সেটা আসলে শাস্ত্রীয় নিয়মে অধর্ম, আবার

অনেক বড় মানুষই ধর্ম বলে যেটা করে বেড়াচ্ছেন, সেটাও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে আসলে অধর্ম—ধর্মধ্বাধর্মরূপেণ কশ্চিদপ্রাকৃতশ্চরন্।

যুধিষ্ঠির এত বড় একটা সামাজিক সত্য এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যা একমাত্র মহাভারতই বলতে পারে। এমন তো বলাই হয়েছে যে, শূদ্রজনেরা বেদ-বেদান্ত শুনবে না, শুনলে কানে সিসা-লাক্ষা ঢেলে দেবে। কিন্তু সমাজের মধ্যে এমন অনেক হয়েছে যে, শূদ্রেরা ধর্মবুদ্ধিতে বেদ-বেদান্ত শুনেছেন এবং শুনে, এমনকী না শুনেও মুনি-ঋষি হয়ে গেছেন. এমন উদাহরণ খোদ বেদেই আছে এবং সে উদাহরণ এমনই এক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা যা শুধু সহৃদয় মানুষেরই চক্ষুরুন্মীলন ঘটায়, সংরক্ষণশীল শাস্ত্রপাঠী বিদ্বান ব্যক্তির কাছে তার কোনও মূল্য নেই।

বেদের সমান গোত্রীয় কৌষতকি ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক কাহিনিতে বলা হয়েছে যে, পুরাকালে সরস্বতীর তীরে ঋষিরা বারো দিনের একটা যজ্ঞ করছিলেন। ঋষিদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত সব নাম আছে—গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ—এঁরা সব। তাঁরা হঠাৎই দেখলেন ঐলূষ বলে একজনের ছেলে, বেশ্যার গর্ভে জন্ম, দিনরাত পাশা খেলে জুয়োচুরি করে বেড়ায়, সেই ঐলূষ কবষ যজ্ঞস্থলে বসে আছেন। ঋষিরা তাঁকে জুয়াড়ি পাশাড়ে হিসেবে যতটা চেনেন, ঠিক ততটাই চেনেন শূদ্রা অথবা বেশ্যার ছেলে বলে। অতএব বৈদিক কর্মে নিচ জাতীয় মানুষের ছায়া দেখামাত্রই ঋষিরা বললেন—ওরে দাসীর পো! তুই ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্থলে এসে বসেছিস। বেরো এখান থেকে। যে অন্যায় তুই করেছিস, তার জন্য এই তোর শাস্তি হল—যেন পিপাসায় আকুল জলতৃষ্ণা তোকে শেষ করে দেয়, এই পবিত্রা সরস্বতী নদীর জল যেন তুই এক ফোঁটাও খেতে না পারিস।

আমরা যা বুঝি, তাতে ব্রাহ্মণেতর শূদ্রের যেহেতু বৈদিক কর্মে কোনও অধিকার নেই, তাই এগুলি কোনও শাস্তি বা অভিশাপ শোনানো নয়, এগুলি এক ধরনের 'সোস্যাল একস্‌কমুনিকেশন', যা আজ থেকে ষাট-সত্তর-আশি বছর আগেও হত। খেয়াল করে দেখুন, এই যে শাস্ত্র সংরক্ষণশীল দুরাগ্রহ, এরই ফলে রামায়ণের রামচন্দ্রকে দিয়ে কী অন্যায়টাই করানো হল! কী হয়েছিল—না, এক ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গিয়েছিল। কেন মারা গেল? না, দেবর্ষি নারদ এসে বললেন—এই দ্বাপর যুগে শূদ্র তপস্যা করলে সেটা মহা-অধর্ম, কেউ নিশ্চয়ই তোমার রাজ্যে তপস্যা করছে, সেটা শাস্ত্রবিহিত নয় বলেই ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেছে। নারদের এই শাস্ত্র কথা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের আচার-সমুদাচার নিশ্চয়ই এমন এক 'সোস্যাল কন্ডিশনিং' গড়ে তুলেছিল, যাতে রামচন্দ্র কোনও যুক্তিতর্ক চিন্তা না করে সোজা গিয়ে সেই তপস্যারত শূদ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোন জাতের মানুষ, কেনই বা এমন তপস্যা করছ? তপস্বী অধোমুখে সত্য কথা বলল—আমি জাতিতে শূদ্র, কিন্তু এই

মর্তশরীরেই আমি দেবভাবের প্রার্থনায় তপস্যা করছি—দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ। আমার নাম শম্বুক।

ব্যাস! রামচন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। খড়্গের এক কোপে শূদ্র তপস্বীর মাথা কেটে ফেললেন। ব্রাহ্মণের ছেলেও বেঁচে উঠল। আমরা শুধু বলব—রামায়ণের এই ঘটনায় আমাদের জন্মান্তরবাদ, নিয়তি, কর্মবাদ সব শাস্ত্রীয় তর্ক কিন্তু উলটে যায়। শূদ্র তপস্যা করছে বলে ব্রাহ্মণের ছেলে মারা যাচ্ছে—এই বিপরীত ঘটনা কোনও দার্শনিক যুক্তিতে ধোপে টিকবে না। যদি বলেন, রামায়ণের এই উত্তরকাণ্ডের ঘটনা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত এক ব্রাহ্মণ্য অধিক্ষেপ, তাহলে বলব—প্রক্ষেপের কোনও ঘটনাই এটা নয়, রামায়ণের শাস্ত্রীয় শব্দব্রহ্ম প্রায় সময়েই এইরকম পাঠ্য শাস্ত্রীয় যুক্তির কৌপী ভাবনায় উল্লিখিত। না হলে, অগ্নিপরীক্ষার আগে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অধিক্ষেপগুলিও তর্কযুক্তিহীন পরিপাঠ মনে হয়, বালিবধের পর রামচন্দ্রের যুক্তিগুলিও একই রকমের অযৌক্তিকতার কুযুক্তি বলে মনে হয়।

এমন একটা বিশ্লেষণের পরেও বলি—রামচন্দ্রকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্যের জায়গায় সামাজিক শাস্ত্রীয়তা এমনভাবেই তাঁকে আবিষ্ট করে যা অতিপ্রাচীন বৈদিক পরম্পরার চলমানতাকেও ব্যাহত করে। সেই যে অত বড় সব ব্রাহ্মণ ঋষিরা—গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, বশিষ্ঠ—যাঁরা শূদ্র-যজন সহ্য করতে না পেরে ঐলূষ কবষের স্নান-পান বন্ধ করে দিলেন, এমনকী পয়স্বিনী সরস্বতীর জল পর্যন্ত ছুঁতে দিলেন না, তাঁরা কিন্তু শাস্ত্রীয় যুক্তিতেই কঠোরতম শাস্তি দিয়েছিলেন শূদ্র কিংবা বেশ্যারা ছেলেকে। সরস্বতী নদী থেকে কত দূরে এক জলহীন জায়গায় কবষকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সমাজের অভিভাবকেরা। কিন্তু তারপর এই কবষই যখন আপন তপস্যায় 'প্র দেবতা ব্রহ্মণে গাতুরেতু' এই ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তখন প্রাগুক্ত ঋষিরা দেখলেন স্বয়ং সরস্বতী নদী কবষের অনুগমন করছে। বৈদিক ব্রাহ্মণের মানসিক চলমানতা এটাই যে, সেই মুহূর্তেই তাঁরা সানুনয়ে কবষের পিছন পিছন গেলেন এবং তাঁর কাছে আভূমি প্রণত হয়ে বললেন—ঋষি! আপনাকে প্রণাম। তুমি আমাদের ওপর রাগ কোরো না, আমাদের হিংসা কোরো না—ঋষে নমস্তে অস্তু, মা নো হিংসীঃ ত্বং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো'সি—তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি বেদমন্ত্র দর্শন করেছো।

এতে বুঝতে হবে যে, রামচন্দ্রের অনেক আগের কালের মানুষেরাও একটা 'আরগুমেনটেটিভ লজিকে'র মাধ্যমে বুঝতে পারছেন যে, শূদ্র কিংবা বেশ্যার ছেলেও তপস্যা করতে পারে, মন্ত্রদর্শন করতে পারে এবং আরও বুঝতে পারে যে, দোষটা তাঁদেরই হয়েছে, বরঞ্চ শূদ্র তপস্বীই নির্দোষ—ত উ হেমে নিরাগা ইব মেনিরে। যে রামায়ণ সব সময় বেদবিধি অনুসারে চলছে বলে দাবি করে, সেইখানে রামচন্দ্র কিন্তু শূদ্র শম্বুকের দেবত্বলাভের প্রচেষ্টা শুনেও হৃদয়ে কোনও তর্কযুক্তির অবসর রাখেননি,

তাঁর গলা কেটে দিয়েছেন আগে, কথা বলেছেন তারপর। এইখানে মহাভারত কিন্তু অনেক বেশি যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। যে শ্লোকে যুধিষ্ঠির বলেছেন—শূদ্রাদি কত সাধারণ প্রকৃত মানুষকে আমি ধর্মের নামে অধর্ম করতে দেখেছি। এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখছেন—বেদ-বেদান্ত শ্রবণ করলে কঠিন শাস্তি হতে পারে জানা সত্ত্বেও অনেক মোক্ষকামী শূদ্র আছেন যাঁরা ধর্মবুদ্ধিতে বেদান্ত-উপনিষৎ শ্রবণ করেন অর্থাৎ কিনা শাস্ত্রীয় দিক থেকে তাঁরা অধর্মই করেন। আবার অগস্ত্য ঋষি থেকে আরম্ভ করে তেমন বড় বড় মুনি-ঋষিও আছে যাঁরা ধর্মের নামে অন্যায় অভিশাপ দিয়ে অনেক হিংসার কাজ করেন অর্থাৎ ধর্মের নামে অধর্ম করেন। এই অবস্থায় মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য হল—তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? সদাচার-সদাচার বলে এত যে চেঁচামেচি বস্তুত সদাচারের কোনও নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই—সদাচারো হি অলক্ষণঃ।

যুধিষ্ঠির সমাজের মধ্যে উচ্চকোটি মানুষদেরও নানা বেনিয়ম দেখে একটু ক্ষিপ্ত হয়েই ভীষ্মকে বললেন—এটা তো ঠিকই সাধু-সজ্জনেরা যে সদাচার পালন করছেন, সেটাই ধর্ম বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু এটাও ভুলে যাবেন না যে, মূর্খ লোকেরা অনেকেই এইরকম সাধু-সজ্জনদের পাগল বলে উপহাস করে। তাছাড়া সদাচারের কী কোনও ঠিক আছে— এই যে অবতার-প্রমাণ পরশুরাম, আমাদের দ্রোণাচার্য— এঁরা তো সব বামুন-ঘরের মানুষ, ব্রাহ্মণের যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এঁদের কাজ ছিল, কিন্তু এই মহাজনেরা কী করলেন, তাঁরা পলিটিকস্-এ চলে এলেন। তাহলে সদাচার বলে এমন নির্দিষ্ট একটা কিছু হতে পারে না, যেটাকে বলব—এটা সবারই উপকার করছে—ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সম্প্রবর্ততে। যে ধর্মের গুণে একজন মহা-উন্নতিলাভ করছে, সেই ধর্মের গুণেই অন্যজন মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, কাজেই ধর্ম, আচার সব কিছুই এত বহুল এবং অনেক, যে একটা জায়গায় সেগুলি ভীষণ তর্কযোগ্য হয়ে ওঠে এবং তাতে কিছুতেই এটা বলতে পারি না—এই ধর্ম সকল মানুষের উপকার সাধন করবে—আচারাণাম্ অনৈকাগ্র্যং সর্বেষামুপলক্ষয়েৎ।

তিন

মহাভারতে ধর্ম এবং নৈতিকতার যত দ্বন্দ্ব আছে, তার 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' কিন্তু এই যৌধিষ্ঠিরী যুক্তি এবং মহাভারতেই এই দ্বন্দ্বের প্রকট প্রকাশ তৈরি হয় এইজন্য মহাভারতের বিশালবুদ্ধি কবি ভারতবর্ষের এই বিরাট বিচিত্র সমাজটাকে হৃদয় দিয়ে বুঝেছিলেন। বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠী, বিচিত্র দেশ এবং ততোধিক বিচিত্র মানুষের আচার-ধর্ম কিভাবে গড়ে ওঠে সে কথা বলতে গিয়ে অসাধারণ একটা মন্তব্য করেছে মহাভারত। মহাভারত বলেছে—নদীর স্রোতে একটা কাঠ নিজের ছন্দে ভাসতে-ভাসতে চলে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে—ওই ভাসমান একক কাঠের সঙ্গে অন্য জায়গা থেকে ভেসে-আসা আরও একটা, দুটো, তিনটে কাঠ একত্র মিলিত হয়েছে—তত্রাপরাণি

দারুণি সংসৃজ্যন্তে পরস্পরম্। তারপর আরও কিছু সময় গেলে দেখা যাবে বহুল পরিমাণ তৃণগাছি, আরও কত ছোট ছোট কাঠের টুকরো, গাছের শুকনো ডাল-ভাঙা, শুকনো গোবরের থানা, এতসব কিছু এক জায়গায় হয়ে একটা বড়সড় সংগ্রহ তৈরি করেছে—তৃণকাষ্ঠকরীষাণি কদাচিন্ন সমীক্ষয়া। মহাভারত বলেছে—এই যে নদীর ভাসমানতার মধ্যে কতকগুলি সমগোত্রীয় এবং কতগুলি বিপরীত বস্তুসমূহের একত্র সমাবেশ ঘটে, এই সংযোগ-সমাবেশ কেউ পর্যালোচনা করে দেয় না। ভাসমানতার যাদৃচ্ছিকী শক্তিতেই এই বস্তুগুলি একত্র সমাবিষ্ট হয়—যদৃদ্ধয়ৈব কাষ্ঠেন সঙ্গিং গচ্ছতে কেনচিৎ। ঠিক একই রকম এই মনুষ্য-সমাজ এবং সমাজের আচার—এটা কেউ তৈরি করে দেয়নি, সমাজের আপন প্রবহমানতায় সদাচার তৈরি হয়।

যাঁরা কোনও দিন আনমনে নদীর তীরে বসে এই ভাসমান স্রোত-সংগৃহীত স্তূপ দেখেছেন, তাঁরাই মহাভারতের এই উক্তির যথার্থতা বুঝবেন। বস্তুত মহাভারতের নীতি-নৈতিকতার উদার সমাবেশ এই 'প্রেমিস' থেকে শুরু হয়। এখানে জাতি, বর্ণ, দেশ—ইত্যাদি এত কিছুর নিগড়ের মধ্যে সমাজের চলমানতার চিন্তা আছে বলেই শাস্ত্রীয় নীতি-নিয়মের অতিক্রান্তি আসে যেন। তবে এই অতিক্রম সব সময়েই এক 'বৃহৎ-মহৎ' কে উদ্দেশ করে চালিত হয় বলেই মহাভারতে সেটা 'বৃহৎ-মহৎ' সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। হয়তো এই কারণেই ভীষ্ম-পিতামহের চতুর্বিধ ধর্মলক্ষণের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচার ছাড়াও চতুর্থ ধর্মলক্ষণ হল—প্রয়োজন—চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্মলক্ষণম্। এই প্রয়োজন চলমান সমাজের বাস্তব থেকে তৈরি হয়েছে বলেই সেটা প্রত্যক্ষত শাস্ত্র-নিয়ম অতিক্রম করলেও পরোক্ষে সেটা ভীষণ রকমের মানবিক হয়ে ওঠে এবং এক ধাক্কায় সেটা সমাজকে সচল করে দেয়।

আপনাদের মনে আছে—রামায়ণে বনবাসী রামচন্দ্রকে দেখে রাবণের বোন শূর্পনখা মোহিত হয়েছিলেন এবং মেনেই নিলেন—সে-মোহ অনেকটাই শারীরিক তাড়নায় তৈরি হয়েছিল—শরীরজ-সমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ। রাক্ষসী রমণী হলেই সেকালের সমাজ-ভাবনায় তাদের বিকট মুখ, তামাটে চুল, পেট ঝুলে পড়ছে, গলা ঘ্যাস্‌ঘেসে—এসব বর্ণনা করা হয় এবং তা যেমন শূর্পনখা সম্বন্ধে রামায়ণে করা হয়েছে, তেমনই হিড়িম্বার সম্বন্ধে মহাভারতে করা হয়েছে। শূর্পনখা রামচন্দ্রকে দেখে এবং হিড়িম্বা মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে দেখে যখনই মোহিত হচ্ছেন, তখনই শারীরিক কামনায় পীড়িত বলে বর্ণিত হয়েছেন এবং অভীষ্ট পুরুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হওয়া-মাত্রেই মোহিনী রূপ ধারণ করছেন। আমাদের লৌকিক বুদ্ধিতে তাঁদের আমরা এমনিতেই যথেষ্ট সুন্দরী রমণী বলে মনে করি, যদিও মহাকাব্যের কবিরা আর্যেতরা রমণীদের আর্য-পুরুষের প্রতি কামাবসায়িতার মুহূর্তেই তাঁদের 'কামরূপিণী' করে তোলেন, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই তাঁরা সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে ফেলেন।

কিন্তু এসব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শূর্পনখা যখন সুন্দরী হয়ে রামচন্দ্রের

প্রেমভিক্ষা করলেন, তখন তিনি সবিস্তারে নিজের রাক্ষস-কৌলীন্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—আমি তোমাকে দেখেই মনে-মনে স্বামী বলে মেনে নিয়েছি তোমায়, তুমি আমার স্বামী হও, এই সীতাকে নিয়ে কী করবে তুমি—চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি? হ্যাঁ, রামচন্দ্রের একটা সমস্যা ছিল, তিনি পূর্বেই বিবাহিত ছিলেন। সে-কথা অবশ্য তিনি জানিয়েও ছিলেন শূর্পনখাকে। কিন্তু তারপরেই তাঁকে লক্ষ্মণের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন সপরিহাসে। পরিহাসে ছোট ভাইই বা কী কম যান! অতএব পুনরায় তিনি তাঁকে গড়িয়ে দিয়েছেন রামচন্দ্রের দিকে। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে সাবধান করছেন রাক্ষসীর সঙ্গে পরিহাস না করতে এবং তাঁর ভাষাটা তখন 'সিম্পল জেনারালাইজেশন'-এর জায়গায় এসে পড়ে। তিনি বলছেন—লক্ষ্মণ! এই সব ক্রূর অনার্যদের সঙ্গে কখনও পরিহাস, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে যেয়ো না—ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন। ন কার্যঃ পশ্য বৈদেহীম্...।

তার মানে, রামায়ণে সেই অনার্যজনের সঙ্গে সংস্রবের প্রসঙ্গটাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠছে, তারা যেন কেউ ঠাট্টা-ইয়ার্কিও বোঝে না। তাহলে অনার্যা রাক্ষসী রমণীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক তো দূরের কথা, রামচন্দ্র শাস্ত্রীয় বিধিতে অনার্য-সংস্রবটাই পছন্দ করছেন না। অথচ অনুরূপক্ষেত্রে মহাভারতে হিড়িম্বা ভীমকে একই কথা বলেছিলেন— তোমাকে দেখামাত্রই আমি তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করেছি। আমার মন আকুল হয়েছে কামনায়, অতএব আমি তোমাকে যেভাবে চাইছি, আমাকেও তুমি সেইভাবে চাও—কামোপহতচিত্তাঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্। ভীম হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আপন বাসনালোকে স্থাপন করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সারারাত ধরে কথা কম বলেননি, কিংবা প্রশ্রয়ও কিছু কম দেননি। অবশেষে হিড়িম্ব-বধের পর হিড়িম্বা যখন পঞ্চপাণ্ডব এবং জননী কুন্তীর সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন ভীমকে যে আমরা খানিক উদাসীন দেখছি, সেটাই পরম্পরাবাহিত শাস্ত্রীয় কারণ, যেটা রামচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ভীম একবার হিড়িম্বাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিচ্ছেন এবং সেটা নিতান্তই নাটক বলে মনে হয়। এখানে স্বয়ং যুধিষ্ঠির ভীমের কথার প্রতিবাদ করেছেন এবং অবশেষে রাক্ষসী হিড়িম্বা যখন জননী কুন্তীর সামনে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে নিজের কামনার কথা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন, সেখানেই মহাভারত বিশাল ভারতবর্ষীয় সমাজের বৈকল্পিক নীতি তৈরি করে ফেলে।

হিড়িম্বা কুন্তীকে বলছেন—তুমি তো অন্তত বোঝো যে, কাউকে চাইলে পরে মেয়েদের শারীরিক দহন কেমন হয়—আর্যে জানাসি যদ্দুঃখম্ ইহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্। এরপর ইনিয়ে বিনিয়ে ধর্মের কথা এসেছে। হিড়িম্বা বলেছে—আমি ভীমকে পছন্দ করে সংকটে পড়েছি, এই বিপদ থেকে বাঁচানোটাই এখন ধর্ম। তোমার ছেলেকে আমি চেয়েছি, সেও আমাকে অনুরূপ ভাবে চাইবে—এটাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। আশ্চর্য কিন্তু, এই প্রার্থনা কুন্তীকে পূরণ করতে হয়নি। হিড়িম্বার মুখে তাঁর কামনার

ধর্ম-কথা স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শুনেছেন এবং বিধান দেবার সময় হিড়িম্বার ব্যাপারে তিনি কতটা 'সাপোর্টিভ', সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন এই কথা বলে যে, হিড়িম্বা! তুমি যা বলছো, তা এক্কেবারে ঠিক—এবমেব যথাত্থ ত্বং হিড়িম্বে নাত্র সংশয়ঃ। যুধিষ্ঠির রাক্ষসী হিড়িম্বাকে প্রিয়-মিলনের বিধান দিয়েছেন, তাও শাস্ত্রমতে তেমন বিধিসম্মত নয়। সারাদিন তিনি হিড়িম্বাকে ভীমের সঙ্গে থাকতে বলেছেন এবং রাত্তিরে বলেছেন ফিরিয়ে দিতে। কোনও মঙ্গল-শঙ্খ সেখানে বাজেনি, কোনও মন্ত্রোচ্চারণও শুনিনি পরম বৈদিকতায়। অথচ প্রত্যক্ষ বিধিবহির্ভূত নিয়মে রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের মিলনজাত যে পুত্র হল, সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে জননী কুন্তী আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—তুমিই হচ্ছ এই পাঁচ পাণ্ডব-ভাইয়ের প্রথম পুত্র, তুমি এই প্রসিদ্ধ কৌরবকুলের জাতক এবং আমার কাছে তুমি আমার ভীমেরই মতো—ত্বং কুরূণাংকুলে জাতঃ সাক্ষাৎ ভীমসমো হ্যসি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—রামায়ণের রামচন্দ্রের পক্ষে এমন রাক্ষসীকে বিবাহ করা তো দূরস্থান, তাঁর সঙ্গে কথা বলা, তাঁর যুক্তি শোনা, অবশেষে রাক্ষসীর ভালোবাসার যুক্তি মেনে নেওয়াটা অসম্ভব ছিল। অথচ হিড়িম্বা এবং শূর্পনখার কামাবসায়িতা ছিল একই রকম। এটা আমরা বুঝি যে, রামচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন, তিনি এক পত্নীব্রত ছিলেন, তাঁর পক্ষে শূর্পনখাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু শূর্পনখার কামনার বিপরীতে রামচন্দ্র যেভাবে তাঁর সঙ্গে পরিহাস-রসিকতায় অতি-কঠোর ব্যবহার করেছেন, উদ্‌গত কামনার নাক-কান কেটে দিয়ে যেভাবে লজ্জায় ফেলেছেন, সেটা মহাভারতের কবি ভারতবর্ষের বিচিত্র সমাজবোধে চরম প্রগতিশীলতায় পরিবেশন করেছেন। আর একটা কথা না বললেই নয়। হ্যাঁ, রামচন্দ্র নিজের বিবাহের কথা জানিয়েছিলেন শূর্পনখাকে, কিন্তু একই সঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করার জন্য রামচন্দ্রের পরামর্শটার মধ্যে তো একটা পরিহাস-মিশ্রিত মিথ্যাচার ছিল। রাম বলেছিলেন—তোমার মতো সুন্দরী রমণীর সতীন-কাঁটা থাকবে এটা মানায় না, তুমি বরং আমার ছোট ভাই লক্ষ্মণের কাছে যাও—সে দেখতেও খুব ভালো, আর বিয়ে-থাও করেনি, অকৃতদার— শ্রীমান্ অকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্।

এই 'অকৃতদার' শব্দটা নিয়ে রামায়ণের ধর্মনীতির পরম্পরাবাহী টীকাকারদের অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে। কেউ বলেছেন—কখনও পরদার গ্রহণ করেননি এই অর্থে 'অকৃতদার'; কেউ বলছেন—লক্ষ্মণ বনের মধ্যে বউকে নিয়ে আসেননি বলে 'অকৃতদার'। তাঁরা বলছেন—এইসব অর্থই মানতে হবে, কেননা নিজের মুখে রামচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—আমি কোনও দিন মিথ্যা কথা বলিনি, কোনওদিন বলবোও না—অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন। এমনকী পরিহাসের কথাতেও অর্থহীন মিথ্যার আশ্রয় নেন না, এইরকমই প্রাবাদিক তাঁর চরিত্র—ন বিতথা পরিহাস-কথাস্বপি। অতএব রামচন্দ্রকে যদি এই মহিম চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করতেই হয় তবে টীকাকারদের

ঘাম ঝরাতেই হবে লক্ষ্মণের অকৃতদারতা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যদি কথাটা মিথ্যাভাষণ বা পরিহাসই হয়, তবে রামচন্দ্রের দোষ বরং কমে যায় অনেক। যে কারণে রামায়ণের বিখ্যাত তিলকটীকায় 'অকৃতদার' শব্দের একটা অদ্ভুত অর্থ-নির্দেশ করার পরেও টীকাকার বলেছেন—পরিহাস-কথায় মিথ্যা-ভাষণে কোনও দোষ নেই বলেই রামচন্দ্রের এখানে কোনও দোষ নেই বলেই আমরা মনে করি—পরিহাসাদৌ মিথ্যাভাষণে ন দোষ ইত্যনেন সূচ্যতে ইতি বয়ম্।

সকৌতূহলে আপনাদের জানাই—পরম্পরাবাহী পণ্ডিত টীকাকারেরা রামচন্দ্রকে মিথ্যাচারের নৈতিক কলুষ থেকে বাঁচানোর জন্য যে যুক্তি দিচ্ছেন, সেই যুক্তিটাই আসলে মহাভারতের যুক্তি। কিন্তু মহাভারতে সেই যুক্তি অন্য এক উদার পরিমণ্ডলে সামাজিক চলমানতা তৈরি করে, শূর্পনখার ক্ষেত্রে সে যুক্তি একেবারেই তা করে না। কেননা, রাম-লক্ষ্মণের পরিহাসপ্রিয়তা এক্ষেত্রে শূর্পনখার বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আর মহাভারতে পরিহাসের মিথ্যাচার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ, বড়জোর তা স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক- প্রেমিকার ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু কোনও ভাবেই তা শূর্পনখা এবং রামচন্দ্রের কথা-ক্ষেত্র হতে পারে না, কেননা তাঁরা বন্ধু নন, স্বামী-স্ত্রীও নন, প্রেমিক-প্রেমিকাও নন।

প্রসঙ্গত এটা বলেই ফেলা দরকার যে, মহাভারতে এই মিথ্যাচারের কথা দুই জায়গায় নীতিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুই জায়গায় প্রায় একই শ্লোক পুনরাবৃত্ত হওয়ায় এই শ্লোকটি প্রায় বিধিবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। শ্লোকটি প্রথমবার উচ্চারিত হয়েছে দানবী কন্যা শর্মিষ্ঠার মুখে এবং এখানে প্রসঙ্গটা না উল্লেখ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে, কতটা উদার দৃষ্টিতে মহাভারত আমাদের প্রথাগত এবং শাস্ত্রীয় নীতিনৈতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে নতুন এক মানবিক ভূখণ্ড তৈরি করে। আপনারা সকলেই শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর কথা শুনেছেন। দেবযানী মাতৃহীনা ছিলেন বলেই পিতার প্রশ্রয় তিনি বেশি পেয়েছেন, অন্যদিকে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার রাজধানীতে তাঁর পিতা যেহেতু গুরুর মর্যাদা ভোগ করেন, তাতে তাঁর মেয়ে হিসেবে দেবযানীর চরিত্রেও একটা সার্বিক আধিপত্য-বোধ কাজ করে। প্রথম যৌবনে শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখতে আসা বৃহস্পতিপুত্র কচ তাঁর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হয়তো বা এই কারণেই পরবর্তীকালে বৈবাহিক সফলতার জন্য তাঁর একটা অতিরিক্ত ঝোঁক এবং প্রবণতা তৈরি হয়।

মহারাজ যযাতির সঙ্গে দেবযানীর প্রথম দেখা হয় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে। খুব সামান্য কারণে—যে কারণ বার্ষপর্বণী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর এতকাল সখিবুদ্ধির বিবেচনাতেই দেবযানী এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু পিতার গুরুগৌরবের অতিরিক্ত সচেতনতায় দেবযানী রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিবাদ করেন এবং তার পরিণতি এত দূর যায় যে, শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে একটি মজা কুয়োর মধ্যে ফেলে দেন। ঠিক এই

বিপন্নতার মধ্যে মৃগয়াশীল রাজা যযাতির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং যযাতি তাঁর হাত ধরে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন। তারপর দিন কেটে গেছে অনেক। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার ঝগড়া রাজসভা পর্যন্ত গড়িয়েছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বৃষপর্বার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছেন, অবশেষে রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা তাঁর সমস্ত পরিচারিকাদের নিয়ে দেবযানীর দাসী হলেন। এইভাবেই চলছিল, ইতিমধ্যে আবার মৃগয়া করতে এসে শ্রান্ত যযাতি জল খুঁজতে বেরিয়েছেন এবং দেখা হয়েছে দেবযানীর সঙ্গে—শর্মিষ্ঠা তখনও দেবযানীর পদসেবা করছেন। রাজা দুইজনেরই পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন দেবযানীর কাছে এবং সেটা অনেকটাই ভদ্রতাবশত। কিন্তু বাস্তবে শর্মিষ্ঠাকে রাজা যযাতির বেশি পছন্দ হয়েছে এবং সেটা তিনি মুখে বলেও ফেলেছেন দেবযানীকে। রাজা বলেছেন—এমন একজন অসামান্যা সুন্দরী রমণী তোমার দাসী হল কী করে, এ আমি ভেবে পাচ্ছি না। বস্তুত তোমার সৌন্দর্য কিন্তু কোনওভাবেই এই রূপের সঙ্গে তুলনীয় নয়—অস্যা রূপেণ তে রূপং ন কিঞ্চিৎ সদৃশং ভবেৎ—কিন্তু কী কপাল, এই রমণী তোমার দাসী হয়েছে।

দেবযানী এই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাইলেন না। বললেন—থাক এসব উলটোপালটা কথা—মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ। দেবযানী এবার যযাতির পরিচয় জানতে চাইলেন এবং সর্বাংশে পরিচয় জানার সঙ্গে-সঙ্গেই দেবযানী বললেন—আমি আমার এই হাজার দাসী আর শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে আজ থেকেই তোমার অধীন হলাম, রাজা! তুমি আমার স্বামী হও। আমার সখা হও। সেই মুহূর্তেই জাতের প্রশ্ন উঠে গেল। একে তো রাজা দেবযানীর আচার-ব্যবহারে খুব খুশি হতে পারছিলেন না, তারমধ্যে আবার এই বিয়ের চাপ। রাজা বললেন—দ্যাখো, আমি ক্ষত্রিয় রাজা, আর তুমি ব্রাহ্মণ-গুরুর মেয়ে; বর্ণশ্রেষ্ঠা এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে আমার এই বিয়ে সম্ভব নয়। মহাভারতের কবি কিন্তু শাস্ত্রীয় সংবিধানের ঊর্ধ্বে গিয়ে দেবযানীর মুখে তর্ক জুগিয়েছেন জাতি-বর্ণের বিহিত স্থিতি অতিক্রম করে বিবাহ-সংঘটনার জন্য। গুরু শুক্রাচার্য দেবযানীর প্রণয়-অনুনয় ফেলতে পারেননি এবং বৈবাহিক ক্ষেত্রে রাজার জাতি-বর্ণ সংক্রান্ত সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন—রাজা! তুমি এই অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে বেশি কিন্তু-কিন্তু কোরো না, তোমার যদি এতে কোনও পাপ হয়, সে আমি দূর করে দেবো—অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসীরহং পাপং নুদামি তে।

আমি খুব অবাক হয়ে যাই—সিদ্ধান্তবাগীশের মতো মহাপণ্ডিত এখানে কত কূট যুক্তি খাড়া করে চেষ্টা করেছেন যাতে দেবযানীর মধ্যে ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যতা তৈরি করা যায়। শেষে এমন সিদ্ধান্তও দিয়েছেন যে, যযাতি-দেবযানীর বিয়েটাকে যাঁরা প্রতিলোম-বিবাহের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে নিজেদের ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন জোগানোর চেষ্টা করবেন, তাঁরা জানবেন এখানে—অসবর্ণতা ঘটেনি। বাগীশের স্মার্ত যুক্তি সংরক্ষক সমাজের বাগীশতা তৈরি করুক, আমি শুধু বলতে চাই—এঁরা তবু

মহাভারতের মহদাশয় যুক্তিগুলি আক্ষরিক অর্থে কেন গ্রহণ করেন না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েদের ভাব-ভালোবাসা তো কখনও কখনও এমন পর্যায়েও যায় যে, শেষ পর্যন্ত পিতা-মাতারা তাঁদের স্নেহ-তর্ক এড়াতে পারেন না। আত্মীয়-স্বজন এবং তথাকথিত সমাজবাহক মাননীয়দের মুখে ছাই দিয়ে কখনও কখনও স্নেহশীল উদার পিতামাতারা তো বলেই ওঠেন—হোক এমন অসবর্ণ বিয়ে, যা দোষ হবে আমি বুঝে নেব সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবকতায়। শুক্রাচার্যও মাতৃহীনা দেবযানীর প্রতি আকুল মমতায় ঠিক এই কথাই বলেছেন—তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে আমি রক্ষা করব, এ আমার আশীর্বাদ—অধর্মাৎ ত্বাং বিমুঞ্চামি শৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্।

সত্যি বলতে কী, পাপ করে ফেলার মত কোনো শাস্ত্রীয় বিধান তো থাকতে পারে না এবং সেই পাপ একজন করে ফেললে, অন্য মহান তেজস্বী ব্যক্তি তাঁকে সেই পাপ থেকে উদ্ধার করে দেবেন, এমনটাও হয় না। কিন্তু তেজস্বী মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে অন্যজনকে পাপ না হোক, পাপ-বোধ থেকে মুক্ত করতে পারেন। শুক্রাচার্য অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এবং অসম্ভব উদার তো বটেই, তা না হলে অমন তপস্বী ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি দৈত্য-দানব-অসুরদের গুরু হতেন না। হয়তো বা এতটা উদার বলেই মেয়েকে তিনি বলতে পেরেছিলেন—দ্যাখো মা! প্রথাগত কারণে ধর্ম এক জিনিস আর ভালোবাসা আর এক জিনিস। তুমি যে যযাতিকে বিয়ে করতে চেয়েছ, সেখানে তো তুমি আমার মত নিয়ে সেটা করনি—অন্য ধর্মঃ প্রিয়স্ত্বন্যো বৃতস্তে নাহুষঃ পতিঃ। যযাতিকে তিনি বলেছেন—আমার এত আদরের মেয়ে তোমাকে স্বামী হিসেবে চেয়েছে—বৃতো'নয়া পতি বীর সূতয়া ত্বং মমেষ্টয়া—তুমি একে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করো।

আমরা কিন্তু এখনও আমাদের মূল বক্তব্যে আসিনি। আমরা মাঝপথে শুধু এমন একটা জায়গায় মহাভারতীয় স্পর্শ দিয়ে গেলাম, যেখানে সমাজনীতির স্বীকৃত চলমানতা নতুন সম্পর্ক সেতু তৈরি করে এবং তা করে মহান তেজস্বীর নমনীয় দৃষ্টি কিরণসম্পাতে। আমার কাছে এক নব্য পুরুতমশাই এসে বলেছিলেন—এক বামুন ছেলে মেম সাহেবকে ভালোবেসে ফেলেছে, এ বিয়ে তো আমার দেওয়াই উচিত নয়। সেই বামুন ছেলের বাবা পরম হতাশায় আমাকে বললেন—আমি কী করব বলুন তো? ছেলে ভালোবেসে বিয়ে করছে, আমি তাতে কী করে বাধা দিই? আমরা মানে আমি আর আমার স্ত্রী একটু ধুমধাম করে আত্মীয়স্বজন ডেকে হোমযজ্ঞ করে বিয়ে দিতে চাই। তবে কী জানেন তো, মেমসাহেব হলেও মেয়েটা বেশ ভালো। সে প্রতিদিন এসে আমাদের প্রণাম করছে, আমার স্ত্রীকে তো মাঝে মাঝে এমন জড়িয়ে ধরছে যে, সেও পান খাওয়া মুখে তার গালে পানের ছিবড়ে এঁকে চুমু খাচ্ছে, এখন আমি কী করি?

আমি পুরুতমশাইকে বললুম—আপনি বিয়ে দেবেন না কেন? আমাদের ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়রা যখন রাক্ষসী দানবীদের বিয়ে করেছেন, তখন কি তাঁদের কেউ বিয়ে দেয়নি! সেখানে মেমসাহেব তো অনেক ভালো কথা। এবারে একটু শাস্ত্রবাক্য শুনিয়ে বললুম—মহভারত কিন্তু শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়েই নিতান্ত 'হিউম্যান' একটা 'স্পেস' তৈরি করেছে। সেই যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন বলেছিলেন—শুধু শাস্ত্রবাক্য মাথায় রেখেই ধর্ম জানা যায় না—তখন তিনি একটা সাংঘাতিক মন্তব্য করে ভীষ্ম পিতামহকে বলেছিলেন—আপনি তো ঘোষণা করেছিলেন—ধর্ম বিষয়ে বেদই হল সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তো এবার বলি—বেদ যত সব ধর্ম নিয়মের কথা বলেছে, তা তো প্রতি যুগেই একটু একটু করে কমছে—বেদবাদাশ্চানুযুগং হ্রসন্তীতীহ নঃ শ্রুতম্। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, 'বেদ' আর 'বেদবাদ' কিন্তু এক জিনিস নয়। এই পার্থক্য করতে গেলে 'বেদ' বলতে চারটি বেদের মন্ত্রবর্ণ, তার আবৃত্তি, অর্থবোধ—এইগুলি বুঝতে হবে এবং সেটা নিয়েও কত দুঃখ দেখেছি দার্শনিক এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের মনে। আমরা যেমন আমাদের সময়ের পঠন-পাঠন স্মরণ করে বলি—আহা তখন কী ছিল, এখন কী হয়েছে, ঠিক তেমনই দার্শনিক ধার্মিকরা হাহাকার করে বলেছেন—আহা তখন সেই কালে কেমন সহস্রশাখায় চতুর্বেদ পড়া হত, তারপর বেদ ভাগ হল, তারপর ষড়ঙ্গ বেদের একটা পড়া হত, এখন তো দেখছি একটা শাখা পড়েই বেদজ্ঞ হচ্ছে। দার্শনিকের এই আক্ষেপ কিন্তু আজকের নয়, অষ্টম/নবম শতাব্দীর দার্শনিকরা এই সব আক্ষেপ করছেন। এ তো গেল বেদের পাঠাধ্যয়নের কথা। 'বেদবাদ' বলতে কিন্তু বোঝায় বেদের অনুশাসনগুলি, বেদবিধির কথা। যেমন বেদ বলেছিল—ব্রাহ্মণরা যেন অতিথি ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য সৎকার করেন। দার্শনিক বলছেন—সে এক কাল ছিল যখন একজন ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টায়, অনেক চেয়েচিন্তে একজন সৎ ব্রাহ্মণকে অতিথি হিসাবে পেতেন, তারপর যখন বামুন ঠাকুর আর অতিথি হিসাবে কপালে জুটত না, তখন ক্ষত্রিয় পেলেও অতিথিসেবা চলত, তারপর বৈশ্যদের ক্রিয়াকর্ম করে এমন বামুন দিয়েও কাজ চলছিল, আর এখন তো দেখছি—শুদ্দুরের বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম করে তাদের বাড়ির খাবারদাবার খেয়ে আসছে যে সব বামুন তাঁদেরই অতিথি বলে মেনে নিতে হচ্ছে—ততো বৈশ্যাবেশিনে'পি, সম্প্রতি শূদ্রান্নভোজিনো'পি।

আমার কৌতুক লাগে, অষ্টম/নবম শতাব্দীতে দার্শনিক ধুরন্ধর যেভাবে যুগক্ষয়ের আক্ষেপ করছেন—হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্—সেই আক্ষেপ তো আমরা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের মুখেও শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন—বেদবাদ যুগে যুগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—বেদবাদাশ্চানুযুগং হ্রসন্তীতীহ নঃ শ্রুতম্। তার মানে, এই যুগক্ষয়ের রহস্যটা আমাদের বুঝতে হবে। দিন যত যায়, মানুষ তত বাড়ে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ প্রবেশ করে প্রাক্তন পরম্পরাবাহিত ধর্মধারার মধ্যে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ বিহিত ধর্মের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটায় বলেই ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়িতে শূদ্রান্ন ভোজন করেন। এর দুটো দিক আছে—শূদ্রেরা

যদি ধর্মপরায়ণ না হয়ে উঠতেন তাহলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে যেমন শূদ্রের বাড়িতে যজন-যাজনের প্রশ্নও উঠত না, তেমনই তাঁদের তরফে শূদ্রান্ন-ভোজনের প্রশ্নও উঠত না। তার মানে এক পক্ষের উন্নতি অন্য পক্ষকে আপন কর্মের মধ্যে সমাবিষ্ট করছে। যুধিষ্ঠির তাই এই পরিণতিটাকে ধর্মনাশ বলতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন—সেই সত্যযুগের ধর্ম একরকম, ত্রেতা যুগে সেটা আর এক রকম, আবার দ্বাপর যুগে সেটা আরও একরকম—অন্যে কৃত যুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। আর এই কলিযুগে মানুষের পক্ষে প্রাক্তন নিয়ম-আচার চালিয়ে যাওয়াটা এতটাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, মুনি ঋষিরা মানুষকে যথাসাধ্য ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন—অন্যে কলিযুগে ধর্মা যথাশক্তি কৃতা ইব।

আমি সেই পুরোহিতমশাইকে বলেছিলাম—ভাগ্যিস! যুধিষ্ঠির আমাদের দ্বাপর কলির সন্ধিলগ্নে জন্মেছিলেন, যার জন্যে কলিযুগের কষ্টটা খানিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সংরক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্রকারেরাও এসব বুঝতেন, তা না হলে পরাশরের মতো প্রগতিশীল ধর্মশাস্ত্রকারেরা একথা বলতেন না যে দ্যাখো! সত্যযুগে মনুর মতের প্রাধান্য দিতে হবে, ত্রেতাযুগে মহর্ষি গৌতমের মত, দ্বাপরযুগে মানতে হবে শঙ্খলিখিতের মত, আর কলিযুগে পরাশর। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই পরাশরের অভিমত উদ্ধার করেই বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাবিবাহের মান্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অতএব এই পরাশরের কথাটা যদি ভালোভাবে বুঝি, তাহলে একটা কথা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন স্মৃতি আচারের মান্যতা কমেছে, নতুন নীতি ধর্ম তৈরি হয়েছে এবং নতুন যুগের নতুন ধর্মশাস্ত্রকার নিজেই তাঁর পূর্বসূরিদের সশ্রদ্ধে সরিয়ে রাখছেন। তার মানে এই নয় যে, কলির পরাশর আমাদের সব পুরাতন সংস্কার বাতিল করে দিচ্ছেন, কিন্তু পরাশরের এই মহাযুক্তি—সত্যযুগে মনুর মত, ত্রেতায় গৌতমের—এই যুক্তি থেকে প্রমাণ হয়—ধর্মশাস্ত্রকারেরা কেউই সমাজের ঊর্ধ্বে নন—সমাজের মধ্যে যত সাংস্কারিক প্রবণতা তৈরি হয়, নতুন যে ব্যাপ্ত ধর্মবোধ তৈরি হয়, তাকে যতই প্রাক্তন মূল্যবোধে আটকানোর চেষ্টা হোক, এক সময় ধর্মশাস্ত্রকারদের তার জন্য নতুন নীতি তৈরি করতে হয়।

এতদূর পর্যন্ত জ্ঞান দিয়ে সেই পুরোহিতমশাইকে বললুম—দেখুন, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের এই বঙ্গদেশে মুসলমানেরা এসেছেন, সাহেবরা এসেছেন, সমাজের অন্যতর উদার দৃষ্টি তৈরি হয়েছে, অথচ সেইরকম সর্বজনমান্য আচার্য আর আসেননি যিনি ধর্মবিধান দিয়ে বলবেন—দ্যাখো, এখন 'ইনটারকাস্ট, ইনটার রেসিয়াল' এমনকী বৈদেশিক বিবাহও মেনে নিতে হবে এবং বিয়েও দিতে হবে, তা নইলে তোমাদের থোরি তোয়াক্কা করে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই বিয়ে করে নেবে। তার থেকে এই তো ভালো, বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীকে বৈদিক মধুমন্ত্র শোনাও

এবং তাঁরা একশো শরৎ নির্বিঘ্নে পৃথিবী দেখুক। আমার পুরোহিতমশাই কথা শুনেছিলেন এবং আমি বলব, মহাভারতের শুক্রাচার্য যে কালে কালধর্ম বুঝে পরম মমতায় বলেছিলেন—মহারাজ! আপনি গ্রহণ করুন আমার মেয়েকে, পাপ যা হবে আমি বুঝে নেব—অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসীরহং পাপং নুদামি তে।

শুক্রাচার্য মহাবুদ্ধিমান মানুষ, মেয়ের যখন এত ইচ্ছে রাজাকে বিয়ে করার, তিনি অসবর্ণে বিয়ে দিয়েছেন, কিছুই কেয়ার করেননি, কিন্তু এই মুহূর্তে মহারাজ যযাতি মহর্ষির চাপে পড়ে সব কিছু মেনে নিলেও বিয়ের আগে তিনি দুটি বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেটা দেবযানী এড়িয়ে গেলে শুক্রাচার্য অনুধাবন করেছিলেন ঠিক। যযাতি দেবযানীকে বলেছিলেন—ঠিক আছে মানছি তোমার কথা; মানছি যে, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার বৈবাহিক সংক্রমণ অনেক ঘটেছে, কিন্তু কী জানো—বামুন ঘরের নিয়ম, আচার, সংস্কার এবং শুচিতার বোধ, তার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের আচার, ব্যবহার এবং শুচিবোধের তফাত আছে, এবং তুলনায় ক্ষত্রিয়ের নিয়মাচার কিছু শিথিলও বটে—পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষাং তু ব্রাহ্মণো বরঃ।

আমি এখনকার এত আধুনিক যুগেও অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে পরম্পরা বাহিত সাংস্কারিক মানসে কখনও কখনও কিছু বিষমতা এবং সেটা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ অন্তরালে দেখেছি, কিন্তু এটার থেকেও বড় সমস্যা ছিলেন শর্মিষ্ঠা, যাঁকে একনজরে দেখেই রাজা মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে দাসীর নিম্নতায় স্বামীর রাজধানীতে সঙ্গে নিয়ে গেছেন দেবযানী। দেবযানীর এই মানসিক উচ্চতা বোধ স্তব্ধ করতে পারেননি শুক্রাচার্য, কিন্তু রাজাকে তিনি চেতাবনী দিয়ে বলেছিলেন—এই বার্ষপর্বণী শর্মিষ্ঠা কুমারী বটে, তাঁকে কিন্তু পূজ্যতা-মান্যতা দিয়ে দাসী হিসাবেই পালন কোরো, কিন্তু এঁকে যেন কোনওদিন বিছানায় তুলে বোসো না—সম্পূজ্যা সততং রাজন্ মা চৈনাং শয়নে হ্বয়েঃ। শুক্রাচার্য যেটা বুঝতে পারছেন, দেবযানী মেয়ে হয়েও সেটা বুঝতে পারলেন না। তিনি পুঁটলি বেঁধে আগুন নিয়ে গেলেন রাজধানীতে, রাজসন্নিধানে। অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে তাঁর থাকবার জায়গা হল পৃথক গৃহে, অদূরেই কোনও পৃথক স্থানে—কিন্তু সেখানে এখনও অশোক ফুল ফোটে—অশোক-বনিকাভ্যাসে গৃহং কৃত্বা ন্যবেশয়ৎ।

দেবযানীর সঙ্গে রাজার বিবাহিত জীবন ভালোই কাটছে। দেবযানী পুত্রলাভ করেছেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেবযানী যে প্রকৃতির মানুষ, তাতে পিতার ব্রাহ্মণ্য এবং তাঁর গুরুগৌরব এমনভাবেই তাঁর ভিতরে ক্রিয়া করত, যেটা একদিকে যেমন দাসী হিসাবে শর্মিষ্ঠাকে চাপে রাখত, তেমনই রাজাকেও হয়তো খানিকটা। যাই হোক দিন চলছে, উদাসী হাওয়ায় পথে পথে অনেক মুকুল ঝরে পড়েছে—মহাভারতের কবি লিখেছেন—একবার ঋতু সমাপ্তির কালে শর্মিষ্ঠা বড় আকুল হয়ে উঠলেন প্রিয় মিলনের ঔৎসুকতায়। দেবযানীর প্রতাপে কাউকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়,

কিন্তু ঋতুসিক্ত মন তো এই যুক্তি মানে না, তাই উথালপাতাল হল মনে শুধুই কী করি কী করি, এমন আনচান—কিং প্রাপ্তং কিং নু কর্তব্যং কিংবা কৃত্বা কৃতং ভবেৎ। ঠিক করলেন দেবযানীর স্বামীকেই আমি স্বামী হিসাবে চাই, আমি পুত্র চাই তাঁর কাছে।

মহাকাব্যের অভিসন্ধিতে রাজারও কেমন ইচ্ছা হল সেই দাসীদের ঘরের দিকে যাবার, সেখানে অশোকশাখায় ফুল ফুটছে, হয়তো বা 'প্রিয়ার পদাঘাতে'। রাজা দেখামাত্রই শর্মিষ্ঠা সমাকুল হৃদয়ে মিলন ভিক্ষা করলেন তাঁর কাছে। রাজা তাঁর নিবেদন খুব যে উপেক্ষা করতে পারলেন তা নয়। বস্তুত এই উপেক্ষা না করার বীজ তাঁর মনের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। হয়তো দেবযানীর স্বভাবগত অহং এবং উচ্চতার বোধ রাজার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তাঁর ঈপ্সিত 'সেক্সুয়াল কমপ্যাটিবিলিটি' নষ্ট করে দিয়েছিল, যার ফলে শর্মিষ্ঠার প্রতি মনঃপ্রবণ ছিলেনই। কিন্তু তৎকালীন দিনের অবিসংবাদী এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়েও তিনি শর্মিষ্ঠাকে বলেই ফেললেন—তোমার মতো এক অসামান্যা রমণীকে আমিও চাই কিন্তু সেই শুক্রাচার্য যে বলেছিলেন—বার্ষপর্বণী শর্মিষ্ঠাকে যেন কখনও বিছানায় তুলো না—তার কী করব?

এই কথার উত্তরে শর্মিষ্ঠা যেটা শোনালেন, যেটা মহাভারতের অন্যতম নৈতিকতা, যেটা স্বয়ং কৃষ্ণ পরে অর্জুনকে শুনিয়েছেন। শর্মিষ্ঠা বলেছেন—মিথ্যে কথা বলবে তুমি। কেন,মিথ্যা বললে পাপ হয় না? শর্মিষ্ঠা বললেন—না, হয় না। পাঁচ রকমের মিথ্যে বললে পাপ হয় না। কী কী? শর্মিষ্ঠা বললেন—ঠাট্টা ইয়ার্কি, পরিহাসের সময়ে মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না। মেয়েদের কাছে মিথ্যে বললে পাপ হয় না; পাপ হয় না বিয়ের সময়ে মিথ্যা কথা বললেও—ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। আমি একটি মহিলা কলেজের বিদ্বৎসভায় এই কথাটা বলেছিলাম নীতিধর্মের প্রসঙ্গে। মহিলা প্রগতিবাদিনীরা এ কথা শুনে ভীষণ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—একজন মহিলা হয়ে এমন কথা বলছেন শর্মিষ্ঠা! এটাতে মেয়েদের চরম অপমান করা হয়েছে। আমি বুঝিয়ে বললাম—এটা মেয়েদের অপমান নয়, বরঞ্চ বলুন, এটা পুরুষের বাঁচার তাগিদ। আমি বললাম—আজ যদি আবার বছর কুড়ি পরে আমার সেই প্রাক্তনী মালবিকার সঙ্গে আবার দেখা হয়, যদি রেস্তোরাঁর নক্ষত্র আলোকে তার সঙ্গে দু কাপ কফি খেয়ে দু ঘণ্টা কাটাই, তাহলে কি আমি বাড়িতে এসে প্রৌঢ়া গিন্নির কাছে কলকাতার জ্যাম-জট-রুদ্ধ রাস্তাঘাটের কথা বলব, নাকি বলব—মালবিকার সঙ্গে আজ দু ঘণ্টা কাটল স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতিতে।

এবারে বিদুষী মহিলারা বললেন—তাহলে পুরুষমানুষেরা কত খারাপ বুঝুন। আমি বললাম—এমন উদাহরণ ছাড়াও অন্য উদাহরণেও পুরুষরা খারাপ। এই ধরুন, আপনাকে সেই কবিতার বেলায় অকাল বসন্ত ঘনিয়ে এনে যে পুরুষটি বলেছিলেন—এমন চাঁদপানা মুখ, এমন শরীর আমি জীবনে কখনও দেখিনি, তখনও সেকথার মধ্যে ব্যবহারিক মিথ্যা ছিল অথচ আলংকারিক সত্য ছিল এবং এখন এই

পঁচিশ বছর পরেও যদি সেই পুরুষ একই কথা বলেন, তবে তার মধ্যেও জানবেন ব্যাবহারিক মিথ্যা আছে এবং আলংকারিক সত্য আছে। না হলে মহাভারতের বৃদ্ধ টীকাকার সিদ্ধান্তবাগীশ পর্যন্ত লিখেছেন— মেয়েদের মন পাবার জন্য মিথ্যে বললে দোষ নেই—স্ত্রীষু তন্মনোরঞ্জনায় প্রযুক্তম্ অনৃতং বচনং ন হিনস্তি। সিদ্ধান্তবাগীশ বুড়ো রসিক মানুষ, তিনি সঠিক কথা বলেছেন, বরঞ্চ এই জায়গায় অতিপ্রাচীন টীকাকার আরও কত মজাদার দেখুন। সে আমলে বহু বিবাহ চালু ছিল; তিনটি চারটি স্ত্রীর মধ্যে একতমাকে বেছে নেওয়ার জন্য কতটা মানসিক কৌশল লাগে, সে বিষয়ে আমার বাস্তব ধারণা না থাকলেও নীলকণ্ঠের বক্তব্যটা খুব 'ইনট্রিগিং'। নীলকণ্ঠ বলছেন—বিধান অনুসারে বিবাহিত বলে সব স্ত্রীই যেহেতু তাঁর ভোগ্যা বা গম্যা, অতএব তাঁদের মধ্যে একতমার সঙ্গে সংগত হওয়ার জন্য পুরুষ যদি, এইরকম বলে যে, আমি অমুক স্ত্রীকে তেমন পছন্দ করি না বা ওঁর সঙ্গে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না, তবে এই মিথ্যে বলায় পাপ নেই—স্ত্রীষু গম্যাসু অহম্ এনাং রময়ে ইত্যুক্তিরনৃতাপি কৃত্বা চেৎ ন হিনস্তি।

আমরা বলতে চাই—প্রাচীন নীলকণ্ঠ অনেক কঠিন মানুষ, কিন্তু আমাদের মতে সিদ্ধান্তবাগীশ রসিক বটে। আমরা বরং 'মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলায় দোষ নেই'—এমন নীতিধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন সমাজ সাধন সেই অতিবাদী মিথ্যার জয়ঘোষণা করব—সত্য থাকুন ধরিত্রীতে/শুষ্ক রুক্ষ মুনির চিতে/জ্যামিতি আর বীজগণিতে/কারো ইথে আপত্তি নেই/কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে/এবং আমার কবির গানে/পঞ্চশরের পুষ্পবাণে/মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই। শর্মিষ্ঠা বলেছিলেন—হাস্য, পরিহাসে মিথ্যা বলায় দোষ নেই, মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলাতেও দোষ নেই, আর দোষ নেই বৈবাহিক মিথ্যায়। সত্যি বলতে কী, ধনীদরিদ্র, ভদ্রাভদ্র, সাধু অসাধু, কঠোর সত্যব্রতী এবং দৈনিক মিথ্যাবাদী—প্রত্যেক ধরনের মানুষকেই যে কত মিথ্যে বলতে দেখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই মিথ্যা যে কতটা এই সমাজ ব্যবস্থায় জরুরি, তার জন্য সহৃদয়ের হৃদয়ই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এখানে এই চার-পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতায় প্রত্যেকটি মেয়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে যেভাবে পিতামাতার হৃদয় জুড়ে আছে সেখানে বৈবাহিক ক্ষেত্রে সব মিথ্যাই সত্য। বাড়তে বাড়তে মানুষ যেখানে একুশ কোটিতে দাঁড়ায় এবং যেখানে এক বোকা বদমাশ পুরুষও বিয়ের সময়ে কন্দর্পকান্তি হয়ে উঠে প্রোডাক্ট খুঁজতে বেরোয়, সেখানেই তো মিথ্যেটা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবারে উলটো দিকে যাঁরা বরপক্ষের মা-বাবা, ভাই-বোন এমনকী পরিজন বন্ধুদের উদ্‌গত চোখের সামনে মেয়েকে নিয়ে আসবেন, তাঁরা যদি হাজার লক্ষ মিথ্যে কথা বলেন, তবে সেখানে এক ফোঁটাও অন্যায়, অনীতি নেই। সেটা 'অ্যাডভারটাইজমেন্ট'-এর শিল্প হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। শর্মিষ্ঠা সেটাই বলেছেন—ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি/ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।

পরের মুহূর্তে শর্মিষ্ঠা আরও 'সিরিয়াস' কথা বলছেন। যদি প্রাণসংশয় উপস্থিত

হয়, তবে যে কারও প্রাণ বাঁচানোর জন্য, আর যদি এমন হয় যে ধন সম্পত্তি, সোনা-দানা সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও মিথ্যে বললে কোনও পাপ হয় না। শর্মিষ্ঠা বলেছিলেন—এই পাঁচ রকমের মিথ্যেতে কোনও দোষ নেই মহারাজ—পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি। কার্যক্ষেত্রে মিথ্যার মতো এক বৈকল্পিক সত্যের প্রতিষ্ঠায় রাজা যযাতি কতটা মনে মনে সযৌক্তিক হয়েছিলেন জানি না, তবে শর্মিষ্ঠার সমাদর এবং ভালোবাসা তিনি ফেলতে পারেননি, এবং আমরা মনে করি—রাজাও তাঁকেই ভালোবেসেছিলেন। পার্থিব সত্যের জায়গায় রাজা শেষ পর্যন্ত দেবযানীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন, দেবযানী বাবাকে দিয়ে স্বামীকে অভিশাপ খাইয়েছিলেন এবং 'সেক্সুয়াল অ্যান্ড মেন্টাল কমপ্যাটিবিলিটি' না থাকা সত্ত্বেও রাজাকে দেবযানীর সঙ্গেই থাকতে হয়েছিল আরও মহাকাব্যিক হাজার বছর। তবু এই প্রকরণের মধ্যে শর্মিষ্ঠা এবং তাঁর মিথ্যা মাহাত্ম্যই রসশাস্ত্রীয় মতে জয়ী হয়ে গেছে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল— পরবর্তী কালের প্রামাণিক সাহিত্যে নববধূকে আশীর্বাদ করার সময় কালিদাসের মহর্ষি কণ্ব দেবযানীর নাম করছেন না। তিনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করে বলছেন—মহারাজ যযাতির মনের মানুষ যেমন শর্মিষ্ঠা তোমার স্বামীও তোমাকে সেইরকম ভালোবাসুক—যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতাভব।

এটা ভেবে দেখুন, যে রমণীর সঙ্গে যযাতির বিধিসম্মত কোনও বিবাহ হল না, শুধুমাত্র অসহায়া রমণীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আপন আকাঙ্ক্ষার সমাপতন ঘটল যেখানে, সেই রমণীর জয়কার ঘোষণা হল মহাকবি কালিদাসের লেখনীতে। এই ঘোষণা প্রমাণ করে—মহাভারত যেখানে মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়, সেই মিথ্যা চির আচরিত সত্যের চেয়ে অনেক বেশি মধুর, কেননা সেটা সংস্কারপ্রবণ সমাজনীতির মধ্যে মধুরতর বাস্তবের সংক্রমণ ঘটায়। ঠিক এই কথাটাই আমরা কর্ণপর্বে কৃষ্ণের মুখে শুনেছি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—সত্য কথা বলা ভালো, কেননা সত্য থেকে ভালো কিছু হতে পারে না, কিন্তু বাস্তব এবং পরিস্থিতি এমন জিনিস যে সত্যের তত্ত্বটা একেবারেই দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সত্য জিনিসটা কখনও কখনও এমন অন্যায় অধর্ম ঘটিয়ে দেয় যে, তখন সত্য ব্যাপারটার ওপরেই একটা সন্দেহ তৈরি হয়ে যায়—তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্। কৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেছেন অর্জুনকে—এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মিথ্যে বললে সত্যের চেয়ে বেশি উপকার হয়, অথবা সত্য বলাটা সেখানে মিথ্যে বলার মতো খারাপ কিছু ঘটিয়ে ফেলে—ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং ব্যক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। বস্তুত এমন পরিস্থিতি যদি তৈরি হয়, তাহলে কৃষ্ণের মতে সত্যের চেয়ে মিথ্যা বলাই ভালো।

কথাটা কে বলছেন, এটাও বুঝি খানিক গুরুত্ব দিয়ে ভাবাই ভালো। কথাটা কৃষ্ণ বলছেন—এই ভারতবর্ষে তিনি ভগবান বলে চিহ্নিত। যদি তাঁর ভগবত্তা না মানেন, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ অথবা অন্যতর এক মধুর সমাজবোধের

মানুষ। জীবনে যত রকম তাঁর ক্রিয়াকলাপ আছে, যতরকম তিনি কথা বলেছেন, যতরকম তিনি আচার ব্যবহার করেছেন তার বেশিরভাগই পরম্পরাবাহী প্রথাসম্মত নয়। এর জন্য তাঁকে কথাও শুনতে হয়েছে অনেক, সমালোচনাও সইতে হয় অনেক, তবু তাঁকে কেউ 'ইগনোর' করতে পারেন না, তাঁকে মেনে নিতে হয়, তাঁর 'জাস্টিফিকেশন' শুনতে হয়, আবারও তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত আবারও তাঁকে মেনে নিতে হয়। মনে আছে, এক বিখ্যাত পুরাণে ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের কাছে কৃষ্ণের পরবধূবিলাসের কথা শুনে পরীক্ষিৎ ছি ছি করে বলেছিলেন—এ সব আপনি কী শোনালেন, ব্রহ্মর্ষি? যে কৃষ্ণ নাকি সমস্ত ধর্মের প্রবক্তা, তিনি ধর্ম সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত ধর্মসেতুর তিনি রক্ষক—স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা—তিনি কিনা পরস্ত্রীদের নিয়ে এমন বিলাস বিহার করলেন? আমার তো মনে হয় খুব খারাপ কাজ করেছেন এটা।

পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের একটা উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার সময় ছিল না শুকদেবের। তিনি যখন রাসবিলাস বর্ণনা করছিলেন, তখনই অনেক সূত্র দিয়েছেন কৃষ্ণকে বোঝার, সূত্র দিয়েছেন আগে এবং পরেও। পরীক্ষিত বোঝেননি, অতএব এখন শুকদেব একেবারে ডেঁটে বলেছেন—যা করেছেন, বেশ করেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মতো বিরাট পুরুষ ওরকম অনেক কিছু করতে পারেন, তোমার সেটা বোধগম্য হবে না।

বস্তুত এই মুহূর্তে আমাদেরও কোনও সময়াবসর নেই, অথবা প্রবৃত্তিও নেই যে, 'অখিলরসামৃতমূর্তি' কৃষ্ণের পরবধূবিলাসের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব। সেই দায়িত্ব আমাদের কলিযুগ-পাবনাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর প্রিয় পার্ষদ রূপ গোস্বামীর ওপর রইল। আমরা শুধু মহাভারতের 'কনটেক্সটে' বলব যে, শাস্ত্র, নিয়ম এবং প্রচলিত প্রথার বাইরেও এক নতুন সামাজিক সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যা সব সময়েই তর্কযোগ্য হলেও তা কল্যাণ এবং মঙ্গলের সমাধান নিয়ে আসে। এই যে কথাটা বলছিলেন কৃষ্ণ—যেখানে মিথ্যে বলাটা সত্যের মতো উপকার করে সেখানে মিথ্যেই বলতে হবে—এখানে এই উপকার বা কল্যাণের কথাটা শেষ পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতেই হবে। প্রসঙ্গটা আপনারা শুনেছেন বহুবার, তবু সেটা বলতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে তো এইরকম হয়ই—অর্জুন বারবার যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করছেন—এইবার এই কর্ণটাকে শেষ করতেই হবে, কিংবা কখনও গর্ব করেও বলেছেন—আমি একবার একরথেই কর্ণকে মেরে আসব। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব অন্যরকম আর কর্ণও খুব সাধারণ মানের ধনুর্ধারী যোদ্ধা নন। তা একবার হল এইরকম যে, অর্জুন অন্যত্র ভয়ংকর যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন, ভীমও তাই, আর এদিকে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব কর্ণের সামনে পড়ে গেছেন। কর্ণের কী মনে হল—সাধারণত অসম লোকের সঙ্গে তিনি তেমন যুদ্ধ-টুদ্ধ করেন না—কিন্তু কী তাঁর মনে হল—ভাবলেন এই যুধিষ্ঠিরকে একটু শিক্ষা দিই। তা ভালোই শিক্ষা দিলেন। নকুল-সহদেব পাশ থেকে চেষ্টা করেও কিছু করতে

পারলেন না। যুধিষ্ঠিরের রথ, ঘোড়া, সারথি কর্ণের বাণে সব তছনছ হয়ে গেল, এমন কী তাঁর গৌরবের প্রতীক শিরস্ত্রাণটিকে পর্যন্ত বাণের খোঁচায় উড়িয়ে দিলেন কর্ণ। এইভাবে প্রাণে বধ না করে জিইয়ে রেখে বীরমানিতা নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে বড় জ্বালা আছে। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিরবুদ্ধি মানুষও এই ভীষণ অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

অর্জুন সংশপ্তকদের মতো ভীষণ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি দাদা যুধিষ্ঠিরের সুরক্ষা নিয়ে মাঝে মাঝেই ব্যস্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার উপায় ছিল না। ফিরে যখন এলেন, তখন আর যুধিষ্ঠিরের তর সইল না। তিনি যা নয় তাই বলতে থাকলেন অর্জুনকে। সে এমন গালাগালি, যা এখানে লিখতে পারলে বেশ মজাই হত, কিন্তু প্রসঙ্গ লঙ্ঘনের নৈতিকতায় প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য যাতে হত না হয়, তার জন্য এইটুকু বলি যে, যুধিষ্ঠির কর্ণের কাছে হেরে এতটাই অপমানিত বোধ করেছেন যাতে একসময় তিনি এমনও অর্জুনকে বলেছেন—তুই আমার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে পাঁচ মাসেই যদি তাঁর গর্ভপাত হয়ে যেত, তবে ভালো হত। তার চেয়েও ভালো হত তুই এক্কেবারে না জন্মালে—মাসে'পতিষ্যঃ পঞ্চমে ত্বং সুকৃচ্ছ্রে/ন বা গর্ভে' প্যভষ্যিঃ পৃথায়াঃ। আজ তো দেখছি যদি অভিমন্যু বা ঘটোৎকচ বেঁচে থাকত, তাহলেও আমার এই অপমান হত না কর্ণের হাতে—তখনও কিন্তু অর্জুন অনেক বুঝিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর পাশে এসে না দাঁড়ানোর সযৌক্তিক কারণগুলি—কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখ মানছে না কোনও পদবাক্যের শালীনতা-নীতি—এইরকম চড়তে চড়তে তিনি এক সময় বলে ফেললেন—তুই যদি তোর এই গাণ্ডীব ধনুকটা কৃষ্ণের হাতে দিয়ে—ধনুশ্চৈতৎ কেশবায় প্রদায়—নিজে সারথির কাজটা করতিস, তাহলে এত দিনে কবেই মারা পড়ত এই কর্ণ। না হয় ছেড়ে দে কৃষ্ণকে, গাণ্ডীবটা না হয় অন্য কাউকেই দিয়ে দে, যে অন্তত তোর থেকে অস্ত্রবিদ্যায় ভালো—দেহ্যন্যস্মৈ গাণ্ডিবমেতদদ্য/ত্বত্তো যো'স্ত্রেষ্বভ্যধিকো নরেন্দ্রঃ। এই সমস্ত অপমান দোষারোপের শেষে যুধিষ্ঠির একেবারে ধিক্কার দিলেন গাণ্ডীব ধনুকটিকেই এবং ধিক্কার দিলেন অর্জুনের বাহুবীর্যকে—ধিগ্‌গাণ্ডীবং ধিক্ তে বাহুবীর্যম্/অসংখ্যেয়ান্ বাণগণাংশ্চ ধিক্ তে।

এতক্ষণ যত তিরস্কার করেছিলেন যুধিষ্ঠির, তা সবই মেনে নিচ্ছিলেন অর্জুন। ব্যক্তিগত জীবনে কখনও তিনি যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করেননি এবং এ অনতিক্রম এতটাই যে, স্বয়ং দ্রৌপদী পর্যন্ত ঠাট্টা করে সত্যি কথাটা বলে বলতেন—অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ভাইও বটে, শিষ্যও বটে—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য। সেই অর্জুন কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের মানাহত শব্দরাশি। কিন্তু এই যে, তিনি বললেন—ধিক তোমার গাণ্ডীব ধনুককে, তুমি অন্য যোগ্যতর হাতে তুলে দাও তোমার গাণ্ডীব, এই কথাটা ভীষণ লেগে গেল তার মনে। আমাদের ঝগড়াঝাটিতেও এইরকম হয়, এক

একটা বাক্য, শব্দ কখনও কখনও রক্ত চড়িয়ে দেয় মাথায়। অর্জুন হঠাৎই তরবারি নিষ্কাশিত করলেন এবং এতটাই তাঁর রাগ হল যে, এক্ষুনি যেন কেটেই ফেলবেন দাদা যুধিষ্ঠিরের মাথা—অসিং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো জিঘাংসুর্ভরতর্ষভম্।

কৃষ্ণ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন, এবার হঠাৎই অর্জুনকে উন্মুক্ত অসি হাতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তেড়ে যেতে দেখে তিনি বলে উঠলেন—এটা তুমি কী করতে যাচ্ছ, অর্জুন—উবাচ কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত—তোমার সামনে তো যুযুধান বা আততায়ী কাউকে দেখছি না যে, তার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে। একটু আগেই তুমি আমাকে চিন্তিত স্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা জিজ্ঞেস করছিলে, তা তাঁর সঙ্গে তো দেখা হল এবং তিনি কুশলেই আছেন। তাহলে হঠাৎ তোমার এই রুদ্রমূর্তি কেন? যেখানে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে পরম আনন্দ হবার কথা, সেখানে তোমার চরম রাগ হচ্ছে, এটা কেমন বিপরীত ব্যবহার—হর্ষকালে চ সংপ্রাপ্তে কস্মাত্তে মন্যুরাবিশৎ। কৃষ্ণ বললেন সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না—তুমি ঠিক কী করতে চাইছ, তাই বলছি, কারণটা তুমি নিজেই বলবার চেষ্টা করো—তত্ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্?

অর্জুন অসম্ভব রেগে গেছেন, সাপের মতো তার নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু কৃষ্ণের শান্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্রুদ্ধ উত্তর দিয়ে বললেন—আমার গুপ্ত প্রতিজ্ঞা ছিল—যে লোক আমাকে বলবে—তোমার গাণ্ডীব অন্য কাউকে দিয়ে দাও, তাকে আমি ছাড়ব না, তার মাথা কেটে ফেলব আমি। আজকে রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে সেই কথাটাই বলেছে এবং তোমার সামনেই বলেছে, অতএব আমি ছাড়ব না। আজকে যুধিষ্ঠিরকে মেরেই তবে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব এবং সত্যের কাছে, সত্য-প্রতিজ্ঞার কাছে আমার কোনও ঋণ থাকবে না—সো'হং যুধিষ্ঠিরং হত্বা সত্যস্যানৃণ্যতাং গতঃ। আমার শান্তি হবে এতেই, তবে হ্যাঁ, তুমি কী মনে করো এই ব্যাপারটায়, তুমি বলো আমি নিশ্চয় শুনবো—কিংবা ত্বং মন্যসে প্রাপ্তমস্মিন্ কালে উপস্থিতে। অর্থাৎ কিনা এত ক্রোধের মধ্যেও একটা ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে বিবেক কাজ করছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মতো এক বড়ভাইয়ের মাথা কেটে ফেলার মধ্যে গভীর অন্যায় আছে, সেটা কোথাও সামান্যতম খোঁচা দিচ্ছিল অর্জুনের হৃদয়ে। কিন্তু কখনও কখনও সত্যের এমন আড়ম্বর তৈরি হয় এবং সত্য-প্রতিজ্ঞার আড়ম্বর তো সেখানে আরও বেশি সমুজ্জ্বল—তাতে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার মাহাত্ম্য বিপ্রতীপভাবে ক্রোধেরও জন্ম দেয়। কিন্তু সজ্জন সংবেদনশীল ব্যক্তির অন্তর্হৃদয়ে সেই 'স্পেস'-টুকু তবু থেকেই যায়, যাতে বিবেক কথা বলে ওঠে— প্রতিজ্ঞাত সত্যই যদি প্রকৃত সত্য হয়, তাহলে সেটাই জগদ্বিতায় তো?

সামান্য এই বিবেক-টিপ্পনীটুকু অবশ্য অর্জুনের পূর্ব-ক্রোধোক্তির তলায় একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়। ফলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে মারতে যাচ্ছেন—এই আকস্মিকতাতেই কৃষ্ণ

একেবারে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অর্জুনকে। বললেন—ছিঃ ছিঃ অর্জুন! ছিঃ ছিঃ। আমি এখন বুঝতে পারছি, তুমি বৃদ্ধ-জ্ঞানীদের সেবা করোনি কখনও। নইলে এমন অসময়ে ক্রুদ্ধ হয় কেউ? তুমি সত্য-প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হওয়ার ভয়ে ধর্মের নামেই এমন একটা নৃশংস কাজ করতে চাইছ যখন, তাহলে তুমি নিশ্চয় ধর্মভীরু বটে, কিন্তু তুমি প্রকৃত পণ্ডিত নও, কেন না ধর্মের যে দুটো ভাগ আছে, সেটা তুমি জানো না, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ে বিবেচনার যে ভাবনা আছে, সেটা তুমি একেবারেই বোঝো না। এমন তো হতেই পারে যা শাস্ত্রপরম্পরায় বিহিত হয়েছে, অথচ বিবেচনার দিকে তাকালে সেই বিহিত কার্যও হয়তো করা উচিত নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, কাজটা করা উচিত ছিল বলে মনে হচ্ছে, অথচ সেটা ভীষণভাবেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ তবে সেটাও করা উচিত নয়। কিন্তু কোনটা করা উচিত, আর কোনটা করা উচিত নয়, সেটা বুঝতে গেলে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জ্ঞানীদের কথাই শোনা উচিত, অথচ সেটা তুমি বুঝতেই পারছ না।

কৃষ্ণ যে বারবার বৃদ্ধদের কথা উল্লেখ করছেন, বলছেন—তুমি বৃদ্ধদের সেবা করোনি—ইদানীং পার্থ জানামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া—এই বৃদ্ধেরা হচ্ছেন 'ধর্মবিভাগজ্ঞঃ', অর্থাৎ ধর্মের দুটো প্রান্তই তাঁরা বোঝেন--'কোটিদ্বয়বিৎ', 'উভয়াংশবিৎ'—ধর্মের মধ্যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অংশও তাঁরা বোঝেন, আবার ধর্মের ব্যবহারিক দিকটাও তাঁরা বোঝেন। কৃষ্ণ বলছেন—যাঁরা ধর্মকে আত্মসাৎ করে নিয়ে তারপর ধর্মের ব্যবহারিক উপদেশ দেন, যাঁরা ধর্মের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলিও বোঝেন এবং ধর্মের বিস্তারও বোঝেন, সেই বৃদ্ধদের ধর্মনিরূপণ তুমি একটুও জানো না বলেই এ-রকম একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

আসলে পৃথিবীতে যেটা ঘটে, ঘটতে থাকে সেটা শাস্ত্রীয়ভাবে সব সময় ঘটবে না বলেই উপস্থিত সময় বুঝে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত পালটে দিয়েও যাঁরা ধর্মকথাই বলবেন তাঁরাই এই কৃষ্ণকথিত জ্ঞানীবৃদ্ধ—অনুসৃত্য তু তং ধর্মং কথয়েয়ুরুপস্থিতাঃ—তাঁরা যেটা বলবেন, সেটা শ্রুতিপরম্পরায় নেমে আসবে, সেটা বড় মানুষের কাছে শুনে বুঝতে হবে— শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্বম্, তুমি সেটা বুঝতে পারছ না, অর্জুন! শাস্ত্রবাণীর বাইরে এসে উপস্থিত বিষয়ে ধর্মনীতির কথা যাঁরা বলতে পারেন, তাঁরা পরম্পরাগত ব্রাহ্মণই হবেন অথবা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রই হবে, তা নয়। সেই প্রয়োজনীয় নীতির কথা একজন শাস্ত্রাভিজ্ঞ শূদ্রও বলতে পারেন, বলতে পারেন একজন মহিলাও। ঠিক এই দৃষ্টি ছিল বলেই কৃষ্ণ স্ত্রী-শূদ্রের নাম করে বলতে পেরেছেন—তোমাকে আমি যা বলতে চাইছি, তা তোমাকে যেমন ভীষ্ম কিংবা যুধিষ্ঠিরও বলতে পারতেন, তেমনই বলতে পারেন শূদ্রযোনিতে জাত বিদুর, কিংবা বলতে পারেন তোমার জননী কুন্তীও—বিদুরোঽপি তথা ক্ষত্তা কুন্তী বাপি যশস্বিনী। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে একজন শূদ্র পুরুষ কিংবা একজন মহিলা কিন্তু ধর্ম-উপদেশ করতে পারেন না।

অর্জুন যাঁকে মারার জন্য উদ্যত হয়েছেন, সেই উপস্থিত শত্রু যুধিষ্ঠিরও ধর্মের এই ব্যবহারিক নীতি জানেন, এ-কথা বলে কৃষ্ণ এক মুহূর্তের মধ্যে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাত সত্যকে বালকের যথেচ্ছ ভাষণের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন—ত্বয়া চৈব কৃতং পার্থ বালেনৈব কৃতং পুরা—আবার অন্যদিকে শূদ্র বিদুর এবং কুন্তীর ধর্মজ্ঞতার প্রশংসা করে শাস্ত্রকে তিনি পরিশীলিত করেছেন যন্ত্রণা-লব্ধ অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দুতে। আসলে কৃষ্ণ যেটা বলতে চাইছেন, সেটা হল—প্রথা এবং পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রবিধির মধ্যে মানবিক যুক্তিগুলিও যেন অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এটা যে কোনও অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, তাও নয়, কেননা জীবনের পালনীয় কর্তব্য-অকর্তব্যগুলির ক্ষেত্রে আমরা যখন ধর্মযুক্তির বিধান দিই, তখন সেগুলিও তো যুক্তিই বটে। অতএব নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ধর্মসংশয় তৈরি হলে পরিশীলিত এবং অভিজ্ঞ-বৃদ্ধের মনে নতুন তর্কযুক্তি আসবে, এটাই স্বাভাবিক। এই কথাটা সকলে বোঝেননি, কিন্তু কেউ কেউ বুঝেছেন বলেই বৃহস্পতির মতো স্মৃতিশাস্ত্রকার লিখেছেন—শুধুমাত্র প্রথাগত শাস্ত্রের বিধান দিয়ে ধর্মের নির্ণয় করা একেবারেই ঠিক হবে না। সেখানে যদি যুক্তি-তর্ক না থাকে এবং শুধু থাকে যুক্তিহীন শাস্ত্রবাণীর বোঝা, তাহলে ধর্ম তো হয়ই না, বরং ধর্মহানি হয়—যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

কৃষ্ণ এটাই বলেছিলেন—শুধু সত্য-সত্য করে মাথা ঠুকে মোরো না অর্জুন! সত্য যদি মিথ্যার চেয়েও খারাপ ফল তৈরি করে, আর মিথ্যা যদি সত্যের মঙ্গলময় অভ্যুদয় ডেকে আনে, তবে সেখানে মিথ্যাটাই ধর্ম। কতকাল আগে বলা শর্মিষ্ঠার সেই ধর্মযুক্তি আজ অর্জুনের কাছে উচ্চারণ করছেন কৃষ্ণ। শর্মিষ্ঠার পঞ্চ মিথ্যার ধর্ম কৃষ্ণ সামান্য পালটে দিয়েছেন এবং সেটা হয়তো খানিকটা সামাজিক 'কমপ্রোমাইজ'-এর কারাণে, কিন্তু অনেকটাই তিনি পুনরুক্তি করেছেন। যেমন বিয়ের সময় বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ বিবাহ-ঘটনার জন্য যে-সব অতিবাদী মিথ্যা উচ্চারণ করে, তাতে যেমন দোষ নেই, তেমনই দোষ নেই স্ত্রী-পুরুষের রমণ-সম্বন্ধের মিথ্যা কথা বলার। শর্মিষ্ঠা এই রমণ-রতি-সম্বন্ধের কথাটা না বলে নর্মবচনের কথা বলেছিলেন। তা নর্মবচন বলতে যেমন বন্ধুবান্ধবের হাস্য-পরিহাস বোঝায়, তেমনই স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসার কথাও বোঝায়, তা না হলে শৃঙ্গারের সহায়িকা সখীকে নর্মসহচরী বলত না লোকে। প্রাণসংশয়ে মিথ্যার আশ্রয় বা ধন-সম্পত্তির অপহরণে মিথ্যার আশ্রয় নেবার কথাটা শর্মিষ্ঠার মতোই আছে, কৃষ্ণ যোগ করেছেন—ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় মিথ্যা বলাটাই ধর্ম। আমরা বলব—হয় এটা তৎকালীন ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ', নয়তো এটাও বলতে পারি—তৎকালীন দিনের সবচেয়ে শিক্ষিত অথচ অর্থহীন মানুষগুলির জন্য তর্কাতীতভাবে চিন্তা করা।

শর্মিষ্ঠা যযাতির প্রেম পাবার জন্য যা বলেছিলেন, যযাতির প্রেমলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই, তা নতুনতর একপ্রকার শাস্ত্রবাণীতে পরিণত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যুক্তি

ছিল না, সমাজের অভ্যুদয় বা মঙ্গল তাতে কী হল, তার উদাহরণ ছিল না কোনও। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি দাদা যুধিষ্ঠিরকে মারতে চাইছ এই তো? কিন্তু আমি বলব—যে কোনও মানুষকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলতে হলেও সেটা ধর্ম, কেননা প্রাণহানি না করার মধ্যে যে ধর্ম আছে, তার চাইতে বড় ধর্ম আর কিছু নেই—প্রাণিনাম্ অবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম। সেখানে তোমার বড় ভাই, দাদা যুধিষ্ঠির তো ধর্মপ্রাণ কত বড় একজন মানুষ, তাঁকে মেরে ফেলার কথা তো ভাবাই যায় না। হিংসা করার চাইতে মিথ্যা বলা অনেক ভালো। অথচ ভদ্রলোক হওয়া সত্ত্বেও কেমন সামান্য এক ছোটলোকের মতো ব্যবহার করছ তুমি, তুমি কিনা এই রকম ধর্মপুরুষ দাদাকে মারতে চাইছ—হন্যাদ্ ভবান্ নরশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতো'ন্যঃ পুমান্ ইব। ধর্ম অনেক বড় জিনিস, তার গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তার বিচারও সূক্ষ্ম, সেগুলো কিচ্ছু না বুঝে—অসম্প্রধার্য্য ধর্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্—তুমি কবেকার কোন্ প্রতিজ্ঞাত সত্য মনে রেখে গুরুস্থানীয় দাদাকে মারতে চাইছ! এটা ধর্ম নয়।

সত্যের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ এবার একটা কাহিনি বললেন অর্জুনকে।

বললেন—কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সব সময় সত্য কথা বলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সে ব্যাপারে তাঁর খ্যাতিও হয়েছিল, সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলতো। একদিন তিনি তাঁর তপোবনে বসে আছেন, সেই সময়ে কতগুলি নিরীহ লোক দস্যুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই তপোবনে এসে প্রবেশ করল। লোকেরা বৃক্ষ-লতার অন্তরালে যে যার মতো প্রাণভয়ে লুকিয়ে পড়তেই দস্যুরা তপোবনে এসে সেই সব নিরীহ লোকদের ইতস্তত খোঁজাখুঁজি করে যখন পেল না, তখন তারা ব্রাহ্মণ কৌশিককেই জিজ্ঞেস করল—মহাশয়! অনেকগুলো লোক এসে এখানে ঢুকেছিল,, তারা সব গেল কোথায়? আপনি সত্যবাদী মানুষ এবং যদি সত্যিই আপনার এ-ব্যাপারে জানা থাকে, তাহলে সত্য করে বলুন আমাদের—কোথায় গেল এতগুলো লোক—সত্যেন পৃষ্টঃ প্রব্রূহি যদি তান্ বেত্থ শংস নঃ। কৌশিক আপন সত্যের গরিমায় সত্য জানিয়ে বললেন—বৃক্ষ-লতা-গুল্মের অন্তরালে লুকিয়ে এইখানেই রয়েছে তারা সবাই। দস্যুরা সব শুনে নিরীহ লোকগুলোকে খুঁজে বার করল এবং তাদের নৃশংসভাবে মেরে ফেলল।

ব্রাহ্মণ কৌশিকের সত্যবাদিতার কাহিনি শুনিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—এরপর কাল পরিণত হলে কৌশিক ব্রাহ্মণ নরকে গেলেন। ধর্মের সূক্ষ্ম বোধ-বিচার তাঁর ছিল না, শুধু সত্য আঁকড়ে থেকে এতগুলো লোকের অযথা মৃত্যুর কারণ হয়ে তিনি যে নরকে গেলেন, তার কারণ একটাই—তিনি ধর্মের উভয় অংশ জানতেন না, শাস্ত্র জানেন, কিন্তু শাস্ত্র-ব্যবহারের স্থানাস্থান বোঝেন না—যথা চান্নশ্রুতো মূঢ়ো ধর্মানাম্ অবিভাগবিৎ। কী বলতে চাইছেন কৃষ্ণ, সে-বিষয়ে উদাহরণ সহ দিক্‌নির্দেশ করে কৃষ্ণ এবার বৈপ্লবিক যুক্তি দিয়ে অর্জুনকে বললেন—শুধু তর্ক-যুক্তি দিয়েই তুমি ধর্ম

বুঝে নেবে, এটা যেমন ঠিক কথা নয়, তেমনই বেদশ্রুতি যা বলেছে, সেটাই একমাত্র ধর্ম, এটাও ভাবা ঠিক নয়, কেননা অতীত-অনাগত সমস্ত বিষয়ে সব বিধানই দেওয়া আছে এমনটা হতেই পারে না—ন চ সর্বং বিধীয়তে। তোমাকে শুধু মনে রাখতে হবে—সমস্ত প্রাণীর যাতে মঙ্গল হয়, সেটাই ধর্ম—প্রভবার্থায় হি ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।

প্রকারান্তরে কৃষ্ণ এখানে বৈশেষিক দার্শনিকদের কথাটাই মেনে নিলেন কিনা কে জানে। ওঁরা তো বলেছিলেন—যাতে ইহকাল আর পরকালের কল্যাণ হয় সেটাই ধর্ম—ইহকালে অভ্যুদয়, পরকালের মোক্ষলাভ—এ দুটিই পরম কল্যাণ থেকে মুক্তিতে পরিণতি—যতো'ভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। আমরা বলব—বৈশেষিকদের এই ধর্মসূত্র একদিনে তৈরি হয়নি, সমাজের মানসিকতার মধ্যেই তার বীজ ছিল, যেটা কৃষ্ণ মহাভারতে বলে দিয়েছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—আমার নিশ্চিত মত এই যে—যে কাজের মধ্যে হিংসা নেই সেটাই ধর্ম—যৎ স্যাদহিংসা-সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। কৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ এমনটা হতেই পারত যে, দস্যুরা এসে যখন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ কৌশিককে নিরীহ লোকগুলোর কথা জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি জবাব না দিতেও পারতেন, কিন্তু তাতে দস্যুদের সন্দেহ আরও বাড়ত এবং তাতেও লোকগুলোর মৃত্যু হতে পারত; কিন্তু দস্যুদের সন্দেহই যাতে তৈরি না হয় এবং কথাও যদি অবশ্যই বলতে হয় সন্দেহ দূর করার জন্য তাহলে সেখানে মিথ্যা বলাটাই সবচেয়ে ভালো ছিল—সেটাই অবিচারিত সত্য হয়ে উঠত—কেননা তাতে এতগুলো লোক প্রাণে বাঁচত—শ্রেয়স্তত্র অনৃতং বক্তুং তৎ সত্যম্ অবিচারিতম্—এবং সেটাই ধর্মের অনুকূল কথা।

কৃষ্ণ এতক্ষণ এত দৃঢ়তার সঙ্গে এত যুক্তি দিয়ে কথা বলেছেন. তাতে ধর্মের চিরপ্রথিত সংজ্ঞার মধ্যে যে একটা নিঃশ্বাস নেবার জায়গা আছে, সেটা বুঝতে পারলেন অর্জুন। বললেন—একজন মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি যেভাবে কথা বলেন, তুমি সেটাই বলেছ এতক্ষণ। আমি নিজেও এটা বেশ বুঝি যে, যুধিষ্ঠির যাই বলে থাকুন, তাঁকে মেরে ফেলাটা আমার উচিত নয়। কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই সত্য থেকে চ্যুত না হই, আবার যুধিষ্ঠিরের গায়েও হাত না তুলতে হয়, তেমন একটা উপায় তুমি বার করে দাও—অস্মিংস্তু মম সংকল্পে ব্রূহি কঞ্চিদনুগ্রহম্। তুমি তো জান—আমাকে যদি কেউ বলে যে, 'তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্য কাউকে দিয়ে দাও' আমি ভীষণ রেগে যাই এবং আমার প্রতিজ্ঞাই এটা যে তাকে মেরে ফেলব। এই রকম প্রতিজ্ঞা তো ভীমেরও আছে—তাঁকে কেউ 'মাকুন্দ' বা দাড়ি নেই বললেই তিনি তাঁকে মেরে ফেলবেন। সে যাই হোক, তুমি একটা উপায় বার কর, যাতে যুধিষ্ঠিরও বাঁচেন অথচ আমারও সত্য রক্ষা হয়।

আমরা বেশ বুঝতে পারি—দুই মহাবীরের দুর্বলতার জায়গা এগুলি। অর্জুনের

মতো এমন মহাধনুর্ধর বীর, এমন গাণ্ডীবধন্বাকে গাণ্ডীব ছাড়তে বললে, দুর্বলতায় আঘাত করা হয়। তেমনই ভীমের মুখটা হয়তো একটু বেশিই 'প্লেইন' ছিল, ওইরকম ভয়ংকর রণোন্মাদ ব্যক্তির দাড়ি-গোঁফ কম, মাকুন্দ-চোপা—এই পৌরুষের প্রতীকে কোনও আঘাত কিন্তু তিনিও সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন, অর্জুনের গাণ্ডীবের প্রতি ধিক্কার কিন্তু আর একজনও দিয়েছিলেন। তিনি দ্রৌপদী। রাজসভায় বস্ত্রাকর্ষণের কথা কৃষ্ণকে জানানোর সময় সেই বনপর্বে দ্রৌপদী কিন্তু সবার সামনেই বলেছিলেন—ধিক্ বলং ভীমসেনস্য ধিক পার্থস্য গাণ্ডীবম্—কিন্তু হ্যাঁ, তিনি গাণ্ডীব অন্য কাউকে দিয়ে দেবার কথা বলেনি, আর অর্জুনসহ অন্য ভাইরাও তখন যুধিষ্ঠিরের মতো বাঁধা ছিলেন, আর দ্রৌপদী স্ত্রীলোক বলেই মারবার প্রশ্ন আসেনি কখনও। কিন্তু আজকে অর্জুনের বড় আঁতে লেগে গেছে। যুধিষ্ঠির তাঁকে খোঁটা দিয়েছেন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে।

কৃষ্ণ বুঝিয়েছেন অর্জুনকে—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথাটা ভাব একবার। কর্ণের মতো বিশাল ধনুর্ধর পুরুষের সামনে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন রণক্লান্ত যুধিষ্ঠির—রাজা শ্রান্তো দুঃখিতো বিক্ষতশ্চ—এই অবস্থায় রাগে-অপমানে যদি তোমাকে অন্যায় অসংগত কথা কিছু বলেও থাকেন, তাহলে কি তোমাকে এই প্রতিজ্ঞার সত্য রক্ষা করতে হবে। তার চেয়ে বলি শোন—তোমার প্রতিজ্ঞাও থাকবে, যুধিষ্ঠিরও বাঁচবেন। সেটা হল, তুমি এমন একটা কাজ কর যাতে যুধিষ্ঠির বেঁচে থেকেও মরে যান—জীবন্নয়ং যেন মৃতো ভবেদ্ধি/তন্মে নিবোধেহ তবানুরূপম্। কীভাবে সেটা হবে? দ্যাখো, সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দিলেই তার জীবন। যদি তাঁকে অন্যায়ভাবে অপমান কর তবে জীয়ন্তে মরে যান তাঁরা। তুমি সেই মারাটা মারতে পার যুধিষ্ঠিরকে, তাতেই তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! তোমরা সব ভাইরাই যুধিষ্ঠিরকে সম্মান কর, অন্যরাও করেন। এই সম্মানিত যুধিষ্ঠিরকে তুমি একটু তুই-তোকারি করে উলটো-পালটা গালাগালি দাও, সেই অপমানটা যুধিষ্ঠিরের কাছে মৃত্যুর মতো লাগবে। তারপর আবার সব ঠিক করে নাও। অর্জুন, যুধিষ্ঠিরকে এবার গালাগালি দিতে লাগলেন তুই-তোকারি করে। তাঁর ভৎর্সনার মধ্যে অনেক সত্যবাক্যও ছিল, যেগুলি ঘটমান কালে বললেই বলা যেত। তাঁর পাশাখেলার জন্য যে-সব শাস্তি হয়েছে ভাইদের, যে-সব অভিযোগ তুলে এমনও বললেন যে, আমি এবং ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে মরার মতো খাটছি, আর তুমি দ্রৌপদীর খাটে বসে বাক্যি দিচ্ছ; বারবার বলছি—এই ব্যবহার কোরো না। তোমাকে দিয়ে আমাদের সুখের কাজ কিছু হবে না—মা মাবমংস্থা দ্রৌপদীতল্পসংস্থঃ/ত্বত্তঃ সুখং নাভিজানামি কিঞ্চিৎ। অর্জুন শুধু যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হলেন না, নিজের বীরত্ব নিয়ে আত্মশ্লাঘাও করলেন প্রচুর। এই সমস্ত নাটকীয় মিথ্যাচারের পরে অর্জুন মাথা ছোঁয়ালেন যুধিষ্ঠিরের চরণে এবং ক্ষমা চাইলেন তাঁর অপব্যবহারের জন্য। তাছাড়া

কেন তিনি আকস্মিক এই ব্যবহার করেছেন, তার কারণটাও তিনি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছুই আবার ঠিকঠাক হয়ে গেল। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এবং বিচারের মধ্যে এল নতুন এক নৈতিকতা, পরিস্থিতির প্রয়োজনে নতুন শাস্ত্রীয়তা।

চার

আমরা বলব—ভারতবর্ষে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই ধর্ম-ব্যাপারটা ভীষণ রকমের 'ডাইনামিক' এবং বৈচিত্র্যের জায়গা। সাজিয়ে রাখা পুরাতনটাই যদি একমাত্র ধর্ম বলে মানতাম আমরা, তাহলে এমন বৈপ্লবিক কথা কালিদাসের মুখে বেরত না যে, যা কিছুই পুরনো তাই ভালো—এটা যেমন ঠিক নয়, তেমনই যা কিছু নতুন, তা মোটেই ভালো নয়—এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই। বুদ্ধিমান মানুষ যে একটা ছেড়ে অন্যটা পছন্দ করেন, তা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেই করেন, শুধু মূর্খ যারা, তারাই অন্যের কথায় চালিত হয়—সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ। সত্যি বলতে কী, এত বিচার-বিবেচনা যদি না থাকত, যদি না থাকত এমন নূতনতর অভিযান, তাহলে এত প্রকার ধর্মের সৃষ্টি হতই না ভারতবর্ষে। পৌরাণিক কথকঠাকুর আরও ভালো কথা বলেছিলেন। বাস্তবের রূঢ় পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেছিলেন—দ্যাখো বাপু! আমাদের সকলের জ্ঞান একরকম নয়, আর জগৎ-জাগতিক অথবা অলৌকিক চিন্ময়কেও আমরা সকলে একরকম দেখছি না। আমাদের জ্ঞানের ভেদে দর্শনটাও আমাদের এক-এক রকম। আর ঠিক এই কারণেই দেবতারাও বলতে পারেন না যে, ধর্ম জিনিসটা ঠিক কী? ঋষি-মুনি-মানুষেরাও বলতে পারেন না যে এটাই ধর্মের নির্দিষ্ট লক্ষণ। তাঁরা শুধু বলেন—এইটে ধর্ম আর এইটে ধর্ম নয়—অয়ং ধর্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবতে ভিন্নদর্শনাঃ।

পুরাণ বলেছে—আরও পরিস্কার করে শোনো, বাছা! ধর্ম এবং অধর্ম, দুটোই ক্রিয়াত্মক শব্দ—অর্থাৎ তুমি কী করছ, সেটা ভালো না মন্দ, তার ওপরেই ধর্মের প্রয়োগ-প্রবৃত্তি নির্ভর করছে। ক্রিয়াভেদে ধর্মের এবং অধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে বলেই ধর্ম-শব্দের সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করার সময় পৌরাণিক বলেছেন—কুশল বা মঙ্গলাত্মক কাজটাই ধর্ম আর অকুশল বা যে কাজের মধ্যে মঙ্গল নেই, সেই কাজটাই অধর্ম—কুশলাকুশলং কর্ম ধর্মাধর্মৌ ইতি স্মৃতৌ। এই সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করার সময়েও পৌরাণিক কিন্তু ধর্মের সেই ধারণ করার অর্থটা ভুলে যাননি, ঠিক যেমন কৃষ্ণ অর্জুনকে অত কথার মধ্যেও —সত্যের বদলে মিথ্যার ধর্ম বলার সময়েও এটা বলতে ভোলেননি যে, ধারণ করে বলেই ধর্ম, ধর্মই সমস্ত মানুষকে ধারণ করে—ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। পৌরাণিক কথক-ঠাকুর ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন অন্বয়-ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ধারণ করা মানেই যেহেতু একটা মহৎ কাজ করা হচ্ছে অতএব যেখানে-যেখানেই সমাজ-ধারণের তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সেটাই

ধর্ম, আর যেখানে-যেখানে এই ধারণ নেই, সেটাই অ-মহান এবং সেটাই অধর্ম—অধারণে-অমহত্ত্বে চ অধর্ম ইতি চোচ্যতে।

বস্তুত সমাজ-ধারণের এই রকম একটা ধারণার মধ্যে অহিংসা এবং অনৃশংসতা যে কত সূক্ষ্ম মানসিক প্রয়োগের বিষয় হয়ে পড়ে, তা মহাভারতের কিছু মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান-সূত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে সেই যক্ষ-প্রশ্নের কথা, সেই যেখানে তৃষ্ণার্ত পাণ্ডবরা বনের মধ্যে একে একে জল আনতে গিয়ে যক্ষের প্রশ্নের মুখে পড়ছেন এবং তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করে মৃত্যু বরণ করছেন। দ্রৌপদী, নকুল-সহদেব, অর্জুন, ভীম—সকলেই একে একে যক্ষকে অবহেলা করলেন নিজেদের অহংকার-গৌরবে। অবশেষে যুধিষ্ঠির এলেন পুষ্করিণীর ধারে। যক্ষ তাঁকেও বললেন—মা তাত সাহসং কার্ষীঃ—এমন সাহস কোরো না বাছা! আমি অনেকক্ষণ ধরে একই কথা বলে আসছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর এই পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করো। তা না হলে দেখছ তো তোমার ভাইদের দশা, তোমার স্ত্রীর দশা। তারা সব মরে পড়ে আছে, দেখতেই তো পাচ্ছ। যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে স্থির হলেন। একটি একটি করে যক্ষের সমস্ত কুটিল প্রশ্নের ঈঙ্গিত উত্তর দিলেন এবং যক্ষ খুশি হয়ে বললেন—এই যারা সব অতিপ্রিয় ভাইরা তোমার মরে পড়ে আছে এখানে, তাদের মধ্যে একজনকে তুমি বাঁচাতে পারো। যাকে তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং যে তোমার সর্বাধিক প্রিয়তম, তাকেই তুমি জীবিত দেখতে চাইতে পারো—তস্মাত্ ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু।

এমন একটা বৈকল্পিক অবস্থাতেও যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু বেশি চিন্তা করতে হল না। ধর্মের সমস্ত সূক্ষ্ম নির্ণয় তাঁর মাথাতে এমন সুচির-পরিকল্পিতের মতো বাহিত হয় যে, এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে তিনি যক্ষকে বললেন—তাহলে আমার অতিপ্রিয় নকুল বেঁচে উঠুক—নকুলো যক্ষ জীবতু। ধর্মরূপী যক্ষও অবাক হলেন এই উত্তরে। বললেন—তোমার সবচেয়ে প্রিয় ভাই তো এই ভীম। দশটা হাতির বল ধরে গায়ে, আর যুদ্ধেও সে অদম্য,তুমি তাকে ছেড়ে নকুলের মতো ভাইকে বাঁচাতে চাইছ? আচ্ছা, না হয় বাদই দিলাম ভীমকে, অর্জুন! অর্জুনকে তুমি বাদ দিলে কী করে? যাঁর বাহুবল আশ্রয় করে সমস্ত পাণ্ডব-ভাইরা যুদ্ধ বৈতরণী পার হতে চায়, তাঁকে বাদ দিয়ে তুমি কিনা সামান্য ধনুর্ধর নকুলকে বাঁচাতে চাইছ? আর খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে পরে নকুল তো তোমার উত্তরাধিকারে একটু শত্রুও তো বটে, কেননা বৈমাত্রেয় ভাই তো পিতার সম্পত্তিতে ভাগ বসায় উত্তরাধিকার সূত্রে। তো এমন শত্রুরকেও তুমি বাঁচাতে চাইছো কেন—স কস্মান্নকুলো রাজন্ সাপত্নং জীবমিচ্ছসি?

অসাধারণ, চিরকালের আদর্শ উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির এবং তাতে বোঝা যায় ধর্ম ধারণ করে কোথায়; বোঝা যায় ধর্মপালনের মধ্যে কত মমতা থাকলে ধর্মরাজ হওয়া যায়। যুধিষ্ঠির বললেন—আমাকে ধর্মশীল অর্থাৎ ধর্মই আমার স্বভাবের মধ্যে আছে

বলে লোকে বলে। আমি সেই স্বভাব-স্বধর্ম থেকে চ্যুত হতে চাই না বলেই আমি চেয়েছি নকুল বেঁচে উঠুক—নকুলো যক্ষ জীবতু। এই কথাটা পরম আর্তির মতো, পরম কাঙ্ক্ষিতের মতো ধ্রুবপদে যুধিষ্ঠিরের মুখে বেঁধে দিয়েছেন মহাভারতের কবি—নকুলো যক্ষ জীবতু—আমি চাই আমার নকুল বেঁচে উঠুক। যুধিষ্ঠির বলেছেন—ধর্ম যদি একবার হতশেষ হয়ে যায়, তবে সেই আহত ধর্ম আমাদেরও হত্যা করে। আর ধর্মকে যদি রক্ষা করি তবে সেই ধর্ম মানুষকে বাঁচায়—ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ—আমি এই ধর্মটাকে ত্যাগ করতে চাই না। এই ধর্ম কেমন? না, এটা অনৃশংসতার ধর্ম, অহিংসার ধর্ম, ধারণ করার ধর্ম। আমি আত্মার দিক থেকে সেই সর্বতোভদ্র আনৃশংস্য কামনা করি বলেই আমি নকুলকে বাঁচাতে চাই—নকুলো যক্ষ জীবতু। এই আনৃশংস্য বা অনৃশংস ভাবটা খড়্গ তরবারির সংবরণ-সংকোচনে আসে না, এটা মানসিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্র। যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে বলেন যক্ষকে—আমার পিতা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী, আমার মা আছেন দুটি—কুন্তী এবং মাদ্রী। আমি যেহেতু তোমার শত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেঁচেই আছি, তাহলে আমার জননী কুন্তী আমাকে দিয়েই সপুত্রা হলেন। কিন্তু আমার বিমাতা মাদ্রীর দুটি ছেলেই যদি মারা যায় তবে কে তার শ্রাদ্ধ-জল দেবে আর কেমন করেই বা তিনি সপুত্রা হবেন। মাদ্রী মৃতা বলেই কী তাঁর গর্ভ-পরম্পরা লুপ্ত হবে। দ্যাখো যক্ষ আমার কাছে কুন্তী এবং মাদ্রী দু'জনেই আমার মা—আমার দুই মাতাই সমান স্থানে থাকুন, তাঁদের দুই সন্তান আমি আর নকুল বেঁচে রইলাম—এটাই পরম কাম্য আর ঠিক সেই জন্যই বেঁচে উঠুক মাদ্রীপুত্র নকুল—মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু।

ধর্মরূপী যক্ষ পরম প্রসাদে সাশীর্বাদে বললেন—এক্কেবারে সঠিক কথা, এই আনৃশংস্য, এই অনৃশংস ভাবটাই চরম ধর্ম—তোমার সব ভাইরাই বেঁচে উঠুক। বেঁচে থাকুক দ্রৌপদী। যক্ষ শেষ উপদেশে প্রিয়পুত্র যুধিষ্ঠিরকে জানালেন—অহিংসা, সবাইকে সমান দেখা, শান্তভাব, অবিরাম চেষ্টা শুচিতা এবং অন্যের আছে বলে ঈর্ষা-অসূয়ায় না ভুগে অমৎসর হওয়া—এগুলি হল ধর্মের দ্বার। সত্যি বলতে কী—এই যে এক সর্বতোভদ্র ধর্মের কথা বলা হচ্ছে দ্বন্দ্বহীনভাবে, এটাকে আমরা ধর্ম বলে চিহ্নিত করলেও,এগুলি আসলে নীতি, আর নীতি শব্দটা ভারতীয় ভাবনায় এতটাই গভীর যে, সেটা পাশ্চাত্যের এথিকস্ কিংবা মর‍্যালিটির চেয়ে অনেক বড় জায়গায় প্রোথিত বলেই নীতিকে আমরা ধর্ম বলে চিহ্নিত করেছি। নীতি কথাটা আসছে 'নী' ধাতু থেকে—যার অর্থ নিয়ে যাওয়া, টেনে নিয়ে যাওয়া—That which leads one towards a definite goal–নয়নাৎ নীতিরুচ্যতে।

লক্ষণীয়, 'নী' ধাতু থেকে যেমন 'নীতি' কথাটা এসেছে। তেমনই 'নী' ধাতু থেকেই অন্য প্রত্যয়ে আসে 'নয়ন'—চোখ—চোখও আমাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। আবার 'নী' ধাতু থেকেই আরও একটি প্রত্যয়ে 'নেতা'—সঠিক নেতাও

আমাদের নির্দিষ্ট শুদ্ধ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান। 'নী' ধাতুর এই গভীর অর্থটা—leading one towards as definite goal—নীতি-শব্দের মধ্যে আছে বলেই ভারতবর্ষে মানুষের তৈরি যত সুনিয়ম সদাচার, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি আমাদের নিজেকে এবং পরকেও একটা সামান্য সাধারণ স্তর থেকে উত্তর স্তরে উন্নীত করে এবং সেটা একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়।

মহাভারত তাই নীতিকে শাস্ত্র বলে উল্লেখ করে বলেছে—যে যে উপায় অবলম্বন করে মানুষ ভদ্রলোকের আর্য পথ থেকে সরে যায় না, সেই সমস্ত কিছু বলা আছে আমাদের নীতিশাস্ত্রে—তৎ সর্বং রাজশার্দুল নীতিশাস্ত্রে'ভিবর্ণিতম্। এই যে বিশাল ব্যাপ্ত এক নীতির কথা বলা হল মহাভারতে, এটা কিন্তু কোনওভাবেই পাশ্চাত্যের 'মর‍্যালিটি' কিংবা 'এথিকস্' নয়। এমনিতেই পাশ্চাত্য ভাবনায় 'মর‍্যালিটি' ব্যাপারটা 'এথিকস্'-এর একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মাত্র, যেমনটা ম্যাক্স হ্বেবর লিখেছেন—মর‍্যালিটি হল—only a strict compartmentalisation of private and social ethics. কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম-শব্দটা এমনই একটা বড় ব্যাপার, যা মর‍্যালিটি এবং এথিকসকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে এবং আমরা দেখেছি—ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সমাজগত সমস্ত বিষয়েই যেটা শৃঙ্খলার কথা বলে, যেটা ন্যায়ের কথা বলে এবং সর্বাধিক মঙ্গলের কথা বলে সেটাই ধর্ম, আবার এমনও হতে পারে—যেটা ব্যবহারিক দিক থেকে ন্যায় বা নীতির মতো শোনাচ্ছে না, বরঞ্চ অন্যায়ের মতোই শোনাচ্ছে, কিন্তু সেটা যদি মানুষের মঙ্গলবিধান করে সেটাই ধর্ম। ঠিক এখানেই যেমন যেটা 'মর‍্যালিটি' এবং 'এথিকস' এর চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তেমনই ঠিক এইখানেই সেটা অ্যারিস্টটলের moral action-এর চেয়ে বহুগুণ ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে।

ধর্ম এতটা ব্যাপ্ত বলেই ভারতবর্ষে ধর্ম কিন্তু রাজার চেয়েও বড় শাসক এবং হয়তো ধর্ম এতটা ব্যাপ্ত বলেই সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ধর্মের অনন্ত 'ক্যাটিগোরি' তৈরি করেছি, ফলে সম্পূর্ণ সমাজটা সেখানে একত্রে ধরা পড়ে। যে মনু মহারাজকে আপনারা সব সময় গালাগালি দিয়ে থাকেন এবং আজকের একবিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত বুদ্ধিতে হয়তো তাঁকে গালগালি দেবার কারণও আছে—সেই মনুও কিন্তু ধর্মকে ধরেছিলেন এক বিরাট ব্যাপ্তিতে। ধর্ম যেখানে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'—অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, শুদ্ধতা কিংবা ইন্দ্রিয়-দমনের বুদ্ধি—এটা মনু খুব ভালো জানেন এবং সেটা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে পালনীয় বলে মনে করেন—এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যো'ব্রবন্মনুঃ—কিন্তু এর বাইরেও আছে ব্যবহারিক জগৎ, যেখানে পদে পদে ব্যাবহারিক সংকট দেখা দেবে। যথাসম্ভব এই সংকট দূর করার জন্য মনু বিশেষ বিশেষ কিছু ধর্মের কথা বলেছেন এবং গ্রন্থারম্ভেই তার দিক-নির্দেশ করে বলেছেন—এই গ্রন্থে মনু দেশধর্মের কথা বলবেন, জাতিধর্মের কথা বলবেন, কূলধর্মের কথাও বলবেন, এমনকী বলবেন পাষণ্ডদের ধর্ম সম্বন্ধেও।

প্রগতি-পণ্ডিতরা বলবেন—এই তো জাতি-বর্ণের সেই কূপমণ্ডূকতা আরম্ভ হল? আমরা বলব, মনুকে একটু 'বায়াসলেস'ভাবে পড়ার চেষ্টা করবে। পদ-বাক্যের প্রমাণে মনু যেসব কামনাই করেছেন কিংবা মেয়েদের ব্যাপারে তিনি যত কঠোর, সে তো তাঁর আপন সময়ের প্রতিচ্ছবি, সেটা নিয়ে আপনার এত মাথা ঘামানোর দরকার কী? আপনি তো আর মনুর মতে সংসার চালাচ্ছেন না, কিংবা মনুর মতে সমাজ-সংস্কারও করছেন না। কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি যেটা ভাবছেন, তার মধ্যে একটা সামান্য যৌক্তিকতাও আছে। ভারতবর্ষ কোনও কালেই একটা 'ইউনিফায়েড কোড' মেনে চলেনি, জাতি-সমাজের দৃষ্টিতে, দেশের দৃষ্টিতে এখনও চলে না। সেখানে মনু কথিত দেশধর্ম, জাতিধর্ম কিংবা কুলধর্ম সমগ্র সমাজটাকেই কিন্তু ধারণ করে। আমরা একটা ছোট উদাহরণ দিই—দেশধর্মের অনেক উদাহরণ আছে—বঙ্গদেশ থেকে তামিলনাড়ু আলাদা, ওড়িশা থেকে উত্তরপ্রদেশ আলাদা। এ-সব জায়গায় বিয়ে থেকে খাদ্যাভ্যাস সব কিছুই বিপরীত রকম হতে পারে, কাজেই এক দেশে যেটা শুদ্ধাচার বলে গণ্য, অন্য দেশে সেটা চরম অশুদ্ধও হতে পারে।

খুব বড় কিছুর মধ্যে না গিয়ে খাদ্যাভ্যাসের কথা বলি। মনু কিন্তু বুঝেয়েছিলেন—যতই দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মধুর সাত্ত্বিক আহার প্রস্তুত থাকুক, মানুষ মাছ-মাংস খেতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। মনু এই স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—মদ্য-মাংস-মৈথুন —কোনওটাতেই দোষ নেই, তবে কিনা এসব থেকে সরে আসাটাই সবচেয়ে মঙ্গল—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। তবু যত নিবৃত্তির কথাই হোক, মনু থেকে আরম্ভ করে ধর্মশাস্ত্রকারেরা অনেকেই দেবকার্য এবং পিতৃকার্যে অবশিষ্ট মাংস খাওয়াটা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু মাছ খাওয়াটা যেন মনুর একেবারেই পছন্দ নয়। মনুর মতে মাছ সব কিছুর মাংস খায়—জলে ভাসা সমস্ত মৃত পশুর—অতএব মাছ খাচ্ছ মানে সব কিছুর মাংস খাচ্ছ—মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্ মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ। কিন্তু এত অপছন্দ সত্ত্বেও মনু ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই মানুষকে মাছ খেতে দেখেছেন, অতএব মানুষের প্রবৃত্তি দেখে কতকগুলি মাছ যেমন বোয়াল মাছ, রুইমাছ, যেসব মাছের গায়ে ডোরা কাটা দাগ আছে, যেসব মাছের মুখটা সিংহের মতো দেখতে এবং আর সব মাছ, যেগুলির আঁশ আছে—সেগুলি পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে তর্পণের ব্যবস্থা করে সেই মাছের অবশিষ্ট মাছ খেতে বলেছেন।

মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি, শাস্ত্রকার হিসেবে তাঁর মূল্য কিন্তু মনুর চাইতে কম নয়—তিনি মনুর মত পুরো মেনে নিয়ে বোয়াল-রুই ইত্যাদি প্রথম সারির মাছগুলিকে দেবপিতৃকার্যে ব্যবহার করতে বললেও আঁশওয়ালা অন্যান্য মাছগুলিকে সব সময়েই খাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বলব—এই ব্যবস্থাটা কিন্তু অবশ্যই দেশ বুঝে, মানুষ বুঝে। তার মানে ধর্মশাস্ত্রকারেরা কিন্তু 'ডাইনামিক' হচ্ছেন। এবারে বঙ্গদেশের কথায় আসি। নদী-বৃষ্টি-ভরা বঙ্গদেশে মাছের কোনও অভাব ছিল না।

এখানে কিন্তু মনুর মত চলেনি। বঙ্গদেশের প্রথম বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রকার ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণকে ইচ্ছা-অনুসারে মাছ-মাংস খাওয়ার কথা বলে দিলেন কিন্তু বেশি বামনাই দেখাতে গিয়ে পরবর্তীতে শূলপাণি, শ্রীনাথ আচার্যরা আবার মনুর মতে চলে গেলেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় চৈতন্য-মহাপ্রভুর সমসাময়িককালে স্মার্ত-ধুরন্ধর রঘুনন্দন বঙ্গদেশে মাছের উৎপত্তি, আমদানি আর মাছ খাওয়ার অভিলাষ দেখেই বিধান দিয়েছিলেন যে,বঙ্গদেশের বামুনরা শুধু হবিষান্ন ছাড়া সব রকমের মাছ ইচ্ছানুসারে খাবেন। আমরা বলতে চাই—দেশধর্ম কাকে বলে বোঝা গেল? রঘুনন্দনেরও আগে জীমূতবাহন আবার ইলিশ মাছের তেলের কথাও বলেছেন। বঙ্গদেশ ছাড়া কী আর এই মাছের কথাটা স্মার্তের কথায় আসত। রঘুনন্দনকে ধন্যবাদ—তিনি ব্রাহ্মণের পক্ষে সেদ্ধ চাল খাওয়ারও ব্যবস্থা দিয়েছেন হবিষান্ন বাদে। এটাও কেন, আমরা বুঝতে পারি—মাছের ঝোল কিংবা ইলিশ মাছের তেলের সঙ্গে কী আর আতপ চাল চলে!

দেশধর্মে মৎস্যভক্ষণের এমন বিধিতে একটা গল্পকথাও বলতে চাই। শুনেছি, বঙ্গদেশের এক রাজবাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল নাকি উত্তর ভারতে, সেখানে শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা বঙ্গের বধূকে মাছ খেতে দিত না এবং কখনও কখনও তির্যক ভাষায় তার বাপের বাড়ির লোকদের 'মছলিখেকো বাঙালি' বলত। যাই হোক, দুর্ভাগ্যক্রমে এই বাঙালি বউ বিধবা হয়ে ফিরে এল বাপের বাড়িতে। বিধবার এমনিতেই মাছ খেতে নেই, কিন্তু বাপের বাড়ির সবচেয়ে বড় সমস্যা সে তীব্রভাবে মাছ খাওয়াটা দেখছিল, অথচ তার নিজের খাওয়া বন্ধ। মেয়ের শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, অন্য লোকের খাওয়ার সময়ে সে লুকিয়ে ঘরে গিয়ে খায়। বাঙালি রাজার বড় দুঃখ হল,—তিনি নবদ্বীপ থেকে পণ্ডিত আনিয়ে আড়ালে চোখ টিপে বললেন—টাকা যা চান দেব, কিন্তু আপনি আমিষকে নিরামিষ করে দিন, আমার বিধবা মেয়ে মাছ খেতে পারে, আপনি সেই ব্যবস্থা দিন।

পণ্ডিত দু-দিন ভালোমন্দ খেয়ে তৃতীয় দিনে ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলেন—বঙ্গভাষার সংস্কৃতায়ন ঘটিয়ে। লিখলেন—ইল্লিশঃ খল্লিশশ্চৈব রোহিত-চিঙ্গ-পুন্টিকাঃ। দেশধর্মানুসারে পঞ্চ মৎস্যা নিরামিষাঃ। অর্থাৎ ইলিশ, খলশে, রুই, চিংড়ি এবং পুঁটি মাছ দেশধর্মের নিয়মে নিরামিষ মাছ বলে গণ্য হয়। পণ্ডিত ব্যবস্থাপত্রের তলায় দস্তখত করে দিয়ে অর্থ নিয়ে নবদ্বীপ চলে গেলেন। এই কাহিনি শুনে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন—শালা বামুনগুলোও সেইরকম। মাল পেল আর ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেল। আমি বললাম—টাকা নিক, আর যাই করুক—বামুনগুলো তো 'ডাইনামিক'ও বটে। আর ইনি না হয় অর্থ নিয়েছেন বুঝলাম—ভবদেব ভট্ট থেকে রঘুনন্দন তারা শূদ্র-অন্ত্যজদের মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে তো কোনও বাধাই দেননি, বরঞ্চ খাদ্যলোলুপ বামুনদের পাতেও সেদ্ধ চালের সঙ্গে মাছের ঝোল এবং রান্না করা পাকা মাংসের ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। রঘুনন্দন তো আর রাজবাড়ির টাকা খেয়ে ব্যবস্থা দেননি, বরঞ্চ

বলব—তিনি 'সোসিও-ইকনমিস্ট'-এর কাজ করেছেন। আমাদের এই নবদ্বীপের পণ্ডিতমশাইও তাই। বন্ধুকে বললাম, গল্পটা শেষ হয়নি। রাজবাড়ির বিধবা মেয়ে দেখল—ইলিশ, খলশে, চিংড়ি, পুঁটি যখন জুটে গেল, তখন চিতল-ভেটকি কিংবা কই-মাগুর বাদ যাবে কেন! সে বাপের কাছে বায়না ধরতেই আবার নবদ্বীপের সেই পণ্ডিত এলেন রাজবাড়িতে। তিনি পূর্বে লিখিত মাছগুলির সঙ্গে তৃতীয় পঙ্‌ক্তি যোগ করে বললেন---বেগুন দিয়ে রান্না করলে সব মাছই নিরামিষ হয়ে যায়—বার্তাকু-সহযোগেন সর্বে মৎস্যাঃ নিরামিষাঃ।

আমি নিশ্চয় বলব—এই রাজবাড়ি নির্ঘাত কোনও বাঙাল জমিদারি হয়ে থাকবে, কেননা টাঙ্গাইল, বরিশাল কিংবা ময়মনসিংহে মাছের প্রাচুর্য এত ছিল যে, আমাদের মা-ঠাকুমারা এক কড়াই মাছের ঝোলে দুই-তিন খণ্ড বেগুন দিয়ে দিতেন। সেই সব মা-ঠাকুমারা সকলেই স্বর্গত হওয়ায় বলতে পারব না যে, এই বেগুন সংযোগের ঘটনাটা কোনও বিধবার ব্যবস্থা কিনা। কিন্তু সর্বশেষ কথা—দেশধর্ম কিন্তু এতটাই প্রতিবিশিষ্ট হতে পারে এবং সেটা ধর্ম বটে। ঠিক কুলধর্মও এইরকম প্রতিবিশিষ্ট হতে পারে—মহাভারতের ভীষ্ম যখন ভাইপো পাণ্ডুর জন্য মদ্রদেশে মেয়ে খুঁজতে গেলেন, তখন মাদ্রীর ভাই শল্য একটু লজ্জিত হয়েই বললেন—আমাদের বংশে কুলধর্মের একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা এই যে, আমাদের ঘরের মেয়ে নিতে গেলে কিছু সোনাদানা অর্থ-সম্পত্তি মেয়েকে দিয়ে তবেই মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে বর। আমি নাচার, আপনার প্রতি সম্মানবশত একথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে বটে, তবে খারাপ হোক ভালো হোক, আমি কুলধর্ম অতিক্রম করতে পারব না—কুলধর্ম স নো বীর প্রমাণং পরমঞ্চ তৎ। ভীষ্ম-পিতামহ এর উত্তর দিয়ে বলেছেন—না, না, সে কী কথা! আপনার পূর্বজ পিতামহরা এই নিয়ম চালু করে গেছেন, আপনি সেই পরম্পরার বাহক, আমাকে তো সেটা মানতেই হবে। আপনার কোনও দোষ নেই এতে, এটা বৈদিক নিয়মই বটে—ধর্ম এষ পরো রাজন্ স্বয়মুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।

আসলে আসুর-বিবাহে মেয়ের বাবাকে টাকা পয়সা, সোনাদানা দিতে হয়, মেয়েকে স্ত্রী-ধন দিতে হয়, তারপর মেয়েটিকে বিয়ে করা যায়। মদ্রদেশের রাজপরিবার সেটাকে কুলধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং ভীষ্মও সেই কুলধর্মের মর্যাদা দিচ্ছেন। আমরা মনে করি, দেশধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম—এগুলো অনেকটাই 'কাস্টম'-এর মধ্যে পড়ে এবং আজকের ভাষাতেও যেহেতু 'কাস্টমস্ হ্যাভ দ্য ফোর্স অব্ ল' কাজেই সেগুলি মূল্যহীন নয়, বিশেষত বিয়ে-শাদিতে মেয়ের বাড়িতে আর বরের বাড়িতে 'আমাদের এই নিয়ম, আমাদের সেই নিয়ম' এই সব বাদ এবং অনুবাদ ধর্মের দৃষ্টিতে দেখা হয়। আমরা এত বিস্তারে আর যাব না, কিন্তু দেশধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, পাষণ্ড-ধর্ম, ম্লেচ্ছধর্ম—এইরকম সব কিছুর ওপরেই যদি একটা ধর্মের 'সিল' দিয়ে রাখা হয়, তবে কিন্তু সোস্যাল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, এমনকী 'রিলিজিওসিটি'র

ভাবনাগুলিও সেখানে ধরা হয়ে যায়—মনু কিন্তু তাঁর সময়ে সেটাই করতে চেয়েছেন। চুলচেরা বিচারে এটাই কিন্তু আবার বলতে হবে যে, এই দেশধর্ম, জাতিধর্ম অবশ্যই 'মর‍্যালিটি' কিংবা 'এথিকস্'-এর জায়গা নয়, কিন্তু এগুলিও সদাচার—মনু-মহাভারত যেটাকে ধর্মসংকটে অন্যতম প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছেন। আর এগুলি যে সদাচারই বটে, এ সোমেশ্বর ভট্ট মীমাংসাদর্শনের টীকায় 'যস্মিন দেশে য আচারঃ...স সদাচার উচ্যতে'—এই শ্লোক উল্লেখ করে দেশধর্ম, কুলধর্মেরও ধর্মত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

প্রশ্ন কিন্তু তবু থেকেই যাবে, কেননা 'মর‍্যালিটি'-'এথিকস্' ইত্যাদির মধ্যে যে ধর্মের উপজীবন আছে, সেটা অনেকটাই কিন্তু মানুষের মানসিক পরিসর এবং সেই মনটা গড়ে ওঠে নিজের 'ইনস্টিংকট' থেকে এবং তারপর অনন্ত পরিশীলনের মাধ্যমে। এটা তো ঘটনাই যে, পাপ-পূণ্য সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা সহজাত বোধ আছে। কুমারিল ভট্ট তাঁর শ্লোকবার্তিক গ্রন্থে ব্যাসের লেখা একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—এটা ভালো কাজ আর ওটা মন্দ কাজ—এই দুটো ব্যাপারে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত একটা স্বাভাবিক সহজ বোধ আছে, সেটা বোঝার জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না—আচণ্ডালং মনুষ্যাণাম্ অল্পং শাস্ত্রপ্রয়োজনম্। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস—যে লোকটা চুরি করতে যাচ্ছে, সে নিজেও জানে—সে ভালো কাজ করতে যাচ্ছে না, যার জন্য রাতের অন্ধকার বা মানুষের অসাবধানতাকে আশ্রয় করতে হচ্ছে তাকে। আবার যে লোকটা 'অ্যাকসিডেন্ট' হওয়া একটা আতুর মানুষকে রাস্তা থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, সে তার আত্মসম্বন্ধেই জানে যে, সে দারুণ ভালো কাজ করছে—অর্থাৎ এই অবস্থায় তাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে গেলে যে ভালোটা তার লাগার কথা, সে ভালোটা সে আত্মসম্বন্ধে 'ইনস্টিংক্টিভ্লি' বুঝতে পারে। তার জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জীবনের বাস্তব, বাস্তব পরিবেশের মধ্যে এমন সব জটিল, জটিলতর সংকট তৈরি হয়, অপিচ নিজের ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্য কখনও কখনও এমন মোহগ্রস্ত করে মানুষকে যে, তখন তাকে তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে হয়, তার পিছনে থাকে ভালো থাকার বা ভালো হওয়ার পরিশীলন।

রামায়ণ মহাকাব্য বলেছিল—এত সব বড় বড় ধর্মশাস্ত্র থাকতেও দুর্বুদ্ধি লোকেরা তবু তর্ক করে যাবে এবং শাস্ত্রগুলিকেও যেন তারা নিরর্থক করে তোলে—ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ। আমরা বলব—মহাভারত এটা মানেনি, তর্কযুক্তির অবতারণা এখানে সব সময় হয়েছে এবং হয়েছে বলেই শাস্ত্রবুদ্ধিতে মাঝে মাঝে বোকা বনে যেতে হয়েছে মহাভারতের প্রবাদ-প্রতিম নায়ককেও। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মামলা। দ্রৌপদী একেবারে সঠিক বুঝেছিলেন যে, তর্কযুক্তি ঠিক থাকলে তাঁকে সভায় নিয়ে যাওয়া চলে না। হেঁকে বলে দিয়েছিলেন দুর্যোধনের দূতকে এবং সেটা তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, তুমি গিয়ে সেই জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা করো যে, পাশাখেলার সময় সে নিজেকে পণ

রেখে আগে নিজেকে হেরেছে এবং তারপর আমাকে পণ রেখেছে? নাকি, আমাকে পণ রেখে হারার পর নিজেকে পণ রেখে হেরেছে—কিন্নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানম্ অথবানু মাম্।

দুর্যোধনের মতো অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তিও কিন্তু কথাটার সোজা উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন—অ্যায়! ওসব বড় বড় কথা ছাড়। ওকে নিজে এসে সভায় এই প্রশ্ন করতে বল্। দ্রৌপদী আবার দূতকে একই কথা বলেছেন সবিস্তারে। দূতও সেটা সভায় গিয়ে বলেছে, কিন্তু রাজসভার এত গণ্যিমান্যি সভ্যেরাও দ্রৌপদীর প্রশ্নখানার উত্তর কিন্তু দিচ্ছেন না। আগে দুর্যোধনও দেননি, কেননা তিনি মনে মনে আপন জন্মান্তরীয় সংস্কারেও জানেন যে, এই জয়টার মধ্যে ন্যায় নেই, কেননা যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রেখে হেরে যাবার পর শকুনিই তাঁকে দ্রৌপদীর কথা মনে করিয়ে দেন এবং তাঁকে পণ রেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে বলেন। যুধিষ্ঠির এই ফাঁদে পা দিয়েছেন, দ্রৌপদীকে হেরেছেন, কিন্তু সেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যাপারে আর কেউ রা কাড়েনি। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে যুধিষ্ঠির কিন্তু এটাই ভেবে বসলেন যে, তিনি নিজেকেও হেরে গেছেন। অন্যদিকে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তরে রাজসভার সভ্যেরা সত্য জেনেও কেউ উত্তর দিলেন না, কেননা দুর্যোধনের মতো 'পাওয়ারফুল' লোক এই প্রশ্নের ন্যায়সংগত উত্তর চাইছেন না—অধোমুখাস্তে ন চ কিঞ্চিদূচু-নির্বন্ধং তং ধার্তরাষ্ট্রস্য জ্ঞাত্বা।

আপনারা জানেন যে, দ্রৌপদীকে জোর করেই সভায় ডেকে আনা হয়েছিল, তাঁকে চরম অপমানও করা হয়েছিল। দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ চরম প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তাতে কোনও ফল হয়নি। দ্রৌপদী স্বয়ং সভায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কুরু-পিতামহকে তাঁর প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম এও হয়, সেও হয় বলে উত্তর এড়িয়ে গেছেন, তিনি সদুত্তর দেননি এবং সেটা হয়তো এই ভয়েই যে, দুর্যোধন তাঁকে রাজসভার মধ্যেই চরম অপমান করবেন। কিন্তু অপমানিত হবেন জেনেও যিনি দ্রৌপদীর হয়ে সওয়াল করলেন, তিনি বিদুর। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, কখনও কখনও রাজশক্তি, 'পলিটিক্যাল পাওয়ার' প্রকৃত সত্য এবং ধর্মের গলা টিপে মারে। তিনি বলেছিলেন, এই যে সভ্য মানুষেরা সব! ধর্মকে আপনারা কিন্তু পিষে মারছেন—সভ্যাঃ ধর্মো' ত্র পীড্যতে। মহামতি ভীষ্ম তা-না-না-না করে শেষ পর্যন্ত এটাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই জগতে এমনটা হয়, কখনও যখন প্রবল তথা বলবত্তর লোক যেটাকে ধর্ম বলে, ধর্মবিচারের সময় সেটাই ধর্ম বলে চিহ্নিত হয়, আর দুর্বল লোক যেটাকে ধর্ম বলছে, সেটাকে ধর্ম বলে মানাই হয় না—বলবাংশ্চ যথা ধর্মং লোকে পশ্যতি পূরুষঃ।

বস্তুত এটাও একটা ধর্মসংকট—বলবত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী একটা অন্যায়কেও ন্যায় বলে বলছে। এই বস্তুটা মহাভারতে দ্রৌপদীর উদাহরণে খুব জটিল তর্কে বোঝা যায়, কিন্তু সহজভাবে বোঝা যায় রামচন্দ্রের উদাহরণে। রামচন্দ্র সর্বক্ষেত্রে

অতিমহান হয়েও শুধু দুটি কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি কোনও জনসমর্থন পাননি এবং ধর্মও সেখানে চরম সংকটে পড়েছে। সীতা-পরিত্যাগের ঘটনায় আমরা যাচ্ছি না, কিন্তু বন্ধু সুগ্রীবের জন্য রামচন্দ্র যেভাবে আড়াল থেকে বালির অনবধানতায় এবং অলক্ষ্যে তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেন, তখন প্রতিহত, আহত ব্যক্তির ধর্মযুক্তি বলবত্তরের রাজকীয় অন্যায়ে ভেসে গেছে। রামচন্দ্রের বাণে ভূলুণ্ঠিত বালি বাণাহত অবস্থাতেই রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, আমি তো অন্য একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম এবং আমার পিছন দিকে তুমি কোথায় লুকিয়ে ছিলে, আমি তা দেখিইনি, অথচ আমাকে তুমি মেরে দিলে, এমন করে আমাকে মারার ফলে তোমার কোন গুণটা লাভ হল—পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা কো'ত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।

বালি রামচন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রুত অজস্র গুণের কথা বললেন, বললেন রাজাদের স্বাভাবিক সব গুণের কথাও—শম, দম, ধৈর্য, ধর্ম, বল-বিক্রম এবং প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ইত্যাদি। পরিশেষে বালির বক্তব্য, এখন তো বুঝতে পারছি—তুমি নিতান্ত অধার্মিক, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মতো, ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির মতো—তুমি ধার্মিকের ভান করে গোপনে অন্যায় করছ—স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজম্ অধার্মিকম্। তাছাড়া আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি—তোমার রাজ্যে বা নগরেও আমি কোনও পাপ কাজ করিনি, তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতেও যাইনি, অথচ বিনা দোষে তুমি আমাকেই মারলে। আমরা বনের মধ্যে থাকি, ফলমূল খাই, তোমার সঙ্গে আমার তো বিরোধও কিছু ছিল না, তাহলে আমাকে এইভাবে মারলে কেন? এমন তো নয় যে, আমাদের এই বনস্থলী, আমাদের ফলমূল, এ-সব জিনিসের ওপর তুমি রাজকীয় অধিকার চাও, সেই জন্য তুমি আমাকে মেরেছ, কিন্তু তা তো নয়। এমন তো নয় যে, আমাদের উর্বরা ভূমি, সোনা, রুপো এগুলোর জন্য তুমি আমাকে আক্রমণ করেছ, কিন্তু আমাদের ভূমি তো উর্বরা নয়, সোনা-রুপোও কিছুই নেই আমাদের, তবে কেন? কেন এমন করে মেরে ফেলা? বয়ং বনচরা রাম মৃগাঃ মূলফলাশিনঃ।

বালি এবার আর্যধর্মের রাজবৃত্ত শুনিয়ে রামচন্দ্রকে বললেন—রাজধর্ম তো এমন সংকীর্ণ নয়, ক্ষত্রিয় রাজার কতগুলি ধর্মবদ্ধ নিয়ম-নীতি আছে। তাঁরা নীতির জায়গায় অনীতি প্রয়োগ করেন না, কিংবা অনুগ্রহের জায়গায় নিগ্রহ করেন না। তুমি তো ক্ষত্রিয়ের ধর্মে আস্থাহীন, স্বেচ্ছাচারী, কোপন-স্বভাব এবং অনবস্থিতচিত্ত—ত্বন্তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবস্থিতঃ। তুমি নিতান্ত দুর্বোধের মতো এমনও বলতে পারো না যে, আমার মাংস খাওয়ার জন্য তুমি এই কাজ করেছ। কেননা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা পাঁচ রকমের বন্য পশুর মাংস খায়—খরগোশ, গন্ডার, সজারু, গোসাপ আর কচ্ছপ; বানরের মাংস কেউ খায় না, বানরের হাড়-চামড়া-লোমও কোনও ভদ্রলোকে স্পর্শ করে না, সেখানে কোন যুক্তিতে তুমি আমাকে মারলে—অভক্ষ্যানি চ মাংসানি সো'হং পঞ্চনখো হতঃ। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—তোমার স্বভাব অত্যন্ত ক্ষুদ্র,

তুমি শঠ, ছলনা করে প্রতারকের মতো তুমি আমাকে মেরেছ। তোমার মতো পাপী একটা ছেলেকে রাজা দশরথ জন্ম দিয়েছেন কী করে, সেটাই ভাবার বিষয়—কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা।

রামচন্দ্র বালির অভিযোগগুলির জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু রামায়ণের অন্যত্র অনেক ধর্মসার বুদ্ধির কথা শোনা গেলেও এক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত উত্তর ছিল বোকা-বোকা এবং সবচেয়ে বড় কথা—সুগ্রীবের জন্য বালিকে পিছন থেকে মারার কোনও যুক্তি তিনি দেননি, কেননা সুগ্রীবকে বাঁচানোটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। আর যে যুক্তিটি তিনি বড় করে দিয়েছেন, সেখানে শাসক ক্ষত্রিয়ের বলবত্তার অধিক্ষেপটাই বড় হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি চপল বানর, তুমি আমার মতো ভদ্রলোককে নীতিশিক্ষে দিচ্ছ—সৌম্যং বানরচাপল্যাত্ ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি! তুমি কি জানো হে বানর! যে, এই পর্বত, বন, কাননের সঙ্গে সমগ্র এই পৃথিবীই আমাদের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের অধিকার-ভুক্ত—ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈলবনকাননা। অতএব এখানকার মৃগ-পক্ষী-মানুষ—কার ওপরে তাঁরা অনুগ্রহ করবেন, কিংবা কাকে তাঁরা নিগ্রহ করবেন, এটা তাঁদের ব্যাপার।

এত বড় কথাটা রামচন্দ্র কী করে বললেন জানি না। অযোধ্যাপতি দশরথের রাজত্ব কোনওভাবেই কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না এবং বানররাজ বালিও এই রাজ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেছেন এতদিন। বরঞ্চ জনস্থানে খর-দূষণের তত্ত্বাবধানে রাক্ষসরাজ রাবণের একটা অরণ্যবসতি থেকে থাকবে, কিন্তু ইক্ষ্বাকুদের রাজ্য এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকলে রামচন্দ্র আর কীসের বনবাসে গিয়েছিলেন, তিনি তো তাহলে রাজ্যেই বসবাস করেছিলেন। আমরা জানি যে, অনেক বিষয়েই বিরাট পুরুষ, সমগ্র সমাজের তিনি অনুকরণীয় আদর্শভূমি। কিন্তু বালির পরিপ্রশ্নের সম্মুখে পড়ে এ তাঁর কেমন প্রসঙ্গহীন গা-জোয়ারি কথা বেরিয়ে আসছে। রামচন্দ্র বললেন, আমার ভাই ভরত এখন এই পৃথিবীর রাজা—তাঁর মধ্যে সত্য, ধর্ম, প্রজাপালনের গুণ এবং দণ্ডদানের ক্ষমতা সবই বর্তমান। আমরা তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই ধর্মনির্দেশ প্রচার করে যাচ্ছি; যেখানে আমরা অন্যায়-অধর্ম দেখব, সেখানেই দণ্ডবিধানের চিন্তা করব—ভরতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিন্তয়ামো যথাবিধি।

কোথা থেকে, কার আজ্ঞায় রামচন্দ্র ভরতের আজ্ঞা-নির্দেশ পালক করছেন, তার যৌক্তিকতা আমরা জানি না। কিন্তু বালির দোষ কী? না রামচন্দ্র বলছেন—তুমি অধার্মিক, তুমি বড় দাদা পিতার সমান হয়ে ছোট ভাই সুগ্রীবের স্ত্রী, তোমার পুত্রবধূর সমান রুমাকে ভোগ করে যাচ্ছ—রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ। ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে যে এইসব অন্যায় অধর্ম করে—ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্—তাকে আমরা ছাড়ি না। এই অপরাধেই তোমাকে বধদণ্ড দিয়েছি। ভরত এই পৃথিবীর রাজা, আমরা তাঁর আদেশ পালন করে যাচ্ছি; তুমি এমন একটা অধর্মের কাজ করেছ, তাতে তোমাকে

এই শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল আমাদের—ভ্রাতৃভার্যাভিমর্ষেঽস্মিন্ দণ্ডো'য়ং প্রতিপালিতঃ।

রামচন্দ্রের এই উক্তি নিরপেক্ষজনের ধোপে টিকবে না। যুক্তিবাদীদের মতে বালি যে দোষ করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বড় দোষ করেছিলেন তাঁর বন্ধু সুগ্রীব। তিনি বড় দাদা বালির সাময়িক এবং সামরিক অনুপস্থিতিতে মাতৃ-সমান জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ তারাকে উপভোগ করেছিলেন এবং এই এত বড় খবরটা তিনি রামচন্দ্রের কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছেন, আর রাজধর্মের নিয়মে এই সত্য রামচন্দ্রের অনুসন্ধান-যোগ্য ছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি একপক্ষের কথা শুনেই বালির ওপর দণ্ডপাত করলেন এবং তা করলেন কোন দূরে অবস্থিত অযোধ্যাপতি ভরতের অলিখিত এবং অকথিত নির্দেশের অজুহাতে। আমরা বলতে চাইছিলাম—কখনও কখনও এমনও হয় যে, বলবত্তর পুরুষ গায়ের জোরে যেটাকে ধর্ম বলে উপস্থাপন করেন, সেটাকেই ধর্ম বলে মানতে হয়—যেমনটা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে হয়েছিল—যেখানে ধর্মের সমস্ত সূক্ষ্ম গতি বিদুর বুঝে থাকলেও, বিকর্ণ বুঝে থাকলেও ভীষ্ম বোঝেননি। কিংবা বুঝেও বলতে পারেননি।

পাঁচ

এটা বরঞ্চ এখানে স্বীকার করা ভালো যে, আমাদের ধর্ম অথবা আমাদের ভারতবর্ষের নীতি-নিয়ম-সভ্যতা এমন একটা মানসিক ভালো-মন্দ-বিচারে তৈরি হয়েছিল, যেখানে যুক্তিটাও বেশির ভাগ সময়েই যতখানি বুদ্ধিগ্রাহ্য, ঠিক ততটাই হৃদয়গ্রাহ্য। পাশ্চাত্যের দর্শনে যে নীতি-নিয়ম-মর্য্যালিটি, সেখানে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ভয়ের ব্যাপার আছে—অর্থাৎ এটা কর্তব্য এবং এটা না করলে দোষ হবে, অন্যায় হবে—এইরকম একটা মানসিক ভীতি কাজ করে—বার্ট্রান্ড রাসেল এটাকে বলেছিলেন rational fear. রামচন্দ্র যেভাবে যে-কারণে বালিকে শাস্তি দিলেন, এইরকম ক্ষেত্রগুলিকে 'মর্য্যালিটি'র প্রসারিত বৃহৎক্ষেত্র বলেই রাসেল বলেছিলেন—'মরালিটি' ব্যাপারটা অন্য সব কিছুর থেকেও 'সেক্স'-এর সঙ্গে বেশি জড়িত—more concerned with sex than any other topic. রাসেল বাইবেল থেকে একটা বিশ্ববিখ্যাত উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—এটা তো একটা চিরন্তন সত্য যে, বাইবেল বলেছে—Thou shalt love thy neighbour as thyself—তা এই ভালোবাসাটা যদি পুরুষ-রমণী নির্বিশেষে একটা সর্বজনীন প্রয়াস হয়, তবে অবশ্যই সেটা পরম কল্যাণের কারণ হয়ে উঠবে। কিন্তু 'মর্য্যালিটি'র সঙ্গে ভয় এবং হিংসার একটা সম্বন্ধ আছেই। তিনি sexual morality-র উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—একজন লোক যদি অবিবাহিতা কোনও রমণীর সঙ্গ কামনা করে এবং সেক্ষেত্রে যদি তার বাপ-ঠাকুরদাও বেশ বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হন, তবে সাময়িক একটু নিন্দেমন্দ হলেও সে-লোকের কোনও বিপদ ঘটে না। কিন্তু ঘটনাটা

যদি পরস্ত্রীগমনের অর্থাৎ adultery-র 'কেস' হয়, তবে সেখানে স্বামী বা স্বামীপক্ষীয় লোকদের মনে এক ধরনের 'জিলাসি' তৈরি হয় বিশদর্থে, তাতে অন্যদিকে পরস্ত্রীগামী পুরুষের একটা ভয় তৈরি হতে বাধ্য, কেননা এই 'ইম্‌ম্র্যাল' কাজের জন্য দণ্ড নেমে আসবে অন্য পক্ষ থেকে, তাতে হত্যাকাণ্ডও ঘটে যেতে পারে। অতঃপর রসিক রাসেল-এর বক্তব্য—Since murder and adultery are alike dangers, the moral law enjoins that your must love your neighbour, but not your neighbour's wife.

সত্যি বলতে কী, আমাদের নীতি-নৈতিকতা-ধর্মবোধ কোনও ভয়-ভীতি বা পাপের ফলে সম্ভাব্য বিপদবোধ থেকে তৈরি হয়নি, বরঞ্চ তা তৈরি হয়েছে ছোট ছোট সম্পর্ক, আচার এবং সার্বিক মঙ্গলের জন্য। দুর্যোধন-কর্ণরা একবার অরণ্যচারী ভিক্ষাজীবী পাণ্ডবদের কাছে নিজেদের ঐশ্বর্য প্রকট করার জন্য স্ত্রীদের প্রচুর গয়নাগাটি পরিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের অরণ্য আবাসে। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হয়ে গেল। অর্জুনের বন্ধুকল্প গন্ধর্ব চিত্রসেন দুর্যোধনের স্ত্রীসহ বন্দি করে নিলেন। খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুন-ভীমকে পাঠালেন দুর্যোধনকে মুক্ত করার জন্য। অত্যন্ত ক্রোধী ভীম অবশ্য বলেছিলেন—যা হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা যা করতে চাইছিলাম, তা গন্ধর্বরাই করে দিয়েছে। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—এমনটা চলে না, এমনটা করতে হয় না ভীম! কুলধর্ম বলে একটা কথা আছে—আমি, তুমি, দুর্যোধনেরা একই ভরতবংশে জন্মেছি। আমাদের নিজেদের মধ্যে নানান বিবাদ থাকতে পারে, জ্ঞাতিতে-জ্ঞাতিতে ভেদ-বিবাদ তো হয়ই—ভবন্তি ভেদাঃ জ্ঞাতীনাং কলহাশ্চ বৃকোদর—কিন্তু বাইরের লোক এসে আমাদের বংশের ওপর হামলা করছে, আমাদের সঙ্গে যত বিবাদই থাকুক, আমাদের আপন জ্যাঠতুতো ভাই দুর্যোধনকে তুলে নিয়ে চলে গেল, আমাদের ঘরের কুলবধূদের বাইরের লোক এসে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে—এতে আমাদের বংশের সম্মানটাই তো শেষ হয়ে গেল—স্ত্রীণাং বাহ্যাভিমর্শাত্তু হতং ভবতি নঃ কুলম্।

যুধিষ্ঠির যে এইভাবে শত্রুকল্প জ্ঞাতিরও মঙ্গল বিধান করতে চাইছেন, এখানে কিন্তু কোনও ভয়-ভীতির প্রশ্ন নেই। দুর্যোধনকে এবং স্ত্রীদের গন্ধর্ব-কবল থেকে মুক্ত না করলে যুধিষ্ঠিরকে কেউ কিছু বলত না, কোনও দোষও তাঁকে দিত না, বিশেষত দুর্যোধনই যেহেতু কপট পাশা খেলে বনে পাঠিয়েছেন এবং এই নির্জন অরণ্য-আবাসে তিনি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে এসে নিজেই দোষী হয়ে আছেন জনমনে। কিন্তু যুধিষ্ঠির এখানে কুলধর্মের কথা বলেছেন। মাদ্রীর ভাই কুলধর্ম বলে যে কন্যাপনের কথা বলেছিলেন, সেটা আচার, কুলাচার। আর যুধিষ্ঠির যেটা বলছেন সেটা কুলধর্ম—যে ধর্মটা অভিনব এক মঙ্গলের অনুসন্ধান করে নীতি হয়ে উঠছে। শোনা যায়, এই প্রসঙ্গেই যুধিষ্ঠির ভাইদের উদ্দেশে বলেছিলেন—দ্যাখো, জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে যদি আমাদের বিবাদ হয়, তখন ওরা একশোজন, আর আমরা পাঁচজন, কিন্তু অন্য বাইরের লোকের

সঙ্গে যদি বিবাদ হয়, তখন কিন্তু আমাদের এক পক্ষেই একশোজনের সঙ্গে আরও পাঁচজন অর্থাৎ একশো পাঁচজন—অন্যৈঃ সহ বিবাদে তু শতপঞ্চোত্তরা বয়ম্।

এই যে বাহ্য বিপদের সামনে ভাইরা সকলে মিলে একত্তর হয়ে যাওয়া—এটা এমন এক বৃহত্তর নীতিবোধের মানস থেকে সৃষ্ট হয়, যেটাকে ধর্ম বলে স্বীকার করতে হয় এবং সেই ধর্ম নিরন্তর মানসিক পরিশীলনের মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত হতে-হতেই সামগ্রিক মঙ্গলের ভূমিকা তৈরি করে—যেটাকে মনু বলেছেন—উই যেমন একটু একটু করে মাটি তুলে বহুদিন ধরে একটা ঢিবি তৈরি করে, ঠিক সেইভাবেই নৈতিকতাবোধে ধর্মকে মনের মধ্যে তৈরি করতে হয় এবং সেখানে সবচেয়ে বড় কথাটা হল—কারও যেন উৎপীড়ন তৈরি না হয়—ধর্মং শনৈ সঞ্চিনুয়াদ্ বল্মীকমিব মৃত্তিকাঃ। কিন্তু উৎপীড়ন না করা কিংবা কোনও হিংসা না করার মধ্যে যে ধর্ম সেটা সর্বদা অনুশীলনযোগ্য হলেও বাস্তব জীবন সেভাবে চলে না, রাজধর্ম তো চলেই না। আর ঠিক সেইখানেই ধর্মসংকট তৈরি হয়।

আপনাদের মনে থাকবে নিশ্চয় যে, যুধিষ্ঠির এইরকম একটা ধর্ম-ভাবনার পরিশীলনের মধ্যে দিয়েই বড় হয়েছিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারটা তিনি কোনওকালেই পছন্দ করেননি এবং অনিবার্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তিনি আরও দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন—আমি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকে ধিক্কার দিই, যেখানে এইভাবে মানুষকে মারতে হয়। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ মুনিদের মতো নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন বনে বনে পর্যটন করতে। নিশ্চয়ই 'আনৃশংস্য' ভাবিত যুধিষ্ঠিরের মনে এখানে আবেগ কাজ করেছে কেননা রাজধর্মে প্রজাকল্যাণের ক্ষেত্রে বলবত্তর অহংকারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচরিতা কখনও কখনও এমন চরম জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে আপাতদৃষ্ট হিংসাই কিন্তু নৈতিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এমন ঘটনা যুধিষ্ঠিরের জীবনেই ঘটেছে, যখন তিনি প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। হয়তো বা প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা যুদ্ধই এখানে ধর্ম, যদিও এক্কেবারে মূল জায়গায় একজন রাজার রাজ্য জয়ের ইচ্ছা এবং অন্যায়ী রাজার স্বেচ্ছাচার-দমনের ইচ্ছেটাও এখানে ক্রোধের মনস্তত্ত্ব উজ্জীবিত করে, কিন্তু এই ক্রোধ লেজিটিমেট্ বলেই গণ্য হয়ে ওঠে।

আমি এই মুহূর্তে আমার সহৃদয় পাঠককে মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে নিয়ে যেতে চাই। বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস-পর্ব শেষ করে যুধিষ্ঠির তখন বিরাট-রাজার রাজ্যে বসে পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বড়সড় মিটিং করেছেন। দ্রুপদ-রাজার দূত হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনদের কাছে রাজ্যভাগ চেয়ে কথা বলে এসেছেন পাণ্ডবদের জন্য। দুর্যোধন কর্ণরা সে-কথায় কর্ণপাত করেননি। নিরুপায় যুধিষ্ঠির মিত্রভাবাপন্ন রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আরম্ভ করেছেন। ঠিক এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সকৌশলে মহামতি সঞ্জয়কে দূত করে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে। দূত প্রভুর কথা যথাযথভাবে নিবেদন করবেন, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রভু মুখে খুব শান্তিরক্ষার

বার্তা দিয়েছেন কিন্তু পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে একটাও কথা বলছেন না। এতে যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদে। তাঁর মুখেও ভাবী যুদ্ধের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে, কেননা ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা কপট-পাশায় জিতে যাওয়া রাজ্যখণ্ড ফেরাতে চাইছেন না পাণ্ডবদের।

এই প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের ব-কলমে সঞ্জয় বলছেন যুধিষ্ঠিরকে—তোমরা যদি রাজ্যের জন্য চিরস্থায়ী এক বিদ্বেষ মনের মধ্যে পুষেই রেখে থাক, তবে সে বিদ্বেষ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে—এটা তো জানাই ছিল। তাহলে এতদিন বনবাসের দুঃখটাই বা ভোগ করলে কেন? আর সেটা যখন করলে, তখন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে সরে আসাটাই তোমাদের ধর্ম। তোমরা বরং বনেই থেকে যাও—নিবসধ্বং বর্ষপূগং বনেষু/দুঃখং বাসং পাণ্ডবা ধর্ম এব। সঞ্জয়ের বক্তব্য—যুদ্ধই যদি করবে, তো সেই পাশাখেলার পরপরই করতে পারতে। তোমার সহায়-সম্পদ রাজনৈতিক মিত্র যাঁরা, তাঁরা এখন যেমন আছেন, তখনও তো তাঁরাই ছিলেন। তো, তুমি তো তখনই কৃষ্ণ-সাত্যকি, দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে দুর্যোধন-দুঃশাসনদের গুঁড়িয়ে দিতে পারতে। তাহলে এখন কী হল? এখন কেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসছে? আমি তো বলব, রাজ্য ফিরিয়ে না দেওয়ায় তোমার ক্রোধ যতটুকু হচ্ছে, তুমি সেটা একেবারে ঢক্ করে গিলে ফ্যালো যুধিষ্ঠির—মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য। সঞ্জয় এবার একটু জ্ঞান দিলেন নিজে থেকেই, মহামতি যুধিষ্ঠিরকে এই জ্ঞান দেবার প্রয়োজন ছিল না, তবু দিচ্ছেন। সঞ্জয় বললেন—দ্যাখো, ক্রোধ জিনিসটা মোটে ভালো নয়, বিনা ব্যাধিতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, স্বাদেও বড়ই কটু, মাঝে মাঝে মাথা ধরবে অকারণে, আর তাতে পাপ তো নেমে আসবেই। আমি বলব—ক্রোধ বস্তুটা এমন একটা পানীয়, যা একমাত্র সৎ লোকেরাই পান করতে পারেন, অর্থাৎ যাঁর 'অ্যাব্‌সর্ব্' করার ক্ষমতা আছে, দুর্জনের সে ক্ষমতা নেই, অথচ তারাই ক্রোধ করে, তুমি এই ক্রোধ একেবারে গিলে ফ্যালো, যুধিষ্ঠির—সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো/মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য।

মনে রাখতে হবে, সঞ্জয় দূত হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রেব বক্তব্য পেশ করছেন, কিন্তু আমরা জানি—ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি নিজেই সমর্থন করেন না। আমি রাজ্যও ফিরিয়ে দেব না, অথচ বলব যুদ্ধ কোরো না—এই দ্বিচারিতা সঞ্জয় নিজেই সহ্য করতে পারেননি, অথচ তাঁর পক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসেবে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধের উসকানি দেওয়াও সম্ভব নয়। ফলে এই বক্তব্যটা দারুণ—ক্রোধ করাটা তাঁরই সাজে, যিনি সেটা হজম করতে পারেন—ক্রোধটা সৎ মানুষের পানীয়, দুর্জনের নয়—সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো—আমরা বলব—যুধিষ্ঠিরের একটা নামই অজাতশত্রু, চিরকাল তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে, হিংসার বিপক্ষে কথা বলেছেন, অতএব চরম জায়গায় চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরই ক্রোধ করাটা সাজে।

কথাটার একটা দার্শনিক ইঙ্গিত আছে। যিনি সৎ মানুষ, যাঁর প্রজ্ঞা স্থির—one who has complete control over the senses and sensuality—তিনি এই ক্রোধকে হজম করতে পারেন—এই কথাটা সোজাসুজি না বলে—তিনিই শুধু ক্রোধ করার যোগ্য—সতাং পেয়ম্—এ কথা বললে এটাই বোঝায় যে, যাঁর মধ্যে বা যাঁদের মধ্যে তৃষ্ণা-লোভের কোনও আসঙ্গ নেই, 'অ্যাটাচ্‌মেন্ট' নেই—কেননা তৃষ্ণা-লোভ-কামনা প্রতিহত হলেই তো ক্রোধের সৃষ্টি হয়—তা এমন 'অ্যাটাচ্‌মেন্ট' যাঁদের নেই, তাঁরাই শুধু যুদ্ধ করতে পারেন। এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার অর্জুন-বিষাদযোগের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়—এই বিপরীত বস্তুগুলির ওপরে উঠে যিনি ক্রোধ করছেন, সেই ক্রোধ এক মুহূর্তে নৈতিকতার ভূমিকা লাভ করে—ঠিক এই জায়গায় দাঁড়ালে তবে ভীষ্মকে শর-শয্যায় পাতিত করার পর তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারেন অর্জুন; ঠিক এই জায়গায় দাঁড়ালে তবে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাচারের গালি দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অকথ্য ভাষায় অর্জুন বলতে পারেন—কেন তুমি ত্যক্তশস্ত্র নিশ্চেষ্ট আচার্য দ্রোণের গলায় তরবারির আঘাত করলে! ঠিক এইরকম দ্বন্দ্বাতীত নির্মৎসর জায়গায় দাঁড়ালে—ভীম যখন উরুভগ্ন দুর্যোধনের মাথায় লাথি মারতে যাচ্ছেন তাঁকে যুধিষ্ঠির বলতে পারেন—যিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, সেই রাজার মাথাকে তুমি এমন করে অসম্মান করতে পারো না।

আমরা বলতে পারি, এও তো আর এক ধরনের দ্বিচারিতা! তুমি মারছোও তাঁকে আবার সম্মানও করছো। মহাভারত বলবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং অবশেষে হত্যা করাটাও রাজনৈতিক নৈতিকতা তৈরি করে, কিন্তু ওই সম্মানের জায়গাটাই বুঝিয়ে দেয় যে, ওই হত্যাকাণ্ডটা রাজনৈতিক নৈতিকতার দায়, কিন্তু তার পরে ওই সম্মনের জায়গাটা অনৃশংসতার জায়গা—যেটা যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যক্ষের হাত থেকে নকুলকে বাঁচানোর যুক্তিতে—আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ নকুলো যক্ষ জীবতু। মনে রাখতে হবে, সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিচারিতার কথা শুনে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরই যেন যুদ্ধোদ্যোগী হয়ে পড়েছেন, এমন কথাটা চাপিয়ে দেওয়ায় যুধিষ্ঠিরের মতো যোগারূঢ় ব্যক্তিও—যিনি সম্পূর্ণ মহাভারতের মধ্যে সর্বত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু বিবাদ লাগবে বলে নিজেরা চেপে গিয়ে দুঃখবরণ করেছেন—সেই যুধিষ্ঠিরও সঞ্জয়ের কথা শুনে রেগে যাচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির বলেছেন—তুমি কী এমন কথা শুনলে আমার মুখে, সঞ্জয়! যাতে তোমার মনে হচ্ছে আমি যুদ্ধের কথা বলেছি—কা ত্বং বাচং সঞ্জয় মে শৃণোষি/যুদ্ধৈষিণীং যেন যুদ্ধাদ্ বিভেষি। বস্তুত যুধিষ্ঠির বার বার রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রার্থনার মধ্যে একটা ন্যায়োপার্জনের জোর থাকায় মনে হচ্ছে যেন না ফিরিয়ে দিলে যুদ্ধ হবে, আর ঠিক সেই জায়গাটা ধরেই ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয় যুদ্ধ

হবে ধরে নিয়েই তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন, তাতেই ক্রোধ হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের। যুধিষ্ঠির বলেছেন—মানুষ মনে-মনে যা চায়, সেটা যদি বিনা চেষ্টাতেই পাওয়া যেত, তাহলে সেটা পাবার জন্য কোনও কর্মই করতে হত না। আর, বিনা যুদ্ধে যদি মানুষ অল্প কিছুও পায়, তাহলেও মানুষ কখনও যুদ্ধ করবে না। কোনও বিকল্প উপায় না থাকলেই কী মানুষ যুদ্ধটাকে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলে মনে করে? আমি তো মনে করি সেই লোকই স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে যায়—যার ওপরে দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে। কিন্তু জেনো, সঞ্জয়! পাণ্ডবরা সুখ চায়, কিন্তু যুদ্ধ যদি লাগেও তবু জেনো পাণ্ডবরা সেটাই করবে, যেটা ধর্মসংগত এবং লোকের হিতকর—ধর্মাদহীনং যচ্চ লোকস্য পথ্যম্।

তার মানে, ন্যায় এবং নীতির প্রয়োজনে, ধর্মের প্রয়োজনে অথবা শৃঙ্খলার প্রয়োজনে কখনও কখনও যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসছে—হয়তো এটাকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা Legitimate force বলে চিহ্নিত করেছেন। Gabriel Abraham Almond এবং James Smoot Coleman—তাঁদের বই The Politics of Developing areas-তে 'শৃঙ্খলা প্রতিপাদনের জন্য' অথবা 'পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে'—এইরকম দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেটা মূলে–order maintaining অথবা transforming system বলা হয়েছে। এই দুই পণ্ডিতের মত হল—শৃঙ্খলা বা সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য অথবা কোনও দেশ বা সমাজের রাজনৈতিক বা আর্থসামাজিক System, যেখানে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, সেখানে কখনও কখনও যুদ্ধের প্রয়োজন হয় এবং সেটা Legitimate force অর্থাৎ ন্যায়সংগত বলপ্রয়োগ। আমরা বলব—এটাকেই যুধিষ্ঠির বলেছেন—সেই ব্যবস্থা, যেটা ধর্ম থেকে সরে আসছে না, অথচ সেটা মানুষের পক্ষে হিতকর—ধর্মাদ্ অহীনং যচ্চ লোকস্য পথ্যম্। যদি ভগবদ্গীতার দিকে তাকান, দেখবেন সেখানে অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলে বসে গেছেন; আর কৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—আর তুমি যদি নিতান্ত ধর্মসংগত এই যুদ্ধ করতে না চাও—অথ চেত্ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি—তাহলে তোমার নিজের ক্ষত্রিয় ধর্মও নষ্ট হবে লোক-কল্যাণের অযাত্রায়, তোমার যশ তো যাবেই, উলটো দিকে—আমি বলব—তাতে পাপ লাগবে তোমার।

কৃষ্ণ নিজে যখন সঞ্জয়কে বোঝাচ্ছেন—অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধোদ্যোগ নিয়ে কথা বলার পর কৃষ্ণ নিজে যখন তাঁকে বোঝাচ্ছেন, তখন কিন্তু ম্যাক্স্ হ্বেবার-সাহেবের সোসিওলজিক্যাল ডেফিনিশন অব্ স্টেট' তাঁর হজম করা হয়ে গেছে। হ্বেবার বলেছিলেন—a state is a human community—সেটা আত্মস্থ করা ছিল বলেই কৃষ্ণ বলতে পেরেছিলেন—আমি যেমন পাণ্ডবদের বিনাশ চাই না, তাঁদের ভালো চাই, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদেরও আমি বাড়বাড়ন্ত চাই—সমাশংসে বহুপুত্রস্য বৃদ্ধিম্। কিন্তু এই দুটোই একসঙ্গে হওয়াতে গেলে একটা অদ্ভুত মধ্যপন্থা চাই-ই, যেখানে

দু'পক্ষই যুদ্ধ না ঘটানোর জন্য কিছু ছেড়ে আসবে। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বোঝানোর সময়ে যুদ্ধের উৎপত্তি-বিষয়ে একটা তথ্য দিয়ে বলেছেন—প্রথম সেই লোকটার ওপরে বুঝি ক্রুদ্ধ বিধাতার নজর লেগে গিয়েছিল, আর সেইজন্যই বুঝি রাজা-নামক সেই লোকটা সৈন্য-সেনার বল সংগ্রহ করে পরের সম্পত্তি গ্রহণ করার ইচ্ছে করেছিল—ঠিক এইরকম একটা অপপ্রয়াস থেকেই কিন্তু যুদ্ধের ভাবনা এসেছে। তখনই সেই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিল বর্ম, অস্ত্র, ধনুক। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র দস্যুবধের জন্য এই যুদ্ধ এবং বর্ম, অস্ত্র এবং ধনুক আবিষ্কার করেছিলেন—ইন্দ্রেনৈতৎ দস্যুবধায় কর্ম/উৎপাদিতং বর্ম অস্ত্রং ধনুশ্চ।

লক্ষ করে দেখুন, পরের সম্পত্তি লাভ করার জন্য মানুষের একপ্রকার স্বাভাবিক লোভ আছে বলেই লোভীকে বাধা দেবার জন্যও কিন্তু ভাবতে হয় এবং তার জন্য প্রথম প্রকরণ হল বর্ম—বর্ম মানেই কিন্তু 'সেলফ্-ডিফেন্স্'—বস্তুত যুদ্ধ, অস্ত্র এবং ধনুর্বাণের সৃষ্টিও হয়েছে ওই আত্মরক্ষার তাগিদেই। তারপর সেটা ব্যবহৃত হয়েছে অন্যায়ী লোভীকে দমন করার জন্য। তার মানে Political definition of state থেকেই যে যুদ্ধের ধারণা তৈরি হয়েছে, তা নয়, বরঞ্চ তা হয়েছে Sociological concept of state থেকেই। পৃথিবীতে যদি হিংসা বা নৃশংসতাকে প্রশ্রয় দেয়—এমন সামাজিক গোষ্ঠী একটাও না থাকত, তাহলে রাষ্ট্রের ধারণাই তৈরি হত না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনই হত না, কিন্তু দুর্বল-সবল দুই ধরনের মানুষ সমাজের মধ্যে অবধারিতভাবে থাকবে বলেই একটা অরাজকতা তৈরি হবে—তাতে মনু বলেছেন—জলের মধ্যে ছোট মাছকে যেমন বড় মাছ খেয়ে নেয় সেইভাবে বলবত্তর মানুষ দুর্বলতরকে গ্রাস করত—জলে মৎস্যানিবাহিংস্র্য দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।

পণ্ডিতজনেরা বলেছেন—বলপ্রয়োগের ব্যাপারটা রাষ্ট্রের কোনও স্বাভাবিক বৃত্তি নয়. সেটা কোনও রাষ্ট্রের একতম আশ্রয় তো নয়ই। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্র যেহেতু এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র ভৌগোলিক স্থিতি তৈরি করে, তাই ন্যায়সংগত বল-প্রয়োগও কখনও কখনও জরুরি হয়ে পড়ে। খেয়াল করে দেখবেন—রাজনীতির পরিশীলিত ভাবনার মধ্যে যুদ্ধ শব্দটা ভদ্রলোকেরা ব্যবহারই করেন না, বরঞ্চ পরিশীলিত প্রক্রিয়ায় সেটাকে আমরা এখন 'ফোর্স' 'কোয়রসিয়ন্'—এই শব্দ-নৈপুণ্যে চিত্রিত করি, তাহলে মনু কিংবা কৌটিল্য কী দোষ করেছেন দণ্ড শব্দটা ব্যবহার করে? তাঁরা তো রাষ্ট্রের সামাজিক সংজ্ঞা মাথায় রেখেই এ-কথা বলেছিলেন যে. দণ্ড-ব্যাপারটা মোটেই শুধু শাস্তি দেবার জন্য নয়, দণ্ড প্রধানত সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখে, মানুষের ভূ-সম্পত্তি-ধনের ওপর অধিকার বজায় রাখে ইত্যাদি। লক্ষণীয়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ আচার্যরা দণ্ড বলতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বোঝেননি, বরঞ্চ দণ্ড বলতে 'দমন' বুঝেছেন। যাস্ক তাঁর প্রাচীন গ্রন্থে তাঁর পূর্বাচার্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—আচার্য উপমন্যু দণ্ড বলতে দমন বোঝেন—দমনাদিতি ঔপন্যবঃ।

সামান্যভাবে দমনের এই জায়গাটাই কিন্তু Legitimate force—যেটা রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রশ্নে আসবেই। পণ্ডিতের ভাষায়—Today, however, we have to say that a state is a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Note that 'territory' is one of the characteristics of the state. Specially, at the present time, the right to physical force is ascribed to other institutions or to the individuals only to the extent to which the state permits it.

আমরা রাষ্ট্রের বিষয়ে একটু বেশি কথা বলে ফেললাম এই কারণে যে, হিংসা, অনৃশংসতাকে আমরা যেখানে নীতি এবং ধর্মের মূলস্থান বলে নির্দেশ করছি, যেখানে রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে, প্রজাপালনের ক্ষেত্রে, এমনকী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রেও হিংসা কিংবা অনৃশংসতাও ধর্ম হয়ে উঠছে। কথাটা ভীষ্ম বলেই দিয়েছিলেন শান্তিপর্বে। ভীষ্ম বলেছিলেন—হ্যাঁ, এগুলি তো ধর্মের লক্ষণ বটেই—তুমি চুরি করছ না, তুমি দানধ্যান করছ, হিংসা করছ না, সত্য ব্যবহার করছ, ক্রোধ বর্জন করছ—হ্যাঁ এগুলি তো ধর্ম বটেই। কিন্তু দেশ এবং কাল এমন হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, চুরি না করাটাও অধর্ম হয়ে উঠতে পারে, হিংসা না করাটাও অধর্ম হয়ে উঠতে পারে, কেননা ধর্ম-বস্তুটাকে এমন জড়-স্থবির ভেবে বোসো না, ধর্ম দেশ-কাল অনুসারে অন্যরকম হতে পারে, এটাই 'সিচুয়েশনাল এথিকস্'—ধর্মো হি আবস্থিকঃ স্মৃতঃ।

আপনাদের মনে থাকবে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর স্বপক্ষ এবং পরপক্ষের অনেক স্বজন হারিয়ে যুধিষ্ঠিরের এমন দুঃখ হল যে, তিনি আর রাজা হতেই চাইলেন না। ভাইদের উদ্দেশে এমনও বললেন যে, মথুরা-পঞ্চালে গিয়ে আমি ভিক্ষা করব তাও ভালো, কিন্তু আমি আর রাজা হতে চাই না। যুধিষ্ঠির বললেন—এই পৃথিবী, এই রাজভোগ্য সুবর্ণরাশি, হস্তী-অশ্ব-গোধন—কিছুই চাই না, আমি বনে যেতে চাই, তোমরা শাসন করো এই পৃথিবী, আমি চললাম—বনমামন্ত্র্য বঃ সর্বান্ গমিষ্যামি পরন্তপ। যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে ভীষণভাবে 'রিঅ্যাক্ট' করলেন অর্জুন। অর্জুন বললেন—এতদিন ধরে এত দুঃখ পেলাম, এত কষ্ট করলাম, এতদিনে শত্রুবধ করে এই রাজ্যের অধিকার লাভ করলাম, আর এখন তুমি বলছো—ভিক্ষা করবে—এটা তো মূর্খ লোকের কথা। এতে ধর্মও হবে না অর্থও হবে না, শুধু মূর্খের মতো বনে যাওয়াটা সিদ্ধ হবে তোমার—ধর্মার্থাবখিলৌ হিত্বা বনং মৌর্খ্যাৎ প্রতিষ্ঠসে।

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য ছিল—বড় অন্যায় হয়ে গেছে, অনেক হানাহানি, অনেক হিংসা ঘটেছে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা হয় আমাদের ভালো চেয়েছিলেন নয়তো কৌরবদের ভালো চেয়েছিলেন, কিন্তু মারা তো গিয়েছেন—মৃত্যুর পর কে কার ভালো চেয়েছিলেন সেই গোত্রভেদ করে তো আর লাভ নেই, তারা মারা গেছেন ভালো করতে গিয়ে—পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ হতা এব হিতে হতাঃ। এত হানাহানি, হিংসার পর

যুধিষ্ঠির আর রাজা হতে চাইছেন না। ঠিক এর উত্তরে অর্জুন যেটা বলবেন, সেখানেই 'পোলিটিকস' আর 'মর্যালিটি'র সংঘাতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা যে তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করবেন প্রজা কল্যাণের কথা চিন্তা করবেন, সেটা ন্যায় অনুসারে হবে কি না, সেটা অহিংস ভাবে হবে কিনা? অর্জুন আজ যুধিষ্ঠিরকে রাজা হিসেবে দেখতে চাইছেন এই কারণেই যে, অন্যায়কারী শত্রু দমিত হয়েছে এখন প্রজাকল্যাণ এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্যই রাজা হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—অন্যায়ী শত্রু নিহত হবার পরেও যদি আমরা এই ঋদ্ধ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাই তাহলে প্রজারা কী বলবে—সন্তজ্য রাজ্যং ঋদ্ধতে লোকো'য়ং কিং বদিষ্যতি?

আর রাজ্য, ভূমি, রাজসমৃদ্ধি এমনকী প্রজাকল্যাণের বিষয়ও অলব্ধ-লাভের বিষয়, লব্ধ-বস্তুর সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়। সেখানে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—তুমি যদি ভেবে থাক—কাউকে কোনও কষ্ট না দিয়ে কারও কোনও অপকার না করেই অর্থ লাভ, রাজ্য লাভ এবং রাজ্যের সুরক্ষা সম্ভব হবে, তাহলে তুমি এক্কেবারে ভুল ভেবেছ—ন পশ্যামো' নপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বয়ম্। তাকিয়ে দেখুন দেবতা এবং অসুরদের দিকে। অসুররা তো দেবতাদের জ্ঞাতি ভাই, তারা একই বাপের ছেলে। তো দেবতারা কি তাঁদের জ্ঞাতি ভাইদের এতটুকুও ক্ষতি না করে, তাঁদের না মেরে রাজ্য পেলেন—রাজন্ কিমন্যজ্ জ্ঞাতীনাং বধাদ্ গৃধ্যন্তি দেবতাঃ। এই যে ব্রাহ্মণেরা আছেন—তাঁরা অন্যদের পড়াশুনা করান, অন্যের যাগ-যজ্ঞ করেন, তাঁরাও তো অর্থের জন্য, ধনলাভের জন্যই এই কাজগুলো করেন, যজ্ঞকালে পশুহিংসাও বাদ যায় না। এ সবের মধ্যেও তো পরপীড়ন আছে। এইসব কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝবে—এক্কেবারে কারও অপকার না করে রাজ্যলাভ করাও সম্ভব নয়, রাজ্য চালানোও সম্ভব নয়—ন পশ্যমো'নপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বয়ম্।

অর্জুন কথাটা এমন চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন যাতে মনে হতে পারে যেন অন্যায়, অধর্ম, অনীতি ছাড়া রাজতন্ত্র রক্ষা করাই সম্ভব নয়। শুধু রাজতন্ত্র কেন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোনওটাই চালনা করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রেও কি এমন অবস্থা কখনও ছিল বা আছে—যেখানে সকল মানুষ প্রত্যেকেই উপকৃত বোধ করছেন—অথবা সকলেই আত্মবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে বিস্ময়মুকুলিত নেত্রে সরকারের গুণ গাইতে-গাইতে নৃত্য করছেন। আসলে রাজনীতির ক্ষেত্রে মর্যালিটি বস্তুটা অনেক বেশি গভীরভাবে সংপৃক্ত— রাজকোষের জায়গা, অন্যায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি দেবার জায়গা, কিংবা পররাষ্ট্রনীতির জায়গা—এই সমস্ত জায়গাগুলিতে ধর্ম এবং নীতি কিন্তু সাধারণভাবে প্রযুক্ত—এটাই ভালো, এটাই নৈতিক—এতটা সটান-সহজভাবে বলা যায় না। বাজারে গেলে প্রত্যেক ক্রেতাই কিন্তু ভাবেন—ব্যবসাদাররা সব সময়েই ভীষণভাবে ক্রেতাদের পয়সা লুটে নিচ্ছে, যিনি প্রচুর ট্যাক্স দিচ্ছেন, তিনি সবসময়েই ভাবেন রাজা কিংবা সরকার সব টাকা লুটে নিচ্ছে, বদলে কিছুই করে না।

এই প্রসঙ্গে মনু-মহারাজের বক্তব্যটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে রাজনীতিতে নৈতিকতার কথাটাও যেমন বোঝা যায়, তেমনই ব্যবসাদারের লাভের নৈতিকতাও বোঝা যায়। মহাভারতে অবশ্য ব্যবসার প্রসঙ্গে এক ধার্মিক বৈশ্যের কথা উঠেছে, তার নাম তুলাধার অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা। এই বৈশ্য ধর্মের কথা বলে, রীতিমতো ব্রাহ্মণ্য নীতির কথা বলে এবং সে সমদৃষ্টির মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। সে কারও ক্ষতি করতে চায় না, নিজের ব্যবসারও কোনও উন্নতি করতে চায় না। সে নিজেই বলে—বুড়ো, রোগী এবং রোগে-ভোগা মানুষের যেমন আর বিষয়ে রুচি থাকে না, আমারও তেমনই অর্থ-কামে কোনও স্পৃহা নেই। আমি ধর্ম অনুসারে চলি—কোনও প্রাণীর যাতে কষ্ট না হয় অথবা কষ্ট হলেও অতি সামান্য কষ্ট দিয়ে যা পাওয়া যায়, সেটাই আমার জীবিকা এবং সেটাই ধর্ম—অদ্রোহেনৈব ভূতানাম্ অল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ। যা বৃত্তিঃ স পরো ধর্ম...। তুলাধার বৈশ্য বলেছে—সমস্ত প্রাণীর প্রতি আমার দৃষ্টি সমান, আমার দাঁড়িপাল্লাও দুই দিকে সমান থাকে সর্বত্র—তুলা মে সর্বভূতেষু সমা তিষ্ঠতি জাজলে।

একজন ব্যবসায়ী যে ব্যবসা করে জীবন চালায় এবং একজন রাজা যাকে রাজ্য সমৃদ্ধি এবং প্রজাপালন, প্রজা সুরক্ষার জন্য অর্থলাভের চেষ্টা করতেই হয়, তার পক্ষে এই তুলাধারের ধর্ম পালন করে বৈশ্য ধর্ম বা রাজধর্ম পালন করা সম্ভব কিনা, তা অবশ্যই তর্কের বিষয়, কিন্তু মহাভারত, মনু বা কৌটিল্য কখনওই এটাকে ধর্ম বলবেন না। মনু তো এই প্রসঙ্গে একটা সাংঘাতিক বাস্তব কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—সাত প্রকারের অর্থ আছে যা পেলে বা পাওয়ার চেষ্টা করলে কোনও অধর্মই নেই—সপ্ত বিত্তাগমা ধর্মাঃ। কেউ যদি বাপের সম্পত্তি পায়, কেউ যদি বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা পেয়ে যায়, কেউ যদি কম দামে জিনিস কিনে টাকার ব্যাপারে জিতে যায়, রাজা যদি রাজ্য জয় করে সেই রাজ্যের ভূ-সম্পত্তি রাজকোষ পেয়ে যান, তাহলে কোনও অধর্মই নেই সে সব জায়গায়—সপ্ত বিত্তাগমা ধর্মা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ। মনু আর দুটো ব্যবসার কথা বলছেন, আর একটা ব্রাহ্মণের ব্যাপার। শব্দটার নাম প্রয়োগ—অর্থাৎ টাকা খাটানো, সেকালের দিনের ব্যবসাদার অসময়ে ধান কিনে রাখল, সে ধান সংরক্ষণ করল, তারপর আরও অসময়ে সেই ধান বেচল, অথবা চাল বার করে বিক্রি করল। এটা ছাড়াও অন্যান্য 'ইনভেস্টমেন্ট'ও এই প্রয়োগ-বর্গের মধ্যে পড়বে। দ্বিতীয়টা মনু বলেছেন 'কর্মযোগ' অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো-প্রজনন, অশ্ব প্রজনন ইত্যাদি কর্ম করে যে অর্থোপার্জন হয়, তাতে কোনও অধর্ম নেই। আর ব্রাহ্মণ যদি যাগ-যজ্ঞ, পূজা করিয়ে ভালো দক্ষিণা পায়, তাতেও অধর্ম নেই।

মনুর মতো ধর্মশাস্ত্রকারের এই বিধান থেকেই বোঝা যায় যে, তুলাধার বৈশ্য যেমন ধর্মের কথা বলছে, তেমন ধর্মে ব্যবসাও চলবে না, রাজার প্রজাপালন বৃত্তিও থমকে যাবে। মহাভারতের মধ্যে অনেক জায়গাতেই 'ন্যায়-সঞ্চিত অর্থ', 'ন্যায়োপাত্ত অর্থ' অথবা 'ন্যায়-লব্ধ' অর্থের কথা আছে—এই অর্থের মধ্যে ধন-সম্পত্তি যেমন আছে,

তেমনই রাজার রাজ্যলাভও আছে এবং আছে প্রজার ওপরে কর চাপিয়ে রাজকোষের সঞ্চয়, যেটা অন্য পর্যায়ে প্রজা-কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবার কথা। কিন্তু এই ন্যায়লব্ধতা বা ন্যায়সঞ্চিত অর্থ কিন্তু তুলাধার বৈশ্যের ভাবনায় চলে না কিংবা যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক বুদ্ধি যৌধিষ্ঠিরী নীতিতেও চলে না। যুধিষ্ঠির রাজনীতি শিখতে গিয়ে শান্তিপর্বে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তেমন তেমন অবস্থায় পড়লে কী করবেন রাজা। বন্ধু-রাষ্ট্র যাঁকে পরিহার করছে, শত্রুও আছে প্রচুর, সেনা-সৈন্য নেই, আছে শুধু দুষ্ট মন্ত্রী এবং তাঁদের দুর্মন্ত্রণা—এই অবস্থায় রাজাই যেখানে হাতছাড়া হবার জোগাড়, সেখানে, কী করব আমি।

বলে নেওয়া ভালো—যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হাতছাড়াই হয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম সে দুঃখে আর ক্ষতে ক্ষার ক্ষেপণ করেননি। ভীষ্ম বলেছেন—এই অবস্থায় সব চিন্তা বাদ দিয়ে আগে অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে, রাজকোষের কথা ভাবতে হবে। ভীষ্ম বলেছেন—যেখানে জল নেই, সেখানে যেমন মানুষ নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদেই জল খুঁজে বার করে, সেইভাবেই রাজাকে কোষ তৈরি করতে হবে যে কোনও উপায়ে—কোশঞ্চ জনয়েদ্ রাজা নির্জলেভ্যো যথা জলম্। ভীষ্ম যে কথা বলছেন তেমনভাবে অর্থ উপায় করতে গেলে কিন্তু জনসাধারণের ওপর করের বোঝা চাপানো ছাড়া রাজার কোনও গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু ভীষ্ম বলছেন—রাজ্যের দুর্দিনে সেটাই করতে হবে, সেটাই ধর্ম। সময় যখন ভালো হবে তখন প্রজাদের প্রতি না হয় নতুন অনুগ্রহ করবে তুমি, কিন্তু দুঃসময়ে পীড়নটাও ধর্ম হয়ে ওঠে, কেন না বৃহত্তর স্বার্থেই সেটা করা হচ্ছে।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, রাজ্য যখন সুস্থিত, রাজকোষ যখন অমলিন, তখন কিন্তু কখনওই প্রজা-পীড়ন করে কোষ বৃদ্ধি করতে বলবে না মহাভারত কিংবা মনু। ওঁরা বলবেন—জোঁক যেমন বুঝতে না দিয়ে রক্ত খায়, মধুকর যেমন পুষ্প পীড়ন না করে মধু খায় অথবা বাছুর যেমন দুধ খাওয়ার সময় গাভী-জননীকে বুঝতেই দেয় না, রাজা ঠিক সেইভাবে প্রজাদের এতটুকুও পীড়ন না করে কর সংগ্রহ করবেন। কিন্তু রাজ্যের বিপদ যদি আসে, তখন কিন্তু রাজার ধর্ম অন্যরকম হয়ে যাবে, বরঞ্চ অন্যরকম না হওয়াটাই অধর্ম হবে। ভীষ্ম বলেছেন—ভালো অবস্থায় ধর্ম একরকম, খারাপ অবস্থায় আর এক রকম—অন্যো ধর্মঃ সমর্থানাম্ আপৎসু অন্যশ্চ ভারত। ভীষ্মের পরিস্কার বক্তব্য—রাষ্ট্র যদি বিপন্ন হয়, তখন রাজার ধর্ম হিসেবে কেউ ভিক্ষে করার বিধান দেননি। বরঞ্চ সেই সময়ে রাজার সুস্থিত সময়ের ন্যায়-ধর্মটাই অধর্ম হয়ে ওঠে—অধর্মো জায়তে হ্যস্মিন্নিতি বৈ কবয়ো বিদুঃ।

রাজ্যের বিপন্ন অবস্থার কথা বলতে গিয়ে ভীষ্ম কিন্তু সম্পন্ন অবস্থাতেও রাজাদের মানসিকতায় একেবারে হিংসা-দ্রোহহীন একটা নিরামিষ আচরণ স্বাভাবিক বলে মনে করেননি। ভীষ্ম সাধারণ এবং প্রচলিত সদাচার প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময়েই বলে ফেলেছিলেন যে, পরশুরাম-দ্রোণাচার্যের মতো বিরাট পুরুষেরা পর্যন্ত নিজেদের

ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজন ছেড়ে রাজধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে অন্য মানুষের কথা কী বলব—এমন কোনও সদাচারই নেই এই বাস্তব পৃথিবীতে যে আচারকে বলতে পারি—এই আচার সবার সার্বিক ভালো ডেকে আনবে—ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদ্ আচারঃ সম্প্রবর্ততে। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজা বা যে কোনও রাষ্ট্রীয় নায়ক সম্বন্ধে ভীষ্ম বলতে চান—রাজাদের জীবনে তথা রাষ্ট্র পরিচালনার বৃত্তিতে হিংসার ব্যাপারটা আছেই—অন্যত্র রাজন্ হিংসায়া বৃত্তি নৈহান্তি কস্যাচিৎ—কেন না অতি সাধারণ মানুষের জীবনেই কোনও না কোনওভাবে হিংসা ছাড়া রুজি-রোজগার হয় না, জীবন চলে না। একমাত্র অরণ্যবাসী মুনিরা ছাড়া আর কে আছে এই পৃথিবীতে, যিনি শুধু কপালের লেখা নিয়ে 'যা আছে কপালে' বলে জীবন কাটাচ্ছেন, আর সেখানে রাজা! প্রজাপালনের বৃত্তি নিয়ে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে রাজকর্ম চালাব—এমনটা অন্তত রাজাদের পক্ষে সম্ভবই নয়—ন শঙ্খলিখিতাং বৃত্তিং শক্যমাস্থায় জীবিতুম্। এই শ্লোকে শঙ্খ মানে লালাট, ললাটের লিখন, কপালের লিখন, কপালের ওপর নির্ভর করে রাজ্য চালানো যায় না। কাজেই সময় বুঝে ক্ষত্রিয় রাজাকে মানুষের হত্যাকারী হিসেবেও চিহ্নিত হতে হয় আবার সময় বুঝে রক্ষাকর্তা—হন্তারং রক্ষিতারঞ্চ প্রজানাং ক্ষত্রিয়ং বিদুঃ।

ছয়

ভীষ্মের এই বার্তাকে আমরা যদি একটা 'নিরিখ' বলে মেনে নিই, তাহলে বুঝতে হবে যে, তথাকথিত ধর্ম এবং তথাকথিত নৈতিকতা রাজনীতিতে অবশ্যই অন্যরকম। পূর্বাচার্যরা যেটাকে ধর্ম বা আইন বলে মেনে নিচ্ছেন, শাস্ত্র যেটাকে নীতি-ন্যায় বলে উপদেশ দিচ্ছে, তেমন একপেশে ধর্ম দিয়ে রাজার কাজ চলে না—নৈকশাখেন ধর্মেন রাজ্ঞো ধর্মো বিধীয়তে। রাজনীতির ক্ষেত্রে জ্যান্ত মানুষ নিয়েই যেহেতু কারবার, সেই হেতু শেষ জায়গায় শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজার সুপরিশীলিত বুদ্ধিটাই আংশিক হিংসার মাধ্যমে দুষ্টের দমন করে এবং শিষ্ট মানুষের পালন সম্পন্ন করে—ধর্মঃ প্রতিবিধাতব্যো বুদ্ধ্যো রাজা ততস্ততঃ। সবচেয়ে বড় কথা, এই ব্যাপারটা যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতধী ধর্মজ্ঞকেও বুঝতে হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ক্ষমা, বৈরাগ্য, অহিংসা ইত্যাদি চিরপ্রচলিত নৈতিকতার উল্লেখ করে সানুশোচনায় যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—আমরা কুকুরের মতো ব্যবহার করেছি, এতগুলি স্বপক্ষীয়-পরপক্ষীয় মানুষ যুদ্ধে মারা গেলেন—একটা মাংসখণ্ড পড়ে থাকলে কুকুররা যেমন কামড়া-কামড়ি করে রাজ্যখণ্ড নিয়েও আমরা ঠিক সেই কুকুরের মতোই কাজ করেছি—আমিষে গৃহ্যমানানাম্ অশুভং বৈ শুনামিব। এই যুধিষ্ঠিরই কিন্তু যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের কূট বুদ্ধিটুকু ধরে ফেলেছিলেন— ধৃতরাষ্ট্র মুখে শান্তির কথা বলছেন, কিন্তু কাজের সময় অন্যায়ভাবে হরণ করা পাণ্ডবদের রাজ্যখণ্ড ফিরিয়ে দিতে চাইছেন না—অপ্রদানেন রাজ্যস্য শান্তিমস্মাসু মার্গতি।

ঠিক এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীষ্মের কথারই পূর্বাবৃত্তি করেছেন সঞ্জয়ের কাছে। তিনি বলেছেন—দ্যাখো সঞ্জয়! এমন এমন জায়গা আছে যেখানে অধর্ম ধর্মের চেহারা নেয়, আবার ধর্মও কখনও অধর্মের রূপ ধারণ করে—যত্রাধর্মো ধর্মরূপাণি ধত্তে/ধর্মঃ কৃৎস্নঃ দৃশ্যতে'ধর্মরূপঃ—আর ঠিক এইরকম জটিল পরিস্থিতি যদি তৈরি হয়, তবে বুদ্ধিমান লোক বুদ্ধি দিয়েই সেই জটিলতা নিরসন করেন—বিদ্বাংসস্তং সংপ্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা। এই বুদ্ধির কথাই ভীষ্ম বলেছিলেন, এই রাজবুদ্ধি দিয়েই যুধিষ্ঠির ধরতে পারছেন যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শান্তির বাণী ছড়িয়ে ওপর ওপর ধর্ম দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ধর্মটা এখানে আসলে অধর্মের প্রতিরূপ। কৃষ্ণ এবার বুঝিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয়-দূতকে। কৃষ্ণ বলেছেন—যুদ্ধ করব না, হিংসা করব না বলে যুধিষ্ঠির তাঁর ধৈর্য এবং ধর্মবোধ দেখিয়েই যাবেন, দেখিয়েই যাবেন, আর অন্য দিকে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য রাজ্যখণ্ডটা চেয়েই যাবে-চেয়েই যাবে, এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কলহ-বিবাদ-যুদ্ধের কথাটা তো আর মুখ লুকিয়ে বসে থাকবে না—যস্মিন্ গৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রঃ/কস্মাদেষাং কলহো নাবমূর্চ্ছেৎ।

কৃষ্ণ এবার একটা করে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যে সব জায়গায় যুধিষ্ঠির ধর্মসম্মত ধৈর্য দেখিয়েছেন, শম-দম-ক্ষমার চরম মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন সেই ধর্ম অধর্মে পরিণত হচ্ছে, কেন না অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবারও একটা সীমা আছে। আর ঠিক সেই কথাই সঞ্জয় ফিরে যাবার সময় কৃষ্ণ বলে দিয়েছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র যে শান্তির কথা বলছেন, সেই শান্তিরক্ষায় প্রজ্ঞায় সম্পূর্ণ স্থিত আছেন যুধিষ্ঠির, কিন্তু এটাও তাঁকে বলো যে, যুদ্ধের ব্যাপারেও তিনি সমান সমর্থ—এই দুই অবস্থা বুঝেই যেন তিনি কাজ করেন—যোধাঃ সমর্থা স্তদ্‌বিদ্বন্নাচক্ষীথা যথাতথম্।

যে অন্যায় পাণ্ডবদের ওপর ঘটেছে, বিশেষত দ্রৌপদীর ওপর, তাতে যুদ্ধও নৈতিক হয়ে উঠল। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হবার পর বিরাট রাজার বাড়িতে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল, তাতে দুর্যোধনের পক্ষপাতী বলরাম ছাড়া আর কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দুর্যোধনের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলাটাও পছন্দ করেননি, কোনও আলোচনা তো চানইনি। একজন এমন কথাও বলেছিলেন যে, অন্যায়ী এবং অহংকারী দুর্যোধনের সঙ্গে নরম পন্থায় আলোচনা চাওয়ার মানে হল—তিনি অবধারিতভাবে পাণ্ডবদের দুর্বল ভাববেন। কেন না অহংকারী লোকের স্বভাবই এই যে সে ভদ্র-সভ্য নরম মানুষকে দুর্বল মনে করে—মৃদুং বৈ মন্যতে পাপো ভাষমানম্ অশক্তিকম্। এত সিদ্ধান্তের পরেও কিন্তু আলোচনা হয়েছে, দ্রুপদের দূত কৌরব সভায় গেছেন, সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতধী মানুষেরও ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত দেখে গেছেন এবং যুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠার পরেও স্বয়ং কৃষ্ণ গেছেন শান্তির বার্তা নিয়ে। পাণ্ডবরা কেউ যুদ্ধ চাননি, এমনকী কৃষ্ণ যাবার আগে সন্ধির বিষয়ে মতামত চাইলে যুধিষ্ঠির-অর্জুন তো বটেই, ভীমের মতো ক্ষমাহীন মানুষও রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্য সন্ধি চেয়েছিলেন।

কৃষ্ণের শান্তিদৌত্য ব্যর্থ হল এবং শান্তি চাইতে গিয়েছিলেন বলেই হয়তো দুর্যোধন-কর্ণরা তাঁকে বন্দি করার কথাও ভেবেছিলেন। দুর্যোধনের এই চরম অহংকার যুদ্ধের পথটা এতটাই প্রতিষ্ঠা করে দিল যে, ভগবদ্‌গীতা পর্বে কৃষ্ণ ভগবত্তার চরম-ভূমি থেকে বুঝিয়ে দিলেন—এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, এই যুদ্ধ না করাটাই অন্যায় পাপ হবে—অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্মঃ কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। তার মানে 'পোলিটিক্যাল' মর‍্যালিটি যেভাবে যে প্রক্রিয়ায় নৈতিকতার দাবি করে, সেই নৈতিকতা আমাদের প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা থেকে আলাদা এবং সেটাই হওয়ার কথা। এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে নৈতিকতার অন্যতর এক দ্বন্দ্ব আমি বহুবার শুনেছি—তাঁরা বলেন— কৌরব-পক্ষের প্রধান প্রধান সেনাপতিদের প্রত্যেককেই প্রায় অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে এবং যুদ্ধকালেও অস্ত্র ক্ষেপণে যে নীতি আছে, সেই নীতির 'মিনিমাম'টুকুও তো মানা হল না। তার মধ্যে আবার ভীষ্ম তো সম্পর্কে পাণ্ডবদের অতিপ্রিয় পিতামহ, দ্রোণাচার্য অতি প্রিয় গুরু—এঁরাও তো পাণ্ডবদের শিকার হলেন এবং তাঁদের যথেষ্ট ভালোবেসেও তাঁদের অস্ত্র প্রহার থেকে মুক্তি পেলেন না। আর শেষ জায়গায় চরম অন্যায়ের মধ্যেই তাঁদের মারা হল! এ কেমন ধর্ম, কেমন নৈতিকতা!

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন যেভাবে ধনুক-বাণ ছেড়ে—আমি আর যুদ্ধ করব না—এমন একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রথোপস্থে কৃপাবিষ্ট হয়ে বসে পড়লেন—এই নৈতিক পীড়নটা আমাদের জানাই আছে। অর্জুন যখন বলেন—কেমন করে এই পিতামহ ভীষ্ম এবং পূজনীয় আচার্যের শরীরে শরাঘাত করব আমি—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন—তখন বুঝতে পারি নৈতিকতা আর অধর্মের কাঁটা তাঁকে বিঁধছে। যখন বলেন—সব তো আমার ভাই, বন্ধু-পিতার মতো আত্মীয়-স্বজন—এঁদের আমি মারব কী করে—তখনও সেই ন্যায়ধর্মের প্রশ্নই আসে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের চরম দার্শনিক বক্তব্যগুলি আমাদের উত্তর নয়। এমনও বিশ্বরূপী দার্শনিকতা আমাদের উপজীব্য হতে পারে না, যাতে সার্বিক বিভূতির পরিচয় দিয়ে বলব—কে কাকে মারে অর্জুন। দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ—তাঁদের সব আমিই মেরে রেখেছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। আমরা বলব—এসব উপদেশ তোলা থাক ভগবান কৃষ্ণের জন্য—তিনিই এই উপদেশ দিতে পারেন। আমরা তার ধারে-কাছেও হাঁটাহাঁটি করব না।

নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে মহাভারতের কট্টর রাজনীতির কথা উল্লেখ করে এই যুক্তিও আমরা দেব না যে, দ্যাখো বন্ধু—রাজনীতিতে চিরকালীন বন্ধু বলেও কিছু নেই, চিরকালীন শত্রু বলেও কিছু নেই—ন কশ্চিৎ কস্যচিন্ মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ সুহৃৎ—এখানে বন্ধুত্ব তৈরি হয় বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রয়োজনে, শত্রুও তৈরি হয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে। রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ঈর্ষা-অসূয়া অথবা ব্যক্তিগত স্নেহ-মান-প্রণয়ের কোনও মূল্য নেই। তবু মহাভারতের আত্মীয় রাজনীতির মধ্যে

সবকিছু এ..বারেই অন্যরকম, মহাকাব্যের কবি এখানে আসংসার-দীপন এক জীবনালেখ্য তৈরি করছেন। এখানে ভীষ্ম পিতামহের সঙ্গে কিংবা পরম প্রিয় আচার্যের সঙ্গে দ্বৈরথে বারবার হৃদয়ের সম্বন্ধগুলি পীড়িত হবে এবং সেখানেই নৈতিকতার দায় আসবে এবং তার বিচার হবে হৃদয়-ঘটিত নৈতিকতা দিয়েই।

এটা মানতে হবে যে, ভীষ্ম কিংবা দ্রোণ—দুইজনেই পাণ্ডবদের সমর্থনে দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের মুখের ওপরেই অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আন্তরিকতার জায়গায় পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহও তাঁদের কিছু কম ছিল না। কিন্তু পাণ্ডব-কৌরবের চলমান জ্ঞাতি-বিবাদের মধ্যে যখন চরম 'ক্রাইসিস' তৈরি হয়েছে এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সম্মান-বাহিত নৈতিকতার কারণেই যেখানে যুধিষ্ঠির সহ্য করে যাচ্ছেন, সে সব জায়গায় ভীষ্ম বা দ্রোণ কিন্তু চরম প্রতিবাদে কোনও ভয়ংকর সংঘাতে জড়িয়ে পড়েননি, যেমনটা বিদুর পড়েছেন বার বার, চরম অপমানিত হয়েও, বার-বার। পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার দুর্যোধনী পরিকল্পনার কথা না হয় ভীষ্ম-দ্রোণ জানতেই পারেননি, কিন্তু বিদুর সেটা জানলেন কী করে? তাঁর কী ভীষ্ম-দ্রোণের থেকে রাজনীতির বুদ্ধি বেশি ছিল! তারপর পাণ্ডবরা যখন বনবাসে ছিলেন, তখন দুর্যোধন-কর্ণরা তাঁদের সামনে গিয়ে রাজৈশ্বর্য প্রকট করে তাঁদের মনে জ্বালা ধরাতে চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ভয়েই সেখানে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু অন্য অছিলায় দুর্যোধনরা সেখানে গিয়েছিলেন এবং বিপদেও পড়েছিলেন। অপমানিত দুর্যোধন ফিরে আসবার পর ভীষ্ম তাঁকে খুব বকছেন দেখতে পাচ্ছি, এমনও বলেছেন যে, আমি তোমাদের বারণ করেছিলাম, তোমরা শোননি—উক্তং তাত যথা পূর্বং গচ্ছতস্তে তপোবনম্—কিন্তু কার্যকালে যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন ভীষ্মের কোনও বারণ আমরা কণ্ঠত শুনিনি, তবে সব সময়েই তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের এসব 'অ্যাডভেন্চার' পছন্দ করতেন না—এটাই হয়তো সত্যি, কিন্তু কার্যত কিছু বলেননি, হয়তো বা জানতেনও না। কিন্তু যিনি বলছেন—এসব আমার পছন্দ নয়, তবু তুমি করছ—গমনং মে ন রুচিতং তব তত্র কৃতং চ তে—এর বেশি কিছু কিন্তু ভীষ্মও করেননি।

তারপর অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজার গোহরণ-পর্ব। ধরে নিলাম, ভীষ্ম জানতেন না যে, সেখানে পাণ্ডবরা আছেন, কিন্তু হঠাৎ করে বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করার মধ্যেও তো অন্যায় ছিল এবং তার চেয়েও অন্যায় ছিল গোহরণ। কিন্তু ভীষ্ম সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন দ্রোণও। কিন্তু এই ছোটখাট অন্যায়ের কথা ছেড়েই দিলাম—ভীষ্ম এবং দ্রোণ সবচেয়ে কলঙ্কিত হয়ে গেলেন রজস্বলা দ্রৌপদীকে যেদিন সভায় আনা হল এবং তারও আগে হল তুমুল পাশা খেলার অন্যায়। পাশা খেলা যখন চলছিল, এবং যেভাবে চলছিল, তাতে বিদুর প্রতিবাদ করেছিলেন ভয়ংকরভাবে, কিন্তু সেই সময়ে ভীষ্ম-দ্রোণের মুখ থেকে আমরা একটি

প্রতিবাদ-শব্দও শুনতে পাইনি। বিশেষত বিদুরকে যখন যা নয় তাই বলেই চরম অপমান করলেন দুর্যোধন তখনও ভীষ্ম -দ্রোণের মুখ থেকে দুর্যোধনের বিপক্ষতায় কোনও কথা শুনিনি। ভীষ্ম এবং দ্রোণ—দু'জনেই মহাধনুর্ধর, বিদুর সে তুলনায় কিছুই নন, বিদুরকে অপমান করলেও তাঁর যুদ্ধ করার ব্যক্তিগত শক্তি ছিল না। কিন্তু ভীষ্ম কিংবা দ্রোণ—এঁরা তো পরশুরামের অস্ত্রশিষ্য—অথচ অস্ত্রধারণ তো দূরের কথা, তাঁরা এতটুকুও কথা বললেন না বিদুরের সপক্ষে। তারপর তো এল সেই ভয়ংকর সময়—যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনার জন্য তির্যকভাবে বিদুরকেই আদেশ দিলেন দুর্যোধন—এহি ক্ষত্তর্দ্রৌপদীম আনয়স্ব। বিদুর আবারও প্রতিবাদ করেছেন, আবারও অপমানিত হলেন, কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণের মুখ দিয়ে স্ফুট-শব্দ একটাও বেরল না। সে কি শুধু এই ভয়ে যে, বিদুরকে যে-সব অপমানজনক কথা বলছেন দুর্যোধন, তা তাঁদেরকেও বলতে পারেন। শুধু এই অপমানের ভয়ে চুপ থাকা! বুঝি না বাবা!

প্রশ্ন কিন্তু উঠেছে, নৈতিকতার প্রশ্ন—এইসব সময়ে চুপ করে থাকা নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন। উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় যখন যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে—রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যুদ্ধের কথার ওপর শান্তিজল নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন, তখন এই প্রসঙ্গ উঠেছে। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে এক্কেবারে চুপ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—যুধিষ্ঠির কিংবা আমি ধর্ম এবং নৈতিকতার জায়গা থেকে এক চুল সরে এসেছি, এ কথা তুমি একবারও বলতে পারবে না, সঞ্জয়—ন ত্বং ধর্মং বিচরং সঞ্জয়েহ/মত্তশ্চ জানাসি যুধিষ্ঠিরাচ্চ। দুর্যোধন যেভাবে চরম অন্যায় করে কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করেছেন, তাতে কৃষ্ণ তাঁকে 'দস্যু' বলে চিহ্নিত করেছেন, আর দস্যু বধ করাটা কৃষ্ণ পুণ্য কাজ বলেই মনে করেন—তত্র পুণ্যং দস্যুবধেন লভ্যতে/সো'য়ং দোষঃ কুরুভিস্তীব্ররূপঃ। দুর্যোধন নিজের লোভে এবং অহংকারে পাণ্ডবদের রাজ্য ফেরত দিতে চাইছেন না, তাঁর কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়টা অবশ্যই ধর্মসংগত—এটা বোঝাতে কৃষ্ণ কোনও ধর্মসংকট বোধ করছেন না, কিন্তু তাঁর কাছে অনেক সংকটময় হল ভীষ্ম-দ্রোণের ভূমিকা।

পাশা খেলায় হেরে পাণ্ডবরা যখন প্রথম বনবাসে এসেছিলেন, কৃষ্ণ তখন সদলবলে এসেছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে দ্রৌপদীর মুখে তাঁর গ্লানি-অপমান শুনে কৃষ্ণ বলেছিলেন—আমি দ্বারকায় থাকলে এই জিনিস ঘটতে দিতাম না। পাশা খেলাটা আমি হতেই দিতাম না। আমি ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-বাহ্লীক—এঁদের সবাইকে একত্র পাশা খেলার দোষগুলি বুঝিয়ে দিতাম ভালো করে—ভীষ্মদ্রোণী সামানায্য কৃপং বাহ্লীকমেব চ—বুঝাতাম ধৃতরাষ্ট্রকেও। আর যদি সব বোঝানোর পরেও কথা না শুনত কেউ—ন গৃহ্ণীয়ান মধুরং বচঃ—তাহলে জোর করে বন্ধ করতাম এসব— নিগৃহ্ণীয়াং বলেন তম্—শাস্তি দিতাম ধৃতরাষ্ট্রকে। কৃষ্ণ এখানে রাজসভার

সদস্য সভাসদদের একটা চরিত্র উল্লেখ করেছেন। সভাসদেরা অনেক সময়েই রাজাকে খুশি-তোষামুদি করার জন্য অন্যায় হলেও অনেকটা রাজাকে সমর্থন করে যান সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে। কৃষ্ণ বলেছেন—যদি এমন দেখতাম যে, সভাসদেরা যাঁরা বেশিরভাগ সময়েই বাইরে বন্ধুর চেহারায় থাকে, কিন্তু ভিতরে শত্রু—অথৈনম্ অপনীতেন সুহৃদো নাম দুহৃদঃ—যদি দেখতাম তাঁরা নৈতিকতা ছেড়ে ধৃতরাষ্ট্রকেই সমর্থন করছেন, তাহলে সেইসব পাশাড়েদের আমি মেরেই ফেলতাম—সভাসদো'নুবর্তেরন্ তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্।

মহাভারতের কবির শব্দ-চমৎকার আব-ভাব-চমৎকার দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। নাকি সেটা কৃষ্ণের শাব্দবোধ অথবা ভাব-ব্যঞ্জনা। কৃষ্ণ প্রথমে বললেন—আমি ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-বাহ্লীককে ডেকে এনে সব বোঝাতাম, বোঝাতাম ধৃতরাষ্ট্রকেও। কিন্তু তারপরেও যদি সভাসদেরা...? এই সভাসদ কারা? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সভাসদ হিসেবে ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-বাহ্লীকেরাই তো তাঁর সভাসদ, রাজ্যসভার সভ্য। তাঁরা যদি 'অপনীত' হয়ে অর্থাৎ নীতিধর্ম হারিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করেন, তাহলে সেই পাশাড়েদের আমি মেরেই ফেলতাম—তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্। এখানে মহাবিদ্বান্ টীকাকারদেরও কিছু বোঝার ভুল আছে। আমার অপরিণত বয়সে আমি তাঁদেরই অর্থ নিশ্চয় অনুসরণ করে লিখতাম যে, কৃষ্ণ বলেছেন—তাহলে আমি ধৃতরাষ্ট্রের সভায়-আসা পাশাড়েদের মেরেই ফেলতাম। কিন্তু পরিণামী বয়সে মহাভারত চর্চায় অভিজ্ঞতায় এখন বুঝি—আমার ভাবনায় ভুল ছিল।

পাড়ার আড্ডায় এবং লোকাল ট্রেনে দেখেছি—চারজন লোক যেখানে নিবিষ্ট হয়ে 'ব্রিজ' খেলছেন, তখন কতগুলি লোক এক-একজনের পাশে পিছনে থেকে একই নিবিষ্টতায় খেলা দেখেন, তাঁরা মূল খেলোয়াড়দের থেকে কম পাকা লোক নন। কেন না এমন দেখেছি যে, মূল খেলোয়াড় একটা ভুল দান দিলে তারা অসীম একাত্মতায় পাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন—উঃ এটা কী কল্লি? খেলা শেষে দেখা যায় যে, ওই চিৎকার সঠিক ছিল, আসলে তাস-পাশা এমনই জিনিস, তার ওপরে সেটা যদি জুয়া খেলায় পরিণত হয়, তাহলে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতে নিবিষ্টতা আরও চরম হয়। ফল দাঁড়ায়—আশপাশে যিনি বা যাঁরা পাশা খেলা দেখছেন, তিনি বা তাঁরাও তখন পাঁড় পাশাড়ে হয়ে যান। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভাতেও এই জিনিস ঘটেছে। শকুনি যখন পাশার দান দিচ্ছেন, তখন প্রত্যেক দানের শেষে ধৃতরাষ্ট্র পাগলের মতো নির্লজ্জের মতো বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন—কিং জিতম্—জিতেছে কে? শকুনি জিতেছে কি? অর্থাৎ তিনিও তখন নৈতিকভাবে অন্ধ পাশাড়ে—যিনি অনুভবে একাত্ম শকুনির সঙ্গে।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা এতটা না হলেও তাঁরা তো এই সমগ্র পাশাপর্ব জুড়ে একটাও কথা বললেন না। দুর্যোধনের কথা দূরে থাক, বয়স্ক ধৃতরাষ্ট্রকেও তো কেউ নিবারণ করলেন না। সমগ্র পাশাপর্ব জুড়ে বিদুর প্রাতিবাদিক চিৎকার করেছেন—

প্রতীপ-শান্তনুর বংশধর ভীষ্মের উদ্দেশেই তো বলেছিলেন—মাননীয় প্রতীপ শান্তনুর বংশধরেরা শুনে রাখুন, ভয়ংকর আগুন জ্বলে উঠেছে, আপনারা মূর্খের অনুসরণ করে তাঁদের দলে ভিড়ে যাবেন না—বৈশ্বানরং প্রজ্বলিতং সুঘোরম্/মা যাস্যধ্বং মন্দম্ অনুপ্রপন্নাঃ। এর পরেও কিন্তু ভীষ্ম কোনও শব্দ উচ্চারণ করেননি। পাশা খেলা চলেছে, বিদুরই গালাগালি খেয়েছেন ভালোমতো। এই পরিপ্রেক্ষিতটা কৃষ্ণের মুখে ধৃতরাষ্ট্র সভার সভাসদদের তাৎক্ষণিক চরিত্র বুঝিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তে তাঁরাও পাশাড়ে হয়ে গেছেন। তা না হলে সভাসদদের সুহৃদরূপী শত্রু বলে উল্লেখ করে ধৃতরাষ্ট্রের অনুসরণকারী সেই পাশাড়েদের আমি মেরেই ফেলতাম—এই কথাটা কৃষ্ণের মুখে আসত না। কিন্তু সম্মান তো শব্দের মধ্যেই—কৃষ্ণ ভীষ্মের নাম করেননি, দ্রোণেরও না, কিন্তু সভাসদদের কথা বলেছেন, যাঁরা সেই মুহূর্তে প্রায় নিশ্চুপ পাশাড়ে হয়ে গেছেন।

অতএব ভীষ্ম-দ্রোণের ওপর এই 'অপনীতি'-র ক্ষোভটা—অথৈনম্ অপনীতেন। সুহৃদো নাম দুর্হৃদঃ—ছিলই এবং তা হয়তো পাণ্ডবদেরও ছিল. কিন্তু অতি-আত্মীয়তার সূত্রে চরম ধৈর্যশালী যুধিষ্ঠির সে কথা উচ্চারণ করতে পারবেন না বলেই সঞ্জয়কে কথা শোনানোর সময় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কথা বলতে বলেছেন। যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ সে কথা আবারও তুলেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে, কূটনৈতিক মাহাত্ম্যে। কৃষ্ণ বলেছেন—দ্যাখো সঞ্জয়! কুরুসভায় পাশা খেলার আসরে আর একটা ভয়ংকর পাপও ঘটানো হল এবং সেখানে কী চরিত্র প্রকট হয়ে উঠল কৌরব-মহাত্মাদের—ইদং পুনঃ কর্ম পাপীয় এব/সভামধ্যে পশ্য বৃত্তং কুরূণাম্! কৃষ্ণ এবার নির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করে বললেন— পাণ্ডবদের প্রিয়তমা পত্নী কুলবধূ দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় চরম অপমান করতে করতে রাজসভায় নিয়ে আসা হল এবং সেখানে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো কুরুপ্রধানেরা এমন ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চুপ করে বসে রইলেন—যদুপৈক্ষন্ত কুরবো ভীষ্মমুখ্যাঃ/কামানুগেনাপরুদ্ধাং ব্রজন্তীম্।

এই পরিস্থিতিতে ভীষ্মের এই মৌনভাব কৃষ্ণ একেবারেই নৈতিক বলে মনে করেন-নি। কী তাঁর করা উচিত ছিল, সে সম্বন্ধেও কৃষ্ণ সঞ্জয়ের কাছে সম্মানবশত ভীষ্মের নাম না করে কুরুকুলের ওপর গৌরবে বহুবচন চাপিয়ে বলেছেন—তখন কৌরবরা কুরুকুলের অন্যান্য যুবক-বৃদ্ধেরা একত্র হয়ে যদি ধৃতরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন দ্রৌপদীকে সভায় না আনার জন্য, তাহলেই ধৃতরাষ্ট্র আমার প্রিয় কার্যটা করতেন এবং তাতে তাঁরা ছেলেদেরও মঙ্গল হত—তাঞ্চেওদা তে সকুমারবৃদ্ধা/অবারয়িষ্যন্ কুরবঃ সমেতাঃ। এখানে 'কৌরবরা বলতে কৃষ্ণ ভীষ্মকেই বুঝিয়েছেন প্রধানত, কেননা তার আগের শ্লোকেই তিনি বলেছিলেন—ভীষ্ম প্রমুখ কৌরবেরা সব চুপ করে বসেছিলেন। তার মানে, কৃষ্ণ ভীষ্মের কাছে সেই গম্ভীর-বিশাল ব্যক্তিত্বটুকু আশা করছেন, যিনি সেই পরিস্থিতির গভীরতা বুঝে অত্যন্ত কঠোর হতে পারতেন ধৃতরাষ্ট্রের ওপর।

প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করার হুমকি অথবা কৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন—সেই পাশাড়েদের আমি মেরেই ফেলতাম—এমন একটা হুমকি কিন্তু ভীষ্মের কাছে আশা করেছিলেন কৃষ্ণ।

কাজেই যাঁরা বলবেন—ভীষ্মকে পাণ্ডবরা অন্যায়ভাবে মেরেছেন, সেটা কিন্তু এক পরম আত্মীয়ের মরণ-মুহূর্তের কারুণিকতা দিয়ে বিচার করলে নৈতিকতা হবে না। আপাতভাবে শিষ্টাচার-বিরোধী মনে হলেও এ-কথা মানতে হবে যে, দ্রৌপদীকে সভায় আনার ব্যাপারে ভীষ্মের চুপ করে থাকাটা চরম অনীতি এবং অধর্মের কাজ বলে গণ্য হয়েছে। তার মধ্যে যখন তাঁর চোখের সামনে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ আরম্ভ হল, তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপেরা ক্ষুব্ধ হয়ে খুব ঘেমে যাচ্ছিলেন এই পর্যন্ত—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত—কিন্তু তাঁরা কোনও প্রতিবাদও করেননি, সক্রোধে বারণও করেননি দুঃশাসন-দুর্যোধন কিংবা কর্ণকে। বিদুর চেঁচিয়ে মরেছেন শুধু—সভাসদ-সভ্যেরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন, এই রাজসভার সভ্যধর্ম সম্পূর্ণ পীড়িত হচ্ছে—সভ্যা ধর্মো' ত্র পীড্যতে। কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি সভা থেকে, ভীষ্ম-দ্রোণরা কিন্তু সেখানে বসেই ছিলেন। তারপর যখন অপমানের চূড়ান্তও শেষ হয়ে গেল, দ্রৌপদী চরম প্রতিবাদ করলেন রাজসভার সভ্যদের অস্তিত্ব নিয়ে, তখন ভীষ্ম মিন-মিন করে এও হয়, সেও হয় বলে প্রচুরতর নিরপেক্ষতায় ধর্মের সূক্ষ্ম গতি নিয়ে ভাবনা শুনিয়েছেন।

কুলবধূর এই চরম অপমানের মুহূর্তে এত 'ফিলসফি'-ব্যাপারটা কৃষ্ণ একেবারেই পছন্দ করেননি, বরঞ্চ সেটাকেই চরম অধর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন কৃষ্ণ এবং সেটা আমরা আগেই দেখেছি। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলেছিলেন—দুঃশাসন দ্রৌপদীকে শ্বশুরদের সামনে ধরে নিয়ে আসার পর একমাত্র বিদুর ছাড়া দ্রৌপদী আর কাউকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পাননি—নান্যং ক্ষত্তু র্নাথমবাপ কঞ্চিৎ। বস্তুত কৃষ্ণ মনে করেন—অন্যায়, অধর্ম যখন ঘটতেই থাকে ঘটতেই থাকে তখন সেই মহান ব্যক্তিত্বময় মানুষটির সর্বথা প্রয়োজন আছে, যিনি কথায় এবং কাজে চাবুক মেরে ধর্মসংগত কাজটা করাতে বাধ্য করবেন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপের ওপরে কৃষ্ণের এই ভরসা একেবারেই নেই বলে উদ্যোগ-পর্বের প্রথম অধ্যায়েই যখন পাণ্ডব-পাঞ্চাল-বৃষ্ণিদের 'মিটিং' বসেছে বিরাট-রাজ্যে, তখন সভাসূচনাতেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের ওপর চরম অত্যাচারের নিরিখে বলে দিয়েছিলেন— পাণ্ডবরা যদি এবার তাঁদের হৃতরাজ্য ফিরে না পান, তবে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের তো মরতেই হবে। আর দুর্যোধন যদি রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে প্রতারণা করতে থাকেন, তাহলে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা—যাঁরা তাঁর সুহৃদ বলে পরিচিত, তাঁরা তাঁকে বারণ করতেও পারেন, আর যদি তা না করেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, তাহলে যুদ্ধে তাঁদেরও মরতে হবে পাণ্ডবদের হাতে—যুদ্ধেন বাধেয়ুরিমাংস্তথৈব/তৈর্বধ্যমানা যুধি তাংশ্চ হন্যুঃ।

কাজেই মিটিং আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তেই যুদ্ধোদ্যোগের এই প্রকরণ শুরু হয়ে গেছে

যে, ভীষ্ম-দ্রোণরা যদি দুর্যোধনকে বাধা না দিয়ে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে আসেন, তবে তাঁদেরও মেরে ফেলার মধ্যে অনৈতিকতার প্রশ্ন আসবে না। আসলে কৃষ্ণের কথা ভাল করে বুঝতে হলে এটাই অনুধাবন করতে হবে যে, একটা চরম পর্যায়ের অনীতি এখানে অন্যতর তথাকথিত এক অনীতির জন্ম দিচ্ছে, যেটা বস্তুত নীতিই বটে, ধর্মই বটে। কথাটা মহামতি বিদুরের কথা থেকে আরও ভালো বোঝা যাবে। এমনকী বোঝা যাবে স্বয়ং দ্রৌপদীর কথা থেকেও। তবে বলতে পারেন—দ্রৌপদীর চেয়ে ধর্মের স্বরূপ বিদুর অনেক বেশি পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব। আর নিজের স্বার্থে দ্রৌপদী যদিও বা অভিসন্ধিমূলক কিছু বলতেও পারেন, কিন্তু বিদুর একেবারেই সঠিক ধর্মনীতির কথাই বলবেন।

কথাটা বিদুর উদ্যোগ পর্বেই বলেছিলেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে ফিরে আসার পর যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্গে সঞ্জয়ের বিরক্তি দেখে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হয়েছেন। তারপর বিদুরকে ডেকে এনে তাঁর মুখে ধর্মকথা শুনতে চাইলে অনেক কথার মধ্যে বিদুর বললেন—দেখুন মহারাজ! যে-মানুষ যে-মানুষের সঙ্গে যেমনভাবে চলে, সেই মানুষের সঙ্গে সেই মানুষের তেমনভাবেই চলা উচিত এবং সেটাই ধর্ম—তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ। অতএব কপট লোকের সঙ্গে কপট ব্যবহার করাই উচিত, আর ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের ব্যবহার—মায়াচারো মায়য়া বর্তিতব্যং। সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ।

লক্ষণীয়, বিদুরের মতো বিশালবুদ্ধি এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ একথা বললেও কিন্তু যুধিষ্ঠির এই পথে হাঁটেননি। হাঁটলে—শকুনির পাশা উলটে দিতে পারতেন তিনি, সত্যবদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে এতটুকুও তোয়াক্কা না করে ভীম রাজসভায় দাঁড়িয়েই বেদম মারতে পারতেন দুঃশাসনকে, কিংবা অর্জুন কর্ণকে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের জন্যই এসব হতে পারেনি, আর যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধতার জন্য যতকিছু করেছেন তার চেয়ে বেশি ধৃতরাষ্ট্রের আকুল লোভের প্রতি সম্মান দিয়ে তাঁর ইচ্ছের মর্যাদা রেখেছেন। বনবাসে যাবার পর এটাই বলেছিলেন দ্রৌপদী—যারা আমাদের সঙ্গে কপট আচরণ করেছে, তাদের কথা শুনে এই বনবাস-দুঃখ ভোগ করার মানে হয় না, উলটে তাদের আক্রমণ করে রাজ্য গ্রহণ করা উচিত। যুধিষ্ঠির এই কপট আবর্তে পা দেননি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে যাননি। তিনি সোজা পথে এবার যুদ্ধ চাইছেন।

হ্যাঁ, ভীষ্ম-দ্রোণরা সব দুর্যোধনকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন, অনেকেই বলেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন কথা শুনলেন না, তখন তাঁরা কিন্তু কোনও 'আলটিমেটাম' দুর্যোধনকে দেননি এবং যে মুহূর্তে দুর্যোধন সুকৌশলে ভীষ্ম কিংবা দ্রোণকে তৈলসিক্ত করে মহাবীরের মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু বার বার ভুলে গেছেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের বীরের 'ইগো'-টাই কাজ করেছে। খেয়াল করে দেখবেন, যুদ্ধোদ্যোগের প্রথম পর্বে দ্রুপদের দূত যখন যুধিষ্ঠিরের বার্তা বয়ে এনে একটু কড়া

মেজাজে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেছেন, তখন ভীষ্ম কিন্তু একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—আপনার সব কথা এবং অভিযোগগুলি সব সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলেই কিনা জানিনা—আপনার কথাগুলো বড় তীক্ষ্ণ, বড় কড়া। এই যে সামান্য একটু উষ্মা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন ভীষ্ম, তাতেই কর্ণ তাঁর ক্রোধের সূত্র পেয়ে এই সভাতেই সেই বিখ্যাত প্রত্যুক্তি করে বলেছিলেন—দুর্যোধন কারও ভয়ে এক পা মাটিও ছাড়বেন না—দুর্যোধনো ভয়াদ্ বিদ্বন্ ন দদ্যাৎ পাদম্ অন্ততঃ। এরপর ভীষ্ম হাজার বলেও, হাজার ধমকেও কর্ণ-দুর্যোধনদের নত করতে পারেননি। তাছাড়া যুদ্ধ লাগার প্রাক্‌মুহূর্তে সেনাপতি-নিয়োগের সময় ভীষ্ম-দ্রোণরা ঠান্ডা মাথায় কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একবারও কিন্তু তাঁরা বলেননি যে, পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে আমরা তোমার পক্ষে থেকে যুদ্ধ করবো না, দুর্যোধন।

ভীষ্ম-দ্রোণদের সমস্যা হল—তাঁরা সবসময় কতগুলি 'ইগো' এবং 'অবসেশন' -এ ভুগেছেন। পাণ্ডবদের নৈতিক দাবি তাঁরা মেনে নিচ্ছেন সব সময়, তাঁদের প্রতি তাঁদের পক্ষপাতও আছে, স্নেহও আছে, কিন্তু শেষ জায়গাতে এসে একদিকে যেমন যুদ্ধে বীরত্ব-প্রদর্শনের মোহ তাঁদের আপ্লুত করছে, অন্যদিকে কৌরবদের ছেড়ে না যাবার কারণ হিসেবে কৌরবদের অন্ন-ঋণকেই খুব বড় করে দেখাচ্ছেন তাঁরা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম-দ্রোণ একই কথা বলছেন—মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়—কৌরবকুলের অন্ন-অর্থ এতকাল ভোগ করে আমাদের আর উপায় নেই তাঁদের ছেড়ে যাবার। ভীষ্ম-দ্রোণের এই যুক্তি আমাদের কাছে নিতান্তই দুর্বল। কেননা, দিনের পর দিন দুর্যোধনের অন্যায়ের প্রতিবাদটাই তাঁদের অন্ন-ঋণের দায় মোচন করে দিতে পারত। আমরা বলবো—বরং জীবনের প্রান্তে এসে এই বৃহৎ যুদ্ধটা তাঁরা রীতিমত 'এনজয়' করেছেন—একটা বীরমানিতার বোধ বা 'ইগো' কাজ করেছে বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধেই আপ্লুত বোধ করেছেন।

ফলত শেষ জায়গায় এসে পাণ্ডবদেরও আর উপায় ছিল না, যুদ্ধের সেনাপতিকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া। সেখানে পাণ্ডবদের দিক থেকে অধর্মের প্রশ্নও ওঠে না, অনীতিরও নয়। বরঞ্চ নৈতিকতার দিকে পাণ্ডবরা কতখানি সচেতন, তা ভীষ্ম-দ্রোণের সেনাপতিত্ব-কালে প্রত্যেকটি যুদ্ধের শেষ জায়গায় এসে বোঝা যায়। ভীষ্ম দশ দিন ধরে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। নবম দিনের যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের চরম অবস্থা তৈরি হয়েছে—পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই মাঝে-মাঝে ভীষ্মের সমর সম্মুখে পড়েও কেউ মারা যাননি, ভীষ্ম সে চেষ্টাও করেননি। এখানে তাঁর স্নেহ-পক্ষপাত ছিল এবং দুর্যোধন হাজার বলেও ভীষ্মকে এই স্নেহ পক্ষপাত থেকে টলাতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধ তো শুধু এই পাঁচ পাণ্ডব ভাইকে নিয়ে নয়। পাণ্ডবদের অজস্র সৈন্য হতাহত হয়েছে, বিপুল ক্ষতিও হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। অতএব নবম দিনের যুদ্ধের পরেই যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন—কী করে আমরা এই ভয়ংকর ভীষ্মকে

আটকাব। লক্ষণীয়, এখনও পর্যন্ত যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে মারব কীভাবে—এ কথা মুখেও আনতে পারছেন না। কৃষ্ণ বললেন—তোমরা বললে আমি নামতে পারি যুদ্ধে—স মাং নিযুঙক্ষ্ব রাজেন্দ্র যথা যোদ্ধা ভবাম্যহম্। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করে দিতে চাননি। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ তাঁর সত্য-প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসবেন, এই অপনীতিও তিনি চাননি। তিনি বলেও দিয়েছেন সে কথা—আমি নিজের স্বার্থের গুরুতর প্রয়োজনে তোমাকে মিথ্যাবাদী হতে দিতে পারি না—ন তু ত্বামনৃত্যং কর্তুম্ উৎসহে স্বার্থগৌরবাৎ। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আরও বললেন—তার চেয়ে চলো, আমরা সবাই তোমার সঙ্গে পিতামহ ভীষ্মের কাছেই যাই। যুদ্ধারম্ভে তিনি আমার কাছে শপথ করে বলেছিলেন যে,—বাছা যুধিষ্ঠির! যুদ্ধ লাগলেও আমি তোমাকে তোমার হিতের মন্ত্রণা দেব, কিন্তু তোমার পক্ষে থেকে আমি যুদ্ধ করতে পারব না, দুর্যোধনের পক্ষেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

আমরা ভালো করে বুঝতে পারি না, ভীষ্ম কোনও প্রাক্তন ভাবনায় কুলধর্মের নৈতিকতায় ভোগেন কিনা। প্রসিদ্ধ ভরতবংশের মূলস্থান যে হস্তিনাপুর, যেখানে তাঁর পিতা শান্তনু, পিতামহ প্রতীপ রাজত্ব করেছেন, সেই বংশের মূলস্রোত যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের মাধ্যমে হস্তিনাপুরেই প্রবাহিত, এবং তিনিও যেহেতু এই বংশের লালন করেছেন আজীবন, হয়তো সেই কারণেই এক কৌলিক দায়িত্ব এবং নৈতিকতা তাঁর মধ্যে হস্তিনাপুরের পাশে থাকার আন্তর প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কিন্তু কী অদ্ভুত এই নৈতিকতা যে, যাঁর পক্ষে তিনি যুদ্ধ করেছেন তাঁর জয় তিনি চান না। তার জন্য নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিতে চাইছেন অন্যতর পক্ষকে, যারা ন্যায়ধর্মে স্থিত আছেন। অন্যদিকে, যুধিষ্ঠিরকেও দেখুন—যাকে তিনি মারতে চাইছেন, তিনি তাঁরই কাছে গিয়ে তাঁকে মারার অনুমতি চাইছেন, তাঁর কাছে গিয়েই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—কী করে আপনাকে হত্যা করব বলুন, আপনার মতো মহাবীর পুরুষ মারার শক্তি আমাদের নেই। ভীষ্ম আত্মগরিমা স্বীকার করে বলেছেন—হ্যাঁ, সত্যিই আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের জয় আসা সম্ভব নয়। অতএব আমাকে বধ করার উপায় বলছি শোনো।

ভীষ্ম শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে অর্জুনকে অস্ত্রপ্রহার করতে বলেছেন নিঃসংকোচে। কিন্তু আশ্চর্য এই মহাকাব্যিক নৈতিকতা যে, শত্রুর বধোপায় জানা সত্ত্বেও অর্জুন কেঁদে ফেলছেন কৃষ্ণের কাছে। বলছেন—আমি সেই ছোটবেলায় সারা গায়ে ধুলো মেখে এই বুড়ো ঠাকুরদার কোলে উঠে কতবার তাঁকে ধূলিধূসরিত করেছি, আর কতবার ডেকেছি বাবা বলেই। তিনি আলতো করে ভুল শুধরে দিয়ে বলতেন—আমি তোর বাবা নই রে, ছেলে! আমি তোর বাবারও বাবা—নাহংতাতস্তব পিতুস্তাতো'স্মি তব ভারত। অর্জুনের এই স্নিগ্ধ মানসাবস্থায় কঠিন কোনও কর্তব্যের দায় শেখাতে হয়েছে তাঁকে এবং বোঝাতে হয়েছে আপৎকালীন ধর্মের কথা। কৃষ্ণ বলেছেন—তোমার বয়োজ্যেষ্ঠই হোন, বৃদ্ধই হোন অথবা অনেক গুণের মানুষই হোন তিনি,

সে মানুষ যদি ঘাতকের মতো, আততায়ীর মতো ধেয়ে আসেন তোমার দিকে, তবে তাঁকে হত্যা করাটাই আপৎকালীন ধর্ম—আততায়িনম্ আয়ান্তম্ হন্যাদ্ ঘাতকম্ আত্মনঃ।

তাহলে কৃষ্ণের মতে ভীষ্মকে হত্যা করার প্রয়োজনটাও পাণ্ডবদের আপৎকালীন ধর্মের মধ্যে আসছে। কৌতুকের বিষয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শরশয়ান ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির যখন রাজনীতির শিক্ষা নিচ্ছেন, তখন আপৎকালীন ধর্মের আলোচনায় ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—আপৎ বা 'ডেনজার' কাকে বলে। ভীষ্ম বলেছিলেন—আপদ্ বিনাশভূয়িষ্ঠম্—এমন একটা স্থল, যেখানে প্রচুর বিনাশ বা জীবনহানি ঘটছে। জীবনটা যে সময় দাঁড়িয়ে আছে এক সংশয়িত সুতোর ওপর—শঙ্কনীয়ং হি জীবিতম্। ঠিক এই সব সময় প্রথাগত ধর্ম এবং নীতিকে মাথায় রেখে ভূরি বিনাশ অথবা শঙ্কিত জীবন বাঁচানোর জন্য যে সংশয়টা তৈরি হয়, সেখানেই আপৎকালীন অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে বুঝতে হবে। ভীষ্মের কাছে যাবার আগে যুধিষ্ঠির তাঁর এই অবস্থার কথা জানিয়ে বলেছিলেন—অমার্য ঘাট হয়েছে, আমি ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়েছি, প্রত্যেক দিন ভীষ্ম আমাদের শেষ করে দিয়ে যাচ্ছেন, শুধু একটা রাজ্য পাওয়ার জন্য এই বিশাল ক্ষয় আমি আর সইতে পারছি না। আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রতিদিন ভীষ্মের বাণে পীড়িত হচ্ছি—ক্ষয়ং নীতোঽস্মি বার্ষ্ণেয় রাজ্যহেতোঃ পরাক্রমী।

ঠিক এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণরা ভীষ্মের কাছেই গেছেন, ভীষ্ম তাঁর বধোপায় বলে দিয়েছেন এবং মমত্বের দুর্বলতায় ক্লিষ্ট অর্জুনের কাছে সমর-সম্মুখীন ভয়ংকর ভীষ্মকে আততায়ী ঘাতকের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে তবেই নীতির জায়গা খুঁজে বার করতে হয়েছে মহাভারতে। একই রকম নীতিশুদ্ধি তৈরি করতে হয়েছে দ্রোণাচার্যের ক্ষেত্রেও। তিনিও নীতিগতভাবে পাণ্ডব পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধকালে পাণ্ডবপক্ষের সৈন্য বাহিনীতে ধ্বংস নামিয়ে এনেছিলেন। তাঁরই সেনাপতিত্বকালে অন্যায়ের পথে মারা গেছেন পাণ্ডবদের স্নেহলালিত কুমার অভিমন্যু। মারা গেছেন বিরাট রাজা এবং পাঞ্চাল দ্রুপদ। অশেষ ধ্বংসের শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—শুধু যুদ্ধ করে দ্রোণাচার্যকে জেতা যাবে না—নৈষ যুদ্ধেন সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ কথঞ্চন। দ্রোণাচার্যকে যদি কোনও ভাবে অস্ত্রত্যাগ না করানো যায়, তবে যুদ্ধজয় অসম্ভব। তবে আমি বলব অর্জুন—এখানে জয়ের জন্য উপায় খুঁজতে হবে এবং সেই উপায়ের মধ্যে যদি প্রথাগত ধর্ম না থাকে, তো থাকবে না। প্রথাগত নিয়ম অতিক্রম করেই জয়ের চেষ্টা করো অর্জুন—আস্থীয়তাং জয়ে যোগং ধর্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ। দ্রোণাচার্য নিজেই এক সময়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—আমাকে যুদ্ধ থামাতে হলে বিশেষ কোনও অপ্রিয় খবর শোনাতে হবে। কৃষ্ণ সেই বার্তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—দ্রোণের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর শোনাতে হবে দ্রোণকে।

এক চিলতে 'নীতি' প্রতিষ্ঠার জন্য কতটা চেষ্টা করে মহাভারত অথবা এক চিলতে

অধর্ম যেখানে হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক যুদ্ধধর্মের মধ্যেও কতটা প্রচেষ্টা থাকে মহাভারতের যাতে সেই তথাকথিত অধর্মও ধর্ম বলে প্রতিপন্ন হয়। এটা কি ভাবা যায় যে, দ্রোণবধের জন্য কৃষ্ণ যে উপায় বলছেন, তা স্বয়ং তাঁর পরম সখা অর্জুনেরই পছন্দ হচ্ছে না। তিনি অনুমোদন করছেন না এই উপায়। এই অবস্থায় অর্জুনকে 'সাইড্ ট্রাক' করে কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু তিনিও ব্যাপারটা পছন্দ করেননি, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর অশ্বত্থামার মিথ্যা-মৃত্যুর খবর দেবার জন্য কত তোড়জোড়। পাণ্ডবদের স্বপক্ষীয় মালবরাজের একটা হাতি ছিল, তার নামও অশ্বত্থামা। নাম ভাঁড়ানোর জন্য সেই গোটা হাতিটাকে মেরে ফেললেন ভীম অর্থাৎ 'অশ্বত্থামা হত' বলার জন্য একটা সত্য প্রতিরূপ উপস্থাপন করা হল আক্ষরিক নৈতিকতার জন্য। তারপর ভীম দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে বললেন—মারা গেছে অশ্বত্থামা—অশ্বত্থামা হতঃ। ভীমের মুখে হঠাৎই কথাটা শুনে আচার্যের মাথায় একটা তড়িৎ প্রক্রিয়া শুরু হল বটে, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি হাজারে হাজারে পাণ্ডব সৈন্য মেরে ফেললেন। কিন্তু পুত্রের নিধনবার্তা তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনতে চেয়েছেন। স্বপক্ষের ভুয়োবিনাশ বা অতিরিক্ত প্রাণক্ষয় বন্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত বলেছেন—হ্যাঁ, অশ্বত্থামা মারা গেছে—তবে সেটা একটা হাতি। এই শেষাংশটুকু অনুচ্চস্বরে বললেন যুধিষ্ঠির।

আমি বোঝাতে চাইছি—মহাভারতের নৈতিকতা এবং ধর্মের অভিসন্ধিগুলি কত কঠিন, জটিল বহুমুখিতায় সম্পন্ন হয়। এটা তো মানতেই হবে যে, দ্রোণাচার্য কোনওভাবেই পিতামহ ভীষ্ম নন। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অনেক মমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বার্থের কারণেই কৌরবদের রাজবাড়িতে প্রবেশ করেছেন। পাঞ্চাল দ্রুপদের অর্ধরাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে, কিন্তু সেই অর্জিত রাজ্যে তিনি রাজত্ব করতেও যাননি। তিনি থেকে গেছেন হস্তিনাপুরীর বৃহত্তর রাজনীতিতে অন্যতম নায়কের ভূমিকায়। যুদ্ধের সময় কুমার অভিমন্যুর মৃত্যুতে আচার্যের ভূমিকা ছিল এবং তিনি অনন্ত বিনাশ ঘটিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডব বাহিনীতে। এই অবস্থায় কৃষ্ণের কথা মতো যুধিষ্ঠিরের এই মিথ্যাভাষণ অন্যায় হয় না। কিন্তু তবু সেই নৈতিকতার অভিসন্ধিতে মমত্বের সংকোচ, সম্বন্ধের সংকোচ, মহাকাব্যিক সংকোচ। দ্রোণকে শেষ সময়ে অস্ত্রাঘাত করে মারার জন্য অর্জুনের অনর্গল তিরস্কার নেমে এসেছে ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর। তার মানে আপতকালীন ধর্ম হিসেবে দ্রোণকে মেরে ফেলার ব্যাপারটা ব্যাকরণগত প্রকরণে শুদ্ধ হয়ে উঠলেও এই নৈতিকতা খানিক যেন লঙ্ঘিত হয় অর্জুনের অনুতাপে। আর সর্বশেষে শুধুমাত্র এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় মিথ্যা-উচ্চারণ করার পরেও সামান্য অপরাধে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের অন্তিম ব্যঞ্জনা বিপ্রতীপভাবে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথাগত নৈতিক ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, ধৈর্য এবং ক্ষমাতেই নৈতিকতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা।

বরঞ্চ বলব—কর্ণ অথবা দুর্যোধনকে যেভাবে মারা হয়েছে, তাতে নৈতিকতার দায় অনেক কম। একজনের রথের চাকা মাটিতে বসে যাবার পরেও তাঁকে মারা হচ্ছে আর একজনকে নাভির তলদেশে উরুতে আঘাত করে। এখানে আপাতদৃষ্টিতে দুই জায়গাতেই যুদ্ধনীতির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জীবনের মধ্যে কর্ণ এবং দুর্যোধন যত অনর্থপাত ঘটিয়েছেন, যত অসভ্যতা করেছেন, সেখানে বিদুরের নৈতিক যুক্তি প্রমাণসহ হয়ে ওঠে—যে সারা জীবন কপটতা করেছে, তাকে কপটতা দিয়েই জবাব দিতে হবে—মায়াচারো মায়য়া বর্তিতব্যঃ/সাধ্বাচারো সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ। লক্ষণীয়, কর্ণকে শেষ অস্ত্র প্রহার করার আগে কীভাবে তিনি রজস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি দ্রৌপদীকে বেশ্যা প্রতিপন্ন করে কৌরবদের ঘরে বেশ্যাবৃত্তি করতে বলেছিলেন, কীভাবে ভীমকে বিষ খাওয়ানোর মন্ত্রণা করেছিলেন, কীভাবে জতুগৃহের মৃত্যুদাহ তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন—পাশাখেলা, পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠানো, সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, অভিমন্যুকে চরম অন্যায়ে হত্যা করা—এই সমস্ত অন্যায় একটা একটা করে স্মরণ করিয়ে দেবার পর কর্ণকে মেরে ফেলাটা নৈতিকতার জায়গায় চলে যায়। দুর্যোধনের ক্ষেত্রেও একই কথা, তাঁর প্রকৃত অন্যায়ের বিরাট তালিকা যুদ্ধভূমিতে কৃত অন্যায়টাকে বিপ্রতীপভাবে সিদ্ধ করে এবং সেটাকে নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠা করে।

সর্বশেষে জানাই, মহাভারতের নৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আরও শতেক আলোচ্য বস্তু ছিল—সে আলোচনায় পরিসর নেই বলে তার সূচনাও করতে চাই না আমরা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে—অন্তত মহাভারতের বিশাল ব্যাপ্ত মহাকাব্যিক ভূমি থেকে বিচার করলে এটাই শেষ কথা হয়ে উঠবে যে, জীবন এখানে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার আদর্শের চেয়ে অনেক বড়। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মহাকাল রান্না চাপিয়েছেন আমাদের এই পৃথিবীর কড়াইতে। আমাদের মায়া-মোহ লোভ তৃষ্ণাময় এই বিরাট পার্থিব কড়াইতে আমাদেরই চাপিয়ে মহাকাল রান্না চাপিয়েছেন। দিনের প্রকাশ-প্রতীক সূর্য আর রাত্রির প্রকাশ প্রতীক আগুন—এই দুইয়ের ইন্ধনে আমরা নিত্যকাল সেদ্ধ হয়ে চলেছি। দিন রাত্রি, মাস বৎসর আর ছয় ঋতু—এই হল মহাকালের হাতা খুন্তি ঝাঁঝরা—মহাকাল আমাদের সকলকে ঘেঁটে ঘেঁটে রান্না করছেন—অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে/সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন। ঈশ্বর জানেন—এই যে লোভ-মোহ-মায়ার সতত পরিবর্তনশীল জীবন, যেখানে ক্ষুধাশান্তি করে জীবন বাঁচানোর জন্য কুকুরের অস্ত্র যাচনা করতে হয় চণ্ডালের কাছে, যেখানে বেড়াল বেজি পেঁচার হাত থেকে বাঁচার জন্য ইঁদুরকে প্রাথমিক বন্ধুত্ব করতে হয় বেড়ালের সঙ্গে, যেখানে কর্ণের মতো সূর্যপুত্রকে গর্ভে ধারণ করেও সামাজিক সমন্বয়ের জন্য স্বামীর কাছে চেপে যেতে হয়, যেখানে শুধু গৃহকর্তার দেওয়া ভাত খেয়েছি বলে সত্যের পক্ষপাত ত্যাগ করে গৃহকর্তার জন্য যুদ্ধ করতে হয় এবং যেখানে সমস্ত অন্যায়ের

দায় আপন স্কন্ধে বহন করার জন্য কৃষ্ণকে ধর্মনিত্যা গান্ধারীর অভিশাপ গ্রহণ করতে হয় সানন্দে—সেই বিশাল ভারতীয় সমাজে নীতি, নৈতিকতা এবং ধর্মের মাত্রা কখনও একরকম হতে পারে না। ভারতবর্ষের বিচিত্র মানুষ ভেদ, বিচিত্র দেশ ভেদ এবং ততোধিক বিচিত্র সাংস্কৃতিক ভেদ—এখানে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম সিদ্ধান্তই সবথেকে সত্য—এখানে ধর্মকেও অধর্মের মতো দেখতে লাগে, অধর্মকেও কখনও কখনও দেখতে মনে হয় ধর্মের মতো, আবার কোনও জায়গায় ধর্ম ধর্মের মতোই দৃশ্যমান—মানুষকে তার পরিশীলিত বুদ্ধি দিয়েই ধর্ম এবং ন্যায়কে বুঝে নিতে হবে—বিদ্বাংসস্তং সম্প্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা।

মহাভারতবংশে এই দেশের সকলের জন্ম। তাঁরা সত্য কাকে বলে জন্ম থেকেই জানেন, ধৈর্য এবং ক্ষমা কত বড় ধর্ম, তা তাঁরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন, দান করা বা বিনয়ী হওয়া যে ভদ্রজনের অভিমত, সেটাও তাঁরা বিলক্ষণ বুঝতে পারেন। এমনকী চিরন্তন এই ধর্মমর্মও তাঁরা জানেন যে, প্রচুর পরিমাণ ঘুমিয়ে নিদ্রাজয় করা যায় না, প্রচুর রতিসম্ভোগ করেও রতিতৃপ্তি হয় না, প্রচুর ইন্ধনের ব্যবস্থা রেখে অগ্নি নির্বাপণ করা যায় না এবং প্রচুর সুরাপান করেও সুরাপানের আসক্তি ত্যাগ করা যায় না। নিবৃত্তিই যে এখানে একমাত্র উপায় সেটা আমাদের দেশের লম্পটরাও জানেন, জানেন সুরাসক্তরাও। কিন্তু মহাভারত দুটি কথায় যে ধর্মটাকে জানিয়েছে এবং সেই ধর্মটাকেই যে মহাভারত সবার ওপরে রেখেছে, সেটা অনেকেই জানেন না। বস্তুত তাতেই সমস্ত ধর্মের বিভ্রান্তি ঘটে যায়। মহাভারত বলেছে—তোমার কাছে যে অন্যায়টা অন্যে করলে তোমার খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে, সেই অন্যায়টা তুমি অন্য মানুষের ওপর কোরো না—ন তং পরস্য সন্দধ্যাৎ, প্রতিকূলং যদাত্মনঃ। যে মানুষ নিজে বেঁচে থাকতে চায়, সে যেন কখনও অন্যের জীবন নষ্ট না করে। মহাভারত বলেছে—ধর্মের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ এটাই—তোমার নিজের যেটা ভালো লাগছে না, সেটা অন্যের ওপর প্রয়োগ কোরো না—ন তৎ পরেষু কুর্বীত জানন্ অপ্রিয়মাত্মনঃ।

জমি-অধিগ্রহণ ঃ তৎকাল

এক একজন ডাক্তার আছেন, যাঁরা বিভিন্ন রোগের ভয়ঙ্করী বর্ণনা দেন, বিভিন্ন রোগ-জীবানুর বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের কথা বলেন। তাতে প্রায় মনে হয় আমরা বেঁচে আছি কী করে? কোনও রোগ না হওয়াটা তো আশ্চর্যের। শরীর ভাল থাকার সময় আমরা খুব একটা ভাবিও না এ-সব নিয়ে, কিন্তু শরীর খারাপ হলে—মাথায় পড়িলে তবে বলে বজ্র বটে। একই ভাব দেখি নির্বাচনের সময়। একমাত্র নির্বাচনের সময় ছাড়া গ্রাম, গ্রামের মানুষ, নদী-জল, কৃষিভূমি, সার, চাষ—এ-সব নিয়ে শহরের মানুষ মাথা ঘামান না, রাজনৈতিক নেতারাও মাথা ঘামান না। শুধু গুটিকতক লোক, বিদ্বান-বিদ্যাবতীরা, যারা উচ্চাশার দায়ে 'থিসিস' করে তারা বিষয়ভিত্তিক অনুপ্রেরণায় লিখে ফেলে যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা মূলত কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। গ্রামই এ-দেশে প্রথম সামাজিক বর্গ এবং চাষ-আবাদ, হল-লাঙল-বলদই আমাদের প্রধান উপজীব্য এবং তা কোটি কোটি মানুষের উপজীব্য।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে রাজনৈতিক নেতাদের দেখলে। শহরে জন্মানো, বড় হওয়া অতঃপর চাকরি সূত্রে আরও বড় শহরে চলে যাওয়া লোকেরা যা বলার বলতে থাকুন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা তো আর সবাই শহর থেকে নির্বচিত হন না। কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম কেন্দ্রিক জেলা থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, শহরে এবং শহরের স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদেরও বুঝি অতিরিক্ত টানে বলেই, তাঁরাও হয়তো গ্রামের খবর আর তেমন করে রাখেন না। বিশেষত গ্রামের মানসিকতাও তাঁরা বোঝেন না। একজন কৃষকের কাছে তাঁর কৃষিজমি যে কী বস্তু, একজন গ্রাম্য মানুষের কাছে তাঁর খাল -বিল- পুকুর এমনকী ভিটের ওপর একটা প্রায় নিষ্ফল আমগাছও যে কী বস্তু, তা শহরের অধিকাংশ মানুষের বোঝার ক্ষমতা নেই। ।

যারা পূর্ববঙ্গ থেকে ভয়ত্রস্ত ভাবে এ-দেশে পালিয়ে এসেছিলাম, তারা কৃষিজমি এবং বসত ভিটের জন্য বাপ-ঠাকুরদার হাহাকার দেখেছে। লক্ষণীয়, এই সব বাপ-ঠাকুরদারা অনেকেই নিজেরা জমি চাষ করতেন না, চাষ করাতেন এবং জমির ফসল ভোগ করতেন, তাদেরই এই হাহাকার। সেখানে চাষি-কৃষকেরা কী হতে পারে। দূরদর্শী ব্যক্তিরা যখন এ-দেশে চলে আসেন, আমার খেয়াল আছে, চাষি-কৃষক-খেতমজুরেরা কিন্তু তখনও অনেকেই ও-দেশে থেকে গিয়েছিলেন

কৃষিজমির মায়ায় এবং আশায় যে, তাঁরা খেতি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের ভাত মারবে কে? অন্তত যত দিন কৃষিজমির অস্তিত্ব আছে। দুর্ভাগ্য, সে দিনের নক্ষত্র আলোকে তাঁরা ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি। রাজনৈতিক জাতি বিদ্বেষের উস্কানি ছিল সর্বত্র, দেশভাগ হয়ে যাবার পর জমিদার-বাবুদের জমি-লেখা-পড়া ছাড়াই হাত বদল হয়ে গেল। মনে আছে—যাঁরা চাষ করতেন, তাঁদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্গের হিন্দু যেমন ছিলেন, তেমনই নিম্নবর্ণীয় মুসলমানরাও ছিলেন, যাঁদের বলা হ'ত 'গেরস্ত'। কী কারণে যে তাঁদের জাতিচিহ্ন 'গেরস্ত' হল, তা জানা যায়নি। কিন্তু এককালে যাঁরা সম্পন্ন, বাবুদের ফসল -ভাগের ব্যাপারে তিন ভাগ আর কৃষকেরা এক ভাগ থেকে 'বাবুদের অর্ধেক এবং কৃষকেরা অর্ধেক' করার ব্যাপারে একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন সযৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবেই, অথচ তাঁরাই—বাবুরা যেখন দেশান্তরী হলেন তখন নতুন ভাগাভাগির মধ্যে পড়লেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক জাতি বিদ্বেষ, আমরা তার মধ্যে যাব না। শুধু বলতে চাই — নিম্নবিত্ত কৃষকেরাও এবার দেশান্তরে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কৃষিকর্ম ছেড়ে আসা মানুষগুলির দুঃখ আর হাহাকার আমি দেখেছি। অন্যের মালিকানায় ভাগে কাজ করলেও সেই জমির ওপর তাঁদের স্বপুত্রবৎ মায়া ছিল। এ-দেশে এসে একটি প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর উপর পুনরায় জমির কাজ পাওয়া অত সহজ ছিল না। ফলত কেউ সামান্য মুদিখানার কাজ, লোকের কাজ, অথবা আত্মীয়ের বাড়িতে ভার হতে-হতে অন্য কাজ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু জমির জন্য মায়া তাঁদের এখনও যায়নি।

জমি থেকে লাভই বা কী হয়? এখন তো চাষের কাজে ভাগচাষির তিন-এক ভাগ, কিন্তু সবরকম খরচা করে তিন আনার ভাগে ধান চাষে যে লাভ থাকে, তাতে প্রতিবারই শুনি— কিছুই থাকে না, বাবু! তবু ওই কলাডা-মুলোডা, পটল-ঝিঙেতে চলে যায় কোনও রকমে। তবু জমি ছেড়ে এঁরা অন্য কাজ শিখবেনও না। চাকরিও করবেন না। ভাগ্যিস, অন্য কাজ আর চাকরি করলে আমাদের আর খাবার জুটত না। স্বার্থপরের মতোই বললাম কথাটা কিন্তু এমন স্বার্থপরের মতো বলি বলেই আমাদের আরও সচেতন হয়ে ভাবা উচিত যে, এই সব অশিক্ষিত এবং চিরকালীন দরিদ্র এই চাষিদের কাছে জমি বস্তুটা কী?

আসলে কতগুলি কাজ, কতগুলি ভাবনা, কতগুলি সংস্কার হাজার হাজর বছর ধরে পরিচর্চিত হতে হতে মানুষের অন্তর্গত হয়ে যায়। জমি এবং জমির ফসলও তাই। এটা অনেকেই বোঝেন আর্য জনজাতি চাষ-আবাদ জানত না। খানিকটা যুদ্ধপ্রিয় হওয়ার ফলে এবং অনেকটাই খাদ্যের অন্বেষণে এখান থেকে ওখানে তারা 'চরৈবেতি' করেছে। কিন্তু চাষের ব্যাপার যখন তারা ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠীর কাছেই শিখল, তখন থেকে জমির ওপর তাঁদের অনন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। মাটি তাঁদের কাছে দেবতা হয়ে গেছে; সমস্ত সম্পদের আধার হয়ে উঠেছে এক-একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভূমি। এটা স্বাভাবিকই এবং অতীত কালান্তরের হিসেব কষলে সতত বিচরণশীল এক

জনজাতি কতটাই বা সময় নিয়েছে এটা বুঝতে যে, বাসস্থানের জন্য যেমন ভূমির প্রয়োজন, তেমনই খেয়ে বাঁচার জন্যও সেই ভূমিরই প্রয়োজন। মনে আছে, পশুচারণকারী আর্যরা যখন এই উর্বর ভারতীয় ভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন, তখন ঘনবৃক্ষ-সমন্বিত অরণ্যভূমির মধ্যে তাঁদের গরু হারিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। এই অবস্থায় ইন্দ্রের কাছে তারা মধুর প্রার্থনা করে বলেছিল--হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ, সুখময়, ভয়শূন্য লোকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও আলোয়, যেখানে ভয় নেই। আমরা ভ্রমণ করতে করতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমাদের গরুগুলি আর বিচরণ করতে পারছে না। তার মধ্যে যত দস্যু-তস্কর তারাই তো এই ভূমি আশ্রয় করে রয়েছে— অগব্যুতি ক্ষেত্রম্ আগন্ম দেবা/উর্বী সতী ভূমিরংহুরণাভূৎ। তুমি আমাদের পথ দেখাও, ইন্দ্র।

সবাই জানে, ভারতের প্রাচীনতর অধিবাসীদেরই 'দস্যু' বলে চিহ্নিত করেছিলেন আর্যরা এবং অন্য জায়গার মানুষদের সঙ্গে এত গরু দেখে অনার্যদের পক্ষে দু/চারটে গরু এদিক/ওদিক সরিয়ে ফেলাটাও কিছু অসম্ভব নয়। এর পরেই তো সংঘর্ষের শুরু আর্যদের সঙ্গে তথাকথিত দাস-দস্যুর। সংঘর্ষ মিটলও বটে, পারস্পরিক জানাজানি এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ হল। আর্যরা চাষের জমি চিনলেন, ক্ষুধার অন্ন পেলেন পর্যাপ্ত। এবার ইন্দ্রের কাছে পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় হল— ইন্দ্র নাকি বিশেষ ভাবে বুঝেই তাঁর সখাদের বড় বড় জমি এবং গবাদি পশু ও দান করেছেন —মহি ক্ষেত্রং পুরুশ্চন্দ্রং বিবিদ্বানাদিৎ সখিভ্যশ্চরয়ং সমৈরৎ। সভ্যতার প্রথম যুগে, যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা তেমন করে চালু হয়নি, তখন জমিগুলো বড়-বড়ই থাকার কথা। কেননা চাষাবাদ তখন এক-একটা গোষ্ঠীর হাতে ছিল বলেই পণ্ডিতরা ধারণা করেন। একটা সঠিক যুক্তিও এখানে আছে। যে জনজাতি শিকার ধরার জন্য অস্ত্র বানাত, তারা শিকারে যেত গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেই; এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলি যখন শিকার ছেড়ে কৃষিকর্মের দিকে তাকাল, তখন প্রাথমিক ভাবে এক -একটি গোষ্ঠী হিসেবেই তারা বড় বড় জমি চাষ করতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ আর্যদের মধ্যেই যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল যারা প্রথমে পঞ্চনদী অতিক্রম করে এলেও ক্রমে সরস্বতীর দৃষদ্বতীর অন্তরভূমি ছাড়িয়ে পূবদিকে যে গঙ্গা নদীর অববাহিকা ধরে চলে এল, সেখানে পর্যায়ের পর পর্যায়ে আর্যজনগোষ্ঠীরা গোষ্ঠী হিসেবেই বড় বড় জমি দখল করেছে এবং জমি চাষ করেছে।

যে গোষ্ঠী যে জমি পরিস্কার করে চাষ করেছে সে জমিতে অবশ্যই সেই গোষ্ঠীর অধিকার বর্তেছিল— এ-কথা প্রাথমিক ভাবে অবশ্যই এক ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এ-কথাও মানতে হবে যে, এক একটি বড় চাষের জমি যত দিন আর্য জনজাতির গোষ্ঠীগুলির হাতে ছিল, তত দিনেও কিন্তু একটি সুষ্ঠু কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কেননা বেদের মধ্যে হল- লাঙল নিয়ে বারো-তেরো বার চিন্তা ভাবনা থাকলে গরুর চিন্তা ছিল অনেক বেশি এবং প্রায় অসংখ্যবার দেবতাদের কাছে গরুর প্রার্থনা চলেছে। তার মনে, পশুপালনের স্মৃতি তখনও যায়নি। তাছাড়া জমি দখল, নতুন জমির সন্ধান এবং

সেই জমির জন্য তথাকথিত অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং অবশেষে পরস্পর সহাবস্থানের সময় যখন এসে গেল, তখন কিন্তু বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেল। ঋগ্‌বেদের মধ্যেই যেহেতু বর্ণব্যবস্থার সূত্র রয়ে গেছে, তাতে এটাও ধারণা করা যায় যে, কৃষিজমিতে ফসল ফলানোর জন্য যে বিপুল পরিশ্রম লাগে, সেই পরিশ্রমের জোগান আসছিল অবদমিত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেই, কেননা তাঁরা অনেকেই আর্যসম্মত বর্ণ-ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণ শূদ্র হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন বৈদিক কাল থেকেই।

সমাজে পূর্ণাঙ্গ কৃষিব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু জমির বন্টন-ব্যবস্থাও একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়ল। বিশেষত সঙ্গে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় একটি সুগঠিত রাজতন্ত্র গড়ে উঠল, তখন জমির স্বত্ব, জমির মালিকানা ব্যাপারটাও ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। শূদ্র চাষ-আবাদের শ্রম দিতে থাকলেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি এবং বল দিলেন, বাকি রইলেন শুধু বৈশ্যেরা। বস্তুত কৃষিকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উন্নয়নে যাঁরা সবচেয়ে সাহায্য করেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই বৈশ্য। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন—গরু চরানো, গো-বৃদ্ধি, অশ্ববৃদ্ধির ব্যাপারগুলির সঙ্গে আগে বৈশ্যরাই প্রধানত জড়িত ছিলেন, সেই বৈশ্যরাই পরে কৃষির সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সার্থক 'এগ্রিকালচারালিস্ট' হয়ে উঠেছিলেন—পণ্ডিতের ভাষায়—In India the Vaisya was first a tender of cattle; then from the Vedic period onwards an agriculturalist or cattle-man; and lastly a trader.

মনুর লেখা বিখ্যাত শ্লোকটি ভদ্রলোক উল্লেখ করেননি বটে, কিন্তু সেই শ্লোকে 'বার্তা' নামক পারিভাষিক শব্দটি বোঝানোর সময় টীকাকার কুল্লুকভট্ট বৈশ্যের কাজ উল্লেখ করে বলেছেন—'কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যম্'। গোরক্ষণের কথাটা মাঝখানে এলেও টীকায় কালক্রম অনুসারে সাজানো হয়নি, বরঞ্চ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সমাসে অল্পাক্ষর ছোট শব্দ প্রথমে আসে বলেই পণ্ডিতজনের গবেষণার পদ্ধতিটা একেবারেই ঠিক আছে বলে মনে হয়।

এ-পর্যন্ত বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় কৃষিজমির মালিকানা এবং বন্টন নিয়ে। এ-কথা অবশ্য বলে নেওয়া ভাল যে, কৃষিকর্ম একান্ত ভাবে বৈশ্যের কাজ হলেও কৃষি জমির দিকে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কোনও নজর ছিল না, এ কথা ভাবলে খুব ভুল হবে। খোদ্ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই অপালার বক্তব্যে শুনি—তিনি তাঁর পিতার ঊষর জমিটি যাতে ফসল ভরে ওঠে তার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন আর সেই বিখ্যাত অক্ষসূক্ত, যার ঋষি হলেন কবষ ঐলূষ। প্রমাণ আছে—কবষ ঋষি আদি জীবনে শূদ্র ছিলেন, যজ্ঞস্থান থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে তপস্যার মাধ্যমে তিনি ঋষির মর্যাদা লাভ করেন এবং ঋগ্‌বেদের অনেকগুলির মন্ত্র তাঁরই দার্শনিকতায় সৃষ্ট। নিম্নবর্ণীয় ছিলেন বলেই নয়, তবে জীবনের কোনও সময়ে তাঁর জুয়ো খেলার অভ্যাস ছিল। ঋষি অবস্থায় সেই পাশা

খেলার চরম নিন্দা করে শেষে তিনি নিজেকেই কৃষিকর্মে নিয়োগ করার জন্য কৃষির প্রশংসা করে বলছেন— পাশা কখনও খেলো না, বরং কৃষিকার্য করো। তাতে যা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও এবং কৃতার্থ বোধ করো। তাতে ঘরে বউ আসবে, গরুও পাবে অনেক— অক্ষৈ র্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব/ তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া.....।

ঋগ্‌বেদের এই দুটি মন্ত্র থেকে তিনটি জিনিস পরিস্কার হয়ে যায়। এক, অপালা তাঁর পিতার নামে চিহ্নিত করে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বা জমিতে শস্য প্রার্থনা করছেন। তার মানে কি তখন সেই ঋগ্‌বৈদিক কালেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এসে গেছে? দ্বিতীয়ত বোঝা যায় যে, বৈশ্য শূদ্র ছাড়াও ব্রাহ্মণেরাও কেউ কেউ কৃষিজমিতে ফসল ফলানোর লাভালাভ বুঝতে পারতেন এবং সময়কালে কৃষিকর্ম করতেন। তৃতীয়ত, এটা বোঝায় যে, কৃষিকর্মে অর্থ আসে এবং অর্থ থাকলে ভাল বউও পাওয়া যায়। চতুর্থত, এই দুই মন্ত্রে না বলা হলেও বুঝতে পারি যে, ক্ষত্রিয় বর্ণ রাজ্যরক্ষা এবং মানুষের কল্যাণের বিষয়ে প্রধানত নিযুক্ত থাকলেও কৃষিজমির পণ্যের ওপরে রাজকরের ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত থাকতেন। এমনকী কেউ কেউ কৃষিকর্মও করতেন। মহাকাব্য রামায়ণে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার এতটুকু অতিক্রম যেখানে দেখা যায় না, সেখানে রামের শ্বশুর জনক রাজাকে আমরা স্বয়ং হল-লাঙল নিয়ে কৃষিকর্ম করতে দেখেছি। প্রাচীন টীকাকার ক্ষত্রিয়-রাজার এহেন হীন কর্ম দেখে 'জাস্টিফাই' করার জন্য বলেছেন—নিজের যাগযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র করার জন্যই জনক-রাজা খানিক কৃষিকর্ম করতেন।

এবারে আসল কথায় আসা যাক — জমির মালিকানা। সত্যি বলতে কী, অপালার পিতার নামে চিহ্নিত কোনও জমির কথা বললেও ঋগ্‌বেদের সেই কালে কৃষিজমির কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। খুব বেশি হলে ওই জমিটুকুর ওপর অপালার পিতার ভোগ-দখলের স্বত্ব ছিল, এইটুকু বলা যায়। আর ভোগ-দখল, যাকে ইংরেজিতে বলি 'occupation and use', সেটা থাকাই স্বাভাবিক, তা না হলে জমিগুলোর চাষ-আবাদ হবে কী করে, ফসলই বা উঠবে কী করে, আর ফসল বেচে লক্ষ্মীলাভই বা হবে কী করে। ব্যক্তি মানুষের এই ভোগ-দখলের স্বত্বটা আরও সপ্রমাণ হয়ে ওঠে ঋগ্‌বেদের আরও একটি মন্ত্র থেকে এবং সেখানে দেবতারা অনন্তকালকে মাপছেন, ঠিক যেমন ব্যক্তিমানুষকে বাঁশের লাঠির মতো কোনও প্রমাণকে বস্তু দিয়ে জমি মেপে দেওয়া হয়।

বস্তুত এটাও হয়তো ভোগ-দখলের জন্যই, পণ্ডিতজনেরাও তাই মনে করেন। কেননা, একেবারে সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিতে জমি-ভূখন্ড মানেই সেটা সকল মানুষের সম্পদ, কারও একার সম্পত্তি নয়। ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্ন বোধহয় তখনই আসে, যখন সে জমি কেনা যায়। বিক্রি করা যায়, বিনিময় করা যায় অথবা নিদেন পক্ষে দান করা যায়। সারা বেদ-ব্রাহ্মণ জুড়ে এমন, একটি অংশও দেখানো যাবে না। যেখানে কেউ জমি কেনা-বেচা করছে অথবা কেউ কাউকে জমি দিচ্ছে। এমনকী রাজারও কোনও

অধিকার নেই জমির ওপর যে, তিনি প্রীত হয়ে কাউকে জমি দেবেন, অথবা ক্রুদ্ধ হয়ে কারও জমি নিয়ে নেবেন। অর্থাৎ 'প্রাইভেট ওনারশিপ'ও ছিল না, 'টেস্ট ওনারশিপ'ও ছিল না। বেদের যুগে রাজা রাজত্ব পাচ্ছেন প্রজাদের রক্ষা করার জন্য, কিন্তু সেই রাজত্বে তাঁর নিজের বসবাস করারই কোনও জমি নেই। অথর্ববেদের মধ্যে রাজত্বে অভিষেকের পর দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে—থাকার জন্য এই রাজাকে একটা গ্রাম দাও, ঘোড়া দাও, গরু দাও। তার মানে রক্ষকর্তা রাজার জন্য যে জমিটি, সেটাও একটি ভূমিখণ্ডের জনসমূহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, সেখানে রাজার কী অধিকার থাকবে জমির ওপর যে, তিনি অন্যকে জমি দেবেন?

আসলে প্রাচীনকালের বিচার করতে গিয়ে মালিকানা, অধিকার বা 'ওনারশিপ'-এর সঙ্গে ভোগস্বত্ব বা পজেশন ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলেছেন অনেকেই। বৈদিক যুগে ভূমি যেহেতু দেবতার আদলে চিহ্নিত হয়েছে, অতএব সেটা কাউকে দেবার বিষয়ও ছিল না, আবার একছত্রে জমি নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করারও অধিকারী ছিল না কেউ। বেদে যা আছে, তা হল—বসতি করার জন্য, কৃষিকর্ম করে খাবার জন্য জমি দরকার, সেটা জাতিমুখ্য বা উপজাতীয় মুখ্যের সম্মতিক্রমে এবং অন্যান্যদের অবিরুদ্ধতায় পেয়ে যেতেন একজন ব্যক্তি মানুষ এবং তা পেতেন অবশেষে রাজার মাধ্যমেই যাঁকে যম বলা হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান বা বসতিস্থলকে এই ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'অবসান', যেখানে গড়ে উঠেছে নতুন গার্হস্থ, অথবা পুরাতন পরম্পরায় নবীন গার্হপত্য। শতপথ ব্রাহ্মণ মানুষ বলছে— এই পৃথিবীতে যম আমাকে এই বসতটুকু দিয়েছেন— অদাদ্ যমো অবসানং পৃথিব্যাঃ, পৃথিবীতে সব বসতিগুলির ওপর যমই তো আধিপত্য করেন এবং সেই তিনিই আমাকে এই বসতটুকু দিয়েছেন। আমার পূর্ব পিতা পিতামহেরা এই জমি তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য। কিন্তু যমই হলেন ক্ষত্রিয়, প্রশাসনিক অধিপতি, আমার পূর্ব-পিতা-পিতামহেরা হলেন বসতকারী সংস্থা। অতএব ক্ষত্রিয় অধিপতি যদি বসতকারী সংস্থার সম্মতিক্রমে একটি স্থান আমাদের থাকার জন্য অনুমোদন করেন, তবে সেটা যেন সঠিক ভাবে ব্যবস্থা করা হয়। অতএব আমাদের ক্ষত্রিয় যম আমাদের উপজাতীয় সংস্থার সম্মতিক্রমে, আমাদের পিতা-পিতামহদের সম্মতিক্রমে এই যজমানকে, আমাকে আমার গার্হস্থগঠনের জন্য জমি দিন।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই বক্তব্যটা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে পণ্ডিতেরা বলেছেন। প্রথমত এই যম-যজমান-সংবাদ থেকে প্রমাণ হয় যে, জমি ব্যাপারটা মনুষ্য সমাজের, এটা একটা নির্দিষ্ট প্রজন্ম কিংবা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অধিকৃত বস্তু নয়। দ্বিতীয় একটি নির্দিষ্ট জমি বংশ বংশ ধরে গড়ে তোলা হয়েছে, পূর্বজদের স্মৃতি-সত্তা জড়িয়ে আছে জমির সঙ্গে। তৃতীয়ত, ছোট-বড় যেরকম জমিই হোক তার সঙ্গে সংপৃক্ত আছে বিভিন্ন উপজাতীয় সংস্থা, যাঁদের সম্মতি ছাড়া যমেরও অধিকার নেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজারও অধিকার নেই জমি কাউকে ভোগ-দখল করতে দেবার। চতুর্থত, এখানে শর্ত

একটাই যে, জমি প্রাপক তার জমিটিতে থাকবে, কাজ করবে এবং তার সামাজিক সংস্থার উন্নতি ঘটাবে। বদলে তার কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে না এবং তাতে এই ইঙ্গিত আরও দৃঢ়তর হয় যে, গার্হস্থ জীবনের জন্য একটা জমির প্রয়োজন আছে, সেখানকার আলো, হাওয়ায়, সমীপবর্তী জলে সে পুষ্ট হয়ে গার্হস্থ পালন করবে। পণ্ডিতেরা শতপথের এই বক্তব্যের সঙ্গে প্লেটোর তুলনা করেছনে। 'ল'জ' নামের সেই শংসায় প্লেটো লিখেছেন—Let the apportionment be made with this understanding that the citizen who recieves his plot must consider it as common property of the whole state: since this land is his father land he should tend it even more diligently than a mother her children in as much as being a goddess she is mistress over mortals.

বৈদিক যুগের এই শান্ত মধুর গার্হপত্যের কল্পনা অনেকটাই বাস্তব ছিল বহু দিন পর্যন্ত। আর যদি এমনটাই হয় যে, এক-একটা পরিবার খানিক-খানিক জমি পেতেন একটি মধুর গার্হপত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য এবং সেখানে অন্যের গার্হস্থে ঝামেলা না করলে তার নিজের কোনও সমস্যা নেই, তাহলে এই জীবনটা বয়েই চলত মন্দাক্রান্তা তালে— বাড়ি-ঘর, চাষবাস, কিছু বিত্তের সঞ্চয়, শ্যামলী-ধবলীর দুগ্ধ-পান, আর বড়-মেজো-ছোট কতগুলি পুত্র-কন্যা—বৈদিকেরা সমন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণে নিজেদের সুখ বর্ণনা করবেন— ভালই হল যদি সংসারে কিছু বিত্তসঞ্চয় থাকে, বাড়ি ঘর থাকা ভাল, গৃহপালিত পশুদের ভাল হোক, সন্তানেরা ভাল থাকুক— যদ্‌বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রম্।

তবে সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই এত শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না, বহু দিন বংশপরম্পরাক্রমে জমি ভোগ করতে-করতে নিজের এবং পরের মানসিক বিপর্যয় হতে বাধ্য। নিজের বিপর্য়য় এই রকম যে, এই জমিটা আমারই, এতকাল ভোগ-দখল করছি, চায করছি, ফসল ফলাচ্ছি, পিতা-পিতামহেরা এখানে ছিলেন, আমিও আছি, আমার সন্তানেরাও থাকবে— অতএব জমিটা আমারই। একটা গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে বেরিয়ে এসে এই যে 'আমি-আমার' চিন্তা, এটাই কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা তৈরি হবার প্রাথমিক মানসিকতা। আবার অন্য দিকে আছেন রাজা—আইন এবং প্রশাসনের মূল অধিকর্তা। তিনি ব্যক্তি জীবনের সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব রক্ষার ব্যাপারে নিজের প্রাশসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, অথচ জমি-জমার ব্যাপারে তাঁর কোনও উক্তিই চলবে না, এমনটাও তো স্বাভাবিক নয়। বিশেষত বন-জঙ্গল, আগাছা পরিষ্কার করে যে নিজের জমি তৈরি করছে— সে বাস্তুজমিই হোক অথবা কৃষিভূমি, সেখানে থাকা বা চায করার ব্যক্তিগত অধিকার তো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রাধিপতি রাজাই দিচ্ছেন, অতএব তাঁরও তো একটা প্রশাসনিক অনুভূতি তৈরি হয় যে, জমিগুলির মূল দায়িত্ব রাজার, কেন না কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই নির্দিষ্ট জমি-জমার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপনা ঘটে থাকে। হ্যাঁ জমি জমার সুরক্ষা, চাষের ফসল, সব কিছুর জন্যই রাজকর দিতে হতে পারে। কিন্তু রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্র শুধুমাত্র কর লাভ করেই নিশ্চিন্তে থাকবে, এটা শক্তি-ক্ষমতার কোনও

স্বাভাবিক প্রবণতা নয়। ফলে রাজা-রাজড়াও ভূমির রাষ্ট্রীয় মালিকানা চাইবেন—এটাও একটা স্বাভাবিক বিবর্তন।

কিন্তু শক্তি-ক্ষমতার জোরে রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথা যতই হোক, জমির সঙ্গে যেহেতু বসবাসকারী মানুষ, কৃষক শ্রেণি এবং অন্যান্য কর্মচারী মানুষই সরাসরি জড়িত, তাই গোষ্ঠীসমাজের ভাবনা এবং অধিকার কথঞ্চিৎ শিথিল হতেই জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসঙ্গটাই প্রথম তৈরি হয়েছে।

একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে যিনি সুরক্ষা দিচ্ছেন, বলবত্তর মানুষকে যিনি নিয়ন্ত্রণে রাখছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে, দুর্বলের অন্ন-সম্পত্তি যাতে বলবত্তর মানুষ মাৎস্যন্যায়ে গ্রাস না করে, তার জন্য যিনি সদা-জাগ্রত, সেই রাজাও কি পিছিয়ে থাকবেন তাঁরই ভূখণ্ডে অবস্থিত জমিগুলির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে? আমাদের ধারণা ব্যক্তি এবং রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—একজনের পিতৃ-পিতামহের ক্রমে জমির ওপর ভোগ-দখলের অধিকার, অন্য দিক রাষ্ট্র-গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে পুরাতন জনমুখ্য এবং বিশ্পতিদের ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রীয় রাজার হাতে চলে গেল, তখনই ভারতবর্ষে জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বে রাজারই জয় হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বিশেষত মৌর্যশাসনের সময়ারম্ভেই জমির মালিকানায় রাজার নিয়ন্ত্রণ এসেছে বলে কোনও কোনও পণ্ডিতেরা মনে করেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা করতে গিয়ে পণ্ডিত কাঙ্‌লে খানিক সংশয়ান্বিত ভাবেই লিখেছেন—It is possible that the rule that all land belongs to the king reflects an earlier stage in the development of society when all land was the property of the entire tribe... (but when) over the generations individual families continued to hold and till the same separate pieces of land, a vested interest was created, which practically amounted to ownership of the separate pieces of land. Then the rights of alienation came to be recognized.

কথাটা সংশয়ের মধ্যে আছে বলেই আরও বলার সাহস পাই। সাহস পাই বলতে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বভাব এবং প্রবণতাই হল এই রকম যে, তা অকল্পনীয় ভাবে ব্যক্তিস্বত্ত্বের দিকে হাত বাড়ায়। সুরক্ষা এবং কল্যাণের দায়িত্ব নিতে নিতে রাজার যখন মনে হল যে, তাঁর রাজ্যের সমস্ত জমি তাঁরই বা তাঁর নামাঙ্কিত রাষ্ট্রের, সে-দিন দু-পাঁচটা শিষ্ট দৃষ্টান্তের খবর আমরা পাচ্ছি যে, তিনি যাগ-যজ্ঞের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যাজ্ঞিক পুরোহিতকে ভূমিদান করতে চাইছেন। কিন্তু সমাজে তখনও আর্যগোষ্ঠীর গোষ্ঠীশাসন চলছে শাস্ত্রীয় ভাবনায়। তাঁরা বাধা সৃষ্টি করছেন রাষ্ট্রীয় রাজার ক্ষমতায়। ফলে শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি— বিশ্বকর্মা ভৌবন যাজ্ঞিক পুরোহিতকে যখন জমি দিতে চাইছেন দক্ষিণা হিসেবে তখন, স্বয়ং পৃথিবী-মাতা আবির্ভূত হয়ে রাজাকে সাবধান করে বলছেন—কোনও মর্ত্য মানুষের অধিকার নেই আমাকে দিয়ে দেবার। তুমি মূর্খের মতো কাজ করেছো।

এই কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, শাসক রাজা এক দিকে তার প্রশাসনিক অধিকার কায়েম করতে চাইছেন, অন্য দিকে যাঁরা জমিকে সমস্ত মানুষের সার্বিক ভরণের উৎস বলে মনে করেন, তাঁরা এই আগ্রাসনে বাধা সৃষ্টি করছেন। এটা মনে রাখা ভাল যে, শাসক যখন অধিকার প্রমাণের তাগিদে ভূমিদান করেন, তখন প্রথম-প্রথম ভাল কাজের জন্য সদর্থক নামেই দান আরম্ভ করেন, কিন্তু অধিকার অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে সেই সব দানের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। তখন শালা-শ্বশুর, অপদার্থভাই, অপদার্থ আত্মীয়বর্গ ও রাজার দান-মান লাভ করতে থাকে। ফলে আমাদের দেশে মৌর্য শাসনের পরেও কোনও কোনও সামন্ত রাজ্য, রাজাদের ভূমি-দান দাক্ষিণার ক্ষেত্রে একটা নিয়ন্ত্রণ-বারণ প্রসারিত হয়েছে শাস্ত্রকারদের মাধ্যমেই। ব্যাপারটা যে রীতিমত নীতি-যুক্তি এবং সামাজিক তর্কে পরিণত হয়েছিল, সেটা মীমাংসা দর্শনের মতো একটা বৈদিক পরম্পরার শাস্ত্র ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে।

জৈমিনির লেখা সুপ্রাচীন মীমাংসা দর্শনের একটি সূত্রে বৈদিক বিশ্বজিৎ যজ্ঞে রাজাদের ভূমি-দান প্রসঙ্গে যে আলোচনা আরম্ভ হয়, তার প্রথম কল্প হল এই যে, যিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করবেন, তাঁর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি যাজক-পুরোহিতের হাতে তুলে দিতে হবে। এটাই যজ্ঞের বিধি। জৈমিনির এই সূত্র নিয়ে মহামান্য টীকাকারদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ টীকাকার শবরস্বামী টীকার আরম্ভেই প্রশ্ন তুলেছেন— নিতান্তই কাউকে ভূমি দেওয়া যাবে কিনা। ভূমি বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে? ভূমি বলতে কি মাটি দিয়ে তৈরি করা কোনও জিনিস বোঝাচ্ছে, নাকি পৃথিবী বোঝাচ্ছে, নাকি কৃষিক্ষেত্র বোঝাচ্ছে, নাকি শুধুই একটু মাটি বোঝাচ্ছে? আরও নানা প্রশ্ন, এবং অন্যেরাই বা কী প্রশ্ন করতে পারেন এই বিষয়ে, সেই রকম অনেক পূর্বপক্ষ তৈরি করে শবরস্বামী সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন—না, ভূমি কিছুতেই দেওয়া যাবে না। কেননা, পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেখা যায়, যাদের খণ্ড খণ্ড জমি আছে, ভূখণ্ড আছে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তাদের কারও নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—আচ্ছা! যিনি সার্বভৌম নৃপতি, সমস্ত পৃথিবী যাঁর অধিগত, তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্যটাই তো দিয়ে দিতে পারেন। শবরস্বামী উত্তর দিচ্ছেন—কেমন করে দেবেন? একজন সার্বভৌম রাজা ভূমির যতটুকু অংশ ভোগ করতে পারেন, অন্য একজন সাধারণ মানুষও তাই পারে। এই ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কোনও তফাত নেই। তবে হ্যাঁ, সার্বভৌম রাজার বৈশিষ্ট্য হল— তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত ধনের এবং সম্পদের সুরক্ষা দেন বলে সব কিছুরই একটা ভাগ তিনি রাজকর হিসেবে পান, কিন্তু কোনও ভাবেই তিনি জমি পান না, কারণ জমিতে অন্য মানুষেরা থাকেন এবং সেই কারণেই ভূমি দেওয়া যাবে না।

কাজেই চাষের জমিই হোক বা অন্য জমিই হোক, রাজা সার্বভৌম নৃপতি হলেও জমি কাউকে দিতে পারেন না। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোলব্রুক সাহেব, যিনি জৈমিনিসূত্রের ওপর শবরভাষ্যের টীকা দেখে নিজস্ব

আলোচনায় লিখেছেন—The earth is not the king's, but is common to all beings enjoying the fruit of their labour. It belongs, says jaimini, to all alive; therefore, although a gift of a piece of ground to the individual does take place, the whole land cannot be given by a monarch, nor a province by a subordinate prince, but house and field acquired by purchase and similar means are liable to gift.

তাহলে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিজের রাজ্য পুরোহিত যাজকের হাতে তুলে দেবার যে কথাটা বিধি হিসেবে এসেছে, কোলব্রুক সাহেব তার অর্থ বুঝেছেন এই যে, রাজা যদি কোনও ব্যক্তির কাজ থেকে কোনও জমি অথবা বাড়ি পয়সা দিয়ে কিনে থাকেন, তবেই সেটা তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দান করতে পারেন, অন্যের জমি, কৃষিক্ষেত্র বা বাড়ি —এর কোনওটাই তিনি নিতেও পারেন না, দানও করতে পারেন না। আসলে কোলব্রুক সাহেব দান হিসেবে যে একটা বাড়ি অথবা যে জমির কথাটা বলেছেন, সেটা আরও পরবর্তী কালে আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছে, এবং তখন ব্যক্তিগত মালিকানা এসে গেছে—সূত্রকার জৈমিনি বা টীকাকার শবরস্বামীর মতে দান হিসেবে জমি-বাড়ি অন্য জায়গা থেকে দেওয়াই যাবে না।

এই ব্যাপারটা—অর্থাৎ জমি দেওয়া যাবে না, বা রাজা জমি দিতে পারবেন না—এই ব্যাপারটা কিন্তু তখনও একই ভাবে সত্য যখন জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা, বেদ এবং বেদপরবর্তী যুগেও বহু দিন, যখন এই রকম চিন্তা ছিল —জমি রাজারও নয়, ব্যক্তিরও নয়, জমি মানুষের জন্য— এই অবস্থা থেকে সরাসরি জমির ওপর রাষ্ট্রের বা রাজার অধিকার আসেনি বলেই মনে হয়, বরঞ্চ সরাসরি ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্যক্তি মালিকানা থেকেই বৃহত্তর ব্যক্তিকল্যাণের জন্যই অথবা খানিক রাজস্বার্থেও পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বা রাজার মালিকানা কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার জায়গাটা কতটা শক্ত ছিল এবং সেখানে যে প্রশাসক রাজাও হুল ফুটোতে পারতেন না, সেটার একটা খুব বড় প্রমাণ আছে বলভীর রাজা প্রথম ধ্রুবসেনের শিলালিপিতে।

এখনকার গুজরাট-সৌরাষ্ট্রে তখনকার বলভীর স্থান। বলভীর রাজা প্রথম ধ্রুবসেনের সময় মোটমুটি ৩১৮। এই ধ্রুবসেন তাঁর রাজ্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনশো ষাট পদবর্ত ভূমি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জমির ওপর রাষ্ট্রের বা রাজার মালিকানা না থাকায় এক জায়গায় তিনি সেই জমি দিতে পারলেন না। লোকের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে যে সে জমি কিনে দেবেন, তাও হল না। সম্ভবত এবং প্রথমত এক জায়গায় এতটা জমি একজনের মালিকানায় ছিল না; আর দ্বিতীয়ত এক জায়গায় বহুজনের ভাগ জোড়া দিলে এ-বিক্রি করতে চায় তো ও বিক্রি করতে চায় না, এই সমস্যা। শেষ পর্যন্ত মহারাজ ধ্রুবসেন আপন রাজ্যখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাংশে চার খণ্ড জমি আর উত্তর-পূর্বে চার খণ্ড জমি দিয়ে মোটামুটি তিনশো পদবর্ত ভূমির বুঝ দিলেন মন্দিরের মোহান্তকে। আর যে ষাঠ পদবর্ত ভূমি দেবার কথা ছিল তার চল্লিশ পদবর্ত

এক জায়গায় এবং অন্য জায়গায় কুড়ি পদবর্ত জমি দিয়ে ধ্রুবসেন কোনও মতে নিজের রাজমুখ রক্ষা করলেন।

আমাদের বক্তব্য, যেকালে রাজতন্ত্র ছিল এবং রাজতন্ত্রী রাজাকে যখন প্রায়শ স্বৈরতন্ত্রী এবং স্বেচ্ছাবিহারী বলে বর্ণনা করা হয়, সেকালেও কিন্তু রাষ্ট্রগত চাষের জমি বা অন্যের ভূমিস্থিত গৃহ-অট্টালিকার ওপর রাজার কোনও মালিকানা ছিল না। তাছাড়া বলভীর রাজা ধ্রুবসেন কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত নন যে, তিনি শুধু এইরকম করেছেন, কিন্তু অন্যেরা যা ইচ্ছে তাই করতেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে রাজা যে ব্রাহ্মণ সজ্জনদের এত 'ল্যাণ্ড-গ্রান্ট দিতেন, মন্দির বানিয়ে দিতেন অথবা যে সব জমিতে নানা পদবির রাজপুরুষের আবাসনের ব্যবস্থা করতেন সেই সব জমি কোথা থেকে আসত? এখানে দুটো উত্তর আছে। অর্থাৎ দুটি উপায়। এক হল, যে-সব জমি বা গৃহের যোগ্য উত্তরাধিকারীরা কেউই বেঁচে নেই বা তাঁদের কোনও খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না, বা যেগুলির কোনও সঠিক দাবিদারও নেই, তাঁদের জমিতে রাষ্ট্র বা রাজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হত। দ্বিতীয়ত, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রাজকর না দেবার ফলে যে সব-জমি-বাড়ির ওপরে মালিকের স্বত্ব চলে যেত, সেইসব জমিবাড়ি রাজা দানের জন্য ব্যবহার করতে পারতেন, অথবা ব্যবহার করতে পারতেন রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনেও। অর্থাৎ এখনকার দিনে যে-সব বেওয়ারিশ জমি সরকারি মালিকানায় খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখনকার দিনেও সেইসব ব্যক্তিগত স্বত্বহীন জমিই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকত। তখনকার দিনের পরিভাষায় এই সব জমির নাম ছিল 'রাজ্যবস্তু'। শিলালিপির প্রমাণে দেখা যাচ্ছে— কোনও এক 'চেগুলরগ্রামে' এই রকম কিছু খাস জমি 'রাজ্যবস্তু' ছিল, তা এক সজ্জন ব্রাহ্মণকে দান করা হচ্ছে।

প্রমাণ আরও দিতে পারি যাতে বোঝা যাবে তৎকালীন আইনের ধারাতেও রাজাদের পক্ষে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার জমি অধিগ্রহণ করাটা ভীষণ রকমের কঠিন ছিল। কিন্তু তা বলে কি জনকল্যাণের অন্য কর্মগুলি বন্ধ থাকবে। আমরা বলব, মোটেই না। কিন্তু এখনকার পরিশীলিত বুদ্ধিতে 'রাজ্যবস্তু'গুলির সঠিক খতিয়ান দরকার এবং দরকার সেইসব 'রাজ্যবস্তু'র অথবা বসবাসহীন, উষর, কর্ষণ-হীন ভূমিগুলির উপযুক্ত একটি 'ব্যাঙ্ক', যাতে সত্য-মঙ্গল-প্রেপ্সু জনগণতান্ত্রিক সরকারের কোনও সৎকর্মও অন্যায়ের কলঙ্কে চিহ্নিত না হয়।

নীতিকথায় রাজনীতি

আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন সংস্কৃতের পাঠক্রমে দু'খানা গল্প ছিল পঞ্চতন্ত্র থেকে। ছোটবেলায় কথামালার গল্প পড়েছি। ফলত প্রথম যখন সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের গল্প পড়লাম, তখন বেশ রোমাঞ্চ হয়েছিল। বিশেষত সংস্কৃত নীতিশ্লোকগুলো ছন্দে ছন্দে মুখস্থ করে তার অর্থগৌরব স্মরণ করেতও বেশ ভাল লাগত আমার। আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইরা যেমন বুঝিয়েছিলেন এবং আমার পিতাঠাকুরও বৃদ্ধ চাণক্য আওড়াতে-আওড়াতে যা বুঝিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হল—জীবনের পথ চলতে-চলতে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি আসে, কার্যাকার্য বিষয়ে যে সব সংশয় আমরা সমাধান করতে পারি না। এমনকী মানুষও যে কতশত বিচিত্র স্বার্থে চালিত হতে পারে, সে সব বিষয়ে উপদেশ দেয় নীতিশাস্ত্র। আবার সে উপদেশও ঠিক শাস্ত্রবাহিত ধর্মোপাদেশের মতো শোনায় না, কেননা পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এইসব গ্রন্থ নীতির উপদেশ করে গল্পের মাধ্যমে—পশুপাখি এবং সর্বস্তরের বিচিত্র মানুষ নিয়ে সেই সব গল্প। তাতে ভাল, মন্দ, চোর, বদমাশ, ঠকবাজ, ধোঁকাবাজ সব কিসিমের পশুরা সব নানান ভূমিকায় আছে। গল্পগুলো যেমন অসাধারণ এবং তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক।

কিন্তু দিন যেতে-যেতে ভাবনার যত প্রসার ঘটেছে, শব্দ-সরস্বতীর অন্তর যখন পটে আঁকা ছবির মতো আস্তে-আস্তে প্রকট হয়ে উঠল, তখন বুঝলাম—পঞ্চতন্ত্র বইখানা প্রধানত রাজনীতি বিষয়ক এবং সমাজনীতি সেখানে আছে রাজনীতির পোষ্য হিসেবে। গ্রন্থের আরম্ভেই গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হচ্ছে, তাঁরা সকলেই প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের প্রধান পুরুষ। মনুও বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, ব্যাস এবং অবশেষে চাণক্য অর্থাৎ কৌটিল্য। প্রস্তাবনায় বিষ্ণুশর্মা নামাঙ্কিত কৌটিল্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্তের কাছাকাছি যায়। গ্রন্থের প্রস্তাবনা-অংশ স্মরণ করিয়ে বলি — দক্ষিণের সেই জনপদে মহিলারোপ্য নামে নগর। সেখানকার রাজা অমরশক্তি মহাবিদ্বান মানুষ। কিন্তু তাঁর তিন ছেলেই মূর্খ। পড়াশুনোর নাম শুনলেই পালায়। তার জন্য রাজার ভারী দুঃখ। রাজ্যের বৈভব-সুখও তাঁর ভাল লাগে না। এই অবস্থায় মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বললেন— আমার বিষয়ে একটু ভাবো তোমরা। পাঁচশো পণ্ডিত রাজার দেওয়া বৃত্তি ভোগ করছেন। অথচ আমার ছেলেগুলো আকাট

মূর্খ রয়ে গেল। একটু ভাবো। রাজার ভাবনা শুনে একজন মন্ত্রী— এ-রকম সার্বিক বক্তব্য জানানো মানুষ-মন্ত্রী কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পাবেন, এঁরা 'পারসপেকটিভ' বোঝেন না, সর্বাগ্রে সমাধান দেবার জন্য অনেক বলতে ভালবাসেন বলেই বলেন—তেমন একজন মন্ত্রী বললেন— এটা কি অত সোজা কথা। বারো বছর ধরে ব্যাকরণ পড়তে হবে। তারপর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের লেখা ধর্মশাস্ত্র, আইন-কানুনের বই, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র। এত সব পড়লে তবে কিনা এই মূর্খদশা থেকে একটা জাগ্রত বোধ তৈরি হবে— ততঃ প্রতিবোধনং ভবতি। বক্তার এবং বক্তব্য-বিষয়ের বিস্তার শুনেই সুমতি নামে এক মন্ত্রী বললেন— দেখুন মহারাজ! মানুষের জীবন বড় ছোট, আর এত সব বিদ্যা জানতে গেলে জীবন কেটে যাবে কখন! তার চেয়ে বরং সংক্ষেপে এমন শাস্ত্রজ্ঞান হওয়া দরকার যাতে এদের সামগ্রিক বোধ তৈরি হতে পারে, অর্থাৎ কিনা জল ফেলে হাঁসের মতো দুধটুকু খাওয়া শিখতে হবে।

উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন এমন একজন মানুষ, যিনি রাজা, তায় তাঁর পুত্রগুলি মূর্খ— এ-অবস্থায় সুমতি-মন্ত্রীর কথা শুনলেই বোঝা যায় যে, তিনি অবস্থা বুঝে ত্বরিতে সমাধান দিচ্ছেন। সুমতি বললেন— জীবনে সময় বড় অল্প বলেই একটা করিৎকর্মা লোকের কথা বলছি আপনাকে। তিনি এই নগরেই থাকেন, নাম বিষ্ণুশর্মা। এই ব্রাহ্মণ হেন শাস্ত্র নেই জানেন না। ভাল মাস্টার হিসেবে তাঁর নাম ছাত্রমহলে সবাই জানে। আপনি তাঁর হাতে আপনার ছেলেদের লেখাপড়ার ভার দিন। রাজা অমরশক্তি সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্ণুশর্মাকে তলব করে নিয়ে এসে বললেন— আপনি আমার ওপর করুণা করে আমার এই ছেলেগুলিকে অর্থশাস্ত্র পড়িয়ে দিন এমন করে, যাতে ওরা অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য সমবয়সিদের থেকে বেশি কুশল হয়ে ওঠে। আপনি এই অনুগ্রহটুকু করুন। আমি আপনাকে রাজকীয় দান দেব শত-শত।

বিষ্ণুশর্মা মেরুদণ্ড সোজা করে বললেন— আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না, শত শত দান দিলেও, না। তবে হ্যাঁ, আমি আপনার ছেলেদের পড়াব এবং আগামী ছ'মাসের মধ্যে আমি যদি এদের নীতিশাস্ত্রে কুশল করে তুলতে না পারি, তবে জানবেন— আমার নাম বিষ্ণুশর্মা নয়। বিষ্ণুশর্মা নিজের মধ্যে অনন্ত মনোবল পোষণ করেন এবং পড়িয়ে ছাত্র তৈরি করাটা তাঁর 'প্যাশন'। সেই জন্যই সাস্ফালনে আবারও রাজাকে বললেন— দেখুন রাজামশাই। আমার আশি বছর বয়স হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ ত্যাগ করেছি অনেক দিন। অতএব টাকা-পয়সা, রাজদান নিয়ে আমি কী করব! তবে আমার দিক থেকে এই সিংহের গর্জানিটুকুও শুনে রাখুন— আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য সরস্বতীকে নিয়ে খেলায় বসব আমি। আর লিখে রাখুন, আপনি লিখে রাখুন আজকের তারিখটা। ছ'মাসের মধ্যে যদি আপনার ছেলেদের আমি নয়শাস্ত্রে (নীতিশাস্ত্র) কুশল করে তুলতে না পারি, তা হলে আমার যেন পরলোকের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার আচার্যোচিত বক্তব্য এবং রাজার প্রার্থনার থেকেও এই কথোপকথনের মধ্যে যেটা অনেক বেশি জরুরি, সেটা হল— তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ।

প্রথমত রাজা অমরশক্তি নিজে বিদ্বান মানুষ বলেই অনন্তপার শাস্ত্ররাশির গুরুভার এবং মাহাত্ম্য দুটোই ভাল জানতেন। সেই কারণেই ছেলেদের জন্য তিনি শুধু অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান ভিক্ষা করেছেন বিষ্ণুশর্মার কাছে। কিন্তু এই অর্থশাস্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই একটা সঙ্কেত ভেসে আসে যোগরূঢ় সেই বিখ্যাত শাস্ত্রের দিকে যার নাম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র বলে— মানুষের জীবন চালানোর প্রধান উপায়টাই হল অর্থ, ওটাই মানুষের বৃত্তি। রাজা-রাজড়াদের ক্ষেত্রে এই অর্থভাবনা তো আরও জরুরি, কেননা রাজ্যলাভ এবং রাজ্য-পরিপালনের মাধ্যমে যে অর্থবৈভব তৈরি হয়, তার উপায় শাস্ত্রই হল অর্থশাস্ত্র। খেয়াল করে দেখুন, অমরশক্তি নিজে রাজা, তিনি জানেন যে, তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকার বর্তাবে তাঁর ছেলেদের ওপরেই। ছেলেরা যাতে সঠিক ভাবে রাজ্য চালাতে পারে, তার জন্য অর্থশাস্ত্রের পাঠই সবচেয়ে জরুরি। ঠিক এই কারণেই তিনি শুধু অর্থশাস্ত্র পড়ানোর জন্য বিষ্ণুশর্মাকে অনুরোধ করেছেন।

রাজার এই প্রার্থনার উত্তর দেবার সময় বিষ্ণুশর্মা কিন্তু অর্থশাস্ত্র কথাটা উচ্চারণ না করে বললেন—আমি ছ' মাসের মধ্যে এই ছেলেদের 'নীতিশাস্ত্রে' কুশল করে দেব এবং দ্বিতীয় বার আস্ফালনের সময় নীতিশাস্ত্র না বলে বললেন 'নয়শাস্ত্র'। আমরা এখানে জানতে চাই যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা এখানে নীতিশাস্ত্র বা নয়শাস্ত্র ('নীতি' আর 'নয়' একই কথা) বলতে রাজার প্রার্থিত অর্থশাস্ত্রই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা নীতিশাস্ত্র বলতে আমরা যেমন ভাল-ভাল নীতিকথার সমাহার বুঝি, নীতি মানে তা নয়। নীতি মানে যে রাজনীতি শাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র, তা মহাভারতের একটি শ্লোকে পরিষ্কার বলা আছে—তৎসর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রে'ভিবর্ণিতম্। তার চেয়েও বড় প্রমাণ হল—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পরে আর যত রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রাজনীতি অর্থে নীতি-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, নীতিসার, নীতিপ্রকাশিকা, নীতিবাক্যামৃত ইত্যাদি। আবার রাজনীতি-শাস্ত্র বোঝাতে অর্থশাস্ত্র বা অর্থবিদ্যা শব্দটিও যেহেতু কাব্য-সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে—যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে—তাই এই উপসংহারটাই ঠিক হবে যে, পঞ্চতন্ত্রের মতো গল্পসাহিত্যের কথামুখে একজন অর্থশাস্ত্র পড়াতে বলছেন, অন্যজন নীতিশাস্ত্র পড়াবেন বলে জানাচ্ছেন—আসলে দুটো একই কথা—এখানে রাজনীতির কথাই প্রধান বলা হবে। তবে হ্যাঁ, ওই যে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন—আপনার মূর্খ পুত্রদের পড়ানোর সময় আমি সরস্বতীকে নিয়ে খেলা করব, সেটা হল পড়ানোর কৌশল অথবা ক্ষমতা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স সোজাসুজি না বুঝিয়ে যদি পশু-পাখির গল্প, সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প দিয়ে বোঝাই, তা হলে সেটা সরস্বতীর বিনোদন ছাড়া কী?

আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়— রাজার প্রধান মন্ত্রী পাঠ্য বিষয় হিসেবে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রের কথা বলেছিলেন। সমস্ত বিষয় ছেড়ে রাজা যে শুধু অর্থশাস্ত্রের পাঠ দিতে বলছেন, তার কারণ রাজাদের ধর্ম এবং কাম সব সময় অর্থের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সেই কথাই বলে। কৌটিল্য বলেছেন—

তিন পুরুষার্থের মধ্যে (চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ এখানে প্রযোজ্য নয়, রাজা মোক্ষকামী হলে রাজ্যের প্রয়োজন থাকে না) অর্থই হল প্রধান। আর ধর্ম এবং কাম অর্থ থেকেই হয়— অর্থ এব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্যঃ। অর্থমূলৌ হি ধর্মকামৌ। কথাটা এত তাত্ত্বিক ভাবে না বলে খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মহাভারতের কবি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর বিরাগী যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে বসতে চাইছেন না, তখন অর্থ-পুরুষার্থের প্রবক্তা হিসেবে অর্জুন তাঁকে বলেছিলেন— দেখুন মহারাজ। অর্থ যদি বাড়ে এবং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যদি ভারী হয়, তবে তা থেকেই সমস্ত ভাল কাজ হতে পারে। ধর্মের পোষণ এবং কামনার শান্তি তো অর্থ থেকে হবেই, খুব সাধারণ ভাবে দেখলেও মানুষের জীবনটাও তো চলে ওই অর্থ থেকেই। কাজেই অর্থই সব। অর্থ থাকলেই তার বন্ধু থাকে, অর্থ থাকলেই আত্মীয়স্বজন এবং অর্থ থাকলেই লোকে তাকে পুরুষ বলে এমনকী পণ্ডিতও বলে— যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মহাভারতে অর্থ নিয়ে এই যে ভাবনা, যে অর্থের প্রতিশব্দই প্রায় 'মনুষ্যবতী ভূমি' বা রাষ্ট্র— আমাদের খেয়াল করতে হবে-- পঞ্চতন্ত্রের প্রথম গল্প থেকেই সেই অর্থের জয়গান এবং এক্ষুনি যে অর্জুনের জবানিতে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছি, সেই মহাভারতীয় শ্লোকটি অবিকল বসানো আছে বণিকপুত্র বর্ধমানের মুখে। সম্পূর্ণ বইখানা লিখে ফেলার পর কৌটিল্য যেমন বই লেখার প্রয়োজন জানিয়ে অর্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করছেন অথবা অর্জুন যেমন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন গ্রহণ করানোর জন্য অর্থ-পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেছেন, তেমনই পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে প্রথম গল্প থেকেই রাজনীতির ভাবনা আরম্ভ হয়েছে, যদিও সেই ভাবনাগুলি গল্পের মাধামে প্রকট করে তোলা হচ্ছে খুব ছোট্ট-ছোট্ট ব্যক্তি-স্তর থেকে এবং সেই সব গল্প বলতে-বলতে সামাজিক পুরুষ এবং রাষ্ট্রনায়কদের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক মন্তব্যও বাদ যাচ্ছে না।

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম গল্পের প্রথম নায়ক বর্ধমান নামে সেই বণিকপুত্র রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবল— অনেক টাকা থাকলেও কীসে আরও টাকা হয়, কীভাবে আরও অর্থসম্পদ তৈরি হয়, তার উপায় ভাবা উচিত এবং তা করাও উচিত— প্রভূতেঽপি বিত্তে অর্থোৎপত্ত্যুপায়াশ্চিন্তনীয়াঃ কর্তব্যাঃ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মূলত রাজনীতির গ্রন্থ হলেও রাজ্যলাভ, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজ্যের পরিপালন যেহেতু অর্থের ওপরেই মূলত নির্ভর করে তাই রাজা, রাজনীতি, অথবা রাজ্য নিয়ে কথা বলার আগে কৌটিল্য প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে, অর্থই হল প্রধান, অর্থই মানুষের জীবন-ধারণের বৃত্তি এবং রাজাদের কাছে অর্থ শব্দের তাৎপর্য হল একটা জনসমন্বিত ভূখণ্ড এবং অর্থশাস্ত্র এগুলি পাবার উপায় বলবে। পঞ্চতন্ত্র এই অর্থলাভের উপায় বলে ব্যক্তিস্তর থেকে এবং সেটা বলে এমন এক ব্যাপ্ত সামাজিক বোধ থেকে, যেখানে ধরেই নেওয়া হয় যে, সব কিছু সবার জন্য নয়, সবাই সব কিছু পারেও না, অতএব নিজের ওপরে নির্ভর করে কাজ আরম্ভ করো।

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম গল্পেই বর্ধমান বণিক প্রথমে বুঝে নিচ্ছে— এ জগতে টাকায় হয় না এমন কোনও কাজ নেই, টাকা থাকলে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব আছে, টাকা না থাকলে নেই। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে অর্জুনের মুখে অর্থভাবনা-সংক্রান্ত অন্তত দুটি শ্লোক বর্ধমান বণিক স্মরণ করেছে একেবারে অবিকৃত ভাবে এবং নির্মম ভাবে সে ভেবেছে যে, টাকার জন্য লোকে বাপকেও ছেড়ে যায় এমনকী বেছে নেয় শ্মশানের কাজও। অতএব তার সিদ্ধান্ত হল— যেভাবে হোক বুদ্ধিমান লোক অর্থলাভের জন্য চেষ্টা করবে— যত্নেন মতিমাংস্তস্মাদ্ অর্থমেকং প্রসাধয়েৎ। এখন অর্থলাভের উপায় যা যা হতে পারে, সেটা ব্যক্তিস্তর থেকে দেখে বর্ধমান বলছে— ছয় রকমের উপায় আছে অর্থ উপার্দন করার। তার প্রথমটায় কোনও বুদ্ধি লাগে না, ইনভেস্টমেন্ট লাগে না, সেটা হল ভিক্ষে করা। তবে ভদ্রলোকে ভিক্ষে করে না এবং তাতে অপমানের শেষ নেই।

দ্বিতীয় উপায় রাজ-সরকারের সেবা করা। তবে সেখানে সমস্যা হল রাজা প্রায় কখনওই যোগ্য লোক চিনে নিয়ে তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দেন না— বিতরীত নৃপো নোচিতমহো। তৃতীয় উপায় কৃষিকর্ম। তাতে বড় কষ্ট, বড় পরিশ্রম। পড়াশুনো করতে পারি— সেটা আর একটা উপায়। কিন্তু সেটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার, আর ঝামেলাও অনেক। হাজার রকম নিয়ম, শৃঙ্খলা, তার মধ্যে আবার গুরুর কাছে যাও, সেখানে নিচু হয়ে থাকো, এ সব পারা যায় না। আবার যদি সুদের ব্যবসা করি, তাতে দারিদ্র জোটে এক সময়, কেননা টাকা থাকে পরের হাতে। অতএব দুনিয়ায় সবচেয়ে যেটা ভাল, অর্থলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সেটা হল ব্যবসা। আমি ব্যবসা করব।

আজ থেকে হাজার/দেড় হাজার বছর আগে এমন ভাবে ব্যবসার গৌরব প্রতিষ্ঠা করাটা সহজ ছিল না। তাও যেমন-তেমন করে এই ব্যবসা নয়। ঘরে বসে মিথ্যে বেসাতি করার থেকে উদ্যম নিয়ে দূর দেশে গিয়ে বাণিজ্য করার মধ্যেই যে উন্নতির উপায় নিহিত আছে, সেটা সেইকালে ঘোষণা করাটা অত সহজ ছিল না। যাই হোক, অর্থলাভের উপায় স্থির হতেই অর্থাৎ কিনা 'আলটিমেট এন্ড' হিসেবে অর্থলাভের পুরুষার্থতা সিদ্ধ হতেই বর্ধমান বণিক দূরদেশে বাণিজ্য করতে বেরোয় এবং এই যাত্রাপথেই গল্প আসতে থাকে, একটার পর একটা গল্প, যার ওপরের মোড়কটা ছাড়ালেই রাজা, রাজনীতি, রাজতন্ত্রের চরিত্র, রাজভৃত্য এবং রাষ্ট্রের কথা বেরিয়ে আসে।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে, পঞ্চতন্ত্রের মূল গল্পকথার মাঝখানে যে নীতিশ্লোকগুলি আছে, তা সব সংস্করণে এক রকম নয়। গল্পের সুযোগ নিয়ে গল্পের সঙ্গে মেলে, এমনকী মেলেও না, অথবা আংশিক ভাবে মেলে এমন শ্লোক যে কত ঢুকে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এতে এমনও হয়েছে যে, নীতিশ্লোক যেটা হয়তো সত্যিই মূলে ছিল, সেটাই গেছে হারিয়ে। এই যে বর্ধমান বণিক ভাবছে— অর্থ থাকলেও অর্থোপার্জনের কথা চিন্তা করতে হবে— এখানে মহাপণ্ডিত Hartel অনেক পাণ্ডুলিপি দেখে যে সংস্করণ হার্ভার্ড থেকে বার করেছেন অথবা Edgerton যেটা বার করেছেন লন্ডন থেকে, সেখানে বর্ধমান বণিকের ভাবনায় যেটা এসেছে, সেটা একেবারে

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা মনু-মহাভারতীয় রাজধর্মের অন্যতম শ্লোক। তাতে বলা হয়েছে– যে ধন তোমার নেই তা অর্জন করতে হবে, যা আছে তা রক্ষা করতে হবে, সুরক্ষিত ধনকে নানা জায়গায় খাটিয়ে বাড়াতে হবে, এবং প্রয়োজনের বেশি যেটা বেড়েছে, সেটা ব্যয় করতে হবে রাজকীয় বিভিন্ন সংস্থার উন্নতি সাধনে। আমাদের বক্তব্য হল— রাজা অমরশক্তি তাঁর ছেলেদের অর্থশাস্ত্রে নিপুণ করে তোলার অনুরোধ করেছিলেন বিষ্ণুশর্মার কাছে। ফল বর্ধমান বণিকের গল্প বলতে গিয়ে প্রথমেই অর্থশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটা অর্থশাস্ত্রের ভাষাতে জানিয়ে দেওয়াটাই তো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, অথচ এই পাঠটি বাদ দিতে গিয়ে অর্থের প্রাধান্য বোঝানোর জন্য একটির বদলে পাঁচ-ছটি শ্লোক ঢোকাতে হয়েছে— গল্পের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্র বোঝানোর পরিকল্পনা তাতে অবাস্তব হয়ে ওঠে না অবশ্য।

এই প্রসঙ্গে Edgerton-এর 'পঞ্চতন্ত্র রিকনস্ট্রাকটেড' আবারও স্মরণে আনতে হবে। কেননা, তৎকালীন অর্থশাস্ত্রভাবনায় রাজতন্ত্র এবং রাজার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং সেটা লোকের কাছে আদরণীয়ও ছিল। ঠিক এই কারণেই পঞ্চতন্ত্রের বিভিন্ন গল্পের মধ্যে সিংহের ঘটে আনাগোনা রাজার প্রতীক হিসেবে। রাজার শৌর্য-বীর্য থাকবে, তিনি অধিগুণসম্পন্ন হবেন, বংশপরম্পরায় রাজা হলেও তাঁর কৌলীন্য থাকবে এবং নিজের রাজ্যে তাঁর প্রতিপত্তি নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না— এই সমস্ত ব্যাপারটাই সিংহের সঙ্গে মেলে বলেই সিংহের মাহাত্ম্যসূচক একটি নীতিশ্লোক পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে অবশ্যই অপেক্ষিত ছিল, অথচ পঞ্চতন্ত্রের হিন্দি-বাংলা যত সংস্করণ দেখুন, দেখবেন, কোথাও সোজাসুজি এই রকম একটি শ্লোক পাবেন না। এ বিষয়ে প্রথম খটকা লাগে ইউ এন ঘোষালের একটি বই দেখে। তাঁর সময়ে এই সব বিচিত্র পঞ্চতান্ত্রিক সংস্করণ চালু ছিল না বলে, তিনি Edgerton -এর অনুবাদ দেখে তত্ত্বনির্ণয় করেছেন, অথচ সেখানে উদ্ধৃত দুটি শ্লোক আমি প্রচলিত কোনও সংস্করণে পাইনি। অথচ বর্ধমান-বণিকের অর্থলাভের প্রস্তাবনা শেষ হতেই যে সিংহ এবং ষাঁড়ের গল্প পিঙ্গলক আর সঞ্জীবকের নামে বলা হল, সেখানে সিংহ পিঙ্গলকের নামোত্থাপন-মাত্রেই বলা হচ্ছে— সেই বনে থাকত এক সিংহ। তার নাম পিঙ্গলক। সমস্ত পশুর দ্বারা পরিবৃত হয়ে বনরাজ্যের আধিপত্য-সুখ অনুভব করত। সে নিজের ক্ষমতায়-শক্তিতে এই বনরাজ্যের রাজা, সর্বদা সে মাথা উঁচু করে চলত এবং ভয় কাকে বলে সে জানে না। এই কারণেই তো নীতিকথায় বলে— বনের মধ্যে একা ঘুরে বেড়ায় সিংহ, এমন নয় যে তার কপালে কোনও চিহ্ন দেওয়া আছে, যাতে তাকে রাজা বলে চিনতে পারা যায়, রাজনীতির কোনও জ্ঞানও তার থাকে না, কিন্তু এমনই তার প্রাণশক্তি, এমনই ব্যক্তিত্ব যে, তার ওপরেই রাজপদবি চেপে বসে। তা ছাড়া এটাও বড় ঠিক যে, বনের মধ্যে রাজা বলে সিংহের পৃথক কোনও অভিষেকও হয় না, হয় না অন্য কোনও সংস্কার, কিন্তু যে নিজের বিক্রম এবং শক্তির দ্বারা নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠিত করে, তার পশুরাজ আখ্যাটা নিজে-নিজেই জোটে— বিক্রমোর্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা।

এই শ্লোক দুটি পশুরাজ সিংহ-সম্বন্ধী হলেও এর শাস্ত্রীয় তাৎপর্য রাজতন্ত্রের রাজার মধ্যে নিহিত। প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনেক রাজগুণের কথা বলেছে, যে সব গুণ রাজার মধ্যে পূর্ব থেকেই নিহিত থাকতে পারে বা শিক্ষার মাধ্যমে একজন রাজা তা আত্মস্থও করতে পারেন, কিন্তু বংশপরম্পরায় রাজত্বলাভের কথা মনু-কৌটিল্য সকলেই সমর্থন করেছেন বলে একজন রাজার মধ্যে শৌর্য-বীর্য-ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এর থেকেও বড় কথা হল— সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে রাজাকেই শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ বলে স্থির করেছেন কৌটিল্য—তাঁর মতে মন্ত্রী, দুর্গ, জনপদ, কোশ, দণ্ড এবং মিত্র— এই সব অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলেও শুধু রাজা যদি থাকেন, তবে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলি তৈরি হয়ে যেতে পারে, অতএব রাজাই সব— রাজা রাজ্যম্ ইতি প্রকৃতিসংক্ষেপঃ। এই নিরিখে পঞ্চতন্ত্রের গল্পটিতে সিংহ পিঙ্গলক যখন অচেনা পশু ষাঁড়ের ডাক শুনে ভয় পেল এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ পশুদের মধ্যে গিয়ে বসল, তখনও কিন্তু বলা হচ্ছে—গ্রাম, শহর, পাহাড়, কৃষিক্ষেত্র, ব্রাহ্মণদের দেওয়া জমি সব জায়গাতে সিংহই হল সর্বত্র স্থানিক শাসক। সেই পিঙ্গলক ভয় পেল বটে, কিন্তু বাইরে ভয় পাবার কোনও চিহ্ন দেখাল না এবং শুধু ফিরে গিয়ে বসল তার পাত্রমিত্র চর্তুমণ্ডলের মধ্যে বটগাছের তলায়— স্বসাধ্বসমাকারং প্রচ্ছাদ্য বটতলং চতুর্মণ্ডলাবস্থানেনাবস্থিঃ।

পঞ্চতন্ত্রের কথাকার প্রথিতশক্তি সিংহের মাধ্যমে রাজার গুণ বর্ণনা করছেন। মনু বলেছিলেন— রাজা এমনই হবেন যে, তাঁর মন্ত্রণা বাইরে যাবে না কখনও এবং তাঁর আকার ইঙ্গিত, চেষ্টা এমনই নিগূঢ় থাকবে যে, বাইরে থেকে তার বিক্রিয়া কিছু বোঝা যাবে না— তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ। সিংহ পিঙ্গলক ঠিক সেইভাবেই কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বসল গিয়ে চতুর্মণ্ডলে বিভক্ত তাঁর বিশ্বস্ত পশুদের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের কথাকার নিজেই চতুর্মণ্ডল কথাটা ভেঙে বলেছেন— চতুর্মণ্ডলের অবস্থান হল— প্রথমে সিংহ, তারপর অন্তরঙ্গ অনুগামীর দল, তারপর আছে কাকরব নামক ভৃত্যেরা অর্থাৎ রাজার সেই সব ভৃত্য যারা বিপদ-সঙ্কেত দেয় (বনে বিপদ উপস্থিত কাকের মতো অনেক পাখিই বিপদ-সঙ্কেত দেয়), আর তার পরে আছে কিংবৃত্ত, যারা কী হয়েছে জেনে আসে এই রকম গুপ্তচর।

আপনারা খুব ভালই জানেন যে, পশুরাজ্যে সিংহ এই রকম চতুর্মণ্ডল সাজিয়ে বসে থাকে না, কিন্তু সিংহের ওপরে রাজার তকমা লেগে যাওয়ায় কথাকার সেই ভাবেই রাজাকে দেখছেন, যেভাবে অর্থশাস্ত্র বলে। অর্থাৎ মন্ত্রী-অমাত্য-সেনাপতি, দূত, গুপ্তচর ইত্যাদি যে একজন রাজার পরিধেয় পরিচ্ছেদের মতো, সেটা বুঝিয়ে দিলেন কথাকার। চতুর্মণ্ডল শব্দটা নিয়ে নানা পণ্ডিত, নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষত কাকরব এবং কিংবৃত্ত শব্দটাও এখানে হেঁয়ালি তৈরি করেছে। তবে আমরা বলব— সিংহ পিঙ্গলক ভয় পেয়ে এবং ভয় বুঝতে না দিয়ে যেভাবে বটের তলায় চতুর্মণ্ডল আশ্রয় করল, তাতে প্রথমত আশঙ্কিত রাজার দুর্গে আশ্রয় নেবার কথা মনে আসে।

মনু-কৌটিল্যরা যেহেতু গিরিদুর্গ, জলদুর্গ বা মরুদুর্গের মতো প্রাকৃতিক দুর্গের অভাবে চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক) সেনাবাহিনীতে তৈরি নরদুর্গের আশ্রয় নিতে বলেন, আমরাও তাই এখানে চতুর্মণ্ডল বলতে এই রকম নৃদুর্গের কথা ভাবতে চাই—কাকরব এবং কিংবৃত্তেরা সেখানে থাকবেই পারে, কেননা আতঙ্কিত-ভীত অবস্থায় দূত-গুপ্তচরের প্রয়োজন বেশি বলেই আলাদা করে তাদের নাম এসেছে।

পঞ্চতন্ত্র-কথার অদ্ভুত আর একটা বৈশিষ্ট্য হল— রাজার শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের প্রতীকে সিংহের কথা বলে গল্প আরম্ভ করলেও কোনও মহান শক্তিশালী রাজার রাজ্য বা তাঁর শাসন যে নিরঙ্কুশ নয়, অথবা শুধুমাত্র শক্তি বা ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্য দিয়েই যে রাজত্ব চলে না, বরঞ্চ রাজ্য চালাতে গেলে বুদ্ধি, কৌশল, সঠিক পররাষ্ট্রনীতি, সঠিক মন্ত্রণা যে অনেক বেশি জরুরি সেটা পঞ্চতন্ত্রের কথাকার বুঝিয়ে দেন অনেক বোকা সিংহের গল্প বলে। অথবা কখনও শেয়াল, কাক অথবা নাপিতের ধূর্তামিতে কত শক্তিধর ব্যক্তির ভয়ঙ্কর বিপন্নতা তৈরি হয়—এই সব গল্প শোনাতে শোনাতে পঞ্চতন্ত্র সেই অর্থশাস্ত্রীয় ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যাতে বলা যায়—সৈন্য-সামন্তের বা রাজকোষের মতো বিভিন্ন রাজ্যাঙ্গের দুর্বলতাতেই যে রাজা দুর্বল হয়ে ওঠেন, তা নয়, বরঞ্চ সঠিক উপায় প্রয়োগ এবং সন্ধি-বিগ্রহের সঠিক পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগে দুর্বল রাজাও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন, এমনকী রাজা না হলেও অন্য কেউও তেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যেমন শেয়াল, নাপিত অথবা কোনও ধূর্ত বানর। ঠিক এই কারণেই Edgerton সাহেব বলেছিলেন—পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে নীতি বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তার মধ্যে morality বা নীতি-নৈতিকতার কোনও তাৎপর্য নেই। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি অনীতি বা দুর্নীতি। কেননা অনেক গল্পেই এখানে ধূর্ততার জয়গান এবং বাস্তব-বোধের বহমানন—বলাবাহুল্য, জীবনযাপনের বৃহৎ ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় এগুলি অপরিহার্য।

পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে কথান্তরে যত অর্থশাস্ত্রীয় যুক্তি আছে, তা সব বা অনেকটাই এই অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়, অতএব প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অর্থশাস্ত্রের তন্ত্রোদ্ধার করেই আমাদের থামতে হবে। অর্থশাস্ত্রীয় রাজনীতিতে প্রথম যেটা লাগে, সেটা কিন্তু বিদ্যাও নয়, জ্ঞানও নয়, সেটা হল বুদ্ধি এবং চতুরতা। রাজনীতিশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন, সেই মনু, মহাভারত অথবা কৌটিল্য কিন্তু কখনও এমন স্পষ্ট ভাবে এটা বলবে না যে, দ্যাখো! বিদ্যে-জ্ঞান এসব ফালতু কথা, আসল হল বুদ্ধি, বাস্তববোধ। সত্যি বলতে কী, বুদ্ধি কিংবা চতুরতা নিয়েও তাঁরা রা কাড়বেন না, কেননা বিদ্যে-জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, চতুর বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, এমনটা স্পষ্ট করে বললে রাজনীতির মান থাকে না। পঞ্চতন্ত্রের সুবিধে এই, পঞ্চতন্ত্র বালকের কাছে গল্প বলছে, তার মধ্যে কোনও 'প্রিটেনশন' নেই। পঞ্চতন্ত্রের কথাকার এ-কথা বলতে লজ্জা পান না যে, দ্যাখো! তুমি যতই বিদ্বান হও আর যতই বড় বংশের মানুষ হও বুদ্ধি না থাকলে কোনও লাভ নেই—বিদ্যাবানপি কুলীনোঽপি বুদ্ধিরহিতঃ কিং করোতি। এই বুদ্ধিটা যে

প্রধানত দেশ-কালের বোধ, লোকব্যবহার, উপস্থিত বুদ্ধি এবং বাস্তব-চেতনার ওপরেই নির্ভর করে, সেটা পরিষ্কার জানিয়ে পঞ্চতন্ত্র বলে— যতই তুমি শাস্ত্রজ্ঞানী হও, তোমার যদি লোকব্যবহার জানা না থাকে, তবে তুমি হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নও—অপি শাস্ত্রেষু কুশলা লোকাচারবিবর্জিতাঃ। সর্বে তে হাস্যতাং যান্তি।

লোকব্যবহার এবং বাস্তববোধই যে একজন মানুষকে রাজনীতিতে সফল করে তোলে, সেটা বোঝানোর জন্য পঞ্চতন্ত্র যে গল্পটা বলে, তাতে বোঝা যায় যে, বিদ্বান লোকের কিছু সাহংকার একগুঁয়েমি থাকে, সেটা কাটিয়ে ওঠাই প্রথম বাস্তববোধ। চার বামুন ভাইদের মধ্যে তিন বিদ্বান রাস্তায় চলতে চলতে এত জায়গায় প্রচুর হাড়গোড় পড়ে আছে দেখে বলল—আমাদের বিদ্যা পরখ করার এই হল উপযুক্ততম সময়। বলে প্রথম জন—সব হাড়গোড় জোড়া লাগিয়ে একটি জন্তুর কঙ্কাল বানিয়ে তুলল, দ্বিতীয়জন সেই কঙ্কালের গায়ে চামড়া, মাংস, রক্ত স্থাপন করে জন্তুটিকে মূর্তিময় করে তুলল। এ বার তৃতীয়জন সেই মূর্তিতে যখন প্রাণসঞ্চার করতে যাচ্ছে, তখন চতুর্থ সুবুদ্ধি-ব্রাহ্মণ বলল—আরে করছ কী? এই পশুটা তো একটা সিংহ তৈরি হতে যাচ্ছে, এটাকে প্রাণ দিলে তো সিংহটা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। বিদ্বান বামুন বলল—মূর্খ কোথাকার। আমার বিদ্যে আছে, বিদ্যে পরখ করার এই হল সঠিক সময়। তুই থাম। চতুর্থ বলল—তা হলে একটু দাঁড়াও। আমি সামনে এই গাছটায় একটু উঠে নিই। সে গাছে উঠতেই তৃতীয় ব্রাহ্মণ পশুশরীরে প্রাণের সঞ্চার ঘটাল স্ববিদ্যাবলে। ব্যস। সিংহ তৈরি হয়ে গেল এবং জাতকের প্রথম ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতে হল তিনটি বিদ্বান বামুন ভক্ষণ করে। সিংহ সেখান থেকে চলে গেলে চতুর্থ সুবুদ্ধি গাছ থেকে নেমে বাড়ি গেল। পঞ্চতন্ত্রের কথাকার সিদ্ধান্ত দিলেন—বাছা! বুদ্ধি অনেক বড় জিনিস, অন্তত বিদ্যার চেয়ে তা অনেক বড়—বরং বুদ্ধি র্ন সা বিদ্যা ইতি।

এই যে বুদ্ধিকে ঐতিহ্যগত বিদ্যার চেয়ে বড় জায়গা দিয়ে দেওয়া হল, এইখানেই অর্থশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপত্তি তৈরি হয়। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান একটা শাস্ত্র হিসেবে অর্থশাস্ত্র অথবা রাজশাস্ত্রের পক্ষে এ-কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা কঠিন যে, ভাই! বিদ্যা তেমন কিছু নয়, বুদ্ধিই বড়। অর্থশাস্ত্র তাই এখানে একটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, যার নাম উপায়। উপায় মানে কৌশল। অর্থশাস্ত্রীয় যুক্তিতে উপায় নিয়ে শত কথা শোনানোর আগেই পঞ্চতন্ত্র সিংহ আর শশকের বিখ্যাত গল্পটার সূত্রপাত করে বলে—বুদ্ধিমান লোকের অসাধ্য কিছু নেই, শক্তি-ক্ষমতা-পরাক্রম নিয়ে যা করা যায় না, বুদ্ধি কৌশল, উপায় দিয়ে সেটা করা যায়—উপায়েন হি যৎ সাধ্যং তন্ন শক্যং পরাক্রমৈঃ। সত্যি বলতে কী—পরাক্রম,বলপ্রয়োগ অথবা যুদ্ধও একটা অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু সেই উপায়টাকে পঞ্চতন্ত্র এবং প্রাচীন রাজশাস্ত্রকারেরা সবচেয়ে অধম এবং শেষ উপায় বলে মনে করে একই যুক্তিতে। বরঞ্চ বুদ্ধি করে রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে যে কার্যসিদ্ধি করা যায়, সেটাকেই রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ বলে বলেছে মহাভারতের রাজধর্ম-পর্ব—উপায়বিজয়ং শ্রেষ্ঠমাহুঃ।

উপায় শব্দটা পারিভাষিক বলেই অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা অথবা মহাভারতের রাজধর্ম সেই উপায়ের চারটে ভাগ দেখিয়েছে। তার একটা হল সাম, অর্থাৎ ভাল কথা বলে কৌশলে কাজ উদ্ধার করা। দ্বিতীয় হল দান, অর্থাৎ গোলমাল লাগলে শত্রুকে খানিকটা দিয়ে দেওয়া। তৃতীয় ভেদনীতি। গুপ্তচরের মাধ্যমে অথবা কূটনৈতিক উপায়ে শত্রুর নিজজনের মধ্যে অন্তঃকলহ তৈরি করে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। আর চতুর্থ হল দণ্ড অর্থাৎ আক্রমণ। এই চারকে কূটনৈতিক কৌশল বা চতুরুপায়ের মধ্যে অর্থশাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা দান-নীতি তেমন পছন্দ করেন না, কেননা শত্রুর যদি শক্তি বেশি থাকে, তবে একবার দান পেলে সে আরও দাবি করতে থাকে আর ভেদনীতির অসুবিধে হল, এতে শত্রুকে দুর্বল করতে বিস্তর সময় লাগে। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা তাই সাম এবং দণ্ডকেই শত্রুদমনের সবচেয়ে বড় কৌশল বলে মনে করেন। নৈতিক দিক থেকে প্রাচীনেরা যেহেতু যুদ্ধকেও সব সময়েই বর্জন করতে চেয়েছেন, অতএব কথা বা আলোচনার মাধ্যমে যে শত্রু জয় করা যায়, সেই সামনীতি পঞ্চতন্ত্রেও সবচেয়ে বড় কৌশল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষত পঞ্চতন্ত্র যেহেতু রাজা-রাজড়ার কাহিনিকে সহজ স্তরে নিয়ে এসে গল্প বলে, তাতে আরও বোঝা যায় যে, এই সব রাজনীতির উপায়গুলি সাধারণ মানুষের মধ্যেও একই ভাবে প্রযোজ্য। বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মিতাক্ষরা টীকায় বলা হয়েছে—এই সাম-দান-ভেদ-দণ্ডের রাজনৈতিক কৌশলগুলি শুধু রাজাদেরই ব্যবহারের বিষয় নয়, সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেগুলির প্রয়োগ চলে। পঞ্চতন্ত্র-কথা ঠিক সেটাই দেখিয়েছে।

পঞ্চতন্ত্র একটা গল্পের মধ্যেই রাজনীতির চতুরুপায় কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা দেখিয়েছে, কেননা লক্ষ্যে স্থির যিনি, তেমন কুশলী রাজা একই সঙ্গে চারটি উপায়ের প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন এই মহাবুদ্ধি শেয়ালের গল্পে। মহাচতুরক নামের সেই শেয়াল একদিন বনের মধ্যে দেখল—একটা হাতি, আপনা-আপনি মরে পড়ে আছে। সে হাতিটার চারদিকে ঘুরতে লাগল কিন্তু কিছুতেই কোনও দিক থেকে তার চামড়া ফুটো করতে পারল না। এর মধ্যে কোথা থেকে এক সিংহ এসে সেখানে উপস্থিত হল। শেয়াল জানত, একেবারে মহাভারতের ধুরন্ধর বুদ্ধিমান মন্ত্রী কণিকের মতোই জানত যে, ভীরুজনের সঙ্গে ভয় দেখিয়ে ভেদনীতি করা ভাল, কিন্তু প্রবল শক্তিমানের সামনে একেবারে হাতজোড় করে মিষ্টিকথায় কাজ হাসিল করতে হবে—ভয়েন ভেদয়েদ্ ভীরুং শূরমঞ্জলিকর্মণা। অতএব সিংহকে দেখেই শেয়াল একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে বলল—হুজুর আমি তো আপনার লেঠেল-মাত্র। আমি আপনার জন্যই এই হাতিটাকে পাহারা দিচ্ছি। আপনি খান এই হাতিটাকে। সিংহ রাজোচিত মহিমায় শেয়ালকে বলল—ওহে, অন্যের মারা পশু আমি কখনও খাই না। যা, তোকেই হাতিটা বক্‌শিস দিলাম, তুই খা। সিংহের কথা শুনে শেয়াল সিংহকে মহাজনের যোগ্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিল।

সিংহ চলে যেতেই সেখানে একটি বাঘ এসে উপস্থিত হল। শেয়াল ভাবল—এক

বদমাশকে তো পেল্লাম করে তাড়িয়েছি। এখন এটাকে তাড়াই কী করে, এটার গায়েও তো বেশ জোর, আর শক্তিমান লোককে তো ভেদনীতি ছাড়া শায়েস্তা করা যাবে না। কেননা কথায় বলে—সাম- দান যেখানে কাজ করে না, সেখানে শত্রুকে ঠান্ডা করতে হলে ভেদনীতিই গ্রহণ করতে হয়। আমরা দেখেছি—শেয়াল যে-কথাটা নীতি-শ্লোক উল্লেখ করে বলছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও সেই কথাটাই বলে। কৌটিল্য অবশ্য বলবান শত্রুর ব্যাপারে সামনীতি পছন্দ করেন না এবং সে-ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব যুক্তিও আছে। তবে বলবান শত্রুকে তিনি প্রথম ভেদনীতি দিয়ে বিনষ্ট করতে চান, নিরুপায় হলে দণ্ড—সামদানাভ্যাং দুর্বলানুপনয়েৎ, ভেদ-দণ্ডাভ্যাং বলবতঃ। অতএব ভেদনীতি মাথায় রেখে শেয়াল এ বার বাঘকে বলল—বলবান বলেই বিনত হয়ে কাঁধ উঁচু করে সন্ত্রস্ত স্বরে বলল—মামা! এমন অসময়ে একেবারে মরণের মুখে এসে পড়লে গো! একটা সিংহ এক্ষুনি এই হাতিটাকে মেরে আমাকে পাহারায় রেখে স্নান করতে গেছে। যাবার আগে সে আমাকে বলে গেল—যদি কোনও বাঘ আসে এ দিকে, তা হলে চুপি-চুপি আমাকে জানিও, আমি এই বনটাকে বাঘশূন্য করতে চাই। কারণ বাঘেদের ওপর আমি ভীষণ রেগে গিয়েছি। এই কদিন আগে এই রকমই আমার মারা একটা হাতিকে একটা বাঘ খেয়ে এঁটো করে দিয়েছিল। অতএব ওদের আমি ছাড়ব না। শেয়ালের কথা শুনে বাঘ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বলল—ভাগনে! দোহাই তোমার! আমার কথা কিচ্ছুটি বোলো না। এ বারের মতো আমার প্রাণ ভিক্ষে দাও।

শেয়ালের এই ভেদ-ভীতির প্রচারে বাঘ তক্ষুনি পালাল এবং এ বার সেখানে এল এক চিতা। শেয়াল ভাবল—এর দাঁতগুলো বেশ শক্ত। ওকে দিয়ে এই হাতির চামড়াটা একটু কাটিয়ে নিই, তারপর তাড়াব। শেয়াল বলল—আরে ভাগনে যে! কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা! তা কী ব্যাপার? তোমায় দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার খিদেও পেয়েছে খুব। তা অসুবিধে তো নেই কিছু। এই হাতিটাকে মেরে এক সিংহ আমাকে পাহারায় রেখে গেছে। তা যতক্ষণ সিংহ না আসে, ততক্ষণ এই হাতির মাংস যতটা পার খাও তুমি। চিতা বলল—মামা। যদি এমনটাই হয়ে থাকে, তা হলে মাংস খেয়ে কাজ নেই। কেননা আপনি বাঁচলে অমন মাংস ঢের পাওয়া যাবে। শেয়াল বলল—বোকা, ভিতু কোথাকার! তুমি নিশ্চিন্তে মাংস খাও। ওই সিংহটাকে আসতে দেখলেই আমি তোমায় দূর থেকে সঙ্কেত দেব। শেয়ালের কথায় চিতা মাংস খেতে বসল। কিন্তু যেই না চিতা হাতিটার বাইরের শক্ত চামড়াটা দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে মাংস খাবার পথ বার করেছে, অমনি শেয়াল বলল—এই রে! পালাও, ভাগনে। পালাও, সিংহটা ওই আসছে। চিতা পালাল।

চিতার দাঁতে কাটা চামড়া সরিয়ে শেয়াল এ বার মাংস খেতে বসল। খানিকটা মাংস খেয়েছে কি না খেয়েছে, এর মধ্যেই আর একটা শেয়াল এসে নিজের দাপট দেখাতে লাগল। মহাচতুরক শেয়াল দেখল—এর গায়ের জোর তাঁর সমানই এবং নীতিশাস্ত্র বলে—উত্তমকে প্রণিপাতে তুষ্ট করো, যেমন সে করেছে সিংহকে। বলবানের সঙ্গে

ভেদনীতি, যেমন সে করেছে বাঘের সঙ্গে আর নীচ ব্যক্তিকে সামান্য দান করে ভোলাতে হয়, যেমন সে করেছে বুদ্ধিহীন চিতাকে, আর সমশক্তিকে পরাক্রম দেখিয়ে পরাজিত করতে হবে। অতএব আর দেরি না করে নবাগত শেয়ালটির ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মেরে জ্ঞাতিশত্রু নিঃশেষ করে বহুক্ষণ ধরে হাতির মাংস খেল।

মনু কৌটিল্য-কথিত এই যে চারটি কূটনৈতিক পন্থা, এই গল্পে চারটিরই প্রয়োগ একের পর এক বা একসঙ্গেই ঘটেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য আরও গল্পে কূটনৈতিক বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে দণ্ড বা শাস্তি দেবার ব্যাপারটা এসেছে সবার শেষে। তবে কিনা এখানেও তো পাত্রাপাত্র বিচার আছে, আছে সেই বিচার যেখানে শত্রু নিজে নীতিহীন কিনা সেটা দেখতে হয় নিপুণ ভাবে। ওই যে দুই শেয়াল দমনক আর করটককে নিয়ে ষাঁড়-সিংহের গল্প আরম্ভ হয়েছিল, তারা আগে তো ওই সিংহেরই মন্ত্রী ছিল। তাদের চাকরি চলে গিয়েছিল, কিন্তু সিংহের মানসিকতার সুযোগ নিয়ে আবার মন্ত্রিত্ব ফিরে পাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এক সময় দমনক যখন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ষাঁড়-সিংহের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখতে আরম্ভ করল, তখন অপর শেয়াল করটক যে-সব শাস্ত্রবচন আওড়াল, তা সবই অর্থশাস্ত্র এবং রাজধর্মের কথা।

এখানে প্রথমে এসেছিল রাজভৃত্যের কথা, যারা রাজার কাছাকাছি থাকেন। এ-কথা তো এখনও খুব সত্যি যে, রাজাদের এমনটাই স্বভাব, যেমন এখনকার মন্ত্রীদেরও এই স্বভাব যে, কাছাকাছি-থাকা লোকটিকেই রাজা ধরে বসেন, না থাক তার লেখাপড়া, না থাক সংস্কৃতি— আসন্নমেব নৃপতি র্ভজতে মনুষ্যং/বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসংস্কৃতং বা। রাজাদের এই অভ্যস্ততা থেকেই অবিবেচক রাজা উত্তম পদের যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মানজনক অধম পদে নিয়োগ করেন। যে মণি সোনার গয়নায় বসানো উচিত, তা যদি টিনের ওপর বসানো হয়, তখন সে মণি চমক না দেয়, সে তো স্যাঁকরার দোষ। আবার মাথার ওপরে বসা এমন মূর্খ মহান প্রশাসককে আমি দেখেছি যিনি গণতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়ে বলেন—আমার কাছে তো সবাই সমান, সবার সঙ্গেই সমান ব্যবহার করি। পঞ্চতন্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এখানে এক সুরে বলবে—রাজপ্রশাসকের যদি ভৃত্যদের সম্বন্ধে তর-তম জ্ঞান না থাকে সেখানে উদ্যমী এবং সমর্থ লোকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অসৎ, নীচ, ফন্দিবাজ মানুষটি, যার স্তাবকতায় রাজা চলতে থাকেন, রাজা জানেন না, সেই একদিন রাজার সর্বনাশ করে।

করটক ঠিক তাই বলেছিল। বন্ধুস্থানীয় সঞ্জীবক ষাঁড়ের সঙ্গে সিংহ পিঙ্গলকের যখন লড়াই লেগে গেল, তখন করটক-শেয়াল দমনক-শেয়ালকে বলেছিল, যে-সব রাজা নীচলোকের অনুবর্তী হয়ে পণ্ডিতের কথা শোনেন না, তাঁরা বিপন্নতায় ভর্তি এক অনর্থের খাঁচায় প্রবেশ করেন, যা থেকে আর বেরোবার উপায় থাকে না। অথবা তোর দোষ দিয়ে লাভ কী? এ-তো রাজারই দোষ। আরে মন্ত্রীর বিচক্ষণতা তখনই, যখন দুই পক্ষের সন্ধি ভেঙে যায়, নইলে সব ঠিকঠাক থাকলে সবাই তো পণ্ডিত। তুই মন্ত্রী হবার যোগ্যই নোস। কেননা অনায়াসে যা হবার নয় এবং রীতিমতো অস্ত্র ব্যবহারের

ঝুঁকি নিতে হবে—এমন ক্ষেত্রেও রাজনীতি-কুশলীরা বুদ্ধি দিয়ে অহিংসার মাধ্যমে মীমাংসা করেন। এঁরাই আসলে মন্ত্রী। কেননা সামনীতিতে কৌশলেই যে কাজটা করা যায়, সেখানে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দণ্ডের ব্যবহার করেন? যে-পিত্তরোগ চিনি খেলেই কমে যায়, সেখানে কোনও ডাক্তার রোগীকে পলতা পাতা খাওয়ায়?

পঞ্চতন্ত্রের এ-সব কথা মনুসংহিতার রাজধর্ম, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মহাভারতের রাজধর্ম-পর্বের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। বস্তুত প্রবন্ধের পরিসর নেই, জায়গা নেই, তাই পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি সহায় করে অর্থশাস্ত্রের হাজারো কূটনীতি এখানে বোঝাতে পারলাম না। বিশেষত রাজার দুর্গ, তাঁর পররাষ্ট্রনীতির ছয় রকম প্রকার, এবং করনীতি নিয়ে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি এতটাই অর্থশাস্ত্রীয় ভাবনায় বাঁধা যে সেগুলি সদৃষ্টান্তে গল্প করে বোঝানোর দরকারও নেই। তবু শেষ পাতে সেই বিখ্যাত সিংহ-খরগোশের গল্পটা একবার স্মরণ করাই। ভাসুরক সিংহ বনের মধ্যে যথেচ্ছ পশু ধরে-ধরে খেত, সেখানে বনের পশুরা সকলে মিলে সিংহের কাছে গিয়ে বলল—আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসুন। আপনি প্রতিদিন যথেচ্ছ বনের পশু খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ প্রতিদিন একটি পশু হলেই আপনার খিদে মেটে। আপনি বসে থাকুন নির্বিবাদে, প্রতিদিন এক জাতের পশু একটি করে আসবে আপনার কাছে, আপনি খান, বিনা কষ্টে থাকুন, রাজধর্ম পালন করুন, আমরাও ঝাড়েবংশে উচ্ছিন্ন হই না।

আসলে এখানে অর্থশাস্ত্রীয় করনীতির মূল কথাটা বলা আছে। মহাভারতের মধ্যে প্রথম রাজার সঙ্গে প্রজাবর্গেরও একটা চুক্তি হয়েছিল। তারা রাজকর দেবে রাজার প্রজাপালন-ধর্ম সুস্থির করার জন্য। মহাভারতের এই প্রাক্‌কথনে ব্রহ্মা মনুকে আদেশ দিলেও তিনি পৃথিবীর প্রথম রাজা হতে চাননি। তখন পার্থিব প্রজারা মনুকে অনুনয় করে বলেন—আমরা জানি রাজকোষ ছাড়া রাজ্য চালানো যায় না। অতএব চুক্তি থাকুক—আমাদের যদি পঞ্চাশটা পশু থাকে, তবে তা থেকে একটা আপনাকে দেব। যদি সোনা থাকে, তা হলেও দেব পঞ্চাশের এক ভাগ, ধান থাকলে ধান দেব দশের এক ভাগ। এমনকী আপনার বিয়ের জন্য এক সুন্দরী কন্যাও দেব আপনাকে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে দেখুন—বনের পশুরা সিংহ ভাসুরককে একটা সিংহী দান করতে পারেনি বটে চুক্তিটা করেছিল একেবারে প্রাচীন করনীতি অনুসরণ করে—একটা পশু রাজার জন্য রাজকর। আর মহাভারত বলেছে—কর নেবার নীতি হল ভ্রামরী নীতি। মৌমাছি যেমন প্রত্যেক ফুল থেকেই একটু একটু মধু নেয়, অথচ ফুল নষ্ট করে না, গাছ নষ্ট করে না, রাজা সেই ভাবে প্রজার কাছ থেকে কর নেবেন এবং কখনওই এমন ভাবে কর ধার্য করবেন না, যাতে করের উৎসটাই নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চাতন্ত্রের পশুরা সিংহের জন্য একটি করে পশুকর ধার্য করে নীতিবাক্যে বলেছিল—রাজা হবেন গয়লার মতো, প্রজার বিত্ত-দুগ্ধ দোহন করবেন শনৈঃ শনৈঃ। কিন্তু যে বোকা রাজা প্রজাকে পাঁঠার মতো একবারেই কেটে ফেলবেন, তার একবার মাত্র তৃপ্তি হবে, দুবার নয়।

এমন একটা অসাধারণ করনীতি স্থির করে, প্রতিদিন যখন এক-এক পশু সিংহের

কাছে যাচ্ছে, তখন এল সেই খরগোশের পালা। সে রাস্তার মধ্যে একটা কুয়োর মধ্যে নিজের ছায়া দেখেই ঠিক করে ফেলল—আমি বুদ্ধি-কৌশলে সিংহ ভাসুরককে খেপিয়ে তুলে এই কুয়োয় এনে ফেলব—অহং ভাসুরকং প্রকোপ্য স্ববুদ্ধ্যাস্মিন্ কূপে পাতয়িষ্যামি। এর পরের ঘটনা আপনাদের জানা। খরগোশ সময়মতো সিংহের কাছে না গিয়ে দেরি করে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্রোধে সব ছারখার করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, এই অবস্থায় ছোট্ট খরগোশ যখন সিংহের কাছে এল, তখনও খরগোশ ভয় পেল না। বরঞ্চ সিংহের ক্রোধাগ্নি আরও উদ্দীপিত করে সে অন্য এক সিংহের গল্প শোনাল, যে নিজেকে এই বনের রাজা বলে দাবি করেছে এবং ভাসুরককে চোর বলেছে। জ্বলন্ত খিদের ওপর এমন অপবাদ, বিশেষত রাজ্যসংশয় ভেবে ভাসুরক যুদ্ধ করা স্থির করল এবং এক্ষেত্রে যে নীতিবাক্যটি উচ্চারণ করল সেটা একেবারে কৌটিল্য-কথিত যুদ্ধনীতি। কৌটিল্য লিখেছিলেন—বন্ধুলাভ (ally), স্বর্ণলাভ, এবং ভূমিলাভের মধ্যে ভূমি বা রাজ্যকেই সবচেয়ে বড় লাভ বলে জানতে হবে। পঞ্চতন্ত্রের ভাসুরক সিংহের মতে—যুদ্ধ করে যদি এই তিনটির একটিও না আসে, তবে যুদ্ধ করে লাভ নেই এবং এক্ষেত্রে যখন অন্য সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে, তখন নিজের রাজ্যরক্ষার জন্যই এ বার তাকে যুদ্ধ করতে যেতে হবে।

ভাসুরক যেতে চাইলে খরগোশ বুদ্ধি করে বলল—যাবেন তো মহারাজ, কিন্তু সে-সিংহ তো দুর্গের মধ্যে থাকে আব কে না জানে যে, দুর্গাশ্রিত রাজার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা দুষ্কর। খরগোশ রীতিমতো মনুসংহিতার রাজধর্ম শুনিয়ে দুর্গের সুবিধেগুলো জানাল। ভাসুরক তখন রেগে আছে, শান্তির কথা, শত্রুর সুবিধের কথা শুনে সে আরও রেগে যাচ্ছে। সে বলল—শত্রুর শেষ রাখতে নেই, নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনীতি তাই বলে। খরগোশ তবু বলল—শত্রুর বলাবল না জেনে এইভাবে যাবেন? ভাসুরক এ বার ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাপিয়ে বলল—তোর এত কথার দরকার কী? তুই দুর্গটা দেখিয়ে দে। খরগোশ এবার ভাসুরককে কুয়োর ওপর নিজের ছায়া দেখাল। সিংহ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরল।

একটি গল্পের মধ্যে করনীতি, দুর্গ ব্যবহার, যুদ্ধ বা দণ্ড ইত্যাদি রাজ্যাঙ্গের ভাবনা মিশিয়ে পঞ্চতন্ত্র যে গল্প করেছে, এমন গল্প আরও আছে এবং সে-সব জায়গায় রাজনীতি-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এমন ভাবে গল্পের সঙ্গে মেশানো আছে যে, ওপর থেকে তা ভাল করে ধরাই যায় না। বিশেষ করে মন্ত্রী, মন্ত্রণা, দূত এবং পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজনীতি শাস্ত্রের বচনগুলি এমন সুকৌশলে পশু-পক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে মেলানো হয়েছে যাতে গল্প এবং গল্পের টান থাকে অটুট, অথচ রাজনীতির শিক্ষাগুলি অন্তরে প্রবেশ করতে থাকে আয়াসহীন প্রচ্ছন্নতায়। এতে বোঝা যায়, পঞ্চতন্ত্র-কথার শিক্ষণ-প্রণালীও রাজনীতি-মথিত।

দ্বিচারিতা ছলনা এবং মহাভারত

এক

সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার কথা ছিল। এখন সময় যেরকম পড়েছে, তাতে কারও সঙ্গে কারও দেখাই হয় না। ফলত অনেক দিন পর বেশ ভালই লাগছিল। আমার যাবার আগেই সেখানে আমার বউদিদির বাপের বাড়ির লোকজন দু চারজনা এসেছিলেন। হয়তো খাওয়া দাওয়ার এই আয়োজনে একই সঙ্গে অন্য আরও দু-একজনের সৌজন্য মিটিয়ে দেবার জন্য আমার খুড়তুতো দাদার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুও এসেছিলেন, তিনি জগাদা। ঘটনাক্রমে তিনি আমারও ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—বহুতর রান্নার আয়োজন চলছে। কাটা সবজি, বাটনা বাটা, ডালের ফোড়ন মশলা সম্ভার সব কিছুর গন্ধে বাড়ি ঘর ম-ম করছে। আমাদের প্রচুর গল্পগুজব, প্রত্ন-কথা, মুহুর্মুহু চা, মাছের ডিমের বড়া, অসময়ে স্নান ইত্যাদির অন্তে খাবার দেওয়া আরম্ভ হল। দেখলাম—বউদি অতি যত্নে আমার বৃদ্ধা কাকীমাকে ঘরে খাবার দিয়ে এলেন এবং মাঝে মাঝে আমার দাদাও তাঁর তদারকি করছেন। দেখে বেশ ভাল লাগল। একটু অন্তরালে সিগারেট খেতে খেতে যখন জগাদার কাছে এই ব্যবহারের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছি, তখন জগাদা বললেন—যা দেখছিস, সব ভুল। এটা আজকের ব্যাপার। বউদির বাপের বাড়ির লোক এসেছে, তাঁদের সামনে বউদি শাশুড়ি সেবা করছে। অন্যদিন কাজের লোক মাসিমার ঘরে খাবারের থালা রেখে আসে। দ্যাখ্ মাসিমার কাছে তো কম খাইনি সারা জীবন, একটু খারপই লাগে।

ঘটনা শুনে আমি বললাম— দ্যাখো জগাদা! আমাদের সবার মধ্যে কোনো না কোনো বিষয়ে এক ধরনের দ্বিচারিতা আছে এবং সেটা সকলের সামনে আমরা প্রকাশ করতেও পারি না। এই সেদিন খবর পেলাম —তুহিনের বাড়িতে তুহিনই অফিস থেকে ফিরে রাত্রে খাবার রান্না করে, তুহিনই ছোট বাচ্চাকে খাওয়ায়, তুহিনই সবাই শুলে মশারি খাটায়। অথচ সে এতদিন কোনও গৃহকর্মই করত না। তার অবশ্য চাকুরে বউ। আমরা তাই ভাবলাম—চাকুরে বউকে সুখে রাখার জন্য তুহিনের এই জীবন-যন্ত্রণা, কী আর করা যাবে! কুচুটে এক নিন্দুক এসে আরও খবর দিল—কেসটা কিন্তু একবোরে উলটে যাবে, যদি সন্ধ্যে থেকেই তুই তুহিনের বাড়িতে অবস্থান করিস্ রাত দশটা পর্যন্ত। আমি একদিন সুযোগ বুঝে ঘটনা যাচাই করার জন্য তুহিনের

বাড়িতে গেলাম। তুহিনের সঙ্গে গল্প করছি, তুহিনের বউই চা-মিষ্টি দিল। খানিক সময় যেতে বুঝলাম— তুহিন অস্বস্তি বোধ করছে। সে না পারছে উঠতে, না পারছে বসতে। হঠাৎ দেখলাম তুহিনের স্ত্রী রান্না আরম্ভ করল, আর তুহিন উঠে গিয়ে বলল আর একটু পরেই আরম্ভ করতে পারতে, ভাত তরকারী সবই তো ঠান্ডা হযে যাবে নৃসিংহ তো আর এখানে থেকে যেতে আসেনি, ও যাক, তারপর রান্না কোরো।

বুঝলাম স্পষ্ট ইঙ্গিত। আমি গেলে তুহিনের রান্না করার সুবিধে হয়। এবং আমারও সৌজন্যবোধে কাল-বিলম্ব না করে উঠে আসা উচিত। তুহিনের বউ কিন্তু স্বামীর কথার ধারে কাছে গেল না। সে বলল— তোমরা গল্প করছো করো না, রান্না আমি করে ফেলছি। তোমার বন্ধুও তো আর প্রতিদিন আসবে না। তোমরা কথা বলো, আমি চা দিচ্ছি। তুহিন দ্বিগুণ অস্বস্তি নিয়ে আমার কাছে এসে বসল কিন্তু তুহিনের বউ খুব স্মার্ট। একটু পরেই ভাত চাপিয়ে দিয়ে নিজেই সে চা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসল। 'তুহিন এখন স্বস্তিতে।'

খানিক কথাবার্তা চলার পরেই আমি মন খুলে বললাম— দ্যাখ তুহিন, আমি এতটা সময় থাকতাম না। তবে অমুক লোকটা তোদের বাড়ির নাটক নিয়ে একটা কথা তুলেছিল, তাই বুঝতে এসেছিলাম সত্যিই কী করিস তোরা। উত্তর দিল তুহিনের বউ। বলল— নাটকই বটে দাদা। আমি সারাদিন পর অফিস থেকে ফিরি। সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগে। বাচ্চাটার জন্য এমন কাজও কিছু থাকে যা আমি না করলে চলে না। এই অবস্থায় সত্যিই তুহিন আমাকে সাহায্য করে। ও রান্না করে, চা করে—এবং সেটা সবটাই আমার প্রতি মমতাবশত। কিন্তু পুরুষ মানুষের এই হাতা খুন্তি নাড়া দেখলে ওর বাবা-মা-পরিজনের যত খারাপ লাগবে, তেমনই বিক্রিয়া ঘটবে আমার বাড়ির লোকেদের মনেও। দুই বাড়ির ভাব- ভাবনা হয়তো আলাদা হবে, কিন্তু কোনো ভাবটাই আমাদের ভাল লাগবে না। তাই এই নাটক। অন্তত তাতে বাইরের চাপা কথাগুলি বন্ধ থাকে। বাইরের লোক আসলে, বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ির কেউ আসলে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এই নাটক আরম্ভ করি। অর্থাৎ আমি কাজে নেমে পড়ি এবং লোকে ভাবে আমি স্ত্রীলোকের চিরাচরিত কর্তব্য পালন করছি।

তুহিনের বউকে আমি তুহিনা বলেই ঠাট্টা করে ডাকি, কিন্তু আজ তুহিনার কথা শুনে আমার কিছু বোধ উন্মোচিত হল। এমন সত্যি আর খোলামেলা কথায় আমার বোধ হল যে, সত্যিই তো আমরা এখনও পুরুষদের কোনও রূপ গৃহকর্ম চোখে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু সত্যিই তো কেন এমন হবে— মেয়েরা চাকরি করে সংসারে টাকা জোগাবে, আর আমি কলসী নিয়ে জল আনতে গেলেই লোকে বলবে মেয়েছেলে হয়ে গেছে—বহুতর কর্মের ওপরে এই রকম স্ত্রী-পুরুষের মিল সারাটা তো আমরাই করছি। অতএব লোকচক্ষুতে ভাল থাকবার জন্যই আমাদের কিছু নাটক করতে হয় এবং এইরকম নাটক আমরা অহরহ করছি যা আমরা নিজেরাও সব সময় বুঝি না বা না বোঝার ভান করি।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক ধরনের দ্বিচারিতা আছে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে এক রাজনীতি-কুশল অবচ্ছায়ী মানুষ যে অহরহ সময়ে অসময়ে সেই কপট নাট্যের প্রস্তাবনা রচনা করে চলেছে। ভাবুন না, আমরা যখন টেলিফোনে কথা বলি, তখন সময় বুঝে মানুষ দেখে গেলার স্বর এক এক সময় এক-এক রকম হয়। মোবাইলে বসের টেলিফোন এলে গলার যে সুর বেরোয়, অধস্তনের ফোনে থাকে অন্য সুর। কাজের লোক কামাই দেবে বলে টেলিফোন করলে যে হতাশা, ক্রোধ বিরক্তি এবং পরের দিন কামাই করবে কিনা এই অনিশ্চয় মিলে আমাদের গলাটা টেলিফোনে ঠিক কেমন হয়, তা বোধ হয় একমাত্র অবুঝ কাজের লোকই বোঝে। আর সর্বশেষ নাটকে আমার স্ত্রী বলেছেন— তুমি মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলছ, নাকি পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলছ, সেটা টেলিফোনের এই দিকে তোমার গলা শুনলেই আমি বুঝতে পারি। এমনকী যুবতী রমণীর সঙ্গে কথা বলছি, নাকি সাতান্ন বছরের স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছি—তাও নাকি তিনি অনায়াসেই বুঝতে পারেন আমার কণ্ঠস্বরের সম-অসম-বিষম তারতম্যে। আমি বলেছিলাম—টেলিফোন লাগবে না, এককাঠি বাড়িয়ে তাঁকেই শুনিয়ে বলেছিলুম— জানো মহাভারতের কথক ঠাকুর কী বলছেন? বলেছেন—অসুরকুলের গুরু সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শুক্রাচার্য যতটুকু রাজনীতিশাস্ত্র জানেন এবং দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি যত রাজনীতি জানেন, সে সবই নাকি মেয়েদের বুদ্ধির চেয়ে বেশি হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি, মনু ইত্যাদি বিশালবুদ্ধি মানুষেরা যে রাজনীতিশাস্ত্র লিখেছেন, সেটা তাঁরা লিখেছেন স্ত্রীলোকের বুদ্ধিনিষ্কর্ষ থেকেই— স্ত্রীণাং বুদ্ধ্যর্থনিষ্কর্ষাদ্ অর্থশাস্ত্রাণি শক্রহন্।

কথাটা বলেই যে বেঁচে গেলাম, তা নয়। আমার স্ত্রীর বান্ধবী—তিনি খানিক প্রগতিবাদিনী, খানিক স্ত্রী স্বাধীনতাকামিনী। কথাটা তাই পড়তে পারল না। তিনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কথাটায় মেয়েদের প্রশংসা করা হচ্ছে না নিন্দে করা হচ্ছে। শুক্রাচার্য-বৃহস্পতির মতো রাজনীতিবিদ স্ত্রীলোকের বুদ্ধিকে উদাহরণ মেনে তাঁদের রাজনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন—এ-কথাটা স্তুতি না নিন্দা? আমি বললাম— এটা স্তুতিও বটে, আবার নিন্দেও বটে, স্তুতিটা এইখানে যে, মেয়েদের মানসিক অবস্থানের সঙ্গে বাচিক তৎপরতার এত পার্থক্য থাকে, অথচ সেই পার্থক্যটাকে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই এমনভাবেই চেপে রাখতে পারে যে, পণ্ডিত শাস্ত্রকারেরা এই রকম মনে করেছেন—আর নিন্দার ব্যাপারটা এইখানে যে, এই রকম দ্বৈতাচার করলে মেয়েদের তো চেনা খুব কঠিন হবে, বিশ্বাস করা তো আরও কঠিন।

বান্ধবী বললেন— যেভাবে আপনি স্তুতির ব্যাখ্যাটা দিলেন, ওটাই আসলে নিন্দেই। অর্থাৎ আপনি বলতে চান—মেয়েরা ভাবে একরকম আর বলে আর একরকম, তা এটা কি কোনো ভাল কথা হল? আর একটা কথা বলুন—ছেলেরা কি এরকম করে না, শুধু মেয়েরাই করে? আমি বললাম, অবশ্যই ছেলেরাও এটা প্রচুর করে, তবে কিনা যে সব

ছেলে এটা করে, তাদের মধ্যে রাজনীতির ভাবটাই বেশি আসে। এই যেমন ধরুন না, মনু-মহারাজ রাজাদের আচরণীয় কর্তব্য হিসেবেই বলেছেন—রাজাদের ভাব-সাব যেন এমন হয় যে, তাঁরা কি ভাবছেন এটা যেন লোকে বুঝতেই না পারে। কথা বলার সময় বা শোনার সময় তাঁর মুখে চোখে যেন কোন ক্ষোভ, বিরক্তি, বা কোনও সুখও ফুটে না ওঠে। তাঁর হাত পা বা অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন তাঁর আন্তরিকভাবে পরিস্ফুটন না ঘটে। অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাব সব গোপন থাকবে, কিন্তু অন্য, পর বা শত্রুর সমস্ত ভাব— সে মুখে-চোখেই হোক বা হাতে পায়েই হোক— পরের সব ভাব তিনি নিজে অথবা দূতের মাধ্যমে, চরের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করবেন, এমনকী অপর রাজার সম্বন্ধে তাঁর অনুগত লোকজনের ভাব কী, সেটাও তিনি বোঝার চেষ্টা করবেন—আকারম্ ইঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম্।

তবে কিনা, রাজা কথাটা বললেই একটা প্রাচীন যুগের আবহ চলে আসে, তার চেয়ে রাজনীতি কথাটা অনেক ভাল। কেন না গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র সব তন্ত্রেই রাজনীতির চেহারাটা কখনওই সরল সুবোধ গোপালকের তাত্ত্বিকতায় ধরা পড়ে না। সেখানে দ্বিচারিতা আছেই। অসাধারণ একটা প্রাচীন শ্লোকে রাজ-ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয়েছে— রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লোক। তবু রাজা তাঁদের উপেক্ষায় করে চলেন; আবার কোনও মতে যে লোকটি রাজার সামনে এসে পৌঁছল, রাজা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন দেখেও দেখছেন না। রাজার কাছে কেউ যখন সাগ্রহে কিছু জানায় তিনি তখন হাতির মতো নিস্পৃহ চোখে তাকান তার দিকে, চোখের পাতা ওঠে একবার, নামে একবার কিন্তু কিছু তাঁর হ্যাঁ-না কিছুই বোঝা যায় না, কথা যদি বলেন, তাও অনেক কায়দা করে বলেন। বড় মাপের যে লোকটা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেরিয়ে যাবে, সেই লোকটির বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সামনে রাজা তাঁর দোষগুলি নিয়ে কথা বলেন। কবি বলছেন—এই রকম একটা মানুষকে যদি রাজা হিসেবে সেবা করতে হয়— করেও অনেক কুমতি পুরুষেরা— তাহলে পিশাচেরা কী দোষ করল—স স্বামী যদি সেব্যতে কুমতিভিঃ কিং নঃ পিশাচৈঃ কৃতম।

আমার যৌবনগন্ধী বয়সের কথা মনে পড়ে। আমার এক বন্ধু একটি তথাকথিত সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে বলেছিল তার দার্শনিক পছন্দের কথা, সঙ্গে এ-কথাও জানিয়েছিল —অনেকেই লাইন দিচ্ছে ওখানে। মেয়েটিকেও দেখতাম —কখনও কারো দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকাত, উপেক্ষা করত অনেককেই, আবার বেশি কথা বলত এমন একজনের সঙ্গে যার 'বাফুনারি' তে ছেলেরাও বিরক্তি হত। পরে ভেবে দেখেছি — হয়তো বা রাজার সঙ্গেই সুন্দরী মেয়েদের কিঞ্চিৎ তুলনা করা যায়। পুরোটা নয়— কেন না রাজা বা রাজোপম গণতান্ত্রিক নেতারা মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার করেন, তা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে তুলিত হতে পারে না। বিশেষত, স্তাবক পুরুষদের মধ্যে কার সঙ্গে সেই মেয়ে ভাল করে কথা বলবে, কাকে উপেক্ষা করবে, কার প্রতি সকরুণ কটাক্ষ করবে— এই সমস্ত প্রক্রিয়াটার মধ্যেই যে দ্বৈতাচার আছে—সেই প্রক্রিয়াটাই

তৈরি হয় আত্মরতির কারণে, অর্থাৎ কিনা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে নিজেকেই উপভোগ করে, আর এটা যেহেতু মনুষ্য হৃদয়ের আদান এবং প্রদানের ব্যাপার, তাই সেখানে নান্দনিকতার একটা অবসর থেকেই যায়। কাজেই স্ত্রীলোকের দ্বৈতাচারের সঙ্গে রাজনীতির তুলনা চলে না।

যুধিষ্ঠির মহারাজ অবশ্য খুবই খেপে ছিলেন মেয়েদের ওপর। অন্যান্য সময়ে প্রশ্ন করার সময় যুধিষ্ঠির কখনওই নিজে বেশি মন্তব্য করেননি এবং ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছেন খুব সংক্ষেপে। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করার সময় যুধিষ্ঠির নিজেই অনেক মন্তব্য করে ফেলছেন এবং তাতে বোঝা যায়— অনেক পুরুষ মানুষ, বিশেষত প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক দাগা খাওয়া পুরুষ মানুষের মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা থাকে, সেইরকম একটা মানসিকতা থেকে যুধিষ্ঠির মন্তব্য করে বলছেন—এখন এই মেয়েদের ব্যাপারটা আমাকে একটু-বুঝিয়ে বলুন তো পিতামহ। সব সময় তো প্রায় দেখি—পুরুষরা যতই আবেগ দেখাক মেয়েদের ওপর, তারা খালি বঞ্চনাই করে—এতা হি রমমানাস্তু বঞ্চয়ন্তীহ মানবান্। একবার যদি পুরুষ মানুষ মেয়েদের খপ্পরে পড়ে, তো রেহাই নেই আর। তাছাড়া অদ্ভুতও লাগে দেখে— পুরুষ হাসলে পরে এরা হাসে, কাঁদলে পরে কাঁদে অথচ সময়কালে অত্যন্ত অপছন্দের পুরুষকেও এরা হেসে কথা বলেই বশ করে ফেলে। সবচেয়ে বড় কথা— মিথ্যাকেও মেয়েরা সত্য বলে প্রতীত করায় এবং সত্যকে মিথ্যা বলে বোঝাতে পারে মেয়েরা— অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যঞ্চাপি তথানৃতম্।

ঠিক এর পরে যুধিষ্ঠির শুক্রাচার্য আর বৃহস্পতির রাজনীতিজ্ঞতার চেয়েও স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করে রাজনীতি আর অর্থশাস্ত্রের মূল উপাদান হিসেবে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের বক্তব্য—এখানেও অবশেষে রাজনীতির সঙ্গেই যে মেয়েদের স্বাভাবিক তুলনা চলে এল, তার আসল কারণ কিন্তু সেই মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতীতি করানো অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে বুঝিয়ে দেওয়া— অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যঞ্চাপি তথানৃতম্। তার মানে 'হিপোক্রিসি'। তবে যুধিষ্ঠির মেয়েদের দেখে যতই আশ্চর্য হোন, 'হিপোক্রিসি' ব্যাপারটা মেয়েদের শুধু একচেটিয়া নয়। বিশেষত যুধিষ্ঠির নিজের জীবনে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন— দ্রৌপদী ভালবাসছেন অর্জুনকে, ভীমের ভালবাসাকে তিনি ব্যবহার করেন, আর যুধিষ্ঠিরকে জ্যেষ্ঠ স্বামীর মর্যাদা দিয়েও গালাগাল করেন মাঝে মাঝে—সেই দৌপদীকে দেখে যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী-বিষয়ক মন্তব্যগুলি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ঘটনাই যে, হিপোক্রিসি ব্যাপারটা স্ত্রীলোকের কোন একক বৈশিষ্ট্য নয়। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যের প্রতীতিতে গ্রহণ কারনোর মতো ব্যাপারটা পুরুষের ক্ষেত্রে আরও যে কতটা ব্যাপ্ত স্বভাবের মধ্যে নিহিত, তা সেই কোন কালে পাবলিলিয়াস সাইরাসের মতো গ্রিক দার্শনিক বলে গিয়েছিলেন—It is easy for men to talk one thing and think another.....অর্থাৎ সেই একই কথা 'মনে এক মুখে এক'।

সাধারণত এই 'মনে এক মুখে এক' ব্যাপারটাকে আমরা খল অথবা ছল পুরুষের ধর্ম বলে মনে করি। সাধারণত খল তথা ছলনাময় মানুষ একটা বিশেষ 'ক্লাস', যাদের স্বভাব, চরিত্র এবং লোকব্যবহার নিয়ে হাজার-হাজার নিন্দা-শব্দ উপচিত হয়েছে শত শত বছর ধরে। কত প্রবাদ 'মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্'—মধু ঝরে পড়ছে জিভে হৃদয়ে বিষ, অথবা আসলে বিষের কলসি, কিন্তু ওপরে দুধের পরত—বিষকুম্ভং পয়োমুখম্— এই সব প্রবাদের সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ প্রবাদ—hypocrites kick with their hind feet while licking with their tongue অথবা স্বয়ং শেক্সপিয়ারের 'O serpent heart hid with a flow'ring face' প্রায় সব একই রকম এবং এটাও মানতেই হবে প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে এবং প্রত্যেকটি 'বর্তমান' কালে এই ধরনের স্বভাব খল—আঁদ্রে জিদ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন— ছলনা করতে-করতে যাদের মনে আর সামান্যতম পাপবোধও থাকে না এবং অত্যন্ত তন্নিষ্ট ভাবে যারা মিথ্যাচার করে, মিথ্যা কথা বলে— তারা আসলে একটা ক্লাস— আবহমান কালে তারা ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, হৃদয়ে পাপবোধ নিয়েও দ্বৈতাচার করা যায়, মিথ্যাচার করা যায়; এবং এমন এমন মিথ্যাচার এবং অন্যায় আছে যা আমরা অনেকেই পরিস্থিতির চাপে পড়ে করি, করতে বাধ্য হই, হয়তো বা করতেও ভালবাসি এবং অন্যতর সযৌক্তিক ব্যাখ্যায় সেটাকে 'জাস্টিফাই' ও করি।

মহাভারতের অন্তত দু'টি জায়গায় কতগুলো 'পারমিটেড হিপোক্রিসি'র কথা বলা আছে। বলা হয়েছে পাঁচটা ব্যাপারে মিথ্যা বললে কোনও দোষ নেই এবং এই প্রসঙ্গটা একবার এসেছে মহাভারতের আদিপর্বে আর একবার কর্ণপর্বে। পাঁচ মিথ্যার একটা হল —নর্মবচন, অর্থাৎ বন্ধু -বান্ধবের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময়ে মিথ্যা বললেও দোষ নেই। কিন্তু এই মিথ্যা বড় নির্ভেজাল, তার পরেরটাই সাংঘাতিক। সেটাই বলা হয়েছে—মেয়েদের কাছে মিথ্যা বললে দোষ নেই। কথাটা শুনলে পরেই এখনকার মহিলামহল চিড়বিড় করে ওঠেন ওবং ওঠাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর একটা ব্যাখ্যা আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রায় স্মার্ত পন্ডিতের মতো ব্যাখ্যা করে বলেছেন— একজন পুরুষ যে রমণীর সঙ্গে সঙ্গম করছেন অথচ বলছেন আমি তাকে ভালবাসি না—স্ত্রীষু গম্যাসু অহমেনাং ন রময়ে— এই রকম বললে সেটা মিথ্যে নয়। বেচারা শাস্ত্রবুদ্ধি নীলকণ্ঠ। স্ত্রীলোকের মন বলে কিছু বোঝোই না তুমি । আমরা তো বলব— রসশাস্ত্রের ন্যূনাধিক সমস্ত অলংকারকে যিনি 'অতিশয়োক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন, তিনি এই অতিশয়ী কথার মূল্য বোঝেন— তোমার মুখ চাঁদের মতো, অথবা 'মুখভয়ে চাঁদ আকাশে' ইত্যাদি রমণী-হৃদয়ের তর্পণ-কথা সবই তো অতিশয়োক্তি বলে চিহ্নিত করা যায়, বিশেষত বিবাহের পর। আর যদি বলেন প্রেমোন্মাদ অবস্থায় যে-সব পৌরুষের বচন সত্য বলে মনে হয়, বিবাহের পরেও তা একই রকম সত্য থাকে এবং ভাইস-ভার্সাতেও তাই, তবে সেই প্রতিবিশিষ্ট 'হরমোন' পরীক্ষা করে আমাদের তার

ফলাফল জানানো উচিত, যাতে অনেকেই চিকিৎসা লাভ করতে পারেন।

আমি বলেছিলাম—যে প্রসঙ্গে এই মহাকাব্য এসেছে, সেটা আসলে 'সিচুয়েশনাল এথিক্স'-এর জায়গা বলেই এই বাক্যের ব্যাখ্যা হওয়া উচিত রসশাস্ত্রসম্মতভাবে। বিশেষত, কর্ণপর্বে এই 'সিচুয়েশনাল এথিক্স' ব্যাখ্যা করার সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণ যে শব্দবন্ধগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি সিচুয়েশনাল এথিক্স'-এর মধ্যেই পরে বলে আপনি একে ঠিক 'হিপোক্রিসি'-ও বলতে পারবেন না, অথচ সেটা ওই 'হিপোক্রিসি'-ই বটে। কৃষ্ণ বলেছেন—অনেক সত্যই আছে যা বলা উচিত নয়, বরঞ্চ সেখানে মিথ্যাই বলা উচিত— ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যম্ অনৃতং ভবেৎ— সময় এমন আসতেই পারে যখন মিথ্যাটাই সত্যে পরিণত হতে পারে, আবার সত্যটাই হয়ে উঠতে পারে ভীষণ কঠিন এক অন্যায় ভাষণ। ঠিক এই ভাবে যদি মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলা যায় অথবা আধুনিক ভাবেই মানি—পুরুষের কাছেও মেয়েরা মিথ্যে বলতে পারে— সেটা 'সিচুয়েশনে'র ওপর নির্ভর করে। আমাদের মতে ব্যাখ্যাটা এই রকম। ধরা যাক, আমার স্ত্রী সন্দেহগুণ যুক্ত, অথবা আপনি ভীষণ জেলাস অনুভব করেন সবসময়। ধরা যাক, কলেজ স্ট্রীটে আমাদের সাথে দেখা হল মালবিকার, আমার চল্লিশে। আপনার সঙ্গে দেখা হল প্রতীকের, আপনার পঁয়ত্রিশে।

না আমি কোনও প্রেমালাপ করিনি, দাম্পত্যজীবনের কোনও দুঃখ জানিয়ে কোনও সমব্যথা জানাইনি তার কাছে। কিন্তু যৌবন-সন্ধিতে আমরা গভীরভাবে পরিচিত ছিলাম, গভীর ভারে একে অপরের বন্ধু-হৃদয় জানতাম। অথচ আজও যদি আকাশে ঝরা বকুলের ক্রন্দন– ব্যথা লেগে থাকে এবং অকারণের আনন্দে কর্মহীন বিকেল হয়ে ওঠে মদির এবং তারপরেও যদি মালবিকা সেদিনের মতোই বলে— চলো কফিহাউসে কফি খাই। তারপর সময় চলতে থাকে অনবধানে, কথা চলে সুখ-দুঃখের পরোক্ষ-সংশ্লেষে। আমার দেরি হয়ে গেল। তখন পড়ি কী মরি করে বাড়ি পৌঁছে আমি অবধারিত ভাবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীর কাছে বলব— কলকাতায় আর চলাফেরা যাবে না, সেই কখন কলেজ স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছি, জ্যাম, অবরোধ কিছু বাদ নেই, খাবর আছে কিছু, একটু চা? স্ত্রী বললেন—রাস্তায় এতক্ষণ আটকে রইলে, বাস থেকে খানিক হেঁটেওছ বলছ, তা চা-তো রাস্তাতেও ছিল।

অর্থাৎ আমি যথেষ্ট সযৌক্তিক বা সন্দেহোর্ধ্ব সপ্রমাণ নই এখনও। কিন্তু আরও সযৌক্তিক হবার জন্য আরও বড় কোনও ছলের আশ্রয় নেওয়া যেত, কিন্তু সতীসাধ্বী স্ত্রীর জন্যই বিকালের নির্ভেজাল কথালাপেও আমার দোষবোধ কাজ করছে, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের দেওয়া নিদান অনুযায়ী আমার কী কোনভাবে বলা উচিত ছিল— আজ মালবিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বেশ কফি খেলাম একত্র, অনেক গল্প করলাম জানো। মহাভারত বলেছে—মেয়েদের কাছে মিথ্যে বলায় দোষ নেই, দোষ নেই বিয়ের সময়ে মিথ্যে কথা বলায়। সত্যিও তো ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-সম্বন্ধ করার সময় ছেলের বাবা-মা অথবা মেয়ের বাবা-মা কয়জন সব সত্যিকথা বলেন।

মেয়ের চেহারা, ছেলের চেহারা, টাকা পয়সা, আত্মীয়-স্বজন। মর্যাদা, স্টেটাস— সবই কি সত্যের পথ ধরে চলে? আর মহাভারতের শেষ মিথ্যা দু'টির জায়গা হল—টাকা - পয়সা সব চলে যাচ্ছে, ধন-সম্পত্তি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথবা আমার প্রাণ সংশয় উপস্থিত—এখন মিথ্যা বলায় দোষ নেই।

মহাভারতে এই রকম কুঁড়ি-পঁচিশটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি। যেখানে প্রয়োজন-বশাৎ মিথ্যা ছলনায় আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং সেখানে ছলনা অন্যায় বলে গণ্য হয়নি, বরঞ্চ তাৎক্ষণিকতার নিরিখে ধর্ম বলেও গণ্য হয়েছে—ভবেৎ সত্যম্ অবক্তব্যম্ বক্তব্যম্ অনৃতং ভবেৎ—যে কথাটা ফারসি সাহিত্যিক মলিয়ের আরও সুন্দর করে বলেছেন— hypocrisy is a fashionable vice and all fashionable vices pass for virtue. সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই প্রশ্ন উঠেই যাবে যে, তাহলে তো সমস্ত খল স্বভাব এবং ছলনাই মানুষ প্রয়োজনবশত করে অথবা স্বকার্যসাধনের জন্যই করে, তাহলে সেগুলি সবই ন্যায়, সবই কোনও-না কোনও ভবে ধর্মসম্মত। আমরা বলব— কথাটা ঠিক এমন নয়। মিথ্যা তো মিথ্যাই থাকে, সত্য সত্যই, কিন্তু কোন বৃহত্তর প্রয়োজনে অথবা শ্রেয়-সাধনে মিথ্যা-ছলনাও ধর্মে পর্যবসিত হয় এবং সেটা পরিশীলিত ধর্মবোধ থেকেই বোঝা সম্ভব। বিশেষত বোঝা দরকার যে-কারণে অথবা যে প্রয়োজনে ছলনা করা হচ্ছে, তার পরিণতিকে সামাজিক, মানবিক অথবা ব্যক্তিগত হলেও সেই হিত ধর্মসম্মত কোনও প্রয়োজনসাধন করছে কিনা। ব্যাপারটা খুব জটিল, এবং মহাভারত-পুরাণ এবং দৈনন্দিন জীবনে অজস্র সাধু-সজ্জনের মধ্যেও এমন হাজার হাজার উদাহরণ আছে, যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যাচারই বলতে হবে, কিন্তু অন্যতর হিত এবং শুভের পরিণাম-রমণীয়তায় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় বা সমর্থন করা যায়।

প্রতিপক্ষে বরং এটাই বলা ভাল যে, ছলনার প্রবণতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নূন্যাধিক আছে, আর একেবারে শুচি-শুদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে— এ-কথা হাজার উপদেশ বর্ষণ করেও মনু-মহারাজ পর্যন্ত বিশ্বাস করেননি। হাতে-কলমে ছলনা না করলেও মানসিক ছলনা একেবারেই নেই—এমনটা দেবতাদের মধ্যেও হয় না, মানুষ তো কোন ছার। কিন্তু সমর্থনযোগ্য ছলনা অথবা হিতসাধনে পরিণামী ছলনাকে ব্যাখ্যা করার যে জায়গাটা, সেটা খুব সঠিকভাবেই মনোবিজ্ঞানের পরিসর। আমাদের ভারতবর্ষে মানুষের সংস্কার, ঔপনিষদিক সত্যের স্মৃতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের চিরন্তন ধর্মবোধের মধ্যেই কিন্তু মহাভারত একটা জীবন্ত সমাজের কথা বলেছে, কিন্তু সেই সমাজটা কখনওই ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীর মতো স্মার্ত সংস্কারে জর্জরিত কোনও পরিবর্তন বিহীন প্রক্রিয়ায় কথা বলে না। বরঞ্চ জগৎ ও জীবনের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়ে, অহরহ যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, সেখানে একটা 'লাইফ অ্যাফার্মিং স্ট্যান্ড' নেয়, এমনকী ভগবদগীতাও তাই। তা যদি না হত, তাহলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই যুযুধান সৈন্যব্যূহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন যখন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক ফেলে দিয়ে

বাক্যহীন ক্লীবের মতো অশ্রু বিসর্জন করছেন, তখন ভগবান বলে কথিত সেই পুরুষোত্তমের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোত না যে, অর্জুন! এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। যখন তোমার ভাই-বন্ধু, পিতা-পিতামহের সম্বন্ধ ভুলে যেতে হবে, পরিণামী ধর্মের জন্য এই লড়াই, এই যুদ্ধ তোমাকে জিততে হবে—তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব/ হত্বা শত্রুন, ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। এবার গীতার প্রসঙ্গেই প্রকৃত প্রস্তাবের কথা বলি।

কথাটা ভগবৎগীতার মতো আরম্ভ করলেই হয়। গীতার চতুর্থ অধ্যায় যেখানে জ্ঞানযোগ আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে ভগবানের জবানিতে বলা হচ্ছে—আমি এই অব্যয় জ্ঞানযোগের কথা প্রথমে বিবস্বান সূর্যকে বলেছিলাম। বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে এই যোগের কথা বলেন। তারপর মনু এই জ্ঞানযোগ উপদেশ করেন তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু-মহারাজকে। আমরা এখানে যে জ্ঞান প্রচার করতে চাইছি, সেই জ্ঞান প্রথমে উচ্চারণ করেছেন পরশুরাম রাজশেখর বসুর কনিষ্ঠ ভাই গিরীন্দ্রশেখর বসু।

সাহংকারে জানাই এই জ্ঞান ছলনা বা হিপোক্রিসি বিষয়ক। আরও পরিষ্কার করে বললে এই জ্ঞান মনুষ্যকুলের দ্বিচারিতা-বিষয়ে, তবে কিনা যাঁর লেখা পড়ে আমি এই লেখায় প্ররোচিত হয়েছি, সেই লারসন সাহেব এই জ্ঞানের বিষয়-ভাবনায় কিছু গোলমাল করে ফেলেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। সাহেব লিখেছেন— স্বীকার করতেই হবে যে, মহাভারত কথার প্রকৃত রহস্যের ব্যাপারে আমার একটু শঙ্কাই কাজ করে এবং সেই শঙ্কা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্য আমি একটি পুরোনো গল্প বলব এবং সেটা এমন একটা গল্প, যা মূল মহাভারতের মধ্যে না থাকলেও মহাভারতকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে এই গল্পটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। এই ভণিতা করার পর সাহেব সেই গল্পটা বলেছেন, যেটা ১৯৩১ সলে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছিলেন ভগবদগীতার কিছু শ্লোকেব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রকট করে তোলার জন্য এবং যে গল্পটা আশিষ নন্দীও আনুপূর্বিক উচ্চারণ করেছেন গিরীন্দ্রশেখর বসুর অত্যদ্ভুত প্রয়াস প্রমাণ করার জন্য, স্বাধীনতা-পূর্বকালের কলোনিয়াল পরিবেশে দাঁড়িয়ে সমস্ত সংরক্ষণশীলতা কাটিয়ে গিরীন্দ্রশেখর ফ্রয়েডের মতো বিশাল বুদ্ধি মানুষের সঙ্গে পত্র-সমালোচনা চালিয়েছেন এবং তাঁর 'ইডিপাল' ভাবনার বিরুদ্ধে ভারতীয় ভাবনা অনুযায়ী একটা মতবাদও তৈরি করেছিলেন। আশিষ নন্দী অবশ্য সার্বিক ভাবে গিরীন্দ্রশেখরের মত মেনে না নিলেও গিরীন্দ্রশেখরের উদ্ধৃত অসাধারণ গল্পটির নিরিখেই তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধারার বিষয়ে অসামান্য আলোচনা করেছেন যদিও সেখানে গিরীন্দ্রশেখরই প্রধান আলোচ্য।

কিন্তু আশিষ নন্দীর কাছে গিরীন্দ্রশেখরের গল্প শুনে লারসন সাহেব সেটাকে মহাভারত-ব্যাখ্যার কাজে যেভাবে লাগিয়েছেন, সেটা যেন অতি কঠিন এক সমস্যার অতিসরলীকরণ। তবে অন্য ক্ষেত্রে মহাপণ্ডিত এই লারসন-সাহেব মহাভারত-ব্যাখ্যার 'ক্লু' হিসাবে গিরীন্দ্রশেখর-উদ্ধৃত যে গল্পটি উল্লেখ করেছেন, সেটা আসলে প্রাচীন মগধে প্রচলিত একটি গল্প এবং সেই গল্পের নিরিখে লারসন সাহেব যেভাবে

ভগবদগীতা, এমনকী মহাভারতেরও তিনটি স্তর সাজিয়ে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করলেন, তা আমি বেশ বুঝলেও ভাল করে মেনে নিতে পারলাম না এবং তাতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কতগুলি শব্দ-চমৎকার— de-mythologization. de-ritualization, de-historicization, de-humanization ইত্যাদিতে বেশ চমৎকৃত হই, কিন্তু পরিশেষে বুঝতে পারি —হয়, মহাভারত এবং ভগবৎগীতাকে সাহেব এতটাই বেশি বুঝে ফেলেছেন, যা অন্য কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়, নয়তো মহাভারতের সার্বিক জীবনবোধ সম্বন্ধে সাহেবের ধারণাই তৈরি হয়নি। আপাতত সাহেবকে ছেড়ে গিরীন্দ্রশেখরের কথায় আসি।

গিরীন্দ্রশেখর লিখেছেন "যুক্তিবাদীকে ভিত্তি করিয়া গীতার আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমার এই ব্যাখ্যা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা দোষবর্জিত হইবার কথা। গীতায় এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা মনোবিদ্যার দিক হইতে অনেক মূল্যবান।" অতএব মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে গীতা-ব্যাখ্যার জন্য কতটা নিরপেক্ষতা এবং কতটা সংস্কারহীন, নৈর্ব্যক্তিকতায় গীতাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তারই উদ্দেশ্যে গিরীন্দ্রশেখর তাঁর অবতরণিকায় প্রাচীন মগধের একটি গল্প বলেছেন। আমরা সেই অসাধারণ গল্পটা আগে গিরীন্দ্রশেখরের অনুকারেই বলব—

পুরাকালে মগধ দেশে শর্বীলক নামে এক মহাতেজস্বী ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। শর্বীলক বেশ লম্বা মানুষ, তাঁর হাত দু'টিও বেশ বড় এবং সে অসীম শক্তিশালী। চারদিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে বহু লোক তাঁর শিষ্য হয়ে পড়াশুনো করতে আসত। যাগ-যজ্ঞ এবং শাস্ত্রচর্চায় তাঁর গৃহ সর্বদা মুখরিত থাকত। মগধে শর্বীলকের সম্মানের সীমা ছিল না।

শর্বীলকের ছেলের নাম পুণ্ডরীক। ছেলেটির অসম্ভব বুদ্ধি, অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে সে জ্ঞানলাভ করেছে। পুণ্ডরীকের বয়স তখন যোলো ছুঁল, তখন একদিন সকালবেলায় পিতা শর্বীলক তাকে ডেকে বললেন—বাছা। আজ খুব শুভ দিন, আজ আমি তোমাকে দীক্ষা দেব বলে ঠিক করেছি। তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করে শ্রদ্ধাচারে থাকবে, রাত্রির দ্বিপ্রহরে যখন অমাবস্যা পড়বে, তখন তোমাকে আমাদের কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করব। সন্ধ্যা থেকেই তুমি নিজের ঘরে নির্জনে একা বসে থাকবে এবং একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করবে।

পিতার উপদেশ-মতো পুণ্ডরীক সারা দিন অনাহারে থাকল এবং রাত্রে নিজের ঘরে ভগবানের নাম স্মরণ করতে-করতে পিতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি; সমস্ত মগধপুরী নির্জন, নিস্তব্ধ। হঠাৎ পুণ্ডরীকের গৃহদ্বার উন্মুক্ত হল। ক্ষীণ দীপালোকে পুণ্ডরীক দেখতে পেল—কৌপীনধারী এক বিরাট পুরুষ তার গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সর্বঙ্গ তৈললিপ্ত, দুই কাঁধে দুই শাণিত কুঠার। এই বিভৎস মূর্তি যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, পুণ্ডরীকের তখন ভয় করতে লাগল। কিন্তু ক্ষীণ দীপালোকে সে পিতাকে চিনতে পারল এবং তাতে ভয়ের সঙ্গে অদ্ভুত একটা বিস্ময়ও

যুক্ত হল মনে। গম্ভীর মেঘমন্দ্রস্বরে শর্বীলক বললেন—বৎস! নির্ভয় হও, তোমার দীক্ষাকাল ঘনিয়ে এসেছে। তুমি কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করে কৌপীন ধারণ করো। সমস্ত গায়ে তৈল লেপন করে আমার দেওয়া এই কুঠার হাতে নিয়ে তুমি আমার অনুগমন করো —কোনও প্রশ্ন কোরো না। এই কথা বলে শর্বীলক পুত্রের হাতে একখানি শাণিত কুঠার দিলেন। অপর কুঠার তিনি নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে চললেন। পুণ্ডরীক মন্ত্রমুগ্ধের মতো, ভূতাবিষ্টজনের মতো পিতার নির্দেশ মেনে তাঁর পিছন পিছন চলল।

অনেক এবং নানা পথ অতিক্রম করে শর্বীলক তার পুত্রকে নিয়ে এক প্রশস্ত রাজপথে এসে পৌছোলেন। এই পথে মগধ থেকে বারাণসী যাওয়া যায়। শর্বীলক রাজপথের পাশে এক বিরাট বটবৃক্ষের তলায় পুণ্ডরীককে নিয়ে এসে বললেন— তুমি এই অন্ধকারে খুব সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। শর্বীলক নিজেও ছেলের পাশে উদ্যত কুঠার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুর অপেক্ষায়। ভয়ে বিস্ময়ে পুণ্ডরীকের বাক্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। অমাবস্যার অন্ধকার, পথচলার পরিশ্রম, সব মিলিয়ে পুণ্ডরীকের বুক কাঁপতে লাগল ধক ধক করে। অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত একযুগ বলে মনে হতে লাগলো। তার কপালে ঘাম জমছে, ভয়ে কাঁটা দিচ্ছে শরীরে।

এদিকে ধনবীর নামে এক বণিক গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে রাজগৃহ থেকে বারাণসী যাচ্ছিলেন। দ্রুত বারাণসীতে পৌছোবার রাজাদেশ থাকায় তাঁকে রাত্রেও পথ চলতে হচ্ছিল। সঙ্গে তাঁর চর্মপেটিকায় দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বাঁধা আছে। পথ বিপদসংকুল বলেই তাঁর সামনে এবং পিছনে চারজন করে সশস্ত্র প্রহরীও পথ চলছে। বণিকের শকট যে মুহূর্তে সেই বিরাট বটবৃক্ষের কাছে এসে পৌছল, অমনই বিকট হুংকার ছেড়ে শর্বীলক অতর্কিত ভাবে শকট আক্রমণ করলেন। শকটের ম্লান আলোকে শর্বীলককে এমনই ভয়ংকর দেখাচ্ছিল যে, শকটের চালক এবং সমস্ত রক্ষীরা যে যেদিকে পারল পালিযে গেল। ওদিকে শর্বীলক তার শাণিত কুঠারখানি ঘুরিয়ে এমনই নিপুণতায় ধনবীর শ্রেষ্ঠীকে আঘাত করলেন যে, একমুহূর্তেই তাঁর রুধিরাক্ত ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। স্বর্ণমুদ্রার সুবৃহৎ পেটিকাখানি অক্লেশে নিজের পৃষ্টদেশে স্থাপন করে শর্বীলক সেই বটবৃক্ষের অন্ধকার তলে ফিরে এলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পুণ্ডরীক।

এই ভয়ংকর নৃশংস ব্যাপার নিজের চোখে দেখার পর পুণ্ডরীক এতটাই স্তম্ভিত যে, তার হাত থেকে পিতৃদত্ত কুঠারখানি পড়ে গেছে; সে কাঁপছে বেতস-পাতার মতো। শর্বীলক মাটি থেকে কুঠার কুড়িয়ে নিলেন এবং পুত্রের হাত ধরে যন্ত্রচালিতের মতো তাকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিলেন। অমারাত্রির তখনও অবশিষ্ট আছে কিছু। ঘরে ফিরে এসে শর্বীলক পুত্রকে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে সে ঘরের শিকল আটকে দিলেন।

কিছুক্ষণ একা ঘরের মধ্যে থাকার পর পুণ্ডরীকের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তখন ঘৃণায়, রাগে ক্ষোভে তার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্যও সে আর এই পিতার গৃহে থাকবে না বলেই ঠিক করল। অবশিষ্ট রাত্রি উদ্বিগ্ন হয়ে কাটাবার পর ভোরের দিকে তার ঘুম এসে গেল। কিন্তু রজনীপ্রভাত হতে দেরি ছিল না এবং হঠাৎই ঘুম ভেঙে যেতেই সে দেখল—প্রভাতের সূর্য-কিরণ মুক্ত দ্বারপথ বেয়ে তার ঘরে এসে পড়েছে। এবং ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার পিতা, সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল বেশ, শালপ্রাংশু মহাভুজ। রাতের সমস্ত ঘটনাগুলি তার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কৌপীণ এবং তৈলাক্ত শরীরখানির দিকে নজর পড়ায় তার সব মনে পড়ে গেল। পুনরায় অস্থির হয়ে উঠতেই পিতা পুণ্ডরীককে বললেন—বৎস। উতলা হয়ো না। এমন কিছুই ঘটেনি যাতে তোমার এত কষ্ট হতে পারে মনে। পুণ্ডরীক বলল—গতরাত্রে আমি যা দেখেছি তাতে এই বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই আমার। আমি এই মুহূর্তেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, আপনি পথ ছাড়ুন। পিতা বললেন—অনাহারে, অনিদ্রায় আর দুশ্চিন্তায় তোমার মন এখন বিপর্যস্ত হয়ে আছে। তুমি স্নানাহার করে খানিক বিশ্রাম করো, পরে তোমার কাছে আমার বংশগত কৌলিক দীক্ষার সমস্ত বিবরণ জানাব। সব শুনে তার পরেও যদি তোমার গৃহত্যাগ করতে ইচ্ছে হয়, তো তাই করবে, আমি বাধা দেব না। কিন্তু এখন তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

পুণ্ডরীক বুঝল— পিতার অমতে তার পক্ষে ঘরের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। দরকার পড়লে তিনি যে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবেন না, সেটা বুঝেই অগত্যা সে স্নানাহার সেরে খানিক বিশ্রাম করল। বেলা দ্বি'প্রহরে শর্বীলক এলেন। বললেন— যা বলছি তা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করো। তোমার কিছু প্রশ্ন থাকলে পরে করবে, কথার মাঝখানে কথা বলবে না। শর্বীলক বলতে লাগলেন— আমাদের বংশ অতি প্রাচীন। মহাভারতীয় পাণ্ডবদের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত আমাদের বংশে একই কৌলিক প্রথা চলে আসছে। ছেলের ষোলো বছর বয়স হলেই পিতা তাকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করে নিয়ে কৌলিক প্রথায় দীক্ষা দেবেন। আমিও আমার ষোলো বছর বয়সে পিতার কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি এবং আশা করি তুমিও তোমার পুত্রের ষোলো বছর বয়সে এই সনাতন কুলপ্রথায় দীক্ষিত করে কৌলিক আচারের ধারা বজায় রাখবে। আমার যে অতুল ঐশ্বর্য-বৈভব তুমি দেখতে পাও, তার অধিকাংশই পরের ওপর জোর খটিয়ে আমার বাহুবলে পাওয়া। আমি দিনের বেলায় লোকধর্ম পালন করি, অনাথ-আতুর, দুঃস্থ-অভাবী লোকের প্রার্থনা পূরণ করি এবং রাত্রে আমার কৌলিক আচার অনুসারে ধন অর্জন করি। আমাদের এটা কুলাচার বলেই আমার কোনও পাপবোধ এবং এতে কোনও অধর্মও আমাকে স্পর্শ করে না।

আতঙ্কিত স্তব্ধ পুণ্ডরীককে শর্বীলক কোনও কথা বলার সুযোগ দিলেন না। শর্বীলক বললেন— আমি বুঝতে পারছি—তোমার মনের মধ্যে কী চিন্তার উদয় হচ্ছে। তুমি

তোমার পিতাকে ভণ্ড, পরস্বাপহারক, এবং নরহন্তা বলে মনে করছ। এমনও ভাবছ যে, এই রকম পিতার আশ্রয়ে বাস করাও ঠিক নয়, অন্ন গ্রহণ করাও ঠিক নয়। এর থেকে ভিক্ষা করে খাওয়াও ভাল, অথবা আরও ভাল মরে যাওয়া। আমি অবশ্য মনে করি— তোমার আতঙ্কিত ক্ষোভ, দুঃখ এবং নানারকম মোহ তোমাকে বিভ্রান্ত করছে। তোমার শরীর, মন ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। কিন্তু তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার বলেই তোমাকে বলছি— তুমি সমস্ত কথা স্থির ভাবে বিচার করো এবং তাতে বুঝবে যে, বাস্তবে তোমার মনোক্ষোভের কোনও কারণ নেই। তুমি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ এবং তার মর্মও বুঝেছ। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই যে, যুদ্ধকালে অর্জুনেরও এইরকম চিত্তবিকার উপস্থিত হয়েছিল। আমি নিজকর্মের জন্য তোমাকে কোনও রকম মনগড়া কারণ দেখিয়ে দোষস্খালনের চেষ্টা করব না। সর্বলোকমান্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশমাত্র তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব। তুমি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছ। অতএব সহজেই গীতার উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবে।

শর্বীলক এবারে শাস্ত্রসম্মতভাবে বোঝাতে আরম্ভ করলেন— তুমি মোহবশে অর্জুনের মতো কষ্ট পাচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে নিয়ে কুরুসৈন্যের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তখন অর্জুনের মনে মোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি কৃষ্ণকে বললেন—

দেখিয়া স্বজন কৃষ্ণ, সমবেত রণোন্মুখ।
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ।।
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত।
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত।।
নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন।
হে কেশব! দুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন।।

শর্বীলক আরও বললেন— দ্যাখো, তোমারই মতো অর্জুনের শরীরে ও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল। তুমিও অর্জুনের মতো এই অবস্থায় ভিক্ষান্নভোজন শ্রেয় বলে মনে করছ— মহানুভব গুরুস্থানীয়দের হত্যা করার চেয়ে এখানে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। এই গুরুস্থানীয়দের হত্যা করে এই জীবলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ এবং কামের ভোগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শর্বীলক গীতোক্ত অর্জুন-মোহ বর্ণনা করে অর্জুনের সঙ্গে পুত্রের সাদৃশ্য স্থাপন করলেন। তারপরেই বললেন—আমি দিনে লোকধর্ম এবং রাত্রে কুলধর্ম পালন করি। সাধারণ লোককে আমার কুলাচারের কথা বলি না বলে তুমি হয়তো আমাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড মনে করে বসে আছ। কিন্তু দ্যাখো, সাধারণ মানুষের চিত্ত দুর্বল, তারা আমার কুলাচারের মহিমা বুঝবে কেমন করে। আমার কুলধর্মের কথা জানতে পারলে তারা আমাকে উৎপীড়িত করবে এবং সেই উৎপীড়ন আমার পক্ষে অসহ্য হবে। এই দুর্বলতার জন্যই আমাকে সত্য গোপন করতে হয়। তুমি এটা ভেবো না যে, সত্য গোপন করাকে আমি মিথ্যাচার বলে মনে করি না। মনে করি, অবশ্যই সত্য গোপন করাকে আমি মিথ্যাচার মনে করি এবং আমি

স্বীকারও করছি যে, আমি মিথ্যার আশ্রয়ে আছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো— মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া কারও সংসারযাত্রা নির্বাহ হতে পারে না, সকলেই অল্পবিস্তর দুর্বল এবং দুর্বলতা থেকে যে অনিষ্টতা তৈরি হয়, তা থেকে বাঁচতে গেলে সকলকেই কিছু-না কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও এই রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জরাসন্ধ-বধের সময় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণও নিজের উদ্দেশ্য গোপন রেখেছিলেন। আর এটাও তুমি জান যে, মহাভারতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা বলার ব্যবস্থা আছে।

এই কথার উত্তরে এই রকম সামাজিক প্রবাদ কাজ করে। প্রবাদ আছে— সত্য বলো। প্রিয়ভাষী হও, কিন্তু সত্য হলেও অপ্রিয় কথা বোলো না— মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—এই প্রবাদের উত্তরে শর্বীলক বললেন— তাহলে অপ্রিয় হবে বলে সত্য গোপন রাখছি, এটাও এক ধরনের মিথ্যাই বটে, অন্তত অপ্রিয় সত্য গোপনে রাখাটা আসলে মিথ্যারই প্রকারভেদ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না, এমনকী লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। গীতায় বলা হযেছে—যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনে মনে ভোগ্য বিষয়গুলি চিন্তা করতে থাকে— কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্— সেই মোহগ্রস্ত ব্যক্তিটি আসলে মিথ্যাচারী। শর্বীলক পুত্রকে বললেন—গীতায় এইরকম বলা হল বটে, কিন্তু আমরা সকলেই মনে একরকম ভাবি, আর সমাজের ভয়ে কাজে আর এক রকম করি। সুতরাং আমরা সকলেই ভণ্ড এবং মিথ্যাচারী । স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মিথ্যাচরণ বিধান করেছেন। অতএব আমাকে যদি মিথ্যাচারী ভণ্ড বলে ঘৃণা করতে হয়, তবে দুনিয়ার তাবৎ লোককেই ঘৃণা করতে হবে। জেনে রেখো সত্য যেমন ভগবানের বিধান, মিথ্যাও তাঁরই বিধান। আর আমাকে যদি পরের ধন অপহরণকারী বলে মনে হয়, তবে শাকান্নভোজী থেকে আমিষাশী সকলেই প্রাণিহন্তা এবং পরস্বপহারক। ভূমি-অর্থ-পশুর কোনও পরিমাণ নির্ধারণ করে ভগবান আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠাননি, সবটাই বাহুবলে অর্জন করতে হয়।

শর্বীলক এবার পাণ্ডবদের উদাহরণ দিয়ে বললেন যে, পাণ্ডবরাও কৌরবদের সম্পত্তি লাভ করে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার লাভ করেছিলেন, আবার কৌরবরাও সে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দুই পক্ষই কোনও-না কোনও ভাবে পরস্বাপহারক। রাজার অধিকার বাহুবলের অধিকার, রাজার তাতে পাপস্পর্শও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজ্য উদ্ধার করার জন্য ক্ষাত্র-শক্তি বা বাহুবলেরই আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। রাজা বহু লোকের ধন অপহরণ করেন, সেই তুলনায় আমি অল্প কয়েক- জনের ধন বাহুবলে অর্জন করেছি।

শর্বীলক এবার নরহত্যার প্রসঙ্গে এসে পুরো গীতাশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় আউড়ে গেলেন। অর্থাৎ সেই আত্মা অবিনশ্বর, সে মরেও না, কেউ তাকে মারতেও পারে না। জন্মালে মরতে হবে এটাই ধ্রুব নীতি, আমি ধনবীর শ্রেষ্ঠীর শরীরটাই শুধু ধ্বংস করেছি

নিমিত্তের মতো। তিনি সকলকেই মেরে রেখেছেন। অতএব নরহত্যা করে আমি কোনও পাপ কাজ করিনি। আমি কুলধর্ম পালন করেছি মাত্র। ভগবান কৃষ্ণও অর্জুনকে তাঁর কুলোচিত ক্ষাত্রধর্ম পালন করে শত্রুহত্যায় নিযুক্ত করেছিলেন— স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। শর্বীলক এবার পুত্রকে বোঝালেন— তোমার যদি মনে হয় যে, গীতার এই সব উপদেশ পূর্ণজ্ঞানীর জন্য, তবে জেনো তোমার ভুল হচ্ছে। অর্জুনের দিব্যদৃষ্টিলাভের অনেক আগেই কৃষ্ণ বলেছিলেন—তুমি ওঠো, অর্জুন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ—অতএব পুণ্ডরীক তুমি গীতার বাণী স্মরণ করে কুলধর্ম পালনে সঙ্কল্প গ্রহণ করো। অর্জুন যে হৃদয়-দৌবল্যে ভুগছিলেন, সেই দুর্বলতা কাটিয়ে আমার চিরন্তন কুলধর্মে দীক্ষিত হও।

গিরীন্দ্রশেখর গল্পশেষে লিখেছেন— পুণ্ডরীক পিতার কথা শুনে শেষ পর্যন্ত এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে, তার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সূর্যালোকে অন্ধকারের মতো দূরীভূত হল এবং অর্জুনের মতোই সে পিতাকে বলল—আমার সমস্ত মোহ কেটে গেছে, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার কুলধর্মের স্মৃতি ফিরে এসেছে, দূর হয়ে গেছে সমস্ত সন্দেহ, আমি এখন তোমার কথা অনুসারেই কাজ করব—নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা... করিষ্যে বচনং তব। শর্বীলক-পুণ্ডরীকের এই মাগধ উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করে গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রশ্ন তুলেছেন— শর্বীলক উপাখ্যানে গীতার যে উপদেশ আছে, প্রকৃতপক্ষে গীতা কী সেই উপদেশই দেয়? পুণ্ডরীককে নরহত্যায় উৎসাহিত করা, আর অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা কী একই ব্যাপার? শর্বীলক যদি গীতাশাস্ত্রের যথার্থ উপদেশ দিয়ে থাকেন, তবে সাধারণ নরহত্যাকারী, চোর, ঠগ, লম্পট সকলেই তো তাহলে গীতার দোহাই দেবে। আর শর্বীলক যদি ভুল উপদেশ দিয়ে থাকে , তবে সেখানে ভুল কোথায়? শর্বীলক-কথিত গীতার শ্লোকগুলির যথার্থ মর্মার্থই বা কী? এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান ছাড়া গীতার কোনও ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হতে পারে না। শর্বীলকের উপাখ্যান মনে রেখে গীতার ব্যাখ্যা করতে হবে, আমি এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেবার চেষ্টা করব।

দুই

শর্বীলকের সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখর যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষত ভগবদ্‌গীতার শ্লোকগুলিকে শর্বীলক যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা ঠিক কিনা, সেই বিষয়ে গিরীন্দ্রশেখর যে সমাধানগুলি দিতে চেয়েছেন, তা প্রধানত মনোবিজ্ঞানের পরিসর হিসাবেই দেখেছেন পণ্ডিতেরা। আশিস নন্দী নিজেও গিরীন্দ্রশেখরের প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেগুলি খুব প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা শুধু এইটে জানাব যে, প্রাক্ স্বাধীনতার কালে চলমান ঔপনিবেশিকতার মধ্যেও ভগবদ্‌গীতার মতো একটি মান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা করার জন্য গিরীন্দ্র শেখর যেভাবে শর্বীলকের মতো একজন স্বার্থসন্ধানীকে ব্যবহার করেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য।

অথবা শর্বীলকের স্বার্থ সন্ধানের প্রয়োজনে ভগবদগীতার শ্লোকগুলিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা আমাদের সার্বিক মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রটা আরও সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত এক বৃহত্তর পরিসর হওয়া উচিত বলে গিরীন্দ্রশেখর গীতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, সেটা আধুনিক কালের গবেষণা-ক্ষেত্রে একাট দিগদর্শন বটে এবং ১৯৩১ সালে সেটা বৈপ্লবিক।

আমরা এখানে গিরীন্দ্রশেখরের লেখাটি উদ্ধৃত করেছি এই প্রবন্ধের আংশিক ফললাভের জন্য। মহামতি লারসন গিরীন্দ্রশেখরের কাহিনি উল্লেখ করেছেন মহাভারতকে সেই ভাবে দেখার জন্য—a tale that holds clue, in my view, about how to interpret the epic কিন্তু আমরা এটা মনে করি না যে, মহাভারত কিংবা ভগবদ্‌গীতার উদ্দেশ্য ছলনা বা 'হিপোক্রিসি'র মাধ্যমে কীভাবে স্বার্থসিদ্ধি করা যায়, সেটা প্রতিপাদন করা। আমরা শুধু বলব— মহাভারত সব সময়ই একটা সজীব সমাজের কথা বলে। বিচিত্র সময়ে, যে সব বিচিত্র সমস্যার মধ্যে দিয়ে মানুষ যেভাবে জীবনের সম্মুখীন হয়, সেখানে সত্যের পাশাপাশি মিথ্যাচার, দ্বৈতাচার, ভণ্ডামিরও যে সাময়িক প্রয়োজন হয়— মহাভারত সেই প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলে সেটাই যে ঠিক এবং সেটাই অনুসরণীয়, সেটা মহাভারত কখনও বলতে পারে না, গীতার পক্ষে সেটা বলা তো অসম্ভব।

মহাভারত লেখার উদ্দেশ্য অবশ্যই ধর্ম এবং মহাভারতকে 'ইনটারপ্রেট' করতে গেলেও ধর্মকেই প্রয়োজন হবে পদে-পদে, কিন্তু মহাভারত একই সঙ্গে এতটাই 'লাইফ-অ্যাফার্মিং' যে জীবনের গতি সে রোধ করে না। জীবনে চলার পথে চরম ধর্মসংস্থানে পৌঁছনোর জন্যও তথাকথিত অন্যায়, ছলনা, অথবা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হতে পারে, বিশেষত মায়াবী ছলনাকারীর সঙ্গে প্রতিব্যবহারে যে কখনও কখনও ছলনা বা অন্যায়েরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেটা মহাভারতের প্রমুখ চরিত্রগুলি— অর্জুন, কৃষ্ণ, এমনকী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা গেলেও ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের প্রবৃত্তিকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেনি মহাভারত। স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ কৃষ্ণকে স্ববংশের ধ্বংস দেখতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শনও দেখতে হয়েছে, কিন্তু এহ বাহ্য, ভয়ঙ্কর সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলেও ছলনা প্রয়োজন, মহাভারত সেই জীবন-সত্যকেও পরিস্থিতি-সাপেক্ষ নৈতিকতা বলে মেনে নেয়,। 'হিপোক্রিসি'টা তাই মহাভারতের ইনটারপ্রেটিশন হিসেবে ব্যবহৃত হবার কথা নয়, বরং সেটা 'সিচুয়েশনাল এথিকস' হিসেবে তর্কসিদ্ধ হয়ে ওঠার কথা।

বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন জীবনবোধের ক্ষেত্রে ভীষণ রকমের গোঁড়ামি এড়িয়ে চলে। 'বিব্রিকাল মরালিটি' বা অন্য ধরনের চরম নৈতিকতা, যা জীবনের ধারণের সমস্ত রসই শুষে নেয়, এমন ভাবে ফতোয়া দিয়ে আমাদের ধর্মই তৈরি হয়নি। আমাদের প্রাচীন কোনও সত্যবাদী মুনি-ঋষি এমন কথা বলেননি যে, ব্যাস এবং

পৌরাণিকদের বেত মারা উচিত, যেমনটি হোরাক্লিটাস বলেছিলেন—Homer should be whipped and Archilocus likewise. আমাদের সকলের মধ্যে যে অল্পবিস্তর দ্বিচারিতা আছে, সেটা যদি জীবনধারণের সত্যের বিষয় না হত, বিশেষত সেটা যদি গভীরতর অন্যায়ের প্রতিপক্ষে ক্ষুদ্রতর দ্বৈতাচার না হত, তা বলে আমরা দেবীভাগবত পুরাণের শ্রোতা-মহান জনমেজয়কে এরকম প্রশ্ন করতে শুনতাম না— এটা কেমন কথা হল, মুনিবর! মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি কিনা এমন নিপাট মিথ্যে কথা বলছেন। ধর্মশাস্ত্রে প্রবীণ মুনি হয়েও বৃহস্পতি যদি এত মিথ্যাচার করেন তাহলে গৃহস্থ আশ্রমের লোকেরা কেন সত্য কথা বলবে, আর কোন সত্য আচরণ করবে— কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী?

এখানে গৃহাশ্রমী কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'গৃহাশ্রমী' মানে সাধারণ গেরস্ত মানুষ, যাঁদের আচরণীয় কর্তব্যে সব সময়েই একটা আদর্শ দরকার হয়, এবং আদর্শজনেরা সব সময়েই তাঁদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দেন। দেবীভাগবত পুরাণের ব্যাস শ্রোতা জনমেজয়ের এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, দ্যাখো বাছা! অন্যকে উপদেশ দেবার ব্যাপারে সকলেই খুব সাধু সাজতে পারে— কিন্তু তেমন তেমন পরিস্থিতি এলে এবং স্বার্থ বিঘ্নিত হলে এই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা উলটো হয়ে যাবে একেবারে— বিপ্লুতি-র্হ্যবিশেষেণ স্বকার্যে সমুপস্থিতে। তার ছলনা, মিথ্যাচার সাধারণ মানুষের কোনও একক বৈশিষ্ট্য নয়, বৃহত্তর প্রয়োজন এবং স্বকার্য-সাধনের ক্ষেত্রে সত্যের উপদেষ্টা মুনি-ঋষিরাও অনেক সময় দ্বিচারিতা করেন, মিথ্যাচার করেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম যে, অসুরদের পীড়ন-নিপীড়ন রোধ করতে না পেরে দেবতাদের গুরু এক সময় ছলনার আশ্রয় নিলেন। অসুরদের গুরু শুক্রচার্য তখন আশ্রমে নেই, সেই অবস্থায় দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের রূপ ধরে অসুরদের কাছে এলেন এবং প্রবঞ্চনা করে বললেন—দ্যাখ্ আমি তোদের গুরু। যা বলব তাই শুনবি। অসুরেরা দেবগুরুকে শুক্রাচার্য বলে বিশ্বাস করলে তিনি তাঁদের অহিংসা শেখাতে আরম্ভ করলেন। বললেন— দেবতারা যদি তোদের মারেও তবু সেই আততায়ী দেবতাদের তোরা হিংসে করবি না। কেননা অহিংসাই পরম ধর্ম— অহিংসা পরমো ধর্মো'হন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ। এই ঘটনাতেই শ্রোতা জনমেজয়ের রাগ হয়েছে। তিনি বলেছেন—এটা আপনি কী শোনালেন। মুনিবর! আপনারাই না বলেন যে, শাস্ত্রের বচনে সংশয় উপস্থিত হলে, মনুষ্য-ব্যবহারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব হলে ঋষিদের বাক্যই তো প্রমাণ। তা বৃহস্পতির ছলনায় তো আর্ষ-প্রমাণের বারোটা বেজে গেল! জনমেজয় গলা চড়িয়ে আরও বললেন—আর শুধু মুনি ঋষি বলছি কেন, দেবতারাও কিছু কম যান না, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ কেউই তো ছলনায় মিথ্যাচারে কম যান না। তাহলে মানুষেরা কী করবে— সর্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা?

অবার সেই কথাটা —তাহলে মানুষের ব্যাপারে কী বলব— মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা? এই একটা কথাতেই দানব-মানব দেবতা সব যেন মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে একাকার হয়ে

পড়েন। জনমেজয় বলেছেন—এত বড় বড় সব নাম বশিষ্ঠ-বামদেব-বিশ্বামিত্র, এত বড় বড় সব দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা এঁরা প্রত্যেকেই তো পাপাচার করেন, পরের বৌ দেখলে হামলে পড়েন, অথচ লোকে এদের আর্যপুরুষ ভদ্রলোক বলে, এটা কেমন হয় মুনিবর—আর্যত্বং ভুবনেষ্বেষু স্থিতং কুত্র মুনে বদ। মহামতি ব্যাস কিন্তু তাঁর শ্রোতাকে রেগেমেগে স্তব্ধ করে দেননি, কিংবা এমন সাফাই তিনি দেননি যে, তাঁরা বড় মানুষ, তেজস্বী মানুষ, এই সব আচরণে তাঁদের কোনো দোষ হয় না। বরঞ্চ খুব স্পষ্ট ভাবে এই সত্যটা মেনে নিয়েছেন। যে, উপদেশ দেবার বেলায় একরকম, আর কাজের ক্ষেত্রে আর এক রকম, আপনি আচরি ধর্ম ব্যাপারটা খুব কঠিন। তার মানে উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, কুলীন-অকুলীন, দ্বৈতাচার সর্বত্র আছে। প্রসঙ্গটা এমনই সর্বতোগামী যে, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ পর্যন্ত জগজ্জননী মহামায়ার কাছে দুঃখ করে বলেছেন —তুমিই এর বিচার কর মা! কোথায ধর্ম, কীসের ধর্ম, ঔচিত্য কথাটারই বা কী মানে? কার কাছে গিয়েই বা এই অন্যায় অবিচারের কথা জানাব। আপনারা তো কেউ এক কথা বলেন না। একেক শাস্ত্র একেক রকম? আর কেনই বা বলবে? স্বার্থের বেলায় সবাই একরকম— যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।

আমরা এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কোনও ধর্মযুক্তির প্রামাণ্যে যেতে চাই না, তর্কযুক্তির প্রজ্ঞাতে মহাভারত-পুরাণের অন্যতর বিবরণ দিয়ে এটাও এই মুহূর্তে প্রমাণ করতে চাই না যে, এসব স্বত্ত্বেও ধর্ম এর সত্যের জায়গাতেই মহাভারত-পুরাণের প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা, যা মহামতি লারসনের বিরুদ্ধ কক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যত্র ভাবনা করা যাবে। আপাতত আমাদের ধর্মবাদ, ক্যানসিয়ান এথিকস, নৈতিকতা সব পিছনে ফেলে এইটুকুই বলতে চাই— প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু-না কিছু দ্বিচারিতা আছে, যা সমস্ত পাপবোধ সত্ত্বেও আমরা জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিচিত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করি, যদিও একান্তই বিবেচ্য যে, সেই প্রয়োজনটা কী, এবং কী ধরনের, কেন না তদনুসারেই ওই দ্বিচারিতা, ছলনা এবং মিথ্যাচারেরও নৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে যেতে পারে।

মহাভারতের রাজনীতি

শরশয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের অনন্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মহাভারতের শান্তিপর্বে। সন্ন্যাসীর ধর্ম, স্ত্রীলোকের ধর্ম, গৃহস্থের ধর্ম, রাজনীতিকের ধর্ম—এইরকম শতেক প্রশ্নের উত্তর জানার পরে যুধিষ্ঠির, খোদ ধর্ম সম্বন্ধেই একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে বললেন—কোনটা ধর্ম? ধর্ম ব্যাপারটা এল কোত্থেকে? ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর জটিল না করে যুধিষ্ঠিরকে সত্য, ঋত, দান এবং নির্মল স্বভাবের কথা বলে চিরন্তন ধর্মের উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির মোটেই খুশি হলেন না। বললেন—হ্যাঁ, মানুষের জীবনচর্যার ক্ষেত্রে সত্য, ঋত ইত্যাদির প্রাণশক্তির কথা আমি যথেষ্টই বুঝি, কিন্তু ধর্ম বোধহয় এমন একটা কিছু, যা শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা হাজার উপদেশ, হাজার নিয়ম আর বাণী থেকে বোঝা যায় না। এই ধরুন না, যে লোকটা ঠিকঠাক আছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা 'ব্যালান্স' খাটিয়ে চলছে, তার যা ধর্ম সেই ধর্মের সঙ্গে একেবারে মিল হবে না সেই লোকটার যে বিষম অবস্থায় নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলছে—অন্যো ধর্মঃ সমস্থস্য বিযমস্থস্য চাপরঃ—আবার যে লোক ভীষণ রকমের বিপদের মধ্যে রয়েছে, এমনই বিপন্নতা যেখানে ভিটে মাটি সব গেছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে না, তার বিপদে শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম আর বই পড়া কথা কতটা কাজে লাগবে—আপদস্তু কথং শক্যা পরিপাঠেন বেদিতুম্।

আমরা ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারতীয় রাজনীতির কথা আরম্ভ করতে চাই। মহাভারতের মধ্যে বহু জায়গাতেই রাজনীতির উপদেশ আছে, যেটাকে আমরা শাস্ত্রীয় রাজনীতি বা অর্থশাস্ত্র বলতে রাজি আছি, কিন্তু মহাভারতে জীবনটা যেভাবে চলছে, সেখানে শতসহস্র সামাজিক তথা পারিবারিক টানাপোড়েন চলে, কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকারে আছেন বলেই সেই সব পরিবার এবং তাঁদের সামাজিক পরিবেশটাও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, অথচ সেই রাজনীতির চরিত্র মহাভারতের শাস্ত্রীয় রাজনীতি থেকে একেবারেই আলাদা। তার মানে জীবনচর্চা এবং আদর্শ—এক দুই দিক থেকেই মহাভারত রাজনীতিকে ধরার চেষ্টা করে এবং পদে পদে বুঝিয়ে দেয় যে, রাজনীতির শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং বাস্তব রাজনীতি—এ-দুটো একেবারে আলাদা, অথচ তার মধ্যেই বাস্তব রাজ্যাধিকার এবং বাস্তব রাজনীতি যখন বৃহত্তর রাজনীতি-শাস্ত্রের আদর্শ পথে চলবার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করেও পারে না—মহাভারত এইসমস্ত কল্পগুলিকে ধরবার চেষ্টা

করে, যদিও সেটা লিখে বোঝানো ভীষণই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেননা পণ্ডিতজনে বলেছেন—political science cannot make a Politician out of a scientist any more than physiology can make an athlete out of a physiotherapist.

এই কথাগুলি সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও অবিসংবাদিত ভাবে বলা যায় যে, রাজনীতির বাস্তব দিয়ে রাজ্যশাসনের নীতি তৈরি হয় না, বরঞ্চ নীতিগুলি তৈরি হবার পরেও রাজনীতির বাস্তব সেখানে অন্য নীতি তৈরি করে এবং মহাভারতেও তাই; কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল—মহাভারত আঠারো অধ্যায় জুড়ে অতিমহান তথা পরম্পরাগত এক রাজকাহিনি বলে গেছে। সেই কাহিনির বাস্তব এটাই যে, স্বার্থান্বেষিতা, রাজ্যলোভ এবং শাসনযন্ত্রকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করার প্রবণতা আদর্শ প্রজাহিতৈষী নেতাকে প্রায় কখনওই রাষ্ট্রের অধিকারে আসতে দিতে চায় না। কিন্তু আদর্শ নেতাকে যদি শেষ পর্যন্ত স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হয়, তবে শিষ্টজনসম্মত আদর্শ মার্গ এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্যেও কিছু প্রতিশোধমূলক শঠতার প্রয়োজন হয়; কেননা চরম শঠতার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ধর্ম-নীতি-নিয়মের আদর্শ কাজ করতে চায় না, বরঞ্চ তার ক্ষণিক বিচ্যুতিও তখন রাজধর্ম হয়ে ওঠে বৃহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য। মহাভারতের বিশেষত্ব এই যে, রাজনীতির বাস্তবের মধ্যে যেখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রীয় ভাবনাগুলিই সবচেয়ে বড় প্রযোজ্য প্রমাণ হয়ে ওঠে, মহাভারত সেখানেও ধর্মকে অর্থভাবনার সঙ্গে যথাসম্ভব জুড়ে দেয়। যদি বা রাজপ্রয়োজনের সিদ্ধিতে যেন-তেন-প্রকারেণ রাজার সমৃদ্ধি-কল্পনা প্রধান হয়েও দাঁড়ায়, সেখানেও অন্তত আদর্শগত ধর্মের বা নীতির প্রশ্নটা মহাভারতে ওঠে এবং সেটাই সমর্থিত হয় সার্বিক চেষ্টায়।

নিজের গ্রন্থবৈশিষ্ট্য ঘোষণা করার সময় মহাভারত যখন বলেছিল—এটি ধর্মশাস্ত্রও বটে আবার এটি অর্থশাস্ত্রও বটে, আবার এটি কামশাস্ত্রও বটে এবং অবশেষে মোক্ষশাস্ত্রও বটে, তখনই এটা বোঝা গিয়েছিল যে, মহাভারত কৌটিল্যের মতো শুধু রাজপ্রয়োজনে অর্থশাস্ত্র লিখছে না, এখানে সমাজ এবং সংসারের সবকিছুই বড় অপেক্ষিত। এখানে অবশেষে যিনি রাজা হিসাবে আসছেন, সেই যুধিষ্ঠিরকে অনেক ত্যাগ বৈরাগ্য, ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে রাজা হতে হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, রাজা হয়ে বসার ব্যাপারে তিনি নিতান্ত উদাসীন, তাঁর কোনও তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আকুতিও কাজ করে না রাজা হবার জন্য। বলা বাহুল্য, কৌটিল্যের বিজিগীষু শব্দের ধ্রুবকটির উচ্চারণ মাত্রেই বোঝা যায়—'জয় করিবার ইচ্ছা' ছাড়া আর অন্য সমস্ত রাজনীতির তত্ত্বগুলিই শুধু 'বিজিগীষা'র তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে, ধর্মের প্রায়োগিক ভাবনাকে পরম্পরাগত মর্যাদায় কৌটিল্য বহুমানন করেন বটে, কিন্তু ধর্মের চেয়েও অর্থের প্রাধান্য কৌটিল্যের কাছে অনেক বেশি, তাঁর নিজের জবানেই—অর্থ এবং প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ। অর্থ থাকলে ধর্ম কাম সব সিদ্ধ হবে।

মহাভারত কৌটিল্যের এই অর্থভাবনার কথা মানবে নিশ্চয়, কিন্তু তার প্রধান

প্রতিফলন ঘটাবে প্রতিনায়ক সংস্থায়, দুর্যোধনের মধ্যে। কিন্তু আঠারো পর্বের রাজনীতিতে রাজনীতির প্রকট বাস্তব এবং অর্থের প্রাধান্য প্রমাণ করতে করতে মহাভারত অবশেষে সিংহাসনে বসাবে সেই স্বপ্নশীল লোকটাকে, যিনি রাজা হওয়াটাই সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্তি নিয়েও অবশেষে তিনি নিজে যতখানি সিংহাসনে বসেন, তার চেয়ে বেশি সিংহাসনে বসিয়ে দেন ধর্মকে। এই কথাটা প্রথম খুব সযৌক্তিকভাবে দেখিয়েছিলেন মাদাম বিয়ার্দো নামে এক ফরাসি পণ্ডিতানী। সত্যি বলতে কী, মহাভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মই শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়। রাজ্যলাভের জন্য, রাজ্যে স্থিত হবার জন্য বহুতর অর্থশাস্ত্রীয় ভাবনা কৌটিল্য-কামনন্দকের মতো করেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের ঈপ্সিত রাজনীতি যা সব সময় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে, তা সব সময় আগ্রাসী রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে পরিশীলিত করে রাজধর্মের বিশিষ্টতায় এবং সেই রাজনীতির প্রতিষ্ঠায় যদি বা কূট-কৌশলের প্রশ্রয় কোথাও কোথাও থাকেও তবু তা বহুমানিত হয় না, প্রশংসিতও হয় না, রাজনীতির অতিপ্রয়োজনে প্রযুক্ত হলেও মহাভারতে সেই কূট নিন্দিত হয়।

লক্ষ করে দেখুন, যুধিষ্ঠির যখন রাজনীতির চরম পর্যায়েও নিজেদের জন্য পাঁচটি গ্রাম-মাত্র চাইছেন, সেই অবস্থাতেও রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর ঘৃণার অন্ত নেই, কেননা রাজনীতির শেষ জায়গাটা তিনি জানেন। জানেন যে, সবার শেষে আছে খুনোখুনি হানাহানি। আমাদের এই তিন পুরুষের গণতন্ত্রেই দেখুন, একটা ভোট পর্ব আসবে, আর স্বজাতীয়-বিজাতীয় দলের শত শত কর্মী খুন হবেন। আর খুন যেখানে নাও হচ্ছে, সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এবং জনগণের প্রতি যে কটূক্তি বর্ষিত হয়, এবং তাঁরাও যে-সব কথা বলেন প্রতিষ্ঠিতদের উদ্দেশে, তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে একমাত্র কুকুরের। যুধিষ্ঠির এখানে রাজপুরুষদের কোনও নাম করেননি, শুধু ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করায় এবং ক্ষত্রিয়রাই যেহেতু রাজ্যের প্রশাসন এবং রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন, তাতে আরও প্রমাণ হয়ে যায় যে, রাজনীতিকরাই এই মহাভারতীয় রাজনীতির একটা 'টারগেট এরিয়া'। যুধিষ্ঠির তখনও শান্তি চাইছেন এবং তাঁদের হৃতরাজ্যও নয়, মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, এই অবস্থায় কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাচ্ছেন শান্তির বার্তা বহন করে এবং যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে রাজনীতির তথা রাজনীতিকের আসল স্বরূপটা প্রকট করে তুলেছেন।

যুধিষ্ঠির বলেছেন—আমাদের বৃত্তিটাই খারাপ, বৃত্তির কারণেই আমাদের মানুষ মারতে হয়, আর মানুষ মেরেই আমরা বেঁচে থাকি, ক্ষত্রিয়রা এইভাবেই বাঁচে—বয়ং বধেন জীবামঃ—এক ক্ষত্রিয় আর এক ক্ষত্রিয়কে মারছে, এবং একজনকে নিকেশ করে আর একজন বেঁচে আছে, বড় মাছ ছোট মাছ মেরে বেঁচে আছে, কুকুর কুকুরকে মারছে স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য। অথচ এটাই নাকি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—শ্বা শ্বানং হন্তি দাশার্হ পশ্য

ধর্মো যথাগতঃ। যুধিষ্ঠির জানেন—ধন-জন, অর্থ-সমৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজ্যকামী ক্ষত্রিয় রাজপুরুষেরা যেভাবে সেই সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাতে যুধিষ্ঠিরের প্রচুর আপত্তি আছে। মহাভারতীয় রাজনীতির মজা এই যে, সেটা তার সমকালীন সমাজ এবং সেই বিরাট সমাজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি যদি ধর্মের সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্ত না হয়, তাহলে তার ফল রাজনীতিককেও ভুগতে হয়, এমনকী 'যিনি সমস্ত ধমসেতুর কর্তা, বক্তা এবং অভিরক্ষিতা' বলে চিহ্নিত, সেই কৃষ্ণকেও অধর্মের দায় নিয়ে স্ববংশধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা দাঁড়িয়ে দেখতে হয় সেই ধ্বংস।

খুব বাস্তব জায়গা থেকে যদি মহাভারতকে দেখি, তাহলে দেখব—রাজনীতিতে যা যা হয়, রাজনীতির নৈতিক এবং শাস্ত্রীয় দিক তো বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে তুঙ্গে ওঠার জন্য রাজনীতির যে বিভিন্ন অনাচার, অবিচার, হিংসা, কৌশল এবং কূটনীতি—এগুলোও কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবেই উপদিষ্ট হচ্ছে মহাভারতে এবং সেগুলিকে কাহিনির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাও করা হচ্ছে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে হ্যাঁ, এইরকমটাও ঘটবে এবং সেটাও রাজনীতি। কিন্তু মহাভারতে সব কিছুর শেষে যেহেতু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসছেন, তখনই মহাভারতের শেষ পক্ষপাতটুকু পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা সারা মহাভারত জুড়ে যুধিষ্ঠির রাজনীতির নীতি-নিয়ম-ধর্মের কথা বলবেন, এবং অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-তিরস্কার উপেক্ষা করে নিজের জীবনের মূল্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটাবেন রাজনীতির মধ্যে।

যদি কাহিনি এবং ইতিহাসগত দিক থেকে বিচার করি, তাহলে কুরুপাণ্ডবের জ্ঞাতিবিদ্বেষী রাজনীতি আরম্ভ হবার আগে বেশ কিছু কাহিনি আছে, যেটা কৌরব পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষের কাহিনি। সেই সব কাহিনি বলার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই—তাঁরা যেভাবে রাজ্য পালন করেছেন তা যদি কোনওভাবে অন্যরকমও হয়ে থাকে, তবে তার পরিণতি ঘটছে নীতি-নিয়ম এবং ধর্মে। ধরা যাক, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনি। এখানে দুষ্যন্ত সহপুত্র সমাগতা শকুন্তলাকে অস্বীকার করছেন, তাঁকে কোনও দিন দেখেননি, বিবাহ করার তো প্রশ্নই ওঠে না-ইত্যাদি তিরস্কারে রাজসভা মথিত হচ্ছে। এখানে তপোবনবাসিনী শকুন্তলাও রাজাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না, উন্মুক্ত সভাস্থলে তিনিও যথেষ্ট তিরস্কার করছেন দুষ্যন্তকে। শেষকালে সভাস্থলে দৈববাণী হচ্ছে এবং সভাস্থলেই রাজার চেপে যাওয়া মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিচ্ছে দৈববাণী। রাজা সব মেনে নিলেন, পুত্রের পিতৃত্ব স্বীকার করলেন এবং সেই পুত্রই রাজা হল, যাঁর নাম ভরত। প্রসিদ্ধ ভরত বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ধর্মই যে প্রধান মানদণ্ড হিসাবে কাজ করছে, এটা দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনির 'আলটেরিয়র মোটিফ' হিসেবে কাজ করে।

আবার দেখুন, ভরত রাজা হলেন, তাঁর তিন রানির গর্ভে তিনটি তিনটি করে নটি পুত্র জন্মাল, অথচ তারা কেউ মহারাজ ভরতের রাজগুণ লাভ করল না। প্রজাকল্যাণ এবং

অন্যান্য মহদ্‌গুণ, যেগুলি থাকলে রাজা হওয়া যায়, তার ছিটেফোঁটা ভরত দেখতে পেলেন না ছেলেদের মধ্যে। নিজের তিন রানির কাছে নিজের এই দুঃখ হয়তো বা প্রকাশও করে থাকবেন ভরত, কিন্তু তার ফল হল এই যে, ভরতের তিন রানিই রাগে, দুঃখে অভিমানে নয় ছেলেকেই মেরে ফেললেন একে একে—ততস্তান্ মাতরঃ ক্রুদ্ধা পুত্রান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্। এই ঘটনাটার মানবিক বিচার করে লাভ নেই, এবং এই ঘটনার উদ্দেশ্য ক্ষত্রিয়ের প্রজাকল্যাণ ভাবনার প্রকাশ করা। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনির পরেই মহাভারতে যযাতির উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। সেখানে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে বিবাহের পরেও দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠার প্রণয়পাশে ধরা পড়লেন যযাতি। এই আখ্যানে তৎকালীন দিনের উদগ্র ব্রাহ্মণ্যও গৌণ হয়ে গেল দানবিনী শর্মিষ্ঠার আত্মনিবেদন এবং অনুরাগে। পরবর্তী কালে কালিদাসের নাটকে পর্যন্ত প্রিয়ানুরাগিতার উদাহরণ হিসেবে দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার সমাদর কণ্বমুনির আশীর্বাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে—যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।

কিন্তু এই কাহিনির মধ্যে অন্যে যে যা-ই দেখুক, এখানে দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার অনুরাগ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর মাধ্যমে যযাতির যে শাপমোচন ঘটল, এই পিতৃসুখের ভাবনা এবং দানবনন্দিনীর ঔরসজাত কনিষ্ঠ পুত্রেরই রাজ্যলাভ—এই দুই-ই যেন তথাকথিত ঐতিহ্যের বিপরীত এক সত্য প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ কিনা যা এতকাল হয়ে এসেছে, তাই মহাভারতে হবে না। এখানে নীতি-নিয়ম-ধর্মকে অন্যতর এক চলমানতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। উত্তরাধিকারের নিয়ম ভেঙে, ঐতিহ্যের পরম্পরা নষ্ট করে যযাতি যখন কনিষ্ঠ পুরুকেই অবশেষে রাজ্য দিতে আগ্রহী হলেন, তখন তৎকালীন সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন—আপনি এটা কী করছেন মহারাজ? আপনার বড়ছেলে দেবযানীর গর্ভজাত যদু রয়েছেন, তাঁকে অতিক্রম করে আপনি পুরুকে রাজ্য দিচ্ছেন কেন—জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য রাজ্যং পুরোঃ প্রযচ্ছসি? এটা কেমন বিপরীত কথা? যযাতি বলেছিলেন—যদু তো আমার কথা শোনেনি, এমনকী তার পরে আমার অন্য পুত্ররাও একইভাবে আমার কথার অবমাননা করেছে এবং তাদের মধ্যে দেবষানীর গর্ভজাতরা যেমন আছে, তেমনই শর্মিষ্ঠার গর্ভজাতরাও আছে, কিন্তু যে পুত্র বিনা বিচারে মাতাপিতার অনুজ্ঞা পালন করছে, সেই পুত্রই তো পুত্র। আমি পুরুকেই রাজা করব এবং এ বিষয়ে আমার প্রজারা যা চাইবে তাই হবে। প্রজারা পরিষ্কার উচ্চারণে পুরুকেই রাজা হিসাবে চাইলেন এবং ব্রাহ্মণদের পরম্পরাবাহী যুক্তিও এখানে কাজ করল না।

এ-প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে যে, মহারাজ যযাতির কথার অত মূল্য কী? তিনি নিজেই বা কী ভালো কাজ করলেন, এক যৌবনগন্ধী পুত্রকে নিজের বার্ধক্যভার অর্পণ করে নিজে দেবযানীর যৌবন উপভোগ করলেন। এত বছর জরা ভোগের পর পুরুকে রাজ্য দিলেন কি না দিলেন, তাতে কী আসে যায়? আমরা বলব—ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বরঞ্চ এখানেও অনেক সূক্ষ্ম রাজনীতির চাল আছে যা পরিবারকে ঘিরে গড়ে

উঠেছে। যযাতি নিজে তো দেবযানীকে বিয়ে করতে চাননি, দেবযানীই তাঁকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন পিতা শুক্রাচার্যের মদতে। শর্মিষ্ঠাকেই যযাতি মনে মনে চেয়েছিলেন, অথচ তাঁকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন দেবযানী। অবশেষে পরম ঈপ্সিত সেই মিলন যখন ঘটেই গেল, তখন দেবযানী পিতার অভিশাপ পাতিত করেছেন স্বামীর মাথায়। ঠিক এইখানে যযাতির রাজপ্রজ্ঞা দেখার মতো। তিনি অভিশাপ মাথায় নিয়ে জানিয়েছেন—দেবযানীর জন্যই তো এই অভিশাপ শিথিল হওয়া দরকার, তাঁকে নিয়ে এখনও তিনি যৌবন সফল করার যুক্তি খোঁজেন। শুক্রাচার্য নিজের মেয়ের জন্যই চিরকাল কাজ করেছেন এবং এখনও অভিশাপ শিথিল করে দিয়ে বললেন—তোমার জরা যদি কেউ গ্রহণ করে, তবে তুমি তোমার পূর্বের বয়স ফিরে পাবে। যযাতি এইখানে শুধু বললেন—এত বড় একটা ত্যাগ করবে, তা আমি আমার ছেলেদেরই বলব আমার জরা গ্রহণ করতে, কিন্তু যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবে, সেই আমার রাজ্য পাবে—এ ব্যাপারে আপনাকে অনুমতি দিতে হবে। শুক্রাচার্য অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি এ কথা ভাবতেও পারেননি যে, তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাহী কন্যাপুত্রেরা কেউ পিতার কথা শুনবে না এবং শুনে তাঁকে অপমান করবে। আমার নিজের ধারণা—এত দিনের মেলামেশায় যযাতি পুত্রদের স্বরূপ বুঝে গিয়েছিলেন এবং পুত্রদের মধ্যে কে তাঁর আজ্ঞাবর্তী হতে পারে সেটা বুঝেই তিনি শুক্রাচার্যকে দিয়ে এই অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন যাতে দেবযানী তাঁর পিতাকে দিয়ে আরও একটা অভিশাপের ব্যবস্থা না করতে পারেন।

এই ঘটনায় মহাভারত বুঝিয়ে দিল—যা চিরাচরিত, প্রাচীন পুরাণ, তা মহাভারতে ঘটবে না। বংশগত শাসনে জ্যেষ্ঠই শুধু অধিকারী হয়ে থাকবে, তাঁর চরিত্র, সামর্থ্য—যযাতির ক্ষেত্রে জরা গ্রহণের মতো ক্রাইসিস্ হঠাৎ করে মাথায় নেওয়ার সামর্থ্য—এগুলিও বিচার্য হবে এবং গণ্য হবে প্রজাকুলের অভীষ্ট—কেননা যযাতির ক্ষেত্রে প্রজারাই পুরুকে চেয়েছিল। আর অতি কূটকৌশলে শেষপর্যন্ত দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা, সেটা মহাভারতের নন্দনতত্ত্বের পরিসর। আমরা শুধু বলব—এই সব ঘটনার কথা পূর্বে বলে মহাভারত তার মুখ্য রাজনীতিখণ্ডে পাঠকদের প্রবেশ করাবে এবং বুঝিয়ে দিতে থাকবে মহাভারতে ধর্মই একমাত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়, কিন্তু সেই ধর্ম জড়-কঠিন কোনও প্রাচীন পাষাণখণ্ড নয়, মুর্হুমুহু সেখানে ধর্মের প্রেক্ষিত পালটাবে এবং জীবনের প্রয়োজন বুঝে তা চরম পরিণতিতে পৌঁছবে।

দুই

মহাভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় বাস্তব হল যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞ। মহাভারতের কালেও বৈদিক যজ্ঞগুলির যে স্মৃতি ছিল, সেখানে এই বিরাট যজ্ঞকর্মের ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যা-ই থাকুক, বৈদিক কালেই এই যজ্ঞের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল, যা ধর্মভাব বা আধ্যাত্মভাবের চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক

ব্যাপার। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে একবার বলা হয়েছে যে, রাজা হতে চাইলে রাজসূয় যজ্ঞ করতে হবে আর সম্রাট হতে চাইলে করতে হবে বাজপেয় যজ্ঞ—রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি সম্রাড্-বাজপেয়েন। মূলত যে কোনও যজ্ঞই পুণ্যলাভের প্রয়োজনে করা হয়, অতএব সেটা ধর্মকার্য—এই ধারণা যথেষ্ট মান্য হলেও খুব প্রাচীন কালে যে মুহূর্ত থেকে রাষ্ট্রের ভাবনা চালু হয়েছে অথবা সেই রাষ্ট্রকে ধারণ পালন করা জন্য যখন থেকে রাজনীতির ভাবনা চালু হয়েছে, সেদিন থেকে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতি, সমাজনীতি পররাষ্ট্রনীতি সবই জড়িয়ে গেছে। অবশ্য ধর্ম ব্যাপারটাও তখন খুব বিশাল আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িত ছিল না, এমনকী তীব্র বৈরাগ্যের মাধ্যমে আত্মানুসন্ধান, আত্মচৈতন্য জাগরণ করার মতো সূক্ষ্ম দার্শনিক চেতনাও তখন তৈরি হয়নি বলেই ধর্ম তখন মানুষের জীবন এবং জৈব সমৃদ্ধির সঙ্গে বেশি জড়িত ছিল। হয়তো সেই কারণেই বৈদিক যজ্ঞগুলির মধ্যে মানুষের কামনা-বাসনার নানান ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে, রাজা-রাজাড়াও তাঁর বাইরে নন। ফলত রাজনৈতিক লাভের কারণেই বেশ বড় বড় যজ্ঞকর্মও উন্নতিকামী রাজাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। লক্ষণীয়, মহামতি নারদ, যিনি রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীন বোদ্ধা এবং প্রবক্তা, তিনি যুধিষ্ঠিরের নবনির্মিত রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন এবং তাঁকে রাজনীতির বিষয়ে উপদশ দেবার সময় কীভাবে তিনি চলছেন অথবা কীভাবে তাঁর চলা উচিত, এ বিষয়ে অন্তত একশোটা প্রশ্ন করার পর, তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় করার কথা বলছেন।

ঠিক এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের বর্তমান রাজনৈতিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বস্তুত যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডু হস্তিনাপুরের পূর্বরাজা ছিলেন বটে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তাঁরই রাজা হওয়া উচিত ছিল বটে, কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্তে তাঁর রাজা হওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক এই অবস্থা থেকে তিনি যে রাজা হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন, এটাকে কৌটিল্যের মতো সিদ্ধ শাস্ত্রপ্রণেতার ভাষায় বিজিগীষু অর্থাৎ যে রাজা নানা গুণে গুণী মানুষ এবং রাজা হয়ে বসার জন্য যিনি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হাতে পেয়েছেন, একটা রাজধানীও তৈরি হয়ে গেছে, মন্ত্রী-অমাত্যের সংখ্যা পরিষ্কার এবং তাঁর হাতে আছে একটি রাজকোষ এবং সৈন্যবাহিনী। ঠিক এই অবস্থাটা বিজিগীষু এই জন্য যে, ঠিক এই অবস্থাতেই তাঁর মনের মধ্যে রাজ্য বাড়ানোর সংকল্প তৈরি হয়, এবং বাড়ানো যদি বা নাও সম্ভব হয় তবে অন্তত চারপাশের সামন্ত রাজারা যে তাঁর বশে আছে, সেটা বুঝে নিতে হয় আর রাজ্য হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শক্তি-সামর্থ্য বুঝে কোন রাজার সঙ্গে সন্ধি করব, আর কার সঙ্গে ঝগড়া লাগাব—এ ব্যাপারে বিজিগীষু রাজার সঠিক ধারণা থাকবে—রাজা আত্মদ্রব্যপ্রকৃতিসম্পন্নঃ নয়স্যাধিষ্ঠানং বিজিগীষুঃ।

যুধিষ্ঠির ঠিক এই রাজনৈতিক অবস্থানে আছেন বটে, তবে ওই রাজ্যটুকু পাওয়ার জন্য তাঁকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে এবং সেটাও একটা রাজনৈতিক টানাপোড়েন, যার মধ্য দিয়ে তিনি আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং তারপরেই হয়তো

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান তাঁর হাতে এসেছে, তিনি রাজ্য পেয়েছেন এবং নিজের শক্তি বাড়ানোর চিন্তা করছেন। যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে দেখবেন—যুধিষ্ঠিরের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের মনে থাকবে—যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে জন্মাননি। তাঁর পিতা পাণ্ডু এক ধরনের স্বেচ্ছা-বনবাসে গিয়েছিলেন এবং সেটাও হয়তো খানিকটা অভিমানে ঘৃণায়। তাঁর দাদা ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুহীনতার জন্য রাজ্য পাননি, অথচ রাজ্যের লোভ তাঁর ষোলো আনা ছিল। পাণ্ডু সেটা প্রতিপদে অনুভব করতেন মনে মনে। হয়তো সেই কারণেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ওপর সাময়িভাবে রাজ্যভার সমর্পণ করে সরে গিয়েছিলেন বনবাসের ঠিকানায়। ধৃতরাষ্ট্রও বুঝি এই সাময়িক ন্যস্ত রাজ্যভার উপভোগই করছিলেন। এর মধ্যে শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডু নিয়োগপ্রথায় পাঁচটি দেবসম্ভব পুত্র লাভ করলেন এবং কালপ্রমাণে যুধিষ্ঠিরই যে এই প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ, সে কথা শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে কেউ না কেউ এসে বলে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে এবং বিদুরকে।

এই পারিবারিক সময় থেকে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদেই ঈর্ষা, অসূয়ায় সদ্য প্রসবের জন্য আপন গর্ভে আঘাত হানলেন ধৈর্যশীলা বলে চিহ্নিত গান্ধারী। তারপর তাঁর পুত্র দুর্যোধন যখন যুধিষ্ঠিরের অনুজ হয়েই জন্মালেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জরুরি সভা ডাকলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের একত্রে বসিয়ে, ভীষ্ম এবং বিদুরও সেখানে উপস্থিত হলেন মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে—ধৃতরাষ্ট্র নিজেই তাঁদের ডেকেছিলেন—সমানীয় বহূন্ বিপ্রান্ ভীষ্মং বিদুরমেব চ। সভায় ধৃতরাষ্ট্র নিজেই অনেক কথা বলছিলেন। এমনও বলেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির এখনও কুলজ্যেষ্ঠ, অতএব নিজগুণেই সে রাজ্য পাবে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পর আমার বড় ছেলে দুর্যোধনই রাজ্য পাবে তো—অয়ন্তু অনন্তরং তস্মাদ্ অপি রাজা ভবিষ্যতি? এই কথাটার মধ্যে এক ভয়ংকর ইঙ্গিত ছিল এবং সেই ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার—ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর দিন গণনা করছেন—কবে যুধিষ্ঠিরের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন রাজা হবে।

পরিবারের এই ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষই কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনীতির রূপ ধারণ করেছে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। যে ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির অনিবার্যতা নিজের মুখে জানিয়েছিলেন যে, যুধিষ্ঠির তো নিজের জ্যেষ্ঠতার গুণেই স্বাভাবিকভাবে রাজ্য পাবেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলারই নেই—প্রাপ্তং স্বগুণতো রাজ্যং ন তস্মিন্ বাচ্যমস্তি নঃ—সেই ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু যখন শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে নেমে আসা পিতৃহীন পাণ্ডবদের কুন্তীর ছত্রচ্ছায়ায় ফিরে আসতে দেখলেন, সেদিন তেমন করে তিনি পাত্তাই দেননি পাণ্ডবদের। পাণ্ডবরা প্রায় রাজনৈতিক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাজবাড়িতে বড় হচ্ছিলেন মাত্র এবং দুর্যোধন সেখানে এতটাই রাজনৈতিকভাবে 'প্রোজেক্টেড' যে, রাজবাড়ি থেকে খানিক দূরে ভীমকে তিনি বিষ খাওয়ানোর একটা নিখুঁত পরিকল্পনা করে ফেলতে পেরেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই, অথচ তিনি ধৃতরাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকে কাজে লাগাতে পেরেছেন নিজের মতো

করে। সবচেয়ে বড় কথা, ভীমকে প্রায় খুন করার চেষ্টা হলেও এবং দুর্যোধন এই খুনের চেষ্টা করেছেন, এটা পরিষ্কার বোঝা গেলেও পাণ্ডবরা এ-কথা সরবে বলতে পারেননি, কারণ তাতে পুনরায় তাঁদের ওপরে আঘাত নেমে আসার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক এখন যেমন হয়, খুনি-গুন্ডারা একবার অন্যায় কাজ করে গেলেও তাদের পরবর্তী হুমকির ভয়ে প্রায় সময়েই চুপ করে থাকতে হয়, ঠিক সেইভাবেই যুধিষ্ঠির উত্তেজিত ভীমকে বলেছিলেন—তূষ্ণীং ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্যং কথঞ্চন। গুন্ডা-রাজনীতিতে সরকার বা রাজার পরোক্ষ মদতে দলদাস গুন্ডারা বা রাজকীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যাকে আঘাত করে তার প্রতিবাদ করলে যে, পরিবারের অন্য আরও মানুষ আক্রান্ত হবে সে-কথা বুঝেই কুন্তীকে বিদুর এই সময়ে বলেছিলেন— তোমার আর যে-কটা ছেলে বেঁচে আছে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করো— শেষ-সংরক্ষণং কুরু। কেননা ভীমকে কীভাবে মারার চেষ্টা করা হয়েছে, এ-কথা যদি একবার প্রচারিত হয়ে যায় এবং আমরা সেটা বুঝে ফেলেছি বলে সকলকে বোঝাতে থাকি, তাহলে তোমার অন্য ছেলেগুলোর ওপরে হামলা নেমে আসবে—প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষেঽপি প্রহরেত্তব।

মনে রাখা দরকার, যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবেরা এমনকী কুন্তীও এইরকম একটা দ্বিস্তরীয় রাজনীতির মধ্য দিয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন অর্থাৎ পূর্বরাজার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর প্রতি বাইরে-বাইরে একটা নৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তলায় তলায় যে ষড়যন্ত্র চলছিল, সেখানে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি রাজা অন্ধও বটে, নির্বাকও বটে। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি নানা উপায়ে যুধিষ্ঠিরদের বিব্রত করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মেরে ফেলার চেষ্টাও বাদ যাচ্ছে না— অনেকৈ-রভ্যুপায়ৈস্তান্ জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্। পাণ্ডবদের রাজনৈতিক অবস্থানের খানিকটা উন্নতি ঘটল তাঁদের অস্ত্র পরীক্ষা শেষ হবার পর। এখানে অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যেতেই নতুন একটা রাজনৈতিক চাপ ধৃতরাষ্ট্রের ওপরে তৈরি হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, অস্ত্র পরীক্ষার কালেই অর্জুনের বিরুদ্ধে কর্ণকে 'প্রোজেক্ট' করে ফেলে দুর্যোধন এই রাজনৈতিক চাপ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক করে ফেলার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু ভীম-অর্জুনের ক্ষমতা, যুধিষ্ঠিরের বয়োজ্যেষ্ঠতা, কুন্তীর প্রতি বঞ্চনা এবং খুব বিপ্রতীপভাবে দুর্যোধন কর্তৃক প্রশাসনের অপব্যবহার—এগুলির নিরিখে কুরুবাড়ির বৃদ্ধদের দিক থেকে একটা ভয়ংকর চাপ তৈরি হল যাতে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এক বছরের মধ্যেই যুবরাজ হিসেবে নিযুক্ত করতে বাধ্য হলেন—স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ...যৌবরাজ্যায় পার্থিব।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হলেন এবং তাঁর মধ্যে রাজা হবার সমস্ত গুণই ছিল বলে তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য, কোমল স্বভাব, সরলতা এবং রাজভৃত্যদের প্রতি তাঁর অনুকম্পা তাঁর যৌবরাজ্যের শাসন-ভাবনাতেও অন্য মাত্রা সংযুক্ত করল। যুধিষ্ঠির সকলের মধ্যে বেশ প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার দুই ভাই ভীমার্জুনের অস্ত্রক্ষমতা

সংযুক্ত হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক অবস্থান বেশ সুদৃঢ় হয়ে উঠল। যে-সব রাজ্য আগে পাণ্ডুও জয় করতে পারেননি সেগুলি অর্জুন-ভীমের ক্ষমতায় হস্তিনাপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের রাজনৈতিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। পাণ্ডবদের সার্বিক শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করায়—ততো বলমতিখ্যাতং বিজ্ঞায় দৃঢ়ধন্বিনাম্—ধৃতরাষ্ট্রের মন পাবণ্ডবদের ওপর হঠাৎই বিষিয়ে উঠল—দূষিতো সহসা ভাবো ধৃতরাষ্টস্য পাণ্ডুষু। তিনি আর সইতে পারছেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এত ভালোভাবে চললে যুধিষ্ঠিরকে শেষপর্যন্ত রাজা হিসেবে ঘোষণা করতেই হবে এবং তাতে দুর্যোধনের ক্ষতি হবে সমধিক। কিন্তু এও তো ঠিক যে, ধৃতরাষ্ট্র চাইলেন আর সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন—এমনটা তো কোনও রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। অতএব ধৃতরাষ্ট্র এই মুহূর্তে খানিকটা 'কনফিউজড'। যা তিনি করতে চাইছেন সেটা খানিক যাচিয়ে নেওয়া দরকার।

ঘটনা হল, বুদ্ধিবিপন্ন মানুষও যখন বুদ্ধিমত্তর মানুষের বুদ্ধি শুনতে চায়, তখনও সে নিজের বৃত্তি-রুচিস্বভাবের সঙ্গে মেলে এমন মানুষকেই বুদ্ধিদাতা হিসেবে খোঁজে—একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি দেখেছি—যে মানুষ মাছ-মাংস খেতে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষা নেবার সময়ে এমন একজন গুরু খোঁজন, যিনি মাছ-মাংস অনুমোদন করবেন। একই কথা পরামর্শের ক্ষেত্রেও। এও এক ধরনের গুরুকরণ। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু এই সময়ে ধর্মপ্রাণ বিদুরকে ডাকলেন না, যাঁকে তিনি অসংখ্যবার রাজনৈতিক কারণে বিপন্ন হয়ে ডেকেছেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁকে ডাকলেন না। কেননা এখন ডাকলে—তিনি এটা বুঝেছেন—বিদুর তাঁকে সমর্থন করবেন না। বিশেষত বিদুর পাণ্ডব-ঘেঁষা মানুষ। বিপন্ন পাণ্ডবদের এবং তাঁদের জননী কুন্তীকে তিনিই প্রধানত চালিত করছেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিকে, পাণ্ডবরাও তাঁর স্থির এবং ধর্মশালিনী বুদ্ধিকে সম্মান করে তাঁর মতেই চলেন—উদ্ভাবনম্ অকুর্বন্তো বিদুরস্য মতে স্থিতাঃ।

বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের প্রথম থেকেই দুটো শিবির তৈরি হয়েছে। এক পক্ষ ন্যায়-নীতি-ভদ্রতা এবং অসংখ্য ব্যক্তিগুণ নিয়ে প্রাপ্য রাজ্যের দখল চাইছেন। অন্য পক্ষ রাজ্যে অধিষ্ঠিত; শাসনযন্ত্র, মন্ত্রী, অমাত্য, সৈন্য-সেনাপতি সেই পক্ষেরই হাতে এবং তারা কোনও ভাবেই ন্যায়প্রাপ্য রাজ্যভার স্বজনের হাতেও ছেড়ে দিতে রাজি নন। ঠিক এই অবস্থায় যেটা প্রায়োগিক প্রয়োজন, সেটাকে শাস্ত্রকারেরা বলেন 'আন্বীক্ষিকী'। কৌটিল্য বলুন, মনু বলুন কিংবা মহাভারত বলুন, সমস্ত শাস্ত্রকারেরাই রাজনীতিশাস্ত্র-আলোচনার আরম্ভেই 'বিদ্যা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। সার্বিক আলোচনায় এই বিদ্যা চার প্রকার হলেও খুব স্পষ্ট করে তিনটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, আর যেটা বলা হয়নি, এমনকী কোনও সময় সেটাকে অন্যায়ভাবে নিন্দাও করা হয়েছে মহাভারতে, অথচ ধৃতরাষ্ট্র সেটাই করছেন; যদিও আমরা বলব—ধৃতরাষ্ট্র কেন, মহাভারতের মহারথী সজ্জনেরাও—ভীষ্ম, বিদুর, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির সকলেই

প্রয়োজনমতো আন্বীক্ষিকীর আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু নীতিগতভাবে বিদ্যা হিসাবে সেটা চাররকমের বিদ্যার মধ্যে সোচ্চারে বলা হয়নি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি এই চারটি হল বিদ্যা। এর মধ্যে দণ্ডনীতি ছাড়া আর তিনটি শব্দই পারিভাষিক মনে হলেও দণ্ডনীতি শব্দটাও খানিকটা পারিভাষিক। আন্বীক্ষিকী মানে যুক্তি, তর্ক, দর্শন, একটু কায়দা করে বললে 'আরগুমেন্‌টেটিভ্ লজিক' বা 'আরগুমেন্‌টেটিভ্ ফিলসফি'। ত্রয়ী মানে ঋক্, সাম এবং যজুঃ তিন বেদ, অথর্ব বেদের মধ্যে কিছু আথর্বণিক হিংসা-প্রক্রিয়া আছে বলে অথর্ব বেদকে এক সময় বেদের মধ্যে ধরা হত না, তাই তিন বেদ নিয়ে ত্রয়ী। বার্তা হল—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজকর, খনি, জমি-জরেতের ব্যবহার—এই সব কিছু, যা অর্থনীতির ব্যাপার। আর দণ্ডনীতি হল রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত শাস্ত্র অর্থাৎ 'সায়েন্স অব গভার্নমেন্ট'। কৌটিল্য যখন এই চতুর্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তখনই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে বিদ্যার চতুর্বিধতা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বকালেই মতভেদ ছিল। মনুর মত, বা মানব সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করে কৌটিল্য বলেছেন যে, মনুর মতে ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি এই তিনটেই হল বিদ্যা, আর আন্বীক্ষিকী বা তর্কযুক্তির ব্যাপারটা ত্রয়ীর মধ্যেই ঢুকে যেতে পারে, কেননা বেদজ্ঞান মানেই ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, কোষ, এগুলির জ্ঞান হতে থাকে বলেই তর্ক-যুক্তির জায়গা সেখানেই তৈরি হয়ে যায়—ত্রয়ী-বিশেষো হি আন্বীক্ষিকীতি

এইভাবে প্রাচীনেরা কেউ দুটি বিদ্যা মেনেছেন, কেউ বা একটা—শুধু দণ্ডনীতি। কৌটিল্য সযৌক্তিকভাবে চারটি বিদ্যাই মেনেছেন, কিন্তু মহাভারত আন্বীক্ষিকীকে বাদ দিয়ে মনু-মহারাজের মতো তিনটি বিদ্যার প্রাধান্য দিয়েছেন। বনপর্বের একজায়গায় সেই মতই ব্যক্ত—ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজানতাম্। মহাভারত খুব স্পষ্ট করে আন্বীক্ষিকী বা আরগুমেন্‌টেটিভ লজিকের কথা না বললেও এই বিদ্যা যে মহাভারতের কালে অজানা ছিল না তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। কিন্তু এটাকে স্পষ্ট করে বিদ্যা-চতুষ্টয়ীর মধ্যে গ্রহণ না করার কারণ একটাই হতে পারে। কৌটিল্য স্বয়ং আন্বীক্ষিকী উদাহরণ দিতে গিয়ে লোকায়ত দর্শন এবং সাংখ্য-যোগের উল্লেখ করেছেন। লোকায়ত তো নিরীশ্বর বটেই সাংখ্যদর্শনও বেদ মানে ঈশ্বর মানে না, আর যোগ যেহেতু সাংখ্যের সমানতন্ত্র, তাই সাংখ্যের তত্ত্বগুলি এখানে বেশি প্রাধান্য পায়। তাতে বোঝা যায়, আন্বীক্ষিকীর মধ্যে যুক্তি-তর্ক-হৈতুকতার তাড়না এত বেশি যে, তা অনেক সময় নাস্তিকতার পর্যায়ে চলে যায়। মহাভারতের মধ্যেই এক জায়গায় এক বিশিষ্টজনের মুখে অনুশোচনার সুরে এমন কথা শোনা যাচ্ছে—আমি আগে অনেক পণ্ডিতি করতাম, নাস্তিক ছিলাম, প্রত্যেক বিষয়ে হেতু খুঁজে বেড়াতাম, ফলে বেদনিন্দায় মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি তর্ক-যুক্তিতে আবিষ্ট হয়ে চিরকাল আন্বীক্ষিকীতেই অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, শ্রুতিমূলক তত্ত্বনির্ণয়ে আন্বীক্ষিকী দিয়ে কিছু হয় না—আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্।

মহাভারতের এই শৃগাল-কাশ্যপ সংবাদে আন্বীক্ষিকীর ওপর যত আঘাতই নেমে আসুক তর্ক-যুক্তি ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, অন্যান্য প্রয়োজন, বিশেষত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, পররাষ্ট্রনীতি এগুলি কোনওটাই সযৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু অতিরিক্ত তর্কযুক্তি কখনও কখনও সর্বকার্যেই সমস্যা তৈরি করে বলে মহাভারত আন্বীক্ষিকীকে বিদ্যা-ত্রয়ীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি। অবশ্য তাই বলে আন্বীক্ষিকী ব্যাপারটা চতুর্বিদ্যার মধ্যে মহাভারতের আমলে জানা ছিল না, এমনটা নয়। এখানে পূর্বোল্লিখিত আন্বীক্ষিকী শব্দটাই একটা প্রমাণ তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোধহয় সেই সম্বোধন, যা কৃষ্ণের মতো রাজনীতিকেরই উপযুক্ত। কৃষ্ণ যখন শরশয়ান ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজনীতির উপদেশ যাচনা করছেন, তখন তিনি ভীষ্মকে সম্বোধন করছেন 'চাতুর্বিদ্য' বলে। অর্থাৎ তিনি আন্বীক্ষিকী সহ ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, এই চারটি বিদ্যাই জানেন—চাতুর্বিদ্যে চ যে প্রোক্তাঃ চাতুর্হোত্রে চ ভারত। বিদ্যা হিসেবে আন্বীক্ষিকীর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কৌটিল্যের মতো ধুরন্ধর মানুষ বলেছিলেন যে, বেদজ্ঞান-নিরূপিত 'ধর্মাধর্ম', ব্যবস্যা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটা সমৃদ্ধি বয়ে আনবে, আর কোনটা ক্ষতি করবে সেই 'অর্থানর্থ', আর দণ্ডনীতি বা রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনটা 'পলিসি' হওয়া উচিত অথবা কোনটা 'ইম্‌পলিসি', সেই 'নয়-অপনয়ে'র প্রায়োগিক দিকটা যে তর্ক-যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়, সেটাই হল আন্বীক্ষিকী—বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমানা লোকস্য উপকরোতি।

লক্ষণীয়, কৃষ্ণ এই আন্বীক্ষিকীর প্রয়োজন বোঝান এই কারণে যে, তাঁকেও কিন্তু উদ্যোগপর্বে শান্তির দূত হয়ে আসার সময় 'চাতুর্বিদ্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা বলতে চাই—মহাভারত তার লেখ্যনীতিতে যা-ই বলুক, সেও কিন্তু আন্বীক্ষিকীর চরম মূল্য দেয়, তা নইলে কৃষ্ণ এবং ভীষ্মের মতো যুবক-বৃদ্ধ দুই বিশাল ব্যক্তিত্বকে চাতুর্বিদ্য বলে ডাকত না। আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে পারি—ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়-অপনয় অর্থাৎ পলিসি এবং 'ইম্‌পলিসি' বিচার করার জন্য একজন রাজনৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নাম কণিক। মহাভারত তাঁকে বলেছেন 'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমঃ' অর্থাৎ রাজ্যশাসনের নীতি-নিয়ম যাঁরা জানেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন তিনি। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি রাজনীতির সার কথা শোনাবেন। আমরা আগেই বলেছিলাম—মানুষের নিজস্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ীই গুরু জোটে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কণিকও সেইভাবেই তাঁর মত ব্যক্ত করলেন যার মধ্যে 'পোলিটিক্যাল এথিকস্' বা 'সোশ্যাল এথিকস্' কোনওটাই নেই।

ধৃতরাষ্ট্র সব কথা খুলে বললেন কণিককে। এ-কথাও বললেন যে, পাণ্ডবরা আমার নিজের ভাইপো বটে, কিন্তু তাদের এত বাড়-বাড়ন্ত আমার ভালো লাগছে না। এদের এই ফুলে-ফেঁপে ওঠা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারছি না, ঈর্ষায় আমার গা জ্বলে যাচ্ছে—উৎসিক্তাঃ পাণ্ডবা নিত্যং তেভ্যো'সূয়ে দ্বিজোত্তম। ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা দেখে কণিক অনেক উপদেশ দিলেন, যার নাম কণিক-নীতি। কণিক বললেন—

রাজনীতিতে কেউ কারও নয়, নিজের উন্নতির জন্য যে কোনও অন্যায় রাজনীতিতে করা যায়। দরকার হলে শত্রুকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, অথবা সুযোগ যদি আসে তবে কাঁধে-রাখা শত্রুকে আছাড় মেরে শেষ করবে, ঠিক যেমন মাটির কলসি ভাঙে মানুষ—ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি। কণিক আরও অনেক অনৈতিক কাজ রাজনৈতিক কর্তব্যের কক্ষায় প্রবেশ করিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—যাকে তুমি মারতে চাও, তার কাছে এইরকম দেখাও যে তার কোনও ক্ষতিই তুমি করবে না, এমনকী লোক-দেখানো দান-মানও তাকে কিছু দিতে পার, কিন্তু সুযোগ পেলে তাকে বিষ খাইয়েও মারতে পার। তবে হ্যাঁ, হত্যার মতো সাংঘাতিক কাজ করার আগে কথায়-ভাবে মুখে ফুটিয়ে তুলবে বিনয়, কিন্তু মনটা হবে তোমার ক্ষুরের মতো ধারালো—বাচা ভৃশং বিনীতঃ স্যাদ্ হৃদয়েন যথা ক্ষুরঃ।

কণিকের কথা ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরল বেশ এবং তিনি ঠান্ডা মাথায় ভালো প্রচার করিয়ে গোপনে পাঁচ পাণ্ডব এবং জননী কুন্তীকে বারণাবতের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করলেন দুর্যোধনের সহায়তায়। যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষের রাজা হবার দিকে খানিকটা এগিয়েও কিন্তু আবারও অবস্থার বিপাকে পড়ে গেলেন এবং সেই বিপন্নতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে তাঁদের। রাজনীতিতে এই যে নীতিহীনতার দিকটা ভেসে উঠল কণিকের উপদেশে, মহাভারতেই নীতিলেশহীন রাজনীতির উল্লেখ আবারও হয়েছে শান্তিপর্বে ভীষ্মের রাজনীতি উপদেশের কালে।

ভীষ্ম সেখানে ভারদ্বাজ-পুরঞ্জয়ের প্রাচীন কথোপকথন উল্লেখ করে পুরোপুরি 'ম্যাকিয়াভ্যালিয়ান্' একটা উপদেশ দিয়েছেন, যাতে যুধিষ্ঠির একেবারে চমকে উঠেছেন। এতটাই তিনি বিরক্ত হয়েছেন যে, ভীষ্মকে তিনি বলে ফেলেছেন—এ কেমন রাজনীতির কথা শোনালেন আপনি যাতে আমার ধর্মবোধ, নীতিবোধ সব যেন ডুবে গেল...সংমুহ্যামি বিষীদামি ধর্মো মে শিথিলীকৃতঃ।

ভীষ্ম বুঝিয়ে বললেন—দেখো বাছা যুধিষ্ঠির, রাজার ধর্ম বস্তুটা একক কোনও বস্তুপিণ্ড নয়—যে, একইভাবে একই নির্দিষ্ট ছকে সেটা ব্যবহার করা যাবে—নৈকশাখেন ধর্মেন রাজ্ঞো ধর্মো বিধীয়তে। সময় এমন আসে, যখন শেষ জায়গায় এসে রাজাকে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করতেই হয় এবং সেটাই রাজার প্রজ্ঞা। বস্তুত ভীষ্ম যে রাজপ্রজ্ঞার কথা বলছেন এটাই আসলে আন্বীক্ষিকী এবং এই আন্বীক্ষিকীর মাধ্যমে অনেক অন্যায়ও রাজনৈতিক দিক থেকে ন্যায় হয়ে উঠতে পারে। তবে এটাও ঠিক কণিকের সঙ্গে বসে আজ ধৃতরাষ্ট্র যেটা ঠিক করলেন সেই রাজপ্রজ্ঞার নৈতিকতা অথবা তার সীমাবদ্ধতা কতটা! আর পরবর্তীতে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বুদ্ধিতে যে ধরনের রাজপ্রজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন তারই বা নৈতিকতা কতটা? তবে এ-সব ভাবার আগে আবার যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাদের। ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের ভাবিত গূঢ়-হত্যার রাজনীতি কাজ করতে পারল না বিদুরের হিতৈষণায়। একই সঙ্গে মহাভারত বুঝিয়ে দিল—যেন তেন প্রকারেণ অন্যায়-অপনয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতা দখল করা কোনওটাই মহাভারতীয় রাজনীতির সিদ্ধি ঘটায় না। ফলে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল, আর পাণ্ডবরা খানিকটা এগিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

বিদুরের নির্দেশ মেনে জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে পাণ্ডবরা বনের পর বন পেরিয়ে উপস্থিত হলেন পঞ্চাল দেশে। রাস্তায় হিড়িম্ব-রাক্ষস-বধের চেয়েও পাণ্ডবদের কাছে বড় পাওনা ছিল ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিয়ে এবং এখানে উপরি পাওনা হলেন ঘটোৎকচ, যিনি ভবিষ্যতের ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। ঘটোৎকচকে কুন্তী যেভাবে পাণ্ডু-বংশের প্রথম পুত্র বলে সম্বোধন করে জাতপাতের লড়াইটা একেবারেই স্তব্ধ করে দিলেন, তেমনই বক-রাক্ষসের গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণ পরিবারকে বাঁচিয়ে কুন্তী কিন্তু পাণ্ডবদের কাছে মহাভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় তাৎপর্যটা যে ধর্মের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত রাজা হতে গেলে তাকে যে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির দিকে তাকাতে হবে, সেটা একটা নির্দেশ হিসেবে যুধিষ্ঠিরের কাছে বার্তা গেছে এই কাহিনির মাধ্যমে। যুধিষ্ঠির মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছিলেন—কেন তুমি পরের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য নিজের ছেলেকে রাক্ষসের মুখের গ্রাস হিসেবে পাঠাচ্ছ—কথং পরসুতস্যার্থে স্বসুতং ত্যক্তুমিচ্ছসি? কুন্তী বলেছেন—আমি এই একটা সিদ্ধান্তে দুটো-তিনটে কাজ সেরে ফেলেছি। প্রথমত, আমার ভীম কতটা পারে, কতটা তার শক্তি, সেটা কতকগুলো ঘটনায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে এতদিন বাস করছি, তার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারি তার পরিবারকে বাঁচিয়ে। তৃতীয়ত, রাজকর্তব্য। অর্থাৎ শুধু ব্রাহ্মণ বলেই নয়, চতুর্বর্ণের সুরক্ষার প্রতি দায়িত্ব আছে আমাদের। সেটাই রাজকর্তব্য—প্রতীকারশ্চ বাসস্য ধর্মশ্চ চরিতো মহান্।

বক-রাক্ষসকে হত্যার পর কুন্তী ছেলেদের প্ররোচিত করলেন পঞ্চাল দেশে যাবার জন্য। আগে থেকেই খবর ছিল—দ্রৌপদী স্বয়ংবরা হবেন। একেবারে প্রথমে এ-ব্যাপারে খেয়াল না করলেও মহামতি ব্যাস পাণ্ডবদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। পাণ্ডবরা স্বয়ংবর-সভায় গেলেন, মীনচক্ষু ভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতলেন অর্জুন; কিন্তু হয়তো বা মায়ের ইচ্ছাকৃত ভুলে, অথবা দ্রৌপদীকে ঘিরে যেন ভাইতে ভাইতে বিরোধ না ঘটে—মিথো ভেদভয়ান্নৃপ—এই যৌধিষ্ঠিরী ভাবনায় মায়ের ভুলটাকে 'জাস্টিফাই' করে দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের যে বিবাহ হল—এইখানেই পাণ্ডব-ভাইদের রাজনৈতিক আবর্তন ঘটে গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে ভারতবর্ষের নাম করা সব রাজা সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন পঞ্চালে। একেবারে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য, উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব দেশের রাজারাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-কৌতুকে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য, কেউ বা শুধুই কৌতুক দেখার জন্যই এসেছিলেন। কিন্তু সবার ওপরে এটাই সত্য যে, দ্রৌপদী সেকালের

দিনের যতই 'সেনসেশনাল' রমণী হোন, তাঁর স্বয়ংবর কিন্তু রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল এবং হয়তো সেই কারণে একটু সাজানোও ছিল। কেননা যেদিন দ্রোণাচার্যের আদেশে অর্জুন দ্রুপদকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন, সেদিনও কিন্তু অর্জুন তাঁর মর্যাদা অতিক্রম করেননি, তিনি দেখাতে পেরেছেন যে, তিনি গুরুর আদেশ পালন করছেন-মাত্র। কিন্তু এই ঘটনায় দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য চলে গেল দ্রোণাচার্যের কাছে এবং তাঁর অপমানটা দ্রুপদের গায়ে বাজল দ্বিগুণভাবে। মহাভারত জানিয়েছে—অপমানের পর থেকে আপন তপস্যায় ভবিষ্যতের দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাওয়ার চেয়েও যাঁদের ক্ষমতায় দ্রোণাচার্যের এত বাড়বাড়ন্ত, সেই কৌরবদের ধ্বংস করার জন্য তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করলেন—অস্যাঃ হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপদ্যতে ভয়ম্।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা-পূরণের জন্য যাঁর জন্ম সেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ঘোষণা করা হলেও দ্রুপদ সেই পুরুষটিকেই শুধু খুঁজে যাচ্ছিলেন, যিনি তাঁকে শুধু আদেশ-রক্ষার জনা বন্দি করেছিলেন—সো'ন্বেষয়ানঃ কৌন্তেয়ম্ এবং দ্রুপদ কন্যাদানের শর্ত হিসেবে মৎস্যচক্ষু ভেদ করার যে মাত্রা ঠিক করেছিলেন, সেটা অর্জুনের মতো বীরের কথা মনে রেখেই—যজ্ঞসেনস্য কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে। কৃষ্ণং দদ্যামিতি...। এমনকী ঘোষিত স্বয়ংবরে দ্রৌপদী যেভাবে কর্ণকে—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না—বলে প্রত্যাখ্যান করলেন, সেখানেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে আমরা মনে করি। যাই হোক, দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহ হয়ে যাবার পর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সেটা হল—রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবরা এক প্রবল শক্তিমান রাজনৈতিক মিত্র লাভ করলেন। মহাভারতে দ্রৌপদী-বিবাহের অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়ে মহাভারতের কথক ঠাকুর বৈশম্পায়ন মন্তব্য করছেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদের সংযোগ হল, অর্থাৎ দেবতাদের কাছ থেকেও আর ভয় রইল না পাণ্ডবদের। দ্রুপদ যে-সব যৌতুক দিলেন পাণ্ডবদের তার মধ্যে ধন-রত্ন, সোনা-দানার চেয়েও বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে হাতি-ঘোড়া-রথের উপঢৌকন। দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর আশীর্বাদিক ভাষণে কুন্তী নববধূর কাছে এই আশা করছেন যে, সে দায়িত্ব নিয়ে এবার কুরু-জাঙ্গল প্রদেশে তার স্বামীকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে—অনু ত্বামভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা। তবে শুধু দ্রুপদ-পাঞ্চালের সঙ্গেই সংযোগ নয়, এই স্বয়ংবরকে উপলক্ষ করেই পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যাওয়ায় মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের সংঘরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রিক অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজদের সঙ্গে গভীর সংযোগ ঘটে গেল পাণ্ডবদের। পাঞ্চালরা এবং অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজেরা মিত্রপক্ষে চিহ্নিত হওয়ায় পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে গেল একলপ্তে।

ব্যাপারটা যে বেশ ভয়েরই হয়ে দাঁড়াল, এটা রাজনৈতিকভাবেই বুঝে নিলেন চতুর ধৃতরাষ্ট্র। একে তো লুকানো কথাটা জানাজানিই হয়ে গেল যে, পিতৃহীন পাণ্ডবদের

বারণাবতে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা হয়েছিল। ভীষ্ম-বিদুর এই ঘটনা নিয়ে ছি-ছিক্কার করতে থাকলেন। দ্বিতীয়ত, বিদুর যখন একেবারে 'অফিশিয়ালি' ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—তাহলে এবার তো পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগাযোগ-ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে হয়েছে—আমার ভালো লাগছে শুনে যে পাণ্ডবরা ভালো আছে এবং তার চেয়েও বড় কথা, তারা রাজনৈতিকভাবে একটা মিত্রগোষ্ঠী লাভ করেছে এবং তারা প্রত্যেকেই ভীষণ বলবান—যৎ তে কুশলিনো বীরা মিত্রবন্তশ্চ পার্থিবাঃ। আর এটা তো সত্যিই বড় কথা, বিদুর! যে, সবান্ধবে দ্রুপদের মতো একটা রাজনৈতিক বন্ধু পেলে যে রাজার সহায়-সম্বল কিছু নেই, সেও নিজেকে রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সজ্জিত বলে মনে করবে—ন বুভূষেদ্ ভবেনার্থী গতশ্রীরপি পার্থিবঃ।

ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্যে দুটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটা হল 'অর্থী' দ্বিতীয়টা 'গতশ্রীরপি পার্থিবঃ'—এমন রাজা সহায়-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্যের মধ্যে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় যে সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের কথা প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে বলা হয় তার সপ্তম অঙ্গ 'মিত্র' বা ally জড়িত আছে। আর প্রথম শব্দ 'অর্থী' বলতে প্রার্থী না বুঝে যদি 'অর্থ' বলতে কৌটিল্যের মতে মনুষ্য-সংবলিত একটি ভৌগোলিক খণ্ড বোঝেন—'মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ', তাহলে ধৃতরাষ্ট্র কতটা নিপুণভাবে কথা বলেছেন একবার ভেবে দেখুন। কৌটিল্য, মনু, কামন্দক, শুক্রাচার্য—যাঁরাই আমাদের রাজনীতিশাস্ত্র-প্রণেতা আছেন, তাঁরাই মিত্রলাভের তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন একজন রাজার অধিকৃত ভূখণ্ডকে ধ্রুবক হিসেবে ধরে নিয়ে। পাণ্ডবদের হাতে সেই ভৌগোলিক খণ্ডটি রাজ্য হিসেবে এখনও আসেনি, তাঁরা তাই 'অর্থী' অর্থাৎ তাঁরা চান একটি রাজ্যের অধিকারী হোন তাঁরা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতে—সহায়সম্বলহীন গতশ্রী অবস্থাতেও একজন 'অর্থী'র কাছে দ্রুপদ-পাঞ্চালের মতো মিত্রলাভ ভীষণ রকমের একটা 'অ্যাচিভ্‌মেন্ট' হয়তো এর ফলেই 'অর্থী' পাণ্ডবদের হাতে 'অর্থ' হিসেবে একটি 'মনুষ্যবতী ভূমি' এসে যাবে।

রাজনীতিতে মিত্রলাভের অশেষ উপকার এবং সেই বন্ধু জুটে যায় চার ভাবে। মহাভারত সেই কর্ণপর্বে গিয়ে বলবে—বন্ধু হতে পারে সহজ (natural ally), যেমন মামা-মাসির ছেলে। বন্ধু হতে পারে মিষ্টি কথায় তুষ্ট হয়ে। টাকা-পয়সা, ধনরত্নের বিনিময়েও বন্ধু হয়, আবার বন্ধু জোটে নিজের শক্তিমত্তায়—প্রতাপতশ্চোপনতং চতুর্বিধম্—অন্য পণ্ডিতেরা এই চার প্রকারের ক্ষেত্রে খুব 'রিজিড' নন, যেমন কামন্দকীয় নীতিসার বলেছে—বিবাহাদির মাধ্যমেও রাজনৈতিক মিত্রলাভ হয়, কোনও রাজাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর ফলেও বন্ধু হয়ে ওঠে রাজনৈতিকভাবে। আমরা তো বলব—এই সংশোধনীটুকু ঠিকই। পাণ্ডবরা এক প্রকারে সহজ মিত্র লাভ করেছেন মামা বাসুদেবের ছেলে কৃষ্ণ-বলরামকে পেয়ে, আর ওদিকে বৈবাহিক সূত্রে বন্ধু হিসেবে পেলেন দ্রুপদ পাঞ্চালকে। যাঁরা এখনও একটি রাজ্যও পাননি, পিতৃ-পিতামহক্রমে প্রাপ্য রাজ্য

পাণ্ডবদের জন্মের আগে থেকেই বেদখল হয়ে গেছে, আর নিজের বাহুবলে তা অর্জন করার মধ্যেও পাণ্ডবদের পারিবারিক রাজনীতির সমস্যা ছিল, ঠিক এই অবস্থায় দ্রুপদের মতো বৈবাহিক লাভ এবং তার চেয়েও বেশি কৃষ্ণের মতো এক অসাধারণ রাজনীতিকের স্বয়মাগমন পাণ্ডবদের রাজনৈতিক শক্তি এক লাফে অনেকটা বাড়িয়ে দিল।

এটা মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণ তখন কংস-ধ্বংস করে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে। প্রবল-পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর আঠেরো/উনিশবার লড়াই হয়ে গেছে এবং যেভাবেই হোক তিনি হারেননি। মথুরা থেকে রাজধানী সরিয়ে দ্বারকায় নিয়ে গেছেন কৃষ্ণ এবং তাতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান আরও দৃঢ় হয়েছে। এতকাল ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন বলেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করা হয়নি, কিন্তু এখন খানিকটা নিজের প্রয়োজনেই এবং অবশ্যই পাণ্ডবদের প্রয়োজনে তিনি উপস্থিত হয়েছেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এবং অদ্ভুত ব্যাপার হল, কৃষ্ণ কিন্তু পাণ্ডবদের চিনে নিয়েছেন, যেখানে অন্যেরা কেউই তাঁকে চিনতে পারেননি। মহাভারত থেকে প্রমাণ করা কঠিন যে, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের চিনতেন, কিংবা আগে তাঁদের সঙ্গে পাণ্ডবদের দেখা হয়েছে। কিন্তু এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে, কৃষ্ণের নিজের পিসি হলেন পৃথা-কুন্তী, তাঁকে বা তাঁর ছেলেদের কৃষ্ণ এতদিন দেখেননি, কোনও আলাপ-পরিচয় তাঁদের সঙ্গে হয়নি এতদিন, এ-কথা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরঞ্চ মহাভারতের প্রমাণ না থাকলেও আমরা বলব যে, পাণ্ডবরা যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে আসছেন, এটা কোন-ও না-কোনওভাবে কৃষ্ণ জানতে পেরেছিলেন।

স্নাতক ব্রাহ্মণদের ছদ্মবেশে থাকা পাণ্ডবদের কৃষ্ণই কিন্তু চিনিয়ে দিয়েছেন দাদা বলরামকে, এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবরা হওয়ার খানিক সময় পরেই কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই ভার্গবকর্মশালায়, এবং বিবাহোত্তরকালে প্রায় দ্রুপদের মতোই হাতি-ঘোড়া-রথের দণ্ডবাহিনী উপহার দিয়েছেন পাণ্ডবদের। খুব অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেছে যে, পাণ্ডবদের নিয়ন্ত্রণ-ভার কৃষ্ণের হাতে এসে গেছে। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের লোক-দেখানো অনুজ্ঞায় বিদুর যখন পাণ্ডবদের ফিরিয়ে নিতে এলেন হস্তিনায়, তখন মিত্র হিসেবে দ্রুপদকে পাওয়াটা যে কৌরবদের কাছেও খুব লাভের হয়েছে—এ-কথা ধৃতরাষ্ট্রের জবানে বিদুর জানালেও পাণ্ডবদের ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে দ্রুপদের অনুমতি চাইতেই দ্রুপদ কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্রুপদ বলেছেন—যুধিষ্ঠির যদি মনে করেন, যদি কৃষ্ণ-বলরাম মনে করেন যে, পাণ্ডবরা ফিরুন, তাহলে তাঁরা ফিরবেন। বিশেষত কৃষ্ণ-বলরাম পাণ্ডবদের হিত বিবেচনা করছেন বলেই তাঁদের মতটা গুরুত্বপূর্ণ—এতৌ হি পুরুষব্যাঘ্রাবেষাং প্রিয়হিতে রতৌ।

দ্রুপদের এই সৌজন্যের উত্তর দিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন—হ্যাঁ, আমি মনে করি যে, যুধিষ্ঠিরের এখন ফেরা উচিত, এখন দ্রুপদ যা বলেন। দ্রুপদ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—সমস্ত নিয়ন্ত্রণ এখন কৃষ্ণের হাতে, কৃষ্ণ যেটা বললেন এই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে সেটাই সময়ের প্রয়োজন বলে বুঝতে হবে—যথৈব মন্যতে বীরো দাশার্হঃ পুরুষোত্তমঃ। কেননা কুন্তীর ছেলেরা আমার কাছে যেমন, কৃষ্ণের কাছেও ঠিক তেমনই। দ্রুপদের এই কথাটা নিশ্চয়ই পারিবারিক সম্পর্কের দৃষ্টিতে উচ্চারিত হয়নি, কেননা রাজনৈতিক মিত্রলাভের ক্ষেত্রেই তাঁদের এই সমগোত্রীয়তা আসে। কিন্তু বৈবাহিক শ্বশুর হিসেবে দ্রুপদ পাণ্ডবদের রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি, তিনি সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছেন কৃষ্ণের ওপর। লক্ষণীয়, এতক্ষণ গৌরবে কৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের কথাও বলছিলেন দ্রুপদ, কিন্তু শেষ বাক্যে তিনি বিদুরকে বললেন—দেখুন, নিজেদের পক্ষে কোনটা ভালো, সেটা স্বয়ং পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও যা বোঝেন না, কৃষ্ণ কিন্তু তার চেয়ে বেশি বোঝেন—যথৈষাং পুরুষব্যাঘ্রঃ শ্রেয়ো ধ্যায়তি কেশবঃ। অতএব কৃষ্ণ যেভাবে বলবেন সেইভাবেই চলবেন পাণ্ডবরা। কৃষ্ণ কিন্তু পাণ্ডব-সহায় হিসেবে ভীষণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন এই সময়ে। বিবাহিত পাণ্ডবদের নিয়ে দ্রৌপদী-কুন্তীর সঙ্গে তিনি নিজে এসেছেন হস্তিনাপুরে এবং থেকে গেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজধানী-প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত।

দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ের খবর হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে আলোড়ন তুলল। ধৃতরাষ্ট্র বেশ ভেঙে পড়লেন এবং পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাবার আগে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—তুমি একবার কৌশলে এঁদের রাজ্যের বাইরে পাঠাও, তখন যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রী-অমাত্যদের অর্থ আর মান দিয়ে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব। ওরা আমার হয়েই কাজ করবে—ধ্রুবমস্মৎসহায়াস্তে...অর্থমানেন পূজিতাঃ। এই দুর্যোধনের মানসিকতা তো দু'দিনে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। ফলে দ্রৌপদী-বিবাহের পরে পাণ্ডবরা যে সহায় লাভ করলেন, সেই জোট ভাঙার জন্য দুর্যোধনের বিভ্রান্ত বিকল্প ছিল তিন-চাররকম। একবার তিনি বলছেন-গুপ্তচর দিয়ে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেব, একবার বলছেন—গুন্ডা লাগিয়ে ভীমকে গুমখুন করব, আর একবার বলছেন—এমন এমন সব সেক্‌সি সুন্দরী মেয়ে পাঠাব যারা এক একজন পাণ্ডবকে পাগল করে দেবে—অথবা দর্শনীয়াভিঃ প্রমদাভি র্বিলোভ্যতাম্—তাতে কৃষ্ণা দ্রৌপদীও যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তেমনই পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন দ্রুপদ।

এইসব অরাজনৈতিক কূট-কৌশল, যা কণিক-নীতির একাংশের মধ্যে পড়ে, এগুলি শকুনি-দুঃশাসন বা ধৃতরাষ্ট্রেরও ভালো লাগতে পারে, কিন্তু মহাবীর কর্ণ এই ভাবনাগুলি কোনও কালেই পছন্দ করেননি। তিনি এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রার কথা বলেছেন এবং যেটা ভয় দেখিয়েছেন, সেটা কিন্তু পাঞ্চাল দ্রুপদ এবং যাদব কৃষ্ণের হঠাৎই পাণ্ডব-সহায়

হিসেবে প্রকট হয়ে ওঠা নিয়ে। অনেক বলার শেষে কর্ণ সিদ্ধান্ত দিলেন—যতক্ষণ না পাঞ্চালরা রথ-অশ্ব-পদাতিক ভালোভাবে গুছিয়ে নিচ্ছে এবং আমরা যেহেতু গুছিয়ে রয়েছি বলেই ওদের থেকে ভালো জায়গায় আছি, তার মধ্যেই তুমি তোমার বিক্রম দেখিয়ে দাও। যতক্ষণ না পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ভাই-বন্ধু-ছেলেদের নিয়ে যুদ্ধের উদ্যম প্রকাশ করছেন এবং একবার যদি বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ যাবদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য পাঞ্চালদের সঙ্গে যোগ দেন—আমি বলব তার আগেই তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো পাণ্ডব-পাঞ্চালদের ওপর—যাবন্নায়াতি বার্ষ্ণেয়ঃ কর্ষন্ যাদববাহিনীম্।

কর্ণের কথায় আর কিছু না হোক, ধৃতরাষ্ট্র এটা বুঝলেন যে, উপযুক্ত সহায় লাভ করে পাণ্ডবরা এখন রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি শক্তিমান, বিশেষত দ্রুপদের প্রধান শত্রু দ্রোণাচার্যের আশ্রয়দাতা হিসেবে দ্রুপদ যে কোনও সময় কুরুদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত আছেন, তাছাড়া দ্রুপদও যেহেতু পাণ্ডবদের শক্তি-সহায়তা পাচ্ছেন, অতএব তাঁদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে যুদ্ধ করাটা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর কেউ অনুমোদন করবেন না। বরঞ্চ বাস্তবে দেখা গেল—কুরুসভার বুদ্ধিমান মন্ত্রীরা সকলেই ধৃতরাষ্টকে উলটো চাপ দিলেন পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য ভাগ করে দেবার জন্য—ক্ষেমঞ্চ যদি কর্তব্যং তেষাম্ অর্ধং প্রদীয়তাম্—এবং সত্যিই কিন্তু কুরুসভার মন্ত্রীদের চাপে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ একেবারেই পৃথক স্থানে নির্দিষ্ট করলেন। জায়গাটা প্রাথমিকভাবে খুব ভালো ছিল না, খানিকটা ঊষর জায়গা আর অধিকাংশই বন। যাই হোক, দুর্যোধন যেখানে আছেন, সেখান থেকে তো খানিক সরে থাকা যাচ্ছে, তাছাড়া রাষ্ট্রের সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ-রাজধানী, কোশ, দণ্ড, মিত্র—ইত্যাদি সপ্তাঙ্গ লক্ষণ একটি রাষ্ট্র পাণ্ডবদের হাতে আসছে, এটাই পাণ্ডবদের কাছে এক বিশাল রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিল। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা হলেন।

কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী সাজিয়ে নিতে সময় লাগল না পাণ্ডবদের এবং পরে খাণ্ডববন দাহ করার পর ময়দানবের সাহায্যে খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে উঠল শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে। যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়ে বসলেন তখন নারদ এলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়। নারদকে পরবর্তী মানুষেরা ঝগড়া লাগানোর মাধ্যম বলে চিহ্নিত করলেও মহাভারতে নারদ অন্যতম রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ এবং স্বয়ং কৌটিল্য 'পিশুন' বলে নারদের একটা বিকৃত নাম ব্যবহার করেছেন। 'পিশুন' মানে খল পুরুষ, যেখানে দোষ নেই সেখানে দোষ আবিষ্কার করাটা পিশুনের স্বভাব। নারদ যে এসে যুধিষ্ঠিরের খুব দোষ আবিষ্কার করেছেন, তা নয়, কিন্তু রাজ্য চালানোর ব্যাপারে নতুন রাজা হিসেবে কী কী বিশদ নীতি তিনি অবলম্বন করেছেন এবং প্রশাসনের প্রায় সব কটি ক্ষেত্রে তিনি সঠিক লোক নিয়োগ করেছেন কি না এবং সঠিক ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, সেসব প্রশ্ন করে নারদ অনেক বড় বড় রাজসভার বর্ণনা দিলেন, যেগুলি তিনি দেখে এসেছেন। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর শেষ উপদেশ ছিল রাজসূয় যজ্ঞ করার। কেননা ধৃতরাষ্ট্রের প্রদত্ত রাজ্যাংশে রাজ্যলাভ করে

একটা রাজা উপাধি লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু সঠিকভাবে তিনি রাজ্য হয়েছেন কি না, সেটা বোঝা যায় সর্বক্ষেত্রে বিশেষত পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজেদের বলবীর্য যাচাই করে নিয়ে।

হয়তো কৌটিল্য এই অবস্থাটারই নাম দিয়েছেন 'বিজিগীষু' মহাভারতের কবি যা পারিভাষিকতায় বলেননি, বরঞ্চ বেদ-ব্রাহ্মণ যা ধর্মের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছিল—রাজসূয় যজ্ঞ করলে রাজা হওয়া যায়—রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি—সেটাই নারদ উপদেশ করেছেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু কৌটিল্যের 'বিজিগীষু'—অবস্থাটা আমরা যেহেতু জানি, অর্থাৎ 'বিজিগীষু'র দুই পাশে এবং সামনে-পিছনে যে রাজমণ্ডল, সেখানে কার সঙ্গে সন্ধি করতে হবে, কার সঙ্গে বিবাদে যেতে হবে, অথবা কার কার ওপরে আধিপত্য স্থাপন করা যায়—এগুলি যেহেতু কৌটিলীয় বিজিগীষুর সার্বক্ষণিক চিন্তার মধ্যে পড়ে, তাই মহাভারতীয় বুদ্ধিতে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বলাটা বিজিগীষু রাজার স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পর্যায় বলেই আমরা মনে করি।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির যে ধরনের মানুষ তাতে পরম্পরাপ্রাপ্ত বৈদিক ভাবনায় রাজসূয় যজ্ঞ করার একটা সংকল্পভাবনা করলেও সেটা যে অত সহজ নয় এবং এর পিছনে যে একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে, এটা তিনি বুঝেছিলেন। সেটা বোঝা মাত্রেই তিনি দ্বারকায় দূত পাঠালেন কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার জন্য। কৃষ্ণ এলেন এবং অত্যন্ত বাগ্মী পুরুষ যেমন অপছন্দ হলেও প্রথমে উলটো দিকের প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে মেনে নিয়েও পরে তাঁর দোষগুণ দেখাতে আরম্ভ করেন, কৃষ্ণ ঠিক তাই করতে আরম্ভ করলেন। আসলে যুধিষ্ঠির নিজেই এটা চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তেই তিনি আন্তরিকভাবে বলেছিলেন—দেখ কৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজন-পরিজনেরা, আর বন্ধুরা তো বটেই, সবাই মিলে আমাকে বেশ রাজসূয় যজ্ঞ করার উপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু আমি জানি—কিছু লোক আছে, তারা আমাকে এতই ভালোবাসে যে, আমি যেটা করতে চাইব সেটাই তারা বলবে—বাঃ! খুব ভালো হচ্ছে, কোনও অসুবিধে হবে না তোমার। আবার কিছু লোক আছে স্বার্থপর, তারা আমাকে তুষ্ট করার জন্যই আমার সব কাজ, সব আরম্ভই ভালো-ভালো বলে যাবে। আবার অনেকে আছে, যে কাজটা করলে তাদের নিজেদের সুবিধে হবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সেই কাজটাই তারা আমার প্রশংসা করে করতে বলবে—প্রিয়মেব পরীপ্সন্তে কেচিদাত্মনি যদ্ধিতম্।

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এর মধ্যেই যুধিষ্ঠির আশপাশের মানুষজন, বিশেষত রাজোপজীবী মানুষজনকে চিনে ফেলেছেন বেশ ভালো করেই। তিনি এটাও বুঝেছেন যে, নিজের স্বার্থহেতুগুলি অতিক্রম করে রাষ্ট্র বা রাজার হিতৈষিণী চিন্তা করতে গেলে বস্তুগত বা বিষয়গত হেতুগুলিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং এটা কৃষ্ণই একমাত্র করতে পারেন—ত্বং তু হেতূনতিক্রম্য কামক্রোধৌ ব্যুদস্য চ। যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক শক্তির কথা তিনি জানেন এবং নিজের অভিজ্ঞতায় অন্যান্য সব রাষ্ট্রের বলাবলও তিনি জানেন। অতএব এই অবস্থায় যুক্তি-তর্ক-আন্বীক্ষিকীর মাধ্যমে বলতে

পারেন কোন কাজটা এখন 'পলিসি' হিসেবে ঠিক হবে, আর কোনটা 'ইম্‌পলিসি'।

কৃষ্ণ বললেন যুধিষ্ঠিরকে—মহারাজ। রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য যে শক্তি এবং গুণের প্রয়োজন হয়, তা সবই তোমার আছে। রাজসূয় তুমি করতেই পার। কিন্তু একটা ভাবনা তোমায় ভাবতেই হবে। এই ভারতবর্ষে বড় বড় বংশে জন্মানো যত রাজা আছেন তাঁরা এবং আরও যত সব ক্ষত্রিয় রাজা আছেন, তাঁরা সবাই একটি মানুষের চারপাশে মণ্ডলাকারে ঘুরছেন, সেই মানুষটি হলেন মগধরাজ জরাসন্ধ—রাজানঃ শ্রেণীবদ্ধাশ্চ যে চান্যে ক্ষত্রিয়া ডুবি। এখানে শ্রেণিবদ্ধ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ ধান-মাড়াই করা বলদের উদাহরণ দিয়েছেন। ধান-ভানার কল চালু হবার আগে গ্রামে-গঞ্জে বড় বড় উঠোনে শক্ত খুঁটি পুঁতে বিভিন্ন দূরত্বে কয়েকটি বলদের গলায় দড়ি বেঁধেই তাদের দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধান-মাড়াই করা হত। দড়ির বাঁধন ব্যাপারটা যদি মহারাজ জরাসন্ধের আজ্ঞা-অনুজ্ঞার শাসন-শৃঙ্খল হয়, তবে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা জরাসন্ধের মতো রাজস্তম্ভে রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের মতো চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—শ্রেণীবৃদ্ধাঃ তস্ত্যা দাম্না বলীবর্দা ইব আজ্ঞয়া বদ্ধাঃ। বস্তুত কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যে রাজমণ্ডলের উল্লেখ করেছেন, প্রতাপশালী রাজা হতে গেলে সামনে-পিছনে এবং দুই পাশে যে রাজাদের শত্রুতা এবং মিত্রতা খেয়াল করে চলতে হয় বিজিগীষু রাজাকে, কৃষ্ণ বলছেন—সেই মণ্ডলীকৃত রাজারা সকলেই এখন জরাসন্ধের আজ্ঞায় চলেন। রাজসূয়োন্মুখ যুধিষ্ঠিরের কাছে কৃষ্ণ প্রথমেই যে চিত্রটা তুলে ধরলেন, সেটা হল—সমস্ত রাজমণ্ডলের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মগধরাজ জরাসন্ধ এবং তিনি আপন শক্তিতে সমস্ত রাজাকে পর্যুদস্ত করেই সবার মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন—স্থিতো মূর্ধ্নি নরেন্দ্রাণাম্‌ ওজসাক্রম্য সর্বশঃ।

জরাসন্ধের প্রতিপত্তি কতটা, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণ নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যাতে তৎকালীন রাজনীতির প্রত্যক্ষটা যুধিষ্ঠিরের চোখের সামনে চলে আসে। একই সঙ্গে তিনি নিজের জীবনের এবং সেই সূত্রে খোদ মহাভারতেরও একটা 'ফ্ল্যাশব্যাক্‌' তৈরি করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—এই লোকটার জন্য আমাদের মথুরা-জন্মস্থান ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছে এবং আমাদের মতো যুদ্ধশ্রেষ্ঠ মানুষদের পরাজিত করেই জরাসন্ধ এখন মগধ এবং দ্বারকার মাঝামাঝি জায়গাটার ওপর নিজের আধিপত্য কায়েম করেছে—সো'বনীং মধ্যমাং ভুক্ত্বা মিথো ভেদমমন্যত—তাতে আমাদের সঙ্গে যেমন তাঁর চিরশত্রুতা হয়ে গেছে, তেমনই এটাও তো মানতে হবে যে, একজন, যিনি সকলকেই নিজের ক্ষমতায় দাবিয়ে রেখেছেন, তিনিই তো প্রকৃত প্রভু—প্রভু র্যস্তু পরো রাজা যস্মিন্নেকবশে জগৎ—আর এটাও পরিষ্কার জেনো যে, এই যে বিরাট সাম্রাজ্য নিজের দখলে রেখেছেন জরাসন্ধ, সেটা কিন্তু কোনও মৌখিকতা নয়, দুনিয়ার যত রাজা তাঁকে যে এত খাতির করে চলেন, সেটাও কিন্তু এমনি-এমনিই হয়নি, এর জন্য রাজনীতির সমস্ত কৌশল

সার্বিকভাবে প্রয়োগ করেই তিনি সম্রাট হয়ে বসে আছেন—স সাম্রাজ্যং মহারাজ প্রাপ্তো ভবতি যোগতঃ।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, তোমাকেও সেই রাজনৈতিক উপায় প্রয়োগের মাধ্যমেই সার্থক সম্রাট হয়ে উঠতে হবে। কৃষ্ণ অবশ্য এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে, যাগ-যজ্ঞ-যুদ্ধ যা কিছুই করো, জরাসন্ধকে শেষ না করে তুমি কোনও দিনও সঠিক রাজা হতে পারবে না। এই সহজ সত্যটাকে বোঝানোর জন্য কৃষ্ণ কতকগুলি উদাহরণ দিলেন, যেগুলি হয়তো ইতিহাসের চেষ্টায় প্রমাণ করা যাবে, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে জরাসন্ধের অবস্থান কতটা শক্তিশালী, সেটা কৃষ্ণের বক্তব্য থেকে খুব ভালো বোঝা যায়। অন্য কোনও অহংমন্য মানুষ হলে তিনি জরাসন্ধের বিরুদ্ধে আপন গৌরবের কথাই বেশি বলতেন। কিন্তু বুদ্ধিমান কৃষ্ণ প্রখর বাস্তববাদী বলেই জরাসন্ধের ক্ষমতার কথা সগৌরবে ব্যাখ্যা করছেন। মহাভারতের কালের অনেক পরে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এক জায়গায় বলেছেন—কোনও রাজার সামরিক শক্তি এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি যদি বেশি থাকে, তাহলে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মিত্রসংগ্রহের ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়, রাজনৈতিক বন্ধু জোটার জন্য তাকে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না, বরঞ্চ তাঁর বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য শত্রু-মিত্র সকলেই প্রায় ব্যগ্র থাকে। কৌটিল্য বুঝিয়েছেন—সামরিক শক্তি যাঁর বেশি, যে রাজা 'মিলিটারিজম্'-এর মাধ্যমে নিজেকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছেন, তাঁর মিত্ররাষ্ট্রীয় বন্ধুজনেরা তো তাঁর পাশে থাকবেই, এমনকী শত্রুরাও তাঁর পাশে থাকবে—দণ্ডবতো মিত্রং মিত্রভাবে তিষ্ঠতি অমিত্রো বা মিত্রভাবে।

অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি এবং 'মিলিটারিজম্' ক্ষমতা থাকলে বন্ধু কতটা জোটে, তা আমরা পূর্বকালের রাশিয়া এবং এখনও আমেরিকা-চীনকে দেখে বুঝতে পারি। কৃষ্ণ ঠিক এটাই জরাসন্ধ সম্পর্কে বলছেন এবং বলতে গিয়ে তাঁর মিত্রগোষ্ঠীর পরিচয় দিচ্ছেন একে-একে। কৃষ্ণ প্রথমেই বলছেন শিশুপালের কথা এবং তার কারণও আছে। কৃষ্ণ বলছেন—শিশুপাল জরাসন্ধকে আশ্রয় করে তাঁর সেনাপতির কাজ করেন সমস্ত যুদ্ধে—রাজন্ সেনাপতি র্জাতঃ শিশুপালঃ প্রতাপবান্। কোথায় সেই মগধ দেশ, বিহারের কতগুলি পাহাড়ের মধ্যে তার রাজধানী, আর কোথায় চেদি-দেশ-মধ্যপ্রদেশের বেত্রবতী-শুক্তিমতী নদীর ঠিক ওপরে সেই শোভন-সুন্দর অঞ্চল। এত দূরে থেকেও জরাসন্ধের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে তিনি সেনাপতিত্ব করেন জরাসন্ধের প্রতি শ্রদ্ধায়। কৃষ্ণের দুঃখটা অবশ্য অন্য জায়গায়। যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এখন কথা বলছেন কৃষ্ণ, বাবা বসুদেবের বোন পৃথা-কুন্তীর ছেলে বলে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে সম্পর্ক, শিশুপালের সঙ্গেও কিন্তু কৃষ্ণের একই সম্পর্ক। কেননা বসুদেবের আরেক বোন শ্রুতশ্রবার ছেলে কিন্তু এই শিশুপাল। ফলে পাণ্ডবরা যে ঘনিষ্ঠতায় কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই, শিশুপালও সেই অর্থে, সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেই

শিশুপাল কিন্তু জরাসন্ধের আশ্রিত ব্যক্তি এবং জরাসন্ধ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

দ্বিতীয় যাঁর কথা বললেন কৃষ্ণ, তিনিও কিন্তু কৃষ্ণের আর এক পিসতুতো ভাই দন্তবক্র; তিনি করূষ-দেশের অধিপতি বৃদ্ধশর্মার ছেলে। বৃদ্ধশর্মা কৃষ্ণপিতা বসুদেবের অন্য আর এক বোন পৃথুকীর্তিকে বিয়ে করেছিলেন। করূষ-দেশের ভৌগোলিক অবস্থান মগধের আরও কাছে, বিহারের মধ্যে দিয়ে যাওয়া শোন নদী করূষ-দেশকেও ছুঁয়ে যায়। সেই করূষাধিপতি দন্তবক্র কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত ভাষায় শুধুই 'বক্র' শিশুপালের মতোই জরাসন্ধের অনুগত হয়ে আছেন। লক্ষণীয়, পুরাণকারেরা শত্রুভাবে ভগবানের ভজনা করার জন্য তিনটি জন্মের কথা বলতে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণের সঙ্গে দ্বাপর যুগে দন্তবক্র-শিশুপালেব যুগ্মভাব উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা বলব—দন্তবক্র-শিশুপাল দু'জনেই কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই বলেই একটা যুগ্মভাব তৈরি হয়েছে, তাই পুরাণকারেরা নারায়ণ-স্বরূপ কৃষ্ণের শত্রুপক্ষে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু অথবা রাবণ-কুম্ভকর্ণের পরম্পরায় দন্তবক্র-শিশুপালকে টেনে এনেছেন। কিন্তু লৌকিকভাবে ইতিহাস বিচার করলে মহাভারতের প্রমাণটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষ্ণ এটাই গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আপন পিসতুতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও এঁরা দুজন জরাসন্ধকে আশ্রয় করে কৃষ্ণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন।

কৃষ্ণ আরও কিছু রাজ-রাজড়ার নাম করেছেন, যাঁদের প্রসঙ্গে আমরা পরে আসতে চাই। কেননা এই বক্তৃতার সর্বশেষে এসেছে কৃষ্ণের নিজের কথা এবং এইখানে কৃষ্ণের পূর্বজীবনের বিরাট 'স্ট্রাগল'টুকু রাজনৈতিক অনুলেপনে ধরা পড়ে। সামান্যাকারে হলেও সে-কথাটা আমাদের বলতে হবে এইজন্য যে, মহাভারতের রাজনীতিতে কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণের নিজস্ব রাজনৈতিক কার্যকলাপ—যা কৃষ্ণের পূর্বজীবনের ঘটনা হলেও কৌরব-পাণ্ডবের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সেগুলি রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। এটা প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির প্রথম পাঠ যে, রাজা যে রাষ্ট্রে রাজত্ব করছেন, সেই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র এবং প্রশাসনের প্রকৃতি তাঁকে আগে বুঝতে হবে। কৃষ্ণ যে অঞ্চলে রাজত্বের অংশভূত ছিলেন, সেই মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে কিন্তু তৎকালীন অধিকাংশের মতো রাজতন্ত্র ছিল না। সেখানে কুলতন্ত্রের শাসন চলত, কৌটিল্য যাকে বলেছেন সংঘরাষ্ট্র। অর্থাৎ আমরা ইংরেজিতে যে প্রশাসনিক প্রকৃতিকে Corporation বলি, কৃষ্ণজন্মস্থান মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে একটা প্রাচীন বংশের প্রধান প্রধান পুরুষেরা সকলে মিলে রাজত্ব চালাত। সবচেয়ে বড় কথা, সংঘরাষ্ট্রের উদাহবণ দিতে গিয়ে কৌটিল্য যে বংশনাম উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ-বলরাম সেই বৃষ্ণিবংশেরই জাতক।

ইতিহাস-ভূগোলের দিক থেকে এ-কথা বলে নেওয়া ভালো যে, কৃষ্ণের পিতামহ আর্যক শূর একসময় বুঝি এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে, তাঁর নামেই মথুরা অঞ্চলটাকে চিহ্নিত করেছেন মেগাস্থানিস। তিনি বলেছেন শূরসেনাই। আর অন্যদিকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ভৌজ্য-শাসনতন্ত্রের উল্লেখ মেলায় এবং ভোজ্য

শাসনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বহু পূর্বপুরুষ সাত্বতের নাম থাকায় আমরা প্রায় নিশ্চিন্ত যে ভৌজ্যশাসনতন্ত্র রাজতন্ত্রের শাসন নয়। বিশেষত সত্বান্ বা সত্বতের পুত্রদের মধ্যেই অন্ধক-বৃষ্ণিদের কুলনামের উল্লেখ থাকায় এবং সংঘরাষ্ট্রের প্রসঙ্গেই যদুবৃষ্ণিদের রাষ্ট্রকে সংঘরাষ্ট্র বলায় আমরা একেবারেই নিশ্চিত যে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে সংঘশাসন চলত, অন্তত তাঁরা রাজতন্ত্রী নন। তবে কিনা একটা সংঘরাষ্ট্রে কুলশাসন চালাতে গেলেও কুলপ্রধানদের অন্যতম পুরুষদের মধ্যে একজনকে প্রধানতম বলে স্বীকার করে নিতেই হয়। সেই প্রধানতম ব্যক্তি অনেক সময় রাজা উপাধি ধারণ করতেন। হয়তো তাই মহাভারতে, হরিবংশে কংসের পিতা উগ্রসেনকে আমরা রাজা শব্দে সম্বোধিত হতে দেখেছি; কিন্তু কৌটিল্য স্বয়ং জানিয়েছেন যে, এই রাজা শব্দটা একটা উপাধিমাত্র, সেই কারণেই সংঘরাষ্ট্রের প্রধানতম পুরুষটি আসলে রাজা নন, কৌটিল্যের ভাষায় 'রাজশব্দোপজীবী', অর্থাৎ 'রাজা' শব্দটাকে যিনি উপজীব্য করে প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন মাত্র, তিনি সে অর্থে রাজা নন!

মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে এ-কথা পরিষ্কার বলা যায় যে সত্বান্ (সত্বৎ) বলে পৌরাণিক যে মূল পুরুষ ছিলেন, তাঁর ছেলেরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত বিখ্যাত। এই ছেলেরা হলেন অন্ধক, বৃষ্ণি, মহাভোজ ইত্যাদি—অন্ধক-দেবাবৃধ-মহাভোজ-বৃষ্ণিসংজ্ঞাঃ সাত্বতস্য পুত্রাঃ বভূবুঃ। কৃষ্ণের যাঁরা সমসাময়িক এবং তাঁর মতোই যাঁরা মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে কুলপ্রধান, তাঁদের মধ্যে অক্রূর, উগ্রসেন, কংস, কৃতবর্মা, সাত্যকি—এঁরা সকলেই পূর্বতন, অন্ধক-বৃষ্ণিদের ধারা-উপধারায় জন্মেছেন এবং সবাই মিলে 'অলিগার্কিক্যাল' ভাবনায় মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের প্রশাসন চালাতেন, যদিও কংসের পিতা উগ্রসেন রাজোপাধি ধারণ করে প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। মনে রাখা দরকার, আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠতর গণতন্ত্রের মধ্যেও যেমন একটা অভিজাত কতিপয়ের শাসন-ইঙ্গিত থাকে, সেসব নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন রবার্ট মিশেল, মস্কা বা পেরেটোর মতো ইতালিয়ান সোশিওলজিস্টরা, তেমনই আমাদের মনে হয় এটাই স্বাভাবিক যে অলিগার্কিক্যাল বা কতিপয় কুলপ্রধানদের শাসনক্ষেত্রেও অতি-উচ্চাশাসম্পন্ন একক ব্যক্তির দিকে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত মথুরা-শূরসেনের রাজনীতিতে এটা ঘটেছে, এবং তা কৃষ্ণের মহাভারতীয় যুক্তি থেকেই বোঝা যায়।

কৃষ্ণ তখনও জন্মাননি, মথুরা-শূরসেনে তখন কুলতন্ত্রের শাসন চলছে এবং প্রশাসনিক রাজপদে অভিষিক্ত আছেন উগ্রসেন। কৃষ্ণপিতা বসুদেব কুলপ্রধানদের অন্যতম, তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিও যথেষ্ট এবং উগ্রসেনের ছেলে কংসের প্রায় সমবয়সি। উগ্রসেন বেঁচে থাকতেই কংস ক্ষমতালিপ্সু হয়ে পড়েন এবং তাঁর লিপ্সা আরও বেড়ে যায় মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হওয়ায়। জরাসন্ধ নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্যই কংসকে মদত দিতে থাকেন এবং তাঁকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখার জন্য নিজের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তির সঙ্গে কংসের বিয়ে দেন। কংস

প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকেন এবং তাতে এতকালের কুলপ্রধানদের স্বীয় মতাদর্শের ভাবনায় চলাটা ব্যাহত হতে থাকে। ইতোমধ্যে জরাসন্ধের উপায়-কৌশল এবং 'মিলিটারিজম'-এর মদতে নিজ পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন কংস। একথা হরিবংশের জবান থেকে পরিষ্কার যে, কংস মথুরার অন্যান্য কুলপ্রধান যাদব-বৃষ্ণিদের সম্মিলিত ইচ্ছার তোয়াক্কা না করেই জরাসন্ধের মদতে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন—সমাশ্রিত্য জরাসন্ধম্ অনাশ্রিত্য চ যাদবন্।

কংসের হাতে ক্ষমতা এককভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মথুরায় যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক কুলপ্রধানদের ক্ষমতা ক্ষীণ হতে থাকে এবং হয়তো কংসনীতির অন্যতম প্রধান সমালোচক হিসেবে কৃষ্ণপিতা বসুদেব কংসের বিষ নজরে পড়ে যান এবং তার ফলে তাঁর স্ত্রীপুত্রের জীবনও সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমরা বেশি বিস্তারে যাব না, কেননা এই বিষয়ে বর্তমান লেখক অন্যত্র আলোচনা করেছে। কিন্তু এটা জানাতেই হবে যে, পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মথুরার কুলপ্রধানেরা নিজের নিজের মতো করেই শক্তি সংগ্রহ করছিলেন। তার মধ্যে কৃষ্ণপিতা বসুদেব কৃষ্ণজননী দেবকীকে বিয়ে করার আগে হস্তিনাপুরের তদানীন্তন রাজা ভীষ্মপিতা শান্তনুর ভাই বাহ্লীকের পাঁচ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন হয়তো রাজনৈতিক কারণেই। বাহ্লীকের বড় মেয়ে রোহিণী, যাঁর গর্ভে বলরামের জন্ম। আর উগ্রসেনের ভাই কিংবা দাদা দেবকের সাত মেয়ে, যাঁদের সবার বড় হলেন দেবকী, তাঁদের বসুদেব বিয়ে করেছিলেন উগ্রসেন বা দেবকের হাত শক্ত করার জন্য। কংসের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় বসুদেব অবশ্য তেমনভাবে নিজের শক্তি দেখাতে পারেননি এমনকী তাঁর পুত্রদের পর্যন্ত মানুষ করতে হয়েছে বিনা পিতৃপরিচয়ে এবং সেটাও মথুরায় নয়, ব্রজপুর বৃন্দাবনে, যেটা কংসের গো-বর্ধন বা কেট্‌ল-ব্রিডিং এবং পশুপালনের জায়গা ছিল।

রাজসূয়ের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিজের পূর্ব-জীনকাহিনি শুনিয়ে বলছেন—আমাদের মথুরায় কংস যখন জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তিকে বিয়ে করল, তারপর থেকেই শ্বশুর জরাসন্ধের জোর দেখিয়ে সে তার নিজের জ্ঞাতিগুষ্ঠি অর্থাৎ আমাদের সকলকে উৎপীড়ন করে—বলেন তেন স্বজ্ঞাতীন্ অভিভূয় বৃথামতিঃ—সকলের মাথায় উঠে বসল। কৃষ্ণের মুখে এই জায়গায় কংসের সম্বন্ধে যে শব্দটা বসানো হয়েছে সেটা একেবারে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের পারিভাষিক ভাষা। শব্দটা হল 'অপনয়', অর্থাৎ দণ্ডনীতি বা রাজনীতির ক্ষেত্রে এটাকে বলে 'ইম্‌পলিসি'। একটি কুলপ্রধানদের পরিচালিত অলিগার্কিক্যাল প্রশাসনে হঠাৎ অন্য সকলকে উৎপীড়ন করে, অন্য এক মহারাজের জোরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করাকে কৃষ্ণ 'অপনয়' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন—শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তঃ য তস্যাসীদ্ অতীবাপনয়ো মহান্। আমরা ধরেই নিতে পারি—এই উৎপীড়ন পর্বের মধ্যেই ব্রজভূমিতে বলরাম এবং কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, এবং তাঁরা বড়ও হয়েছেন সেখানে। অবশেষে উৎপীড়ন যখন চরমে উঠেছে, তখন অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজ-যাদবদের বৃদ্ধ পুরুষেরা, যাঁরা

পূর্বকালে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতেন, তাদের প্রতি কংসের উৎপীড়ন-অত্যাচার চরমে উঠল—ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈস্তু পীজমানৈ র্দুরাত্মনা।

ঠিক এই অবস্থায় মথুরার অভিজ্ঞ রাজন্য পুরুষেরা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছেন যাতে জ্ঞাতিগুষ্ঠির অন্যান্য কুলপ্রধান কোনওভাবে শাস্তি পান, ফিরে পান নিরুপদ্রবে বাঁচার অধিকার। কৃষ্ণ বলেছেন—তাঁরা সব আমাদের কাছে এসেছিলেন—জ্ঞাতিত্রানম্ অভীপ্সন্তিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা। কৃষ্ণ তাঁদের বিপন্নতার কথা শুনেছেন এবং সেটা তাঁর বুঝতেও অসুবিধে হয়নি, কেননা তাঁর নিজের পিতাই সেই বিপন্নদের একজন। কৃষ্ণ সবকিছু বিস্তারিতভাবে মহাভারতে রাজসূয়ের প্রাক্‌কালে যুধিষ্ঠিরকে জানাননি, কেননা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জরাসন্ধের সঙ্গে যা জড়িত কৃষ্ণ তাই শুধু জানিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। ফলে নিজের কথা বলতে গেলেও খুব সংক্ষেপে বলেছেন আপন কৃত কর্মকাণ্ডের কথা। কিন্তু একটু ভেঙে না বললে সবটাই বেশ বোকা-বোকা শোনাবে বলে, বিশেষত মহাভারতের বাইরে যারা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ পড়েননি, তা তাঁদের অনুক্রম বুঝতে অসুবিধে হবে, তাঁদের জন্য মহাভারতের পরবর্তী শ্লোকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণ বলেছেন—আমার জ্ঞাতিগুষ্ঠির লোকেরা আমার কাছে ত্রাণ চাইতে এলে আমি প্রথম যে কাজটা করলাম সেটা হল—আমি আর বলরাম মিলে আহুকের মেয়ে সুতনুর সঙ্গে অক্রূরের বিয়ে দিয়ে দিলাম—দত্ত্বাক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা। এই অক্রূর এবং সুতনু দু'জনের পরিচয়ই আপনাদের জানা নেই, কিন্তু এখানে এই বিয়ের মধ্যে রাজনীতি জড়িয়ে আছে বলেই সূত্রাকারে জানাই, অক্রূর হলেন বৃষ্ণি-বংশের জাতক আর কৃষ্ণ হলেন বৃষ্ণি-অন্ধকদের বৈমাত্রেয় ভাই দেবমীঢ়ুষের বংশজ শূরসেনের নাতি, আর কংস হলেন অন্ধক-বংশের অধস্তন পুরুষ। কংস অত্যাচারী হবার আগে এঁদের জ্ঞাতিগুষ্ঠি সকলেই একসঙ্গে প্রশাসন চালাতেন। কিন্তু কংস যখন ক্ষমতাবৃদ্ধি করে ফেললেন, তখন তাঁর মাতা-পিতা এবং অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজদের অন্যান্য কুলপ্রধান কংসের পাশ থেকে সরে গেছেন, সে-কথা কংস নিজেই স্বীকার করেছেন—উভাভ্যামপি বিদ্বিষ্টো বান্ধবৈশ্চ বিশেষতঃ—কিন্তু সবাই সরে গেলেও অক্রূর বোধহয় বহুকাল কংসের কাছের লোক ছিলেন। লক্ষ করে দেখবেন, কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে এসে ঘাতক দিয়ে মারার পরিকল্পনা করে কংস কিন্তু অক্রূরকেই বিশ্বস্ত ভেবে পাঠিয়েছিলেন মথুরায়।

কৃষ্ণ এই মানুষটাকে চিনতেন না, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অক্রূরকে স্বপক্ষে আনতে গেলে যে উপায়গুলি অবলম্বন করার দরকার ছিল, তার প্রথমটা ছিল অক্রূরের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। তিনি আহুকের মেয়ে সুতনুর সঙ্গে অক্রূরের বিয়ে দিয়ে দিলেন। আহুক বলতে যাঁকে বোঝায় তিনি কিন্তু কংসপিতা উগ্রসেনেরও বাবা। আর উগ্রসেনকে আমরা বৃদ্ধ হিসেবেই প্রথম থেকে চিনেছি। অতএব অক্রূর উগ্রসেনের এক বৃদ্ধা ভগিনীকে বিয়ে করছেন, এটা হতেই পারে না। আর সেকালের

দিনে পৌরাণিক 'কনভেনশন'ই হল—বিখ্যাত মানুষের নামে অধস্তন পুরুষদেরও পরিচয় দেওয়া হত। রামায়ণের রামচন্দ্রকে কতবার তাঁর পূর্বজ প্রপিতামহ রঘু নামে ডাকা হয়েছে, তার ঠিক নেই। অতএব এই আহুক আসলে উগ্রসেন এবং তাঁকে যে আহুক নামে সম্বোধন করা হত, তার অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীধর স্বামীর মতো প্রাচীন টীকাকার যেমন ভাগবত পুরাণের এক জায়গায় প্রসঙ্গ অনুসারে আহুককে উগ্রসেন বলে চিনিয়েছেন, তেমনই হরিবংশ পুরাণে সোজাসুজিই অক্রূরের স্ত্রীকে একবার উগ্রসেনা আর একবার উগ্রসেনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা অনুমান করতে পারি উগ্রসেনের এই মেয়েটির ওপর অক্রূরের দুর্বলতা ছিল এবং অন্ধক-যাদব-ভোজদের প্রধান পুরুষেরা যখন কৃষ্ণের কাছে এসে কংসের হাত থেকে মুক্তি চাইলেন, তখন তাঁদের অন্যতম সংঘমুখ্য অক্রূরকেও কংস থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বপক্ষে নিয়ে আসার জন্য কৃষ্ণ এই বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতে সুফল নিশ্চয় এতটাই হয়েছিল যে, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে নিজের পূর্বাবস্থা বোঝানোর প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে কৃষ্ণ এই প্রসঙ্গ তুলেছেন।

গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা অলিগার্কিক প্রশাসনে গোষ্ঠীপ্রধানেরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেলেও তাঁদের প্রভাব পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় না। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণের বুদ্ধি কৌশলের কথা জানানোর সময় বলেছিলেন—অন্ধক, যাদব এবং ভোজ গোষ্ঠীর সকলে একযোগে কংসকে ত্যাগ করেছিলেন—অন্ধকা যাদবা ভোজাঃ সমেতাঃ কংসমত্যজন্। অন্যদিকে কৃষ্ণ কিন্তু তাঁদেরই এককাট্টা করেছিলেন কংসের বিরুদ্ধে এবং এখানে শেষ লোকটা ছিলেন অক্রূর, যিনি কৃষ্ণ-বলরামকে ব্রজপুর থেকে মথুরা নিয়ে যাবার সময় ভরভর করে কংসের সমস্ত পরিকল্পনা কৃষ্ণের কাছে বলে দিয়েছিলেন। অতঃপর কংসকে মেরে ফেলতে কৃষ্ণের খুব একটা অসুবিধে হয়নি এবং তার জন্য কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় এসে বেশি রক্তক্ষয়ও করতে হয়নি। কৃষ্ণ কংসকে মেরে ফেলতে পেরেছিলেন প্রায় বিনা বাধায়।

কংস মারা যাবার পর ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকেরা একটা বড় অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন বটে, কিন্তু তাঁরা এবার আরও বড় আক্রমণের মুখে পড়ে গেলেন। কংসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই স্ত্রী বাপের বাড়িতে গিয়ে পিতা জরাসন্ধকে উত্তেজিত করলেন পতিহত্যাকারী কৃষ্ণকে চরম দণ্ড দেবার জন্য—কংসভার্যা জরাসন্ধং দুহিতা মাগধং নৃপম্। চোদয়েত্যেব রাজেন্দ্র—জরাসন্ধ সদলবলে যুদ্ধ করতে এলেন মথুরায়। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজ সকলে মিলে আমাদের আঠেরোটা কুল। আমি তাঁদের সবার সঙ্গে আলোচনায় বসলাম—মন্ত্রো'য়ং মন্ত্রিতো রাজন্ কুলৈরষ্টাদশাবরৈঃ। সেই সম্মিলিত সভায় এটা ঠিক হল যে, আমরা যদি তিনশো বছর ধরেও বহু অস্ত্র নিয়ে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করি তাহলেও আমরা পেরে উঠব না। তার মধ্যে হংস আর ডিম্ভক নামে দুটো ভয়ংকর লোক জরাসন্ধের সহায় আছে। যদি এই তিনটে লোক এক জায়গায় হয়, তাহলে আমরা শেষ হয়ে যাব।

হংস আর ডিম্ভক—এরা ঠিক কে ছিলেন, কোন দেশের রাজা ছিলেন, নাকি তাঁরা এমনই ভয়ংকর কোনও যুদ্ধবীর, যারা জরাসন্ধের দলে থেকে যুদ্ধ করেন, তার খুব বিশদ বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না, কিন্তু হরিবংশে তাদের কথা খানিকটা আছে। যাই হোক, মহাভারতে যতটুকু জানতে পারছি, তাতে আঠেরোবারের চেষ্টায় বলরাম তাঁকে পুরো মারতে না পারলেও প্রায় শয্যাশায়ী করে দেন। কিন্তু কৃষ্ণের যুক্তিতেই খবর রটিয়ে দেওয়া হল যে, হংস মারা গেছেন এবং এই খবর শুনে ডিম্ভক যমুনার জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন, কিছুদিন পর ডিম্ভকের মৃত্যুর খবর শুনে হংসও এসে যমুনার জলে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এই দুই যুদ্ধবীরের মৃত্যুর পরেও জরাসন্ধের শক্তি কিছু কমেনি। জরাসন্ধের মেয়েরা পিতার কাছে স্বামীর হত্যাকারী কৃষ্ণকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য বারবার বলতেই থাকল—পতিঘ্নং মে জহীতি পুনঃ পুনরন্দিমম্—এবং জরাসন্ধও বারবার মথুরা আক্রমণ করতে থাকলেন। কৃষ্ণ জানিয়েছেন—ঠিক এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাতি-গুষ্টি সকলকে বুঝিয়ে সমস্ত সম্পত্তি ভাগে ভাগে নিয়ে চলে গেলেন কুশস্থলী-দ্বারকায়। কৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে জানিয়েছেন—আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ছেলেপিলে, জ্ঞাতি-গুষ্টি, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে পালিয়ে গেছি দ্বারকায়—পলায়ামো ভয়াত্তস্য স্বসুতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার 'স্টেক'গুলো বোঝাতে গিয়ে প্রধানত জরাসন্ধের কথা বলছেন এবং জরাসন্ধের মতো শক্তির বিরুদ্ধে এত বছর ধরে লড়তে গিয়ে তাঁর সহায়-শক্তিকে কতটা নির্মূল করতে পেরেছেন কৃষ্ণ, সে হিসেবও তিনি দিচ্ছেন। কৃষ্ণ জানিয়েছেন তিনি হংস-ডিম্ভককে শেষ করতে পেরেছেন এ-কথা ঠিক, কিন্তু প্রাগজ্যোতিষপুর এবং তার প্রান্তিক দেশের রাজা নরকাসুর এবং মরুদৈত্যকে তিনি এখনও কিছু করতে পারেননি। জরাসন্ধের আর এক বড় সহায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যিনি কৃষ্ণের মতোই চক্রক্ষেপণ করতে পারেন বলে বাসুদেব উপাধি ধারণ করেছেন বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণ—আদত্তে সততং মোহাদ্ যঃ স চিহ্নঞ্চ মামকম্—সেই তাঁকেও কৃষ্ণ এখনও কিছু করতে পারেননি। এ ছাড়াও আরও অনেকে আছেন এবং তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন বিদর্ভের রাজা ভীষ্মক, যাঁর মেয়ে রুক্মিণীকে কৃষ্ণ বিয়ে করে বসে আছেন, অথচ শ্বশুর ভীষ্মক এখনও জরাসন্ধের পক্ষে—স ভক্তো মাগধং রাজা ভীষ্মকঃ পরবীরহা।

আসলে এইখানে মহাভারতে কৃষ্ণের নিজস্ব বক্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই বিবাহের মধ্যে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছে। কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর প্রাবাদিক আকর্ষণটা হয়তো এখানে প্রধান প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু কৃষ্ণ এই বিবাহের বাড়তি ফলটা ভেবেছিলেন তাঁর অনুকূলে ফলবে। কিন্তু সেটা ঘটেনি। কৃষ্ণ একটু অভিমান করেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—আরে ওই বিদর্ভের ভীষ্মক-রাজা, তিনি তো আমাদের এই ভোজ-কুলেরই আর এক শাখা, তাঁর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিমাণও অনেকটা, তিনি এতটাই বড় বীর যে, আশপাশে পাণ্ডাদেশ,

ক্রথকৈশিক-দেশ সব তিনি জয় করে বসে আছেন, তাঁর ভাইটাও মহাশক্তিশালী বীর, কিন্তু সেই এত বড় মানুষটাও জরাসন্ধের আনুগত্য করছেন—স ভক্তো মাগধং রাজা ভীষ্মকঃ পরবীরহা।

এত বড় বীর ভীষ্মক, অথচ তিনি জরাসন্ধের পক্ষে—কৃষ্ণের এই আক্ষেপের কোনও যুক্তি নেই, কেননা এ-রকম বীর আরও অনেক আছেন জরাসন্ধের পক্ষে। কৃষ্ণের আক্ষেপ হল—এই ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, বৈবাহিক পরমাত্মীয়, আমরা সব সময় তাঁর প্রিয় আচরণ করি এবং তাঁর কাছে নতও থাকি—প্রিয়াণ্যাচরতঃ প্রহ্বান্ সদা সম্বন্ধিনঃ সতঃ—সত্যি বলতে কী, কারণে-অকারণে আমরা তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই তিনি আমাদের পছন্দ করতে পারেন না, বরঞ্চ উলটে আমাদের সঙ্গে অপ্রিয় ব্যবহার করেন—ভজতো ন ভজত্যস্মান্ অপ্রিয়েষু ব্যবস্থিতঃ। আসলে ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীকে বিয়ে করে কৃষ্ণ ভেবেছিলেন—মেয়ের জন্য বৈবাহিক কারণেই তিনি কৃষ্ণের পক্ষে অনুকূল আচরণ করবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা হয়নি। কৃষ্ণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কেন ব্যর্থ হয়েছে কৃষ্ণ জানেন। কারণটা হল—এই মেয়ের ওপরে ভীষ্মকের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিবাহসভায় স্বয়ং জরাসন্ধ তাঁর অনুগত শিষ্য শিশুপালের জন্য রুক্মিণীকে বধূ হিসেবে মনোনীত করেন। ভীষ্মকের ছেলে রুক্মী জরাসন্ধের অন্ধ সমর্থক, তিনি তো কথাই দিয়েছেন, এমনকী একটু চাপে পড়ে হলেও ভীষ্মকও জরাসন্ধেরএই প্রস্তাব মেনে নিয়ে প্রায় কথা দিয়ে দিলেন শিশুপালের অনুকূলে—প্রায় বাগদত্তা রুক্মিণী।

এই অবস্থায় বিয়ের আসর ভেস্তে যায়, বিয়ে স্থগিত রেখে সুকৌশলে কৃষ্ণকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। শত্রুপক্ষের এই চেষ্টা ব্যর্থ হতেই কৃষ্ণ কিন্তু আর দেরি করেননি। রুক্মিণীর প্রেমভাবনাকে বহুমানন করে কৃষ্ণ তাঁর অনুগামী যাদব-বৃষ্ণিদের সহায়তায় রুক্মিণীকে বিয়ের আগের দিনই বিদর্ভ থেকে হরণ করে দ্বারকায় নিয়ে যান। বিবাহসভায় জরাসন্ধ-শিশুপালের এই অপমান ভীষ্মককে সইতে হয় এবং হয়তো এই ঘটনায় তিনি আরও ক্ষিপ্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণ ভেবেছিলেন—এই ক্ষোভ সাময়িকভাবে থাকবে, এবং কন্যার প্রতি স্নেহবশতই ভীষ্মকের কৃষ্ণ-বিরুদ্ধতা কমে আসবে এবং জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কৃষ্ণ এতদিনে বুঝেছেন—রাজনীতিতে ক্ষমতার মনস্তত্ত্ব এমনই এক বিচিত্র স্বভাব তৈরি করে, যেখানে স্নেহ, আত্মীয়-সম্বন্ধ, বৈবাহিকতা—কোনও কিছুরই দাম থাকে না। কৃষ্ণ সেটাই আপেক্ষ করেছেন—আমরা তাঁর প্রিয় হবার চেষ্টা করে সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ করি, কিন্তু তিনি আমাদের ওপর তুষ্ট হন না। অর্থাৎ এই বিবাহের রাজনৈতিক ফলাফলও জরাসন্ধের পক্ষে গেছে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চাইলেন—শিশুপাল-দন্তবক্র, মুরু, নরক, পৌণ্ড্রক-বাসুদেব এবং ভীষ্মক এদের সবাইকে নিয়ে জরাসন্ধ এখনও বহাল তবিয়তে আছেন এবং জরাসন্ধকে শেষ না করে নিলে রাজসূয় যজ্ঞের রাজনৈতিক ফলপ্রাপ্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে। একই সঙ্গে কৃষ্ণ এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রচুর

সেনাসৈন্য নিয়ে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে অভিযান করে শুধুই ব্যর্থতার মুখ দেখতে হবে, আবার জরাসন্ধকে বধ না করে কোনও রাজনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনাই আসে না—সমারম্ভো হি শক্যো'য়ং নানাথা কুরুপুঙ্গব।

যুধিষ্ঠির সদ্য রাজ্য পেয়েছেন, শত্রুতা বস্তুটা কী, তার যতটুকু কটু আস্বাদ, তা দুর্যোধনের কাছেই যতটা হোক পেয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তিনি যেমন শুনলেন, তাতে এক মুহূর্তে তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ করার সমস্ত ইচ্ছেটাই উবে গেল। তিনি ভীষণভাবে শান্তির পক্ষে সওয়াল করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন—আমি যদি রাজসূয়টা ঘটা করে আরম্ভও করি তবে শেষ করতে পারব না—আরম্ভো পরমো হ্যেষ ন প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ। কৃষ্ণ কিন্তু শান্তিকামী যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং বোঝাতে লাগলেন যে, জরাসন্ধের জন্য অন্যান্য ভদ্রলোক রাজাদের কী অবস্থা। কিন্তু বড় বড় কথার মধ্যে এটা কৃষ্ণ কৌশলে জানিয়ে রাখছেন যে, সোজাসুজি ক্ষত্রিয়ের মতো সম্মুখ যুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করা যাবে না এবং এই মর্যাদাময় যুদ্ধের প্রয়োজনও নেই, কেননা জরাসন্ধ নিজে এত অন্যায়, এত পাপ করে রেখেছেন যে, ক্ষত্রিয়োচিত সম্মুখ যুদ্ধের মর্যাদা তিনি 'ডিজার্ভ' করেন না, আর সবচেয়ে বড় কথা, সবাই মিলে চেষ্টা করেও সেটা আমরা পারিনি এবং পারবও না—ন চ স্ম মাগধং সর্বে প্রতিবাধেন সঙ্গতাঃ।

জরাসন্ধকে জয় করার ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে কৃষ্ণের প্রয়াসটাই বেশি। যুদ্ধ করে যেখানে জয়লাভ সম্ভব নয়, সেখানে ছয় উপায় খুঁজতেই হবে এবং সেটা যে যুদ্ধনীতির বাইরে নয়, সেটা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম অঙ্গ। মহাভারতে অবশ্য ক্ষত্রিয়োচিত সম্মুখ যুদ্ধনীতির বাইরে এই উপায়ের কথা কৃষ্ণই বলছেন এবং তা বলছেন যখন বিরুদ্ধ রাজার অন্যায় প্রবৃত্তি গভীর, অথচ তাঁর যুদ্ধবীর্য প্রশ্নাতীত। কৃষ্ণ বলেই দিলেন—প্রচুর সৈন্য-সামন্তের অধিকারী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার নীতি মোটেই খাটে না। বরঞ্চ আমরা কজন ছদ্মবেশে মগধরাজ্যে প্রবেশ করে জরাসন্ধের কাছাকাছি যাব এবং যেই সুযোগ পাব তাঁকে একাকী দেখার, সেই মুহূর্তেই নিজেদের কাজটা করে নেব—শত্রুমেকমুপক্রম্য তং কামং প্রাপ্নুয়াম হ।

এটা বুঝতেই হবে যে, মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতি-রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগে এতকাল মাগধ জরাসন্ধের প্রভাবকে কেন্দ্র করে যে ভয়ানক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল, কৃষ্ণ তার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছেন নিজের হাতে। যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এটা বোঝাতে পেরেছেন যে, জরাসন্ধ-পক্ষের মিত্র রাজারা যতই শক্তিশালী হয়ে তাঁর জন্য যুদ্ধ করুন, বাইরে থেকে এসে তাঁদের পক্ষে জরাসন্ধের সেনাপতি-কর্ম করাটা ভীষণই দুষ্কর। কিন্তু যুদ্ধজয়ের প্রধান দুই দোসর—হংস এবং ডিম্ভক—মহাভারতে এঁদের সঙ্গে কোনও ভৌগোলিক রাষ্ট্রের যোগ নেই বলেই মনে করি এঁরা যে কোনও যুদ্ধে জরাসন্ধের নিজস্ব সেনানায়ক ছিলেন। বিশেষত বলরাম অন্তত আঠেরোবারের চেষ্টায় হংসকে প্রায় মরার মতো করে

ফেলেন—রামেণ স হতস্তত্র সংগ্রামেষ্টাদশাবরে—এই সংবাদে জরাসন্ধের আঠেরোবার মথুরা আক্রমণের কথা মনে পড়ে এবং মথুরার নিকটবর্তী যমুনা নদীতে আগে ডিম্ভক এবং পরে হংস আত্মহত্যা করায় এই তত্ত্ব আরও জোরদার হয় যে, মথুরা অঞ্চলে যুদ্ধ করতে গিয়েই হংস-ডিম্ভক কৃষ্ণ-বলরামের অভিসন্ধিতে মারা পড়ে। কিন্তু হংস-ডিম্ভককে এতটাই ভয়ংকর মনে করেন কৃষ্ণ যে, তাঁদের মৃত্যুর পর এখন তিনি জরাসন্ধকেই সোজাসুজি 'টারগেট' করছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—হংস-ডিম্ভক মারা গেছে, মারা গেছে সদলবলে কংসও। এখন সময় এসেছে যখন জরাসন্ধকে আগে মারা দরকার—জরাসন্ধস্য নিধনে কালো'য়ং সমুপাগতঃ জরাসন্ধের মিত্রবর্গ শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কিংবা মুরু-নরককে কৃষ্ণ পরে বুঝে নেবেন বলে ঠিক করেছেন, কেননা তাঁর ধারণা—জরাসন্ধ মারা পড়লে প্রধান নায়কের অনুপস্থিতিতে জরাসন্ধের মিত্রবাহিনীর সংঘশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই সুযোগে আশাহত দুর্বল এক-একজনকে শেষ করতে কৃষ্ণের সময় লাগবে না।

যুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে ভয় পাচ্ছিলেন বলে কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে, জরাসন্ধকে দৈহিক যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। তিনি এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, ভীমসেনকে যদি তাই মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহলে বয়স কম বলেই জরাসন্ধ তাঁর হাতে মৃত্যুবরণ করবেন বলে কৃষ্ণ মনে করেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—আমার কৌশলী বুদ্ধি আছে, ভীমের আছে দৈহিক শক্তি, আর আমাদের দুজনের যদি কোনও বিপন্নতা হয়, তবে অর্জুন থাকবে আমাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে—ময়ি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবয়োর্জয়ঃ। অতএব কোনও চিন্তা নেই, আপনি অনুমতি দিন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে ঢুকলেন এবং তার পরের কাহিনি সকলের জানা। কোনও ব্রতের কারণে উপবাসকৃশ জরাসন্ধ কৃষ্ণের ভাব-কৌশলে ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং অবশেষে কৃষ্ণের বুদ্ধিতে ভীম জরাসন্ধ-বধে সমর্থ হলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর বন্দিশালা মুক্ত করে সেইসব রাজাদের কৃষ্ণ ছেড়ে দিলেন, যাঁদের বলি দেবার জন্য আটকে রেখেছিলেন জরাসন্ধ। এইসব কৃতজ্ঞ রাজাদের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সাহায্য করতে বললেন কৃষ্ণ আর জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকেও তিনি কৃতজ্ঞ করে ফেললেন মগধ রাজ্যে তাঁকে অভিষিক্ত করে।

কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম সফলভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার পরই রাজসূয়ের প্রাথমিক পর্ব শুরু হল দিগ্‌বিজয় দিয়ে। এই সময়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেছেন এবং চার পাণ্ডবভাই ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব চতুর্দিকে দিগ্‌বিজয় সেরে এলেন প্রায় নির্বিঘ্নে। এই নির্বিঘ্নতার প্রথম কারণ জরাসন্ধের মৃত্যু এবং জরাসন্ধের মিত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে কংস, হংস-ডিম্ভক এবং মরু-নরককে কৃষ্ণ আগেই হত্যা করেছেন। কৃষ্ণ কাজটা সহজ করে দিয়েছেন বলেই জরাসন্ধের মৃত্যুর পর শিশুপাল এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবও পাণ্ডব-ভাইদের দিগ্‌বিজয় পর্বে যুধিষ্ঠিরের সাময়িক বশ্যতা মেনে নিয়েছেন সৌজন্য

দেখিয়ে। যুধিষ্ঠির নিজেও বুঝেছেন যে, তাঁর একান্ত নিজস্ব ধর্মভাবনায় অন্য সব কিছু সম্ভব হলেও নিজেকে সফল একজন রাজা বা ততোধিক বলবীর্যসম্পন্ন একজন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব হত না যদি না কৃষ্ণ তাঁদের বুদ্ধিদাতা হিসেবে থাকতেন। যুধিষ্ঠির পরম কৃতজ্ঞতায় এ-কথা স্বীকার করেই কৃষ্ণকে বলেছেন—আজকে তোমার জন্যই সমগ্র পৃথিবী আমার বশীভূত—ত্বৎকৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্‌বশে কৃষ্ণ বর্ততে—আজ তোমার জনই এত ধনরত্ন আমার অধিকারে এসেছে—ধনঞ্চ বহু বার্ষ্ণেয় তৎপ্রসাদাদ্ উপার্জিতম্।

এই প্রসঙ্গে রাজনীতির তত্ত্বকথায় এসে সামান্য আকারে জানাই যে, একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে একটি জনসমন্বিত ভূখণ্ড যেমন প্রয়োজন, আরও পরিষ্কার করে বললে—কৌটিল্যের ভাষায় অর্থশাস্ত্রীয় 'অর্থ' শব্দের অর্থই যেহেতু 'মনুষ্যবতী ভূমি'—আমরা বলব—যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে সেই ভূমি লাভ করেছেন। তদুপরি মহাভারতের সভাপর্বের প্রথমেই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতিনিয়মগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে যেভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাতে মনে হয় যুধিষ্ঠির সেইভাবেই তাঁর রাষ্ট্রশাসন চালাচ্ছিলেন। প্রশাসনিক ব্যাপারে নারদের প্রশ্নগুলি নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে শুধু এইটুকু জানাই যে, নারদের প্রশ্নশেষে যুধিষ্ঠির জানিয়েছেন—আপনি যা যা বললেন, এবং প্রশাসনিক স্থিতি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের কর্মচারী থেকে রাজকর, জনপদ-সংরক্ষণ থেকে কৃষি-পশুপালন-বাণিজ্য—সব ব্যাপারেই রাজাদের যা করা উচিত, তা আমি করেছি। যুধিষ্ঠির 'করেছি' বলেন না, বরং সবিনয়ে বলেন—করা হয়েছে—রাজভি র্যদ্‌যথা কার্য্যং কৃতং তত্তু ন সংশয়ঃ।

আমরা বলব—যুধিষ্ঠির নবনির্মিত রাষ্ট্র পেয়েছেন এবং তাঁর রাজকীয় ক্ষমতাও বেড়ে গেছে পররাষ্ট্রনীতির সফলতায়। জরাসন্ধ মারা গেছেন এবং দিগ্‌বিজয়ের মাধ্যমে প্রচুর অর্থও তাঁর রাজকোষ সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যে আস্থা, সেটা তত্ত্বগতভাবে মহাভারতের একটা রাজনৈতিক দিগ্‌দর্শন ঘটায়। এখানে খুব প্রকটভাবেই মনে হয় যে, নতুন রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত হয়ে যুধিষ্ঠির মন্ত্রী হিসেবে কাদের গ্রহণ করলেন! মহাভারত কিন্তু এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনও চিত্র দেয়নি। যুধিষ্ঠিরের সভায় অনেক ব্রাহ্মণ-সজ্জন এবং মুনি-ঋষিদের সঞ্চার তথা অবস্থানও দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু মন্ত্রীদের কোনও নাম-ধাম নেই। অথচ মহাভারতের রাজনীতির তত্ত্বোপদেশমূলক জায়গাগুলিতে রাজকার্যের সহায় হিসেবে মন্ত্রী নিয়োগের কথা পই-পই করে বলা হয়েছে। এমনকী ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপনের পরপরই যে নারদ এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরের সভায়, তিনি কিন্তু বারবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছেন—তুমি নিজের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ভালোবংশের মানুষদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছ তো? এটা মনে রেখ মহারাজ! সব দিকে থেকে জয় পেতে গেলে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণাই কিন্তু সব থেকে বড় প্রয়োজন—বিজয়ো মন্ত্রমূলো হি রাজ্ঞং ভবতি ভারত।

অবশ্যই প্রশ্ন ওঠে কত জন মন্ত্রী নিয়োগ করা উচিত। এর উত্তরে অন্যান্য রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থগুলি, মনু অথবা কৌটিল্য অবশ্যই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, তার আয়তন অথবা তার সমস্যা বহুলতার ভাবনা মাথায় রেখে মন্ত্রী সংখ্যা নির্ণয়ের কথা বলেছে, কিন্তু মহাভারত কৌরব-পাণ্ডবের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রাজনীতির তত্ত্বকথা বলছে বলেই অল্প কথায় অথবা কখনও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাত্ত্বিক পরামর্শ নির্দেশ করে। লক্ষ্য করে দেখুন না, ইন্দ্রপ্রস্থের পাশেই হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র তো তাঁর পিতৃ-পৈতামহ রাষ্ট্র চালাচ্ছিলেন। তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে ভীষ্ম,দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুর, সঞ্জয় এরা সকলেই ছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক প্রয়োজনে তাঁর একটা অলিখিত মন্ত্রী-মণ্ডলী ছিল, যেখানে দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং কর্ণ-শকুনি সমান্তরালভাবে মন্ত্রণাদাতার ভূমিকায় থাকতেন, অন্তত কুমন্ত্রণায় তো বটেই—দুষ্টং মন্ত্রম্ অমন্ত্রয়ন্। এ-পক্ষ এবং ও-পক্ষ দুই পক্ষই ধৃতরাষ্টকে চাপ দিতেন অপর পক্ষের কথা না শুনতে এবং নাচার ধৃতরাষ্ট্রকে বহু সময়েই আমরা চরম বিভ্রান্ত দেখেছি সুমতি এবং কুমতির দ্বন্দ্বে দোলাচল। নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি একা-একা নিজের বুদ্ধিতে নিজেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও, নাকি আবার বেশি লোকের সঙ্গে আলোচনা করো—কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ? দেখ মহারাজ। অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলে পরে কিন্তু তোমার গোপন সিদ্ধান্ত বাইরে চলে যেতে পারে।

মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনে ভীষ্ম যখন তত্ত্বগতভাবেই রাজনীতির কথা বলছেন, তখন তিনি মন্ত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করে বলেছেন—দ্যাখো যুধিষ্ঠির! মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করেই প্রশাসন চালাতে হবে তোমাকে। তোমার প্রশাসনিক ছিদ্র যাতে অন্য কেউ টের না পায়, আর অন্যের ছিদ্র যাতে তোমার নখদর্পণে থাকে, সেজন্য মন্ত্রীদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্র জিনিসটাই যেহেতু হাজারো মানুষের প্রণিধিমূলক একটা তত্ত্ব, অতএব সেটা চালাতে গেলে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করাটাই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—রাজ্যং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে। কিন্তু মন্ত্রণা করার জন্য ভীষ্ম অনেক রকম প্রশাসনিক কর্মের কথা বলেছেন যাতে বোঝা যায় যে, সেই সব বিশিষ্ট কর্মের জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রীই থাকা দরকার, কিন্তু অতিসংখ্যক মন্ত্রীতে কর্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই ভীষ্ম বলেছেন—খুব কম করে হলেও তিন জন মন্ত্রীর কমে কোনও রাজ্য শাসন চলে না এবং তাঁরা যেন প্রজা-সাধারণের সমস্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ হন—মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুঃ ত্র্যবরা মহদীপ্সবঃ। এই শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ টিপ্পনী কেটে বলেছেন—কম করে পাঁচ জন মন্ত্রী হলেই ভালো হয়, তেমন না পেলে খুব কম করে তিন জন—পঞ্চানামভাবে ত্র্যবরাস্ত্রিভ্যো ন্যূনা ন কার্য্যাঃ।

যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণা-বিষয়ে আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট কাউকে তাঁর মন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখিনি। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য লাভের প্রাককালে আমরা যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের মতো স্থিত দেখেছি, কিন্তু জতুগৃহের দাহ-কাণ্ডের পর এবং দৌপদী-বিবাহের পর আমরা

সমস্ত মন্ত্রণার জায়গায় কৃষ্ণেরই প্রাধান্য দেখেছি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মন্ত্রীর সংখ্যা সম্বন্ধে অনেক পূর্বাচার্যদের মত ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কেউ বুঝি একথা মেনে নেননি এবং কৌটিল্য তো কখনওই বলেননি যে, রাজার মন্ত্রী মাত্র একজনই থাকবেন। কৌটিল্য বলেছেন—একজন মাত্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলে—বিষয় যদি কঠিন এবং জটিল হয়, তবে তিনি যদি কোনওভাবে বিভ্রান্তি বা অনিশ্চয়তায় ভোগেন, তাহলে কোনওদিনই রাজা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না—মন্ত্রয়মানো হ্যেকেন অর্থকৃচ্ছ্রেষু নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছেৎ। আবার রাজা যদি দুজন-মাত্র মন্ত্রী নিযুক্ত করেন তাহলে এই সম্ভাবনা সব সময়েই থেকে যায় যে, বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে এই দুজনে এককাট্টা হয়ে রাজাকে নিজেদের বশে নিয়ে আসতে পারেন, আবার কখনও বা দুজন পরস্পর-বিরোধী হলে নিজের নিজের মত একগুঁয়ে হয়ে রাজার ঈপ্সিত কাজটাই নষ্ট করে দিতে পারেন। কৌটিল্যও কিন্তু তাই মহাভারতের মতোই অন্তত তিনজন মন্ত্রীর পক্ষপাতী; এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, পরবর্তীকালে লিখিত অর্থশাস্ত্র এবং পূর্বতন রাজনীতির উপদেশে মহাভারতের ভাবনা প্রায় একরকম। কৌটিল্য লিখেছেন—তিন বা চারজন মন্ত্রীই সবচেয়ে ভালো, এর চেয়ে বেশি মন্ত্রী হলে আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই খুব কঠিন হবে উঠতে পারে—মন্ত্রিভিস্ত্রিভি-শ্চতুর্ভি র্বা মন্ত্রয়েত।

কিন্তু মহাভারতের পরামর্শমতো তিনই হোক অথবা কৌটিল্যের মতে তিন-চারই হোক, যুধিষ্ঠির তো কর্তব্য বিষয়ে একজনের সঙ্গেই শুধু আলোচনা করেন। তিনি কৃষ্ণ, তাও আবার তিনি রাজধানীতে থাকেন না। তার মানে যুধিষ্ঠির কিন্তু রাজধর্মসম্মত কোনও ব্যবহার করছেন না। এখানে আমাদের একটা ব্যাপারই মাথায় রাখতে হবে। সেটা হল—মানুষটা কৃষ্ণ, হাজারটা কুশলী রাজমন্ত্রীর চেয়েও যাঁর একক মস্তিষ্কই অনেকখানি সরেস এবং সেটা প্রমাণও হয়ে গেল যখন রাজসূয়যজ্ঞের অন্তে সার্বিক উৎসবের সময় সমস্ত হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত—দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি সহ দেশ-বিদেশের সমস্ত রাজা-রাজড়ারা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন, তখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে কৃষ্ণকে রাজসূয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য মনোনীত করলেন। এই প্রস্তাবে চরম আপত্তি জানিয়েছিলেন চেদিরাজ শিশুপাল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বুদ্ধিতে মারা পড়ায় তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, কৃষ্ণের অনেক দোষ দেখিয়ে তিনি ভীষ্মের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেন। তার উত্তরে ভীষ্ম কৃষ্ণের শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি, মেধা এবং অন্যান্য আত্মগুণের পরিচয় দিয়ে তাঁকে এমনই এক অদ্বিতীয় অবস্থানে সম্মানিত করলেন যাতে শিশুপালের ক্রোধ চরমে উঠল। তিনি কৃষ্ণকে মারতেও চাইলেন।

হাজারও রাজা-রাজড়াদের সমর্থনের মুখে কৃষ্ণের সুবিধেই হল। কৃষ্ণ শিশুপালকে রাজসভাতেই চক্রাঘাতে মেরে ফেললেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এতে কৃষ্ণের যেমন সুবিধে হল, তেমনই যুধিষ্ঠিরেরও সুবিধে হল। আরও সুবিধে হল—কৃষ্ণ কিন্তু বস্তুত যুধিষ্ঠিরের অঘোষিত মন্ত্রীই রয়ে গেলেন। তবে খেয়াল করার মতো যে ঘটনা,

সেটা হল—শিশুপাল যখন কৃষ্ণের বিপক্ষতা করে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য অন্য রাজাদের যোগ্যতম বলে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে পৌণ্ড্রক বাসুদের থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণের শত্রুপক্ষীয় ভীষ্মক, রুক্মীর মতো শ্বশুর-শ্যালকও যেমন আছে, তেমনই আছে যুধিষ্ঠিরের যত বিপক্ষীয় মানুষ—অর্থাৎ কর্ণ, দুর্যোধন, জয়দ্রথ তো বটেই অথবা নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিতে দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামা এঁরাও। এতে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের সামনে এখনও অনেক কাজ বাকি এমনকী কৃষ্ণেরও তাই। কিন্তু পৌণ্ড্রক-বাসুদেব বা সৌভ-সৌবীর শাল্বদের মতো জরাসন্ধ-সহায়দের পররাষ্ট্রীয় শক্তি বলেই প্রতিহত করার মধ্যে কোনও চক্ষুলজ্জা ছিল না এবং রাজসূয়ের পরেই কৃষ্ণ একে একে তাঁর শত্রু নিপাত করতে থাকেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সমস্যা হল তাঁর শত্রুরা তাঁর আত্মীয়, যেখানে সম্বন্ধের টানা-পোড়েন আছে, লোক-ব্যবহারের টিপ্পনী আছে, অতএব তাঁর কাজটা আরও কঠিন।

জরাসন্ধের মৃত্যু তাঁর মিত্রগোষ্ঠীকে অনেকটাই দুর্বল করে দিলেও যে মুহূর্তে সৌভপতি শাল্ব যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় শিশুপালের হত্যার খবর পেয়েছেন, সেই মুহূর্তেই বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দ্বারকায়—কৃষ্ণ, তখনও রাজসূয়ের রেশ কাটিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে যেতে পারেননি। শাল্ব রাজার দেশটা গুজরাট-রাজস্থানের সীমানা-ঘেঁষা সমুদ্রতীরবর্তী একটি দেশ, কৃষ্ণের দ্বারকা থেকে এ-দেশ খুব দূরে নয়, আবার এখনকার জয়পুর-যোধপুর-আলোয়ারের কাছাকাছি এটা। দ্বারকা থেকে কাছে থাকার সুবাদেই শিশুপালের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রেই সৌভপতি শাল্ব কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতেই দ্বারকা আক্রমণ করেছেন। মহাভারতের বনপর্বে কৃষ্ণ নিজেই জানিয়েছেন এ-কথা। বলেছেন—শিশুপাল-বধের খবর শুনে শাল্ব এসে দ্বারকায় আমার জ্ঞাতিগুষ্টির অনেককে মেরে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি তখনও এখানে ছিলাম—উপায়াদ্ দ্বারকাং শূন্যামিহস্থে ময়ি ভারত। আমি তারপর গিয়ে শাল্ব-রাজাকে অনেক কষ্টে অনেক যুদ্ধ করে হত্যা করি।

কৃষ্ণ তাঁর কাজ করছেন, সেদিকে সমস্যাও নেই, কিন্তু এই যে তিনি শাল্ব-রাজাকে শাসন করতে দ্বারকা ছেড়ে তাঁর দেশে ছুটলেন, এরই মধ্যে সেই বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সেটা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করারই পরোক্ষ ফল। বস্তুত, রাজসূয়যজ্ঞটা যেহেতু ধর্মকার্যের থেকেও সম্রাট হয়ে ওঠার সমৃদ্ধিটাকেই বেশি করে বোঝায়, তাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের মধ্যেই শত্রুপক্ষের সমস্ত শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়ে ছিল। স্বয়ং ব্যাস রাজসূয়ের এই ভয়ংকর বৈরিতা-ব্যাপ্তি অনুধাবন করে বলেছিলেন—তুমি সামনের এই তেরোটা বছর সাবধানে থেকো যুধিষ্ঠির। তোমার যজ্ঞশেষে শিশুপাল-বধেই সমস্ত উৎপাত শেষ হয়ে গেল বলে ভেবো না যুধিষ্ঠির। সামনের তেরোটা বছর এর ফল চলতে থাকবে—ত্রয়োদশ সমা রাজন্ উৎপাতানাং ফলং মহৎ। যুধিষ্ঠির নিজেই বুঝেছিলেন যে, শিশুপাল বধের মধ্যে দিয়েই এক প্রচ্ছন্ন কূটনীতির জন্ম হয়ে গেল। ব্যাস সেই সময়টা বাড়িয়ে দিলেন তেরোটা বছর।

সন্দেহ নেই, এটা কোনও দৈববাণী নয়। কেননা পাণ্ডবদের বনবাস আর অজ্ঞাতবাসের সময় জুড়ে তেরো বছরই হয়, কাজেই এই মন্তব্য সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পরের মন্তব্য। আমরা এই সত্য মেনে নিয়েও বলি—ঠিক রাজসূয়যজ্ঞের পরে-পরেই ব্যাসের এই উক্তি সাজিয়ে দেবার মানেই হল—মহাভারত-প্রণেতা বুঝিয়ে দিতে চান যে, রাজসূয়ের ধর্মকার্য যুধিষ্ঠিরের ভবিষ্যতের বিপদ ডেকে আনল।

তিন

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ থেকে এবং মহাভারত থেকেও এই টুকরো খবর সংগ্রহ করে জানানো যায় যে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্রবর্ধনের অধীশ্বর পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যিনি জরাসন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিত্র, তিনি রাজসূয়ের পরপরই কৃষ্ণের হাতে মারা যান এবং তারপরেই শাল্বরাজ। কৃষ্ণ ব্যস্ত ছিলেন এই সময়ে, কিন্তু রাজসূয়যজ্ঞে যোগ দিতে এসে সবাই যখন চলে গেলেন, তখনও দুর্যোধন আর শকুনি রয়ে গেলেন যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য দেখার জন্য এবং বুঝে নেবার জন্যও। যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি এবং মর্যাদা দেখে দুর্যোধন ঈর্ষায় কাতর হয়েই হস্তিনায় ফিরলেন এবং তাঁর অন্তরাত্মায় দহন শুরু হল—কেন এই ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠির ভোগ করবেন, এই ঐশ্বর্য কেন তাঁর হবে না! মাতুল শকুনির কাছে এই শোক তিনি বারবার জানাতে থাকলেন এবং একটা সময় চরম পরশ্রীকাতরতায় তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকল। অবশ্য অপমানও তাঁর হয়েছে প্রচুর। ময়নির্মিত সভা দেখতে দেখতে স্ফটিক-বিভ্রমে তিনি জলে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতে ভীম প্রচুর হেসেছিলেন। নতুন কাপড় পরে আবারও ঘুরতে ঘুরতে জলহীন জায়গাতেও দুর্যোধন কাপড় তুলে হাঁটছিলেন, দরজা দিয়ে বেরতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন একই বিভ্রমে এবং আবারও সকলের হাসি। দুর্যোধন সেই অপমান ভোলেননি—নামর্ষয়ৎ ততস্তেষামবহাসম্ অমর্ষণঃ।

শকুনি দুর্যোধনের রাগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—রাগের মাথায় শত্রুর প্রশংসা করলে যা হয়। দুর্যোধন দুঃখ করে বলেছিলেন—আমি আর সইতে পারছি না। এত ঐশ্বর্য, এত সাধুবাদ পাণ্ডবদের জন্য! শিশুপাল কৃষ্ণের হাতে মরে পড়ে রইল, একটা উচ্চবাচ্য করতে পারল না কেউ। কৃষ্ণ-বাসুদেব তাঁর কাজটুকু করে দিলেন আর বাকিটুকু পাণ্ডবদের বলবীর্যে সিদ্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় আমার হয় বিষ খাওয়া উচিত, নয়তো জলে ডুবে মরা উচিত, আমি পাণ্ডবদের এত সুখ দেখার জন্য আর বেঁচে থাকতে চাই না—বহ্নিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি বা বিষম্।

শকুনি দুর্যোধনের রাগটা আরও চাড়িয়ে দিলেন। তিনি আরম্ভ করলেন একেবারে প্রথম থেকে। বললেন—কী আর করা যাবে। সব ভাগ্য, তুমি তো আর কম চেষ্টা করোনি, কিন্তু পারোনি তবু ওদের ঠান্ডা করতে—অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তে ত্বয়া ন শকিতা পুরা। তার মধ্যে দ্যাখো, ওরাই দ্রৌপদীকে স্ত্রী হিসেবে পেল, সঙ্গে জুটে গেল দ্রুপদ-রাজার রাজনৈতিক সহায়তা। সঙ্গে বাসুদেব-কৃষ্ণের মতো একজন অসম্ভব

বুদ্ধিমান মানুষ থাকায় নিজের পিতার অংশ রাজ্যটুকুও পেয়ে গেল—সহায়ঃ পৃথিবীলাভে বাসুদেবশ্চ বীর্যবান্। তো এগুলো ভাগ্য ছাড়া কী? শকুনি এইভাবে দুর্যোধনের ক্রোধ উদ্রিক্ত করেই তাঁর অসহায় ভাবটুকু উড়িয়ে দিয়ে বললেন—তবে দ্যাখো! তুমি একেবারে অসহায় হয়ে গেছ, তা কিন্তু নয়। তোমার ভাইরা আছে, কর্ণ আছে, দ্রোণ-অশ্বত্থামা আছেন, আমি আছি, অতএব ভয় কীসের তোমার। দুর্যোধন সুযোগ পেয়ে বললেন—তোমাদের সবাইকে নিয়েই আমি এই পাণ্ডবদের শেষ করে দেব। শকুনি বাস্তব বুঝিয়ে বললেন—পারবে না ভাগনে! পারবে না। কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, দ্রুপদ—এইসব সাংঘাতিক বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পার পাবে না তুমি—নৈতে যুধি পরাজেতুং শক্যা দেবগণৈরপি। তবে হ্যাঁ, আমি জানি কীভাবে এদের জয় করা যায়। রাজা হিসেবে আমি শুধু যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করব, তাহলেই তো সব শেষ। তুমি আমার ওপর সব ছেড়ে দাও, আমি জানি কীভাবে জয় করতে হবে পাণ্ডবদের—অহন্তু তদ্ বিজানামি বিজেতুং যেন শক্যতে।

দুর্যোধন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। কৌতূহল আর আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে তিনি শকুনিকে বললেন—মামা! বলো, বলো, কী সেই উপায়। যদি আমার একান্ত নিজের লোকেদের কোনও ক্ষতি না হয়, তাহলে বল, সে কী উপায়? শকুনি বললেন—আমি পাশা খেলব যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। আর তুমি তো জানো ভাগনে—পাশাখেলায় আমার কোনও জুড়ি নেই এই পৃথিবীতে। আর যুধিষ্ঠিরের সমস্যা হল—সে পাশা খেলতে অসম্ভব ভালোবাসে, কিন্তু পাশাখেলাটা সে জানে না—দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয় ন স জানাতি দেবিতুম। দ্বিতীয়ত পাশাখেলায় আহ্বান জানালে সে আহ্বানে সাড়া দিতেই হয়, অতএব যুধিষ্ঠির আসবেন, পাশা খেলতে। আর আমিও সেই সুযোগে বাজি ফেলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি সব কেড়ে নেব। তুমি শুধু এই কথাটা পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাও।

কথাটা ধৃতরাষ্ট্রকে খুব কায়দা করেই জানোনো হল এবং তিনিও খুব কায়দা করেই বুঝলেন। দুর্যোধনের উপরোধে শকুনিই এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তোমার দুর্যোধন-বেটা দিন দিন কেমন রোগা-পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটু জিজ্ঞাসা করো ছেলেটাকে—কী হয়েছে তার। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন এবং ক্রমে ক্রমে কথা প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অনন্ত সমৃদ্ধির কথা উঠল। দুর্যোধন অন্ধ পিতার সামনে যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য-মর্যাদা, সবটারই একটা অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন। তাতে দুর্যোধনের অন্তর্জ্বালা ধৃতরাষ্ট্রেরও অন্তরে গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু রাজনীতির বড় জ্বালা! কার্যনির্বাহী রাজার আসনে বসে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরদের মতো প্রবর মন্ত্রীদের তোয়াক্কা না করে দুর্যোধনের মতে যা-ইচ্ছে-তাই করাটা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি দুর্যোধনের জন্য রাজসভা, বাড়ি-ঘর 'রি-মডেল' করার আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করার যে শাকুনিক প্রয়াস, সেটাও তার মনে বেশ ধরেছে। দুর্যোধন অন্য কিছুতে ভুলবেন না বুঝেই শকুনির পাশাখেলাটার একটু মৃদু চলনসই

রূপ মনে মনে ভেবে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে পাঠালেন আলোচনা জন্য। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বোঝালেন—এটা ভাইতে ভাইতে বন্ধুর মতো পাশাখেলার আয়োজন চাইছে সকলে। তুমি গিয়ে পাণ্ডবদের ডেকে আনো এখানে।

কথাটা সামান্য হালকা করে বললেও ধৃতরাষ্ট্র যেহেতু মনে মনে জানেন যে, পাশাখেলার মাধ্যমে সদ্য রাজ্য-পাওয়া যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব হরণ করাটা ভীষণরকমের অন্যায় হবে, এমনকী রাজনীতির দিক থেকেও ব্যাপারটা ভুল হবে, অতএব এই সত্যটা তিনি দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন বিদুরকে আদেশ দেবার আগেই। ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—দ্যাখো পুত্র! পাণ্ডবদের ওপর তোমার যে এত বিদ্বেষ আছে, তা কিন্তু যুধিষ্ঠির জানেই না, আর তোমার প্রতি তার কোনও বিদ্বেষও নেই। অথচ তুমি তাকে বিদ্বেষ করছ, এটা কি ঠিক? দ্বিতীয়ত, তোমার যা সম্পত্তি, সহায়, সৈন-সেনাপতি, রাজ্যাংশ, পাণ্ডবদেরও তাই, সেখানে তুমি কেন ভাইয়ের সম্পত্তি হরণ করতে যাবে—তুল্যাভিজনবীর্যশ্চ কথং ভ্রাতুং শ্রিয়ং নৃপ। সবচেয়ে বড় কথা, রাজসূয়যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তোমার যদি ঈর্ষা-বোধ হয়, তবে তুমিও অনুরূপ একটা যজ্ঞ করো; দেখবে, সেখানেও অনেক অনেক রাজারা তোমার জন্যও অনেক ধন-রত্ন উপহার হিসেবে নিয়ে আসবেন—আহরিষ্যন্তি রাজানস্তবাপি বিপুলং ধনম্।

দুর্যোধন এই কথার জবাব দিলেন একেবারে রাজনীতির শাস্ত্র অনুসারে। প্রথমে তো ধৃতরাষ্ট্র বেশ গালাগালি খেলেন। নিজের শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিদুর কী বলতে পারেন এই ভেবে ধৃতরাষ্ট্রের যে সংশয় হচ্ছে, সেইখানে যেন কষাঘাত করলেন দুর্যোধন। তাঁর বক্তব্য, রাজনীতির স্বার্থসাধনে রাজা কারও কথা শুনবেন না, যে রাজা পরের বুদ্ধিতে চলেন তাঁর বুদ্ধি পদে পদে মোহগ্রস্ত হয়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের মাথার ওপর তোমার মতো এমন একটা মানুষ বসে আছে, যে লোকটা পরের কথায় চলে। সত্যি বলতে কী, ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক লোভ-মানসের সঙ্গে দুর্যোধনের কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পদে পদে সংশয়ী। হয়তো দুর্যোধনের মতে চললে তিনি খুব ক্রূরভাবে হলেও নিশ্চিন্ত রাজলক্ষ্মীর স্বাদ পেতেন, তবে তাতে দুর্যোধনের ধ্বংস আরও ত্বরান্বিতও হতে পারত। কেননা রাজনীতির মধ্যেও যে নৈতিকতা বা 'এথিক্যাল ফাউন্ডেশন' থাকে ধৃতরাষ্ট্র সেটার জন্যই মাঝে মাঝে সংশয়ী হন, মাঝে মাঝেই তিনি বিদুরের মত নিতে চান। কিন্তু দুর্যোধনের রাজনীতি-বোধ এমন নয়। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির সহ সমস্ত পাণ্ডবদের ভাই বলে তাঁদের দ্বেষ করতে বারণ করেছিলেন; দুর্যোধন তার উত্তরে বলেছেন—এই লোকটা আমার শত্রু, আর এই লোকটা আমার বন্ধু—রাজনীতিতে এমন কোনও সাংকেতিক শব্দ নেই এবং শত্রু না মিত্র—এটা কারও গায়ে লেখা থাকে না—শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাত্রিকা। যে যাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাপ দিচ্ছে সেই শত্রু, অন্য কেউ নয়।

দুর্যোধনের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর রাজনীতির ব্যাখ্যা খুব সরল, যদিও

তা ভিতরে ভিতরে এতটাই কূট যে পরবর্তীকালের মোক্ষম রাজনীতি-বোদ্ধা কৌটিল্যের সঙ্গে তাঁর মত মেলে, কিন্তু রক্ষণশীল মনু-মহারাজ বা খোদ মহাভারতের সঙ্গেই তাঁর মত মিলবে না। কৌটিল্য যেহেতু তাঁর অর্থশাস্ত্রে 'অর্থ' শব্দের অর্থই করেছেন 'জনসমন্বিত ভূমি' বা রাষ্ট্র, অতএব তাঁর কাছে ভূমিলাভ হচ্ছে সবচেয়ে বড় লাভ। কিন্তু মনু-মহারাজ তাঁর রক্ষণশীলতায় এককালে বলেছিলেন—ভূমি, হিরণ্য (সোনা-দানা) এবং মিত্র লাভের মধ্যে একজন সঠিক মিত্রলাভ পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি। মনুর মতে, যে রাজা নিজের সমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁর কাছে তিনটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুপক্ষ তাঁর কাছে বন্ধুভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, অতএব সেখানে সাড়া দিয়ে তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, শত্রুপক্ষ সোনা-দানা উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করতে পারেন, বিজিগীষু রাজা সেখানে তাঁর দান গ্রহণ করে শত্রুকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন। আর তৃতীয় প্রকরণ হল—রাজা নিজের রাজ্যের খানিকটা ফিরিয়ে দিয়ে বিজয়ী রাজার বন্ধুত্ব স্বীকার করতে পারেন। কিন্তু যে প্রকারেই হোক—ভূমিলাভ বা সুবর্ণ লাভের চেয়ে পররাষ্ট্রের মিত্রলাভই মনুর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একজন রাজা যদি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হয়ে অল্পশক্তিও হয়ে পড়েন, তবে তিনি যদি এমন একজন রাজাকে বন্ধু হিসেবে পান যাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তাহলে একজন বিজিগীষু রাজা যত উপকৃত হবেন, সোনাদানা বা ভূমিলাভ করে তিনি তত উপকৃত হবেন না—হিরণ্য-ভূমি-সংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে। যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্।

কৌটিল্য অবশ্যই এই মত মানবেন না। অর্থ শব্দের মানেই যাঁর কাছে ভূমিখণ্ড-লাভ এবং সেই ভূমি পালন করার উপায়, তাই ভূমিলাভই রাজার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ এবং সেটা এমনই এক লাভ যা সব সময়েই একটি রাজ্য বা রাজত্বের প্রতিরূপ এবং সেই ভূমিখণ্ড লাভ হলে পার্শ্ববর্তী রাজারা আপন স্বার্থেই কেউ-না-কেউ বন্ধু হিসেবে আসতে চাইবেন। কৌটিল্যের মতে তাই ভূমিলাভ হলে মিত্রলাভ আপনিই হয় এবং সেটা রাজনৈতিক কারণেই হয়, এবং আপন রাজকীয় মর্যাদার জন্যই সোনাদানা, ঐশ্বর্যও আসে আপনা-আপনিই-মিত্র—হিরণ্যে হি ভূমিলাভাদ্ ভবতঃ।

মহাভারতে দুর্যোধনের বক্তব্য কৌটিল্যের মতোই। তিনি বলেছেন—ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হল রাজ্য জয় করে ভূমিলাভ করা—ক্ষত্রিয়স্য মহারাজ জয়ে বৃত্তিঃ সমাহিতাঃ। তাছাড়া সম্পদে সন্তুষ্ট না থাকাটাই বিশেষ সম্পদের কারণ, সেই জন্যই আমার এত অসন্তোষ, আমি শত্রুর সমৃদ্ধি সহ্য করব না—এবার ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। জাতি অনুসারে কারও কোনও শত্রু নেই, কিন্তু একই বস্তুর ওপর যদি দুইজনের সমান আকর্ষণ বা সমান ব্যবহার হয়, তাহলে একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়বেই। দুর্যোধন যা বলছেন, তার একটা বড় সমর্থন মিলবে মহাভারতেই

শান্তিপর্বে ভীষ্ম-কথিত রাজধর্মানুশাসনে। সেখানে বলা হয়েছে—রাজনীতিতে চিরকালের শত্রু বা জাতশত্রু বলে যেমন কিছু থাকে না, তেমনই চিরকালের বন্ধু বলেও কিছু হয় না। একজন রাজার সামর্থ্য, ক্ষমতা, তেজ যে-রকম, তার নিরিখেই অন্য রাজার সিদ্ধান্ত তৈরি হয় যে, তিনি পূর্বোক্ত রাজার শত্রু হবেন, না বন্ধু হবেন—সামর্থ্যাদেব জায়ন্তে মিত্রানি রিপবস্তথা।

দুর্যোধন এত কথা বলছেন কারণ পাণ্ডবদের তিনি কোনওভাবেই বন্ধু ভাবতে পারছেন না এবং পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি যদি তাঁর নিজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্তরায় হয়, তবে তাঁদের এখনই হীনবল করে দেওয়াটা তিনি জরুরি মনে করছেন। আর সেই প্রচেষ্টা যদি শক্তি-সামর্থ্য-দণ্ডের মাধ্যমে সম্ভব না হয়, তবে কৌশলে তাঁদের রাজ্যহরণ করাটাও তিনি ঠিক মনে করছেন। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য অন্ধ হলেও দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। তিনি মনে করেন—পাণ্ডবদের রাজ্যহরণ-প্রক্রিয়া কৌশলে করা গেলেও এই মুহূর্তে পাণ্ডবরা রাজনৈতিকভাবে অধিক বলবান। অতএব তাঁদের সঙ্গে কোনও বিরোধে যাওয়াটা তিনি সমীচীন মনে করেন না—সর্বথা পুত্র বলিভি র্বিগ্রহো মে ন রোচতে। সবচেয়ে বড় কথা, শকুনি অথবা শকুনির ওপর নির্ভর করে দুর্যোধন যে পাশাখেলার চিত্রটা দিচ্ছেন, তার পূর্ণ রূপ এখনও পর্যন্ত অন্তর্গত হয়নি ধৃতরাষ্ট্রের মনে। ফলত দুর্যোধনকে আটকাতে না পেরে এক সময় ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—তোমার যা মনে হয় তাই করো, কিন্তু মনে রেখো, আমার কথা যে এখন শুনলে না, কিন্তু পরে এই পাশাখেলার জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে—যত্তে প্রিয়ং তৎ ক্রিয়তাং নরেন্দ্র/পশ্চাত্তপ্স্যাস হ্যেতদুৎক্রম্য বাক্যম্।

দুর্যোধন পিতার কথা শোনেননি, বিদুরের কথা তো শোনেনইনি। কিন্তু বিদুরও বোধহয় ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রের 'সুহৃদ্-দ্যূত' বা বন্দুত্বপূর্ণ পাশাখেলার ওজরটাকে তিনি তেমন অনুধাবন করে দেখেননি। দেখলে পাশাখেলা বন্ধ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের ওপর আরও চাপ বাড়তেন নিশ্চয়। বিশেষ বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েই এই পাশাখেলার নেমন্তন্ন করায় যুধিষ্ঠিরও বোধহয় তেমন তলিয়ে দেখেননি যে, এই ঘটনার কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে। তিনি অবশ্য শঙ্কা করেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র যা করতে যাচ্ছেন, তাতে দুই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদ একটা তৈরি হবেই, কিন্তু অন্য সময় তিনি যত সরব হন, এখন তিনি তেমন সরব হননি। এমনকী যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়েও বিদুর খুব গোপন কথা প্রকট করে দেবার মতো করে বলেননি যে, দুর্যোধনের মনে কিন্তু কু আছে। ধৃতরাষ্ট্রের সরল উক্তির মতো বিদুরও যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁর কথাই বলেছেন—ভাইদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পাশাখেলার জন্য তোমরা এসো এবং আমোদ করো।

একই সঙ্গে বিদুরের দিক থেকে একটা 'চেতাবনী' আছেই, কিন্তু দূত হিসেবে এসে নিজের মত বেশি ব্যক্ত করা যায় না বলেই বিদুর শুধু বলেছেন—বড় বড় পাশাড়ে সব আছেন সেই সভায়, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের নাম ঠিক করে রেখেছেন, তোমরা চলো।

যুধিষ্ঠির প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় একটু সন্দেহ দেখিয়ে বললেন—পাশাখেলা থেকে তো নানা বিবাদ-বিগ্রহ তৈরি হয়, আর কোন বুদ্ধিমান লোকই বা পাশা খেলতে চায়। তা এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন মহামতি বিদুর? আপনার কথা সবাই শুনি আমরা—কিংবা ভবান্ মন্যতে যুক্তরূপং/ভবদ্‌বাক্যে সর্ব এব স্থিতা স্মঃ। বিদুর খুব উদাসীন-ভাবে জানালেন—আমি জানি, পাশাখেলার মধ্যে হাজার অনর্থ লুকিয়ে আছে, আমি যথাসাধ্য এই পাশখেলা বন্ধ করারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু কী করব? দেশের রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে, সেটা বুঝে তোমার যা ভালো মনে হয়, তাই করো—শ্রুত্বা বিদ্বন্ শ্রেয় ইহাচরস্ব।

এই মুহূর্তেই এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ছিল যুধিষ্ঠিরের। কারণ বিদুরের যে মত নেই পাশাখেলায়, এমনকী সুহৃদ্‌দ্যূতেও নয়, সেটা তো বোঝাই উচিত ছিল যুধিষ্ঠিরের। কিন্তু প্রত্যাখ্যান না করে যাঁরা সেই সভায় পাশাখেলার জন্য বসে আছেন, তাঁদের নাম জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির। বিদুর নামগুলি বললেনও এবং সেটা শুনে যুধিষ্ঠিরও বেশ আতঙ্কিত। কিন্তু তাই বলে একবারও তিনি পাশাখেলা থেকে বিরত হবার কোনও ভাব দেখালেন না। প্রতিপক্ষের নাম শোনাটা আসলে ছিল নিজেকে পরিমাপ করে নেওয়া। একটা কল্পিত অক্ষক্রীড়া-মঞ্চে বসে শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন ইত্যাদি দ্যূতকরদের সামনে বসিয়ে যুধিষ্ঠির একবার পরিমাপ করে নিলেন নিজেকে। খুব যে সুবিধে মনে হল তা নয়, কিন্তু দ্যূতকরের অক্ষহৃদয় এমনই এক বিষম মোহে আবিষ্ট হয় যে, সে নিজেকে রোধ করতে পারে না। যুধিষ্ঠিরও পারলেন না। এই বোধহয় প্রথম এবং এই শেষ, যেখানে মহামতি বিদুরের অভীষ্ট পালন করলেন না যুধিষ্ঠির। অথচ কী মিষ্টি একটা অপযুক্তি তাঁর অক্ষহৃদয়কে তাড়িত করছিল। যুধিষ্ঠির বললেন—ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পেয়েও আমি সেখানে যাব না এমন তো হতে পারে না, কেননা ডাকলে পরে আমি কখনওই ফিরে আসি না—আহূতো'হং ন নিবর্তে কদাচিৎ।

ঠিক এইখানে মহাভারতের নিরপেক্ষ কথকঠাকুর মন্তব্য করেছেন—দৈব মানুষের জ্ঞান-দৃষ্টি হরণ করে, দীপ্ত সূর্যের তেজ যেমন চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সেইরকম। মানুষ যেন পাশবদ্ধ হয়েই বিধাতার বশীভূত হয়—দৈবং হি প্রজ্ঞাং মুষ্ণাতি চক্ষুস্তেজ ইবাপতৎ। হয়তো এই কথাটা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে খানিকটা বাঁচানোর জন্য, তা নইলে শকুনির মুখ দিয়ে একবার যে-কথা উচ্চারিত হয়েছিল—শকুনি বলেছিলেন—যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভীষণ ভালোবাসেন, কিন্তু পাশা খেলা তিনি জানেন না—দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্—সবচেয়ে বড় কথা, পাশা খেলতে ডাকলে সে কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবে না—ন শক্ষ্যতি নিবর্তিতুম্—শকুনির এই কথাটা কিন্তু মহাভারতের কথক-ঠাকুর বললেন না। অথচ ঘটনা তো তাই। পিতার সমান ধৃতরাষ্ট্র ডাকছেন, আমাকে তাই যেতেই হবে, এই মহাসম্মানবোধের চেয়েও পাশাখেলার দুর্নিবার ইচ্ছেটাই এখানে অনেক বেশি বড় হয়ে উঠেছে যুধিষ্ঠিরের কাছে এবং এইখানেই সেকালের দিনের রাজনীতি-বোদ্ধাদের টিপ্পনীটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আসলে তখনকার দিনে রাজতন্ত্র যেভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাতে বিলাস-ব্যসনের একটা জায়গা থাকতই। প্রজাকল্যাণের জন্য রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘু সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছেন অথবা হর্ষবর্ধন তাঁর চীবর বস্ত্রখানির মায়াও ত্যাগ করছেন— এসব বহুশ্রুত হলেও একনায়ক রাষ্ট্রে অর্থের ওপর রাজার ব্যক্তিগত অধিকার অনেক বেশি ছিল। ফলে বিলাসে মত্ত হওয়াটা রাজাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এই বিলাস এক-একটা সময় এক-একটি ভোগ্যবস্তুর প্রতি এমনই মোহ তৈরি করত যে সেটা তখন ব্যসনে পরিণত হত। মনু-মহারাজ রাজাদের কামজ এবং ক্রোধজ দোষগুলিকে ব্যসন বলে চিহ্নিত করেছেন। কামজ ব্যসনের লিস্টিতে যে দশটি দোষের কথা বলেছেন মনু। তার আরম্ভে আছে মৃগয়া, তার পরেই আছে পাশাখেলা। অন্যান্যগুলির মধ্যে মধ্যপান, স্ত্রী-সম্ভোগ, গান-বাজনা—এইসব অনেক গুরুতর মোহের জায়গা হলেও অক্ষক্রীড়ার মধ্যে পণ ধরে খেলার মোহ থাকায় এটাকে রাজাদের অন্যতম ক্ষতি এবং আবেশের জায়গা বলে চিহ্নিত করা হয় প্রাচীন শাস্ত্রে। বিশেষত খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যে যে অক্ষসূক্ত আছে, সেখানে এক অক্ষ-কিতবের সর্বনাশের ঘটনাকে পণ্ডিতরা এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, মহাভারতে যুধিষ্ঠির-শকুনির-অক্ষক্রীড়াকে বৈদিক অক্ষক্রীড়ার উত্তরাধিকার বলেই তাঁরা মনে করেন। এটাও মনে রাখতে হবে যে, সেকালে অক্ষক্রীড়ার গুরত্ব এতটাই যে, পাণ্ডব-কৌরবের বিরাট যুদ্ধটাকেই একটা অক্ষক্রীড়ার প্রতিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে মহাভারতে। এই নিরিখে অক্ষক্রীড়ার ব্যসন এবং মোহ এতটাই সমাজ-মানসের মধ্যে নিহিত ছিল বলে বুঝতে হবে যে, যুদ্ধের ব্যাপারে ক্ষত্রিয়রা যে-সব নীতি-নিয়ম অক্ষয় বলে মনে করতেন, সেগুলিকে তাঁরা অক্ষক্রীড়ার ব্যাপারেও প্রয়োগ করতেন। ঠিক যেমন মনু বলেছেন— ক্ষত্রিয় নৃপতি যদি শত্রুর দ্বারা যুদ্ধ করার জন্য আহূত হন, তাহলে আর ফিরে দেখার প্রশ্ন নেই তাঁকে সাড়া দিতেই হবে—ন নিবর্তেত সংগ্রামাদ্... আহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ— ঠিক তেমনই অক্ষক্রীড়ার গুরুত্বও ছিল প্রায় যুদ্ধধর্মের মতো। না হলে যুধিষ্ঠির বলতেন না— আমাকে যখন আহ্বান করেছে দ্যূতক্রীড়ার জন্য, তখন কিছুতেই আমি ফিরে আসব না—আহূতো'হং ন নিবর্তে কদাচিত্/তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে। কথক ঠাকুর টিপ্পনী কেটেছেন— দ্যূতক্রীড়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের এই আহ্বান আসলে মহাকালের আহ্বান ছিল, যুধিষ্ঠির নিয়তি-তাড়িত হয়ে এ আহ্বানে সাড়া দিলেন।

মনু-মহারাজ বলেছিলেন— রাজাদের পক্ষে ব্যসনে আসক্ত হওয়া মৃত্যুর চাইতেও বড় এক অপরাধ। কেননা মৃত্যুবরণ করে একজন অব্যসনী রাজা স্বর্গযাত্রা করেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন-মত্ত রাজা দিন-দিন নিচে, আরও নিচে নামতে থাকেন—ব্যসনী অধো'ধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী নৃপঃ। যুধিষ্ঠিরেরও তাই হল। তিনি বিদুরের ইচ্ছেটুকু বুঝলেন না এবং তার চেয়েও বড় কথা— যাঁর উপদেশ ছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করেন না, সেই কৃষ্ণকে একবারও

তিনি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না যে, এই দ্যূতসভায় তিনি যাবেন কি না? হ্যাঁ, কৃষ্ণ ব্যস্ত ছিলেন সৌভপতি শাল্বরাজকে শাস্তি দেবার কারণে, কিন্তু যুধিষ্ঠির তো কোনও চেষ্টাই করেননি তাঁকে খবর দেবার। তিনি খবর যখন পেয়েছেন, তখন পাণ্ডবরা বনবাসে এবং কৃষ্ণ সেখানে এসে বলেছেন—এই ঘটনা কিছুতেই ঘটত না, এই বনবাস-কষ্ট কিছুতেই হত না তোমাদের, যদি আমি তখন দ্বারকায় উপস্থিত থাকতাম— যদ্যহং দ্বারকায়াং স্যাং রাজন্ সন্নিহিতঃ পুরা।

তাঁকে না জানিয়ে যুধিষ্ঠির যে নিজের অনিবার্য বুদ্ধিতেই পাশা খেলতে গিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ যে তাতে বিরক্ত হয়েছেন সেটা বুঝিয়েও দিয়েছেন কৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর ভাষা তো আলাদা এবং রাজনৈতিক পরিশীলনে সেটা এতটাই ভদ্র যে, আজকের দিনেও তা শিক্ষণীয়। সম্মানিত যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তিনি বলেছেন— আমি যদি দ্বারকায় থাকতাম, তাহলে কৌরবরা আমাকে এই দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ না জানালেও আমি অনাহূত অবস্থাতেই আসতাম—আগচ্ছেয়ম্ অহং দ্যূতমনাহূতোঽপি কৌরবৈঃ— এবং দেখতে তুমি, যুধিষ্ঠির। আমি দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েই এই ভয়ংকর দ্যূতক্রীড়া আটকে দিতাম। বারবার কৌরব, ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের মতো লোকের কথা উচ্চারণ করে কৃষ্ণ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন— খবর পেলে এঁদেরও আটকানো যেত, কিন্তু তোমাকে আটকানো যেত কিনা সন্দেহ। কারণ খবর তো তোমারই দেবার কথা ছিল। তুমি নিশ্চুপে আপন মোহে পাশা খেলতে এসেছ, অতএব এই খেলা আটকাতে হলে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনও তোমার চাইতে ভালো মাধ্যম হতে পারত।

কৃষ্ণ এবার সেই প্রাচীন রাজবাসনের নৈতিকতায় ফিরে এসে বলেছেন— আমি পাশাখেলার অসংখ্য দোষ দেখিয়ে এই খেলা বন্ধ করতে পারতাম। আমি ভীষ্ম-দ্রোণ সবাইকে জড়ো করে ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিক বুঝিয়ে ছাড়তাম যে এই খেলা তাঁর ছেলেদের পক্ষেও ভালো নয়, তোমার পক্ষেও ভালো নয় অথবা তোমার জন্যই বলতাম যে, এটা তাঁর ছেলেদের পক্ষেই ভালো নয়—পুত্রানাং তব রাজেন্দ্র ত্বন্নিমত্তমিতি প্রভো। পাশা খেলায় যে কত অতর্কিত বিনাশ ডেকে আনতে পারে, সেই প্রসঙ্গে নল-রাজার উদাহরণ দিয়ে কৃষ্ণ সেই রাজনীতি-শাসনের জায়গায় এসেছেন যা মনু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনীতি বোদ্ধারা বলেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন— রাজাদের সবচেয়ে বড় মোহ এবং সর্বনাশের জায়গা হল—স্ত্রীলোক,পাশাখেলা, মৃগয়া এবং মদ্যপান এর যে কোনও একটি হলেই রাজাদের সাবধান করতে হবে। তবে তার মধ্যে এই পাশাখেলাটা সবচেয়ে মারাত্মক, কেননা একদিনের মধ্যে এতে সমস্ত ধন-দ্রব্য-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে—একাহাদ্ দ্রব্যনাশো'ত্র ধ্রুবং ব্যসনমেব চ।

কৃষ্ণ যা বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের জীবনে তাই ঘটেছে, এক দিনে রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি সব গেছে। কৃষ্ণ বলেছিলেন—আমি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতাম এই সব কথা, কিন্তু তবু যদি তিনি না শুনতেন, তাহলে আমি জোর করে বন্ধ করতাম পাশাখেলা, যত জুয়াড়ি পাশাড়ে ছিল, সেখান সবগুলোকে আমি শেষ করে ছাড়তাম— নিগৃহ্যীয়াং বলেন

তম্... তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্। কৃষ্ণ যে অনেক দূর পর্যন্ত আলোচনার জায়গায় থাকেন এবং তারপর শক্তি প্রয়োগ করেন—এ পরীক্ষা অনেকবার ঘটেছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করার কোনও ভাবনাই করেননি, অতএব নিজের সিদ্ধান্তে পাশা খেলতে গিয়ে তাঁর ধন-সম্পত্তি, রাজ্যপাট সব তো গেলই এবং সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা হল চরম অপমান— তাঁর নিজের, তাঁর পরিবারের এবং পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর। ব্যসন-দোষের দিক থেকে মদ্যপান এবং স্ত্রীসম্ভোগের থেকেও যে পাশাখেলাটা আরও খারাপ সেটা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সামনেই প্রকট করে তোলায়—বিশেষতশ্চ বক্তব্যং দ্যূতে পশ্যন্তি তদ্বিদঃ—যুধিষ্ঠিরের ধার্মিক সত্তার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে যায়, তেমনই এত গুরুতর ব্যাপারে কারও পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করায় যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক বুদ্ধি নিয়েও সংশয় উপস্থিত হয়। স্বয়ং কৃষ্ণই পরোক্ষে সেই সংশয় প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু যা হবার, তা হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরও নিশ্চয়ই তাঁর স্বকীয় কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট অনুতপ্ত। পাশাখেলার আসরে কৌরবরা পাণ্ডবদের রাজ্যপাট জিতে নেবার চেয়েও যে চূড়ান্ত অপমান করলেন দ্রৌপদীকে, সেই দিনই পাণ্ডব-কৌরবের রাজনীতিরও চূড়ান্ত দিশা তৈরি হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির পাশা খেলে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন ঠিকই, কিন্তু পৈতৃক রাজ্য লাভের ব্যাপারে পাণ্ডব-কৌরবদের মধ্যে যে বিস্ফোটক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার একটা মুখ তৈরি হল পাশা খেলার মাধ্যমে। কুন্তীসহ পাণ্ডবরা বহুকাল ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে বসে ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দেবার নামও করেননি। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থে জায়গা দিলেন পাণ্ডবদের, কিন্তু পাশাখেলার অজুহাতে এবং মাধ্যমে তাঁদের সমৃদ্ধ রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ আবারও দখল করে নিলেন দুর্যোধনের প্ররোচনায়। অতএব হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য একটা যুদ্ধ নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠির শান্তিপ্রিয় মানুষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁর একেবারেই পছন্দের জিনিস নয়, কিন্তু আপন আগ্রহে পাশা খেলতে গিয়ে যে চরম ঘটনাগুলি ঘটে গেল, তাতে তাঁর এতটুকুও মুখ রইল না, যাতে তিনি বলতে পারেন যে, শান্তিই সবচেয়ে বড় কথা, বড় জোর সামাদি উপায়ের মাধ্যমে আলোচনায় বসা যেতে পারে। এটাই পাশাখেলার অন্যতম মাত্রা।

পাশাখেলার আসরেই নির্বাক সত্যবদ্ধ যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের প্রতিবাদ ভেসে এসেছে। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের পাশা-স্পর্শী বাহুটিই আগুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুন কোনওমতে জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতার সম্মান রক্ষা করলেও দ্রৌপদীর অপমান-শেষে ভীমের পাশে দাঁড়িয়ে কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। পাণ্ডবদের প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞায় সেদিন ধৃতরাষ্ট্রের সভাস্থল মুখরিত হয়েছিল, এমনকী হস্তিনাপুর থেকে বনযাত্রার যে প্রারম্ভিক পথ, সেই পথেও আকার-ইঙ্গিতে ঘোষিত হল কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা, দুর্যোধন-দুঃশাসন-বধের প্রতিজ্ঞা এবং শকুনি-বধের প্রতিজ্ঞাও। আর এই সব কিছুর নিমিত্ত কারণ হয়ে রইলেন দ্রৌপদী।

চার

বনযাত্রার পর তিন-চার দিন যেতে-না-যেতেই কাম্যক বনের অরণ্য আবাসে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ। যদু-বৃষ্ণি-সংঘের মুখ্য পুরুষেরা অনেকেই তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। এসেছেন দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়-দেশের বীরেরা। কথারম্ভে সমস্ত বিস্তার পরিহার করে কৃষ্ণ প্রথমে বলেছেন—ভূমি এখন রক্ত চাইছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির! জেনে রাখুন, যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমি দুর্যোধন-কর্ণ আর শকুনি-দুঃশাসনের রক্ত পান করবে— দুঃশাসন-চতুর্থানাং ভূমিঃ পাশ্যতি শোণিতম্। এই চার জন এবং যারা তাঁদের অনুগামী তাদের সবাইকে শেষ করে আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব—ততঃ সর্বে অভিষিঞ্চামো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্। লক্ষণীয়, এখানে যুদ্ধের সমস্ত প্রতিজ্ঞাটা আসছে কৃষ্ণের দিক থেকে, যেভাবে ছলনার মাধ্যমে পাণ্ডবদের পরাভূত করা হয়েছে, তাতে পাণ্ডবরা নিজেরা যতখানি ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ, কৃষ্ণ বোধহয় তার চাইতেও বেশি। ছলনাশ্রয়ী কৌরবদের তিনি বধ-দণ্ড দিতে চান—নিকৃত্যাপচরণ্ বধ্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ। সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও কৃষ্ণ আবার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন পাণ্ডবদের। প্রকৃত মিত্রলাভের রাজনৈতিক ফলই এই যে, সে মিত্রের শত্রুকে আপন শত্রু বলে মানতে এবং মানাতে থাকে। কৃষ্ণ যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, সেটাই সঠিক মুহূর্ত বুঝে দ্রৌপদী তাঁর চরম অপমানটুকু বিবৃত করলেন তাঁর কাছে। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ক্রোধ ছিল, অভিমান ছিল এবং ছিল সেই সমর্পণ, যেখানে পাণ্ডবরাও তাঁর সঠিক বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয় হয়ে উঠতে পারেন না— অভিগম্যাব্রবীৎ ক্রুদ্ধা শরণ্যং শরনৈষিণী। পাঞ্চালী কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছেন পাণ্ডবদের স্ত্রী হওয়ার সম্বন্ধ-গৌরবে এবং তার চেয়েও বেশি, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ-গরিমায়। বলেছেন, কেমন করে সম্ভব হয় এই অপমান, আমি পাণ্ডবদের স্ত্রী এবং তোমার বন্ধু, তবু কী করে এটা হল—কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো।

দ্রৌপদী এখানে স্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের কাছে যে যুক্তিতে অনুযোগ করেছেন, তাতে এটা খুব পরিস্কার ছিল যে, পাশাখেলার আসরে যুধিষ্ঠিরের পণবদ্ধতার দায় তাঁর ওপরে বর্তাবে এবং তিনি যদি পণবদ্ধও থাকেন, তবুও তাঁর পঞ্চ স্বামীরই বরং দায় থেকে যায় স্ত্রীকে সুরক্ষা দেবার। তাঁর ভাবটা এই ছিল যে, যুধিষ্ঠির পণবদ্ধ হয়ে আছেন থাকুন তিনি, কিন্তু শক্তি থাকতেও ভীম-অর্জুনের মতো বীর কেন হাতগুটিয়ে বসে থাকবেন— যৌ মাং বিপ্রকৃতান্ ক্ষুদ্রৈ র্মর্ষয়েতাং জনার্দন। তাঁর সমস্ত অপমানটার মধ্যে কৌরবদের রাজ্যলাভের চেয়েও যেটা বেশি হয়ে উঠেছিল, সেটা আসলে যৌনতা—আর ঠিক এখানেই দ্রৌপদীর সবচেয়ে বড় আপত্তি। তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন— পাণ্ডবেরা বেঁচে থাকতেও, তোমরা বৃষ্ণিবংশীয়রা, আমার বাপের বাড়ির পাঞ্চালরা বেঁচে থাকতেও ধৃতরাষ্ট্রের ওই ছেলেগুলো আমাকে কেনা বেশ্যার মতো ভোগ করতে চাইল—দাসীভাবেন মাং ভোক্তুমীষুস্তে মধুসূদন— এই অপমান আমি কী

করে সইব? দ্রৌপদী বারবার এই কথাটার উপর জোর দিয়েছেন যে, এরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল— কোন বংশে আমি জন্মেছি, আর কোন বংশে আমার বিয়ে হয়েছে, সেই সম্মানের জায়গাটা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ওরা আমার চুল ধরে টানল রাজসভায়, আর এরা আমার পাঁচ পাঁচ স্বামীরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল— পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রানাং প্রেক্ষতাং মধুসূদন।

সেই কাম্যক-বনের মধ্যে বৃষ্ণি-পাঞ্চালদের অনেক বীরেরাই দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সবার সামনে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন,যাদের ওপরে আজ তুমি রাগ করে কাঁদছ, দ্রৌপদী! সেই কৌরবদের স্ত্রীরাও একদিন কেঁদে ভাসাবে। অর্জুনের বাণ থেকে রেহাই নেই কারও। আমি বলছি, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, পাণ্ডবদের যা করার, তা তারা করবে। কৃষ্ণের কাছ থেকে কথা শোনার পর অর্জুন এবং দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবপক্ষের প্রমুখ বীরের হত্যার প্রতিজ্ঞা নিলেন। কৃষ্ণ, অর্জুন এবং ধৃতদ্যুম্নের এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের রাজনৈতিক দিকটা হল এই যে, এখন আর শম-শান্তির যৌধিষ্ঠিরী রাজনীতি কাজ করছে না, দণ্ড, শাস্তি এবং যুদ্ধের মাধ্যমে আগে ভূমিলাভ প্রয়োজন—সেটা এই বনের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত এক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠবেই যে, শান্তির চেষ্টাই তো সবচেয়ে ভালো, ক্ষমার চেয়ে বলবতী শক্তিও তো কিছু হতে পারে না। আমরা বলব— মহাভারত এই নীতিই সবচেয়ে বেশি মানে, কিন্তু প্রতিপক্ষের আচার-আচরণ যদি সব সময়েই অন্যায় আঘাত করতে করতে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে উঠতে চায়, তবে প্রত্যাঘাতের রাজনৈতিক কৌশল যুদ্ধকেই সাময়িকভাবে নৈতিক করে তোলে। পাণ্ডবদের বনবাস-কালে এ বিষয়ে তর্ক ওঠে কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যাবার পর। পাণ্ডবরা তখন দ্বৈতবনে প্রবেশ করেছেন বনবাসের কাল চলছে মন্থরতায়, সন্ধ্যা নেমে আসছে অরণ্যকুটিরে। এইরকম একদিন সমস্ত পাণ্ডব বসে আছেন এমন মনস্বিনী দ্রৌপদী অসহ্য রাগে জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠিরকে চেপে ধরলেন রাজনীতির নৈতিকতায়। দ্রৌপদীর প্রশ্নটা এই— তোমার জ্ঞাতিভাইরা আমাদের সবাইকে যেভাবে মৃগচর্ম পরিয়ে বনে পাঠাল—যস্ত্বাং রাজন্ ময়া সার্ধমজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্— তাতে কিন্তু দুর্যোধন-দুঃশাসন কর্ণশকুনিদের এতটুকুও অনুতাপ হয়নি। আমাদের বনে পাঠানোর সময় কুরুসভায় সকলের চোখ দিয়ে জল পড়েছে, কিন্তু ওই চারজনের চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল গড়ায়নি—ইতরেষাং তু সর্বেষাং... নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জ্বলম্।

দ্রৌপদী বলতে চান— দুর্যোধন-দুঃশাসনদের এই যে অনুতাপহীন ঔদাসীন্য অথচ অন্য সকলের অশ্রুপাত ঘটছে, একই ঘটনায় দুই পক্ষের এই আচরণ থেকে সবচেয়ে বেশি বোঝা যায় যে, দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা যা করেছেন, জেনে-বুঝেই তার জন্য কোনও দুঃখ পাচ্ছেন না। অথবা এটাই বুঝেছেন যে, প্রতিপক্ষ দুর্বল, অতএব যা করেছেন তাঁরা, বেশ করেছেন। দ্রৌপদীর বক্তব্য ঠিক এইখানেই। একটা শব্দ তিনি

বারবার ব্যবহার করছেন পাণ্ডবদের এবং তাঁর বিপ্রতীপ সুখচ্ছবি নিয়ে। শব্দটা হল 'অনর্হ'— অযোগ্য— আমাদের কী পাওয়া উচিত ছিল, আর কী পাচ্ছি এবং কেন পাচ্ছি, সুখ পাওয়ার কথা ছিল, অথচ দুঃখ পাচ্ছি, যা পাওয়ার কথা নয়— তাই পাচ্ছি— দুঃখানর্হং সুখোচিতম্। এইরকম একটা তর্কের মুখে দ্রৌপদী তাঁর পাঁচ স্বামীর পূর্বকালীন সুখাবস্থা বর্ণনা করেছেন একে একে এবং বনবাসকালীন কৃচ্ছ্রসাধনের কথাও উল্লেখ করেছেন পরপর। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলতে চেয়েছেন—এমন তো তোমার ত্যাগ-বৈরাগ্য নয় যে, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা থাকাকালীন সময়েও তপস্বিজনোচিত বৈরাগ্যে জীবন কাটিয়েছ। দ্রৌপদী বসন-ভূষণ, অশন-আসন প্রত্যেকটি ভোগ্য বিষয়ের সারণি উল্লেখ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— তুমি আগে এইভাবে চলতে, এখন এইভাবে দীনদশায় চলছো। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং নিজের হীন অবস্থার কথাও পদে-পদে তুলনা-প্রতি তুলনায় তুলে ধরেছেন দ্রৌপদী এবং প্রত্যেকেরই কষ্ট জানানোর পর ধ্রুবপদের মতো এই বাক্য ফিরে ফিরে এসেছে যে, আমাদের যেভাবে থাকার কথা আমরা তার চেয়ে হীন-হীনতর অবস্থায় থাকব কেন এবং আমাদের হীন অবস্থা দেখে তোমারই বা কোনও ক্রোধ তৈরি হয় না কেন— কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে? কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব।

দ্রৌপদী এবার তৎকালীন সমাজের রাজনীতিতে ক্ষত্রিয়-রাজন্যদের স্বাভাবিক বৃত্তির কথা তুলছেন। তিনি বলছেন— ক্রোধহীন কোনও ক্ষত্রিয় আছে বলে আমার জানা নেই। সময়ের প্রয়োজনে যে ক্ষত্রিয় পুরুষ নিজের তেজ প্রদর্শন করে না, লোকে তাকে দুর্বল ভাবে, তাকে অবজ্ঞা করে। দ্রৌপদী এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ-বলির রাজনীতি কথা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছেন। প্রহ্লাদের নাতি হলেন বিরোচনের পুত্র বলি। বলি তাঁর স্থিতধী ঠাকুরদাদার কাছে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন— রাজনীতির কথাটা বলুন তো, ক্ষমা দেখানোই ভালো, না, তেজ দেখানো ভালো? প্রহ্লাদ বলেছেন— সব সময় তেজ দেখানোও যেমন ভালো নয়, তেমনই সব সময় ক্ষমা করাও ভালো নয়—ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা। শুধুই ক্ষমা করে গেলে ভৃত্য, শত্রু, নিরপেক্ষ কেউ তাকে পাত্তা দেয় না, কোনও লোকও তার কাছে নত হয় না, এমনকী উলটে তাকে খারাপ কথাও বলে। খুব সাধারণ লোকও তার ধনসম্পত্তি কেড়ে নেয়। অন্তত রাজনীতির পণ্ডিতেরা শুধুই ক্ষমা-ব্যাপারটাকে খুব খারাপ চোখেই দেখেছেন— তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা।

তেজ কিংবা ক্ষমা প্রদর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই যে দেশ, কাল এবং নিজের সামরিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে—দেশকালৌ তু সম্প্রেক্ষ্য বলাবলমথাত্মনঃ— এবং রাজনৈতিক দিক থেকে যে সেটাই ঠিক, এই কথাটা দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদের বচন হিসেবেই উল্লেখ করেছেন দ্রৌপদী। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমা করা যায়, তার একটা ক্রমিক সূচিও দিয়েছেন প্রহ্লাদ, কিন্তু তার কোনওটাই দুর্যোধন-কর্ণদের সম্বন্ধে খাটে না বলেই দেখিয়েছেন দ্রৌপদী। তিনি বলেছেন— ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা লোভী এবং সব

সময় আমাদের সঙ্গে অন্যায় করে চলেছে। ফলে, এখনই সেই সময় এসেছে যখন তোমার ক্রোধের তেজ প্রদর্শন করা উচিত কৌরবদের প্রতি— তদহং তেজসঃ কালং তব মন্যে নরাধিপ।

যুধিষ্ঠির অবশ্য কোনওভাবেই ক্রোধের উত্তেজনা মেনে নিলেন না। এবং ক্ষমাগুণ নিয়ে বেশ একটা বড় বক্তৃতা দিয়ে দিলেন এবং তাতে যা দেখা গেল এখন, তখন বা কোনও সময়েই রাগ দেখানোর কোনও জায়গাই নেই। বিশেষত এমন কোনও রাগ, যাতে দুর্যোধনকে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলতে হবে, এমন ক্রোধের কোনও জায়গা নেই যুধিষ্ঠিরের অভিধানে। কত অসহনীয় অবস্থাতেও ক্ষমা করাটা প্রয়োজন, সেই সুবৃহৎ বিবরণের মধ্যে অবশ্যই মহত্ত্বের তেজ ছিল যুধিষ্ঠিরের এবং সেই কারণেই অবশেষে তাঁর সিদ্ধান্ত এইরকম—দুর্যোধন ক্ষমা পাবার বা ক্ষমা ধারণ করার যোগ্য নয় বলে আমার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়েছে, এটা নয়; বরঞ্চ আমি ক্ষমা করতে পারি—এই যোগ্যতা আমার আছে বলেই সে ক্ষমা আমাকে আশ্রয় করেছে—অর্হস্তত্রাহমিত্যেব তস্মান্মাং বিন্দতে ক্ষমা।

যুধিষ্ঠিরের এত ক্ষমা দ্রৌপদী সহ্য করতে পারেননি, ফলে এই কথোপকথন অনেক দূর গড়িয়েছিল, কিন্তু দ্রৌপদীর যুক্তি-তর্কের কাছে যুধিষ্ঠিরের তর্কচেষ্টা দুর্বল বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, যুধিষ্ঠির-কথিত ধর্ম এবং ক্ষমার যুক্তি প্রত্যক্ষতই এক নির্বিকার মনঃসমাধির যুক্তি বয়ে আনে, যাতে একজন ক্ষত্রিয় রাজার রাজধর্মবোধ শিথিল হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ-শক্তিহীন ধর্মোখ্যাপনের প্রতি প্রথম আঘাত হেনেছিলেন তাঁর কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তিনি বলেছিলেন—তোমার এত ধর্মবোধ, এত যজ্ঞ-দান-তপ-হোমের জ্ঞান, তার মধ্যে পাশা খেলার এমন ব্যসন-দোষ এসে জুটল কী করে— কথমক্ষব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব। আর খেললেই যদি, তাহলে রাজ্য, ধন, অস্ত্র, ভাইরা এমনকী আমাকেও পণ রেখে জুয়ো খেলার বুদ্ধি কী করে হল তোমার—তুমি না এত সোজা-সরল, এত মৃদু, এত ক্ষমাশীল, এত বদান্য, এত সত্যবাদী; তা তোমার এই বুদ্ধি হল কেন— ঋজোর্মৃদোর্বদান্যস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।

যুধিষ্ঠির এ-সব কথার সোজাসুজি উত্তর দিতে পারেননি, বরঞ্চ কিছু অপ্রসঙ্গে ধর্ম, ক্ষমার পুনরুচ্চারণ এবং দ্রৌপদীর দিক থেকে কিছুই না মানার একটা তিরস্কার জারি হয়েছে। এইবার দ্রৌপদী একেবারে শুদ্ধ রাজনীতির কথায় এসেছেন। তির্যকভাবে বলেছেন—এত বড় মানুষের কাছে আরও একটু নয় প্রলাপ বকব আমি, আরও একটু নয় বিলাপ করব, তুমি তো খুব ভালো মানুষ, তাই আরও একটু শোনো— ভূয়শ্চ বিলপিষ্যামি সুমনাস্ত্বং নিবোধ মে। দ্রৌপদী বলেছেন— কাজ তো কিছু করতেই হবে— কর্ম খল্বিহ কর্তব্যং— বসে থাকলে তো চলবে না। জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে হলে উদ্যম তো কিছু চাই,রাজনৈতিক ভাষায় যার নাম 'উত্থান শক্তি'—উত্থানমভিজানন্তি সর্বভূতানি ভারত। দ্রৌপদী সাধারণ লোকের কথা বললেও

তিনি রাজনীতির কথা বলছেন, তা ওই 'উত্থান' শব্দটি থেকেই বোঝা যায়। সাধারণভাবে 'উত্থান' শব্দটার মানে হল উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা, কিন্তু প্রাচীন রাজনীতির পারিভাষিকতায় 'উত্থান' শব্দটি সেই রাজার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, যিনি নিশ্চেষ্টভাবে বসে না থেকে দিনরাত নিরলসভাবে রাজ্যলাভ এবং রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করছেন। যে ভূমিলাভ বা রাজ্যলাভ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই ভূম্যর্থলাভের মূল চালিকাশক্তি হল উৎসাহ এবং নিরন্তর অধ্যবসায়, যাকে পারিভাষিক শব্দে উত্থান বলা হয় রাজনীতি শাস্ত্রে। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্তে বনবাসে বসে আছেন, ভাইরা শিকার ধরে আনছে, তিনি ব্রাহ্মণদের খাওয়াচ্ছেন, ধর্মোপদেশ শুনছেন, কিন্তু একবারও হৃতরাজ্যের জন্য দুঃখবোধও করেন না, দুর্যোধনদের কথা তো তিনি উচ্চারণও করেন না পাছে ভাইরা এবং দ্রৌপদী ক্ষুব্ধ হয়ে দুটো কথা বলে ফেলেন।

রাজনৈতিকভাবে এই নিশ্চিন্ততা এবং সন্তোষের অলস আসনটি যে রাজাদের কোনও গুণের কথা নয়, সেইজন্যই দ্রৌপদী উত্থানের প্রসঙ্গ তুলেছেন। পরবর্তী সময়ে কৌটিল্য স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, 'অর্থ' নামে যে পুরুষার্থটি আছে তার মূল উৎস হল উত্থান— অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্— যিনি রাজা হতে চাইবেন তাঁকে এই নিরলস উদ্যমের জায়গাটাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে—রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানম। আর রাজা যদি চেষ্টাহীন 'অনুত্থায়ী' হয়ে বসে থাকেন, তাতে তাঁর যা আছে, তাও যাবে, আর যা নেই তা পাওয়া তো দূরের কথা, সর্বনাশ হবে তাঁর অনুত্থানে ধ্রুবো নাশঃ প্রাপ্তস্যানাগতস্য চ। যুধিষ্ঠিরের ঠিক এই অবস্থা হয়েছে, তার যা ছিল সব গেছে, এখন যা নেই অথবা যা গত হয়েছে, তা ফিরে পাবার জন্যই দ্রৌপদী সাধারণ লোকের অছিলায় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, জলের কাছে ওই বকটা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে সময় বুঝে মাছ ধরার জন্য, তেমনই ধাতা, বিধাতা সকলেই উত্থানের মাধ্যমে জীবন ধারণ করেন— সর্বে হি স্বং সমুত্থানম্ উপজীবন্তি জন্তবঃ। দ্রৌপদী এখানে প্রারব্ধ কর্ম থেকে আরম্ভ করে পুরুষকার নিয়ে বিশাল বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তার নিষ্কর্ষ একটাই—খাবার জন্য ধান রুইতে গেলেও লাঙল দিয়ে জমিটা চষতে হয়। কাজটা তো আরম্ভ করতে হবে। আরম্ভ-চেষ্টায় ভালো ফল না হলেও অল্প ফল হতে পারে, কিন্তু আরম্ভটাই যদি না করি, তাহলে ফলটাই বা হবে কোত্থেকে, কিংবা খারাপ ফল হলে, কেমন করে করলে ভালো হত সেটা বুঝব কোত্থেকে—অনারম্ভে তু ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে ক্বচিৎ।

আরম্ভ, উত্থান—এইসব রাজনীতির পরিভাষায় যুধিষ্ঠির খানিক আবিদ্ধ হতেই মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন একেবারে ফেটে পড়লেন যুধিষ্ঠিরের ওপর। সত্যে স্থিতি এবং প্রতিজ্ঞার কারণে যুধিষ্ঠির পাশা খেলার আসরে সব হারিয়েও কিছু করতে পারেননি এবং বনবাসে থেকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন— ভীম বলছেন— যুধিষ্ঠির এই ক্ষুদ্র ধর্মের পালন করতে গিয়ে রাজার করণীয় বৃহদাদর্শগুলিই মানছেন না। শক্তিশালী হওয়া

সত্ত্বেও অন্যায় সহ্য করার মধ্যে যে ক্ষমাবৃত্তির অনুশীলন, সেটাকে দুর্যোধনেরা পাণ্ডবদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা বলে ভাবছেন— এটা ভীমের প্রতিপাদ্য ছিল। ভীম যুধিষ্ঠিরের অতি-ধর্ম সহ্য করতে পারছেন না। দ্রৌপদীর কথাই তিনি আর একটু চড়িয়ে যুদ্ধের কথায় নিয়ে এলেন এবং প্রচুর তিরস্কারের পর কেকয়, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণি-বীরদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন দুর্যোধনের ওপর।

দ্রৌপদী এবং ভীম—দু'জনের তীব্র তিরস্কারে একটা কাজ হল যে, যুধিষ্ঠির অন্তত যুদ্ধের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠিরের কথায় এইটুকু সারবত্তা ছিল যে, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, এই সব ভয়ংকর বীরদের হত্যা না করে দুর্যোধনের কাছে পৌঁছানোই যাবে না অতএব অস্ত্রশস্ত্রে শক্তি থেকে আরম্ভ করে মিত্রশক্তি আরও বাড়ানো দরকার। ঘটনার গতি অবশ্য সেইদিকেই ঘুরল। ব্যাসের কাছে প্রতিস্মৃতি বিদ্যালাভ করে অর্জুন অলৌকিক অস্ত্রসংগ্রহের জন্য তপস্যায় গেলেন। এই তপস্যার প্রকার এবং ফল নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না, তাঁর অস্ত্রগুলি শিবের দেওয়া না ইন্দ্রের দেওয়া, তার অলৌকিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই এখানে, কিন্তু বোঝা দরকার এইটুকুই যে, অর্জুন প্রচুর অর্থশস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন, যা ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য অনেকের মনে ভয় ধরিয়ে দিল। পাণ্ডবদের বনবাস-কালে অথবা অজ্ঞাতবাস-কালে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তারও সবিস্তার কোনও বিবরণ প্রয়োজনীয় নয় এখানে।

যদিও বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস পর্বের অনেক ঘটনাই খুব রোমাঞ্চকর এবং সেগুলি থেকে যুধিষ্ঠির তথা অন্যান্য পাণ্ডবদের মানসিক শক্তির অনন্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু সব কিছুর থেকেও যেটা বেশি জরুরি,সেটা হল সত্য এবং ন্যায়ের জন্য পাণ্ডব এবং পাণ্ডব-ঘরণী দ্রৌপদীর কৃচ্ছ্রসাধন সমস্ত প্রজাবর্গের মধ্যে এবং অবশ্যই লোকচক্ষুতে দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে এক বিষম প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণেরা যাঁরা রাজনৈতিক ন্যায়ের জন্য ক্ষত্রিয়দের পরামর্শ দিতেন, তাঁরা অনেকেই কৌরব ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনকে ত্যাগ করে বনবাসের কালেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনে চলে গিয়েছিলেন। এক বন থেকে আর এক বনে সঞ্চারমান যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ব্রাহ্মণদের ভরণ-পোষণ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল এবং সে কথা যুধিষ্ঠির স্পষ্ট জানিয়েওছিলেন, কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন— মহারাজ! বনে আপনাদের যে অবস্থা হবে, আমরাও সেই অবস্থাই ভোগ করব—গতি র্যা ভবতাং রাজন্ তাং বয়ং গন্তমুদ্যতাঃ। যুধিষ্ঠির চিন্তিত ছিলেন— তাঁরা ব্রাহ্মণদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করবেন কী করে? ব্রাহ্মণরা বলেছিলেন— এ-বিষয়ে আপনাদের কোনও চিন্তা করতে হবে না, আমাদের খাবার-দাবার আমরা নিজেরাই জোগাড় করব— স্বয়মাহৃত্য চান্নানি উপযোক্ষ্যামহে বয়ম্।

আপনাদের মনে হতে পারে—মহাভারতীয় রাজনীতির কথায় আমরা হঠাৎ বামুনদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন। ঘামাচ্ছি এই কারণে যে মহাভারতীয় কালে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাঁরা আইন প্রণয়ন করতেন

এবং রাজনীতির সমস্যায় তাঁরাই ছিলেন উপদেষ্টা। সেই তাঁরা অনেকেই ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের সঙ্গ ত্যাগ করে বনে চলে এলেন এবং সেখানে নিজের ভরণ-পোষণ তাঁরা নিজেরা করবেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকবেন, এই মনোভাবটা দুর্যোধনের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সেটাই ঘটল। এরপর বারোটা বছর ধরে সস্ত্রীক পাণ্ডবদের কৃচ্ছ্রসাধন প্রজাসাধারণ এবং ব্রাহ্মণদের মনে যুধিষ্ঠিরসহ পাণ্ডবদের সম্পর্কে এক রাজনৈতিক এবং নৈতিক সমব্যথা তৈরি করে দিল। যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতিতে দুর্যোধন আরও ভালোভাবে রাজত্ব চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, সে খবর আমরা বনপর্বেই পেয়েছি, এমনকী কর্ণ পর্যন্ত ব্রত উদ্‌যাপন করে দান-ধর্মে মতি দিলেন। কিন্তু কোনওভাবেই তাতে এই দায় মুছে গেল না যে, ন্যায় অনুসারে পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজ্যাধিকার থেকে পাণ্ডবদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। বনবাসী পাণ্ডবদের বার বার উত্ত্যক্ত করার চেষ্টাও করলেন দুর্যোধন। কিন্তু সেগুলি বিফলে গেল, বরঞ্চ ফলটা উলটো হয়ে দুর্যোধনের বিরুদ্ধতা তৈরি করল। পাণ্ডবদের উত্ত্যক্ত করতে গিয়ে গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে দুর্যোধন বন্দি হলেন, কর্ণ পালাতে বাধ্য হলেন এবং অবশেষে কর্ণের জীবন-রক্ষার হেতু সোনার বর্ম এবং স্বর্ণকুণ্ডল খোয়া গেল দেবরাজ ইন্দ্রের চাতুরীতে।

অজ্ঞাতবাস-পর্বের শেষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের যে স্টেজ রিহার্সাল হয়ে গেল, সেখানে রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল পূর্বেই। বনবাসের কালেই অর্জুন যখন বিপুল অস্ত্রলাভ করে পুনরায় পাণ্ডব-ভাইদের সঙ্গে মিলিত হলেন, সেই খবর ধৃতরাষ্ট্রের কানে পৌঁছেছিল স্বয়ং ব্যাসের মাধ্যমে। সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র খুব উদ্বিগ্নভাব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সন্তানদের ওপর তখন তাঁর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে। দুর্যোধনেরা হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থে এতকাল রাজত্ব চালিয়ে পাণ্ডবদের ফিরে আসাটা আর চান না। অজ্ঞাতবাসের শেষের দিকে তাই কৌরব দুর্যোধনের মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল। অজ্ঞাতবাসের প্রথম থেকেই পাণ্ডবদের খুঁজে বার করবার জন্য দুর্যোধন চর লাগিয়েছিলেন, কেন না শর্ত ছিল—অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের তথ্য জানতে পারলে আবার বারো বছরের জন্য তাঁদের বনে যেতে হবে। কিন্তু অজ্ঞাতবাস শেষ হবার অল্প সময়ই যখন বাকি, তখন গুপ্তচরেরা এসে দুর্যোধনকে খবর দিল—আমরা বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পাণ্ডবদের কোনও খবর আমরা জানতে পারিনি—নরেন্দ্র বহুশো'ন্বিষ্টা নৈব বিদ্মশ্চ পাণ্ডবান্।

নিরুপায় দুর্যোধন অন্তর্মনা হলেন ভবিষ্যতের ভয় সম্বন্ধে, কিন্তু বাইরে তাঁর কোনও বিকার হল না। বারবার তিনি চরদের বলতে লাগলেন—আরও ভালো করে খোঁজ, সময় তো আর বেশি নেই—অল্পাবশিষ্টং কালস্য। আর একবার যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে খোঁচা-খাওয়া সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আসবে তারা। কৌরবদের কাছে সেটা বেশ কঠিন এবং খারাপ ব্যাপার হবে—দুঃখা ভবেয়ুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান

প্রতি তে ধ্রুবম্। দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ একটু রেগেই গেলেন। তবে তাঁর রাগটা বেশি হল গুপ্তচরদের ওপরে। দুর্যোধনকে তিনি বললেন—তুমি আরও দক্ষ, ধূর্ত গুপ্তচরদের কাজে লাগাও—অন্যে ধূর্ততরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ। তারা সব জায়গা দেখে এসে খবর দিক। দুঃশাসনও ঠিক একই মত প্রকাশ করলেন কর্ণের মতো। অর্থাৎ নতুন দূত পাঠাও—নিদেনপক্ষে তারা এইটুকু খবর আনুক যে, তারা লুকিয়ে আছে, না সাগর পার হয়ে পালিয়েছে, নাকি বাঘ-সিংহের পেটে গেছে তারা।

লক্ষণীয়, একটা অদ্ভুত 'ফ্রাস্ট্রেশন' কাজ করছে কৌরবদের মধ্যে। নইলে কর্ণের মতো মহাবীর, যিনি এককালে যুদ্ধ ছাড়া কথা বলতেন না, তিনি 'দক্ষতর' গুপ্তচর পাঠাতে বলছেন পাণ্ডবদের খুঁজে বার করার জন্য। আরও লক্ষণীয়, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দ্রোণাচার্য বললেন—তারা কোথাও হারিয়েও যায়নি, মরেওনি কোনওভাবে—তারা বীর, তারা বিদ্যা জানে, তারা বুদ্ধিমান এবং তার' সংযমী। তাদের বরঞ্চ কীভাবে অভিবাসিত করা যায়, সেই কথা ভাবো, তারা ঠিক বেঁচে আছে। ভীষ্ম এবং কৃপের কাছ থেকে প্রায় একই রকম কথা শোনা গেল। এইসব কথা যখন চলছে, তখনই ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা এসে বিরাট রাজার মৎস্যদেশ আক্রমণ করার প্রস্তাব দিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট কৌরবদের পূর্বশত্রু, কিন্তু বিরাট রাজার শালা মহাবীর কীচক বেঁচে থাকায় তখন এঁরা কিছুই করতে পারেননি বিরাটকে। এখন সময় এসেছে তাঁদের ওপরে আক্রমণ করার।

এই প্রস্তাবে স্বাগত জানালেন কর্ণ এবং দুর্যোধনকে বললেন সেনা প্রস্তুত করার জন্য। হঠাৎই তাঁদের নজর ঘুরে গেল, কর্ণ এমনও মত প্রকাশ করলেন যে, যাদের অর্থ নেই, বল নেই, পৌরুষ নেই, সেই ভিখারি পাণ্ডবদের খুঁজে কী হবে! ওরা চিরতরে কোথাও পালিয়েছে অথবা যমের বাড়ি গেছে। কাজেই ছাড়ো ওদের কথা—কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ। দুর্যোধন-কর্ণদের ধারণা এই রকম যে, অজ্ঞাতবাসে আছেন বলেই পাণ্ডবদের অর্থ থাকবে না, অর্থ না থাকলেই বল এবং পৌরুষ থাকবে না। কিন্তু দ্রোণ-ভীষ্মেরা যে কথাটা বললেন, তাতে কানই দিলেন না তাঁরা। বস্তুত দ্রোণ-ভীষ্মেরা যেটা বলেছেন, সেটা প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির এক গূঢ় দার্শনিকতা মাত্র। মনু থেকে মহাভারত, কৌটিল্য থেকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকেই একটা শব্দের উল্লেখ করেন যার নাম বিনয়। বিনয়-শব্দটা ইংরেজির 'মডেস্টি' নয়, এটি এমন এক ব্যাপ্ত শব্দ যা সমস্ত দণ্ডনীতির মূল। কৌটিল্য বলেছেন— বিনয়মূলো দণ্ডঃ—অর্থ সৈন্য-সেনাপতি, রাজশাসন, রাজদণ্ড, বলপ্রয়োগ বা Coercion- এই সব কিছুর মূলে থাকতে হবে বিনয়।

মনু-কৌটিল্য যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, বিনয় হল এক ধরনের, Control, এটা শুধু ইন্দ্রিয়-সংযম নয়, এটা সার্বিক এবং ব্যাবহারিক এক অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। কৌটিল্যের মতে বিনয় দুরকম— কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক। যিনি যে-বিষয় জানেন, সেইরকম গুরুর সেবা, শ্রবণ, গ্রহণ, নিজের মধ্যে অধীত বিষয় ধারণ, বিশিষ্ট বিষয়ের

সম্যক জ্ঞান, তর্ক-যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন এবং প্রকৃত সত্যকে জানার আকুলতা—এগুলির দ্বারা যার বুদ্ধি পরিশীলিত হয়েছে— কৌটিল্য বলেছেন— বিদ্যা তাকেই শিক্ষিত করে, বিনীত করে এবং তাকে শেষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। বুদ্ধি পরিশীলনের উপায় হিসেবে শুশ্রূষা-শ্রবণ, গ্রহণ-ধারণ ইত্যাদির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, কৌটিল্য তার একক নাম দিয়েছেন প্রজ্ঞাগুণ, যে গুণগুলি মানুষকে বিনয়-শিক্ষা দেয়। এই প্রজ্ঞাগুণ—সংবলিত বিনয় যদি দণ্ডের মূলে থাকে তবে সে কখনওই Coercion বা বলপ্রয়োগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। হ্যাঁ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হতেই পারে, কিন্তু সেই বলপ্রয়োগের পিছনে যদি বিনয়-শিক্ষার নিদান থাকে তাহলে সেটা রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রবাসী মানুষের এবং রাজার নিজেরও অলব্ধ-লাভে সাহায্য করে এবং লব্ধ-বিষয়ের রক্ষণে সহায় হয়ে ওঠে। প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ মনু রাজাদের প্রতি এক সাবধানী-বাণীতে বলেছেন—অবিনয়ের ফলে কত যে রাজা তাঁর মন্ত্রী-অমাত্য সেনাপতি সহ নষ্ট হয়ে গেছেন, তার শেষ নেই, আর বিনয়যুক্ত রাজা যদি বনবাসী হয়েও দিন কাটান, তবে আপন নিষ্ঠা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর অদম্য প্রাণশক্তিতেই তিনি রাজ্য লাভ করবেন—বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ মনুর সঙ্গে যুক্তি করে বনে যাননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে যে প্রজ্ঞাগুণ- সমন্বিত বিনয়ের পরিশীলন আছে, সেটা দ্রোণাচার্যের 'এপিথেট'গুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়—শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ। মহাভারত বিনীত, বিনীতাত্মা শব্দগুলি অসংখ্যবার যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে ব্যবহার করেছে এবং এইরকম আরও একটি শব্দ 'শীল', যেটাকে চারিত্রগুণ বিনয়ের সঙ্গে একাত্মক করে দেখা যায়, সেই শব্দটা মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের মুখে উচ্চারিত হয়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গেই এবং ভীষ্ম তা উচ্চারণ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের জবানীতে— ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন এই 'শীল' যুধিষ্ঠিরের আছে কিন্তু দুর্যোধনের নেই। লক্ষণীয়, 'বিনয়' এবং 'শীল'—এই দুটি শব্দই বুদ্ধের ধর্মদর্শনে বহুলভাবে ব্যবহৃত এবং সেখানেও এই দুটি শব্দ শুধুমাত্র 'মডেষ্টি' কিংবা 'ক্যারেকটার' হিসেবে অনুশীলিত নয়। যুধিষ্ঠির সারা বনবাস-কাল জুড়ে মুনি-ঋষিদের কাছে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তীর্থ-পর্যটনের নামে অনন্ত দেশ দর্শন করেছেন, মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। অতএব শুশ্রূষা-শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, বর্জন, উপলব্ধি— সব কিছু যুধিষ্ঠিরকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যা ভবিষ্যতের যুদ্ধোদ্যোগে তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

কর্ণ এবং দুঃশাসন নতুন গুপচর নিয়োগ করেন যখন পাণ্ডবদের খোঁজ করতে বলেছিলেন, তখন দ্রোণ-ভীষ্মরা যুধিষ্ঠিরের চারিত্র-প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দ্রোণ-ভীষ্মের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে—সাধারণত কৃপাচার্য তাই করে থাকেন—কিন্তু তা না করে কৃপাচার্য বুঝি সবচেয়ে সার্থক রাজনৈতিক উপদেশ দিলেন দুর্যোধনকে। কৃপ বলেছিলেন—পাণ্ডবরা এখনও লুকিয়ে আছেন অজ্ঞাতবাসে,

কিন্তু তাঁদের প্রকাশ-কাল এগিয়ে আসছে, এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্রে এবং পররাষ্ট্রে তোমার শক্তি কতটুকু আছে, সেটা আগে বুঝে নেবার চেষ্টা কর—স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্রেষু জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ। কৃপাচার্য ধরেই নিয়েছেন—পাণ্ডবদের খুঁজে বার করতে পারবেন না দুর্যোধন। অতএব বাস্তব পরিস্থিতি এটাই যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হলেই বীর পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করতে আসবেন, এই অবস্থায় নিজেদের সৈন্য-সামন্ত বাড়ানোর জন্য এবং রাজকোষ বৃদ্ধি করার জন্য যে-যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, কৃপাচার্য সেই ব্যাপারে অবহিত হতে বলেছেন দুর্যোধনকে। কেননা সৈন্য-সামন্তের শক্তি এবং রাজকোষের অবস্থা বুঝেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে অথবা যুদ্ধ—কৃপাচার্য সবচেয়ে জোর দিচ্ছেন পররাষ্ট্রীয় নীতির ওপর। যাঁরা যুদ্ধে দুর্যোধনের সহায় হবেন তাঁরা প্রবল না দুর্বল অথবা দুর্যোধনের নিজের সৈন্য-সামন্তেরা খুব ভালো, না মাঝারি, নাকি একেবারেই খারাপ, তারা খুশি আছে না অখুশি—এই সমস্ত অবস্থা বিচার করেই ঠিক করতে হবে যে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত না যুদ্ধ-বিগ্রহ করা উচিত—উচ্চাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থঞ্চাপি ভারত।

সন্ধিই হোক অথবা যুদ্ধ, কৃপাচার্য সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রে দুটি প্রধান অঙ্গ দণ্ড এবং কোশের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন, এই দুটি অঙ্গের কথা উচ্চারণও করছেন একই সঙ্গে। এর থেকেও বড় ঘটনা হল—কৃপাচার্য বলেছেন—কোশ এবং বলই পররাষ্ট্রে তোমার নীতি-নির্ধারণের পক্ষে প্রধান বিচার্য বিষয়—সুকোশবলসংবৃদ্ধঃ সম্যক্ সিদ্ধিমপাপ্স্যসি—এই দুটির ওপরে নির্ভর করেই তোমাকে বুঝতে হবে যে, তোমার কোশ-বলের ক্ষমতা বেশি থাকলে তুমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ক্ষমতা কম থাকলে শত্রুর সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতে হবে এবং মাঝে মাঝে গুপ্তচর-গুপ্তঘাতকদের দিয়ে শত্রুরাজ্যে উচ্চ পদাধিকারিকের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পার বা অন্তর্ঘাত করতে পার। শুক্রচার্যের এই কথাগুলির অদ্ভুত প্রতিফলন ঘটেছে কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য অনেক সময়েই কোশ এবং দণ্ডকে (মহাভারতে 'বল') পরস্পরের প্রতিপূরক হিসেবে একত্রে সন্নিবেশ করেছেন, যা মনু থেকে আরম্ভ করে অন্য রাজনীতি শাস্ত্রজ্ঞরা করেননি।

পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৌটিল্য তিন রকমের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম মন্ত্রশক্তি, অর্থাৎ মন্ত্রী-অমাত্যের সঙ্গে আলোচনা করে নীতি-নির্ধারণ। দ্বিতীয় প্রভুশক্তি, যার অর্থ-যে শক্তির মাধ্যমে রাজা নিজের প্রভাব-ক্ষমতা প্রকাশ করবেন। এই প্রভুশক্তির মূল উপাদান হল কোশ এবং দণ্ড—কোশ-দণ্ডবলং প্রভুশক্তিঃ। আর তৃতীয় উৎসাহ-শক্তি, যার কথা আগেই বলেছি মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে। কৌটিল্যের মতে দণ্ড বা সৈন্য-সামন্ত যেমন কোশ-সংগ্রহে সাধন-সহায়, তেমনই কোশও আবার সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহের একমাত্র উপায়। কোশ এবং দণ্ডের ক্ষমতা বেশি হলেই এই কোশভূষণা বসুমতীকে লাভ করা সম্ভব—পৃথিবী কোশ-দণ্ডাভ্যাং প্রাপ্যতে কোশভূষণা। পরবর্তীকালে লেখা কৌটিল্যের মতের সঙ্গে এইখানেই যে শুধু মহাভারতীয় কৃপাচার্যের কথা মিলে গেল, তা নয়, কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির যখন সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের সার্বিক বিপর্যয়ে কী করতে হবে বলে প্রশ্ন তুলছেন, তখন ভীষ্ম বলেছিলেন—রাজার রাজকোষ যদি ক্ষীণ হয়ে যায়, তবে রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ বল (দণ্ড) অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত সব নষ্ট হয়ে যাবে—রাজ্ঞঃ কোশক্ষয়াদেব জায়তে বলসংক্ষয়ঃ। ভীষ্মের মত হল—জলহীন মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত লোক যেমন যেভাবে হোক প্রাণ বাঁচানোর জন্য জল জোগাড় করার চেষ্টা করে, তেমনই রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ বিপর্যয়ে রাজা আগে কোশ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করবেন—কোশঞ্চ জনয়েদ্ রাজা নির্জলেভ্যো যথা জলম্। যদি অর্থসঞ্চয় বা কোশ তৈরি হয়ে যায় তবে সেই অর্থসঞ্চয়ের মাধ্যমেই রাজা সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রের ষষ্ঠ অঙ্গ দণ্ডের শক্তি বাড়াতে পারবেন—রাজ্ঞঃ কোশবলং মূলং কোশমূলং পুনর্বলম্।

ভীষ্মের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় যে, রাজনীতিবিদ হিসেবে কোশ এবং দণ্ডের পারস্পরিক প্রতিপূরণে বিশ্বাস করলেও ভীষ্মের জোরটা যেন কোশের ওপর বেশি। তাহলে সমস্যা একটাই দাঁড়ায় যে, অর্থশাস্ত্রের মধ্যে ভীষ্মের মত (অর্থশাস্ত্রে ভীষ্মের ব্যবহারিক নাম কৌণপদন্ত) বলে কৌটিল্য যেটা উল্লেখ করেছেন, সেখানে কিন্তু কোশের চেয়ে দণ্ডের ওপরেই ভীষ্ম বেশি জোর দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্রে পূর্বাচার্য হিসেবে কৌণপদন্ত ভীষ্মের মত হিসেবে কৌটিল্য জানিয়েছেন যে, ভীষ্ম মনে করেন—রাজনৈতিক 'অ্যালাই' বা মিত্র-সংগ্রহ, শত্রুর নিগ্রহ, অন্যের সেনাকে নিজের উপকারে লাগানো, শত্রুর বলনাশ করার জন্য সৈন্য-সামন্তকে ব্যবহার করা— এই সমস্ত বিষয়ের মূলে আছে দণ্ড বা সেনা। দণ্ডের অভাবে কোশের নাশও নিশ্চিত ঘটবে। কারণ উপযুক্ত দণ্ডের ভয় না থাকলে কোশ সংগ্রহই সম্ভব নয়। কিন্তু কোশের অভাব হলেও তামা-লোহা ইত্যাদি আকর দ্রব্যের দ্বারা, ভূমিলাভের দ্বারা, অথবা অন্যের বা শত্রুর জমি অধিগ্রহণ করে সেগুলির মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করে দণ্ডবলকে পুনরায় সংগঠিত করা যায় এবং সেই দণ্ডবলের সূত্রে পুনরায় কোশ সঞ্চয় করা যায়। কিন্তু দণ্ড বা সৈন্যবল ভেঙে গেলে কিছুই সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, কৌটিল্য ভীষ্মের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা তাঁর মতে দণ্ডের মূলে আছে কোশ। কেননা অর্থ থাকলে অর্থ দিয়েই সৈন্য-সংগ্রহ করা যায়। আর অর্থ না থাকলে সেই রাজার সেনা অন্য রাজার হস্তগত হয় অথবা ভক্ত-বেতন-মাইনে না পেয়ে সৈন্য-সামন্ত স্বামী-রাজাকেই হত্যা করে। আমরা বলব—মহাভারতে ভীষ্মের মতও যে তাই অর্থাৎ কিনা কোশ বা অর্থসঞ্চয়ের ওপরেই যে তাঁর জোর বেশি, সে-কথা তো আমরা মহাভারত থেকেই একটু আগে দেখিয়েছি। তাহলে কৌটিল্য দণ্ডের ওপর তাঁর জোর বেশি বলে ভীষ্মের মত প্রচার করলেন কেন? তার একটাই কারণ এবং সেটাই হল কোশ-দণ্ডের পারস্পরিক প্রতিপূরণের জায়গা, যা কৌটিল্যও মানেন। মহাভারতে ভীষ্ম কোশ বা অর্থসঞ্চয়ের মূল্য দণ্ডের চেয়েও বেশি—এ কথা বলার পর ভীষ্ম বলেছেন—যখন রাজার সার্বিক ক্ষতি হয়ে গেছে, কিছুই নেই, তখন তাকে বললাম—জলহীন জায়গায় তৃষ্ণার্ত্ত লোক যেমন, যেভাবে-হোক জল জোগাড়

করে, রাজাকেও সেইভাবে অর্থসঞ্চয় করতে হবে—এটা বললাম বটে, তবে সেই অর্থ সঞ্চয়টা তৈরি হবে কোত্থেকে? ভীষ্ম বলেছেন—সব কিছুই বিপন্ন অবস্থায় চলে গেলে অন্যায়ভাবে ক্ষত্রিয় রাজাকে নিজের বৃত্তি তৈরি করতে হবে—আপদ্‌গতেন ধর্মাণামন্যায়েনোপজীবনম্। দরকার হলে বিশিষ্ট অর্থবান লোকের কাছ থেকে জোর করেই অর্থসংগ্রহ করতে হবে। সেই মুহূর্তে হিংসা ছাড়া ক্ষত্রিয় রাজার কাছে আর কোনও পথ খোলা নেই। একজন রাজার পক্ষে কপালে যা আছে, হবে—এই ভেবে অবসন্ন হয়ে বসে থাকার কোনও উপায় নেই, অতএব তাঁকে জোর খাটাতে হবে, দরকার হলে হিংসাও করতে হবে—অন্যত্র রাজন্ হিংসায়া বৃত্তি র্নেহাস্তি কস্যচিৎ।

ভীষ্মের এই কথাতেই কৌটিল্য ধরে নিয়েছেন যে, ভীষ্ম কোশের চাইতে দণ্ডের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি মহাভারতে ভীষ্ম যেটা বলেছেন, কৌটিল্যও ঠিক তাই বলেছেন। ভীষ্ম মনে করেন—রাজার পক্ষে রাজা হয়ে বসার জন্য কোশ-বলই সব, কিন্তু কোশ সঞ্চয়ের জন্য দণ্ডের প্রয়োজন। দুটিই দুটির প্রতিপূরক, কেননা কাউকে পীড়িত না করে কোশ-সংগ্রহ করাই সম্ভব নয়, সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করা তো দূরের কথা—নান্যান্ অপীড়য়িত্বেহ কোশঃ শক্যঃ কুতো বলম্। কোশ আর দণ্ড যদি প্রতিপূরকের কাজ না করত, তাহলে কৌটিল্যও রাজার প্রভুতার শক্তিতে কোশ এবং দণ্ডের একত্র আধান ঘটাতেন না অথবা বলতেন না যে, এই কোশভূষণা পৃথিবীকে কোশ আর দণ্ডের মাধ্যমেই লাভ করতে হয়।

পাঁচ

কৃপাচার্যের জ্ঞানগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশ বিফলেই চলে গেল, কর্ণের কথায় দুর্যোধনের মনে হল—বিরাট রাজার রাজ্য আক্রমণ করবেন, কীচক বেঁচে নেই, অতএব বন্ধু সুশর্মার শত্রু বিরাটকে তিনি উচিত শিক্ষা দেবেন। ঠিক হল—সুশর্মা আগের দিন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে বিরাটের পশুসম্পদ গোহরণ করবেন। পরের দিন কৌরবরা অন্য দিক থেকে এসে আর এক প্রস্থ গোহরণ করবেন। দুর্যোধনের উন্মাদনায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামাদের বিরাট-রাজ্যে যেতে হল দুর্যোধনের সঙ্গে। তাঁরা অবশ্য কেউ এটা অনুধাবন করলেন না যে, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা যেদিন বিরাট-রাজার গোধন হরণ করার জন্য বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করলেন, সেদিন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়-সীমা পেরিয়ে গেছে—তত্র ত্রয়োদশস্যান্তে তস্য বর্ষস্য ভারত। সুশর্মণা গৃহীতস্তু...।

আমরা জানি, কৌরবদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বিরাটপুত্র উত্তরের সারথ্যে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। এই ঘটনার বিস্তার আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা সামান্য ঘটনা কৌরব-গৃহের গার্হস্থ্য রাজনীতিটাকে একেবারে বিকটভাবে প্রকট করে তুলল সমরাঙ্গনে প্রায় উপস্থিত অর্জুনের গাণ্ডীব-টংকার, তার রথশব্দ এবং শঙ্খরব—এই তিনের সম্মিলিত ঘোষণায়

দ্রোণাচার্যের মনে হল অর্জুন এসেছেন যুদ্ধ করতে। দ্রোণাচার্য একবার/দুবার আবেগ-তাড়িত হয়ে প্রিয়শিষ্যের এই সাড়ম্বর আগমনের কথা বলেও ফেলেছিলেন, এবং তার ফলেই কৌরব-গৃহের অন্তঃকহলের সূত্রগুলি যেমন বাইরে চলে এল, তেমনই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ দুর্যোধন-কর্ণরা নিতে চাইছেন, তার 'স্ট্র্যাটেজিক' দুর্বলতা বা সমস্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধও প্রকট হয়ে উঠল।

দ্রোণ অর্জুনের আগমন-সংশয় প্রকাশ করতেই দুর্যোধনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছিল—তাহলে তো ভালোই হল, অজ্ঞাতবাসের কাল এখনও বাকি আছে, ওদের আবার বনে যেতে হবে—পুনর্দ্বাদশবর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ। অর্থাৎ ছলনা-লব্ধ রাজৈশ্বর্যের আনন্দে দুর্যোধন ভুলেই গেছেন যে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারটা তাঁর অন্তর্হৃদয়ে নিশ্চয়ই এক ধরনের বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে—যা তিনি প্রকাশ করছেন না হয়তো, কিন্তু এত স্বাভাবিকভাবে তাঁর মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে আসবে কেন—অতি লোভে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তিকাল বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমাদের আবার গণনায় কোনও ভুল হচ্ছে না তো—লোভাদ্ বা তে ন জানীয়ুরস্মান বা মোহ আবিশৎ—যা হোক ভীষ্ম বুঝুন সেটা। এই সংশয়-দোলাচলের মধ্যেই কিন্তু আলোচ্য হয়ে উঠলেন অর্জুন। দুর্যোধন বললেন—গোধন-হরণের প্রতিক্রিয়ায় এখানে বিরাটপুত্র উত্তরের আসার কথা, নইলে স্বয়ং বিরাটের আসার কথা, কিন্তু যদি শুনি অর্জুণ এসেছেন, তাহলে উপায় কী, আমাদের যুদ্ধ করতে হবে—সর্বৈর্যোদ্ধব্যমস্মাভিঃ যদি বীভৎসুরাগতঃ।

প্রিয়শিষ্য অর্জুনের আগমনে দ্রোণ যে সোচ্ছ্বাস মন্তব্য করছিলেন, সেখানে দুর্যোধনের প্রতিক্রিয়ায় কিছু হতাশা আছে বটেই। কিন্তু দুর্যোধনের এই প্রতিক্রিয়া যে দ্রোণাচার্যের মন্তব্যের কারণেই, সেটা বুঝে দ্রোণকে একহাত নিলেন কর্ণ। হরিদাসী মহাভারতে এই বক্তব্যগুলি দুর্যোধনের জবানিতে বলা আছে, কিন্তু সারা মহাভারতে কোথাও দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের উদ্দেশে এত কঠিন কথা বলেননি, অথচ কর্ণ তা অনেক জায়গাতেই বলেছেন এবং মহাভারতের বেশ কয়েকটি সংস্করণে এইরকম একটি শ্লোক এখানে অতিরিক্ত লেখা আছে যে, দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ এবার বললেন, অতএব আমরা এটাকে কর্ণের বক্তব্য বলেই মানব। কর্ণ বললেন—এই দ্রোণাচার্যটাকে সবার পিছনে রেখে যুদ্ধের ভাবনা করা হোক, কেননা ইনি আমাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করছেন, কোথা থেকে একটা ঘোড়ার ডাক শুনেছে, অমনি বুড়োর মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেল—হ্রেষিতং হ্যপশৃণ্বানে দ্রোণে সর্বং বিঘট্টিতম্—এই শ্লোকে 'বিঘট্টিতম্'—শব্দটায় 'বি' উপসর্গ বাদ দিলে বাংলায় 'ঘেঁটে গেল' ভাষাটা আরও মানানসই।

কর্ণ যা নয় তাই বললেন দ্রোণাচার্যকে। কর্ণের মতে দ্রোণাচার্য ভীরু, তিনি পণ্ডিত-টাইপের মানুষ, যিনি অকারণে বড় বড় কথা বলেন, তিনি শত্রুর শুভকামনা করেন এবং স্বপক্ষকে বিদ্বেষ করেন, অতএব এইরকম ঘরজ্বালানি পরভুলানি

পণ্ডিতদের পিছনের সারিতে রেখে—পণ্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পরেষাং গুণবাদিনঃ—আপনারা সেই ভাবনা করুন যাতে শত্রুকে মেরে ফেলা যায়। কর্ণ শুধু দ্রোণকে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়েই থামলেন না, সঙ্গে নিজের আত্মপ্রচার করলেন ষোলো আনা। কী কী ভাবে তিনি অর্জুনকে একেবারে শায়েস্তা করে দুর্যোধনের আনন্দ বর্ধন করবেন, তার বিস্তারিত আত্মশ্লাঘা শেষ করে কৌরবদের উদ্দেশে তিনি বললেন— আপনারা বিরাট-রাজার ধনৈশ্বর্য হরণ করে চলে যান বরং, আর যদি নিতান্তই থাকতে চান, তবে রথে বসে আমার যুদ্ধটা দেখতে থাকুন—রথেষু বাপি তিষ্ঠন্তো যুদ্ধং পশ্যন্তু মামকম্।

কর্ণের এই আত্মশ্লাঘার প্রথম উত্তর দিলেন কৃপাচার্য। পাণ্ডবদের খুঁজে বার করবার জন্য গুপ্তচর লাগানোর প্রস্তাবে কৃপাচার্য যেভাবে রাজনৈতিক দিকটা বড় করে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, এখনও ঠিক তাই করলেন। কর্ণ যেহেতু বক্তৃতার আরম্ভেই—আরে! আপনারা সবাই তো ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি—সর্বান্ আয়ুষ্মতো ভীতান্ সন্ত্রস্ত্রানিব লক্ষয়ে—এইরকম একটা মন্তব্য করেছিলেন এবং যেহেতু তাঁর নিজস্ব রাজনৈকিত বুদ্ধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছিলেন—দেখুন মশায়রা সব! যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও কিছুতেই আমাদের ভালো হতে পারে না—নান্যত্র যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ো'স্তি—অতএব কৃপাচার্য রাজনৈতিকভাবেই তার উত্তর দিয়ে বললেন— দেখ কর্ণ! তোমার বুদ্ধিটা ভীষণ রকমের ক্রূর বলেই সবসময় যুদ্ধ-যুদ্ধ কর। কিন্তু একটা যুদ্ধ কেন করব, তার কারণ মূল থেকে বোঝা অথবা যুদ্ধটা করলে কী হবে, তার ফল আরও কোনও গভীর বিপদ ডেকে আনবে কি না, সে-বিষয়ে এটুকু চিন্তাও তুমি রাজনৈতিকভাবে কর না। রাজনীতির শাস্ত্র অনুসারে পররাষ্ট্রীয় ব্যবহার অনেকগুলি উপায়ের ওপর নির্ভর করে যাকে 'নয়' বলেছেন পণ্ডিতেরা। কিন্তু সেই উপায়গুলির মধ্যে যুদ্ধ ব্যাপারটা হল নিকৃষ্টতম—তেষাং যুদ্ধস্তু পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে 'নয়'—ব্যাপারটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন মানুষ হিসেবে এটাই একজন রাজার হাতে আছে। কৌটিল্য এটাকে তাই 'মানুষকর্ম' বলেছেন। কৌটিল্যের মতে মানুষ নিজের চেষ্টায় বা বুদ্ধিতে যেটা করতে পারে সেটাই মানুষ কর্ম। এই মানুষকর্মের মধ্যেই আছে যাড়্গুণ্য, যা এখনকার ভাষায় কূটনীতি। কৌটিল্য বলেছেন—মানুষকর্মের পিছনে তিনটি শক্তি কাজ করে—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহশক্তি। প্রভুশক্তির মূলে আছে—রাজকোষের অর্থসঞ্চয় আর দণ্ড বা সৈন্যবল। মন্ত্রশক্তির মূলে আছে মন্ত্রী-অমাত্য এবং পণ্ডিত-বিদ্বানদের মন্ত্রণা এবং পরামর্শ—এককথায় জ্ঞানবল। আর উৎসাহশক্তি হল উদ্যম-পরাক্রম। এই তিনটি শক্তির সঙ্গে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সঠিক কূটনৈতিক ব্যবহার যদি কোনও রাজার অলব্ধ-লাভের পথ খুলে দেয় এবং প্রাপ্ত বা লব্ধ বস্তু সুরক্ষা তৈরি করে, তবে সেটাকেই 'নয়' বলে। উলটো দিকে কোশ-দণ্ডের অপ্রতুলতাই হোক, মন্ত্রী-অমাত্যদের ভুল পরামর্শই হোক, রাজার অনুদ্যম-উদাসীন ভাবই হোক অথবা

কূটনীতির অপপ্রয়োগেই হোক—এর যে কোনও একটি যদি রাজার কোনও নতুন প্রাপ্তি না ঘটায় অথবা যা আছে তাও নষ্ট করে, তবে সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই 'অপনয়'।

কৌটিল্য-কথিত 'নয়'-শব্দটা বোঝাবার জন্য অনেক কথা বললাম বটে, তবে খুব অল্প কথায় 'নয়'-কথাটার অর্থ হল 'ডিপ্লোমেসি' যার মধ্যে ইংরেজি 'পলিসি' শব্দটাকেও ধরা উচিত। আর প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে 'ডিপ্লোমেসি'-র সবচেয়ে বড় অঙ্গ হল চারটি উপায়—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। সাম শব্দের অর্থ মধুর বাক্যে আলোচনার মাধ্যমে শত্রুর সঙ্গে বিবাদ মেটানো। সামে কাজ না হলে দান, অর্থাৎ খানিকটা ছাড় দেওয়া। সেটা নিজের দেওয়া পূর্বশর্ত থেকে খানিকটা সরে আসাও হতে পারে, তেমনই শত্রু-রাষ্ট্রকে ধন-সম্পত্তি দিয়ে সাহায্য করেও হতে পারে আবার আপন ভূখণ্ডের খানিকটা ছেড়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়াও হতে পারে। দান-নীতিতে কাজ না হলে শত্রুরাষ্ট্রে ভেদ তৈরি করে যেতে হবে—রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর, সেনাপতির সঙ্গে রাজার, মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর, প্রজাদের মধ্যে রাজার সম্বন্ধে মিথ্যে গুজব ছড়ানো, এমনকী এই প্রক্রিয়ার মধ্যে গোপন অন্তর্ঘাতও আছে। এই তিনটেতে কাজ না হলে দণ্ড অর্থাৎ আক্রমণ— সাম-দান-ভেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রুরাজ্য আক্রমণ করার শক্তি জুটিয়ে নিয়ে আক্রমণ করা।

এই চারটে উপায়ের প্রত্যেকটির ভালো-মন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু নয়জ্ঞ রাজারা— যাঁরা 'ডিপ্লোমেসি' বোঝেন, তাঁরা রাজনৈতিক উপায় হিসেবে যুদ্ধকে সবচেয়ে অপছন্দ করেন। আজকের দিনে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বর্বরোচিত দমননীতির বিরুদ্ধে ভদ্র-শিক্ষিত মানুষের যেমন সর্বাঙ্গীণ প্রতিবাদ লক্ষিত হয়, তেমনটি মহাভারতীয় রাজতন্ত্রে এবং প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞদের কাছেও যুদ্ধ একান্ত বর্জনীয় ছিল। কেননা যুদ্ধের ফলে যেহেতু অনন্ত লোকক্ষয় এবং অর্থনাশ হয়, অতএব সেটাকে কোনও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিই পছন্দ করেননি। এই মহাভারতেরই রাজধর্ম-পর্বে ভীষ্মের উপদেশে বলা হয়েছে— যদি সাম ও দানের মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে পারা যায়, সেই জয়ই হল শ্রেষ্ঠ জয়। ভেদনীতিতে যে জয় আসে, সেটা মধ্যম মানের জয়। আর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ ঘটে, তার চেয়ে জঘন্য কিছু নেই— জঘন্য এষ বিজয়ো যো যুদ্ধেন বিশাম্পতে। আজকের দিনে রাজতন্ত্রকে যাঁরা অহরহ গালাগালি দেন, তাঁরা মাথায় রাখবেন— প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে যুদ্ধ ব্যাপারটাকে নৈতিকভাবে কখনও মেনে নেওয়া হয়নি; অনর্থক রক্তপাত এবং রাজায়-রাজায় অহংমানী যুদ্ধে নিরীহ মানুষের প্রাণনাশের এই উপায়টিকে রাজ্যকামী ব্যক্তিরাও বর্জন করবেন— এটাই মহাভারতের নির্দেশ, বরঞ্চ রাজ্য জয় করতে হলে 'ডিপ্লোমেসি'ই যে সবচেয়ে বড় নিদান, এ-কথাটা মহাভারতের অনুশাসন পর্বে রাজনীতিবিদ বৃহস্পতির মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে— উপায়ৈস্ত্রিভিরাদান মর্থস্যাহ বৃহস্পতিঃ।

লক্ষণীয়, কৃপাচার্যও ঠিক একই কথা বলেছেন কর্ণকে। বলছেন— ডিপ্লোমেসি বা নয় যে রাস্তায় চলে, সেখানে যুদ্ধটা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তবু যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে সেখানেও তো স্থান-কালের বিচার করতে হবে— দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ। দেখতে তো হবে, আমরা কোথায় যুদ্ধ করতে এসেছি, জায়গাটা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা, কোথায় জল পাওয়া যাবে সেটা পর্যন্ত জানি না, সময়টাও গ্রীষ্মকাল এবং যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, সেটা অর্জুন, অন্য কেউ নন। মনে রেখো, রাজনীতির পণ্ডিতেরা কেউ ছুতোর নন যে, তক্তা পেলেই পেরেক ঠুকতে আরম্ভ করবেন— ভারং হি রথকারস্য ন ব্যবস্যন্তি পণ্ডিতাঃ। কৃপাচার্য-কথিত 'দেশ-কালে'র কথাটা আমরা একটু সরলভাবেই ব্যাখ্যা করেছি এবং সেটা প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠের সরলতায় ব্যাখ্যাও। কিন্তু রাজনৈতিক পরিভাষায় দেশ-কাল কথাটা যুদ্ধের বাজারে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীয় ভাবনায় দেশ এবং কাল ব্যাপারটাও পররাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত। শত্রু বা বন্ধুরাষ্ট্রের ভৌগোলিক স্থিতি, রাজমণ্ডলে অন্যান্য রাজার সঙ্গে বিজিগীষু রাজার ব্যবহার, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সন্ধি-বিগ্রহের অবস্থা—এ-সবই দেশ-কালের তত্ত্ব। কৌটিল্য এ বাবদে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন— 'শম' এবং 'ব্যায়াম'। শম অবস্থা মানে—কোনও রাজ্যে কোনও অশান্তি নেই, বিঘ্ন নেই, অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুর্গের সুরক্ষা সম্পূর্ণ, পররাষ্ট্রে উপযুক্ত বন্ধু যে কোনও বিপদে সহায়তা দেবেন— এই রকম একটা অবস্থা। দ্বিতীয় শব্দটা হল ব্যায়াম যার অর্থ রাষ্ট্রগত কর্মোদ্যোগ— অর্থাৎ দুর্গরক্ষার ব্যাপারে সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থা, খাদ্যের জোগাড়, পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি-বিগ্রহের জন্য উপযুক্ত লোক লাগান ইত্যাদি এবং কূটনৈতিক বিন্যাস বুঝে নেওয়া।

দেশ-কাল বিনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে কৌটিল্য আরও তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলি হল ক্ষতি, স্থান বা স্থিতি এবং বৃদ্ধি। ক্ষতি মানে একজন রাজার যে রাজনৈতিক স্থিতি ছিল, তার থেকে খারাপ অবস্থা হয়েছে কি না। স্থিতি বা স্থান— ভালোও নয় মন্দও নয় এমন স্থিতাবস্থা আর বৃদ্ধি মানে এককথায় উন্নতি অর্থাৎ উপচিত অবস্থা, যেটা সবটাই ডিপ্লোমেসির গুণ। কৃপাচার্য যে কোনও যুদ্ধের আগে এই অবস্থাগুলি বুঝে নেবার জন্যই বারবার দেশকালের কথা বলেছেন। বিশেষত পররাষ্ট্রের দেশ-কালিক অবস্থাটাও দূত বা গুপ্তচরের মারফত জেনে নেবার কথা। দূতেরা এসে দুর্যোধন-কর্ণকে বিরাট রাজ্যে কীচকের মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছেন শুধু কিন্তু কে বা কারা তাকে মারল সে বিষয়ে বিশেষ সংবাদ তারা কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু শুধু সেই সংবাদের ওপর ভরসা করেই দুর্যোধন দল-বল নিয়ে বিরাট রাজ্যে যুদ্ধ করতে এসেছেন এবং এখন অনুমান হচ্ছে অর্জুন আসছেন যুদ্ধ করতে। এই অবস্থায় দ্রোণের মন্তব্য শুনে কর্ণ যতই হামবড়াই করুন না কেন, অনেক কিছুই ভাবার আছে। কৃপাচার্য একটা-একটা করে কর্ণের সামনে উদাহরণ দিয়ে অর্জুনের যুদ্ধবীর্যের কথা বলেছেন এবং তারপর বলেছেন— এমন লোকের সঙ্গে একা-একা তুমি যুদ্ধ করবে

বলছ, এ অবস্থায় তোমার মাথার চিকিৎসা করা উচিত— যস্তেনাশংসতে যুদ্ধং কর্তব্যং তস্য ভেষজম্। বরঞ্চ বলো, আমরা সকলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

কৃপাচার্য আচ্ছা করে কর্ণকে ধমকানোর রাস্তা নিতেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও কর্ণের ওপর রাগে ফেটে পড়লেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করা পর্যন্ত কোন যুদ্ধে তুমি অর্জুনকে জিতেছ! কর্ণের প্রতি অশ্বত্থামার ধিক্কার-তিরস্কার নিয়ে আমরা কথা বাড়াব না। শুধু বলব— অশ্বত্থামা কিন্তু অনেক সময়েই কুরুরাজ দুর্যোধনকে সমর্থন দিয়ে এসেছেন, কিন্তু আজকে যে তিনি দুর্যোধনের প্রায় অভিন্ন সত্তা কর্ণকে গালাগালি দিচ্ছেন, তাতে কুরুবাড়ির অন্দরমহলের রাজনীতিটা প্রকট হয়ে ওঠে। খেয়াল করুন, হস্তিনাপুরের রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে দেশের পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর এবং পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে। দেশের ভারপ্রাপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের উত্তরাধিকার দেবেন না— এইখানেই হস্তিনাপুরের রাজনীতির আবর্তন, এবং রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে আছেন এমন কতকগুলো মানুষ, যাঁরা রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত নন। এঁদের মধ্যে কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের বাপের কাল থেকে হস্তিনায় আছেন এবং তাঁর সূত্র ধরে দ্রোণাচার্য-অশ্বত্থামাও কুরুবাড়িতে স্থান পেয়েছেন অনেক কাল। দ্রোণাচার্য কিন্তু দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য জিতেও সে-রাজ্যে রাজত্ব করতে যাননি, কিংবা অশ্বত্থামাকেও পাঠাননি রাজা হতে। তিনি হস্তিনাপুরের বৃহত্তর রাজনীতিতে শামিল হয়ে আছেন নিজের মর্যাদায় এবং তাঁর প্রভাব কিছু কম নয়। অন্যদিকে কর্ণ, তিনিও কিন্তু দুর্যোধনের কাছ থেকে অঙ্গরাজ্য পেয়েছিলেন রাজা হবার জন্য। অথচ তিনি কোনওদিন অঙ্গদেশের রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করতে যাননি। অনুক্ষণ তিনি দুর্যোধনের পাশে পড়ে রয়েছেন বৃহত্তর এক রাজনীতির ভদ্রাসনে, হস্তিনায়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষুদ্র সত্তায় মজার ব্যাপার হল— এঁরা সবাই দুর্যোধনের সঙ্গে আছেন, কিন্তু যখন পরিবারের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে— কর্ণ যেহেতু দ্রোণকে যথেচ্ছ তিরস্কার করে অহংমন্যতা প্রকাশ করেছেন— তখন কিন্তু কৃপ, অশ্বত্থামা কেউ কর্ণকে ছেড়ে দিলেন না। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনভাবেই প্রকট হয়ে উঠল যে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে 'ইনটারভিন' করতে হল স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য।

ভীষ্ম দ্রোণ-অশ্বত্থামাকেও শান করলেন, কর্ণকেও শান্ত করলেন, কিন্তু কৃপাচার্যের দেশ-কালের যুক্তিটা যে কোনও মতেই ফেলে দেবার নয়, সে ব্যাপারে সমর্থনটুকুও প্রকাশ করলেন— দেশকালৌ তু সংপ্রেক্ষ্য যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ। কিন্তু ভীষ্ম এটাও সবাইকে অভিহিত করালেন যে, এখন এই রাজনীতি চর্চার সময় নয়। ভয়ংকর বাস্তব হল— অর্জুন আসছে। দুর্যোধন-কর্ণরা যেভাবে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে দিনক্ষণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন তা সৌর-চান্দ্র মাসের হিসেব দিয়ে উড়িয়ে দিলেন ভীষ্ম। কিন্তু অনেক শান্তির সমাধান দিয়েও পাণ্ডবদের ধৈর্য এবং সততার কথাটা স্মরণ

করিয়ে দিয়ে বললেন— পাণ্ডবরা লোভী নন কেউ এবং নিকৃষ্ট উপায়েও তাঁরা রাজ্য লাভ করার কথা ভাববে না। ফলত ও সময় যখন আসবে, তখন হৃতরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের দাবিও তারা ছাড়বে না। অতএব সেইভাবে ভাবার চেষ্টা কর। অর্থাৎ ভীষ্ম কিন্তু ভালোয়-ভালোয় পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছেন দুর্যোধনকে এবং ভীষ্মের মত হল— সেটাই হবে 'ডিপ্লোমেসি'র আদর্শ; কেননা, কৃপাচার্যের মত মেনে তিনিও বললেন— যুদ্ধ করে কোনও কাজের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয়, এটা আমি মনে করি না— ন হি পশ্যামি সংগ্রামে কদাচিদপি কৌরব। একান্ত সিদ্ধিং রাজেন্দ্র— কিন্তু এখন আর সময় নেই এত ভাবার, অর্জুন ওই এল বলে— সংপ্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।

সমস্ত কৌরব-নায়কদের মধ্যে অর্জুনের এই যুদ্ধটা দর্শনীয় হয়ে রইল। যুদ্ধোন্মাদী কর্ণ পালিয়ে বাঁচলেন এবং ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামার মতো প্রমুখ যোদ্ধা হার মানলেন অর্জুনের কাছে। অর্জুন কুমার উত্তরকে বলেছিলেন— আমি আজ সমস্ত কৌরব সৈন্যদের চাকার মতো ঘুরাব, তুমি শুধু দ্যাখো, দেখে যাও— ময়া চক্রমিবাবিদ্ধং সৈন্যং দ্রক্ষ্যামি কেবলম্। অর্জুন ঠিক তাই করেছেন এবং একের সঙ্গে এক যুদ্ধ হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে দ্রোণ-ভীষ্ম-কৃপ-কর্ণের সঙ্গে, ফলত সেদিন অর্জুনকে কেউ রুখতে পারলেন না। পরিশেষে অর্জুনের মোহনবাণে সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে কুমার উত্তর কৌরব-নায়কদের বিচিত্রবর্ণ উত্তরীয় বসনগুলি নিয়ে এলেন প্রিয়শিষ্যা উত্তরার জন্য। যুদ্ধশেষে দুর্যোধন ফিরে এলেন। পরাজয়ের ক্ষোভ এবং অক্ষমের ক্রোধ নিয়ে। ওদিকে বিরাট-রাজ্যে অজ্ঞাতবাসের আবরণ মোচন করে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা নিজেদের এবং দ্রৌপদীকে প্রকাশ করলেন বিরাট-রাজার সামনে। মাত্র এক/দুই দিন আগে বিরাট-রাজা ভীম এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের কল্যাণে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে হারিয়ে দিয়েছেন এবং অর্জুনের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে সমস্ত কৌরব বাহিনী। কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দের প্রথম ফল যেটা হল— বিরাট-রাজা পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে নিজের সমস্ত সৈন্য-বল, রাজকোষ এবং দুর্গ রাজধানী সহ সমস্ত রাজ্যটাকেই ব্যবহারের জন্য দিয়ে বসলেন— রাজ্যঞ্চ সর্বং বিসসর্জ তস্মৈ/সদণ্ডকোশং সপুরং মহাত্মা। বিরাটের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চিরন্তন মিত্রতা স্থাপিত হল, বিরাট-নন্দিনী উত্তরার সঙ্গে বিয়ে হল অর্জুনের বীরপুত্র অভিমন্যুর।

ছয়

মহাভারতের কর্ণপর্বে— অর্থাৎ ভীষ্ম তখন শরশয্যায় শায়িত এবং আচার্য দ্রোণ মারা গেছেন, কৌরব দুঃশাসন মৃত এবং জয়দ্রথও তাই— এই অবস্থায় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে নিবৃত্ত হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশের মধ্যে একটি প্রধান বাক্য ছিল এই যে, দ্যাখো দুর্যোধন! রাজনৈতিক মিত্রতা চারভাবে তৈরি হয়। প্রথম হল সহজ মিত্র— যেমন মামা-মাসির ছেলে। দ্বিতীয় মিষ্টি-মধুর সাম-বাক্যে তুষ্ট অন্য রাজা, তৃতীয়, টাকা-পয়সা বা সম্পত্তির বিনিময়ে পাওয়া বন্ধুরাষ্ট্র এবং চতুর্থ, আপন

শক্তিমত্তায় বশীভূত বন্ধু। অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বলেছিলেন— এই চার রকমের মিত্র তোমারও আছে, পাণ্ডবদেরও আছে— চতুর্বিধং তদস্তি সর্বং তব পাণ্ডবেষু চ।

আমরা শুধু বলব— দুর্যোধন হস্তিনাপুর রাজ্যে বহাল আছেন, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থও তাঁর অধিকারে। অতএব তাঁর পক্ষে সহজ মিত্র ছাড়াও আর তিন রকমের বন্ধু পাওয়া অনেক সহজ। কিন্তু পাণ্ডবদের তো রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি কিছুই নেই। কিন্তু এই অবস্থাতেও চার রকমের রাজনৈতিক বন্ধু তাঁদের জুটে গেছে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে সবল জায়গাটা তাঁদের সহজ মিত্র অর্থাৎ মামা-মাসির ছেলে। পাণ্ডব-ভাইদের মামা হলেন বসুদেব এবং তাঁর ছেলে কৃষ্ণের মতো এক বিরাট পুরুষ এবং সেই অসাধারণ 'ডিপ্লোম্যাট' তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু। দ্বিতীয়ত, মধুর বাক্য বা সাম-উপায়ের মাধ্যমে পাওয়া বন্ধুর কোনও উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই, মহাভারত তা স্পষ্ট উচ্চারণে বলেওনি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির, যিনি সামবাদের জন্য বিখ্যাত এবং অতীক্ষ্ণ স্বভাবের জন্য যাঁর অন্য নামটাই হল অজাতশত্রু, সেই যুধিষ্ঠিরের মধুরালাপজনিত বন্ধুর অভাব ছিল না। তৃতীয়ত এ-কথাটাও অতিশয়িনী নয় যে, টাকা-পয়সা বা সম্পত্তির বিনিময়েও পাণ্ডবদের কিছু বন্ধু ছিল। হ্যাঁ, এমনিতে যুধিষ্ঠির রাজ্যভোগ যত সময় ধরে করেছেন, তখন ধনৈশ্বর্য না বিলোলেও এটা মানতে হবে যে, রাজসূয় যজ্ঞের আগে-পরে অনেক শত্রুশাতন করেও পাণ্ডবরা কিন্তু কারও রাজ্য কেড়ে নেননি, শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতুকে রাজা করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরাই। এও তো একধরনের ধনৈশ্বর্য দেওয়া। মগধরাজ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর মগধরাজ্যও কেড়ে নেননি পাণ্ডবরা, তাঁর ছেলে সহদেবই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের নির্দেশে। অতএব তাঁরাও মিত্রপক্ষে এসেছেন রাজ্যদানের ফলেই। আর চতুর্থত, বিরাটরাজ্যে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা এবং কৌরবদের আক্রমণ থেকে বিরাট-রাজাকে পাণ্ডবরা যেভাবে বাঁচিয়েছেন, সেটাকেই আমরা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে বন্ধুলাভ বলব। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও মধুর, এই কারণে যে, শক্তিমত্তা বা শক্তির মাধ্যমে পরাজিত শত্রু মৌখিকভাবে বন্ধু হলেও তার পরাজিত হওয়ার রাগ থেকে যায়। এখানে পাণ্ডবরা শক্তি প্রকাশ করেছেন বিরাট-রাজার শত্রুর ওপর। বিরাট-রাজাকে তাঁরা পরাজয়ের অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন তাঁর শত্রুকে পরাভূত করে। ফলে তিনি এমনই এক মিত্রে পরিণত হয়েছেন, যিনি যধিষ্ঠিরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছেন— আমার যা আছে সব আপনার, এই রাজ্যটাও আপনার— ইদং রাজ্যঞ্চ বঃ পার্থ যচ্চান্যদপি কিঞ্চন।

বিরাট-রাজার সৌজন্য-বচনগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির কখনওই তাঁর রাজ্য নিয়ে নেননি বটে, তবে বনবাস-অজ্ঞাতবাসের উত্তরকালে হৃতরাজ্য উদ্ধার করার জন্য যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি আরম্ভ করার দরকার ছিল, যুধিষ্ঠির সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেন কৃতজ্ঞ বন্ধু বিরাটের রাজ্য থেকেই। বস্তুত বিরাট রাজ্যে অভিমন্যু-উত্তরার বৈবাহিক মঞ্চ পরের দিন সকালেই রাজনৈতিক মঞ্চে পর্যবসিত

হল। সভায় উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ এবং বলরাম, দ্রুপদ, সাত্যকি, বিরাট, অভিমন্যু এবং সব পাণ্ডব-ভাইরা। সভার প্রস্তাবনা করলেন কৃষ্ণ। মিত ভাষণে তিনি জানালেন— কৌরবরা কিন্তু যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের রাজ্য জেতেননি— ন চাপি পার্থো বিজিতো রণে বৈ—তাঁরা শকুনিকে দিয়ে পাশা খেলিয়েছেন, সেই পাশাখেলার মধ্যেও কপটতা করেছেন, সেই কপটতায় রাজ্যহরণ করেছেন এবং তার মধ্যে পণ চাপিয়েছেন বনবাসের এবং অজ্ঞাতবাসের— জিতো নিকৃত্যাপহৃতঞ্চ রাজ্যং/ বনপ্রবাসে সময়ঃ কৃতশ্চ। পাণ্ডবদের এই ক্ষমতা ছিল যে, তাঁরা বাহুবলে তাঁদের রাজ্য দখল করে নিতে পারতেন, কিন্তু আপন ধর্মবোধে যুধিষ্ঠির তা হতে দেননি। এবার যুধিষ্ঠির তাঁদের হৃতরাজ্য ফেরত চাইছেন। আপনারা আলাদা আলাদা আপনাদের প্রত্যেকের মত বলুন এবং মিলিতভাবেও আপনাদের মত জানান— শুধু মনে রাখুন, দুর্যোধনেরা অন্যায় লোভ করছেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্মবোধ ত্যাগ করেননি। তৃতীয় দৃষ্টিতে মনে রাখুন— এঁরা দুই পক্ষই কিন্তু পরস্পরের আত্মীয়— এই সব কিছু খেয়াল রেখে আপনাদের পৃথক মত এবং সম্মিলিত মত জানান— সম্বন্ধিতশ্চাপি সমীক্ষ্য তেষাং/মতিং কুরুদ্ধং সহিতাং পৃথক্ চ।

তৎকালীন দিনের মন্ত্রণা-বিষয়ের কৌশলটাই ছিল এই রকম। সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রে রাজার পরেই মন্ত্রী-অমাত্যদের স্থান। হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভার একটা সুসংগঠিত ভাব ছিল, সেটা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। কিন্তু এই দিকটায় যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ তেমন ছিলেন না। আর যুধিষ্ঠির রাজ্য ভোগই বা করেছেন কতদিন? এখন বিরাট-রাজার রাজ্যে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে এতগুলি বুদ্ধিমান লোক উপস্থিত হয়েছেন। এখানে যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতী মানুষ অনেক থাকলেও বিরুদ্ধ ভাবনার লোকও আছেন, কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় সকলের মতই প্রয়োজন, বিরুদ্ধ মত থাকলেও যুক্তিসাপেক্ষে তা মেনে নেবারও প্রয়োজন হতে পারে। কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির নিজেরাই এটা ঠিক মনে করেছেন যে, বিরাট-রাজ্যের বিবাহ-মঞ্চ মন্ত্রণা-সভায় পরিণত হোক এবং সিদ্ধান্ত হোক সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে। আর যখনই সেটা ঠিক হয়েছে, তখন মন্ত্রণার চিরন্তন নিয়মগুলিও কৃষ্ণ সঠিকভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

প্রাচীন রাজনীতিতে এটাই নিয়ম ছিল যে, বিষয়ভিত্তিক মন্ত্রণার সময় রাজা পৃথকভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীর মত জানবেন, তারপর একসঙ্গে সেই বিষয়ের ওপর সকলের সামগ্রিক আলোচনা শুনে সামগ্রিক মতটাও জানবেন— যেমনটি মনু মহারাজ বলেছেন— তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায় মুপলভ্য পৃথক পৃথক। সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু...। এই প্রস্তাবের দুটি অর্থ হতে পারে। এক, একেবারে পৃথক এবং এককভাবে এক-এক মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা, যাতে প্রত্যেকে নিজেদের সংশয় এবং সিদ্ধির উপায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। তারপর সামগ্রিক আলোচনার সময় রাজা নিজেই যদি পৃথগালোচিত পূর্বশ্রুত সংশয়গুলি সবার সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন তবে গ্রহণ-বর্জন-পরিবর্জনের পন্থা

সহজ হয়। আর হতে পারে, সকলে একসঙ্গে বসা হল, পৃথক যুক্তিও নেওয়া হল এবং অন্যদের গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তনের যুক্তিগুলি শুনে, তারপর সারবত্তা বুঝে রাজা সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

এখানে সময়াভাব ছিল, অতএব দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন— রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে দুর্যোধন এখনও কিছুই বলছে না। এই অবস্থায় একজন দূত পাঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ দাবি করা হোক দুর্যোধনের কাছে। নাকি, কী করা উচিত আপনারাই বলুন। কৃষ্ণের কথা শুনে প্রথমে যুক্তি দিলেন অগ্রজ বলরাম। তিনি কৃষ্ণের কথা শুনে দূত পাঠিয়ে রাজ্যার্ধ চাইতে বললেন বটে, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলার দোষ নিয়ে যুধিষ্ঠিরকেই দায়ী করলেন সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য। আর বললেন— দুর্যোধন কিন্তু ভীষণ মানী মানুষ, দূত যে কেউ যাক, সে যেন অবনত হয়ে নরম গলায় কথা বলে— তস্মাৎ প্রণম্যৈব বচো ব্রবীতু/বৈচিত্র্যবীর্যং বহুসামযুক্তম্। বলরামের কথা শুনে কৃষ্ণের বশংবদ এবং অর্জুন-শিষ্য সাত্যকি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। যুধিষ্ঠিরের অপমানের নিরিখে তিনি চরম শাস্তি হিসেবে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু সদুপায় দেখতে পেলেন না। পাঞ্চাল দ্রুপদ সমর্থন করলেন সাত্যকিকে। তবে দূত পাঠানোর প্রস্তাবটা তিনি মেনে নিলেন, কিন্তু সেখানেও বলদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন— দুর্যোধনের কাছে কিন্তু নরমভাবে কথা বলে কোনও লাভ নেই। কারণ ভদ্রজনের কোমলতাকে সে দুর্বলতা বলে মনে করে— মৃদুং বৈ মন্যতে পাপো ভাষমানমশক্তিকম্। আমার মত হল— যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে আমরা আগে আমাদের মিত্র-রাজাদের কাছে দূত পাঠাই আর আমার পুরোহিত ব্রাহ্মণটিকে আপনারা দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠান এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যা বলবার, তাকে বলে দিন— প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ সমর্প্যতাম্।

নিজের মতের সঙ্গে মিলে গেল বলে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মেনে নিলেন দ্রুপদের কথা। শুধু এইটুকু যোগ করলেন যে, পাণ্ডব-কৌরব দুপক্ষের সঙ্গেই তাঁদের কৌলিক আত্মীয় সম্বন্ধ আছে। অতএব দুই পক্ষেরই হিত হয়, এমনভাবেই দূতকে কথা বলতে হবে। সেকালের রাজনীতিতে পররাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নে দূতের ক্রিয়াকর্ম এতটাই রাজনৈতিক প্রয়োজন সাধন করত যে দূতের রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল প্রায় মন্ত্রীর মতো। পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি হবে না বিগ্রহ হবে অর্থাৎ শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের বাতাবরণ গড়ে তোলা অথবা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করা— এই দুটি খুব বেশিভাবে নির্ভর করে দূতের ওপর— মনু লিখেছেন— দূতে সন্ধি-বিপর্যয়ৌ। সাধারণত দূত অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক হতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এতটাই প্রখর হতে হত যে, রাজার সমস্ত বক্তব্য তাঁকে হুবহু নিবেদন করতে হত পররাষ্ট্রের কাছে, যদিও বুদ্ধিমত্তার জায়গা হয়ে উঠত সেটাই, যখন রাজার বক্তব্য নিবেদন করার পরেও তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিতে তিনি নিয়োগকর্তা রাজার ঈপ্সিত সম্পাদন করতেন।

এক্ষেত্রে দ্রুপদের দূত এসে ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের সামনে যেভাবে বক্তব্য নিবেদন করলেন, তাতে পাণ্ডবদের শান্তিকামিতা এবং সন্ধিকামিতার সঙ্গে তাঁদের শক্তিপ্রদর্শনের অঙ্গটাও যুক্ত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তীক্ষ্ণতাও এতখানি ছিল যে, মহামতি ভীষ্ম পর্যন্ত একটু রেগে গিয়ে বলেছিলেন— পাণ্ডবদের প্রতি বঞ্চনা এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে আপনার বক্তব্য সব ঠিকই আছে, কিন্তু আপনার কথা একটু বেশি রকমের তীক্ষ্ণ এবং সেটা হয়তো আপনি ব্রাহ্মণ বলেই—অতিতীক্ষ্ণং তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ। তার মানে দ্রুপদের দূত পাণ্ডবদের হয়ে সন্ধিমনস্কতার কথা নিবেদন করলেও ভীমার্জুনের শক্তি, কৃষ্ণের বুদ্ধি এবং পাণ্ডবদের সৈন্য-সামন্তের গরিমা একটু বেশি প্রকটভাবে প্রকাশ করায় যে ভীতি-প্রদর্শনের আঙ্গিকটুকু সাধিত হয়েছে, এটা পাণ্ডবদের দিক থেকে ঈপ্সিতই ছিল। অর্থাৎ পাণ্ডবরা এবার বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, তাঁরা আর সৌজন্য দেখিয়ে চুপ করে থাকবেন না। দূতের তীক্ষ্ণতায় ভীষ্ম সামান্য ক্ষুব্ধ হলেও তিনি তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেই দূতের কথাতেই দুর্যোধন-প্রিয় কর্ণের মুখ দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে এল। কর্ণ বললেন— ভয় দেখিয়ো না, দূত! ভয় দেখালে দুর্যোধন এক-পা জায়গাও তোমাদের ছাড়বেন না— দুর্যোধনো ভয়াদ্ বিদ্বন্ ন দদ্যাৎ পাদমন্ততঃ। আর কর্ণের এই কথাতেই কুরুসভায় ভেদ তৈরি হয়ে গেল। ভীষ্ম কর্ণকে দুষতে লাগলেন তাঁর আত্মশ্লাঘার জন্য এবং ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মত মেনে নিয়ে নিজেই বললেন যে, তিনি সঞ্জয়কে দূত করে পাঠাবেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

মহাভারতে এর পরে সঞ্জয়ের দৌত্য পর্ব এবং কৃষ্ণের শান্তিযাত্রা। এই দুটি অণুপর্বই রাজনৈতিক দিক থেকে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, তার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের লেখ্য পরিসর কম বলেই শুধু এইটুকু জানাই যে, সঞ্জয় দূত হিসেবে একেবারে 'পারফেক্ট' ছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কথা তিনি সঠিকভাবে জানিয়েওছিলেন পাণ্ডবদের। এই দৌত্যের মধ্যে সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয় বিষয়, সেটা হল— দৌত্যে যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে তাঁর মনের কথা এবং পাণ্ডবদের সম্বন্ধে তাঁর জানা খবরাখবরগুলিও জানাচ্ছেন। তাতে দেখছি—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবভাইদের অপরিমেয় বলের কথা স্বীকার করে নিয়ে বনবাসকালেও মিত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্কের কথা খেয়াল রেখেছেন— ত্যজন্তি মিত্রেষু ধনানি কালে/ন সংবাসাৎ জীর্য্যতে তেষু মৈত্রী। এমনকী কারা কারা, কোন কোন ক্ষুদ্র-মধ্যম-বৃহৎ শক্তি পাণ্ডবদের সহায়তায় তাঁদের পক্ষ নিয়েছেন, তাও ধৃতরাষ্ট্র জানেন। বিশেষত দ্যূতসভায় অপমানিত পাণ্ডবেরা তাঁদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা কৃষ্ণের বুদ্ধিতে—মহামাত্রং বীর্যবতামুদারং জনার্দনঞ্চাপি—যেভাবে ধৈর্যের সঙ্গে উপযুক্ত কালের অপেক্ষা করছেন, তাতে দুর্যোধন, যাঁর উদ্যম শুধু কাজের আরম্ভটুকুতে দেখা যায়, কিন্তু পরিণামে তিনি সেটা ধরে রাখতে পারেন কি না— উত্থানবীর্যঃ সুখমেধমানো—সেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের তেজোবল সহ্য করতে পারবেন কি না— এসব বিষয়ে সঞ্জয়ের

কাছে বিস্তর সংশয় প্রকাশ করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। অনেক পর্যালোচনার পর এমন সিদ্ধান্তও তিনি সঞ্জয়ের কাছে জানিয়েছেন যে, যুদ্ধের চাইতে পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দেওয়াই ভালো— পুরা যুদ্ধাৎ সাধু তস্য প্রদানম্।

এত সব বুঝেও সঞ্জয়কে শেষ আদেশে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—বিপক্ষশক্তির কাছে যা যেভাবে বলা উচিত, তাই তুমি বলো, আর দেখো সবারই যাতে ভালো হয়। তাদের ক্রোধ তৈরি হয় অথবা যুদ্ধ লাগে এমন কথা তুমি বলো না—তত্তাষেথাঃ সঞ্জয় রাজমধ্যে/ন মূর্ছয়েদ্ যন্ন যুদ্ধহেতুঃ। এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল— ধৃতরাষ্ট্র মৌখিকভাবে সঞ্জয়কে যা বলতে বলেছেন, বিরাট রাজ্যের উপনগরী উপপ্লব্যে গিয়ে সঞ্জয় কিন্তু ঠিক ঠিক তাই বলেননি, অথবা বলতে পারেননি। হ্যাঁ, তিনি যুদ্ধ যাতে না লাগে, তার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের শান্তিবার্তা শুনিয়েছেন বারবার, কিন্তু যুদ্ধ না লাগার জন্য পাণ্ডবদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে একটি কথাও তিনি বলতে পারেননি। তার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ—এইসব মহাবীরের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ না করার পরামর্শও দিয়ে ফেলায় যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিরবুদ্ধি মানুষও যথেষ্ট ক্রোধী হয়ে ওঠেন, এমনকী কৃষ্ণ পর্যন্ত শেষ ব্যাকালাপে অংশগ্রহণ করে সঞ্জয়কে উলটো ভয় দেখিয়ে দেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—তাহলে কি সঞ্জয় দূত হিসেবে একেবারে অসফল? উত্তরে বলব—কখনওই না। মনে রাখতে হবে—সঞ্জয় কিন্তু কুরুবাড়িতে চাকরি করা দূতমাত্র নন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের এতটাই কাছের লোক যে, নিজের হৃদয় উদ্‌গীর্ণ করার প্রয়োজন হলে ধৃতরাষ্ট্র যা পুত্র-পরিবারকেও বলতে পারেন না, তা তিনি সঞ্জয়কে বলেন। এক কথায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় বোঝেন। সঞ্জয় এটা বুঝেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্র শান্তির কথা যতই বলুন, পুত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কখনই পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না, এমনকী মুখে যতই বলুন তিনি নিজেও রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চান না মনে মনে।

এই অবস্থায় যা যুধিষ্ঠিরের কাছে বলেছেন সঞ্জয়, সেটা ধৃতরাষ্ট্রের মৌখিক বক্তব্য না হলেও, সেটাই ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় এবং সঞ্জয় সবচেয়ে ভালো বোঝেন। বিরাট নগর থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় একটু রেগেই গেছেন, কেননা দৌত্যকার্যে যুদ্ধ-শান্তির জন্য যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, সে বিষয়ে সঞ্জয় একটি কথাও শোনাতে পারেননি পাণ্ডবদের, অথচ তাঁকে শুষ্ক শান্তির বার্তা শোনাতে হচ্ছে— এই দৌত্যের অর্থ কী? অতএব ফিরে এসে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে এক রাত কথাই বলেননি এবং যতটুকু সময় তাঁর সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎকার ঘটেছে, সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শ শোনেন না, তিনি এমন লোকের কথা শোনেন, যাঁরা সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন— তেষাময়ং বলবান্ নিশ্চয়শ্চ/ কুরুক্ষয়ং নিয়মেনোদপাদি। দৌত্যকর্ম সেরে এসে সঞ্জয় এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন যে, তিনি একা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে তাঁর দৌত্যকর্মের বিস্তার শোনাতে চাননি। বলেছেন— পরের দিন সভায় সকলের সামনে তিনি তাঁর বক্তব্য

শোনাবেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এতে বোঝা যায়, নিযুক্ত দূত হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে তেমন বিশ্বাস করেন না।

রাজসভায় ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখদের সামনে সঞ্জয় সব জানিয়েছেন ধৃতরাষ্টকে। রাজ্যাংশ ফেরত না দিয়ে শুধু শান্তির কথা বলে যে কোনও লাভ নেই, এ-কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-ভাইদের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ বাক্যগুলিও উচ্চারণ করেছেন সঞ্জয়। কিন্তু সঞ্জয়ের ফিরে আসা থেকে পরের দিন রাজ্যসভায় উপস্থিত হওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত যে দীর্ঘ একটা রাত্রি, এই রাত্রিতে ধৃতরাষ্ট্র স্থির হতে পারছিলেন না। দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম আসছিল না। তিনি মহামতি বিদুরকে ডেকে তাঁর হিতৈষিণী কথা শুনলেন সারা রাত ধরে। বিদুরের এই হিতবাক্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির মূলসূত্রগুলি পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলির দার্শনিক বিস্তার ঘটেছে পরবর্তী সনৎ সুজাতীয় নামক অণুপর্বে। তবে কিনা এই রাজনীতির কথা নীতিগত রাজনৈতিক ভাবনার কথা বলে—যা ধৃতরাষ্ট বোঝেন, কিন্তু কার্যকালে মনে রাখেন না। অথবা আপন উচ্চাশা এবং অন্ধ পুত্রস্নেহে মনে রাখতে পারেন না। রাজসভায় পাণ্ডবদের চেষ্টা এবং প্রত্যাশার কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র যখন বারবার দুই পক্ষের সামরিক বলাবল নিয়ে প্রবল আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন সঞ্জয় একবার বলেও ফেললেন—পাণ্ডবদের জন্য এই যতসব বিলাপ করছেন আপনি, এগুলোর কোনও মানেই নেই—যদিদং তে বিলপিতং... সর্বমেতন্নিরর্থকম্। বস্তুত রাজ্যসভার এই বিশেষ অধিবেশনটি ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের সঙ্গে সঞ্জয়ের তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা এবং উভয়পক্ষের সামরিক তুল্যমূল্যতার চিন্তনেই কেটে গেল। কিন্তু সিদ্ধান্তের জায়গায় দুর্যোধন স্থির রইলেন— কারও কথাই তিনি শোনেননি, রাজ্যার্ধ তো দূরের কথা, পাঁচটা গ্রামও তিনি পাণ্ডবদের দেবেন না, যা তাঁরা নিদেনপক্ষে চেয়েছিলেন।

এই অবস্থায় কৃষ্ণের দৌত্য-প্রসঙ্গ আসন্ন হয়ে ওঠে। এখানে প্রথম যেটা বোঝা উচিত, সেটা হল- সঞ্জয়ের দৌত্য-প্রক্রিয়ার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছেন—সঞ্জয় যা বলে গেলেন, সেটাকে তো ধৃতরাষ্ট্রের মত বলেই আমাদের মানতে হবে। তবে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছাটা তো এইরকম বুঝতে পারছি যে, তিনি আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা একটাও বলছেন না, অথচ শান্তির বার্তা আমাদেরই শোনাচ্ছেন অবিরাম—অপ্রদানেন রাজ্যস্য শান্তিমস্মাসু মার্গতি। তিনি দুর্যোধনের মতে স্থিত থেকে আমাদের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করছেন। যুধিষ্ঠির এখন কৃষ্ণের কাছে যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করছেন, তাতে যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি প্রায় দ্বিধাহীন, কেননা তিনি বুঝতে পারছেন যে, যুদ্ধ ছাড়া এই জ্ঞাতি বিরোধের শান্তি হবে না। একই সঙ্গে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের গভীর অনীহা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—দেখো, আমরা রাজ্যের দাবিটাও ছেড়ে দিতে পারছি না, কিংবা যুদ্ধ করে কুলক্ষয়ও করতে চাই না। ফলত ভালো কথায় সন্ধির মাধ্যমেই আমরা শান্তি লাভ করতে চাই। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে যুদ্ধে আমাদের যেতেই হবে, আমি আর কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকতে চাই না—সান্ত্বে প্রতিহতং যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নঃ পরাক্রমঃ।

যুধিষ্ঠির যে অবস্থায়, যে কারণে যুদ্ধবাদী হয়ে পড়েছেন, সেই যুদ্ধবাদিতার মধ্যে 'অ্যাগ্রেশন'—এর একটা 'মরালিটি' বা নৈতিকতা তৈরি হয়। যুধিষ্ঠির বোঝাচ্ছেন—একজন ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর কী পাওয়া উচিত ছিল এবং কী তিনি পাচ্ছেন। অকারণ ছলনায় তাঁর যে দারিদ্র্য এবং নির্ধনতা তৈরি হয়েছে, সেটা এই তেরো বচ্ছর বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। অথচ তিনি দরিদ্র-নির্ধন হবার যোগ্য নন। কিন্তু ভালো কথা বা সামবাদিতায় যখন কোনও কাজও হচ্ছে না তখনই পরাক্রম-প্রদর্শনের নৈতিকতা তৈরি হয়, যদিও যুধিষ্ঠির জানেন— যুদ্ধ ব্যাপারটা অনেকটাই যেন দুটি কুকুরের লড়াই, অন্তত পণ্ডিতেরা তাই ভাবেন। কুকুরেরা প্রথমে ল্যাজ নাড়ে, তারপর চেঁচায়, তারপর গোঁ গোঁ করে ঘর্ঘর আওয়াজ করে, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে দেখাতে থাকে, তারপর আবার ঘোরতর গর্জন করার পর লড়াই আরম্ভ করে। অবশেষে দুই কুকুরের মধ্যে যেটার শক্তি বেশি, সেটাই মাংসখণ্ড পায়। মানুষের মধ্যেও ওই একই রীতি, কুকুরের সঙ্গে তাদের কোনও তফাৎ আছে বলে যুধিষ্ঠির মনে করেন না—এবমেষ মনুষ্যেষু বিশেষো নাস্তি কশ্চন। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এই নীচতা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেটা করণীয় হয়ে ওঠে। শেষ বাক্যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছেন— তুমি সব জানো—তুমি আমাদের চেনো, কৌরবদের চেনো, অবস্থানুসারে প্রয়োজন কী, সেটাও তুমি জানো এবং সর্বোপরি তুমি কথা বলতেও জানো সবচেয়ে ভালো, তবে আমাদের যেটা ভালো হয়, সেটাই তুমি দুর্যোধনকে বলবে—অস্মান্ বেত্থ পরান্ বেত্থ বেত্থার্থাম্ বেত্থ ভাষিতুম্।

কৃষ্ণ বললেন— দূত হিসাবে আমি শান্তির চেষ্টা করব নিশ্চয়ই কিন্তু যা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার আশঙ্কা যে, যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য—সর্বথা যুদ্ধমেবাহমাশংসামি পরৈঃ সহ। কেননা একটা জিনিস আমি বুঝেছি যে, যতদিন আপনি এঁদের সঙ্গে মৃদু-কোমল ব্যবহার করবেন, ততদিনই এরা আপনার রাজ্যটা নিজের দখলে রেখে দেবে। দুর্যোধন পাশাখেলার ছলনায় যে রাজ্যটা জিতেছে সেটা সে বেঁচে থাকতে ভালো কথায় ফিরিয়ে দেবে না বলেই আমার বিশ্বাস—দুর্যোধনো ন হ্যলমদ্য দাতুং/ জীবংস্তবৈতন্নৃপতে কথঞ্চিৎ। লক্ষণীয় বিষয় হল, যুধিষ্ঠিরের মুখে শান্তির কথা শুনে ভীম—যে ভীম পাশাখেলার সময়ে দৌপদীর অপমান দেখে দুর্যোধন-দুঃশাসনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন—সেই ভীমও কিন্তু শান্তির কথাই প্রধানত বলতে বলেছেন দুর্যোধনকে। কৃষ্ণ এতে অবাক হয়েছেন এবং ততোধিক দ্রৌপদী। শান্তির কথা বলেছেন অর্জুন এবং নকুলও। কিন্তু পাণ্ডব-কনিষ্ঠসহদেব একবারের তরেও শান্তি-সন্ধির কথা বলেননি। বরঞ্চ যাতে যুদ্ধ হয়, বিশেষত দ্রৌপদীর অপমানের নিরিখে যাতে যুদ্ধ হয় সেই চেষ্টাই কৃষ্ণকে করতে বলেছেন সহদেব। একই ভাব ছিল দ্রৌপদীরও। তিনি ভীম-অর্জুনের শান্তি-ভাবনায় বিরক্ত-ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর চরম অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণকে এবং শান্তিকামী ভীমার্জুনকে বাদ দিয়ে তিনি পুত্র প্রতিম অভিমন্যুর নেতৃত্বে তাঁর পাঁচ ছেলে

এবং তাঁর বাপ-ভাইরা যুদ্ধ করবেন বলে আরও কঠিন মন্তব্য করেছেন। কৃষ্ণ মেনে নিয়েছেন দ্রৌপদীর কথা এবং অভিমানিনী অপমানিতা দ্রৌপদীর আক্রোশ-বাক্যগুলি তাঁর ঈপ্সিত যুদ্ধভাবনা আরও চেতিয়ে তুলেছে।

পাণ্ডবদের দূত হিসাবে কৃষ্ণের ধৃতরাষ্ট্র-সভায় আসার মধ্যে বিরাট একটা আড়ম্বর ছিল এবং এই আগমন নিয়ে কৌরবকুলে নিজেদের মধ্যে অনেক নাটক হল। এর মধ্যে বিদুরের বাড়ি গিয়ে এবং কুন্তীর বাড়িতে গিযে কৃষ্ণ কৌরবদের সমস্ত 'প্রোটোকল' ভেঙে দিলেন। দৌত্য-কালেও তাঁর ভাব-ভাবনা এবং ভাষা নিয়ে রীতিমতো একটা বড় গ্রন্থ লেখা যায়, বিশেষত মধ্যম পরিসরে সেই দৌতকর্ম বর্ণনা করা বাতুলতা বলেই অতিসংক্ষেপে জানাচ্ছি যে, কৃষ্ণ কৌরব-সভার মধ্যেই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন যে, দুর্যোধন ছলনা করেছেন এবং তার জন্য তাঁর অনুতাপ নেই কোনও, তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা নিজেই এখন রাখছেন না। অর্থাৎ দুর্যোধন যে একটা গভীর অন্যায় করেছেন এখনও, এটা তিনি সভায় সমবেত কুরুবৃদ্ধদের বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের শান্তির প্রস্তাব মানেননি এবং এক সময় তিনি কৃষ্ণকে বন্দি করার একটা অসফল চেষ্টা করেন। আমরা এর বিস্তারে যাচ্ছি না, আমরা শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে, কৃষ্ণের শান্তি-দৌত্য যে ব্যর্থ হল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় 'পলিটিক্স'টা কৃষ্ণ নিজেই। তিনি এমনভাবেই সব কিছুই উপস্থাপনা করেছেন যাতে পাণ্ডবদের ঈপ্সিত যুদ্ধটা দুর্যোধনের মুখ দিয়েই ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব শান্তির কথা যতই বলুন কৃষ্ণ, যুদ্ধটা যেখানে নৈতিক হয়ে উঠেছে, তার একটা নৈতিক পরিসর তিনি সৃষ্টি করে গেলেন। সম্পূর্ণ দৌত্যের পর এক নতুন প্রতিপক্ষতা তৈরি করে কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে গেছেন, শান্তির ব্যর্থতা তাঁর কাছে প্রকট করে তোলায় কুন্তী বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়ে পুত্রদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন যুদ্ধে উদ্যোগী হবার জন্য। অর্থাৎ কৃষ্ণের দিক থেকে পাণ্ডবদের জন্য আরও একটা যুক্তি তৈরি হয়ে রইল, যেখানে যুদ্ধে এক তরফের জয়পরাজয়, জীবন-মরণ সংশয়িত জেনেও শ্বাশত-কোমল মাতৃহৃদয়েও অপমান-জনিত প্রতিশোধের যৌক্তিকতা অর্থাৎ ধর্ম খুঁজে পায়। সারাজীবন ধরে কুন্তী এত অন্যায় দেখেছেন এবং সয়েছেন, যাতে একদিকে যেমন তাঁর মুখ দিয়ে এই সাংঘাতিক প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে যে, আমি বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি সব জায়গাতেই অপমানের জ্বালা সয়েছি—সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ—তেমনই অন্যদিকে পুত্রদের উদ্দেশে কুন্তীর সেই আগুন-ঝরানো উপদেশ—একবার এক মুহূর্তের জন্যও অন্তত জ্বলে ওঠ, এতদিন ধরে তুষের আগুনের মতো শুধু ধোঁয়া ছাড়ার চেয়ে অন্তত একবার জ্বলে ওঠা অনেক ভালো—মুহূর্তজ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরম্।

পুত্রদের উদ্দেশ্যে কুন্তীর এই ভর্ৎসনা বস্তুত মরণ বাঁচন-পণ এক যুদ্ধের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করা। মৃত্যু হতে পারে জেনেও যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের উদ্দেশে এই

কথা যে, এই সময়টার জন্যই তোমাদের পেটে ধরেছিলাম, বাছারা—এই সংবাদটা কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য বহন করে নিয়ে গেছেন উপপ্লব্যে। যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্রমান্বয়ে নিজের দৌত্যপ্রক্রিয়া বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ জানিয়েছেন—পাঁচটা গ্রামও তাঁরা দেবেন না, অমি অনেক চেষ্টা করেছি সাম-দান ভেদের ভাবনায়, কিন্তু কিছুই হবার নয় এবং এক্ষেত্রে চতুর্থ উপায় দণ্ড বা আক্রমণ ছাড়া আর কোনও উপায় আমি দেখছি না— দণ্ডং চতুর্থং পশ্যামি তেষু পাপেষু নান্যথা। এটা একেবারেই রাজনীতির শাস্ত্রসম্মত কথা এবং যুধিষ্ঠির বিনা বাক্যব্যয়ে ভাইদের বলেছেন,তোমরা এবার সেনা সাজানোতে মন দাও— তস্মাৎ সেনাবিভাগং মে কুরুদ্ধং নরসত্তমাঃ।

সাত

সেকালের দিনে মহাভারতের কালে যুদ্ধ মানে এমন নয় যে, গেলাম আর ধরে ধরে মারলাম। চোরাগোপ্তা আক্রমণের মতো হীন কাজ তো কিছু ছিলই না। আর যুদ্ধভূমিও একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেনাপতি নির্বাচন। পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি কে হবেন, সেই প্রশ্নে বিরাট-রাজার কথা উঠল, দ্রুপদের কথা উঠল, এমনকী ভীষ্মের কথা মাথায় রেখে মহাবলী ভীমসেন ক্লীবনামী শিখণ্ডীর কথাও ভাবতে বলেছেন। আমাদের ধারণা, পাণ্ডবদের প্রধান সৈন্যসহায় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের নিরিখে পাঞ্চালদের কথাই প্রথমে আসে বলে অর্জুন তাঁর প্রায় সমবয়সি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নির্বাচন করার কথা বলেছেন এবং মহামতি কৃষ্ণ সেটাই সমর্থন করেছেন। কিন্তু এটাও ভাবার মতো বিষয় যে, ভীমের মতো মহাশক্তিসম্পন্ন লোকও ক্লীব বলে পরিচিত শিখণ্ডীকে সেনাপতি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শিখণ্ডীর পরিচয় ক্লীব হলেও তিনি সম্ভবত স্ত্রীলোক ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধৈষিণী অম্বা-শিখণ্ডিনীই ক্লীব বলে পরিচিতি হয়েছেন তাঁর পুরুষোচিত বেশ-বাস, ব্যবহার এবং অস্ত্রবিদ্যার সমাহারে। কিন্তু একজন স্ত্রী বা ক্লীবকে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতিত্বে বরণ করার প্রস্তাবটাই মহাকাব্যিক উদারতায় অত্যন্ত আধুনিক। হয়তো প্রয়োজনের তাগিদে ধৃষ্টদ্যুম্নই সঠিক নির্বাচন, কিন্তু শিখণ্ডীর কথাটা আলোচ্য হওয়াটাই যুগকালীন উদারতা।

সাত অক্ষৌহিণী সেনাকে বর্ম পরার আদেশ দিয়ে এদিক ওদিক থেকে তাঁদের একত্রে নিয়ে পাণ্ডবরা চললেন যুদ্ধভূমির দিকে। হাতি, ঘোড়া, রথ আর পদাতিকে সম্মিলিত পাণ্ডব-বাহিনী সমুদ্রের মতো গর্জন করতে থাকল। অশ্বের হ্রেষা, হাতির বৃংহণ, রথের ঘর্ঘর, সৈন্য-সমূহের কোলাহল, আর শঙ্খ-দুন্দুভির শব্দ—সব মিলিয়ে চলমান সৈন্যবাহিনী সমুদ্রতুল্যই বটে।

সৈনাদের সঙ্গে চলতে লাগল বহুতর খাদ্যবাহী শকট, প্রয়োজনীয় দোকান, বেশ্যা এবং বেশ্যাদের তাঁবু, বাহন, ধনভাণ্ড, অস্ত্র, অস্ত্র-চালনার যন্ত্র, এবং বৈদ্য-চিকিৎসকেরা— শকটাপণ বেশ্যাশ্চ যানযুগ্যঞ্চ সর্বশঃ। দ্রৌপদী অবং অন্যান্য

স্ত্রীলোকেরা পাণ্ডব এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বিরাট-রাজ্যের উপনগরী উপপ্লব্যেই রয়ে গেলেন। বেশ খানিকটা আসার পর যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু ভাবতেই হচ্ছে যে, যেখানে দেবমন্দির আছে, শ্মশান আছে, আছে ঋষিদের আশ্রম অথবা আছে তীর্থক্ষেত্র, সিদ্ধক্ষেত্র, সে-সব জায়গা বাদ দিতে হবে। অবশেষে যুধিষ্ঠির পেলেন সেই জায়গা, যেখানে প্রচুর ঘাস এবং কাঠের ইন্ধন পাওয়া যায়। জায়গাটা সুন্দর, সমভূমি , ক্ষার মাটি নেই অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যদের অসুবিধে হবে না, গোরু-ঘোড়া -হাতির খাবার আছে এবং রান্না করার কাঠ আছে। যুধিষ্ঠির সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এই জায়গাই কুরুক্ষেত্র, যেখানে কাছেই হিরণ্বতী নদী বয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ সেখানে পরিখা খনন করলেন যাতে সৈন্যরা সুরক্ষিত থাকে, হাতি-ঘোড়ার খাবার জলও তাতে পাওয়া যাবে।

পাণ্ডবরা যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে রওনা হবার পর কুরুদের মধ্যে যে মিটিং হল, তাতে এটাই বেরিয়ে এল, যে এই যুদ্ধটা কৃষ্ণই ভীষণভাবে চাইছেন, এবং ভীম-অর্জুন তাঁর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন-মাত্র। দুর্যোধন নিজেই বলেছেন— আমি কৃষ্ণকে যেভাবে অপমান করেছি, পাণ্ডব-ভাইদের সঙ্গে এবং দ্রুপদ-বিরাটের সঙ্গেও যে অপব্যবহার করেছি, তাতে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করবেনই এবং আমার সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধটা কৃষ্ণই চাইছেন— ইষ্টো হি বাসুদেবস্য পাণ্ডবৈ মর্ম বিগ্রহঃ। আমরা আগেই এ কথা জানিয়েছিলাম। যুধিষ্ঠিরের মতো সর্বতোভদ্র মানুষ যুদ্ধের প্রয়োজনের সময়েও যুদ্ধের পরিণতিতে হিংসার যন্ত্রণা ভোগ করেন। এমনকী কুরুক্ষেত্রে এসে এত যুদ্ধসজ্জার মধ্যেও যুধিষ্ঠির বলেছেন— কী চেয়েছিলাম আর কী হল? আমরা শান্তির জন্য এত চেষ্টা করলাম, অথচ সেই শান্তি আমাদের কাছ থেকে সযত্নে চলে গেল, আর যেটার জন্য কোনও চেষ্টা করিনি, সেই মহাযুদ্ধটা কেমন অনায়াসে চলে এল আমাদের সামনে— অকৃতে তু প্রযত্নে' স্মানুপাবৃত্তঃ কলির্মহান। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন যে, দুর্যোধনের মতো ক্ষমতালিপ্সুরা মৃদুতার মাধ্যমে শান্ত হন না, তাঁদের পালটা মার দরকার। দুর্যোধন এবার বুঝেছেন— যুদ্ধ এবার লাগবেই। অতএব তাঁরাও পাণ্ডবদের মতোই সেনা -সৈন্য সাজিয়ে রওনা দিলেন কুরুক্ষেত্রের দিকে। দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন বহু সম্মান দিয়ে।

এখানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতি-বিষয় বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব। আমরা শুধু এই যুদ্ধ এবং পরিণতির মধ্যে রাজনীতির তৎকালীন প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলি অতি সংক্ষেপে ধরার চেষ্টা করছি। লক্ষণীয় বিষয় হল—যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—যুদ্ধ ব্যাপারটা হল অনেকটাই দুই কুকুরের লড়াই, যাতে ল্যাজ-ন্যাড়া থেকে চেঁচানি, দাঁত দেখানো থেকে শেষ মারামারি সবটাই আছে। তো দুর্যোধন এতদিন প্রচুর ল্যাজ-নাড়া দেখিয়েছেন গর্জনও করেছেন প্রচুর এবং দাঁত দেখানোর জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে এসেই শকুনির ছেলে উলুককে পাণ্ডব-শিবিরে পাঠালেন যুধিষ্ঠিরকে বেশ খানিকটা গালাগালি দিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে আসার জন্য। এটা তখনকার প্রথার মধ্যে ছিল—

আদিকবির রামায়ণে ও বালিপুত্র অঙ্গদ রাবণকে যুদ্ধপূর্ব মুহূর্তে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়ে এসেছিলেন। তবে এই গালাগালি দেবার মধ্যে পরপক্ষকে উত্তেজিত করার কাজ যতটুকু হয়, তার থেকে অনেক বেশি নিজে উত্তেজিত হওয়া যায়। যা নিজের মুখে বলা যায় না, সেই কথাগুলি উলূকের মুখ দিয়ে বলিয়ে দুর্যোধন বিমলানন্দ লাভ করলেন, তবে পাণ্ডবরা এবং কৃষ্ণ তো তাঁকে কথা না শুনিয়ে ছেড়ে দেননি, তাঁরাও দুর্যোধন-কর্ণাদির উদ্দেশে প্রচুর তিরস্কার বর্ষণ করলেন।

যুদ্ধ লাগার ঠিক আগে-আগে তিনটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এক কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ বলরাম এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেন না। দুই পক্ষই তাঁর কাছে সমান, এই উদার যুক্তি যতই সযৌক্তিক হোক না কেন, মহাভারতের প্রমাণ তিনি খানিকটা দুর্যোধনের পক্ষপাতী মানুষ ছিলেন। তাছাড়া যাদব-বৃষ্ণি-অন্ধকদের মধ্যে নিজস্ব ভুল বোঝাবুঝি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছু ছিল, যে কারণে বলরাম পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে পাণ্ডবদের শক্তি আর বাড়াতে চাননি। খুব বাস্তব জায়গা থেকে জানাই—অতিপরিচিত বা 'ফ্যামিলিয়ারিটি' যদি একান্তভাবে ঘৃণার নির্দেশক নাও হয়, তবু অনেক সময়েই সেটা স্বাভাবিক গুণ-প্রখ্যাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে ওঠে। যাদব-বৃষ্ণিদের সংঘরাষ্ট্রে কৃষ্ণ অন্যান্যদের জন্য অনেক করলেও তাঁর অসম্ভব ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষাবশতই হোক অথবা অতি পরিচিতির অবহেলাবশতই হোক, কৃষ্ণকে অন্য সংঘমুখ্যেরা সব সময় সহ্য করতে পারেননি। তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে এবং অন্যত্র তা আমরা সবিস্তারে লিখেছি। এখন এটা তো বাস্তবেই দেখছেন যে, কৃষ্ণ এবং অর্জুনের প্রিয় শিষ্য সাত্যকি ছাড়া কৃষ্ণের কুলের আর কেউ পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেননি। এমনকী কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের নাম বারবার আগে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হিসেবে উচ্চারিত হলেও এই বীর যোদ্ধা কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেননি। যোগ দেননি অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজদের আর কোনও প্রধান পুরুষ। অন্যদিকে সেই কুলেরই কৃতবর্মাকে দেখুন, যিনি এই সেদিন হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের শান্তিদৌত্যকালেও কৃষ্ণের অঙ্গরক্ষক হিসেবে সাত্যকির সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি কিন্তু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের বিপক্ষে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তার ওপরে ছিল—যাদব-বৃষ্ণিদের অতি বিশ্বস্ত এবং অতি বিচক্ষণ নারায়ণী সেনা। আবার বলরামের কাছে উভয় পক্ষের সমতা প্রমাণ করার জন্য কৃষ্ণ কিন্তু সোজাসুজি যুদ্ধে নামেননি, তিনি অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করায় প্রতিজ্ঞাত হলেন।

ঠিক এইরকম গৃহ-বিসংবাদ কৌরবদের মধ্যে ছিল। কৌরবদের ঘরে জ্ঞাতি বিরোধী রাজনীতির মধ্যে কর্ণ যেভাবে দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিলেন, তাতে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে বহুবার কথাও বলেছেন ভীষ্ম। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। কর্ণের উচ্চকিত কথায় দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামার প্রতিক্রিয়া আপনাদের মনে আছে। সেদিন পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভীষ্মই সব মিটমাট

করে দিয়েছেন, কিন্তু আজ এই মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে দুর্যোধন হঠাৎই নিজপক্ষ এবং পরপক্ষের বলাবল বোঝার জন্য কে কত বড় যোদ্ধা, কতখানি তার ক্ষমতা, এইসব নিয়ে ভীষ্মকেই একটা বড়সড় প্রশ্ন করে বসলেন। ভীষ্ম অনেককেই মহারথ, অতিরথ এইসব মান্য সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে কর্ণকে একজন অর্ধরথ যোদ্ধা বলে উল্লেখ করলেন এবং তার কারণও দেখালেন। কিন্তু তাতে ফল যা হবার হল। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে তিনি আর যুদ্ধই করবেন না এবং আরও স্পষ্ট করে বোঝালেন যে, তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা এবং যুদ্ধবীর্যের সাফল্য কিছুতেই সেনাপতি ভীষ্মের সাফল্যভাগে পড়তে দেবেন না। আমরা শুধু বলব—এইরকম গৃহ-বিসংবাদ কিছু কৌরবপক্ষেও রয়ে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামা সকলেই ভিতরে ভিতরে কর্ণ বিরোধী অবস্থান থেকেই যুদ্ধ আরম্ভ করছেন এবং কর্ণও ঠিক তাই, তিনি আরম্ভের মধ্যে থাকলেনই না।

সম্পূর্ণ এই ঘটনাটাকে আজকের ভাষায় অন্তর্ঘাত বলা যাবে কি না বলা মুশকিল, কিন্তু মহাভারতে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে, যার নাম 'তেজোবধ'—মানে এক যোদ্ধার দীপ্যমান যুদ্ধবীর্যে জল ঢেলে দেওয়া। পাণ্ডবদের ব্যাপারে ভীষ্ম এবং দ্রোণের মতো মহাযোদ্ধাদের দুর্বলতার কথা দুর্যোধনের জানা ছিল এবং ভীষ্ম-দ্রোণরা এ কথা প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা করেননি। তৎসত্ত্বেও শুধু সাম্মানিক কারণেই দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্বে বরণ করেছেন এ কথা ঠিক মনে করি না আমরা। তিনি ভেবেছিলেন — তাঁর প্রধান ভরসা কর্ণ পাণ্ডব-ভাইদের মারার দায়িত্ব নেবেন, আর ভীষ্ম-দ্রোণরা সৈন্যক্ষয় করলেই যথেষ্ট হবে। এই অবস্থায় কর্ণ সাভিমানে যুদ্ধ ছেড়ে বসে গেলেন প্রথমারম্ভেই। তিনি ভীষ্মকে বলেছেন— শুধু আজকে নয়, আগেও আপনি পদে পদে আমাকে অনেক খারাপ কথা বলেছেন, আমি সেগুলো শুধু দুর্যোধনের জন্য সয়ে গেছি — অনাগসং সদা দ্বেষাদেবমেব পদে পদে। আপনি কৌরবদের ভাল চান না, কিন্তু দুর্যোধন সেটা বোঝেন না। এবং আজকে আপিন কী করছেন? বিরাট যুদ্ধবীর যোদ্ধাদের তেজ নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছেন— তেজোবধমিমং কুর্যাদ্ বিভেদয়িষুরাহবে— কে বা কারা করে এইরকম? আপনি কি জানেন না যে, রাজার একান্ত নিজের মৌল সেনাদের মধ্যেই একবার বিভেদ উপস্থিত হলে তাদের একত্র করা দুষ্কর হয়ে পড়ে, আর এখানে তো অন্য রাজার সেনারাও রয়েছে— মৌলা হি পুরুষব্যাঘ্র কিমু নানা সমুত্থিতাঃ।

এটা অবশ্যই একটা যুক্তিসিদ্ধ কথা। রাজাদের ক্ষেত্রে প্রধান হল মৌল সেনা, যাদের কথা কৌটিল্যও বলেছেন অর্থশাস্ত্রে, এই সেনারা পিতা-পিতামহক্রমের মূল থেকে আসা বিশ্বস্ত সেনা-সেনাপতির মতো 'স্ট্যান্ডিং আর্মি অব দ্য স্টেট'। কৌটিল্য মৌল-বলকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন এই কারণে যে, রাজা যেভাবে ভাবেন, রাজা যেমনটা চান, তাঁরাও ঠিক সেইভাবেই ভাবিত হয়ে রাজার ইচ্ছা পূরণ করেন— তদ্‌ভাবিত্বান্ নিত্যসৎকারানুগমাচ্চ। কর্ণ বুঝিয়ে দিতে চাইছেন—কৌরব-পক্ষের

সেনাপতি হচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা 'তদ্‌ভাবভাবিত' নন, দুর্যোধনের মতো করেই তাঁরা ভাবেন না বলেই স্বদেশীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মৌল-বলের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ তিনি সেনাপতি হয়ে অন্য লোকেদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে সদা বিশ্বস্ত দুর্যোধন-সহায়ের তেজেহানি ঘটাচ্ছেন— তেজোবধো না ক্রিয়তে প্রত্যক্ষেণ বিশেষতঃ— অথচ এই সময়ে সেনাপতি হিসেবে তাঁর উৎসাহ দেবার কথা। কর্ণ ও ভীষ্মকে যথেচ্ছ গালাগাল দিয়েছেন, যুদ্ধে বিরত হয়ে তাঁকে বসে যেতেও বলেছেন, শেষে নিরুপায় হয়ে নিজেই বসে গেছেন। দুর্যোধন বেশি আপত্তি করেননি, তিনি 'স্ট্র্যাটিজিক্যালি' ভেবেছেন, পাণ্ডবদের অজস্র সৈন্য ক্ষয়ের পর কর্ণ তাঁদের শেষ করে ছাড়বেন। দুর্যোধনের 'স্ট্র্যাটিজি'-এত ভুল ছিল না, কিন্তু কর্ণ শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনকে হতাশ করেছেন—সেটা দুর্যোধন বোঝেননি।

যুদ্ধারম্ভে পাণ্ডবপক্ষেও ঘোর বিপন্নতা এসে গিয়েছিল অর্জুন বিষাদের সূত্র ধরে। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-আচার্য-গুরুজন-ভাই বেরাদরকে মারতে হবে বুঝে অর্জুন একেবারে ভেঙে পড়লেন। এই অবস্থায় ভগবদ্‌গীতার উপদেশ নেমে আসে কৃষ্ণের মুখে। এই উপদেশের মধ্যে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি অথবা হাজারো দার্শনিক তত্ত্বের উপদেশ থাকুক, এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, তুমি রাষ্ট্র চালনার দায় নিতে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেছ, সেখানে অন্যায়-অনীতি যদি রাষ্ট্রকে গ্রাস করে, তবে অন্যায়ী ব্যক্তিকে তো বটেই, সেই অন্যায়ের পক্ষপাতী এবং সেই অন্যায়ের সঙ্গে যুক্তজনকেও তোমাকে শাস্তি দিতে হবে 'স্বধর্ম' কথাটা গীতায় বহুলভাবে উল্লিখিত এবং এই 'স্বধর্ম' সমাজের সর্বস্তরীয় মানুষের নিজের কাজটাকে এমনভাবে দেখতে বলে, যেখানে 'আমি করছি' এই অহংকার থাকবে না, অথচ সেখানে ধৈর্য থাকবে, উৎসাহ থাকবে, কাজটাকে বৃহত্তর প্রয়োজনে নিজের অনাসক্তিতে সিদ্ধ করতে হবে—মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুসাহসমন্বিতঃ। কৃষ্ণ জানিয়েছেন—এই দৃষ্টিতে কাজ করলে নিজের আত্মীয়-বন্ধুও যদি অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তারা হত্যার যোগ্য হয়ে ওঠে এবং সেই হত্যায় পাপও হয় না। মহাভারতের যুদ্ধারম্ভে এই প্রশ্ন তো ছিলই যে, ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বিরাট পুরুষেরা দুর্যোধনের বিরুদ্ধে অনেক সময়েই অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যাননি এবং অত্যন্ত সংকটের মুহূর্তে যেমন পাশাখেলার সময়, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় এবং পাণ্ডবদের বনবাসে-অজ্ঞাতবাসে পাঠানোর সময় এঁরা কিন্তু দুর্যোধনের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেননি এবং যুদ্ধেও তাঁরা দুর্যোধনেরই পক্ষে আছেন। ফলে যুদ্ধ যখন লাগবে এবং তাতে যদি দুর্যোধন বধযোগ্য হয়ে ওঠেন, তবে তাঁর হয়ে যাঁরা যুদ্ধ করছেন, তাঁরাও বধযোগ্য বটে, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মযুক্তি সেই পথেই চলেবে।

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য ভগবদগীতার দার্শনিক যুক্তিগুলিও এখানে আরও বেশি ব্যাখ্যেয় ছিল, কিন্তু তা লেখার জন্য আরও বড় পরিসর প্রয়োজন, এমনকী গোটা যুদ্ধটা চলাকলীন সময়ে রাজনীতির গতি-প্রকৃতি যে পথ ধরে চলেছে,

তারও বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন ছিল এখানে, কিন্তু তারও পরিসর নেই। সামান্য যে আলোচনা সেটাও রাজনীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র এবং সেটা না বললেই নয়।

আট

দেখুন, পাণ্ডবপক্ষে নানান চর্চার পর দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমগ্র যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচিত করা হল, কিন্তু কৌরবপক্ষে তেমন কোনও সেনাপতি নির্বাচন করা হল না। যেটা করা হল— আসন্ন যুদ্ধের প্রয়োজনে সব দিক বিচার করে সাময়িকভাবে একজন যুদ্ধনায়ক বাছাই করা— দুর্যোধন যেটা প্রথমত ভীষ্মকে বেছেছেন— এবং সেই সময়টা জুড়ে তিনি সর্বাধিনায়ক সেনাপতি। দুর্যোধনের দিক থেকে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। তাঁর সেনাবাহিনীতে প্রধান বীর যাঁরা, তাঁরা সবাই প্রায় বাইরের লোক—দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা— এঁদের সবাইকে একসঙ্গে সেনাপতি করা যায় না এবং এখানে তাঁদের মর্যাদারও তর-তম আছে। পাণ্ডবপক্ষে এই অসুবিধা নেই। বড় সৈন্য সহায়ক হিসাবে এবং সেই দ্রৌপদীর বিবাহ-সময় থেকে নৈতিক সহায় পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হয়ে রইলেন বটে, তবে তিনি বোধহয় নিজেও জানেন যে, ভীম-অর্জুনও নয়, পাণ্ডবদের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা অস্ত্রহীন কৃষ্ণ, যিনি অর্জুনের সারথ্য করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধের লাগাম তাঁর হাতে, তিনিই রথ, অতিরথ, মহারথ, সবাইকে পরিচালিত করবেন বুদ্ধিতে।

তবে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনী যেভাবে সাজানো হয়েছে, তার একটা সঠিক সংজ্ঞাচিত্র পাওয়া যাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। যুদ্ধকালে সামরিক পদাধিকার কৌটিল্যে তিনটি—পদিক, সেনাপতি এবং নায়ক। দশটা রথ, দশটা হাতি, প্রত্যেক রথের সঙ্গে পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য এবং পনেরোজন পদাতিক— এই দশটির অধিনায়কের নাম হল পদিক বা পতিক। দশজন পদিকের অধিকারে থাকবেন একজন সেনাপতি এবং দশজন সেনাপতির অধিকারে থাকবেন একজন নায়ক। তবে নায়ক যতই সবার ওপরে হোন, কৌটিল্যে কিন্তু নায়ক-কর্মের বিবরণ মাত্র এক জায়গায় আছে এবং সেনাপতির পদমর্যাদা রাজপরিবারের পুরোহিত, যুবরাজ অথবা মন্ত্রীর প্রায় সমান। এখানেই সেনাপতি এবং নায়কের পদমর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে পণ্ডিতমহলে। কৌটিল্য যেখানে সেনাপতির নানান যুদ্ধোদ্যোগ এবং যুদ্ধকর্মে তাঁর বিরাট কার্যকর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে নায়কের কথা বলতে গিয়ে একবারমাত্র বলেছেন যে, নায়ক চলবেন সবার আগে এবং সবার শেষে সেনাপতিরা নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হবেন। ঠিক এই দিক থেকে দেখলে নায়ক-পদটাকে একটা বৃহৎ অলংকৃত মর্যাদার জায়গা বলে মনে হয়। নায়ক যেন এমন কেউ, যিনি বিশাল যুদ্ধবীর্য এবং সুনামের অধিকারী, যাঁকে দেখলে প্রতিপক্ষ ভয়ও পায়, সম্মানও করে। সেই দিক দিয়ে দেখলে দুর্যোধনের বাহিনীতে নায়ক অনেক, যে কথা ভগবদগীতার আরম্ভে দুর্যোধনের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— আমার

পক্ষে বিশিষ্ট মানুষগুলির নাম শুনুন—দ্রোণ। আপনি নিজে, তারপর ভীষ্ম আছেন কর্ণ আছেন, কৃপ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ আরও কত নাম— এঁরা সবাই আমার সৈন্যদের নায়ক— নায়কাঃ মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে। এটাই হবার কথা। একজন নায়কের তত্ত্বাবধানে অনেক সেনাপতি, যেমন ভীষ্মের নায়কত্বকালে দ্রোণ, অশ্বত্থামারা আবার দ্রোণের সময় কর্ণ, জয়দ্রোথ, অশ্বত্থামারা। পাণ্ডবপক্ষেও তেমন হলেও ধৃষ্টদ্যুম্নকে মর্যাদা দিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে— ধৃষ্টদ্যুম্নই সেনাপতি, তবে সেখানেও নায়ক অনেক— ভীম, অর্জুন দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি। এখানে কৃষ্ণের নামই নেই শুধু অস্ত্রহীন বলে, যদিও তিনি পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধসূত্রধার সারথি। যাই হোক, যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং যুদ্ধের কোনো বিশদ বিবরণেই আমরা যাব না। তবে প্রথম দিনের যুদ্ধ-কথা না বললে নয়, কেননা যুদ্ধের মধ্যেও যেখানে যেখানে মহাকাব্যিক উদারতার স্পর্শ আছে, সেগুলি না বললে মহাভারতের উদার রাজনীতি বোঝাও অসম্ভব. এই যেমন কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ যখন প্রায় লাগে লাগে, তখন যুধিষ্ঠির যুদ্ধবর্ণ ত্যাগ করে, ধনুক -বাণ রথে রেখে পায়ে হেঁটে চললেন বিপক্ষ বাহিনীর নায়ক ভীষ্মের দিকে। যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবীর ভাইরা তাঁকে আটকাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত বারণ উপেক্ষা করে এগোতে লাগলেন ভীষ্মের দিকে, ফলে নিরুপায় পাণ্ডব-ভাইরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। বিপক্ষ সৈন্যদের মধ্য থেকে নানান কটূক্তি এবং অপযুক্তিও ভেসে আসছিল যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডব-ভাইদের প্রতি। তারা বলছিল পাণ্ডুবংশের কুলাঙ্গার এই যুধিষ্ঠির। ব্যাটা এখন যুদ্ধের ভয়ে ভীষ্মের কাছে ছুটে যাচ্ছে— ব্যক্তং ভীত ইবাভ্যেতি রাজাসৌ ভীষ্মম্ অন্তিকম্। এত ভয় পায় কেন বুঝি না বাবা! আরে তোর ভীম-অর্জুনের মতো দুটো ভাই রয়েছে, নকুল-সহদেব আছে, তবু ভয়! তোরা কি ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মাসনি? আমাদের কৌরবপক্ষ বাবা এদিক দিয়ে অনেক ভালো। সৈন্যদের এইসব কথা-জল্প উপেক্ষা করে শর তরবারি -সমাকুল সৈন্য-সমুদ্রে যেন অবগাহন করেই ভীষ্মের কাছে পৌঁছলেন যুধিষ্ঠির—সো'বগগাহ্য চমূং শত্রোঃ শরশক্তিসমাকুলাম্।

একমাত্র কৃষ্ণ বলেছিলেন যে অপরপক্ষে হলেও ভীষ্ম-দ্রোণের মতো মান্য পুরুষদের আশীর্বাদ না নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারছেন না যুধিষ্ঠির এবং যুধিষ্ঠিরের কাছেও এই বড় মানুষদের স্বাভাবিক আশা কতটা যে, তাঁরা বলেছেন—তুমি এইভাবে আমাদের কাছে আশীর্বাদ চাইতে না এলে আমরা খুবই কষ্ট পেতাম, এমনকী হয়তো অভিশাপই দিয়ে দিতাম তোমাকে। আর যুধিষ্ঠিরের ভাষাটা কী রকম? তিনি সবেগে ভীষ্ম-পিতামহের পা জড়িয়ে ধরে বললেন— আপনার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, পিতামহ! আপনি অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন, যাতে জয়লাভ করতে পারি— অনুজানীহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয়। ভীষ্ম বললেন—যুদ্ধ কর পুত্র! আমি অনুমতি দিলাম, তুমি জয়লাভ কর! আমি এতে খুশি হয়েছি, তুমি বর চাও আমার কাছে। তবে হ্যাঁ, যেন এটা বলো না যে, আমার যুদ্ধ কর' চলবে না। এটা তো

বোঝ যে, সমস্ত মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। আমি কৌরবদের কাছে অর্থদাসত্বে বাধা পড়ে আছি। আর সেইজন্যই ক্লীবের মতো কাতর হয়ে তোমাকে বলতে হচ্ছে—যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ ছাড়া আর যা চাও, আমি মেনে নেব— ভৃতোস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যং কিমিচ্ছসি?

এই একই জবাব দ্রোণ-কৃপের কাছ থেকেও এসেছে এবং এটা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে অবশ্য এটাই জানাব যে, মহাভারতীয় রাজনীতিতে সাধারণ রাজনীতির অঙ্ক মিলতে চায় না। সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে এক পক্ষের যুদ্ধনায়ক জয়ের জন্য শত্রুপক্ষের অন্যতম যুদ্ধনায়কের কাছে আশীর্বাদ চাইতে যাচ্ছেন— এটা মনু, কৌটিল্য কেউ মেনে নেবেন না। আর ঠিক এইখানেই মহাভারতীয় রাজনীতির উদার আড়ম্বরটুকু ফুটে ওঠে। যুদ্ধ রাজনীতির নৈতিকতা মরালিটির প্রশ্নটা আরও বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ভীষ্ম-দ্রোণের জবাবে— আমরা অর্থ-পোষণের দায়ে কৌরবদের ঘরে আটকে গেছি। যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। পণ্ডিতজনেরা বলেছেন—এটা একটু আশ্চর্যই বটে, ভীষ্ম-দ্রোণ যথেষ্টই স্পষ্টবক্তা ছিলেন, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের কর্মপন্থায় আপত্তি জানিয়েছেন। পাণ্ডবদের ব্যাপারে দুর্বলতাও তাঁরা প্রকট করেছেন বারবার, তাহলে কেমন এই অন্ন-ঋণ, কেমন এই অর্থদাসত্ব— যার জন্য আজ এই যুদ্ধ থেকে সরে আসার নৈতিকতা শুধু নয়, সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়েও ভীষ্ম কোনও কর্কশ সিদ্ধান্ত নেননি। দুর্যোধনের বিরুদ্ধে, এমনকী আরও কঠিন-কর্কশও হতে পারেননি পাণ্ডবদের বনযাত্রা এবং পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস নিবারণের ক্ষেত্রে। আর যুদ্ধকালে তো আরও খারাপ অবস্থা দেখলাম! দুর্যোধন যখন ভীষ্মের কাছে সেনাপতিত্বের প্রস্তাব দিচ্ছেন, তখন ভীষ্ম নিজের দুর্দম ক্ষমতার কথা নিজ মুখেই বলছেন এবং বেশ গর্বিতভাবেই দুর্যোধন-বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন।

পণ্ডিতদের এই যুক্তি-তর্কের দিকটা রাজনীতির যুক্তি-তর্কের দিক থেকে নিরসন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি একান্নবর্তী পরিবারের বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলির পারিবারিক মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করেন, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই এই বিরোধের সমাধানসূত্র পাওয়া যায়। আমি তো দেখেছি—একান্নবর্তী পরিবারগুলির বৃদ্ধ অভিভাবক যাঁরা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের টাকা পয়সাও অনেক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হচ্ছে,তখন মাঝে মাঝে তাঁরা অধস্তনের বিরুদ্ধে এখানে-ওখানে মুখ খুলেছেন। অথচ খুব জটিল-কুটিল বিপন্ন মুহূর্তে ছেলেমেয়েরা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তখন পছন্দ না হলেও তাঁরা মুখ খুলছেন না, বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি মেনে নিচ্ছেন, এমনকী অধস্তনের তাৎক্ষণিক চাটুবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন অভিভাবকতাও জনসমক্ষে মাঝে মাঝে প্রকট করে তুলছেন, যেন ছেলেপিলেরা তাঁর মতেই চলছে অথবা ছেলেমেয়েরা যা করেছে, তার পিছনে তাঁদের সমর্থন আছে।

ভীষ্ম-দ্রোণের ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটেছে। রাজসভায় যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে দুর্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসনের বাড়াবাড়ি চলছিল, তখন বাধা দিলে তাঁদের নিজেদেরই চরম অপমান হত দুর্যোধন-কর্ণের হাতে। তাঁরা বিদুরের অপমান দেখেছিলেন। একই কারণে বনবাস-পণে পাশাখেলার সিদ্ধান্ত তাঁরা আটকাতে পারেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের মানসিক অসন্তুষ্টি থাকলেও উদ্যোগপর্বে ভীষ্ম-দ্রোণেরা পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা শতমুখে বলেছেন। কিন্তু শেষ জায়গাটা যখন আসে, তখন যেন এতকালের হস্তিনাপুরের গর্ভগৃহ ভীষ্মকে আর কিছুতেই মুক্তি দেয় না। ভীষ্ম তো শুধু এই বংশজ দুর্যোধন-দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির- ভীম- অর্জুনদের ছোট থেকে দেখেননি, তিনি তো ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু -বিদুরকে পুত্রস্নেহে পালন করেছেন, এমনকী তাঁদেরও পিতৃসমান বা পিতাই —সেই বিচিত্রবীর্যকে মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া এবং রাজার সবচেয়ে বিশ্বস্ত হিসেবে রাজ্যভার সামলানো, এসব কিছুই ভীষ্মের দায়িত্ব ছিল। যে রাজ্য এবং যে মানুষগুলিকে এতকাল তিনি দেখে আসছেন, যাঁদের সুখ-দুঃখের সমস্ত দিনগুলিতে তিনি তাঁদের পাশে থেকেছেন, সেই ভদ্রাসন ছেড়ে তিনি পাণ্ডবদের কাছে যান কী করে? একে তো পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য পানইনি বহুদিন, আবার যখন পেলেন, তা কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল, সেখানে বৃদ্ধতম ভীষ্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে যান কী করে? বরঞ্চ তিনি দায়িত্ব এবং প্রয়োজন অনুভব করেছেন— আমি অত বুড়ো মানুষদের অনর্থক দায়িত্ব পালনের অকর্মণ্য অজুহাত দিতে দেখেছি— সেখানে ভীষ্মের যে ব্যক্তিত্ব এবং শক্তি, তাতে তিনি প্রয়োজনে অনুভব করেছেন— কুরুবাড়িতে থেকেই তাঁর দায়িত্ব পালন করার।

অবশেষে এই যুদ্ধ। কী করে হঠাৎ একদিন বলা সম্ভব— আমি আর তোমাদের সঙ্গে নেই, আমি ন্যায়ের পক্ষে থাকার জন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলাম। এতদিনের অভিজ্ঞতায় ভীষ্ম জানেন যে, ন্যায় বস্তুটা নির্দিষ্ট আঙ্কিক নিয়মে গঠিত কোনও যৌগ রসায়ন নয়, একটা ন্যায়ের মধ্যে আরও পাঁচটা ন্যায়ের টানাপোড়েন থাকে; সেই পিতা শান্তনুর সময় থেকে কৌরবকুলের কুলতন্তুগুলি প্রসারিত করার জন্য যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী থেকে শুধু মানিয়ে নিয়ে, জীবনের এতটা পথ এলেন, তাঁর পক্ষে বোধহয় এটাই বড় যুক্তি যে, এবার কোনওভাবে মৃত্যু বরণ করাই ভালো। আর সেই মহাভারতের যুগে হলেও রামায়ণের কহিনি সবার জানা ছিল। বিভীষণ বড় ভাই রাবণকে ছেড়ে ভগবৎ প্রমাণ রামচন্দ্রের আশ্রিত হয়েও এই অপবাদ থেকে মুক্ত হননি যে, তিনি গৃহভেদী বিভীষণ।

পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে আরও অনেক বেঁচে থাকার এবং আরও অনেক ভোগের ইচ্ছে তাঁর ছিল না। এবং সে ইচ্ছে ছিল না দ্রোণেরও। তিনি ভীষ্মের মতো সেই অর্থ দাসত্বের কথাই বলেছেন। এমনকী এই অর্থঋণ বা অন্নঋণের কথা তাঁকে দুর্যোধন-কর্ণের মুখে শুনতেও হয়েছে একাধিকবার। একদিন দ্রোণকে এমনও তাঁদের মুখের ওপর বলতে হয়েছে— আমি তোমার টাকায় খাই-পরি না, আমি মহামতি

ভীষ্মের দেওয়া বৃত্তিতে খাই-পরি। কিন্তু ভীষ্মের বৃত্তি আসে কোথা থেকে? সেই কুরুরাষ্ট্র থেকেই তো, যা ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের দৃষ্ট এবং অনুমোদিত বৃত্তি। তর্কযুক্তি যতই বিস্তার করি না কেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণ দু'জনেই যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, যথেষ্টই তাঁরা বুঝেছেন কর্ণ-দুর্যোধন-দুঃশাসনকে, কিন্তু পরম্পরাবাহী ঐতিহ্যগত জীবনের পরিণাম ত্যাগ করে তাঁরা জীবন এবং ভোগের জন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে চাননি— নিবৃত্ত ভোগেচ্ছা পুরুষ-বহুমানো বিগলিতঃ। তাঁরা মরতেই চেয়েছেন, তা নইলে নিজেদের মৃত্যুর উপায় তাঁরা নিজেরা বলে দিতেন না এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও এই যুদ্ধক্ষেত্রে জয়াশীর্বাদ চাওয়ার পরেই এ-কথা নির্লজ্জভাবে বলা সম্ভব হত না যে, কী করে এই যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করা যাবে, সেটা আপনি বলুন— কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্।

কথাটা তখনও ভদ্রলোকের মতো ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে দীপ্ত হয়ে উঠেছেন ভীষ্ম। বলেছেন— আমি যুদ্ধ করতে থাকলে আমাকে কেউ জয় করবে এমন লোক তো দেখি না, বাবা! সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞাসা করে বলেছেন—সে কথা তো আমরা জানিই পিতামহ, আর ঠিক সেই জন্যই আপনাকে প্রণাম করে আপনার বধের উপায় আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি—হন্ত পৃচ্ছামি তস্মাত্ত্বং বধোপায়ং পিতামহ। ভীষ্ম বলেছেন —ঠিক এখনই আমার মরার সময় হয়নি বাছা! আর ক'দিন পরে এসো। ভীষ্মের মনে ঠিক এই কথাই ছিল যে, অন্তত কয়দিন দুর্যোধনকে দেখিয়ে দুর্যোধনের জন্য কিছু করা উচিত। উপায় থাকতেও দুর্যোধন তাঁকে সেনাপতিত্বের ভার দিয়েছে। তাছাড় পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের তিনি কিছু করবেন না, একথা হাবে-ভাবে-কথায় অনেক প্রকারে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন. এমনকী কুরুবাড়ির অন্তঃপুরের মহিলারাও এই সংবাদ জানেন। স্বয়ং গান্ধারী পূর্বে এক গম্ভীর মুহূর্তে পুত্র দুর্যোধনকে বলেছিলেন— তুমি যেন বোকার মতো এটা ভেবো না যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ—এঁরা কেউ সর্বশক্তি নিয়ে তোমার জন্য যুদ্ধ করবেন। ভীষ্ম নিজেও সেটা বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি পাণ্ডুর ছেলেদের মারতে পারব না, কিন্তু প্রত্যেকদিন বিপক্ষের দশ হাজার সৈন্য আমি মেরে দেব।

দশ দিনে প্রতিদিনে দশ হাজার সৈন্য ভীষ্ম মেরেছিলেন কি না, এই ক্ষুদ্র হিসেব মহাকাব্যিক দৃষ্টিতে নিতান্তই অমূলক, কিন্তু এ-কথা ঠিক তিনি অনেক সৈন্য সংহার করেছেন এবং যুদ্ধের তৃতীয় দিনে এবং নবম দিনে তাঁর আক্রমণের ধার এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে, ভগবান বলে চিহ্নিত মানুষটি, যিনি যুদ্ধ না করার জন্য পূর্বেই প্রতিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি পর্যন্ত অর্জুনের সারথ্য পরিত্যাগ করে নিজের চক্র-হাতে নেমে এসেছিলেন ভুঁয়ে এবং তা ভীষ্মকে শুধু ঠেকানোর জন্য। সবচেয়ে বড় কথা, ভীষ্মের অবিরাম শত্রু-শাতনের প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণ ভুলেই গিয়েছিলেন তার প্রতিজ্ঞার কথা। পণ্ডিতেরা বলেছেন— ঘটনাটা দু'দিন হয়নি, একদিনই ঘটেছিল এবং সেটা নবম দিনে এবং কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম তাঁর

চলৎকুণ্ডলশোভী চক্রধারী রূপ দেখে নিজে অস্ত্র ত্যাগ করে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করেছিলেন। মহাভারতের এই অংশ নিয়ে ভাগবত পুরাণে সেই অসামান্য স্তুতিমঙ্গল বিস্তারিত হয়েছে ভক্তবাঞ্ছায় ভগবানের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মর্মে। আমরা এই বিস্তারে যাব না, কিন্তু এইটুকু বলতে হবে যে ভীষ্মের নবম দিনের যুদ্ধ রাত্রিবেলায় পাণ্ডব- পাঞ্চালদের একত্রে আলোচনাসভা ডাকতে বাধ্য করল। ভীষ্মের বিক্রম স্মরণ করে ক্ষোভে- দুঃখে যুধিষ্ঠির আবার বনে যেতে চাইলেন।

আলোচনাসভা থেকে সেই রাত্রেই যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এবং কৃষ্ণকে সামনে রেখে উপস্থিত হলেন ভীষ্মের কছে। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ—আপনি আপনার মৃত্যুর উপায় বলে দিন— ভবান্ হি নো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ। ভীষ্ম এতটুকু দুঃখিত হলেন না। দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞাত সত্য তিনি পালন করেছেন, আর তাঁর বাঁচার ইচ্ছে নেই। বরঞ্চ যাঁদের ন্যায়দর্শিতা এবং সত্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ চিরকাল, তাঁদের উদ্দেশে নির্দ্বিধায় বলেছেন— কালই অর্জুন আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, সে সামনে রাখুক শিখণ্ডীকে, সে তো মেয়ে ছিল আগে আর এখন সে যতই পুরুষাভিমানী হোক আমি তাকে দেখলেই আর যুদ্ধ করব না, অস্ত্র ত্যাগ করব। এই সুযোগে আমার পতন ঘটাক অর্জুন— অর্জুনঃ সমরে শূরঃ পুরস্কৃত্য শিখণ্ডনম্। অর্জুন কিন্তু আপত্তি করে কৃষ্ণকে বলেছিলেন— আমি বালক বয়সে ধুলি-ধূসর হয়ে, এই পিতামহের কোলে চড়েছি। তাঁকে বাবা বলে ডাকলে তিনি বলতেন—বাছা! আমি তোমার বাবা নই, আমি তোমার বাবার বাবা। আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে বধ করব কী করে? কৃষ্ণ বলেছেন— এমন ভাবলে চলবে কেন? হাজার হলেও ভীষ্ম আততায়ী, তিনি আমাদের মারতে আসছেন, সেখানে শিখণ্ডীকে সামনে রাখলে তাঁর তেজের হানি ঘটবে, তখন ধর্মযুদ্ধে তাঁকে বধ করাটা অন্যায় হবে কেন?

পরের দিন সেই কথামতো শিখণ্ডীকে সামনে রেখেই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন অর্জুন। সারদিন যুদ্ধের পর যখন সন্ধ্যা নেমে আসছে, তখন রণক্লান্ত বৃদ্ধ সম্মুখীন অর্জুনের। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখামাত্র অস্ত্র ত্যাগ করেছেন এবং তারপরেই ঝাঁকে ঝাঁকে অর্জুনের বাণ এসে পড়তে লাগল ভীষ্মের ওপর। তাঁর শরীর শিথিল হয়ে এল, তবু প্রতি-অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। শরীরে আর জায়গা রইল না বাণ ছাড়া। একটা সময় তিনি দুঃশাসনকে স্খলিত স্বরে বললেন-- এইসব বাণ তো কখনও শিখণ্ডীর হতে পারে না, এমন কঠিন, এমন তীক্ষ্ণ, এমন তীব্র সর্পবিষের মতো , যমদূতের মতো—এইসব বাণ কখনও শিখণ্ডীর হতে পারে না— নেমে বাণাঃ শিখণ্ডীনঃ।

অন্ততঃ পাঁচবার উচ্চারিত হয়েছে এই করুণ বিলাপ— নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ—এই বাণগুলি কখনও শিখণ্ডীর হতে পারে না— নেমে বাণা শিখণ্ডিনঃ —মহাভারতের বীরগাথার মহিমাকীর্তনে এটা যদি অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা হয়, তবে আজকের দিনের তির্যক দার্শনিকতায় একবারও কি এই প্রতিতুলনা মনে আসবে না যে, শিখণ্ডীর শরাঘাতের স্পর্শ কেমন, তা কি অনুভবগম্য ছিল ভীষ্মের

কাছে—সেগুলি কি তেমন কঠিন-তীক্ষ্ণ নয়, সাপের বিষের মতো নয় অথবা যমদূতের মতো নয়? স্ত্রীপূর্ব শিখণ্ডীকে তিনি দেখেছিলেন, কাশীরাজের ঘর থেকে নিয়ে আসার সময় তিনি ত্রস্তা ছিলেন, হস্তিনায় এসে তিনি নিজের মুখে শাল্বরাজার প্রতি তাঁর প্রণয়ের কথা জানিয়েছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিলেও শাল্বের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ভীষ্মের কাছে ফিরে এসেছিলেন অম্বা শিখণ্ডিনী। এবার ভীষ্ম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নিজের কৌমার্য্য ব্রত রক্ষার কারণে । সেই প্রত্যাখ্যাতা রমণীর মুখ যদি তিনি ভুলেই যেতেন, তাহলে এতবার এমন বিপ্রতীপ বিশ্বাস উচ্চারিত হতে পারে না— একখনও শিখণ্ডীর বাণ নয়, কিংবা শিখণ্ডীর কথা বলবার সময় বারবার ভীষ্মের মুখে তাঁর স্ত্রী-পূর্বতার কথা অথবা পুরুষের আবরণে তাঁর পূর্ব -রমণীভাবের কথা ঘোষিত হত না।

যাই হোক, কৌরবদের প্রথম সেনাপতি ভীষ্মের পতন ঘটল এবং এই পতনের পর শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম আন্তরিকভাবে দুর্যোধনকে বলেছিলেন— আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাক এই যুদ্ধ, এই শত্রুতা, এই ভাইতে ভাইতে বিরোধ—যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ—দুর্যোধন শোনেননি, কর্ণও শোনেননি—কর্ণের কাছেও একই আর্তি জানিয়েছিলেন ভীষ্ম। আর যুদ্ধ বস্তুটার প্রকৃতি এমনই যে, তা যদি পুরোপুরি বন্ধ না হয়, তাহলে হত্যার পথ উদগ্র জয়াকাঙ্ক্ষাকে পুষ্ট করতে থাকে এবং সেখানে ন্যায়, ধর্ম, সৌজন্য, মায়া, মমতা সব একে একে তথাকথিতভাবে স্খলিত হতে থাকে। ভীষ্ম না হয় বলেই দিয়েছিলেন যে, শিখণ্ডীকে সামনে রেখে আমাকে মার এবং তিনি শিখণ্ডীর সামনে অস্ত্রত্যাগ করে তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে আপন প্রায়শ্চিত্ত তথা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। কিন্তু অপর পক্ষে কি ন্যায়-ধর্ম এতে অব্যাহত থাকল? একটা চরম জায়গায় এসে ধর্মের কর্তা, বক্তা, অভিরক্ষিতার মতো কৃষ্ণকে বলতে হচ্ছে—শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে পাতিত করায় কোনও দোষ নেই। একই ঘটনা ঘটেছে দ্রোণের ক্ষেত্রেও।

মহাভারত থেকে মনু মহারাজ— যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রাজনীতির প্রবক্তা, তাঁরা তো যুদ্ধকালীন হত্যার মধ্যেও একটা ঐশ্চর্য -আড়ম্বর আনতে চেয়েছেন— সম্মুখ যুদ্ধ, পৃষ্টপ্রদর্শন না করা, কিংবা অস্ত্র প্রহারের সময় অপ্রস্তুত শত্রুকে প্রহার না করা ইত্যাদি। কিন্তু উদগ্র যুদ্ধের সময় যখন শত্রু পাতনই একমাত্র ধর্ম হয়ে ওঠে, তখন এই নীতি-নিয়ম ঠিক থাকে? বাস্তবে যে তা থাকে না, তা দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বকালেও বারবার প্রমাণ হল। কতকগুলি নাম করা যুদ্ধবীর অন্যায়ভাবে চলে গেলেন দ্রোণাচার্যের কালে। সবার আগে তো অভিমন্যুর নাম করতে হবে। কী অন্যায়ভাবে সপ্তরথী মিলে কৌরবরা বধ করলেন কিশোর অভিমন্যুকে। স্বয়ং দ্রোণাচার্যের অবদানও এখানে কম ছিল না, কিন্তু তাঁকে আরও অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করেছিলেন দুর্যোধন। অভিমন্যু-বধের ফলস্বরূপ মারা গেলেন কৌরবদের জামাই জয়দ্রথ। সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথ বধ করবেন—অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গই হয়ে যেত,

কিন্তু কৃষ্ণের বুদ্ধিতে শেষ রক্ষা পেল, যদিও সেটাও তো একভাবে কৌশলই। দুর্যোধন আবারও বৃদ্ধ আচার্যের মনে উত্তেজনা তৈরি করলেন কটু কথা বলে। মারা পড়লেন পাণ্ডবপক্ষের বড় সুহৃদ দ্রুপদ এবং বিরাট। আরো মারা পড়লেন ঘটোৎকচ; এমনই এক উপকার করার জন্য তাঁকে উত্তেজিত করা হল কর্ণকে, যাতে যে মারণ-বাণ অর্জুন বধের জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন কর্ণ, সেই বাণ তাঁকে প্রয়োগ করতে হল ঘটোৎকচের ওপর। অর্জুনকে বাঁচানোর জন্য এটাও ছিল কৃষ্ণেরই কৌশল, বৃহত্তর প্রয়োজনে একান্ত আত্মীয়ের জীবন বলিদান।

এই যে বৃহত্তর প্রয়োজন, যেখানে এক ধরনের ধর্মহীনতা, অধর্ম অন্যতর এক ধর্ম তৈরি করছে, বিরাট যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনে এই অধর্মও হয়তো প্রয়োজনীয় ধর্ম, দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর হয়ে ওঠায় সেখানে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ এবং লোকদৃষ্ট ধর্মত্যাগের কথা এসেছে। নিজ পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির অবস্থা দেখে পাণ্ডবরা আস্তে আস্তে বিপন্ন বোধ করছিলেন। এই বিপন্নতার বোধও পরপক্ষীয় অন্যায় থেকেই তৈরি হয়েছিল। ও-পক্ষে জয়দ্রথ আর এ-পক্ষে ঘটোৎকচ মারা যাবার পরেই দুর্যোধন এসে দ্রোণাচার্যকে চরম অপমানকর সব কথা বলেছেন। এমনও বলেছেন যে, পাণ্ডবদের ওপর স্নেহবশত আপনি আপনার দিব্যাস্ত্র বা মারণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করছেন না। দ্রোণ বলেছিলেন—মারণাস্ত্রে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের ওপর মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়। তবু তোমার ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে আমাকে সেই কাজ করতে হবে। ঠিক আছে করব।

ঘটনাচক্র এমনই যে, রাতের অন্ধকার থাকতেও মশাল জ্বালিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করার আদেশ দিলেন দ্রোণ, সকালবেলায় সূর্যোদয়ের পরেই দ্রুপদ-বিরাট মারা গেলেন। পাণ্ডব-ঘরের কনিষ্ঠতম দুই বীর—অভিমন্যু এবং ঘটোৎকচ, তথা বৃদ্ধতম দ্রুপদ এবং বিরাট মারা পড়লেন, অজস্র সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে, পাণ্ডবরা এবার ত্রস্ত, চিন্তিত হচ্ছেন, যুদ্ধও চলছে পনেরো দিন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সকলের সামনে অর্জুনকে বললেন— প্রচুর প্রচুর যুদ্ধ করেও তুমি এই মানুষটাকে কোনওদিন জয় করতে পারবে না— নৈষ যুদ্ধেন সংগ্রামে শক্যঃ কথঞ্চন। কোনওভাবে যদি দ্রোণকে একবার অস্ত্র ত্যাগ করানো যায়, তবেই তাঁকে বধ করা যাবে। কৃষ্ণের এ-কথা কিছু নতুন নয়। যুধিষ্ঠির যুদ্ধারম্ভের কালে যখন ভীষ্ম-দ্রোণের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন এ-কথা। বলেছিলেন— আমাকে অস্ত্রত্যাগ না করিয়ে আমাকে মারতে পারবে না এবং বিশ্বাসযোগ্য তেমন লোকের মুখ থেকে কোনও অপ্রিয়বার্তা শ্রবণ না করলে আমি অস্ত্রত্যাগ করবও না।

কৃষ্ণ শুধু এই কথাটা অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তোমরা ধর্মত্যাগ করে এবার জয়ের জন্য চেষ্টা কর, এখানে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে বসে থাকলে চলবে না—আস্থীয়তাং জয়ে যোগঃ ধর্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ। মনে রাখা দরকার, কৃষ্ণের মতো সখা তথা মান্য লোকের মুখ দিয়ে এ-কথা বেরলেও অর্জুন এটা মনে মনে

মানতে পারেননি। তারপর কৃষ্ণের কথায় 'অশ্বত্থামা' নামে একটা হাতি মেরে চেঁচিয়ে দ্রোণকে শোনালেন—'অশ্বত্থামা' মারা গেছে। তবু দ্রোণ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করেননি। তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদীর মুখে এই সংবাদ যাচাই করতে চাইলেন এবং সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ দ্বিধাগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— জীবন বাঁচানোর জন্য যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে তবে সেই মিথ্যে তাকে পাপস্পৃষ্ট করে না— অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতে'নৃতৈঃ। দ্রোণ যদি আর আধবেলা এইরকম যুদ্ধ করেন, তবে তোমার সৈন্য -সেনার কোনও অবশেষ থাকবে না। হ্যাঁ, এ-কথা আমরা জানি, যুধিষ্ঠির কোনওরকমে, অব্যক্ত এবং অনুচ্চতায় সত্যের অংশটুকু বলেছিলেন এবং দ্রোণের শ্রবণযোগ্য স্বরেই মিথ্যার অংশে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়েছিলেন দ্রোণকে। শুনেই দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন এবং যোগ অবলম্বন করেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এরপর ধৃষ্টদ্যম্ন তাঁর রথে উঠে তাঁর চুল ধরে গলা কেটে ফেলেন এবং মহাভারতের কবি বলেছেন—তখন দ্রোণের দেহে প্রাণই ছিল না— গতসত্ত্বস্য দেহিনঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নকে এর জন্য যথেষ্ট তিরস্কার শুনতে হয়েছে অর্জুনের কাছে এবং অর্জুন এই মৃত্যু কোনওভাবে মেনে নিতে পারেননি।

কৌরবপক্ষের পরবর্তী সেনাপতি কর্ণের মৃত্যুর মধ্যেও সেই অন্যায় নিহিত আছে। কর্ণের রথের চাকা বসে গিয়েছিল মাটিতে, ভূমি তাঁর রথচক্র গ্রাস করেছিল, এই অবস্থায় অর্জুন কর্ণকে মারেন। এরকম বিপন্ন অবস্থায় শত্রুকে প্রহার করতে নেই— এই যুদ্ধ- নৈতিকতার কথা কর্ণ নিজেই শুনিয়েছেন অর্জুনকে। কিন্তু ততোধিক নৈতিকতার কথা উচ্চারণ করে কৃষ্ণ তখন বার বার পাশাখেলার অবতারণা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং অবশেষে অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠানোর কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। এ যেন দুই পক্ষের অসহায়তার শোধবোধ। তবু কর্ণকে মারা হল এবং অন্যায়ের কলঙ্করেখা স্পর্শ করেই রইল পাণ্ডবদের এবং সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণকে। একই কথা বলতে হবে দুর্যোধনের সম্বন্ধেও। তাঁর উরুভঙ্গের ব্যাপারটা অবশ্যই ভীমের প্রতিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তবু তাঁর উরুভঙ্গ নিয়ে ভীমসেনের কঠোর সমালোচনা হয়েছে এবং এই মৃত্যুর দায়ও এসে পড়েছে কৃষ্ণের ওপর।

ঠিক এইখানেই প্রশ্ন উঠেছে। খুব নিরপেক্ষ বিচার করে পণ্ডিতজনেরা অনেকেই প্রশ্ন তুলে বলেছেন—তাহলে ধর্মযুদ্ধ কী হল? এই তো এতগুলো বয়স্ক লোককে মারা হল, অন্যায়ভাবে মারা হল কর্ণ-দুর্যোধনকে এবং স্বয়ং কৃষ্ণের মতো ভগবৎপ্রতিম মানুষ সেইসব অন্যায়ের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রইলেন, তাহলে ধর্মটাই বা কী হল, এবং ধর্মযুদ্ধের মধ্যেই বা কোন ধর্ম থাকল? সত্যি বলতে কী, এখানে বারবার ভীষ্ম পিতামহের মতো বলতে হয় ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম, সব জায়গায় সাধারণ যুক্তিতে ধর্ম বোঝা যায় না। অনেক পণ্ডিত মানুষকেও আমি দেখেছি—তাঁরা যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের তথাকথিত অন্যায় প্রহারগুলি স্মরণ করিয়ে দেন এবং অন্যায়-বুদ্ধির জন্য কৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করেন, তখন তাঁরা নিঃসন্দেহে

অনেকটাই যুদ্ধকালে পাতিত মহাবীর যোদ্ধাদের বিপ্রতীপ পরিণতি দেখে করুণরসে আপ্লুত হন বলে মনে হয়। এই সময়ে তাঁদের মনে থকে না যে, সেই শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাঁচ ছেলের হাত ধরে হস্তিনায় উপস্থিত কুন্তীর প্রতি কী অবিচার করা হয়েছিল। অথবা দিনের পর দিন পাণ্ডবদের সঙ্গে, তাঁদের একতমা প্রিয় পত্নীর সঙ্গে দুর্যোধন-কর্ণরা কী ব্যবহার করেছিলেন। ভীষ্ম-দ্রোণরা কিন্তু সমস্ত জটিল মুহূর্তগুলিতেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সব সময় একেবারে উচিত কথাটি তাঁদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেনি। এমনকী উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের শান্তিদৌত্যের সময় ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বিবেকশীল মানুষরা দুর্যোধনকে যতই বুঝিয়ে থাকুন, তাঁদের যে সেই সময় আরও কঠিন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল, তা দৌত্যকার্য সম্পন্ন করে ফিরে-আসা কৃষ্ণের ক্ষোভ থেকে প্রকট হয়ে ওঠে।

আমরা দেখেছি সেই ধৃতরাষ্ট্র যখন সঞ্জয়কে দূত হিসাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠালেন, সেই তখন থেকে যুধিষ্ঠির বলে গেছেন— এ ব্যাপারে ভীষ্ম কী বলছেন, কী বলছেন গুরু দ্রোণ অথবা গুরুপুত্র অশ্বত্থামা? কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাশিত ভাবনা সেই ভাবে পূরণ হয়নি, যতটা পাণ্ডবভাইদের কাছে কাম্য ছিল। স্বয়ং কৃষ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন— না ভাই! ভীষ্মও নন, দ্রোণও নন, তাঁরা কেউই সময়োপযোগী কথাটা বলেননি এবং তা না বলে তাঁরা বস্তুত দুর্যোধনের অনুগামী হয়েছেন— ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্বচঃ। সর্বে তম্ অনুবর্তন্তে..। আসলে যুদ্ধোদ্যোগপর্বে দুর্যোধনকে বোঝানোর সময় অন্তত ভয় দেখিয়েও যদি ভীষ্ম-দ্রোণ, কৃপ-অশ্বত্থামারা দুর্যোধনকে বলতেন-- আমরা এমন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ করব না, তাহলেই অনেক কাজ হত। কিন্তু তাঁরা এই ভয় দেখাননি। ফলে কৃষ্ণও বলেছেন— আমরা আমাদের ন্যায়প্রাপ্য সব ছেড়ে দিয়ে শুধু কৌরবদের সঙ্গে শান্তিকামনা করব এমনটা হতে পারে না, অতএব যুদ্ধই করতে হবে — ন চাপি বয়মত্যর্থং পরিত্যাগেন কর্হিচিৎ। কৌরবৈঃ শমম্ ইচ্ছামঃ.....।

আর যুদ্ধ যখন লাগলই তখন সেই যুদ্ধজয়ের জন্য যদি অন্যায় ছলনার প্রয়োজন হয় কৃষ্ণ তাতে পিছপা হন না। যুদ্ধের ব্যাপারে কৃষ্ণ তেমন কোনও মহাকাব্যিক রোমাঞ্চ অনুভব করেননি কোনওদিন, যাতে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন তিনি। সর্বক্ষেত্রেই যখন বৃহত্তর এবং মহত্তর ধর্ম সাধিত হবে, সেখানে সাধারণ ন্যায়-ধর্ম পরিত্যাগ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। শেষ যুদ্ধের সময় দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের যুদ্ধকালীন অন্যায়গুলি পরপর আবৃত্তি করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ একটা সাংঘাতিক যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন— আমাদের যে-সব অন্যায়ের কথা তুমি বলছ, তার সবটাই তোমার সমস্ত অন্যায় কাজগুলোর প্রতিশোধ হিসেবে করা হয়েছে—বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম।

তার মানে, বৃহত্তর সর্বতোভদ্র ধর্মের মর্ম অন্য জায়গায়, সেই ধর্মের সাধন-পদ্ধতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করা যায়। বারবার এই সংশয় উত্থাপিত

হয়েছে যুধিষ্ঠিরের মুখে, অর্জুনের মুখেও। তাঁরা চিন্তিত হয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁরা অন্যায় করছেন। প্রথম দিকটায় কৃষ্ণ অত বোঝানোর চেষ্টা করতেন না, অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বময় পুরুষ হিসেবে শুধু দায়টা গ্রহণ করে নিতেন। যুদ্ধকালীন সময়েও একবারই তিনি বলেছিলেন— এই যে জরাসন্ধ, শিশুপাল, একলব্য নিষাদ এবং আরও অনেকে— তাদের আমি বুদ্ধি বলে মেরেছি এবং মেরেছি তোমাদের জন্য, তাও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আগে। যদি তারা এখনও থাকতেন, তাহলে এখন তাঁরা ভয়ংকর হয়ে উঠতেন—ইদানীং স্যু র্ভয়ঙ্করাঃ। লক্ষণীয়, জরাসন্ধ, কালযবন ইত্যাদি শত্রু-নিধনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের শঠতা ছিল, এবং এই শঠতা তিনি অপছন্দ করেন না। শারীরিক এবং রাজনৈতিকভাবে যে শত্রু অন্যায়ভাবে বেড়ে উঠেছে, সেই প্রবলতর শত্রুর সামনে তিনি শারীরিক ক্ষমতা দেখিয়ে রোমান্টিক হয়ে পড়তেন না। তিনি নিজেই কতবার বলেছেন— জরাসন্ধের ভয়ে আমি কতবার পালিয়ে গিয়েছি। কৃষ্ণের রাজনীতি-বোধে সেকালের রোমান্টিক সম্মুখ-সমরের চেয়ে 'ডিপ্লোমেসি'-র মূল্য অনেক বেশি এবং 'ডিপ্লোমেসির মূল্য অনেক বেশি, এবং 'ডিপ্লোমেসি'-তে কাজ না হলে শারীরিক এবং অধিক অস্ত্রনিপুন শত্রুর বিরুদ্ধে ঈষৎ-শঠতায় অন্যায় যুদ্ধ করারও তিনি পক্ষপাতী, বস্তুত সেটাও হয়তো 'ডিপ্লোমেসি'-রই শেষ জায়গা।

আপনাদের মনে পড়বে, ভীমের গদাঘাতে উরুভঙ্গ অবস্থায় দুর্যোধন যখন বারবার আত্মখ্যাপন করে পাণ্ডবদের বলছেন— ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমার সঙ্গে যদি তোমরা সরল-সোজা যুদ্ধ করতে, তাহলে কোনওদিন তোমাদের জয় হত না— ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্। এই কথার উত্তরে কৃষ্ণ দুর্যোধনের সারাজীবনের অন্যায়গুলি শুনিয়ে প্রতিশোধের কথা শুনিয়েছিলেন। দুর্যোধন অবশ্য যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করার গৌরব শুনিয়ে থামিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে এবং তার পরেই তাঁর বীরোচিত মৃত্যুর জন্য পুষ্পবৃষ্টি হল তাঁর মাথার ওপর। অপ্সরা গান্ধর্বরা তাঁর জয়গান করতে লাগল। এতে পাণ্ডবদের বিড়ম্বনা আরও বাড়ল। তাঁর ভাবতে আরম্ভ করলেন—দুর্যোধনের কথাগুলোই বোধহয় ঠিক, তাঁরাই বোধহয় অন্যায় যুদ্ধের শরিক। কৃষ্ণ সব বুঝলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই উঁচুমানের যে, তিনি এটাও বুঝলেন— এমনটা রাজনীতিতেই হয়, একজন নেতা, রাজা যথেষ্ট অন্যায়কারী হলেও তাঁরও যদি উৎপথে মৃত্যু হয় তবে তাঁর জন্য মৃত্যুকালীন সমবেদনার ঝড় বয়ে যাবে। এবং সেই মুহূর্তে দণ্ডদাতা শাস্তা ব্যক্তি যেন অসমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠেন, অন্তত সাময়িকভাবে। কিন্তু কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এমনই যে, তিনি এই অবস্থাতেও বলে উঠলেন—তোমাদের এত দ্বৈরথে ভোগার কারণ নেই কোনও। কৌরবপক্ষে যে-সব যোদ্ধা ছিলেন, তার সকলেই অতি শীঘ্র অস্ত্রমোচনে সমর্থ ছিলেন, এতটাই তাঁরা বীর, যে সরল ঋজুযুদ্ধে তাঁদের পরাস্ত করা অসম্ভব ছিল। যুদ্ধনীতির সব নিয়ম মেনে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের মতো বিরাট যোদ্ধাদের সহজে হত্যা করা যেত না—নৈষ শক্যঃ কদচিত্তু হন্তুং ধর্মণঃ পার্থিবঃ। তাঁদের পারাস্ত করার জন্য ছলনা-কপটতার প্রয়োজন

ছিলই, আমি সেটাকে 'উপায়' বলি এবং আমি বারবার সেই উপায় প্রয়োগ করে তাঁদের হত্যা করিয়েছি তোমাদের হিতের জন্য— ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ।

কৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে শঠে শাঠ্য-আচরণে সমর্থক এখানে। তিনি বলে দিয়েছেন—এর জন্য কোনও অনুতাপ দহন হৃদয়ে পোষণ করো না তোমরা। শত্রু যদি সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় অধিক হয়, তবে এইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই মারতে হবে তাদের। আর এই পথ আমরাই প্রথম অনুসরণ করছি অথবা ভদ্রলোকের পথ নয় এটা, তা ভাবারও কোনও কারণ নেই। আমাদের পূর্ব-পূর্ব মহান রাজারা আগেও এই ছলনার আচরণ করেছেন এবং স্বয়ং দেবতারা অসুরবধের জন্য এই পথ অনুসরণ করেছেন। সৎ এবং ভব্য মানুষেরা এই অন্যায়-মার্গ অনুমোদন করেছেন এবং সকলেই এই পথ মেনে নিয়েছেন—সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে।

কৃষ্ণ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোকদৃষ্ট অন্যায়গুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ-সাধনের জন্য ন্যায়সম্মিত হয়ে ওঠে, তেমনই দেবাসুর -সম্পর্কিত কথাটা—পূর্বৈরনুগতো মার্গঃ দেবৈরসুরঘাতিভিঃ— এই কথাটা এখনই ওঠার ফলে অবতার-তাত্ত্বিকতায় দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের মতো তত্ত্বটাও মননযোগ্য হয়ে ওঠে। অবশেষে কৃষ্ণ যে অন্যায়ের দায় নিয়ে বললেন— এইসব ছলনা-মায়া আমি তোমাদের ভালোর জন্য করেছি। —ভবতাং হিতকাম্যয়া—তখন অনুগতজনের চরম এবং পরম তত্ত্বের কাছে শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণের মূল্য তথা মাহাত্ম্যও ভীষণভাবে অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে, যিনি বলেছিলেন— তুমি সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও— আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব—সেই প্রতিজ্ঞা মহাভারতীয় রাজনীতির শেষ কথা।

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি

এক

পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস দুই-ই শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা এখন বিরাট-রাজার রাজধানীতে বসে দফায় দফায় 'মিটিং' করছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, পাঞ্চালদের সঙ্গে এবং যাদবদের সঙ্গে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝে মাঝে উভয়পক্ষের দূত চালাচালি চলছে। কখনও সঞ্জয় পাণ্ডবদের কাছে আসছেন ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে। কখনও বা দ্রুপদ-রাজার পুরোহিত কৌরব-সভায় যাচ্ছে পাণ্ডবদের দূত হয়ে। উভয় পক্ষ থেকেই শান্তির চেষ্টা চলছে। তার মাঝে মাঝে যুদ্ধের উসকানিও চলছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা চলছে সেটা হল—যুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে উভয় পক্ষের বলাবল অথবা শক্তির পরিমাপ করে নেওয়া।

শান্তির সমস্ত চেষ্টাই যখন বিফল হল তখন কৃষ্ণ কৌরব-সভায় চললেন শেষ চেষ্টা করার জন্য। তখনকার দিনে কৃষ্ণ যতখানি যুদ্ধকুশলী বীর বলে পরিচিত ছিলেন, ঠিক ততখানিই তিনি পরিচিত ছিলেন রাজনীতিবিদ বলে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির বিষয়ে যেমন তার সাফল্য আছে, তেমনই তাত্ত্বিকতার দিক থেকে কৃষ্ণের মতো অসাধারণ তাত্ত্বিক সেকালে আর কেউ ছিল না। সেই কৃষ্ণ কৌরব-সভায় কথা বলতে যাবেন, চারদিকে তাই হইহই পড়ে গেল। কার্তিক মাসের এক শুভ দিনে সকালের স্নানাহ্নিক সেরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে কৃষ্ণ সাত্যকিকে রথ বার করতে বললেন। তাঁকে এও বলে দিলেন যে, রথের মধ্যে যেন তাঁর প্রিয় অস্ত্রগুলি থাকে—গদা, চক্র, শেল, শক্তি এবং আরও অন্যান্য প্রহরণ। কৌরব-সভার তথাকথিত নায়ক দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনিকে কৃষ্ণ বিশ্বাস করেন না এবং তিনি সাত্যকিকে বলেছেন—শত্রু যদি দুর্বলও হয়, তবুও তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ব্যক্তিগত অস্ত্রের সমস্ত আয়োজন রথস্থ করে সাত্যকির সঙ্গে কৃষ্ণ রওনা দিলেন হস্তিনাপুরের পথে।

কৃষ্ণের সারথি দারুক রথ চালাচ্ছিলেন তীব্র গতিতে। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর কৃষ্ণ দেখতে পেলেন, অনেক ঋষি-মুনি পায়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরই পথ বেয়ে—অথাপশ্যন্ মহাবাহুঃঋষীণধ্বনি কেশবঃ। ব্রহ্মতেজে ঋষিদের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত। কৃষ্ণের রথ আসছে দেখে ঋষিরা পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে পড়লেন—স্থিতান্ উভয়তঃ পথি। তখনকার দিনের সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত এই

মুনি-ঋষিদের অতিক্রম করে যাবার রীতি ছিল না। এঁদের অতিক্রম করে অবহেলায় চলে যাবার মানে ছিল মান্য ব্যক্তির মর্যাদা অতিক্রম করা। কৃষ্ণ এই মর্যাদা বোঝেন; তাই অবিলম্বে তিনি রথ থেকে নেমে ঋষিদের অভিবাদন জানালেন আনতমস্তকে।

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের সবার কুশল তো? আপনাদের ধর্মাচরণে কোনও বিঘ্ন হচ্ছে না তো? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এঁরা সব আপনাদের অনুশাসন মানেন তো? এ সব প্রশ্ন ছিল একেবারেই মামুলি। মান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলেই সেকালের লোকেরা এসব প্রশ্ন করতেন। কৃষ্ণও করেছেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা সব কোথায় চলেছেন? আপনাদের গমনের শেষ সীমাটাই বা কোথায়? আমিই কি কিছু করতে পারি আপনাদের জন্য? কৃষ্ণ যাঁদের সঙ্গে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সেই ঋষিদের নাম মহাভারতের সব পাঠে নেই। যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা রাজনীতির তত্ত্বে নিষ্ণাত। নারদ, দেবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, কোহল, জামদগ্ন্য, শ্বেতকেতু ইত্যাদি। এই নামগুলো দেখে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, এঁরা কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন; আবার ইতিহাস-পুরাণের সময় বিবেচনা করে এটাও ভাবা ঠিক হবে না যে, নারদ, জামদগ্ন্য, শ্বেতকেতু—এঁরা সব মহাভারতের যুগের বহু পূর্ববর্তী মানুষ। বস্তুত, নারদ, জামদগ্ন্য—এগুলো কোনও ব্যক্তিনাম হিসেবে বিবেচনা না করে এঁদের একেকটা 'স্কুল' বা 'ইনস্টিটিউশন' হিসেবে ভাবা উচিত তাহলে অন্তত 'অ্যানাক্রনিজমে'র যুক্তিতর্ক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

যাই হোক, কৃষ্ণের কথা শুনে ঋষিরা প্রথমে তাঁকে প্রত্যাভিনন্দন করলেন এবং ঋষিদের মুখপাত্র হিসেবে জামদগ্ন্য বললেন—আমাদের মধ্যে এমন ঋষিরা আছেন, যাঁরা প্রাচীন দেবাসুর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের মধ্যে আছেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা, আছেন তপস্বী রাজর্ষিরা—দেবাসুরস্য দ্রষ্টারঃ পুরাণস্য মহামতে।

মনে রাখতে হবে, দেবাসুর যুদ্ধের দ্রষ্টা ঋষিদের আক্ষরিক অর্থে দ্রষ্টা না ভাবাই ভাল। আসলে দেবাসুর যুদ্ধের মধ্যেও একটা বিরাট রাজনীতি ছিল, যে রাজনীতিতে অসুরদের বঞ্চনা করে দেবতাদের জয়ী হতে হয়েছিল। উক্ত ঋষিরা এই রাজনীতির তাত্ত্বিক দিকটা অবগত আছেন। জামদগ্ন্য জানালেন—আমরা সকলে হস্তিনাপুরের রাজসভার আলোচনা-চক্রে যোগ দিতে যাচ্ছি। সেই মহতী সভায় অন্যান্য জায়গা থেকে যেসব ক্ষত্রিয় আসবেন, সভায় উপস্থিত যে সব সভাসদ থাকবেন এবং আপনিও যেখানে কথা বলবেন, আমরা সেই সভায় যাচ্ছি। জামদগ্ন্য আরও জানালেন, সেই রাজসভায় রাজাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি যে সব ধর্মার্থের কথা বলবেন, সেই সব মূল্যবান কথা শুনতেই আমাদের যাওয়া। আপনার কথা শুনে সভায় উপস্থিত কৌরবেরা কী ধরনের প্রতিপ্রশ্ন করেন, তাও আমরা শুনতে চাই—কুরুণাং প্রতিবাচশ্চ শ্রোতুমিচ্ছাম মাধব।

জামদগ্ন্য এবার তাঁর বিশেষ কৌতূহলের কথা জানিয়ে বললেন, সেই সভায়

আপনি মিলিত হবেন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের সঙ্গে। কাজেই সেখানে আপনি যা বলবেন এবং আপনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ইত্যাদি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও বা কী বলেন—সেটা শোনাও আমাদের মহান কৌতূহলের ব্যাপার—তব বাক্যানি দিব্যানি তথা তেষাঞ্চ মাধব। অতএব আপনি নির্বিঘ্নে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করুন, ইতিমধ্যে আমরাও চলে আসছি। আবার দেখা হবে—পুনর্দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্।

কৃষ্ণ এবং ঋষিদের কথোপকথনটি যদি খানিকটা আধুনিকভাবে বোঝা যায়, তাতে এমন ধারণা করা চলে যে, হস্তিনাপুরের রাজসভাটি একটি 'সেমিনারে' পরিণত হয়েছিল। পরের দিন কৃষ্ণ রাজসভায় বললেন, আগের দিন তিনি বিদুরের বাড়িতে বসে নিজের ভাবনা-চিন্তা আরও একবার ঝালিয়ে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যও করেছেন বিদুর। পরের দিন কৃষ্ণ রাজসভায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ—সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সেদিনকার বক্তা হিসেবে কৃষ্ণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি নির্দিষ্ট ছিল—আসনং সর্বতো ভদ্রং জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্। কৃষ্ণার্থে কল্পিতং তত্র ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ। ভীষ্ম-দ্রোণ সবাইকে যথোপযুক্তভাবে সম্ভাষণ করে বসার আগেই পথে ফেলে আসা সেই মুনি-ঋষিদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখতে পেলেন কৃষ্ণ। সেই নারদ, জামদগ্ন্য, কোহল, শ্বেতকেতু ইত্যাদি ঋষিরা। ঋষিদের দেখে কৃষ্ণ বয়োবৃদ্ধ ভীষ্মকে জানালেন—আজকের এই সভার কাজ দেখবার জন্য মাননীয় ঋষিরা এসেছেন—পার্থিবীং সমিতিং দ্রষ্টুমৃষয়ো'ভ্যাগতা নৃপ। আপনি এঁদের যত্ন করে বসান।

কৃষ্ণের কথা শুনে মহামতি ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত থেকে ঋষিদের ডেকে এনে উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা করলেন—আসনান্যথ মৃষ্টানি মহান্তি বিপুলানি চ। ঋষিরা উপবেশন করলে কৃষ্ণের কথামত 'পার্থিবী সমিতি' আরম্ভ হল। রাজনীতির আলোচনার জন্য রাজা-রাজড়ারা যে সভায় মিলিত হয়েছেন—সেই 'পার্থিবী সমিতি'কেই আমরা 'সেমিনার' বলেছি। আমরা যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের 'সেমিনারে'র কথা উল্লেখ করছি, তার কারণ এই আলোচনাচক্র থেকেই সেকালের অনেক রাজনীতির তত্ত্ব এবং তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আপনারা শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের কথাই না হয় স্মরণ করুন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। পাণ্ডবপক্ষের একান্ত জয় সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনের মর্মান্তিক বিয়োগযাতনায় মহামতি যুধিষ্ঠির অস্থির হয়ে আছেন। তিনি রাজা হতে চাইছেন না। এর পর সমস্ত পাণ্ডব-ভাইয়ের অকুণ্ঠ চেষ্টায় কৃষ্ণ এবং অন্যান্য মুনি-ঋষিদের ব্যগ্রতায় যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু আর কেউ না বুঝুন, কৃষ্ণ বোঝেন যে মহামতি যুধিষ্ঠিরের রাজনীতি এবং রাজধর্ম শিক্ষার কিছু প্রয়োজন আছে। তিনি একদিন সনির্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন যাতে ভীষ্মের মৃত্যুর আগেই তাঁর কাছ থেকে রাজধর্মের নীতি-কৌশল কিছু শিক্ষা করা যায়। তিনি বললেন, দেখ যুধিষ্ঠির। ভীষ্ম দেহত্যাগ করলে এই পৃথিবী হয়ে যাবে চন্দ্রহীনা রাত্রির

মতো—নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী, তিনি চলে গেলে সমস্ত জ্ঞানরাশি পৃথিবী থেকে অস্তমিত হয়ে যাবে। তাই বলছি, সময় থাকতে মহামতি ভীষ্মের কাছ থেকে সব জেনে নাও। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিদ্যা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের করণীয় যাগ-যজ্ঞাদি এবং নিখিল রাজধর্ম—এই সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে শিখে নাও—রাজধর্মাংশ্চ নিখিলান্ পৃচ্ছেনং পৃথিবীপতে।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথা মান্য করে ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমরা কিন্তু এখানেও ব্যাস, নারদ, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবল, মৈত্রেয় অশ্মক ইত্যাদি বহুল বহু মুনি-ঋষিকে দেখতে পাচ্ছি—শ্রদ্ধাদম-শমোপেতৈর্বৃতশ্চন্দ্রমিব গ্রহৈঃ। অর্থাৎ এখানেও কিন্তু এক মহতী বিদ্বৎসভার আয়োজন হয়েছে যেখানে সেকালের রাজরাজড়ারা এবং মুনি-ঋষিরা উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে রাজধর্মের উপদেশ শুনতে চেয়েছেন। ভীষ্মও পাণ্ডব-কুলের সুযোগ্য পুরুষের কাছে নিজের চির-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার উমুক্ত করেছেন। ভীষ্ম প্রথমে সমগ্র রাজনীতি এবং রাজধর্মের একটি পরম সংক্ষিপ্ত রূপ যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থাপিত করেছেন এবং তারপরেই তাঁর বক্তব্যের মূল ভূত উপাদানগুলি উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ ভীষ্মই প্রথম নন, তাঁর পূর্বেও আরও অনেক রাজনীতি শাস্ত্রের প্রবক্তা আছেন, যাঁরা রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। ভীষ্ম তাঁর পূর্ববর্তী আচর্যদের যে নামগুলি করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন—বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, বিশালাক্ষ, ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভরদ্বাজ, গৌরশিরা ইত্যাদি। পরবর্তী কালে অর্থশাস্ত্রের লেখক কৌটিল্যও এঁদের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন সম্প্রদায়-প্রবর্তক শাস্ত্রকার হিসেবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বেশির ভাগ গ্রন্থই আরম্ভ করা হয় দেব-দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে। কিন্তু কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থারম্ভে কোনও দেব-দেবীর আশীর্বাদ চাননি। তাঁর প্রণম্য ব্যক্তি হলেন দুজন—শুক্র এবং বৃহস্পতি—নমঃ শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্। তাও আবার শুক্রাচার্যের নাম আগে। বৃহস্পতির নাম পরে।

প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে, বৃহস্পতি দেবতাদের শিক্ষাগুরু হিসেবে পরিচিত এবং শুক্রাচার্য হলেন অসুরদের গুরু। মহাভারত-পুরাণে যে অসংখ্য দেবাসুর যুদ্ধের বিবরণ আছে, সেখানে কতবার যে এই বৃহস্পতি ও শুক্র রাজনীতির প্যাঁচ কষেছেন তার হিসেব নেই। বৃহস্পতির বুদ্ধি প্রতিহত করার জন্য শুক্রাচার্যকে নতুন ভাবনা ভাবতে হত, নতুন 'স্ট্র্যাটেজি' গ্রহণ করতে হত। ফলত শুক্রাচার্যের রাজনীতির ভাবনা ছিল আরও বেশি কুটিল এবং নিপুণ। হয়তো সেই কারণেই শুক্রাচার্যকে আগে নমস্কার করে পরে বৃহস্পতিকে নমস্কার করেছেন কৌটিল্য—নমঃ শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্।

কৌটিল্যের পূর্ববর্তী রাজনীতিশাস্ত্র প্রবর্তকদের মধ্যে শুক্র-বৃহস্পতি তো আছেনই,

কিন্তু আরও যাঁদের মত নিয়ে আলোচনা করেছেন কৌটিল্য, তাঁদের মধ্যে মহাভারতোক্ত শাস্ত্রকারদেরই নাম পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই বিশালাক্ষ (শিব, ছ'বার), বাহুদন্তিপুত্র (ইন্দ্র, একবার), ভরদ্বাজ (দ্রোণাচার্য, সাতবার), পিশুন (নারদ, ছ'বার), বাতব্যাধি (উদ্ধব, যাঁকে ভাগবতে বলা হয়েছে—বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী, পাঁচবার), পরাশর (ব্যাসপিতা, একবার) পরাশর (ব্যাস, একবার) এবং আছেন ভীষ্ম (যাঁর পারিভাষিক নাম কৌণপদন্ত, চারবার)।

মহাভারতীয় ভীষ্মের কথা কৌটিল্যের আচার্য তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে এবং তার সবচেয়ে বড় কারণ—মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যে উপদেশগুলি দিয়েছেন, তার বেশির ভাগই আছে সংলাপের পদ্ধতিতে অর্থাৎ ডায়ালগ্ ফর্মে। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন আর সেই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ভীষ্ম একটি পুরাতন রাজনীতি-সংলাপ উদ্ধার করছেন। বলছেন—এই কথাটা যদি বল, তবে তোমাকে অমুক ঋষির সঙ্গে তমুক রাজার যে কথা হয়েছিল, সেটাই বলতে হয়। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন এবং ভীষ্মের উত্তর চলেছে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে। অর্থাৎ সেই সেমিনার, ট্রানজানক্শনস্ এবং প্রসিডিংস্। পূর্বতন সংলাপোক্তির সঙ্গে ভীষ্মের নিজস্ব রাজনীতিবোধ একাকার হয়ে যাওয়ায় তাঁর এই বক্তব্যগুলি অন্য এক মাত্রা লাভ করেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৌণপদন্তের প্রসঙ্গ মহাভারতীয় শান্তিপর্বের রাজধর্মের মূল্য বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রক্ষিপ্তবাদের পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে যে সমস্ত পণ্ডিত শান্তিপর্বের রাজধর্মের অংশটুকুকে খ্রিস্টজন্মের পরবর্তী কালের লিখন বলে মনে করেছেন, বিশেষত শান্তিপর্বে শক, পহ্লব, পারদদের উল্লেখ দেখে যাঁরা এটিকে খ্রিস্ট-পরবর্তী কালে নিক্ষেপ করেন, তাঁরা শান্তিপর্বের অন্য একটি প্রহেলিকাও মনে রাখুন। রাজনীতিশাস্ত্রের পূর্বাচার্যদের নাম উল্লেখ করবার সময় ভীষ্ম এই শাস্ত্রের পরম্পরা কীভাবে নেমে এল, তা বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—পুরাকালে যখন সত্যযুগের পালা চলছে, তখন রাজ্য বা রাষ্ট্র বলে কোনও কিছু ছিল না, রাজা বলেও কিছু ছিল না। কোথাও কোনও অন্যায়ই ছিল না, অতএব দণ্ড, দাণ্ডিক দণ্ডদাতারও কোনও প্রয়োজন হয়নি। সকলেই ন্যায়-নীতি মেনে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত।

তবে এই অবস্থা বেশি দিন চলেনি। লোভ, মোহ, মাৎসর্যের ফলে লোকেরা স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠল। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই অবস্থায় দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এসে মনুষ্যলোকের সুস্থিতির জন্য অনুরোধ জানালেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই ভগবান ব্রহ্মা নাকি এক লক্ষ অধ্যায় জুড়ে একখানি দণ্ডনীতির গ্রন্থ রচনা করলেন।

দেবতাদের মধ্যে এই গ্রন্থ ধারণ করার মতো কেউ ছিলেন না। মহাদেব শঙ্কর এই গ্রন্থ আত্মস্থ করে নিজের বুদ্ধিমতো সেটার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চালু করালেন। কারণ কালের গতিতে মানুষের আয়ুষ্কাল কমে আসছে, অতএব ব্রহ্মার তৈরি শত

সহস্রাধ্যায়ী পড়বার মতো আয়ুই নেই কারও। দশ হাজার অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মার লেখা এই দণ্ডনীতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চালু হল বিশালাক্ষ শিবের নামে। তার নাম বৈশালাক্ষ তন্ত্র। এইবার দেবরাজ ইন্দ্র এই গ্রন্থ বুঝলেন এবং জনগণের সুবিধের জন্য তিনিও গ্রন্থখানিকে আরও সংক্ষিপ্ত করলেন পাঁচ হাজার অধ্যায়ে। তার নাম বাহুদণ্ডক তন্ত্র—সহস্রৈঃ পঞ্চভিস্তাত যদুক্তং বাহুদন্তকম্। ।

দেবগুরু বৃহস্পতি বাহুদন্তক তন্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করলেন তিন হাজার অধ্যায়ে এবং সেটাকে পুনরায় সংক্ষিপ্ত করলেন অসুরগুরু শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্যের অন্য নাম উশনা বলে তাঁর লেখা গ্রন্থটি হল ঔশনস তন্ত্র বা কাব্যতন্ত্র। কোনও সন্দেহ নেই যে, অসুরগুরু শুক্রাচার্যই এঁদের সবার মধ্যে সবচেয়ে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং সেইজন্যই তাঁর লেখা গ্রন্থখানিই মনুষ্যলোকের সবচেয়ে প্রতিভাধর মানুষটির হাতে তুলে দেবার কথা হল এবং কে না জানে তিনিই হলেন মনুষ্যলোকের প্রথম রাজা।

রাজ্য বা রাজার কথায় পড়ে আসছি। আপাতত যেটা বুঝতে হবে, সেটা হল—ব্রহ্মা শত-সহস্র অধ্যায়ে যে দণ্ডনীতির শাস্ত্র লিখেছেন, ভগবান শঙ্কর সেটাকে দশ হাজার এবং ইন্দ্র সেটাকে পাঁচ হাজর অধ্যায়ে লিখেছেন কি না—এটা নিছকই তর্কের কথা। দণ্ডনীতিশাস্ত্র অন্তরীক্ষ লোকের দেবতারা প্রথম লিখেছিলেন কি না এবং তার অধ্যায়-সংখ্যা অত বিপুল ছিল কি না, সেটা পৌরাণিকের অতিবাদ বলে মনে করা যেতেই পারে। কিন্তু এটা অবশ্যই ঠিক যে, বৈশালক্ষ তন্ত্র অথবা বাহুদন্তক তন্ত্র কৌটিল্যের পূর্বে লেখা হয়েছে এবং তিনি মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকেই হয়তো এই পারিভাষিক নামগুলি পেয়েছেন। কারণ ওই শান্তিপর্ব ছাড়া আর কোনও প্রাচীনতর গ্রন্থে একবারও পরিস্কার করে বলা হয়নি যে, শিব এবং বিশালাক্ষ অভিন্ন ব্যক্তি অথবা ইন্দ্র এবং বাহুদন্তক (কোথাও 'বাহুদন্তিপুত্র') একই ব্যক্তি।

কৌটিল্য মহাভারত থেকেই এই অদ্ভুত নামগুলি সংগ্রহ করেছেন। এমনকি যাঁদের পারিভাষিক নাম মহাভারতে নেই, যেমন পিশুন (নারদ), কৌণপদন্ত (ভীষ্ম) অথবা বাতব্যাধি (উদ্ধব)—এই সব নাম যে তিনি কোথায় পেলেন, তা আমাদের ভাল জানা নেই। ধারণা হয়—মহাভারত থেকে আরম্ভ করে তাঁর নিজের সময় পর্যন্ত রাজনীতির বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, হয়তো সেই সব পূর্বাচার্যদের মুখে তিনি এই নামান্তরগুলির প্রসিদ্ধি শুনে থাকবেন।

শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ বসাক লিখেছেন : "নীতিশাস্ত্র প্রবক্তা এই আচার্যদের নামের সহিত দৈহিক ও মানসিক বিকলতা ও ব্যাধির বা দোষের আভাস লক্ষিত হয়, এবং তাঁহারা কেন যে সমসাময়িক জনসমাজে এইরূপ নামে আখ্যাত বা পরিচিত হইতেন তাহা সম্যগ্‌ভাবে বুঝিতে পারা যায় না।"

আমাদের ধারণা—বিখ্যাত ব্যক্তির নিন্দনীয় নামগুলি গ্রহণ করার পিছনে কৌটিল্যের একটা যুক্তি আছে। কৌটিল্যের নিজের নামও তো খুব সুবিধের নয়। বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য নামের প্রসিদ্ধি থাকলেও অর্থশাস্ত্রের প্রকরণে নিজেকে তিনি কুটিলমতি কৌটিল্য

বলেছেন। শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা, নারদ-ভীষ্মের মতো মহাজনদের বিকৃত বা চলতি নাম গ্রহণ করার পিছনে কৌটিল্যের দুটি যুক্তি কাজ করে থাকতে পারে।

এক, পণ্ডিতজনেরা স্বীকার করেছেন যে, কৌটিল্যই বোধহয় প্রথম সেই শাস্ত্রপ্রণেতা যিনি ধর্ম বা ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মকে রাজধর্মের আওতার বাইরে রেখেছেন। হয়তো এই কারণেই দেবতাদের চিরপরিচিত নাম শিব কিংবা ইন্দ্রের পরিবর্তে তাঁদের লোক-প্রচলিত নাম ব্যবহার করেছেন। নামের মধ্যে দেবত্বের পরিহার সম্ভব হয়েছে বলেই এঁদের মত খণ্ডন করতেও তাঁর বাধেনি। একই কথা নারদ, ভীষ্ম বা উদ্ধবের সম্বন্ধেও খাটে। পুরাণ-ইতিহাসের মহাত্মা পুরুষদের মানিত নাম ব্যবহার না করে কৌটিল্য তাঁদের চলতি নাম বেছে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ হল, রাজনীতির সমস্ত ক্ষেত্রটাই যেহেতু সাধারণ বুদ্ধির বাইরে, তাই তাঁদের পূর্বাচার্যদের নাম করেছেন রাজনীতির জটিলতা বজায় রেখে। রাজনীতি যিনি বোঝাতে চাইছেন, তাঁর দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে বেশি বলেই শিবের নাম বিশালাক্ষ। রাজনীতিতে দণ্ডদাতা রাজার বাহুদুটির সঙ্গে করাল দন্তের কোনও তফাত নেই বুলেই ইন্দ্রের শাস্ত্রটি বাহুদন্তকতন্ত্র। অথবা বাহুদন্তিপুত্র মানে যাঁর বাহুতে হাতির বল, তাঁর ছেলে। একই ভাবে কৌণপদন্ত সাপের দাঁত, অথবা পিশুন।

এই রকম আরও যে সব পূর্বাচার্যের চলতি নাম কৌটিল্য গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন দীর্ঘচারায়ণ, ঘোটমুখ, কণিক ইত্যাদি।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো। মহাভারতে রাজনীতির শাস্ত্রপ্রণেতাদের একটা ক্রম আছে। যেমন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি। কিন্তু যখন পরমত-খণ্ডনের জন্য পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করেছেন তখন কিন্তু নারদের মতের পর শিবের মত এসেছে। অথবা ভরদ্বাজের মতের পর ইন্দ্রের মত। এই ক্রমবিপর্যয় থেকেও মনে হয় কৌটিল্য কখনই এঁদের দেবতার মর্যাদায় আবদ্ধ করেননি এবং ঠিক সেই কারণেই দেবতাদের প্রচলিত দেবনামও গ্রহণ করেননি।

কৌটিল্যের পূর্বাচার্যদের নাম বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে যে কথা বলছিলাম, সেই কথায় আসি। কথা হল—ভারতবর্ষে রাজনীতি শাস্ত্র বা রাজধর্ম-চর্চার একটা পরম্পরা চিরকাল চলে আসছে। খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যে আমরা হয়তো রাজনীতির আলোচনা তেমন কিছু পাই না, কিন্তু শতপথ এবং ঐতরেয়ের মতো ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি থেকে এবং তারপর আপস্তম্ব অথবা বৌধায়নের মতো ধর্মসূত্রগুলির সময় থেকেই রাষ্ট্র এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করেছে। সময়ের দিকে দিয়ে ধরতে গেলে বোঝা যায়—খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকেই রাজ্য-রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে এবং তার স্পষ্টতর রূপ পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই।

আমরা যাকে মনু-সংহিতা বলি তার সংকলন-কাল মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে হলেও মনুকথিত রাজনীতির ভাষ্য

অনেক আগেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এরই মধ্যে রচিত হয়েছে রামায়ণ এবং মহাভারত। বাল্মীকির লেখায় এখানে সেখানে রাজধর্মের নানান বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হলেও মহাভারতের মধ্যে রাজধর্মের আলোচনা অনেক সুশৃঙ্খল এবং বিপুল। মহাভারতের সভা-পর্ব, উদ্যোগ-পর্ব, শান্তি-পর্ব এবং অনুশাসন-পর্বে ভারতীয় রাজধর্মচর্চার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে 'অগমেন্টেশনের' কাজ করবে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি, যা পালি ভাষায় লেখা। পণ্ডিতেরা খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণ মহাভারতের সংকলন-কাল নির্ণয় করলেও মহাভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনাগুলি মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্বীয় বলেই মনে হয়।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ/ তৃতীয় শতাব্দীতে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পেয়ে গেছি। কঠিন-হৃদয় পণ্ডিতেরা শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতিতে অর্থশাস্ত্রকেও এককভাবে কৌটিল্যের লেখা বলে মনে করেন না এবং কৌটিল্যের সময়ও তাঁদের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর আগে নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এঁদের সময়-নির্ণয় পদ্ধতি পুরোটাই প্রায় 'স্টাইল' নির্ভর, যা সবচেয়ে দুর্বল পদ্ধতি বলেই আমরা মনে করি। এ ছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শিলালিপির শব্দরাজির সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যবহৃত শব্দগুলির মিল দেখিয়ে যাঁরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে মৌর্য-পরবর্তী সময়ের রচনা বলতে চান, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, বহু পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত শব্দরাজির সঙ্গে যদি অর্থশাস্ত্রীয় শব্দের মিল থাকে, তাহলে কি কৌটিল্যকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ফেলা যাবে?

সত্যি কথা বলতে কী, কিছু শব্দ এবং স্টাইলের ভিন্নতা বিচার করে যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সময়কাল নির্ণয় করতে হয়, তাহলে প্রভাত-সঙ্গীত এবং পূরবীর কবিকে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতে হয়। আমরা এই দুর্বল পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি না বলেই রাধাকুমুদ মুখার্জির নির্ণীত কৌটিল্যের অবস্থানেই আমরা বিশ্বাস করি এবং তা কোনওমতেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক কাল ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক কাল থেকে আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে স্মৃতি-গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে, তার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (খ্রি. ১০০—খ্রি. ৩০০), বিষ্ণুধর্মসূত্র (খ্রি. ১০০—খ্রি. ৩০০), নারদস্মৃতি (খ্রি. ১০০—খ্রি. ৪০০) এবং বৃহস্পতিস্মৃতি এবং কাত্যায়নস্মৃতির মধ্যেও রাজনীতির আলোচনা আছে। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিশাস্ত্রের কথা বললে কৌটিল্যের পরেই আমাদের যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি এবং কামন্দকীয় নীতিসারের (খ্রি. ৪০০—খ্রি. ৬০০) কথা উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ করতে হবে মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু, অগ্নি বা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা, যেখানে রাজনীতির আলোচনা ইতস্তত ছড়ানো আছে। রাজনীতির আলোচনায় আরও এক গুচ্ছ পণ্ডিতজনের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এঁরা হলেন মনু-সংহিতার টীকাকার মেধাতিথি (৯ ম.খ্রি.), গোবিন্দরাজ (১১৪০ খ্রি.) এবং কুল্লুকভট্ট (খ্রি. ১১৫০—খ্রি.

১৩০০)। টীকাকারের প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে তিনিই মিতাক্ষরা টীকা (খ্রি. ১০৭০—খ্রি. ১১০০) রচনা করে আধুনিক ভারতীয় দণ্ডবিধির মূল ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।

দুই

আধুনিক যুগে আমরা যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলি, হয়তো ঠিক সেই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কথাটা প্রাচীন যুগে ব্যবহার হয়নি। সম্পূর্ণ করে না হলেও কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বোঝাতে যে সব শব্দ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত সেগুলির একটা আনুক্রমিক শব্দ-পর্যায় ব্যবহার করলে আমরা এই নিম্নলিখিত শব্দগুলি পেতে পারি : রাজশাস্ত্র, রাজধর্ম, দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র এমনকি রাজনীতি শব্দটিও।

'রাজশাস্ত্র' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছেন মহাভারতের রচয়িতা। পরবর্তীকালে যে গ্রন্থটি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নামাঙ্কিত হয়েছে, সেই নীতিপ্রকাশিকার মধ্যেও 'রাজশাস্ত্র' কথাটিই নেওয়া হয়েছে। যিনি কালিদাসেরও পূর্ববর্তী কাব্য-নাট্যকার, সেই অশ্ব ঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত কাব্যে শুক্র-বৃহস্পতির লেখা রাজনীতিবিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে ওই 'রাজশাস্ত্র' কথাটাই বহাল রেখেছেন। 'রাজশাস্ত্র' এই শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে 'রাজনীতি' কথাটাও পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। মহাভারতে 'রাজনীতি' আলোচনার সময় এককভাবে শুধু 'নীতি' শব্দটাই প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজনীতি শব্দটাও যে একেবারে উচ্চারিত হয়নি, তা নয়। তবে রাজ্য এবং রাজনীতির আলোচনার সময় 'রাজ' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'নীতি' বা 'নয়' শব্দ প্রয়োগ করাটা মহাভারতকারের অভ্যাসের মধ্যে পড়ে।

আসলে 'নীতি' বা 'নয়' শব্দটা আসছে 'নী' ধাতু থেকে—যার অর্থ নিয়ে যাওয়া, আরও পরিষ্কার করে বলা যায়—টেনে নিয়ে যাওয়া, যিনি নেতৃত্ব দিয়ে অন্য মানুষদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যান, তিনিই নেতা। এই নেতা শব্দটিও আসছে 'নী' ধাতু থেকে। হয়তো ধাতু-মূলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে যাওয়ার অর্থ আছে বলেই—নয়নান্নীতিরুচ্যতে—শুধু 'নীতি' শব্দ দিয়েই রাজনীতিকে বোঝানো গিয়েছে। রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থকেও 'নীতিসার' বা 'নীতি প্রকাশিকা' বলতেও অসুবিধে হয়নি। রাজনীতি শব্দটা অবশ্য রাজনীতি অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশে এবং মাঘের শিশুপালবধে।

'রাজধর্ম কথাটা অবশ্য দণ্ডনীতির সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছে মহাভারতে। অন্তত পি. ভি. কানে তাই মনে করেন। সেখানে বলা হয়েছে—দণ্ডনীতি যদি উপযুক্তভাবে প্রয়োগ না করা হয় তবে বেদ এবং ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্ষত্রিয় রাজা যদি চিরন্তন রাজধর্ম ঠিকমতো পালন না করেন, তবে বর্ণাশ্রমধর্মের বিনাশ ঘটবে। মহাভারতের এই শ্লোকে দণ্ডনীতি আর রাজধর্মের মর্মকথা এক হয়ে গেলেও রাজধর্ম কথাটাকে এখানে দণ্ডনীতির চেয়ে পুরাতন শব্দ বলে মনে হয়—ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে।

'রাজধর্ম' শব্দটা অবশ্য বিখ্যাত করে দিয়েছেন মনু। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন প্রায় প্রতিজ্ঞার মতো করে—রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি। অর্থাৎ আমি রাজধর্মের কথা বলব। এখানে রাজধর্মের অন্তর্গত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'কর্তব্য'। মনুসংহিতার প্রসদ্ধি টীকাকার মেধাতিথি তাই বলেছেন—ধর্ম মানে এখানে কর্তব্য। রাজার কর্তব্য বিষয়ে বলবেন বলে মনু প্রতিজ্ঞা করছেন। রাজার কর্তব্যটা কী? না, ষাড়্গুণ্য।

'ষাড়্গুণ্য' মানে ছ'টি গুণের সমাহার। এই ছয় গুণের সব কটাই প্রায় রাজার পররাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে পড়ে। রাজা কার সঙ্গে সন্ধি করবেন, কার অপকার করবেন, কার সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদ বাধাবেন, কাকে উপেক্ষা করবেন, যুদ্ধের সময়ে কাকে আশ্রয় করবেন বা কার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, কোন রাজার সঙ্গে আগে সন্ধি করে পরে কারণ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন—এই ছ'রকম নীতিকে একসঙ্গে ষাড়্গুণ্য বলে। ষাড়্গুণ্যের ব্যাপারটা অন্তঃশত্রু বা অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে বটে, তবে প্রধানভাবে এই নীতিগুলি (policy) পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বেশি হয় প্রযোজ্য।

মনুসংহিতার টীকাকার এই ষাড়্গুণ্যকেই রাজার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছেন এবং সেইজন্যই এটা রাজার ধর্মের মধ্যে পড়ে। মনুসংহিতার মধ্যে রাজার অন্যান্য কর্তব্যের কথাও বলা আছে। যাগ-যজ্ঞ, দান, ব্রাহ্মণ-সেবা—এগুলোও রাজার ধর্ম। কিন্তু ধর্ম হলেও এর ফল চোখে দেখা যায় না বলে, যে ধর্মের ফল চোখে দেখা যায়—যেমন সন্ধি, বিগ্রহ, যুদ্ধ-যাত্রা ইত্যাদি—সেগুলিকেই প্রধানত রাজধর্ম বলে মনু মনে করেন।

সত্য কথা বলতে কী 'রাজধর্ম শব্দটা 'দণ্ডনীতি' কিংবা 'অর্থশাস্ত্রে'র তুলনায় অনেকটাই বিশদ এবং ব্যাপ্তিময় শব্দ। মহামতি কানে যতই মনে করুন দণ্ডনীতি এবং রাজধর্ম মহাভারতে একাকার হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে নিপুণভাবে মহাভারত আলোচনা করলে তা মনে হয় না। দুটি শব্দকে সমার্থক বোঝানোর জন্য মহাভারতের যে শ্লোক তিনি উদ্ধার করেছেন (শান্তিপর্ব, ৬৩.২৮), সেখানে প্রধানত 'ক্ষাত্র' শব্দটা ব্যবহৃত হওয়ায় রাজধর্মের ব্যাপ্তি অনেকটা বেড়ে গেছে। 'ক্ষাত্র' শব্দের আলোচনায় পরে আসব, আপতত সোজা কথায় এইটুকুই বলা যায় যে, যদি এই দুটি শব্দই মহাভারতে একার্থক হত, তাহলে অন্তত একই শ্লোকের মধ্যে এই দুটি শব্দই মহাভারতের কবি প্রয়োগ করতেন না। এই কথাটা খুব ভাল করে বোঝা যাবে শান্তিপর্বেরই অন্য একটি শ্লোকে—

বিনষ্টায়াং দণ্ডনীত্যাং রাজধর্মে নিরাকৃতে।
সম্প্রমুদ্যন্তি ভূতানি রাজদৌরাত্ম্যতো'নঘ।।

এই শ্লোক এবং ওই একই শ্লোকের পূর্বে বলা রাজার আচরণীয় কর্তব্যের ফিরিস্তি থেকে বোঝা যাবে দণ্ডনীতি অনেকটাই রাজার অন্তঃ এবং পররাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার এবং নিশ্চয়ই রাজধর্মের বৃহদংশের মধ্যেই সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু

রাজধর্মের মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে যেটা প্রজাদের সঙ্গে রাজাকেও ঠিক রাখে। অপিচ এই রাজধর্মের মধ্যেই খানিকটা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে আধুনিক 'কিংশিপ থিওরি' এবং 'সার্বভৌমত্বে'র কল্পনা, যেটা এখনও ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

'রাজধর্ম' শব্দটা যে দণ্ডনীতির চেয়েও পুরাতন এবং ব্যাপ্ত, বিশদ শব্দ, তা বোঝা যাবে মহাভারতে ভীষ্মের বক্তব্য থেকেই এবং মহামতি কানে তা উল্লেখও করেছেন। ভীষ্ম বলেছেন, যাবতীয় জাগতিক ধর্মকে রাজধর্মেরই অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে। সমস্ত ধর্ম এবং উপধর্মও রাজধর্মের মধ্যেই পড়ে। রাজধর্ম সমস্ত ধর্মের শীর্ষস্থানীয় বলেই বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্মের পালনীয়তাও রাজধর্মের ওপর নির্ভর করে। এমনকি প্রজাদের রোগ, শোক, ভয় এবং মৃত্যুও রাজার অধীন বলে রাজধর্মই মানুষের শেষ আশ্রয়। অন্যান্য বন্য জন্তুর পদচিহ্নের ওপর যদি হাতির পা পড়ে, তাহলে যেমন ক্ষুদ্র জন্তুর পদচিহ্ন লুপ্ত হয়, তেমনই জাগতিক সমস্ত ধর্মই রাজধর্মের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

রাজধর্মের মধ্যে এতটা ব্যাপ্তি আছে বলেই পণ্ডিতেরা এটাকে বিশাল ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করেছেন। বস্তুত 'রাজন' শব্দটির সঙ্গে ধর্ম শব্দটি জুড়ে যাওয়ায় রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে রাজার নিজস্ব ইতিকর্তব্যতাও এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ফলে শুধু রাজ্যশাসনই নয়, যে ধর্ম রাজাকেও ধারণ করে—সেটাও এখানে বড় আকাঙ্ক্ষিত অর্থ। হয়তো এই অর্থ আছে বলেই শেষপর্যন্ত মহাভারতের কবিকে বলতে হয়েছে—ত্যাগই হল রাজধর্মের মর্মকথা, কারণ ত্যাগের চেয়ে বড় ধর্ম আর কীই বা আছে—সর্বস্ত্যাগো রাজধর্মেষু রাজংস্ত্যাগং ধর্মজ্ঞাছরগ্র্যং পুরাণম্।

রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম পর্যায় শব্দ হল দণ্ডনীতি। আধুনিক যুগের সাধারণ একটি লোকও দণ্ড শব্দের অর্থের মধ্যে শাস্তির গন্ধ পাবেন এবং শাস্তির অর্থ নিয়েই হয়তো প্রথম দণ্ডের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন—যাগ-যজ্ঞ করবার সময় অসুর-রাক্ষস বা যজ্ঞবিঘ্নকারী মানুষজন তাড়ানোর জন্য যে লাঠিটা ব্যবহার করা হত, সেটাই দণ্ডের প্রথম অর্থ। অন্যেরা বলেন, মূলত পশুপালী আর্যসমাজ গোচারণের জন্য যে লাঠি ব্যবহার করত, সেটাই পরে দণ্ড না শাস্তির রূপ ধারণ করেছেন।

সংস্কৃত ভাষায় প্রথম সার্থক অভিধান হল যাস্কের লেখা নিরুক্ত (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০—খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দী), এখানে দণ্ডশব্দের মূল অর্থ যাস্কেরও পূর্বকালে কত রকম ছিল, সেটি সবিস্তারে দেওয়া আছে। যাস্ক লিখেছেন—আমরা যদি বলি 'দণ্ড্যঃপুরুষঃ', তাহলে দৈহিক শাস্তি অথবা টাকা-পয়সার জরিমানা বোঝাতে পারে।

দণ্ড শব্দের অন্য একটি অর্থ হতে পারে ধারণ করা এবং দণ্ড শব্দের শেষ অর্থ বলার সময় যাস্ক তাঁর পূর্বতন আচার্যের নাম স্মরণ করছেন। অর্থাৎ সমসাময়িককালের প্রচলিত অর্থ তিনি বলেছেন, এখন তাঁরও বহু পূর্বকালে দণ্ড শব্দের কী অর্থ ছিল, তা জানানোর জন্য তিনি বলছেন— উপমন্যুর মতাবলম্বী আচার্যরা বলেন—দণ্ড শব্দের উৎপত্তি 'দম্' ধাতু থেকে যার অর্থ দমন করা। যাস্কের

টীকাকার দুর্গসিংহ বলেছেন—যারা অবিনীত অজিতেন্দ্রিয় (অদান্ত) তাদের দমন করেন রাজা।

পরবর্তীকালে আমরা যখন যাস্কের সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে মহাভারতের যুগে পৌঁছেছি, অথবা কৌটিল্যের যুগে পৌঁছেছি, তখন কিন্তু সাহিত্য এবং লোক-ব্যবহারে দণ্ড শব্দের মধ্যম যে অর্থটি—ধারণ করা—সেই ধারণের মহিমাটুকু দণ্ড শব্দের মধ্য থেকে যেন লুপ্ত হয়ে গেল। 'দণ্ড' মানেই যেন শাস্তি দেওয়া বা দমন করা। সুপ্রযুক্ত দণ্ডবিধি যে সমস্ত লোককে ধারণ করে সে বোধটা একেবারেই যে এ যুগে ছিল না, তা কিন্তু নয়। যুধিষ্ঠিরের কাছে দণ্ডনীতির প্রশংসা করবার সময় ভীষ্ম কিন্তু দণ্ডের ধারণ-শক্তিটি মাথায় রেখেই বলেছিলেন—দণ্ড যখন ন্যায়বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সেটি সমস্ত চরাচর রক্ষা করে—দণ্ডেন সহিতা হ্যেষা লোকরক্ষণকারিকা।

দণ্ড যখন লোকরক্ষার কাজে যুক্ত হয়, দণ্ড যখন জগৎকে ধারণ করে, তখন দণ্ডের মধ্যে নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ—দুটি বৃত্তিই কাজ করে। সাধারণ মানুষকে দণ্ড যেমন একটা লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই দণ্ডকেও টেনে নিয়ে যেতে হয়, কল্যাণময় এক লক্ষ্যের দিকে। এই পরস্পর পরিপূরক 'নয়ন'-ক্রিয়ার মধ্যেই দণ্ডের ধারণ করার ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে।

কৌটিল্যের সময়ে এসে মহাভারতের এই 'লোকরক্ষণকারিকা' দণ্ডবিধি রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে অন্বিত হল। কৌটিল্য বললেন— দণ্ড হচ্ছে যোগ-ক্ষেমের সাধন—যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ। 'যোগ' অর্থ, যা নেই তা যোগ করা, আর ক্ষেম মানে, যা আছে তা রক্ষা করা। কৌটিল্য আরও পরিস্কার করে বলেছেন যে, দণ্ডনীতির এই যোগক্ষেমের সাধনটি যে কোনও রাজার সম্পূর্ণ শাসন-পদ্ধতির মধ্যে অনস্যূত হওয়া চাই। এই শাসন-পদ্ধতির মধ্যে যেমন দর্শন, যুক্তিতর্ক অথবা ডায়ালেকটিসের ব্যাপার আছে, তেমনই আছে বেদ, ধর্ম, বর্ণাশ্রমের ভাবনা, আবার তেমনই আছে কৃষি-বাণিজ্যের সুষ্ঠু-ব্যবস্থা। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যা নেই, তা যুক্ত করা, যা আছে তা রক্ষা করা, যা সুরক্ষিত, সেটাকে বাড়ানো এবং যা বেড়েছে সেটাকে উপযুক্ত উন্নয়নের কাজে লাগানোর ভারটা দণ্ডনীতির দায়। এবং সেটা সর্বত্রই সাধারণ নীতি।

এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের মর্মকথা হল—দণ্ড বা শাস্তিই দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য—মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন। দণ্ডের স্বরূপ বলতে গিয়ে ভীষ্মকে তাই বলতে হয়েছে—একই দণ্ডের অনেক রূপ—দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ। অন্তত পাঁচটা রূপের কথা মহাভারতে আছে। বলা হচ্ছে—দণ্ডনীতি অর্থাৎ দণ্ডনীতিশাস্ত্র হচ্ছে ব্রহ্মকন্যা, এটি লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রী। দণ্ডনীতিকে ব্রহ্মকন্যা বলা হচ্ছে কারণ এই শাস্ত্রের পাঠ রাজা এবং মানুষের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির জন্ম দেয়। এটি 'লক্ষ্মী' স্বরূপিণী কারণ দণ্ডনীতির মাধ্যমেই গৃহস্থের সম্পদরক্ষা ঘটে। দণ্ডনীতি সমাজকে স্থায়িত্ব দেয় তাই একে 'বৃত্তি' বলা হচ্ছে। দণ্ডনীতিকে 'সরস্বতী' বলা হচ্ছে, কারণ দণ্ডনীতি মানুষকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে অপরাধ মোচন করার সুযোগ দেয় এবং

পুনরায় তাকে নিজের কথা বলার সুযোগ দেয়! দণ্ডনীতির শেষ রূপ হল জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ সে জগৎকে ধারণ করে।

দণ্ডের এই বহুরূপের ব্যাখ্যাটি আমরা পেয়েছি মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা থেকে, অন্যথায় দণ্ডনীতিকে ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী ইত্যাদি বলার হেতু বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। অন্যদিকে এটাও স্বীকার করতেই হবে যে, এই ব্যাখ্যার মধ্যে টীকাকারের ওপর আধুনিকতার ছায়া পড়েছে হয়তো। হয়তো মহাভারতের কবি এত কিছু বোঝাননি। শুধুমাত্র 'মিথলজিক্যাল' চরিত্রগুলির গুণ চাপিয়ে দিয়েছেন দণ্ডনীতির স্বরূপ বোঝাতে। কিন্তু বিনা কারণে, বিনা কোনও ইঙ্গিতে এই রূপকগুলি উচ্চারিত হয়নি এবং সেইজন্যই হরিদাসের ব্যাখ্যা আমাদের শুনতে হবে।

মহাভারতে দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের সৃষ্টির সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাকে যেভাবে জড়িয়ে পড়তে দেখেছি, তাতে মনে হবে বুঝি এই শাস্ত্রের সৃষ্টির মূলেও ঐশ্বরিক তত্ত্ব আছে। বালগঙ্গাধর তিলক কিন্তু শুধু এই দেবতাবাচক শব্দগুলির নিরিখেই দণ্ডনীতির ঐশ্বরিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া স্বীকার করেননি। তাঁর মতে দণ্ডনীতির মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্যই ব্রহ্মা, শিব—ইত্যাদি দেবতার নাম-মাহাত্ম্য এখানে জড়ানো হয়েছে। মহাভারতে অন্যত্র কিন্তু সাতজন ঋষিরও নাম করা হয়েছে যাঁরা দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রণেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এঁরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। এঁদেরকে একযোগে চিত্রশিখণ্ডী বলা হয়।

এঁদের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য—লোকধর্ম নিয়ন্ত্রণ করা যাতে করে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং যাতে মানুষ সুখে থাকে—ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্। এই সপ্তর্ষি তাঁদের শাস্ত্র রচনা করেছিলেন মানুষের কথা ভেবে—লোকান্ সঞ্চিন্ত্য মনসা ততঃ শাস্ত্রং প্রচক্রিরে। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই সপ্তর্ষিকে তাঁর নিজের ভাবনা জানিয়ে শাস্ত্র তৈরি করতে বলেছেন। শাস্ত্র লিখতে যাবার আগেই তিনি তাঁর ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে, এই শাস্ত্র লিখতে হবে যাতে মনুষ্যসমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ যে কর্মে প্রবৃত্ত হবে এবং যা থেকে মানুষ নিবৃত্ত হবে—সেটার ব্যাপারে এই শাস্ত্রই হবে প্রমাণ—

লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ধর্মঃ প্রবর্ততে।।
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি।

রাজনীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মহাভারতের এই কথাটি অন্তত একবারের জন্যেও গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে মনে করিয়ে দেবে। তিনি বলেছিলেন—Now since political science uses the rest of the sciences,and since, again it lagislates as to what we are to do and what we are to abstain from,the end of this science must include those of other sciences, so that its end must be the good for man.

অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র যে কীভাবে রাজধর্মের মধ্যে বিলীন হয় সেকথা আমরা আগেই বলেছি। তবে চিত্রশিখণ্ডীর গ্রন্থরচনার কথাটা আমরা শেষ করে নিই। ব্রহ্মা বলে দিয়েছিলেন—তোমরা যে শাস্ত্র লিখেছ, সেই শাস্ত্রই ভবিষ্যতে শুক্র-বৃহস্পতি শিখবেন, শিখবেন মনু। এই শাস্ত্র মানুষকে সমৃদ্ধি দেবে, এই শাস্ত্র মানুষকে শৃঙ্খলা শেখাবে এবং এই শাস্ত্রের মধ্যে মনুষ্যহিতের সর্বোত্তম গূঢ় কথাটি বলা আছে—এতদর্থাঞ্চ ধর্ম্যঞ্চ রহস্যঞ্চেতদুত্তমম্। ভবিষ্যতে যিনি রাজা হবেন, তিনি এই শাস্ত্রের বলেই প্রজাসুখ লাভ করবেন, লাভ করবেন সমৃদ্ধি।

লক্ষণীয়, দণ্ডনীতি বা রাজশাস্ত্র শব্দটা একবারও উচ্চারণ না করেও যে শাস্ত্রের কথা বলা হল, সন্দেহ নেই—এটাই রাজনীতি শাস্ত্র। যার প্রবর্তক চিত্রশিখণ্ডী। সাত ঋষি এবং তাঁরা রাজার কথা ভেবেই শুধু নয়, মানুষের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন—লোকপিতরঃ সর্বে লোকার্থচিন্তকাঃ।

এখানে রাজনীতিশাস্ত্রের মূলেই কোনও অলৌকিকতা নেই বটে কিন্তু এই চিত্রশিখণ্ডীকেও ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়, এমনকি তাঁদের সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে মহাভারতে। কাজেই আমাদের মনে হয় ব্রহ্মা, শিব—এই সমস্ত নামগুলি নিয়েও দণ্ডনীতির মূলে কোনও ঐশ্বরিক নিদান খোঁজার কারণ নেই। বস্তুত ব্রহ্মাকে যেহেতু সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, তাই যে কোনও শাস্ত্রের নতুন সৃষ্টি হলেই সেই শাস্ত্রের প্রথম লেখককে ব্রহ্মা বলাটাই যেন নিয়ম। আমাদের নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে যে কোনও নবতম শাস্ত্রের মূলেই ব্রহ্মার নামটি আছে। আসলে প্রথম লেখকই এখানে ব্রহ্মা বলে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু বাস্তবে রাজনীতি-শাস্ত্রের মূলে কোনও দেবতার অধিকার নেই বলেই মহামতি কৌটিল্য মানুষের দৃষ্টিতেই এঁদের নামকরণ করেছেন—বিশালাক্ষ, বাহুদন্তিপুত্র, পিশুন, বাতব্যাধি ইত্যাদি।

রাজশাস্ত্রের পর্যায়শব্দের মধ্যে এখন বাকি রইল শুধু অর্থশাস্ত্র। প্রথমেই মনে রাখা দরকার—'অর্থশাস্ত্র' শব্দটির আবিষ্কর্তা কিন্তু কৌটিল্য নন। দণ্ডনীতি বা রাজনীতিশাস্ত্রের পর্যায় শব্দ হিসেবে 'অর্থশাস্ত্র' কথাটি প্রায় স্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মহাভারতেই। অবশ্য অর্থের শাস্ত্র-অর্থশাস্ত্র এই সমাসবদ্ধ পদটি থেকে 'শাস্ত্র' শব্দটি বাদ দিলে যে শব্দটি থাকে সেই 'অর্থ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে আছে ভূরি ভূরি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ যা চায়, তাকে চার ভাগে ভাগ করে নিলে পাওয়া যায় চর্তুবর্গ। অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখানে 'অর্থ' শব্দের মানে শুধুই টাকা-পয়সা নয়। অর্থ মানে প্রয়োজন, অর্থ মানে সমৃদ্ধি। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—রাজা যে ব্রহ্মণকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করবেন, তিনি যেন ধর্ম এবং অর্থে অভিজ্ঞ হন। অর্থাৎ রাজা কীভাবে রাজ্য বাড়াবেন, কীভাবে রাজকোষ বৃদ্ধি করবেন তার জন্য অর্থশাস্ত্রটা জানা প্রয়োজন। মহাভারতে বহু বহু ঋষি এবং পুরোহিতকে দেখা যাবে, যাঁরা অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

'অর্থ' শব্দ বাদ দিয়ে অর্থশাস্ত্রে আসি। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলে দশ

দিনের মাথায় ভীষ্ম মারা গেলেন। কৌরবপক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হল এবং কর্ণের মতো বীর প্রস্তাব করলেন—সেনাপতি করা হোক দ্রোণাচার্যকে। কেন? শুধু তাঁর যুদ্ধ-ক্ষমতার জন্যই দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি-পদ দিতে হবে এমন নয়। কর্ণ বললেন—এই মানুষটার মধ্যে যেন শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতিকে একত্র দেখা যায়—কো হি... সেনাপতিঃ স্যাদন্যো'স্মাচ্ছুক্রাঙ্গিরস-দর্শনাৎ।

আমরা আগেই জানিয়েছি—শুক্র এবং বৃহস্পতি—দুজনেই ছিলেন রাজশাস্ত্রপ্রণেতা। দ্রোণাচার্য এই দুই ব্যক্তির প্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র জানেন। এর পর দুর্যোধনের অনুরোধে দ্রোণাচার্য কৌরবপক্ষের সেনাপতিত্ব করার জন্য রাজি হবার পর পরই তাঁকে বলতে শুনছি—দুর্যোধন! আমি যেমন ষড়ঙ্গ বেদ জানি তেমনই আমি মানবী অর্থবিদ্যাও জানি—বেদং ষড়ঙ্গং বেদাহম্ অর্থবিদ্যাঞ্চ মানবীম্। এই অর্থবিদ্যা' কথাটি অবশ্যই কৌটিল্যের উদ্ভাবিত 'অর্থশাস্ত্র' শব্দের পূববর্তী। আরও প্রণিধানযোগ্য—মানবী অর্থবিদ্যা। তার মানে কৌটিল্যের পূর্বে মনুর লেখা একটি অর্থশাস্ত্র ছিল এবং আমাদের কাছে সেটি লুপ্ত। কৌটিল্য যখন 'ইতি মানবাঃ' বলে মনু-সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করেছেন, হয়তো তখন এই 'মানবী অর্থবিদ্যা'র গ্রন্থ থেকেই মনুর মত সংকলিত হয়েছে। আবার খুব সরলভাবে ধরলে—মনু যে রাজধর্মের কথা বলেছেন, সেটাকেই হয়তো পারিভাষিকভাবে অর্থশাস্ত্র বলা হত। এই অর্থবিদ্যা প্রাচতস মনুর লেখা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে অবশ্য পরিষ্কারভাবেই 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটিই প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—শ্রেষ্ঠ রাজারা এই অর্থশাস্ত্রকে অবলম্বন করে থাকেন—যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে। তবে মহাকাব্যের মধ্যে 'অর্থশাস্ত্র' শব্দের যতই ব্যবহার থাকুক, কৌটিল্যের সময়ে এসে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে রীতিমতো আধুনিক অর্থেই রাষ্ট্রের চেতনা যুক্ত হল। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বোঝবার আগে অর্থ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন সেটা আগে বুঝে নিতে হবে।

আমরা পূর্বে জানিয়েছি যে, অর্থ শব্দের অনেক রকম অর্থ হয়। আমাদের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত 'অর্থ' শব্দের প্রধান অর্থগুলি মোটামুটি—ধন, বিত্ত, লাভের টাকা, বস্তু, দ্রব্য, কাম্যফল, স্ব-পররাষ্ট্রচিন্তা, ফল ইত্যাদি। কৌটিল্য নিজে অর্থশাস্ত্রের অর্থ দিয়েছেন তাঁর নিজকৃত অর্থশাস্ত্রের শেষ প্রকরণে—যার নাম তন্ত্রযুক্তি। তন্ত্রযুক্তি মানে —তিনি যে বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন তার সার্থকতা বিচার, সোজা কথায়, অর্থশাস্ত্রের অর্থ নির্ণয়ের যুক্তি।

কৌটিল্য বলেছেন—মানুষের বৃত্তি বা জীবনধারণের উপায় হল অর্থ—মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ। একই সঙ্গে তিনি আরও একটি অর্থ দিয়ে বলছেন—মনুষ্যযুক্ত ভূমিকেই আমরা অর্থ বলতে পারি—মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ। অতএব যে শাস্ত্র পৃথিবীর লাভ এবং পালনের উপায় বলে দেয়, সেটাই অর্থশাস্ত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গেলেই যেখানে সব সময়

ধর্ম এবং দর্শনের উল্লেখ সেখানে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে যে মানুষটি মনুষ্যজীবনের ধারক হিসেবে 'অর্থে'র উল্লেখ করলেন, সেটা ভীষণ রকমের আধুনিক হয়ে গেছে। অন্য দিকে 'অর্থ' শব্দের মধ্যেই যেহেতু মানুষের অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ডের কথাও রয়ে গেছে, তাই অর্থশাস্ত্রকে একটি রাষ্ট্রের মানুষ, তার ভূমি এবং সেই ভূমিসংযুক্ত মানুষগুলির পালন-পোষণের সহায়ক শাস্ত্র বলা যায়।

কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা না রেখেও আমরা এটা জানাতে পারি যে, কৌটিল্য নিজে নিজেই এই শব্দ সৃষ্টি করেননি বা এই শব্দের ব্যাপ্ত তাৎপর্যও তাঁর নিজের তৈরি নয়। তবে সকলের ওপরে এই শব্দটাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শাস্ত্র বা 'তন্ত্র' রচনা করার মধ্যেই তাঁর নিজস্বতা। এর জন্য তাঁকে গালাগালি শুনতে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তবু ধর্ম-দর্শন এবং নানা বিধি-বিধানের সীমাবদ্ধ সমাজকে অতিক্রম করে তিনি রাজধর্মের মধ্যে অর্থেরই প্রাধান্য স্বীকার করে নেন, তখনই বুঝতে হয় কৌটিল্য মানুষটা তাঁর নিজের সময় এবং সমাজের থেকে অনেক বেশি আধুনিক। তবে সেই আধুনিকতার মধ্যেও একটা পরম্পরা আছে। আমরা পরে সে কথায় আসছি।

মানুষের জীবনধারণের উপায় স্বরূপ যে 'অর্থ', যা নাকি পৃথিবীর লাভ এবং পালনে সাহায্য করে, সেই অর্থসাধনের প্রধান উপায় কিন্তু দণ্ড—যার কথা আমরা আগে বলেছি—দণ্ড যা নেই তা এনে দেয়, যা আছে তা রক্ষা করে, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি করে এবং বাড়তি জিনিসকে ভাল কাজে লাগায়।

পৃথিবীর লাভ এবং পালনের কথাটি মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে অর্থশাস্ত্র যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তাই কিন্তু রাজাদের রাজ্যশাসনের প্রণালী এবং সেইটাই অর্থশাস্ত্র। এই শাসনের মধ্যে গ্রাম এবং রাজার শাসনকেন্দ্র পুর-নগরের শাসন-ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই আছে অন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রনীতি। এ ছাড়া অন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন, যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, কর, খনি, নদী, বন—সব ব্যাপারেই আলোচনা আছে এবং এ সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজা এবং রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ।

তিন

মহাভারতে যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং ভাই-বন্ধু-জ্ঞাতিজনের শোকে যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই আর রাজা হতে চাইছেন না, তখন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন অর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করে। মনে রাখতে হবে—যুধিষ্ঠিরের স্বভাবটা প্রায় ব্রাহ্মণদের মতো এবং চতুর্বর্গের মধ্যে 'মোক্ষ' বা মুক্তিকামিতাই তাঁর মধ্যে বেশি। বৈরাগ্য-সাধনেই তাঁর মুক্তি এবং সেই কারণেই শোকসন্তপ্ত আত্মাকে শান্ত করার জন্য তিনি বলে যেতে চাইছেন—গমিষ্যামি বিনির্মুক্তো বিশোকো নির্মমঃ ক্বচিৎ।

মোটামুটি এই অবস্থায় অর্জুন তাঁর প্রতিরোধ-বাক্য শোনাচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে। অর্জুন বলছেন—এত দুঃখ পেলাম, এত কষ্ট করলাম, আর তারপর এই অদ্ভুত তোমার

মূঢ়তা—তুমি বলছ কি না রাজ্য ছেড়ে চলে যাব! এতদিনে শত্রুবধ করে এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করলাম, সেখানে সব ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবাটা যে একেবারেই বুদ্ধিহীনতা হবে। দেখ, ক্লীব মানুষরা কি রাজ্য পায়? নাকি অলস লোকেরাই রাজ্য পায়—ক্লীবস্য হি কুতো রাজ্যং দীর্ঘসূত্রস্য বা পুনঃ?

যুধিষ্ঠির অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি বনে গিয়ে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে ভিক্ষা করবেন সেও ভাল, তবু রাজসিংহাসনে তিনি বসতে চান না। অর্জুন বললেন—ভিখারি হয় কারা? যাদের ভাল বলতে কিছু নেই, ছেলেপিলে নেই, পশুধন নেই, তারাই ভিখারি হয়। সব থাকতেও তুমি বোকার মতো ভিখারি হবে কেন—কস্মাদাশংসসে ভৈক্ষ্যং কর্তুং প্রাকৃতবৎ প্রভো? আমরা রাজার ঘরে জন্মেছি, অমানুষিক ক্ষমতায় এই রাজ্য জয় করেছি, সেখানে ধর্মার্থ ত্যাগ করে মূর্খের মতো বনে যাব কেন—ধর্মার্থাবখিলৌ হিত্বা বলং মৌর্খ্যাৎ প্রতিষ্ঠসে?

ধর্ম এবং অর্থ—এই দুটি মোক্ষম শব্দ ব্যবহার করে অর্জুন বুঝিয়ে দিলেন যে কাম বস্তুটাও রাজার কাছে কোনও উপযোগী বস্তু নয়, আর মোক্ষ বা মুক্তি তো নয়ই। মনুসংহিতায় এবং মহাভারতের বহু জায়গায় উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—এই-ওই করলে রাজারা ত্রিবর্গ লাভ করেন। টীকাকারেরা সেখানে বলেই দিয়েছে—বাপু। মোক্ষর চিন্তা রাজার নয়, সে চিন্তা করলে রাজার রাজ্যপাট মাথায় উঠবে। অতএব চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষটা রাজা বাদ দিয়েই রাখুন।

পুরুষার্থ হিসেবে কামের একটা ভূমিকা অবশ্যই আছে, তবে সে কাম কখনওই লালসা বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা নয়। উপভোগ এবং আরও উপভোগের দ্বারাও যেহেতু কামের তৃপ্তি হয় না, অতএব কামকে সব সময়ে ধর্ম বা অন্তর্জাত মানসিক শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। একটি গৃহস্থের জীবনে কামের স্থান ততটাই যতটাতে আমাদের সংসার-চক্রের গতি রুদ্ধ না হয়। তবু শুধু এক গৃহী ব্যক্তিরই সামান্য স্বাধীনতা আছে কামের ব্যবহারে, অন্য কারও নয়। পণ্ডিতেরা একে বলেছেন—'biologial motivating force' কামের মাধ্যমে একটি মানুষ যেমন রতি-পুত্রের সুখ লাভ করে, তেমনই কামই তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

ব্যাপারটা বৃহদারণ্যক উপনিষদ আরও ভাল করে বুঝিয়েছে। উপনিষদ বলেছে—এই যেমন লোকে বলে—সংসারী জীব সম্পূর্ণটাই কামময়। সেখানে বুঝতে হবে—সে যেমনটি কামনা করছে সেই অনুসারে তার সংকল্প তৈরি হচ্ছে—স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন—'ক্রতু' হচ্ছে অধ্যবসায়, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যার পরে মানুষ কাজ করতে নামে। বৃহদারণ্যক আরও বলেছে—মানুষ যেমনটি সংকল্প করে, তেমনই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, আর যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় সেই কর্মের ফল সে লাভ করে—যৎ-ক্রতুর্ভবতি, তৎকর্ম কুরুতে, যৎকর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

বৃহদারণ্যকের এই পংক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, কাম যদি শুধু ভোগের জন্য

ব্যবহৃত না হয়ে কোনও সংকল্পের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়, তবে সেই কামই কিন্তু তার পূর্ব পুরুষার্থ 'অর্থ'কে বহন করে নিয়ে আসতে পারে। অর্থাৎ কৌটিল্য মানুষের জীবন ধারণের উপায়কে 'অর্থ' বলে নির্ধারণ করেন, তখন বুঝতে হবে সেই 'অর্থ' লাভের সহায়ক হবে কাম—যা রাজার সংকল্প তৈরি করবে, তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করবে এবং তাঁর লাভ-পালনেচ্ছার পূর্তি ঘটাবে। শুধু রাজার ক্ষেত্রেই কেন, যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই কাম যদি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের ইষ্টলাভে সহায়তা করে, তবে সেই কামই পুরুষার্থ।

কৌটিল্য এই কথাটাই বলেছেন, তবে 'কাম' শব্দটাকে একেবারে 'ক্রুড' অবস্থায় ধরেছেন। তিনি বলেছেন—ধর্ম এবং অর্থের সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে কামের পরিতৃপ্তি গ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে, রাজা সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু ধর্ম এবং অর্থের চিন্তা করবেন।

কৌটিল্যের মতে ধর্ম, অর্থ, এবং কাম—এই তিন পুরুষার্থকেই তাদের প্রাপ্যটুকু দিতে হবে, অর্থাৎ এই তিনটিরই সেবা করতে হকে সমানভাবে। রাজা যদি এই তিনটির মধ্যে একটিতে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন বা অত্যাসক্ত হয়ে পড়েন, তবে সেটাই তাঁর রিপু হয়ে দাঁড়াবে। এতে যেমন তাঁর নিজের কষ্ট বাড়বে, তেমনই অন্য দুটি পুরুষার্থও বিঘ্নিত হবে। এই ভাবে ধর্মে অত্যাসক্তি অর্থ-কামের বিপর্যয় ডেকে আনবে, অর্থে অত্যাসক্তি ধর্ম-কামের এবং কামে অত্যাসক্তি ধর্ম-অর্থের বিপর্যয় ঘটাবে। এত সব তত্ত্ব-কথা জেনেও শেষপর্যন্ত কৌটিল্য কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষার্থ 'অর্থে'র ওপরেই তাঁর সমস্ত আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, কারণ অর্থই মানুষের জীবনের মূলাধার। অর্থ থেকেই ধর্ম এবং কাম পরিণতি লাভ করে।

আমরা এবার সেই পূর্বকথায় ফিরে যাব। কিন্তু সেখানে বিড়ম্বনা হল—অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বোঝাবার সময় পুরুষার্থ-চতুষ্টয় বা চতুর্বর্গের দুটি মাত্র উল্লেখ করলেন, কিন্তু কামের উল্লেখ করলেন না। করলেন না এই জন্য যে, কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো সংকল্প সাধক কাম তাঁদের আগেই কর্মে প্রেরিত করেছে এবং সে কর্ম আজ সুসম্পন্ন। এতটাই সুসম্পন্ন যে, কৌটিল্যের মতে পৃথিবীর লাভ এবং পালনই যদি অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্ধেক 'অর্থ' তাঁরা আপন অধ্যবসায়ে লাভ করে ফেলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের পৃথিবীলাভ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীলাভের আসল তাৎপর্য যে প্রজাপালন, সেই অর্ধেক অর্থ এখনও বাকি। অর্জুন তাই বলেছেন—অমানুষিক কষ্ট আর ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আমরা এই সম্পদ লাভ করেছি। নিজের ধর্ম থেকে চ্যুত না হয়ে, এত শত্রু শাতন করে এই পৃথিবী লাভ করেও এখন সেটি ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে?

লক্ষ করে দেখুন, তৃতীয় পুরুষার্থ কামের কথা অর্জুন উচ্চারণ করলেও তিনি যখন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—ক্লীব অথবা আলস্যপরায়ণ মানুষের রাজ্যলাভ হয় না, অথবা যখন বলেছেন—নিশ্চেষ্ট (সর্বারম্ভান্ পরিত্যজ্য) ভিখারি রাজা নিয়ে কী

করবে—তখনই কিন্তু তিনি সেই সংকল্পাত্মক অধ্যবসায়ের কথা বলে দিয়েছেন, যাকে বৃহদারণ্যক বলেছে ক্রতু, শঙ্কর বলেছেন অধ্যবসায় এবং এ সব কিছুরই মূলে আছে কাম। এই কাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এখন মানুষের বৃত্তি অর্থের কথা ভাবাচ্ছে। সংকল্পাত্মক পুরুষার্থের কাজ অর্ধেক শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুনের মুখে এখন ধর্ম এবং অর্থের কথা শোনা যাচ্ছে।

কৌটিল্যকে যেমন দেখেছি—ধর্ম অর্থ এবং কামের সমন্বয় ঘটিয়েই আবারও যেমন তিনি অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করেন, অর্জুনকেও আমরা সেই রকমই অর্থের কথায় ফিরে আসতে দেখছি। অর্জুন বললেন, আজকে যদি সব ছেড়ে আপনি চলে যান, আর ঠগ-বদমাশ অসৎ লোকেরা এসে এই রাজ্য হরণ করে এবং প্রজাপালন না করে, তবে সে পাপ কিন্তু আপনাতেই বর্তাবে—যে ঘি যজ্ঞে আহুতি দেবার কথা ছিল আপনার, সেই ঘি যদি লোভী-অসৎ লোকের হাতে পড়ে তবে প্রজাপালনের আহুতিটুকু পড়বে না, লোকে সেটা আত্মসাৎ করে স্বার্থের কাজে লাগাবে।

অর্জুন আস্তে আস্তে অর্থের কথায় আসছেন। তিনি বললেন, যে ধন কাল পর্যন্ত থাকে না, সে ধনের কথা ঋষিরা ভাবতে পারেন। কিন্তু মনীষীরা যাকে ধর্ম বলে মনে করেন, তার উদ্ভব ধন থেকেই। পরাক্রমশালী লোক যার ধন-সম্পত্তি হরণ করে, তার ধর্মও হরণ করে। সেখানে দেখুন, আমরা হলাম ক্ষত্রিয়, বাপ-ভাই আত্মীয়স্বজনও যদি অন্যায়ভাবে আমাদের ধন হরণ করে তবে কাউকে আমরা ক্ষমা করি না—হ্রিয়মানে ধনে রাজন্ বয়ং কস্য ক্ষমেমহি।

পঞ্চপাণ্ডব ভাইরা এতদিন রাজ্য হারিয়ে ধনহীন অবস্থায় বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নির্ধনতা তাঁদের চরম কষ্ট দিয়েছে। অর্জুনের অবধারিত প্রতিক্রিয়া তাই ধর্মপ্রাণ মুনিপ্রায় যুধিষ্ঠিরের থেকে অন্যরকম। অর্জুন বলছেন—পাশে যে গরিব লোকটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ তাকে দেখে এমন করে যেন সে সুস্থ সমাজের কোনও মানুষই নয়। দারিদ্র্য যেন জীবনে এক মহাপাপ, আর সেই দারিদ্র্যকে কখনওই আপনি প্রশংসা করতে পারেন না—দারিদ্র্যং পাতকং লোকে ন তচ্ছংশিতুমর্হসি। সমাজে যারা পতিত হয়েছে তারা যেমন কষ্ট পায়, দরিদ্রও সেইরকম কষ্ট পায়, আমি সেই পতিত আর নির্ধন মানুষের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখতে পাই না।

অর্জুন এবার তাঁর পুরুষার্থ-ত্রয়ীর প্রধানতম অর্থের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করছেন—পর্বত থেকে যেমন অনেক নদীধারা বেরিয়ে আসে তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম এবং স্বর্গ, এবং এই অর্থ থেকেই মানুষের জীবন-যাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়।

কী রকম? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল কি না? কৌটিল্যের মতেও অর্থই ধর্ম-কামের উৎস এবং অর্থই তিনটি পুরুষার্থের মধ্যে প্রধান এবং অর্থ থেকেই মানুষের জীবনযাত্রা—মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ। অর্জুন বলেছেন—গ্রীষ্মকালের

ক্রমশীর্ণ নদীগুলি যেমন এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই অর্থহীন অল্পবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কাজই খাপছাড়া হয়ে যায়—বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা।

মনুষ্য-জীবনে অর্থের প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে অর্জুন এবার প্রায় অপ্রিয় সত্যের মতো কষ্টকর বাস্তব কথা উচ্চারণ করছেন। বলছেন—যার টাকা-পয়সা আছে, তারই বন্ধু আছে; বন্ধু না থাকলেও, জোটে। যার টাকা-পয়সা আছে, সেই জগতে বিখ্যাত মানুষ। যার টাকা-পয়সা আছে, সে ব্যাটা মূর্খ হলেও লোকে তাকে পণ্ডিত বলে। নির্ধন লোকের মনে যদি মহৎ কার্য সাধনের ইচ্ছেও থাকে তবু অর্থের অভাবেই সে তা করতে পারে না। মানুষ যেমন হাতি দিয়েই হাতি ধরে, তেমনই অর্থ দিয়েই সমস্ত প্রয়োজনের সিদ্ধি ঘটানো যায়—অথৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ। সত্যি কথা বলতে কি—ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন—এই সমস্ত কিছুই অর্থের দ্বারাই নিষ্পন্ন।

জীবনাযাত্রার চরমতম উপায় হিসেবে এই ভাবে যে অর্থের প্রাধান্য দেখানো হল এবং যে অর্থ অর্জুনের মতো যুদ্ধজয়ী বীর এবং কৌটিল্যের মতো অর্থশাস্ত্রীর প্রধান প্রতিপাদ্য, সেই অর্থের মূল চালিকাশক্তি হল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়, যাকে রাজনীতিশাস্ত্রের পারিভাষিক ভাষায় বলা হয় 'উত্থান-শক্তি'। সাধারণ ভাবে এই শব্দের মানে হল—উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা, কিন্তু প্রাচীন রাজনীতির পারিভাষিকতায় এই শব্দ একমাত্র সেই রাজার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, যিনি দিনরাত অনলসভাবে রাজ্যলাভ এবং রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করছেন।

কৌটিল্য পরিষ্কারভাবে তাঁর অর্থশাস্ত্রে জানিয়েছেন যে, 'অর্থ নামে যে পুরুষার্থটি আছে, তার মূল উৎস হল উত্থান—অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্। চেষ্টা, নিরন্তর চেষ্টাই হল উত্থান। কৌটিল্য বলেছেন—যিনি রাজা হবেন, তিনি যেন এই 'উত্থানে'র ব্যাপারটাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। না হলে তাঁর সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাজা যদি নিশ্চেষ্ট 'অনুযায়ী' হয়ে বসে থাকেন, তা হলে তাঁর যা আছে তাও যাবে, ভবিষ্যতের লাভ তো দূরের কথা। একমাত্র উত্থান শক্তির মাধ্যমেই রাজা তাঁর ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন, একমাত্র উত্থান থেকেই এই দ্বিতীয় পুরুষার্থের সিদ্ধি।

রাজার পরম পুরুষার্থ হিসেবে কৌটিল্য যতই অর্থকে চিহ্নিত করুন, অর্থের প্রাধান্য যেমন মহাভারতেও পাই, ঠিক তেমনই অর্থের মূল হিসেবে উত্থানশক্তির কথাও বোধহয় কৌটিল্যই প্রথম বলেননি, এই উৎস সন্ধানে অর্থের প্রাধান্যের কথা প্রথমে বলেছেন কৌটিল্যের পূর্বাচার্য বৃহস্পতি। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার সময় জানাচ্ছেন যে, রাজধর্মের মূল শক্তি যে 'উত্থান' সে কথা নাকি বৃহস্পতিই প্রথম বলেছেন—উত্থানং হি নরেন্দ্রানাং বৃহস্পতিরভাষত। রাজধর্মসম্য তন্মূলম্...। পুরুষার্থ-ত্রয়ীর মধ্যে অর্থের প্রাধান্য খ্যাপন করে ভীষ্ম বোধহয় বৃহস্পতি-নীতি থেকে দু-চারটে শ্লোকও উদ্ধার করেছেন। মূল বৃহস্পতি-নীতি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই

শ্লোকগুলির শুচিতা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন, কিন্তু ওই যে ভীষ্ম বলেছেন—এখানে পুরানো শ্লোক আছে—শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধ সে—এই পংক্তিটাই বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

তা ছাড়া শ্লোকগুলির মধ্যে যে ধরনের উদাহরণ আছে, উদাহরণের 'প্যাটার্নটা প্রাচীন। বৃহস্পতি যা বলেছেন তা ভীষ্মের মুখে এই রকম শোনাচ্ছে—উত্থান বা চেষ্টাশক্তি কাজ করেছে বলেই অমৃত লাভ করেছেন দেবতারা। অসুররা আর্য পুরুষদের হাতে যে পর্যুদস্ত হয়েছেন, সেও কিন্তু দেবতাদের উত্থান-শক্তির বলেই—উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ। এই উত্থান-শক্তির জন্যই ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে আধিপত্য লাভ করে স্বর্গরাজ্যের শাসন চালাচ্ছেন। উত্থানশক্তির শক্তিতে শক্তিমান হলে তিনি পণ্ডিতদেরও মাথায় চড়ে বসতে পারেন। বস্তুত পণ্ডিতজনেরা সদোত্থায়ী রাজাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের বশংবদও হন। উলটো দিক বলা যায়—যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও রাজা যদি উত্থান শক্তিটিই হারিয়ে ফেলেন, তা হলে নির্বিষ ঢোড়া সাপের মতো শত্রুরা তাঁকে জব্দ করে।

আমরা মহাভারতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পাশাপাশি রেখে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে রাজশক্তি বা রাজধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল অর্থলাভ এবং সেই অর্থলাভেরও মূল হল নিরলস অন্তহীন প্রয়াস। কিন্তু এ বাবদে কৌটিল্যের সঙ্গে মহাভারতের তফাতটা হল এই যে, কৌটিল্যের সময়ে অর্থশাস্ত্র পৃথক একটি বিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু মহাভারতের যুগে অর্জুনের মুখে যখন অর্থের প্রশংসা শুনছি তখন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক পরিমণ্ডলটাও কিন্তু ভীষণভাবে খেয়াল করার মতো।

মহাভারতে পুরুষার্থ-ত্রয়ীর মধ্যে অর্জুন যখন অর্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করছেন, মনে রাখতে হবে, সেই প্রতিষ্ঠা তাঁকে করতে হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের প্রতিপক্ষতায়। যুধিষ্ঠিরই মহাভারতীয় সমাজের প্রধান প্রতিভূ। আমরা বনপর্বেও দেখেছি, আবার শান্তিপর্বেও দেখেছি যে, যুধিষ্ঠির তাঁর সামনে উপস্থিত রাজ্যপাটের ভোগ-সুখের থেকেও শান্ত নিবৃত্তির জীবন বেশি পছন্দ করেন। রাজার রাজ্যপাট যে মোক্ষ-সাধনের তুলনায় কিছুই নয়, সামান্য বিষয়-ধর্মের চেয়ে নিবৃত্তিমূলক মুনিধর্ম যে অনেক শ্রেয়—এই মহাপ্রাণতার দর্শন ভারতবর্ষের সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং যুধিষ্ঠির সেই সমাজ-মানসের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কিন্তু এই দার্শনিক মানসিকতার প্রতিপক্ষতায় অর্থ এবং উত্থান-শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করা—যা আমরা বনপর্বে দেখেছি যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে অর্জুন-ভীম, এমনকি ভীষ্মেরও প্রতিবাদে—এই প্রতিবাদ-প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অর্থ বা সমগ্রিকভাবে অর্থশাস্ত্রের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সামাজিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে।

ভারতবর্ষের বিশাল ধর্মীয় এবং দার্শনিক পরিমণ্ডলের পাশাপাশি যেখানে এই অর্থ এবং তন্মূলক উত্থানশক্তির জয়কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অবধারিতভাবেই

যেটা হবার কথা, সেটা হল—অর্থলাভ যে নিছক অর্থের জন্যই এক নীতিবিহীন অর্থাভিসন্ধিতে পরিণত না হয়, সেই অর্থলাভের মধ্যে যেন ন্যায়-নীতি, ধর্মের সংযুক্তি থাকে। সায়নাচার্য পুরুষার্থসুধানিধিতে (২.৭) মহাভারত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাতে বলা আছে যে, অন্যায়ভাবে যখন অর্থ উপায় করা হয় তখন তাকে অর্থদূষণ বলে— অন্যায়েনার্জিতং দ্রব্যমর্থদূষণমুচ্যতে। 'অর্থদূষণ' শব্দটা মনুস্মৃতি কিংবা অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিতে খানিকটা পারিভাষিক বটে, কিন্তু এইভাবেও অর্থলাভের মধ্যে অন্যায়টুকু নির্দেশ করা যায়।

'ন্যায়-লব্ধ', 'ন্যায়-সঞ্চিত', 'যথান্যায়-সঞ্চিত'—এই সব শব্দগুলি 'অর্থে'র বিশেষণ হিসেবে বারংবার মহাভারতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি অর্থলাভের ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজন ব্যাপারটাই যেহেতু বড় হয়ে ওঠে, তাই স্বার্থের তাগিদে অন্যের অনিষ্ট যাতে না হয় সেদিকেও বেশ কড়া নজর ছিল মহাভারতের সামাজিকদের। শান্তিপর্বে আমরা এক ব্যবসায়ী বৈশ্যের সন্ধান পাব, যিনি তাঁর জীবিকা উপার্জনের উপায় জানানোর সময় বলেছেন—কাউকে কোনও কষ্ট না দিয়ে অথবা খুব অল্প কষ্ট দিয়ে মানুষ যদি জীবিকা অর্জন করতে পারে তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ধর্ম।

মহাভারতে এই ধার্মিক বৈশ্যের নাম তুলাধার অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা। পরবর্তী বক্তব্যে সার্থকনামা এই বৈশ্যের কথাবার্তা ধর্ম এবং সমদৃষ্টির মাহাত্ম্যে এতটাই উজ্জ্বল যে, অর্থ নামক পুরুষার্থলাভের উপায় হিসেবে সেটাকে উদাহরণ বলে নেওয়াই যায় না। কোনও কোনও পণ্ডিত অর্থের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ দেখাতে গিয়ে এই তুলাধারের বক্তব্য টেনে এনেছেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে একজন ব্যবসায়ী যে অর্থলাভের চেষ্টা করে অথবা একজন রাজা যখন রাজসমৃদ্ধির জন্য অর্থলাভের চেষ্টা করেন, তখন ওই তুলাধারের বলা ধর্মের তুলনা হয় না এবং তার তাৎপর্যও থাকে না। তুলাধার নিজেই বলেছেন—বুড়ো, রোগী আর রোগাভোগা মানুষের যেমন বিষয়ে রুচি থাকে না, আমারও তেমনই অর্থ-কামে কোনও স্পৃহা নেই—তথার্থকাম-ভোগেষু মমাপি বিগতা স্পৃহা। ধর্মের এই মনোবৃত্তির সঙ্গে সদোত্থায়ী অর্থকামী রাজার ধর্মের মিল হয় না।

রাজার অর্থলাভের তাৎপর্যই যেখানে পৃথিবী-জয় এবং তার পরিপালনের মধ্যে, সেখানে কাউকে কষ্ট না দিয়ে বা খুব অল্প কষ্ট দিয়ে যে রাজধর্ম চলবে না, সেটা বেশ ভালই বলা যায়। মনু এক জায়গায় বলেছিলেন—বাপের সম্পত্তি পাওয়া, রাজার রাজ্যজয় এবং ব্যবসায়ী বৈশ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোনও পাপও নেই, অধর্মও নেই। কারণ রাজার ধর্মে রাজাকে রাজ্য জয় এবং শুল্ক গ্রহণের মতো কাজ করেই 'অর্থ' লাভ করতে হবে এবং একজন ব্যবসায়ীকে 'অর্থ'লাভের জন্যই লাভের অংশটা রাখতেই হবে। আর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার অর্থলাভ এতটাই স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে অধর্ম নেই কোনও এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তি রাজার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। মনু এইরকম সাত কিসিমের অর্থলাভের কথা

বলেছেন,—সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ—যার মধ্যে ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই অনুস্যূত এবং এই ধরনের 'অর্থ'লাভের সঙ্গে তুলাধারবর্ণিত ধর্মের কোনও তুলনা হয় না।

বস্তুত কৌটিল্য যে অর্থে 'অর্থ'কেই রাজাদের পরম পুরুষার্থ হিসেবে নির্ণয় করেছেন, সেখানে ধর্মের অনুষঙ্গ ন্যায়ের পথ ছাড়া আর কিছু নয়। একইভাবে মহাভারতে তুলাধারবর্ণিত 'ধর্ম' যে কখনও রাজার অর্থলাভের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, সে কথা অর্জুনই পরিষ্কার করে বলেছেন যুধিষ্ঠিরকে। অর্জুন বলেছেন—আপনি দেবাসুর যুদ্ধের কথাটাই ভাল করে ভেবে দেখুন। দেবতারা জ্ঞাতিবধ করেই সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। রাজা যদি অন্যের ধন হরণ না করেন, তা হলে যাগ-যজ্ঞ ধর্মকার্য কোনওটাই করা সম্ভব নয়। দেবতাদের আচারই বলুন, আর বেদের নির্দেশই বলুন, ব্রাহ্মণই বলুন আর ক্ষত্রিয়ই বলুন—সকলেই একভাবে ধনের মাধ্যমেই শ্রেয়োলাভের চেষ্টা করছেন।

যে দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে সব সময় অর্থ-কামসিদ্ধির উর্ধ্ব কোটিতে রাখা হয়, অর্জুন কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ কৌটিল্য-কথিত মনুষ্যবৃত্তির কোটিতে নিয়ে এসেছেন। পৌরাণিকেরা জানিয়েছেন—দেবতা এবং অসুরেরা একই বাপের ছেলে, বৈমাত্রেয় ভাই। দুই পক্ষের সামনেই স্বর্গরাজ্য জয়ের অভিসন্ধি ছিল। যেখানে দেবতারা কিন্তু ভাই বলে অসুরদের ছেড়ে দেননি। অসুর-ভাইদের সঙ্গে চিরকাল দ্রোহ আচরণ করেই দেবতারা স্বর্গরাজ্যের অধিকার টিকিয়ে রেখেছেন—দ্রোহাদ্ কিমন্যজ্ জ্ঞাতীনাং গৃহ্যস্তে যেন দেবতা। ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞ করা এবং দক্ষিণা গ্রহণ করার প্রবৃত্তিকে আজকে যাঁরা আত্ম-ভরণের অসদুপায় বলে গালগাল দেন, তাঁদের জানাই—এ কথা আমাদের পূর্বজরাও ভালভাবে জানতেন। যাগ-যজ্ঞের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী, সে সম্বন্ধে অর্জুনের বক্তব্য হল—ব্রাহ্মণরা তো অধ্যাপনার উদ্দেশ্য নিয়েই অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁরা অধ্যাপনা করেন টাকাপয়সার জন্য। সেই টাকাপয়সা দিয়ে তাঁরা নিজেরা যেমন যাগ-যজ্ঞ করেন, তেমনই তাঁরা যখন অন্যের যাজন-কর্ম করেন, তখন টাকাপয়সা উপায় করাটাই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ যাজন এবং অধ্যাপনার অর্থেই ব্রাহ্মণের জীবিকা চলে—যজনাধ্যাপন-প্রতিগ্রহৈ-র্ব্রাহ্মণো ধনমর্জয়েৎ।

দেবতা-ব্রাহ্মণদেরই যখন এই অবস্থা, তখন ভূমিপতি রাজার অর্থলাভের মধ্যে ক্ষমা, শম, দম—ইত্যাদি যে থাকবে না সেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। অর্জুনকে তাই বলতে হচ্ছে—রাজারা পরের কাছ থেকে যে ধন উপার্জন করেন, সেই ধনই তাঁদের সব কিছু। সবচেয়ে বড় কথা, এই ধন উপার্জনের ব্যাপারে পরের কোনও অপকার করা হয়নি, অথচ ধন আপনিই এসেছে—এ রকমটা কখনওই হয়নি—ন পশ্যামো'নপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বয়ম্। রাজারা নতুন ভূখণ্ড জয় করেন এবং জয় করার অব্যবহিত পরেই বলেন—এই ভূখণ্ড আমার, ঠিক যেন বাপের সম্পত্তি পাবার পর ছেলেমেয়েরা বলে—এ সম্পত্তি আমার। এই ভাবে রাজার উপার্জনের মধ্যে যদি তথাকথিত কোনও

অন্যায়ও থাকে, তবু এতে রাজার অধর্ম হয় না, রাজর্ষিরাও স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হন না, কারণ ধর্মশাস্ত্রকারেরা পরের ধন গ্রহণ করাটাকেই রাজার ধর্ম বলেছেন।

তবে এইভাবে যে অর্থ উপার্জিত হল, তা যে কোনও অবস্থাতেই রাজার ভোগ-সুখ-বিলাসের জন্য নয়, সেটাও পরিষ্কারভাবে অর্জুনের জবানিতেই বলা আছে। কৌটিল্যের ভাষা ব্যবহার করলে বলা যায়—অর্জুন এতক্ষণ যে কথা বলেছেন, তা হল পৃথিবীর লাভ-সংক্রান্ত, আর এ বার যেটা বলবেন, সেটা পালন সংক্রান্ত। অর্জুন বলেছেন, এই ভাবে যে ধন রাজার ঘরে জমে উঠল, সেই ধনই রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সমস্ত মানুষের কাজে লাগবে—এবং রাজকুলাদ বিত্তং পৃথিবীং প্রতিতিষ্ঠতি। রাজার ধন মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছবে—সে সম্বন্ধে মহাভারতের অর্জুন কিছু বলেননি বটে, তবে তার ধারণাটা পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং অর্থশাস্ত্রে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

পুরুষার্থের উপযোগিতায় রাজা এবং রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু, এবং রাজা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে এই ধর্ম শব্দের তাৎপর্যই বা কী সে কথায় যাবার আগে জানাই—মহাভারত এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যথাবিধি যে ভাবে অর্থলাভের কথা আছে তার মধ্যে 'এথিকস' বা 'মর‍্যালিটি'র অবকাশ খুব একটা নেই। মহাভারতে পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনা যখন করা হচ্ছে, ঠিক তার আগে ধৃতরাষ্ট্র কণিক নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে ডেকে আনেন। কণিকের উপাধি হিসেবে মহাভারতের কবি যে-শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তা হল— 'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমঃ' অর্থাৎ যিনি রাজনীতি-শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র সবচেয়ে বেশি ভাল জানেন। এখানে 'রাজশাস্ত্র' শব্দের অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—রাজশাস্ত্র হল দণ্ডনীতিশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র বলতে আমরা এখানে অবশ্যই কৌটিল্যের অর্থই ধরব অর্থাৎ পৃথিবীর লাভ এবং পালনের উপায়। কণিক যে কথাগুলি বলেছেন, মহাভারতের কবি তার নাম দিয়েছেন—'রাজশাস্ত্রার্থদর্শনম্' অর্থাৎ রাজশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের মূল কথা বা 'ফিলসফি'। আরও বলা হয়েছে—এই রাজশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের 'দর্শন' কিছু তীক্ষ্ণ অর্থাৎ এর মধ্যে ক্ষমা-দয়া ইত্যাদি কোমলতার কোনও স্থান নেই।

জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ভয়ঙ্কর কল্পনা মহাভারতের পাঠককে যেহেতু অসহায় পাণ্ডবদের ওপরে পূর্বাহ্নেই সমব্যথী করে তোলে, তাই কণিকের মত শুনে আমরা কষ্ট পাই। ভাবতে থাকি—এত নির্দয়, এতই কঠিন কি রাজার হৃদয় হওয়া উচিত কিন্তু ভবিষ্যতে যুদ্ধপর্বের শেষে যখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির তত্ত্ব শোনাচ্ছেন, তখন দেখা যাবে রাজনীতিতে দয়া, মায়া স্নেহের কোনও স্থান নেই। শুধু তাই নয়, রাজ্য এবং ধনলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে ধর্ম বা ন্যায়-নীতির ভাবনাটা এতটাই অন্যরকম, যা শুধু কণিক-নীতির সঙ্গেই মেলে না, মিলে যায় পূর্বে বলা অর্জুনের কথার সঙ্গেও।

পণ্ডিতেরা বলেছেন—ভীষ্মের বলা এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টিই Machiavellian ad-

vice-এ ভরা, যদিও এই অধ্যায়ের কথাগুলি ভীষ্ম নিজে বলেননি, তিনি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার সময় ঋষি ভারদ্বাজ এবং সৌবীর দেশের রাজার কথোপকথনটি উল্লেখ করেছেন—ভারদ্বজস্য সংবাদং রাজ্ঞঃ শত্রুঞ্জয়স্য চ। সৌবীররাজ পুরঞ্জয় ভারদ্বাজকে 'অর্থ-বিনিশ্চয়' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অর্থাৎ কী করে অর্থ লাভ ঘটবে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। সেই পুরাণো কথা আবারও এখানে ফিরে এসেছে, যা কৌটিল্যের মতের সঙ্গে মিলে যাবে। কী করে অলব্ধ বস্তুর লাভ ঘটবে, লব্ধ বস্তুকে কী করে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। এই অর্থ-সম্পত্তি লাভের উপায় জানাতে গিয়ে ভারদ্বাজ কিন্তু খুব কড়া রকমের দণ্ডনীতির উপদেশ দিয়েছেন—যা এক কথায় হৃদয়হীন এবং নৃশংস এবং যা সাধারণ ধর্ম এবং নৈতিকতার ধার ধারে না। এই হৃদয়হীনতা বা নৃশংসতা কৌটিল্যের সঙ্গেও মিলবে বটে, কিন্তু কৌটিল্যের সঙ্গে মেকিয়াভেলি ভারদ্বাজ বা কণিকের তফাত আছে। যে কোনও উপায়েই রাজা অর্থলাভের চেষ্টা করুন, রাজাও কিন্তু ধর্মশাসনের ঊর্ধ্বে নন।

ভরদ্বাজের 'অর্থ-বিনিশ্চয়' শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাগল হবার জোগাড় হল। তিনি বললেন—এ সব কী শোনালেন পিতামহ! এ তো অধর্মটাই ধর্ম হয়ে গেল আর ধর্ম হয়ে গেল অধর্ম—অধর্মে ধর্মতাং নীতে ধর্মে চাধর্মতাং গতে। আপনি যা বলেছেন, তা তো নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। রাজাদের যা করা উচিত বলছেন, সে তো প্রায় দস্যুর মতো ব্যবহার এবং এই ব্যবহার আমরা বর্জন করতে চাই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি মূর্ছা যাব, আর ধর্ম বস্তুটাও আমার একেবারে শিথিল হয়ে গেল—সংমুহ্যামি বিষীদামি ধর্মো মে শিথিলীকৃতঃ।

ভীষ্ম বললেন—দেখ বাপু! আমি এতক্ষণ যে সব কথা বলেছি, তা পূর্বতন ধর্মশাস্ত্র বা আগমশাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে বলিনি, এর মধ্যে আমাদের নিজস্ব তর্কযুক্তি আছে, প্রজ্ঞা আছে। পূর্বাচার্যরা সেটাকে ধর্ম বা আইন বলে ফতোয়া দিয়েছে, সে রকম একপেশে ধর্ম দিয়েই শুধু রাজার কাজ চলে না—নৈকশাখেন ধর্মেন রাজ্ঞো ধর্মো বিধীয়তে। রাজাকে সময় বুঝে নানা রকম বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে এবং কার্যসাধনে বুদ্ধিই হল রাজার শ্রেষ্ঠ উপায়।

ভীষ্ম যা বলেছেন, তা পর্যালোচনা করলে দাঁড়ায়—রাজাকে নিজের বুদ্ধিতেই চলতে হবে, যদিও প্রাচীন পরম্পরায় তাঁর সামনে করণীয় বিষয়ে উদাহরণ কিছু থাকবে। যাকে ধর্ম বলছি, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সেই ধর্ম বা আইনের কথা যেমন 'আগম' বা শাস্ত্রকথা থেকে নেমে আসে, তেমনই সৎ মানুষের আচার-ব্যবহার এবং সেই সেই শাস্ত্রে প্রবীণ আচার্যদের উপদেশ থেকেও রাজা তাঁর করণীয় কার্যের হদিস পাবেন। কিন্তু সবার ওপরে আছে তাঁর বুদ্ধি, যে বুদ্ধি দিয়ে রাজা নানা জায়গায় নানা ধর্ম আচরণ করবেন—ধর্মঃ প্রতিবিধাতব্যো বুদ্ধ্যা রাজ্ঞা ওতস্ততঃ।

পূর্বাচার্যদের বলা নিয়ম, শাস্ত্র, এবং রাজার প্রায়োগিক বুদ্ধি—এই সব প্রসঙ্গে যখন তুমুল আলোচনা চলছে, সেই সময় ভীষ্ম একটা দারুণ প্রশ্ন তুললেন। তিনি

বললেন—যাঁরা ধর্ম বোঝেন না, বা যাঁরা ধর্মের পরিপন্থী মানুষ,তাঁরা এতটাই বাস্তবজ্ঞানবর্জিত যে, তাঁরা ধর্মের অপলাপ করেন এবং তাঁরাই অর্থশাস্ত্রের প্রামাণিকতা নষ্ট করেন। পদে পদে অর্থশাস্ত্রের দোষ তাঁরা দেখাতে চান যেন, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান মোটেই ভাল জিনিস নয়। তাঁরা নিজের বিদ্যার সুখ্যাতি করার জন্যই অর্থশাস্ত্রের দোষ বার করবার চেষ্টা করেন।

ভীষ্মের এই কথাগুলি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে এবং সেই আলোচনা থেকেই অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্কটাও পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসবে। কৌটিল্য ঠিক ভীষ্মের কথাটাই বলেছেন, তবে একটু অন্য রকম করে এবং কৌটিল্যর প্রসঙ্গটাও অন্য। নানা বিষয় নিয়ে প্রজাদের মধ্যে যেখানে মামলা-মোকদ্দমা চলে, প্রজারা সুবিচার চেয়ে যেখানে যায়, সেটাকে আমাদের ভাষায় আমরা ধর্মাধিকরণ বা কোর্ট বলি, আর কৌটিল্য সেটাকে বলেন ধর্মস্থ। এখানে বিয়ে থেকে আরম্ভ করে জমিজমা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, এমনকি ঋণ নেবার সুদ কষা—সবই আছে। এখানে আইন-আদালতের প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে সামান্য আলোচনার পরেই কৌটিল্য বলেছেন—ধর্ম (পূর্বপ্রণীত মনু প্রভৃতির লেখা ধর্মশাস্ত্র, আইনের বই), ব্যবহার (রাজশাসন এবং সাক্ষীদের কথা), সংস্থা (লোকাচার) এবং ন্যায় অর্থাৎ রাজা নিজের বুদ্ধি দিয়ে যেটা ন্যায় বলে মনে করছেন—এই চাররকম উপায় অবলম্বন করে যে রাজা শাসন পরিচালনা করেন, তিনি সার্বভৌম সম্রাট পদবি লাভ করতে পারেন।

কৌটিল্য আরও বলেছেন, সিদ্ধান্ত নেবার সময় রাজার পূর্বে তৈরি আইন (রাজশাসন) সাক্ষীদের কথা, এবং লোকাচার যদি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ ঘটায়, তবে ধর্মশাস্ত্রকেই প্রমাণ বলে মানতে হবে। কিন্তু সব কিছু বিচার করে রাজা যেখানে নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটি ধর্মসঙ্গত বিধান দিচ্ছেন এবং সেখানে যদি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধও ঘটে তবে 'রাজন্যায়' অর্থাৎ রাজার বুদ্ধিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হবে, ধর্মশাস্ত্রের বিধান সেখানে খাটবে না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে—একটা গোলমাল আছে। ভীষ্মের কথা থেকেও বোঝা যাচ্ছে, কৌটিল্যের কথা থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যান্য শাস্ত্র বা যাকে আমরা 'ডিসিপ্লিন' বলি তার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের একটা সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধটা ইতিবাচকও বটে নেতিবাচকও বটে। ভীষ্ম যখন বললেন—দোষদর্শীরা শাস্ত্রের অপলাপ করে এবং অর্থশাস্ত্রকে অসমীচীন বলে মনে করে, তখন কিন্তু এই দোষদর্শী ব্যক্তিরা কারা, তাঁদের পরিচয় বা তাঁদের নাম ভীষ্ম বলেননি। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে চেঁচিয়ে উঠে বললেন—এই দোষদর্শীরা হলেন তাঁরাই, যাঁরা প্রচার করেন—ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ হলে তেমন অর্থশাস্ত্রের বচন গ্রাহ্য করার দরকার নেই—মুক্তন্তি, ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমর্থশাস্ত্রং নাদর্তব্যমিতি যে বদন্তি।

নীলকণ্ঠের এই স্পষ্টোচ্চারিত ভাষ্য থেকেই বোঝা যায়—অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে

ধর্মশাস্ত্রের একটা বিরোধ চলে আসছে চিরকাল ধরে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, ধর্মশাস্ত্র বলতে কেউ যেন আবার কোনও ধর্মগ্রন্থ না বোঝেন। এক সময় এক দুলালি ধরনের পণ্ডিতম্মন্য মনুসংহিতাকে প্রায় ঋগ্‌বেদসংহিতার পর্যায়ে ফেলে এমন তর্ক করেছিলেন যে, তাঁকে গালাগালি দিতেও মায়া লাগছিল। বস্তুত ধর্ম ব্যাপারটা এখানে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যর ধর্ম নয়, এমনকি যে ধর্ম মানুষকে ত্যাগ-বৈরাগ্য-চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়, সে ধর্মও এখানে 'ধর্ম শব্দের আওতায় পড়ে না। ধর্ম এখানে অনেকটাই সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র অর্থাৎ সমাজে বাস করতে গেলে এটা করতে হবে এবং এটা করা যাবে না—এই ধরনের বিধি-নিষেধাত্মক সিদ্ধান্ত যেখানে প্রায় আইনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনই তাকে বিশেষ অর্থে আমরা 'ধর্ম বলব। প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলিই এখানে সমাজ-ধারণের প্রথম 'ডাইজেস্ট' হিসেবে গণ্য হতে পারে। ঠিক তার পরেই এসেছে 'ধর্মশাস্ত্র' যাকে আমরা অন্য নামে স্মৃতিশাস্ত্রও বলে থাকি। যেমন মনু-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদি।

ধর্মসূত্রগুলি প্রধানত গদ্যে অথবা গদ্য-পদ্যের মিশ্র ভাষায় লেখা। সেখানে ধর্মশাস্ত্রগুলি মহাভারত-রামায়ণের মতো অনুষ্টুপ্ ছন্দে পদ্যে লেখা। ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের বিষয়বস্তুতে খুব বেশি তফাত নেই, যদিও প্রথমটি সংক্ষিপ্ত এবং প্রধানত বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্মে স্থিত মানুষের পরিবার-পরিজনের পালন তথা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়েই বেশি আলোচনা করেছে। ধর্মসূত্রগুলির তুলনায় ধর্মশাস্ত্রগুলি অনেক বিশদ এবং তার বিষয়গুলি ধর্মসূত্রের ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। সমস্যা এবং তার সমাধান প্রচুর থাকায় একজন রাজার পক্ষে আইনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন সহজ হত, তেমনই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে রাজার কর্তব্যগুলি নির্দিষ্টভাবে থাকায় খানিকটা 'legislative elements'র হদিসও পাওয়া যাবে। ধর্মসূত্রে এটা সম্ভব নয়।

ধর্মশাস্ত্রের যে বিপুল সম্ভার আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে, তা আমাদের সার্বিক শাসনের আইন হলেও, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই রাজধর্মের কথা আছে, দণ্ডনীতির কথাও আছে। কোনও সন্দেহ নেই, ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত এই অংশগুলিই প্রধানত অর্থশাস্ত্রের পরিসর।

রাজাদের ক্ষমতা, অধিকার, সুবিধা এবং দায়িত্ব নিয়ে অর্থশাস্ত্রের যে বিস্তারিত আলোচনা আছে ধর্মশাস্ত্রে তা নেই, কিন্তু প্রত্যেকটি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে রাজধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কৌটিল্যের পূর্বযুগেও আলোচিত হয়েছে, ফলে অর্থশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ বলেই মানতে হয়। লক্ষণীয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ধর্মই কিন্তু পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান, কিন্তু জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে কামের মূল্য এতটাই যে, কামসূত্রের পরিসরে কামই প্রধান পুরুষার্থ। একইভাবে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের বিরোধে কৌটিল্য যতই ধর্মশাস্ত্রকে বড় করে দেখুন, অর্থশাস্ত্রের পরিসরে অর্থই কিন্তু প্রধান

লক্ষ্য। নিজের লক্ষ্যবস্তু প্রতিষ্ঠার জন্য কৌটিল্য কিন্তু ধর্মের ওপরেও রাজার জন্য একটা ফাঁক রেখে দিয়েছেন, যাকে তিনি বলেছেন 'রাজন্যায়' আর ভীষ্ম যাকে বলেছেন রাজার প্রজ্ঞা—'বুদ্ধি-সংজননো ধর্মঃ'।

ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে যাঁরা অতি বিখ্যাত—যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি—তাঁরা প্রত্যেকেই ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের বিরোধে ধর্মশাস্ত্রের পক্ষপাতী হয়েছেন। বারংবার একবাক্যে তাঁরা জানিয়েছেন যে, বিধান দেবার সময় যদি ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের বিধানকেই বলবান বলে মানতে হবে—অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ। পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল হাজারা এই বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। ধর্মশাস্ত্রকারদের নানা বচন এবং বিজ্ঞানেশ্বর, দেবন ভট্ট এবং শূলপাণির মতো বিখ্যাত টীকাকারদের ব্যাখ্যা-প্রমাণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটলে ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য বা অধিক প্রামাণিকতার কথা আসবে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত অর্থশাস্ত্রের তুলনায়। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে যে রাজধর্ম, দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনা আছে, সেগুলির চেয়ে ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য বেশি। এখানে অর্থশাস্ত্র বলতে শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি বা কৌটিল্যের লেখা অর্থশাস্ত্রকে বোঝায় না। বোঝায় সেইটুকু, যতটুকু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই রাজনীতির অংশ বা প্রসঙ্গ আছে।

কৌটিল্য এবং তাঁর পূর্বাচার্যদের লেখা অর্থশাস্ত্রের বর্গীকরণই হয়েছে আলাদাভাবে এবং তা হয়েছে অতি প্রাচীনকালে। ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিকে বলা হয় স্মৃতি আর অর্থশাস্ত্রকে বলা হয় উপবেদ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত যে রাজনীতিশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র সেগুলিও স্মৃতি নামেই চলে। মিত্রমিশ্র তাঁর বীরমিত্রোদয় নামক গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এইরকমই লিখেছেন—অর্থশাস্ত্রং চাত্র ধর্মশাস্ত্রান্তর্গতমেব নীতি-ব্যবহারশাস্ত্ররূপম্ গৃহ্যতে। ঔশনস্যাদ্যর্থশাস্ত্রস্য অনেনৈব নিরস্তত্বাৎ।

কৌটিল্য অবশ্য ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র দুটোকেই ইতিহাসের মধ্যে ফেলেছেন। আমাদের প্রাচীন মতে রামায়ণ-মহাভারতকেই ইতিহাস বলে বলা হয়েছে, কৌটিল্য কিন্তু ইতিহাসের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। কৌটিল্য বলেছেন—দিনের শেষ ভাগে রাজা ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করবেন। সেই ইতিহাস কী? না, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রও এক ধরনের ইতিহাস।

ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের যেমন একটা ভালরকম পার্থক্য পাওয়া গেল, তেমনই পার্থক্য আছে আরও কতগুলি বিষয়ের সঙ্গে। আমরা এখন যাকে 'বিষয়' বলি, সেকালে বিষয়গুলিকে বলা হত 'বিদ্যা'। লক্ষ করে দেখবেন—মহাভারতের শান্তিপর্বে যখন ভীষ্মের গুণ গাওয়া হচ্ছে, তখন কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—চতুর্বিদ্যা অর্থাৎ চার রকমের যে বিদ্যা আছে, তা তুমি সব জান—চাতুর্বিদ্যে চ যে প্রোক্তাশ্চাতুর্হোত্রে চ ভারত। আবার কৃষ্ণ যখন উদ্যোগপর্বে শান্তির দূত হয়ে কৌরবসভায় যাচ্ছেন, তখন

তাঁকেও 'চাতুর্বিদ্য' অর্থাৎ চার রকমের বিদ্যায় কুশল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন আমাদের জানা দরকার হল—এই চতুর্বিদ্যা কী কী?

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বলা হয়েছে—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি—এই চারটে হল বিদ্যা। এর মধ্যে একমাত্র 'দণ্ডনীতি' শব্দটি ছাড়া আর প্রত্যেকটি শব্দই পারিভাষিক। আন্বীক্ষিকী বলতে কোনও টীকাকার বলেছেন—অর্থবিদ্যা, যেটাকে আরও সহজ করে বলা যায় যুক্তি-তর্ক-দর্শন। ত্রয়ী মানে তিন বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ। অথর্ববেদকে অনেকেই বেদের মধ্যে ধরতেন না। এই বেদের মধ্যে মারণ-উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদি মানুষের অপকার-সাধক কিছু অংশ থাকার জন্যই হোক অথবা অপেক্ষাকৃত পরের যুগে লেখা হয়েছে বলেই হোক, বেদ বলতে বোঝায় ত্রয়ী, তিন বেদ। বার্তা হল মোটামুটি এখনকার অর্থনীতি শব্দের প্রতিরূপ। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, কর, খনি—এ সব হল বার্তার পরিসর। এখনকার অর্থে এটা অর্থনীতি হতে পারে, কিন্তু কোনওভাবেই একে অর্থশাস্ত্র বলা যাবে না।

কৌটিল্য চতুর্বিদ্যার বিষয়ে তাঁর পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করেছেন। বলেছে—মনু অথবা মনুর মতাবলম্বীরা তিনটি বিদ্যা স্বীকার করেছেন—ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি, কারণ আন্বীক্ষিকী বা দর্শন-যুক্তির ব্যাপারটা তাঁদের মতে ত্রয়ীর মধ্যেই ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। বস্তুত সেকালের দিনের সবচেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয় ছিল বেদ। বেদ পড়া এবং দৈনন্দিন জীবনে যাগ-যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা ঠিক রাখবার জন্য ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে শব্দকোষ, ছন্দ থেকে জ্যোতিষ সব পড়তে হত। এত পড়াশুনোর ফলে মনের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা, নানা যুক্তি কাজ করতে থাকে। তাতেই দার্শনিকতা তৈরি হয়। এই দার্শনিকতার প্রকাশ ঘটেছে বেদের অসংখ্য মন্ত্রে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এবং উপনিষদে। এমনকি রামায়ণ-মহাভারতের মতো ইতিহাসগ্রন্থকে এবং অবশ্যই অথর্ববেদকেও ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত করেছেন কৌটিল্য। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থপাঠের পরোক্ষ ফল যেহেতু তর্ক, যুক্তি, দার্শনিকতা, তাই বোধহয় মনুমতাবলম্বীরা আন্বীক্ষিকীকে ত্রয়ীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেছে—ত্রয়ীবিশেষো হি আন্বীক্ষিকীতি।

কৌটিল্যের পূর্বাচার্য বৃহস্পতি দুটি মাত্র বিদ্যা স্বীকার করেন—বার্তা এবং দণ্ডনীতি অর্থাৎ 'ইকোনমিকস্' এবং 'সায়েন্স অব্ গভর্নমেন্ট'। তাঁর মতে যিনি এই দুনিয়ার হালচাল, লোকাচার জানেন, অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, যিনি ইকোনমিকস্ এবং পলিটিকসটা ভাল জানেন, তাঁর কাছে বেদবিদ্যা এবং দার্শনিকতা তাঁর নিজেকে রক্ষা করার একটা উপায়মাত্র। লোকে যাতে তাঁকে নাস্তিক-টাস্তিক না বলে সেইজন্য বেদ এবং দার্শনিকতার রক্ষাকবচ তাঁকে পরতে হয়। এমনিতে ওটা কোনও বিদ্যার মধ্যেই আসে না,—ওটা একটা আবরণ—সংবরণমাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদঃ।

গৌতম যখন তাঁর ধর্মসূত্র রচনা করেছিলেন, তখন ত্রয়ী আর আন্বীক্ষিকীকেই তিনি শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন (গৌতমধর্মসূত্র ১১-২)। কিন্তু বৃহস্পতির নীতিতে প্রায় লোকায়তিকভাবে এই দুটি বিদ্যাকে একেবারে অপ্রতিভ করে দেওয়া হল।

কৌটিল্যের আরেক পূর্বাচার্য শুক্রাচার্যের মতে—বিদ্যা হল একটিই এবং তা হল দণ্ডনীতি। কারণ আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা—সব কিছুর নির্ভর হল দণ্ডনীতি। দণ্ডনীতির সম্বন্ধে আগে আমরা সামান্য আলোচনা করেছি এবং সেখানে মহাভারতের যে মত উদ্ধার করা হয়েছে, তার সঙ্গে উশনা বা শুক্রাচার্যের সম্প্রদায়ের মত মিলে যাবে।

বিদ্যার সংখ্যা নির্ণয়ে কৌটিল্য কিন্তু মোটামুটি সংরক্ষণশীল। তিনি চতুর্বিদ্যাই স্বীকার করেন। তাঁর মতে চার রকম বিদ্যারই নিজস্ব জায়গা আছে, যেখানে যেটা প্রয়োজন, সেটা বেছে নিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, বিদ্যার সংখ্যা-নির্ণয়ে কৌটিল্য কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাননি। তাঁর সমসাময়িক কালে যে আদর্শ চলছিল—বেদ, ব্রাহ্মণ্য, এবং সমাজ—এর কোনওটাকে উড়িয়ে দিতে চাননি বলেই চতুর্বিদ্যা-স্বীকারের মধ্যে তাঁর নিজের কালের ছায়াটা ঠিক ধরা পড়েছে। চার রকমের বিদ্যাই কৌটিল্য স্বীকার করেন এই কারণে যে, একজন রাজাকে যদি ধর্ম এবং অর্থ দুটোই বুঝতে হয়, তবে আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ীরও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন বার্তা এবং দণ্ডনীতির—তাভির্ধর্মার্থৌ যদ্ বিদ্যাত্ তদ্‌বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্।

আন্বীক্ষিকী বলতে কৌটিল্য তিনটি দর্শনের নাম করেছেন। বলেছেন—সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত দর্শনের জ্ঞানই আন্বীক্ষিকী। আশ্চর্য ব্যাপার হল—যে তিনটি দর্শনের কথা কৌটিল্য বললেন, তার মধ্যে লোকায়ত অর্থাৎ যাকে আমরা চার্বাক বলি, সেই লোকায়ত দর্শন তো বেদ ঈশ্বর কিছুই মানে না, এমনকি সাংখ্য এবং যোগদর্শনও নিরীশ্বরবাদী। পণ্ডিতজনেরা অনেকে সাংখ্য-যোগকে সেশ্বর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে মোটের ওপর এরা বেদবাদী হলেও ঈশ্বরবাদী নয়। আর ঈশ্বরবাদী নয় বলেই এই দর্শনের প্রতিষ্ঠায় যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিশেষত ঈশ্বরবাদী আস্তিক দর্শনের খানিকটা প্রতিপক্ষতা থাকায় এই সব দর্শনের যুক্তি-তর্ক আরও ক্ষুরধার।

যদি বলা যায়, আস্তিক এবং ঈশ্বরবাদী দর্শনের মধ্যে কি যুক্তি-তর্ক যথেষ্ট নেই? আমরা বলব যথেষ্টই আছে, কিন্তু কৌটিল্য আন্বীক্ষিকীর মধ্যে ঈশ্বরবাদী দর্শনগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটাননি। তার কারণ, তিনি যখন চতুর্বিদ্যার অন্যতম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদের মর্যাদা স্থাপন করবেন, সেই স্থাপনার মধ্যেই আস্তিক এবং ঈশ্বরবাদী দর্শনগুলির স্থাপনা আপনিই হয়ে যাবে। কিন্তু সাংখ্য যোগ এবং লোকায়তের মধ্যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠার প্রতিপক্ষতা থাকায় এবং তার মধ্যে তর্ক-যুক্তির বহর বেশি থাকায় এটাই ধরে নিতে পারি যে—নির্দিষ্ট কোন দর্শন নয়, সাংখ্য-যোগ-লোকায়তও নয়। তর্ক-যুক্তি-দর্শনই হল আন্বীক্ষিকীর প্রাণ। যার জন্য অনেকেই আন্বীক্ষিকী বলতে সোজা কথায় তর্কবিদ্যা অথবা হেতুবিদ্যা বুঝেছে। আর আধুনিকেরা বলেছেন—Anvikshiki represents the whole of scholastic philosophy.

আমরা অবশ্য আন্বীক্ষিকী শব্দটাকে ঠিক যে অর্থে আধুনিককালে 'ফিলসফি'কে ফিলসফি' বলা হয় সেই অর্থে 'ফিলসফি' বলতে চাই না। বরঞ্চ তর্কবিদ্যা বা হেতুবিদ্যা

শব্দটায় আমাদের আপত্তি নেই। কারণ আন্বীক্ষিকীর স্বরূপ বলবার সময় কৌটিল্য নিজেই শব্দটাকে ভেঙে বলেছেন—হেতু দিয়ে যেটা বোঝা যায়—হেতুভিরন্বীক্ষমানা—সেটাই আন্বীক্ষিকী। মনুস্মৃতির টীকাকার আন্বীক্ষিকীকে তর্কবিদ্যা বললেও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার বিশ্বরূপ কৌটিল্যের 'হেতু'-শব্দটাকেই ব্যবহার করে বলেছেন— আন্বীক্ষিকী হল হেতুবিদ্যা যার মধ্যে তত্ত্বনিরূপণের সম্পূর্ণ এবং সম্যক দৃষ্টি আছে। এই দৃষ্টিতে দেখতে পেলে আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ তর্ক, যুক্তি, reasoning বা logic বলাই ভাল। আমরা এর আগে ভীষ্মের মুখে যে 'প্রজ্ঞার' প্রশংসা শুনেছি এবং পরবর্তী কালে কৌটিল্য যাকে রাজন্যায় বলবেন—সেই প্রজ্ঞা এবং রাজন্যায় হয়তো এই আন্বীক্ষিকীরই অঙ্গ।

আন্বীক্ষিকীর প্রয়োগ এবং উপযোগ দেখাতে গিয়ে কৌটিল্য বলেছেন—বেদত্রয়ীর কথাই বল আর কৃষি বাণিজ্য-সম্পর্কিত অর্থনীতির কথাই বল অথবা বল দণ্ডনীতির কথা—সব ব্যাপারেই রাজার যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি জোগাবে আন্বীক্ষিকী। ত্রয়ীবিদ্যার মূল পরিসর হল ধর্ম এবং অধর্ম। ধর্ম বলতে এখানে সামাজিক শৃঙ্খলা, আইন, আচার সবই বোঝা যাবে। অধর্ম এগুলির বিপর্যয়। সেই ধর্মাধর্ম ঠিক করতে হবে ত্রয়ী থেকে। অর্থ এবং অনর্থ হল বার্তাশাস্ত্রের বিষয়। এখানে অর্থ বলতে অর্থশাস্ত্র বোঝায় না কিন্তু। এই অর্থ—আগেই বলেছি—সোজা ইকোনমিক্স। মহাভারত বলেছে—পণ্য, আকর, খনি, বাণিজ্য, কৃষি এবং গবাদি পশুপালন বার্তাশাস্ত্রের অন্তর্গত অর্থের বিষয়। আর অনর্থ হল এগুলির বিপর্যয়। চতুর্থ বিদ্যা দণ্ডনীতি থেকে যে দুটির বিচার হয়, তা হল—নয় এবং অপনয়। এই দুটি শব্দের বাংলা ভাল হয় না। বড় জোর নীতি এবং অনীতি পর্যন্ত বলা যায়, কিন্তু ইংরেজি করলে বরং কথাটা আসে ভাল—policy and impolicy.সন্ধি করব না বিবাদ বাধাব, অন্য রাজার আশ্রয় নেব, না চুপ করে বসে থাকব, ভাল কথা বলব না ঝগড়া করব, খানিকটা দিয়ে দেব না আক্রমণ করব—এসব তো দণ্ডনীতির সাধারণ ব্যাপার। নয়-অপনয়ও এইগুলোই। যেমন ক্ষমতাশালী প্রবল রাজার সঙ্গে সন্ধি করাটা নয়, কিন্তু প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাটা অপনয়। এক কথায় বলতে গেলে—dandaniti represents the science of politics and is coucerned specially with the application of the coerceive authority of the ruler.

কিন্তু ত্রয়ীর বিষয় ধর্মাধর্ম, বার্তার অর্থানর্থ এবং দণ্ডনীতির নয়-অপনয়—এই সব কিছুর মধ্যে কোনটা কখন খাটবে, কোনটা কখন উপযোগী বা অনুপযোগী হবে, সেটা তর্ক-যুক্তি দিয়ে বুঝতে সাহায্য করে আন্বীক্ষিকী। সেই প্রজ্ঞা এবং যৌক্তিকতার মাধ্যমে ত্রয়ী, বার্তার আর দণ্ডনীতির বলাবল বিচার করে মানুষের উপকার সাধন করেন রাজা। সেই আন্বীক্ষিকীর প্রজ্ঞাই তাঁকে বিপদে স্থির থাকতে সাহায্য করে এবং সম্পদে বিহ্বল করে না। এই আন্বীক্ষিকীই তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর কথাবার্তা এমনকি তাঁর ক্রিয়াকর্মের মধ্যেও দক্ষতা সৃষ্টি করে। কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকীই প্রদীপ শিখার

মতো রাজার শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ের ওপর আলো ছড়িয়ে দেয় এবং সমস্ত কাজে তাঁকে উপায়ও বাতলে দেয়। সমস্ত ধর্মের আধার এই আন্বীক্ষিকী।

কৃষি-পশুপালন, বাণিজ্য, ধান, সোনা এগুলি বার্তাশাস্ত্রের বিষয় বটে, তবে এই তৃতীয় বিদ্যাটি সম্পূর্ণভাবেই দণ্ডনীতি-নির্ভর। কারণ দণ্ডনীতি সম্যকভাবে প্রযুক্ত হলে রাজকোশে অর্থ বাড়ে। রাজকোশে অর্থ বাড়লে নিজের রাজ্যের মানুষকে নানা উন্নয়নমূলক কর্মের মাধ্যমে খুশি রাখা যায়। আর দণ্ডনীতি উপযুক্ত প্রয়োগে যেমন কৃষি-বাণিজ্য ঠিকভাবে চলে, তেমনই পররাষ্ট্রের শত্রুকেও দমিত করে রাখা যায়।

এই যে চতুর্বিদ্যার কথা বলা হল, এদের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের পার্থক্যটা জলের মতো পরিষ্কার। আধুনিকেরা যাকে অর্থনীতি বলেন, প্রাচীন মতে তা বার্তাশাস্ত্র—যার বিষয় কৃষি, বাণিজ্য-পশুপালনাদি। শুধু ধন উপার্জন কিন্তু অর্থশাস্ত্রের বিষয় নয়। অলব্ধ ভূমির লাভ, যা লব্ধ হয়েছে তার পরিরক্ষণ, যা রক্ষিত, তার বৃদ্ধি এবং বেঁচে যাওয়া বাড়তি জিনিসকে উপযুক্তপাত্রে ন্যস্ত করাটাই শুধু অর্থশাস্ত্রের বিষয়। এবং এই অর্থশাস্ত্রেরই আরেক নাম দণ্ডনীতি, কেননা পণ্ডিতেরা দণ্ডনীতিকেই science of politics বলেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়—অর্থশাস্ত্রের থেকে ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ বেশি বলবান—এই শ্লোকের মিতাক্ষরা টীকায় 'অর্থ' শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে, পণ্ডিতদের মতে তা ঠিক হয়নি। আধুনিকেরা যেটাকে অর্থনীতি বলেন, মিতাক্ষরার টীকাকারও অর্থ বলতে তাই বুঝেছেন। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য আগে বলেছি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় নয় এবং অপনয়ের জ্ঞান, অর্থাৎ দণ্ডনীতির জ্ঞান অর্থাৎ political training and skill. ধর্মশাস্ত্র ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত, কিন্তু তা দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কৌটিল্য বলেছেন—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, এবং বার্তাকে যে নীতি ঠিক ঠিক চালায়, যে বিদ্যা এই তিন বিদ্যাকে রক্ষা করে, সেটাই হল দণ্ড। সেই দণ্ডই অলব্ধ-লাভের সাধন। সেই দণ্ডই লব্ধ বস্তুর রক্ষণের উপায়। সেই দণ্ডই বাড়তি জিনিসকে উপযুক্ত কাজে লাগানোর মাধ্যম। কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটি পরিষ্কার করতে গিয়ে—'পৃথিবীর লাভ এবং পালনের উপায়'—বলে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দণ্ডনীতির কোনও তফাত নেই। অর্থশাস্ত্রই দণ্ডনীতি।

কাজেই মহাভারত যখন বলে—দণ্ডনীতির বিপর্যয় হলে ত্রয়ীবিদ্যা লোপ পাবে, তখন বুঝতে হবে—ত্রয়ীবিদ্যার ভিত্তি যে চাতুর্বর্ণ্য-চতুরাশ্রমের তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা ভেঙে যাবে অর্থশাস্ত্র না জানলে। একই ভাবে অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতির নয়-অপনয় না জানলে কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনের বার্তাশাস্ত্রও ভেঙে পড়বে রাজার অজ্ঞানতায়। আর দণ্ডনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুস্থিতি না ঘটলে বিদ্বান ব্যক্তির তর্ক-যুক্তি-প্রজ্ঞাও ব্যাহত হয়। অর্থশাস্ত্র তাই এই তিন বিদ্যার রক্ষক শাস্ত্র। মহাভারত বলেছে—যে রাজ্যের প্রজারা নিজেদের ধন-সম্পত্তির সঞ্চয় লুকিয়ে রাখে না এবং যারা নয় এবং অপনয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, সেই রাজ্যের রাজা হলেন শ্রেষ্ঠ

রাজা। একবার ভেবে দেখুন, রাজা নয়, প্রজারাই যেখানে দণ্ডনীতির নয়াপনয় অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র জানেন সেই রাজ্যের রাজা হওয়াটা কতটা সৌভাগ্যের।

প্রজার অবস্থাই যদি এমন নয়াপনয়ের ঔচিত্যে পূর্ণ থাকে, সেখানে রাজার কথাটা বলি। যে চতুর্বিদ্যার কথা বলা হল, সেই আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতিকে কিন্তু যে কোনও রাজা বা রাজপুত্র বা যে কোনও শাসকের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে রাখা হয়েছে। ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্রের উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিদ্বান মানুষের কাছ থেকে আন্বীক্ষিকী (যাকে পণ্ডিতেরা ফিলসফি বলেছেন) এবং ত্রয়ীবিদ্যা শিক্ষা করবে ব্যবসা-বাণিজ্য-পশুপালন-কৃষি ইত্যাদি শিখবে সেই সেই বিভাগের শাসক-অধ্যক্ষের কাছ থেকে এবং দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র শিখবে যাঁরা বলেন ভাল এবং করেন ভাল এমন পোলিটিক্যাল থিওরিস্ট এবং পোলিটিশিয়ানদের কাছ থেকে—দণ্ডনীতির্বক্তৃ-প্রযোক্তৃভ্যঃ। প্রবক্তা এবং প্রযোক্তার পার্থক্যটা থিওরি এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে।

এমন একটি অর্থশাস্ত্রজ্ঞ রাজপুত্র বা রাজা পাওয়া গেলে আমাদের প্লেটো-সক্রেটিস সংবাদ স্মরণ করতে হবে—Until philosophers are Kings or the Kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy and political greatness and wishdom meet in one and these commoner natures who follow either to the exclusion of the other are compelled to stand aside, cities will never cease from ill–no, nor the human race as I believe–and then only will our state have a possibility of light, and behold the light of the day,,,

চার

সৃষ্টির প্রথম পর্বে রাজা বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। যতদিনে মানুষ সংহত হয়েছে, ছোট্ট ছোট্ট পরিবার যখন একটা বৃহৎ রূপ ধারণ করেছে, তখন থেকেই রাজার ধারণা বা রাষ্ট্রের ধারণাও আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। আমাদের প্রথম সাহিত্য যেহেতু বেদ, অতএব বেদ এবং তার পরিকর গ্রন্থগুলি থেকেই আমাদের প্রাচীনতম রাষ্ট্র-চেতনার অনুসন্ধান করতে হবে।

ঋগ্‌বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদের যুগের সমাজ বলতে বোঝাত কতগুলি পরিবারকে। সমাজের এই পারিবারিক ভিত্তি থেকে আমরা তিনটি শব্দ পাই, যেগুলির নাম 'জন', 'বিশ্' এবং 'জন্মন'। সৌভাগ্যের বিষয়, একটি ঋক্-মন্ত্রের মধ্যেই তিনটি শব্দ অনুক্রমে লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন যে, বৈদিক যুগের সামাজিক গঠনের প্রথম ইতিহাস এই মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ঋক্-মন্ত্রটিতে বলা আছে— যে ব্যক্তি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতাহুতি দেয় সে তার পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেই শুধু নয়, সে তার 'জন', 'বিশ্' এবং 'জন্মের' সঙ্গে অন্ন এবং ধন লাভ করে—স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈ র্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।

এই ঋকে পুত্র-পরিবার আত্মীয়-স্বজনের কথা (পুত্রৈঃ, নৃভিঃ) আলাদাভাবে বলা থাকায় পণ্ডিতেরা বলেছেন—'জন্মন' বলতে বোঝায় একটা ছোট্ট গ্রাম, যে গ্রামের মানুষেরা পিতৃ-পিতামহের পরম্পরায় ভিন্ন কিংবা একান্নবর্তী হয়ে একত্র বসতি করেছে। 'জন্ম'-সূত্রে বাঁধা এইরকম কতগুলি গ্রাম সাধারণ আত্মীয়তার সূত্র ধরে জন্ম দিয়েছে 'বিশে'র। সংস্কৃতে বিশ্ একটি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ—যার একবচন 'বিশ্', দ্বিবচন 'বিশৌ', বহুবচন 'বিশঃ'। বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা, বসতি স্থাপন করা to enter, to settle. কাজেই বিশ্ বলতে 'বুঝব' 'settlement'. একেকটি বিশের প্রধান পুরুষকে বলা হত বিশপতি। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে এক সরস প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যাচ্ছে রাতের আঁধারে। সে চাইছে—সবাই যেন তখন ঘুমিয়ে থাকে। প্রেমিকার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনই শুধু নয়। সে চায় বিশপতিও তখন ঘুমিয়ে থাকুন—সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ (৭.৫৫.৫)।

অধিকাংশ বিশই তাঁর প্রধান পুরুষ বা একটি ভূমিখণ্ডের নামে নামাঙ্কিত হত। যেমন ঋগ্বেদের প্রার্থনা—হে দেবগণ! তোমরা তৃণস্কন্দের বিশ্গুলি রক্ষা কর—তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরিবৃংক্ত সুদানবঃ। (ঋ. বে. ১.১৭২.৩) তৃণস্কন্দ কোনও জায়গার নাম, যেখানে নুয়ে-পড়া তৃণভূমি আছে, আবার প্রধান পুরুষের নামেও বিশের পরিচয় পাওয়া যাবে। ঋগ্বেদ বলেছে—বশিষ্ঠ যখন তৃৎসুদের পুরোহিত নিযুক্ত হলেন, তখন তাদের বিশ্গুলির নাম ছড়িয়ে পড়ল—অভবচ্চ পুর এতা বশিষ্ঠ আদিত্তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত। (ঋ. রে. ৭.৩৩.৬)। হাইরিখ জিমার বলেছেন—বৈদিক বিশের প্রকৃতি শুধু ভৌগলিকতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখা যাবে না, বিশ্গুলিকে একেকটা সামরিক 'ইউনিট' হিসেবেও মেনে নেওয়া যেতে পারে। ঋগ্বেদের অনেকগুলি ঋক্ উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে প্রধান ঋক্টি হল—বিশং বিশং যুধয়ে সংশিশাধি—প্রত্যেকটি বিশকে তুমি যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর। (ঋ.বে.১০.৮৪.৪)।

আগে দেখেছি, কয়েকটি 'জন্মন'-এর সমষ্টিতে একটি বিশ্ তৈরি হয়, তেমনই কতগুলি 'বিশ্' একত্র করে একটি 'জন'-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই 'জন' হয়তো একটি tribe এবং জনপতি হয়তো একজন রাজা। বৈদিক, 'জন্মন', 'বিশ' এবং 'জন'এর সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল প্রাচীন রোমের জনগোষ্ঠীর বিভাগে। পণ্ডিতেরা লিখেছেন—there the smallest unit, gens, consisted of small number of families descended from a common ancestor; a number of these gens constituted a curia and ten curiae made a tribe. Vedic 'jana' probably corresponded with the tribe, 'vis' with the curia and 'janman' with the gen.

বৈদিক সমাজে একটি ছোট পরিবার বা গৃহের মধ্যে গৃহপতির যে মূল্য ছিল, ঠিক সেই মূল্য ছিল একজন গ্রামপতির। জিমার বৈদিক গ্রামকে একটি পরিবার এবং একটি জনগোষ্ঠী বা ট্রাইবের মাঝামাঝি রাখতে চেয়েছেন। তবে গ্রাম ব্যাপারটাকে 'বিশ'-এর

একটি ছোট সংস্করণ ভাবাই ভাল। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে একটি গ্রামের সুস্থিতি তেমন ছিল না, জমি দখলের জন্য অরণ্যে হাত পড়ত। তখন একটি সম্পূর্ণ গ্রামকে তার অধিপতির সঙ্গে চলতেও দেখা গেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে শর্যাত মানব তাঁর গ্রামটি সঙ্গে নিয়েই ঘুরছিলেন। এখানে গ্রাম অবশ্যই চলমান মনুষ্য-গোষ্ঠীর পরিচায়ক। কিন্তু আর্যরা একটু থিতু হতেই গ্রামও তখন থিতু হয়েছে।

একটি গ্রামে গ্রামপতি বা গ্রামণীর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। টীকাকারেরা গ্রামণীকে গ্রামের নেতা বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তার যে প্রভাব কত ছিল তা বোঝা যাবে রাজার অভিষেক উৎসবে। 'জন্মন' বা গ্রাম যেমন বৈদিক সমাজের সবচেয়ে ছোট 'ইউনিট', তেমনই 'জন' হল সবচেয়ে বড় 'ইউনিট', যার অধিপতিকে রাজা নামে অবশ্যই ডাকা যায়। ভরত যাঁর নামে এই ভারতবর্ষ তাঁকেও এক জনগোষ্ঠীর নায়ক বলেই সম্বোধন করা হয়েছে ঋগ্‌বেদে। স্বয়ং বিশ্বামিত্র এই ভারত জনের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন—বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্। (৩.৫৩.১২) এইভাবে যাদব জন পঞ্চ জন (পঞ্চজনাঃ, জনাসঃ) শব্দগুলিও অধিপতি বা গোষ্ঠী-নামে চিহ্নিত হয়েছে।

সমাজিক বিবর্তনকে যদি রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় তবে ঋগ্‌বেদের মধ্যে 'গোপা জনস্য', জনের রক্ষাকর্তা, অথবা 'গোপতির্জনস্য'—এই পংক্তিগুলিতে জনগোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হিসেবে জনপতিকে পাওয়া যাবে। এই জনপতির সঙ্গে রাজা নামক মানুষটির গভীর সম্পর্ক আছে, সেটা বোঝা যাবে, যখন দেখব একটি ঋক্-মন্ত্রে একটি জনের সুরক্ষার জন্য একটি জনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রার্থনা জানানো হচ্ছে—যূয়ং রাজানমির্যং জনায় বিভৃতস্টং জনয়থা যজত্রাঃ। (ঋ. বে. ৫.৫৮.৪) একজন রাজাই যে জনের অধীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাষ্ট্রেরও অধীশ্বর হন, তা ঋগ্‌বেদেই দেখা যাবে—যখন এক জনাধিপ সমস্ত শত্রুশাসন করে সিংহনাদ করছেন—আজ আর আমার কোনও শত্রু নেই, আমি আজ এই রাজ্যের অধীশ্বর। সমস্ত মানুষের ওপর (এখানে জন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) আমার কর্তৃত্ব, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঋগ্‌বেদে অনেকগুলি জন-জাতি এবং তাঁদের রাজাদেরও নাম আছে। ভরত, দ্রুহ্য, যদু, তুর্বসু, অনু, সৃঞ্জয়, ত্রিৎসু, সুদাস—এগুলো যদি জনাধিপতি রাজার নাম হয়, তবে পঞ্চাল, যাদব, বাহ্লিক, মদ্র—এই রকম সুনির্দিষ্ট কতগুলি জনজাতির যে নাম পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি প্রধানত স্থান-নামে চিহ্নিত। যাই হোক, এই জনাধিপতিই হলেন রাজা। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর রাজত্ব করার জন্যই যে রাজার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রমাণ পাব ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে। রাজার অভিষেকের সময় পুরোহিত সেখানে মন্ত্র পড়েন—মাননীয় দেবতারা! আপনারা এই ব্যক্তিকে শত্রুহীন করুন, ইনি যাতে প্রধান পুরুষের পদবী লাভ করেন, যাতে সবার ওপরে অধিকার পান এবং যাতে 'জনের' ওপর রাজত্ব করতে পারেন, আপনারা তা তরান্বিত করুন—ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজ্যায়।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ইতিহাস-পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আমরা যেমন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা আনবার জন্য রাজার সৃষ্টি হতে দেখেছি, বেদে কিন্তু তেমনটি নয়। বৈদিক আর্যরা যেহেতু নিজদের বাস-বিস্তারের কারণে ভারতবর্ষের পূর্বাধিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অথবা যেহেতু তাঁরা তাঁদের শত্রুস্থানীয় দাস বা দস্যুদের পর্যুদস্ত করে তবে স্বরাজ্য বিস্তার করেছেন, তাই রাজা সৃষ্টির বিষয়ে সেই চিরন্তন দেবাসুর দ্বন্দ্বের 'আর্কিটাইপ'ই (archetype) ব্যবহৃত হয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখতে পাচ্ছি—দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন এবং অসুরেরা দেবতাদের জয় করে নিয়েছেন সর্বতোভাবে দেবতাদের মধ্যে তখনও কোনো রাজা নেই। তখন পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্য দেবতারা নিজেরা সবাই মিলে আলোচনায় বসলেন। দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন—আমাদের কোনও রাজা নেই বলেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। আমরা বরং একজন রাজা মনোনীত করি—রাজানং করবামহা ইতি। তখন তাঁরা সোমকে রাজা হিসেবে মেনে নিলেন এবং সেই সোমের অধিনায়কত্বে সমস্ত দিক জয় করে নিলেন দেবতারা।

মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে মনু একটি পথ তৈরি করেছিলেন এবং হয়তো সেই পথই সামাজিক শৃঙ্খলার প্রথম পথ। এখানে জানিয়ে রাখি—যাঁরা মনুসংহিতার লেখককেই মানব-সমাজের প্রথম রাজা ভাবছেন, তাঁরা কিন্তু ভুল ভাবছেন। মনু নামে একটি মাত্র মানুষ ছিলেন না।

পুরাণগুলিতে দেখবেন স্বায়ম্ভুব মনু, প্রাচেতস মনু, রথন্তর মনু, স্বারোচিষ মনু, আরও কত সব মনু আছেন। তাঁদের একেকজনের ক্রিয়াকর্ম একেক রকম। মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে রাজধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসেবে যে মনুর নাম পাওয়া যাবে তিনি প্রাচেতস মনু। মনুসংহিতার মতো ধর্মশাস্ত্রের লেখক মনু হলেন, স্বায়ম্ভুব মনু। আর এই যাঁকে আমরা মনুষ্য-সমাজের প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসেবে দেখলাম, ইনি হলেন বৈবস্বত মনু। তিনি সূর্যস্বরূপ বিবস্বানের পুত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে—এই বৈবস্বত মনুই আমাদের প্রথম রাজা এবং তাঁর শাসনের পরিধি হল 'বিশ'ভুক্ত মনুষ্যেরা—মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যাহ তস্য মনুষ্যা বিশঃ।

মনুষ্যলোকের রাজা হিসেবে আরও একটি মানুষের নামও আমরা বেদ এবং ব্রাহ্মণে পাই। তাঁর নাম পৃথু। তাঁকেই নাকি প্রথম রাজা হিসেবে অভিষেক করা হয়—পৃথু-র্বৈ বৈণ্যো মনুষ্যানাং প্রথমো'ভিষিষিচে।

প্রথম রাজা হিসেবে যে দুটি নাম আমরা পেলাম, তাঁরা ঐশ্বরিকভাবে সৃষ্ট হয়েছিলেন নাকি অন্যভাবে সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতির চিন্তায় যে বস্তু দুটি প্রথম লাগে সে দুটি যেহেতু—মানুষ এবং ভৌগোলিক খণ্ড, তাই মনু এবং পৃথু শব্দ দুটিই প্রাচীন রাষ্ট্রভাবনার প্রধান ভিত্তি। মনু শব্দ থেকেই 'মানব', এমনকি মানুষ, মনুষ্য ইত্যাদি শব্দগুলিও 'মনু' শব্দের পরিধির মধ্যেই পড়ে। আর 'মনু'—ইনি ব্যক্তিগতভাবে বৈবস্বত মনু হলেও, সমস্ত মনুকেই আমরা লোকযাত্রার সমস্ত হিতকর্মে নিযুক্ত দেখব।

মনুরা প্রত্যেকেই একভাবে সমাজ-শাসক এবং এমনই তাঁদের সার্বিক প্রভাব যে, তাঁদের একজনের সময় অতিক্রান্ত হলে মন্বন্তর নামে তথাকথিত এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসে। অন্যদিকে পৃথুকে দেখুন। 'পৃথু' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ করে দিলেই হবে 'পৃথ্বী' এবং এই শব্দের উচ্চারণ একটু সহজ করে নিলেই হবে 'পৃথিবী'।

রাজ্য এবং রাজা সৃষ্টির পিছনে যে ঐশ্বরিকতা আছে, তার জন্য আমাদের বেশি কষ্ট করতে হবে না। মনুসংহিতার মতো ধর্মশাস্ত্রে রাজধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার আরম্ভেই বলা হয়েছে—এই পৃথিবীতে যখন রাজা ছিল না, যখন বলবত্তর মানুষের অত্যাচারে লোকে এদিক-ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন তাদের সবাইকে রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন—রক্ষার্থমস্য লোকস্য রাজানম্ অসৃজৎ প্রভুঃ। এ কথাগুলি প্রায় সিদ্ধান্তের মতো। কিন্তু সিদ্ধান্তটা কীভাবে হচ্ছে, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু মহাভারতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নটাই এত সুন্দর যে, তার উত্তর দিতে গিয়ে ভীষ্ম সোজাসুজি কথা বলতে পারছেন না। রাজার কথা বলার আগে তাঁকে রাষ্ট্রের কথা বলে নিতে হচ্ছে।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছেন—এই যে রাজা বলে শব্দটা শুনি সেই রাজার উৎপত্তি হল কী করে? মানুষের মতোই এঁদের দেখতে, মানুষের মতোই হাত-পা, মুখ-পিঠ, অস্থি-মজ্জা সব কিছু। সাধারণের মতোই এঁদের জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু কেমন করে এই রাজা হাজারো বুদ্ধিমান মানুষ আর মহা-মহা-শূর-বীরদের সাবহেলে নীচে ঠেলে রেখেছেন—বিশিষ্টবুদ্ধীন্ শূরাংশ্চ কথমেকো, ধিতিষ্ঠতি? আর কী আশ্চর্য এই রাজা নামের মানুষটা যদি ভাল থাকেন, খুশি থাকেন, তবে জগতের কারও কোনও কষ্ট নেই, সবাই সুখে আছে। আবার ইনি যদি, কষ্ট পান, ব্যাকুল হন, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত লোকই আকুল হয়ে পড়ে। এই যে একটা মানুষের ওপর জগতের সবার এত নির্ভরতা, এর কারণ খুব অল্প হবে বলে মনে হয় না।

ভীষ্ম বলতে আরম্ভ করলেন—শোন তাহলে, আগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে হল শোন। সে সব বহুকাল আগের কথা। তখন সেই সত্যযুগ চলছিল—যথা রাজ্যং সমুৎপন্নং যথা কৃতযুগে'ভবৎ। তখন রাজাও ছিল না, রাজ্যও ছিল না। দণ্ডও ছিল না, দণ্ডদাতাও ছিল না। সকলে নিজে নিজেই একধরনের শৃঙ্খলা পালন করে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলল না। মানুষের মধ্যে লোভ মোহ জন্মাল। একেক জনের মধ্যে প্রতিপত্তির নেশা এমনভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল—প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্মস্তেষামনীনশৎ।

মহাভারতের এই কথাই আরও পরিষ্কার করে বলেছে পুরাণগুলি। এখানে যে সত্যযুগের কল্পনা করা হয়েছে, তাতে মন্দ বলে কোনও জিনিসই নেই। সব কিছুই সেখানে ভাল, মানুষ ভাল, মন ভাল, সবার আচার-আচরণ চমৎকার। শোক-দুঃখ, মদ-মাৎসর্য, ধর্মাধর্ম কিছুই নেই। এই রকম এক নির্বিকার চৈতন্যের মধ্যে রাজারই বা কী প্রয়োজন। এই অদ্ভুত অবিকারী সুখের মধ্যে ইতিহাসের দৃষ্টি প্রোথিত করলে দেখা

যাবে—মানুষের তখন বাসস্থান বলে কিছু ছিল না। পর্বতের গুহা অথবা সমুদ্রতীরই ছিল মানুষের প্রথম আবাস। কিন্তু সত্যযুগ পালটে ত্রেতা যুগ আসতেই নানান জটিলতা দেখা দিল। আসলে শাস্ত্রকারেরা যুগক্ষয়ের মধ্যে যে ধর্মের ক্রমিক বিপর্যয় দেখেছেন, তা আসলে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির বিবর্তন।

কূর্মপুরাণ বলেছে—আগে অরণ্যজন্মা বৃক্ষগুলিই ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়, কিন্তু হঠাই তাদের মধ্যে লোভ দেখা দিল—কামলোভাত্মকো ভাবো তদা হ্যাকস্মিকো'ভবৎ। এই কামনা আর বাসনার ফলেই একদিন বৃক্ষের পুঁজি নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা খুব সাধারণ, যাযাবর আর্যজাতির আরণ্যক স্মৃতি এই কথাগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে। এক বনের খাবার শেষ হয়ে গেলে আরেক বনের আশ্রয় তখনও মিলছিল। কূর্মপুরাণ বলেছে যে, গাছের ছায়া আর বনের ফল অপ্রতুল হয়েছিল বলেই মানুষ বাড়ি বানাতে শিখল—চক্রুরাবরণানি চ। শিখল কৃষিকর্ম—বার্তোপায়ম্ অচিন্তয়ন্। ঠিক এই রকম কোনও সময়েই মানুষের মধ্যে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগত সম্পত্তির চেতনা জন্মাল। পুরাণ বলেছে—কালধর্মে মানুষের মধ্যে এমনই লোভ জন্মাল যে তারা জোর করে নদী, পাহাড়, জমি সব দখল করতে লাগল—ততস্তে পর্যগৃহ্নন্ত প্রসহ্য তু যথাবলম্।

সম্পদ এবং তার মালিকানা নিয়ে যে অর্থনৈতিক অভিসন্ধির কথা আধুনিকেরা চিন্তা করেন, তার প্রথম বোধটা বোধ হয় এসেছে জমি এবং স্ত্রীলোকের অধিকার থেকে। ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পর্যায় শব্দ কিন্তু ক্ষেত্র অর্থাৎ জমি। সংস্কৃত ভাষায় স্বক্ষেত্র বলতে যেমন নিজের স্ত্রী বোঝায় তেমনই পরক্ষেত্র বলতে বোঝায় পরস্ত্রী। এই জমি আর স্ত্রীলোকের অধিকার নিয়েই প্রথম সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা 'কেওস' তৈরি হয়। পরস্পরের জমি এবং স্ত্রীলোক নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি চলছে, তখন পুরাণের একটা কথা লক্ষ করার মতো। পুরাণ বলেছে—যাদের জমি এবং স্ত্রীলোক যথেষ্টই আছে, তারাও 'আরও চাই, আরও চাই'—এই রকম একটা চাহিদায় একে অন্যের জমি এবং স্ত্রীলোক জোর করে কেড়ে নিচ্ছিল—ততস্তা জগৃহুঃ সর্বা হ্যন্যোন্যং ক্রোধমুর্ছিতাঃ। আপ্তদারধনাদ্যাস্তু বলাৎ কালবলেন চ।।

একেই বলে বলবত্তরের ক্ষমতার প্রকাশ। জোর যার মুলুক তার। এই রকম এক চরম বিশৃঙ্খলা,যার সঙ্গে state of nature -এর তুলনা হতে পারে, এই বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলে পৃথু রাজার জন্ম হল। মহাভারতে বলেছে—কামনা এবং লোভের বশে মানুষের যখন কার্যাকার্য জ্ঞান চলে গেল, স্ত্রীলোকের মধ্যে কে গম্যা এবং কে অগম্যা—এ বোধ যখন লুপ্ত, কাকে কী বলা উচিত এবং কাকে উচিত নয়—এ সম্বন্ধে যখন ভাবনা কিছু রইল না, তখন সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল। এই শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হল বেদ-ব্রাহ্মণ্য, যাগ-যজ্ঞ—বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈব ননাশ হ।

লক্ষণীয়, চরম বিশৃঙ্খলার সময় বেদ-ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়ে যাবার কথা কিন্তু পুরাণকারেরা বলেননি। তাঁরা সমাজের চরম বিশৃঙ্খলার কথা বলেছেন এবং সেই বিশৃঙ্খলা প্রশমনের সূত্র ধরেই পৃথুর জন্মের কথা বলেছেন। যে বিশৃঙ্খলা থেকে

শৃঙ্খলার প্রতীক পৃথু জন্মেছেন, সেই বিশৃঙ্খলারও একটা প্রতীক আছে। সে প্রতীক মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে একই রকম। পৃথুকে পুরাণকারেরা ভগবানের অবতার বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি কিন্তু সেই পৃথুর জন্ম অধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ বেণ রাজা থেকে। অধর্ম মানে বিশৃঙ্খলা; বেণ সেই অধর্মের প্রতীক।

অনেকে এই অধর্ম পুরুষকেই আমাদের পৃথিবীর প্রথম রাজা বলে মনে করেন, কিন্তু রাজা হলেও বেণ হলেন অত্যাচারী পরধনকামী বলবত্তর ক্ষমতার প্রতীক। স্বেচ্ছাচার এবং লোভই দিল বেণের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ, বিশৃঙ্খলা বা অর্ধমই তাঁর প্রধান আকর্ষণ—স ধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভে ব্যবর্তত। ঠিক এই রকম একটা ব্যবহারই আমরা সম্পত্তি গ্রাস করা মানুষের মধ্যে পেয়েছি। নদী, পাহাড়, জমির অন্যায় দখলদারি এবং বলাৎকৃত স্ত্রী-হরণের মধ্যে যে আচরণ আমরা লক্ষ করেছি, তারই একটা প্রতীকী আচরণ আছে বেণের মধ্যে। বেণ ফতোয়া জারি করেছিলেন—আমার চেয়ে বড় কে আছে ভূমণ্ডলে, আমার চেয়ে বড়ই বা কে আছে, যাকে আরাধনা করা যায়—মত্তঃ কো'ভ্যধিকো'ন্যো'স্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ। সভ্যতার প্রথম লগ্নে, যখন রাষ্ট্র নেই, রাজা নেই, দণ্ড দেই, শৃঙ্খলা নেই তখন বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে যিনি নিজের শাসন চালাতে চান, তিনি কিন্তু রাজা নন, তিনি দুর্বলের ওপর বলবত্তের শাসন জারি করেছেন মাত্র। বাহুবলই তার ক্ষমতার উৎস, সুশৃঙ্খল কোনও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার ক্ষমতার উৎস নয়। বেণ সেই বলবত্তরের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যাই হোক, এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা এখন ঋষিদের একজোট হতে দেখছি। মহাভারত এবং পুরাণগুলি সমস্বরে বলেছে—বেণের বিরুদ্ধে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা একত্রিত হলেন—ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। তাঁরা বেণকে চরম সাবধানবাণী শুনিয়ে বলেছিলেন, তুমি যা করছ, তা ধর্ম নয়। তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল প্রজাপালন করা, অথচ তুমি প্রজাপতি হয়ে প্রজাদের সর্বনাশ করছ। ঋষিদের কথা শুনে বেণ অট্টহাস্য করেছিলেন। বলেছিলেন—ধর্ম। ধর্মের সৃষ্টি তো আমিই করেছি, আর ধর্ম সম্বন্ধে আর কারও কাছে আমার শোনার কিছু নেই। আমি ইচ্ছে করলে এই বসুন্ধরা দহন করতে পারি, জলে ভাসিয়ে দিতে পারি, আমিই সৃষ্টি করতে পারি. আমিই ধ্বংস করতে পারি। এখানে আপনাদের বিচার করতে হবে না—সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্যা বিচারণা। মনুসংহিতা বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলবত্তর পুরুষের এই সাহংকার অবস্থাটার নাম দেওয়া হয়েছে মাৎস্য-ন্যায়। জলের মধ্যে বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনই রাজা যদি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না দেন, তবে বলবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে এবং তার ধনসম্পত্তিও গ্রাস করে—বলীয়ান্ অবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে।

ঋষিরা বেণের কথা শুনে চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁরা একত্রিত হয়েছেন। বায়ুপুরাণ এই ঋষিদের নাম বলতে গিয়ে বলেছেন—মরীচি প্রমুখ ঋষিরা—ঊচুর্মহর্ষয়ঃ সর্বে মরীচি-প্রমুখাস্তথা। মহাভারত পুরাণের সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি আছে

তাঁরা বুঝবেন—মরীচি প্রমুখ হলেন লোকপিতা। সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে ব্রহ্মা প্রথম এঁদের সৃষ্টি করেছিলেন। এই ঋষিদের থেকেই জগতে লোকবিস্তার শুরু হয়। আধুনিক ভাষায় বলতে পারি এরা হলেন patriarchs. রাজা সৃষ্টির পিছনে এঁদের একটা বিরাট অবদান আছে। ঋষির নাম শুনলে যদি কারও ধৈর্যচ্যুতি হয়, তাঁদের মনে রাখা উচিত—প্রাচীন কালের tribe বা clan বলতে যা বোঝাত, সেই tribe এবং clan গুলি কিন্তু এই patriach দের ছত্রচ্ছায়াতেই থাকতেন। অতএব আমাদের মতে সমাজের ওই বিশৃঙ্খল অবস্থায় লোকপিতা বা patriach বা সমবেত হলেন বেণের বিরুদ্ধে।

একথা বলছি এই কারণে যে, সমস্ত পুরাণগুলিতে দেখা যাবে পৃথুর পূর্ববর্তী সময়ে কোনো সভ্যতারই বিকাশ ঘটেনি। এমনকি ভূমির কর্ষণযোগ্যতাও ছিল না, মাটি ছিল অসমান—বিষমাসীদ্ বসুন্ধরা। পৃথুর আগে গ্রাম-শহরের কোনও বিভাগ ছিল না, কৃষিকর্মও তেমন করে প্রচলিত হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্যও নয়—ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষি-র্ন বণিকপথঃ। ঠিক এই অবস্থায় কোথায় সেই মহাভারত কথিত ব্রাহ্মণ্য—যার অবলুপ্তিতে ভয় পাচ্ছে ঋষিরা, দেবতারা। এই অবস্থায় কোথায় যজ্ঞ, কোথায় ঋষি। অতএব আমরা ঋষি বলতে এই মরীচি প্রভৃতি patriach দেরই বুঝব। মহাভারত-পুরাণ বলেছে—ঋষিরা মন্ত্রপূত কুশের আঘাতে বেণকে ধ্বংস করলেন এবং তাঁর দক্ষিণ বাহু মন্থন করতে লাগলেন। এই মন্থনের ফলেই জন্মালেন পৃথু, পৃথিবীর প্রথম রাজা—আদি্রাজা মহারাজঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।

এখানে 'দক্ষিণ' এবং 'মন্থন' শব্দদুটিও লক্ষ করার মতো। দক্ষিণ শব্দটার অর্থ অনুকূল। আমরা মনে করি সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য থেকে শৃঙ্খলা আনবার পক্ষে যাঁরা অনুকূল ছিলেন, তাঁরাই তাঁদের বিশৃঙ্খল সমাজ মন্থন করে অর্থাৎ খুঁজে-পেতে পৃথুকে রাজা করলেন।

পৃথুর পূর্ববর্তী সময়ে বেণ যেভাবে বলবত্তরের শাসন জারি করেছিলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণ্-গ্রন্থগুলিতে তার পূর্বচ্ছায়া আছে। 'ক্ষত্র' বা 'ক্ষত্রিয়', যা সেকালের 'nobility' র প্রতীকি ছিল, সেই 'ক্ষত্র' এবং তার শাসনভূমি রাষ্ট্রকে বৈদিক সমাজের মানুষেরা অনেক সময় 'খাদক' বলে মনে করেছেন। বৈদিক প্রজারা মনে করেছেন—তাঁদের সঙ্গে রাজা বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের। 'ক্ষত্র' বা রাজাকে তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছে—ক্ষত্রং হি রাষ্ট্রম্। রাষ্ট্রের বিপুল সঞ্চিত ভাণ্ডার রাজাকে ভীষণ ভাবে পুষ্ট করত বলেই রাষ্ট্র থেকে 'ক্ষত্র'কে তাঁরা আলাদা করতে পারেননি। রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মক রাজার চরিত্র কী রকম? না, রাজা বা ক্ষত্রিয় হলেন খাদক (অত্তা) আর খাদ্য (অন্ন) হলেন রাষ্ট্রস্থিত প্রজারা—অত্তা বৈ ক্ষত্রিয়ঃ অন্নং বিট্। খাদক ক্ষত্রিয়ের খাদ্য বা অন্ন যদি বেশি থাকে, তবেই সে রাষ্ট্র সমৃদ্ধি লাভ করবে, সেই রাষ্ট্রই টিকে থাকবে। শতপথ ব্রাহ্মণ অন্যত্র আরও কাব্য করে বলেছে—রাষ্ট্র টিকে থাকে রাষ্ট্রের জনগণকে খেয়ে। প্রজারা যে কর দেয় বা রাজার ভরণের জন্য তারা যে ত্যাগ স্বীকার করে, তার ওপরেই রাষ্ট্র টিকে থাকে। অতএব আপন স্থিতির জন্য রাষ্ট্র জনগণকে নিজের খাদ্যে পরিণত করে। রাষ্ট্রের

অধিকর্তা জনগণকে খেয়ে বেঁচে থাকেন—রাষ্ট্রী বিশমত্তি। রাষ্ট্র যেন এক হরিণ, আর জনগণ হল তার খাদ্য যব। রাষ্ট্র-হরিণ জনগণরূপী যব খেয়েই বাঁচে।

এই যে প্রজা-রাজার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক এইখানেই বলবত্তরের স্বৈর-শাসন স্মরণ করা যায়। রাষ্ট্রের শুভকামী মানুষেরা তখন একত্রিত হন এবং বিশৃঙ্খলার বিষ মন্থন করে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের অমৃত তুলে আনেন। এই মন্থন শুরু হয় রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যেই। শতপথ ব্রাহ্মণ তখন বলেন—বিশ্ বা জনগণই রাজার জন্ম দেয়, বিশ থেকেই রাজার সৃষ্টি—বিশ এব তদ্ ক্ষত্রং জনয়তি, বিশো হি ক্ষত্রং জায়তে। আমাদের মতে এই বিশ থেকেই পৃথু মহারাজের সৃষ্টি হয়েছে।

বেণের উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসস্তূপ থেকে পৃথু জন্মালেন। তাঁর হাতে শরাসন, গায়ে অঙ্গরক্ষার বর্ম। একেবারে ক্ষত্রিয় রাজার রূপ। সমস্ত দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের তিনি আশ্রয়। ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে তিনি একান্ত পরিচিত, তিনি বেদবেদাঙ্গবিৎ। মহাভারত-পুরাণে বর্ণিত অলৌকিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আনত হয়ে সমবেত ঋষিদের জিজ্ঞাসা করলেন রাজনৈতিক পরিভাষায়—ধর্ম এবং অর্থ সম্বন্ধে আমার কিছু সূক্ষ্ম বুদ্ধি কাজ করে, কিন্তু তা দিয়ে আপাতত আমি কী সেবা করতে পারি আপনাদের? পৃথুর সামনে উপস্থিত ছিলেন দেবতারা, ঋষিরা। তাঁরা বললেন—চিরকাল ধর্ম বলে যা চিহ্নিত হয়েছে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই ধর্মের আচরণ কর—নিয়তো যত্র ধর্মো বৈ তমশঙ্কঃ সমাচর। এখানে ধর্ম বলতে অবশ্যই দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইন বোঝাচ্ছে। কারণ এর পরেই ঋষিরা বলেছেন—তুমি তোমার নিজের প্রিয় এবং অপ্রিয়ের বিচার না করে, সমস্ত মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবার চেষ্টা করবে—প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যাজ্য সমঃ সর্বেষু জন্তুষু। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং অভিমান যেন তোমাকে বশীভূত না করে। আর যারা ধর্ম বা শৃঙ্খলা মানবে না তাদের তুমি দমন করবে বাহুবলে। আরও একটা কথা। তুমি কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা কর—আমি এই পৃথিবীর সমস্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করব এবং সুচির প্রতিষ্ঠিত যে দণ্ডনীতির ধর্ম এতকাল চলে আসছে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই ধর্ম পালন করব। আর প্রতিজ্ঞা কর—ব্রাহ্মণদের কখনও তুমি শাস্তি দেবে না। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যাতে একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণ না ঘটে, সেটাও তুমি খেয়াল করবে।

ঋষি-ব্রাহ্মণরা যেমন বললেন, বেণপুত্র পৃথু সেইরকমই প্রতিজ্ঞা করলেন। পৃথু তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আদেশে গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করলেন। পৃথিবী শস্যশালিনী হল। যে ভূমি পূর্বে বিষম, অসমান ছিল, সেই ভূমি সমান করলেন পৃথু—সমতাং বসুধায়াশ্চ স সম্যগ্ উদপাদয়ৎ। তখন বিষ্ণু ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিরা ব্রাহ্মণরা এবং প্রজাপাল মানুষেরা (আমাদের মতে patriarchs) মহারাজ পৃথুর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। রত্নগর্ভা বসুন্ধরা সমস্ত রত্ন হাতে নিয়ে পৃথুর সামনে উপস্থিত হলেন। পৃথু পৃথিবীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। মানুষের প্রথম রাজা হলেন তিনি। ভগবান বিষ্ণু তাঁর অংশ প্রোথিত করলেন পৃথুর মধ্যে। জগতে

শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এল। যক্ষ, রাক্ষস, দানব, মানব যে যার অভীষ্ট লাভ করল। চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম ঠিক ঠিক চলতে লাগল। মহামতি ভীষ্ম বললেন—রাজা মানেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থের প্রতিষ্ঠা, রাজার হাত ধরে রাজলক্ষ্মী নেমে আসেন ভুঁয়ে—অথ ধর্মস্তথৈবার্থঃ শ্রীশ্চ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর সর্বব্যাপিণী দণ্ডনীতির মাহাত্ম্যে সমস্ত মানুষের মধ্যে নীতি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই যে পৃথুর কাহিনিতে আমরা প্রথম রাজা এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টির কথা শুনলাম, এর মধ্যে যতটুকু অলৌকিকতা আছে, যতটুকু ঈশ্বরের আবেশ আছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে রাজা এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে ঐশ্বরিকতা আছে। বিশৃঙ্খলা, যাকে আমরা মনু-কৌটিল্যের ভাষায় মাৎস্য-ন্যায় বলি, অথবা ইংরেজিতে state of nature বলি, সেই বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকেই ঐশ্বরিক আবেশ নিয়ে জন্মালেন পৃথু। এতে যেমন রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়, তেমনই আরও একটি তত্ত্ব পণ্ডিতরা এই প্রসঙ্গে অবতারণা করেছেন। সেটা হল প্রজা এবং রাজার মধ্যে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব (Social contract theory) দু-একজন পণ্ডিত মত পোষণ করেছেন যে, পৃথু সমগ্র মানব-সমাজকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আসলে মহাভারতে যেমনটি দেখেছি তাতে, পৃথু কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞা করেননি। ঋষিরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা-বাক্যে পৃথুকে সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বলেছিলেন বটে, তবে তিনি পুরো প্রতিজ্ঞা করেননি। ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা-বাক্য উচ্চারণ করেই তিনি তাঁর রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন এই সামাজিক চুক্তি মোটেই প্রজা এবং রাজার মধ্যে সম্পন্ন হয়নি। এই চুক্তি হয়েছে ঋষি-ব্রাহ্মণ এবং রাজার মধ্যে। দেবতার অংশ হিসেবে পৃথু সেখানে দেবতা এবং ঋষিদের স্বার্থরক্ষাতেই ব্যস্ত ছিলেন, মানুষের স্বার্থ নয়। দেবতারা এবং ঋষিরা নিজেদের সম্বন্ধে পৃথুকে যে শর্ত দিয়েছিলেন, পৃথু তাঁর প্রতিজ্ঞা-বাক্যে সেইটুকুই শুধু মেনেছেন। তিনি পুরো প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণও করেননি। তার ওপরে তাঁর অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে কুবের, পৃথিবী ইত্যাদি ছোট ছোট দেবতারা এবং স্বয়ং ঋষিরা যেভাবে তাঁর মন্ত্রী, অমাত্য আর আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হলেন, যেভাবে বিষ্ণু তাঁর শরীরে আবিষ্ট হলেন, তাতে অনুমান করা যায় দেবতা এবং ঋষিদের স্বার্থরক্ষাতেই তিনি নিযুক্ত হলেন।

গ্রীক মহাকাব্যের ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Gillbert Murray যেমন লিখেছিলেন— Kings may be descended from Gods and specially favoured by particular Gods—পৃথুর ব্যাপারেও আমাদের তাই মনে হয়। মহামহোপাধ্যায় পি ভি কানে যেহেতু বড় আইনজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এই সামাজিক চুক্তির বিষয়টি বেশ আইনি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন—In this account the oath adminstered to prithu was so adminstered by the gods and sages and not by people in the mass, nor does Prithu expressedly

promise anything to the people as such. probably it was thought that the promise to the Sages was impliedly a promise to the people in general. But the account, such as it is, rather appears to emphasize the divine origin of kingship.

মহামহোপাধ্যায়ের অনুমানটুকু ঠিক বলেই মনে হয়, কারণ, এই চুক্তির পাঠ এবং পাঠনের অংশটুকু অত কড়া করে না ধরাই ভাল। কারণ মহাভারতের অন্য একটি অংশে এই সামাজিক চুক্তির আরও একটি বিবরণ আমরা পাব। সেখানেও অবশ্য রাজা এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে সেই ঐশ্বরিকতাই আমরা খুঁজে পাব। কিন্তু সেখানে যে সামাজিক চুক্তিটি হয়েছিল, সেটার মধ্যে রাজা প্রজার মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাব আমরা।

আমরা এর আগে পৃথিবীর রাজা হিসেবে যেমন পৃথুর নাম করেছি, তেমনই মনুর নামও করেছি। কিন্তু রাজার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মনু কীভাবে রাজত্বভার পেলেন, সে কথা বলিনি। আশ্চর্য হল, রাজা সৃষ্টির এই অন্যতর প্রক্রিয়াও মহাভারতের শান্তিপর্বেই আছে এবং সমাজের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার পূর্ণ বিবরণও সেখানে একই রকম বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে সেই অরাজক অবস্থা যেখানে ধন-সম্পত্তি, কৃষিক্ষেত্র, স্ত্রী এবং পরিবারগুলি বিপন্ন হচ্ছিল। ভীষ্ম বলেছেন—অরাজক রাজ্যে পাপীদের পাপ-কর্ম করার মধ্যেও শৃঙ্খলা থাকে না বলে তারা সুখে থাকে না। এ রকম অবস্থায় দুজন মানুষ একজোট হলেই একজনের ধনসম্পত্তি লুঠ হয়ে যায়—একস্য হি দ্বৌ হরতঃ। যে কোনওদিন দাসবৃত্তি করত না, অরাজক বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সেই অদাসও দাস হয়ে যায়, একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকেও জোর করে ধরে নিয়ে যায় অন্য লোকে—অদাসঃ ক্রিয়তে দাসো হ্রিয়ন্তে চ বলাৎ স্ত্রিয়ঃ। অর্থাৎ সেই মাৎস্য-ন্যায়—বলবত্তর ব্যক্তি দুর্বলতরকে গ্রাস করছে।

মহাভারত বলেছে—এই অরাজকতার মধ্যেই শুভবুদ্ধি মানুষেরা একজোট হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন—সমেত্য তাস্ততশ্চক্রু সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্। তাঁরা ঠিক করলেন—যারা চিরকাল ভাল ভাল কথা বলে বক্তৃতা দিয়ে দিলেন এবং যারা দণ্ডদান করার সময় খুব দড় এবং যারা চরিত্রহীন আমরা তাদের ত্যাগ করব, তাদের রাজ্যে আমরা থাকব না। এই রকম একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্ত মানুষ তখন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—আমাদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। আমাদের তো সর্বনাশ আসন্ন—অনীশ্বরা বিনশ্যামঃ। আপনি আমাদের এমন একজন মানুষ দিন যাঁকে আমরা সকলে সম্মান করব এবং যিনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন—যং পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ।

সমস্ত মর্ত্যপ্রজার আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ব্রহ্মা মনুকে আদেশ দিলেন পৃথিবীর রাজা হবার জন্য। কিন্তু ব্রহ্মার এই আদেশ মনুর পছন্দ হল না মোটে—ততো মনুং ব্যাদিদেশ মনুনাভিননন্দ তাঃ। মনু বললেন, রাজ্য চালানোর মধ্যে হাজার পাপ আছে, আমি পাপ

থেকে ভয় পাই। তা ছাড়া মানুষের মধ্যে এত মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার যে, সেই মনুষ্য-রাষ্ট্রের হাল ধরা আমার কর্ম নয়—বিভেমি কর্মণঃ পাপাদ্ রাজ্যং হি ভৃশদুস্তরম্। মনুর কথা শুনে মানুষ প্রজারা তো খুব অবাক হয়ে ভাবলেন—এ আবার কী রকম মানুষ। ইনি লোক-পিতামহ ব্রহ্মার কথাও শুনছেন না, আবার ভাবী প্রজাদের আগে থেকেই মিথ্যাচারী বলে গালমন্দ করছেন।

সমবেত প্রজারা বুঝলেন একটা বিহিত করতেই হবে। তাঁরা মনুর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের যদি পঞ্চাশটা পশু থাকে, তবে তা থেকে একটা আপনাকে দেব। সোনার বেলাতেও ভাগটা হবে পঞ্চাশের এক ভাগ। আপনি যেহেতু আমাদের পালন-পোষন-রক্ষা করবেন, তাই আমাদের সম্বচ্ছরের যে ধান উঠবে, তা থেকে দশের এক ভাগ আপনাকে দেব। এমনকি আপনার বিবাহের জন্য একটি সুন্দরী কন্যাও আপনাকে দেব।

প্রজারা মনুকে আরও বেশ কিছু দান করার অঙ্গীকার করলেন যাকে আধুনিক ভাষায় ট্যাক্স বলতে পারি। কারণ যা কিছুই তারা দেবেন বলে বলেছিলেন, তা রাজকোষশ বৃদ্ধির জন্য—দাস্যামঃ কোশবর্ধনম্। যাই হোক প্রজাদের সুরক্ষার পরিবর্তে কর দেবার এই চুক্তিটি হল প্রথম সামাজিক চুক্তি যা একজন প্রজা এবং রাজার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এটা হল সেই উদাহরণ যেখানে রাজা-সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর থাকলেও মনুর মধ্যে কোনও ঐশ্বরিক আবেশ ঘটেনি, যেমনটি পৃথুর বেলায় হয়েছিল।

মনু আর তাঁর প্রজাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, আধুনিক দৃষ্টিতে তার মধ্যে ফাঁক একটা পাওয়া যাবেই। বিশেষ করে যে অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামাজিক চুক্তির কথাটা চলে, সে অর্থ নিশ্চয়ই এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামাজিক চুক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে। রাজাও সেখানে আইনের ঊর্ধ্বে নন, ধর্মের ঊর্ধ্বে নন। বস্তুত পৃথুর বেলাতেও যেমন, এবং একটু অন্য রকম হলেও মনুর বেলাতেও যেমনটি হয়েছে তাতে রাজা এবং রাজ্যসৃষ্টির মূলে যেমন ঐশ্বরিকতাও আছে, তেমনই মানুষের হাতও আছে। তবে রাজা এবং রাজতন্ত্রের মূলে বহু প্রাচীন যুগে যেমন একটা নির্বাচনের স্পষ্টতা ছিল, সেই গন্ধটা মহাভারতের যুগে ঐশ্বরিকতার ধূপের ধোঁয়ায় পরিণত হয়েছে।

পাঁচ

আমরা আগেই জানিয়েছি যে সভ্যতার প্রথম কল্পে যখন বৈদিক যুগের মানুষেরা কতগুলি দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে ছড়িয়েছিলেন, তখন রাজা বা রাজত্ব বলতে বোঝাত একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য, যেটাকে রাজতন্ত্রের পূর্বচ্ছায়া হিসাবে নামকরণ করা যায় বিশ্‌পতি (মহাভারতের মধ্যে বহু জায়গায় এই শব্দের স্মরণ মনন রয়ে গেছে—বিশাম্পতি শব্দটির মধ্যে) অথবা

জনপতি। খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যে থেকেই যদু, পুরু, তুর্বসু, অনু, দ্রুহ্য, অথবা ভরত, সুদাসের মতো জনপতি, বিশ্পতির নাম পাওয়া যাবে। এই গোষ্ঠী-নেতা বা বিশ্পতিরা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করতেন এবং একজনকে দমিত করার জন্য অন্য নেতার সাহায্যও নিতেন।

ঋগ্‌বেদেই দেখতে পাব—কীভাবে সৃঞ্জয়-গোষ্ঠীর নেতা দৈবরাত সোমক-গোষ্ঠীর সাহদেব্যকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্য দখল করছেন। তুর্বসুর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সন্ধির কথাও ঋকই-মন্ত্র থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। জানা যায় যদু এবং তুর্বসুদের রাজনৈতিক জোট-বন্ধনের কথাও। এসদস্যু বলে আরেক বলিষ্ঠ নেতার নাম পাওয়া যাবে ঋগ্‌বেদে। তাঁর পিতা পুরুকুৎস কোনওভাবে ভূমিহারা দেশছাড়া হয়েছিলেন। কিন্তু এসদস্যু কীভাবে তাঁর হৃত দেশ পুনরুদ্ধার করেন, তাঁর বলিষ্ঠ বর্ণনা আছে ঋগ্‌বেদে।

কিন্তু এ সব কথাই বৈদিক যুগের প্রথম কল্পের কথা। তখনও রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো ভাল ধারণা জন্মায়নি, রাজা সম্বন্ধেও নয়। তাই বলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে বৈদিকরা রাজা শব্দটা জানতেন না।

ঋগ্‌বেদে বহুবার রাজা বা রাজন্ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, এমনকি অধিরাজ, সম্রাট, একরাট্ শব্দগুলিও ঋগ্‌বেদে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র বলতে আমরা যেমন territorial state বুঝি তেমনই রাজা বলতেও বুঝি সেই ভূমণ্ডলের শাসনকর্তা বা নেতাকে।

ঠিক এই রকম কোনও রাষ্ট্রের ধারণা বা রাজার ধারণা হয়তো প্রথম বৈদিক কল্পে ছিল না বলেই পণ্ডিতেরা মনে করেন। যদি বা জনগণ অথবা 'বিশ্-এর অধিপতিকে রাজা বলে মনেও করা যায়, তবু রাষ্ট্র বা 'territorial State'এর ধারণাটা প্রথম বৈদিক যুগে তেমন করে ছিল না। কেননা তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি প্রমাণে দেখা যাবে যে, একটি বিশেষ যজ্ঞীয় কর্মের আংশিক অনুষ্ঠানও একজন ব্যক্তিকে বিশ-এর অধিপতি করে দিতে পারে, কিন্তু সেই অধিপতি। কোনওভাবেই আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রের অধিপতি নন বলেই মনে করেন পণ্ডিতেরা।

এই মতটা অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও খুব যে যুক্তিসহ তা মনে হয় না। ঋগ্‌বেদের মধ্যে রাজা শব্দের এত বহুল প্রয়োগ পাওয়া যায় বলেই শুধু নয়, সম্রাট, একরাট্, বা অধিরাজের মতো শব্দগুলিও এক্ষেত্রে বিচার্য। আমাদের ধারণা পণ্ডিতেরা এক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় রাজতন্ত্রের পারম্পরিক ধারণায় যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। অপিচ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে আরও অনেকানেক তত্ত্বের মহামিলন ঘটিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রথম বৈদিক কল্পে রাজা বা রাষ্ট্রের কোনও ধারণাই ছিল না। আমাদের জিজ্ঞাসা হল—বেদের প্রথম যুগের সঙ্গে বেদের শেষ পর্বের কাল-পার্থক্য এত বেশি নয় যে, এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এটা স্বীকার করে নিতে অসুবিধে নেই যে, territorial state এর কর্ণধার

হিসেবে রাজার অস্তিত্ব বৈদিক যুগের প্রথম কল্পে না থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু বিশ্পতি, জনপতি বা গোপতি থেকে রাজাকে পেতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগেনি।

এ সম্বন্ধে এই ছোট্ট পরিসরে আমাদের আলোচনার সুযোগই প্রায় নেই। তবে পণ্ডিতেরা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রের ওপর ভাল করে নজর করলে বুঝবেন যে, রাজা, প্রজা এবং রাজকর্তা—এই তিনজনেই একটি শাসন-যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন সেখানে এবং এই ঋক্ খুব পরবর্তী কালের নয়। ঋক্‌টিতে বলা হচ্ছে—যে রাজার কাছে ব্রহ্মণস্পতি (সহজ করে বললে—ব্রাহ্মণ, পুরোহিত) প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হয়ে আপন গৃহে বাস করেন (অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব সুস্থিত হয়)। পৃথিবী তার জন্য সর্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজারা আপনিই তার কাছে আনত থাকে—তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি। এখানে যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মণস্পতির কথা বলা হয়েছে, তিনি আদতে বৃহস্পতি। তিনিই যে পরবর্তী কালে দেবতাদের পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন, তার কারণ তিনি রাজার স্বার্থ রক্ষা করে চলেন। পরবর্তী ঋক্‌মন্ত্রে রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি যেন বৃহস্পতিকে প্রচুর পরিমাণ ধন দান করে তুষ্ট রাখেন, তাতে দেবতারা রাজার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাতেই তাঁর রাজত্ব সুস্থিত হবে—অবস্যাবে যো বরিবঃ কৃণোতি ব্রহ্মণে রাজা তমবন্তি দেবাঃ।

উপরিউক্ত ঋকে বিশ্ শব্দটি প্রজা অর্থে ব্যবহার না করে বৈশ্য অর্থেও ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ। আমরা এত দূর যাচ্ছি না। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল এবং আরও কিছু কিছু অংশ, যেগুলিকে পণ্ডিতেরা পরবর্তী কালের রচনা মনে করেন, সেই মন্ত্রভাগের প্রাচীনত্বও কিছু কম নয়। তা ছাড়া যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে রাজা, রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ ধারণা বিকশিত হয়ে গেল, সেগুলির সঙ্গে বেদের পরম্পরা এতই নিকট যে, বেদের মধ্যে যে ধারণা নেই, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে তা পরিণতি লাভ করতে পারে না। কারণ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়েছে—মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্। তা ছাড়া ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে কোনওভাবে টেনেটুনেও খ্রিস্টপূর্ব হাজার শতাব্দীর এদিকে আনতে পারেননি পণ্ডিতেরা। কাজেই রাজতন্ত্রের ধারণাটা যতই 'later Vedic period'-এ তৈরি হোক, সেটাও বহু পুরানো।

যাই হোক, বৈদিক যুগের রাজতন্ত্রের প্রকৃতিটা সামান্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ঋগ্‌বেদের মধ্যে শতবার 'রাজা' শব্দটা পেলেও রাজাকে কীভাবে মনোনীত করা হত, তা ভাল করে করে পাওয়া যায় না। কিন্তু অথর্ববেদের কালে এসেই দেখতে পাচ্ছি—রাজার মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় যেমন বাইরের কিছু মানুষের হাত আছে, তেমন রাজা হিসেবে নির্বাচিত হতে হলে, অথবা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসনে সুস্থিত হতে গেলে রাজারও কিছু দায়বদ্ধতা আছে। বৈদিক যুগে রাজা সিংহাসনে বসতেন নির্বাচনের মাধ্যমে। লক্ষণীয় বিষয় হল যাঁরা রাজা নির্বাচন

করতেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ধনী-মানীরা আছেন, তেমনই আছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা।

অথর্ববেদে বেশ একটা বড় তালিকা আছে; সেই তালিকার মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া যাবে, পরবর্তী কালে তাঁদের বলা হয়েছে রত্নী (রত্নিন্) অথবা মণি। বস্তুত রাজার নির্বাচনের পর এঁদের কাছ থেকে পলাশ-গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি মণিস্বরূপ একটি বস্তু গ্রহণ করতেন রাজা। এই মণিটিই ছিল শাসন-ক্ষমতার স্মারক। এই 'রত্নী'রাই রাজা নির্বাচনে সাহায্য করতেন। যাদের কাছ থেকে এই মণি গ্রহণ করতেন রাজা, তাঁদের কাছে তিনি প্রার্থনা করতেন—যে সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি রথ তৈরি করেন (রথকারাঃ), যাঁরা কামার (কর্মারা) যাঁরা মনীষী, তাঁদের আমার সাহায্যে নিয়ে এসো। যাঁরা রাজা, যাঁরা রাজকর্তা, যাঁরা রথের সারথি এবং যাঁরা গ্রামণী—তাঁদের সবাইকে আমার সাহায্যে নিয়ে এস।

রাজার নির্বাচনে যাঁদের মুখ্য ভূমিকার কথা অথর্ববেদ বলেছে, মনে রাখা দরকার, এঁরা ছাড়াও আরও কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কম গুরুত্বপূর্ণ নন। পণ্ডিতেরা অথর্ববেদ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির নানা তথ্য বিচার করে দেখেছেন যে রাজসূয় যজ্ঞের সময় রত্নহবীংষি নামে যে ইষ্টি (যজ্ঞ) হয়, সেখানে এই রাজকর্তাদের ভূমিকার কথা আসে। অথর্ববেদে মাত্র পাঁচজন রত্নীর কথা বলা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এ সংখ্যা বেড়েছে। বিশেষ করে সেনানী, পুরোহিত, যজমান, মহিষী ভাগদুহ (যিনি কর আদায় করেন), সংগ্রাহিতৃ (কোষাধ্যক্ষ), এমনকি অক্ষাবাপ (যিনি দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলার দেখ্ভাল করেন) এবং গোবিকর্তাও (যিনি মৃগয়া করে জীবিকা নির্বাহ করেন) রত্নীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কোনও সন্দেহ নেই যে, সমাজ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মে রত মানুষের শ্রেণি-প্রতিভূ হিসেবেই এই সব রত্নীদের ভূমিকা বেড়েছে। বিশেষত পুরোহিত এখানে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেন সেনানী, কোষাধ্যক্ষ, ভাগ্দুহ। কারণ সব মিলে এই যে এগারো-বারোজন রত্নীর কথা বলা হচ্ছে, এতে যেমন রাজার শাসন-যন্ত্রে নির্দিষ্ট কতকগুলি শ্রেণির গুরুত্ব বাড়ছে বলে বোঝা যায়, তেমনই রাষ্ট্রকে যাঁরা একটা organism, হিসেবে দেখতে চান, তারা এইখানে সেই organic তত্ত্বের প্রথম সূত্রপাত দেখতে পাবেন। মৈত্রায়ণী সংহিতা স্পষ্ট বলেছে—এই রাজকর্তারা হলেন রাজা এবং তাঁর রাষ্ট্রের অঙ্গ-স্বরূপ। যে রাষ্ট্রের রত্নীরা শক্তিমান, সে রাষ্ট্রের রাজাও শক্তিমান হন—ক্ষত্রস্য বা এতান্যঙ্গানি।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি থেকে যা বোঝা গেছে, তাতে মনে হয় রাজার অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক এবং হয়তো সেই জন্যই রাজপুত্র বা রাজা নিজেকে সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই রত্নীদের বাড়ি যেতেন এক এক করে এবং তাও রত্নীদের পদ-মর্যাদার অনুক্রমে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রথম রত্নী হলেন সেনানী (সেনাপতি) কিন্তু অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রথম রত্নী হলেন পুরোহিত অথবা

ব্রাহ্মণ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে রাজার নির্বাচনে ব্রাহ্মণের প্রভাব কীভাবে বাড়ছিল, এই রত্নীদের বিপরাবর্তিত তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে।

রাজার দিক থেকে সকলের সমর্থন নিয়ে সিংহাসনে বসার এই ব্যাপারটিকে যদি আমরা কোনওভাবে নির্বাচন বলতে পারি, তাহলেও মনে রাখতে হবে রাজার বংশানুক্রমিক অধিকারের নিরিখে সিংহাসনলিপ্সু প্রার্থী রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠতেন, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা, বিশেষত নিজের ভাই এবং বৈমাতৃক ভাইয়েরা। অথর্ববেদে দেখতে পাচ্ছি একাধিক ঋকে পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা রাজার জন্য ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, যাতে করে তিনি পরিবারের 'সজাত' বা সহজাত 'রাজবীর'দের চেয়ে অধিক শক্তিলাভ করেন—তেন ত্বমগ্নে ইহ বধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য আ ধেহ্যেনম্। আরেকটি মন্ত্রে দেখা যায়—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বা সাধারণ মানুষরা যখন একজনকে রাজত্বের জন্য বরণ করছে, তখন যাতে সেই প্রার্থী রাজার সহজাত আত্মীয় বা ভাইয়েরাও তাঁকে বরণ করার জন্য রাজসভায় যান, তার জন্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে—অচ্ছ ত্বা যন্তু হবিনঃ সজাতা অগ্নির্দূতো অজিরঃ সঞ্চরাতৈ।

এতে বোঝা যায়, রাজার নির্বাচনে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং হয়তো বা এঁদেরই 'রাজা' বা 'রাজকর্তা' বলা হয়েছে অথর্ববেদের মন্ত্রে। অবশ্য রাজপরিবারের সদস্যই হোন অথবা পুরোহিত, এঁরা ছাড়াও সাধারণ মানুষেরও যে একটা ভূমিকা ছিল, সেটা কোনওমতেই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ অথর্ববেদের মধ্যে রাজা-নির্বাচনের যে মাঙ্গলিক মন্ত্রগুলি আছে, তার মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা কিন্তু—জনগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। অর্থাৎ একজন রাজার কাছে জনগণের প্রিয় হওয়াটা কিন্তু রীতিমতো কামনার বিষয়।

অথর্ববেদে বলেছে—হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপণ করলাম। তুমি এই জনপদের প্রভু হও, রাজ্য থেকে তোমার যেন চ্যুতি না ঘটে। সমস্ত প্রজারা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করুক—বিশস্-ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু। রাষ্ট্রে যাতে রাজার অবিচল স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এইভাবে—এই আকাশ যেমন অবিচল, যেমন এই পৃথিবী, পর্বত, জগৎ, তেমনই জনগণের মধ্যে তোমার অবিচল স্থিতি হোক—ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্।

অথর্ববেদে এই নির্বাচনী মন্ত্রগুলির শেষে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। বলা হয়েছে—সমস্ত দিকের সব মানুষ তোমাকে একযোগে রাজার সম্মানে সম্মানিত করুক—এইজন্যই তোমার অবিচল স্থিতি চাইছে এই সমিতি—ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ।

পণ্ডিতেরা ধারণা করেন—রাজার নির্বাচন হত একটি সমিতিতে সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের দ্বারা। সমিতি শব্দটা আমরা এক্ষুনি অথর্ববেদের সূক্তে পেয়েছি এবং মনে রাখতে হবে—আজকের দিনেও শব্দটি কিন্তু যুগলে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ শুধু সমিতি নয়, সভা-সমিতি। বস্তুত দুটি শব্দই বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে এই শব্দের

অর্থ খুব স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক কোনও মর্ম বহন করে না বটে কিন্তু অথর্ববেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে সভা এবং সমিতি—এই দুটি শব্দেরই রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। মহামতি হিলেব্রান্ট্ সভা এবং সমিতির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখতে পাননি বটে, কিন্তু অথর্ববেদে স্পষ্টই বলা আছে যে সভা আর সমিতি যেন সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির দুই মেয়ে—সভা চ সা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতে-দুর্হিতরৌ সংবিদানে।

সত্যি কথা বলতে কী দুই মেয়ের মধ্যে যেমন মিলও থাকে আবার অমিলও থাকে, তেমনই সভা এবং সমিতির মধ্যেও মিল-অমিল দুই-ই আছে। কিন্তু সবার ওপরে কথা হল—সভা এবং সমিতিই হল প্রাচীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আদি মিলন-ক্ষেত্র— original and earliest institutions of Indian polity. বৈদিক সাহিত্যে 'সভা' শব্দটির অনেক অর্থ আছে—বাড়ি, দালান, পাশাখেলার আড্ডখানা ইত্যাদি। হয়তো শেষোক্ত অর্থেই ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তে এক জুয়াড়িকে সভায় আসতে দেখা গেছে—সভামেতি কিতবঃ। তবে ঋগ্বেদে যে ঋক্টির মধ্যে সভাশব্দের প্রথম রাজনৈতিক গন্ধ পাওয়া যায়, সে ঋকের ভাবার্থ নির্ণয় করলে দেখা যাবে—জনৈক ব্যক্তির বন্ধুরা আহ্লাদিত এবং সফলকাম হয়ে সভা থেকে ফিরে আসছে এবং ওই ব্যক্তিটিও নিজেকে পাপমুক্ত বলে মনে করছে।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের নিরিখে জয়সোয়াল মনে করেন—আদি বৈদিক যুগে 'সভা' হয়তো 'রাষ্ট্রীয় বিচারালয়' (National Judicature) হিসেবে কাজ করত, কারণ শুক্লযজুর্বেদের একটি উক্তির ভাষা এবং ভাব দেখে তিনি মনে করেছেন যে সভায় যিনি যেতেন, তিনি বিচার-লাভের আশা নিয়েই যেতেন—ধর্মায় সভাচরম্। 'সভা' শব্দটি আদি এবং অকৃত্রিম অর্থটি কী ছিল, তা বার করা খুবই কঠিন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে হপকিনস সাহেব প্রথমে দেখিয়েছিলেন যে, আত্মীয়স্বজন বা স্বজাতীয় লোকেরাই একত্রিত হতেন সভায়। কারণ অন্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায়, সভা-শব্দের তুলনীয় পর্যায় শব্দগুলির অর্থ আত্মীয়, নিজের দল, পরিবার বা স্বজাতি।

হয়তো আদি সভার প্রকৃতি এমনই পারিবারিক তথা আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সভা পরিণত হয় নির্দিষ্ট সজ্জন মানুষের একত্র সমাবেশে, কখনও ক্রীড়াগৃহে, কখনও বা স্থানীয় সমস্যা মেটানোর বিচার-সভায়। বৈদিক সূক্তগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সভায় যেতেন তাঁরাই, যাঁদের বংশ, পরিবারের মর্যাদা ছিল, এবং যাঁরা নিজেরাও যথেষ্ট প্রভাবশালী—সুবীরাসঃ শোশুচন্ত দুম্নস্তঃ। যত্রা নরাঃ সমাসতে সুজাতাঃ। এই ঋকে 'সভা' শব্দটা উল্লিখিত হয়নি বটে, কিন্তু যেখানে তাঁরা বসেন—যত্রা নরাঃ সমাসতে—সেটা সভা ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবতে পারেননি পণ্ডিতেরা। সভায় হয়তো আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছিল। পাশাখেলা তো হতই যাকে জুয়াখেলা বলতেও আমাদের আপত্তি নেই; অতএব সেই সভায় যেতে হলে যে টাকার থলি হাতে নিয়েই যাওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বৈদিকেরা। কারণ ইন্দ্রের যিনি সখা, যাঁর ঘোড়া আছে, রথ আছে, এবং যথেষ্টই গরু আছে, তিনি যখন

হঠাৎ টাকা পান, তখন তিনি সানন্দে সভায় যান—স্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রো যাতি সভামুপ।

বেদের প্রথম যুগে সভা শব্দটার মধ্যে আড্ডাখানার একটা প্রকৃতি থেকে গেলেও সভার চরিত্র পালটাতে সময় লাগেনি। ছোট ছোট জায়গায় স্থানীয় লোকেরা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে ছোট্ট ছোট্ট মিলনক্ষেত্র তৈরি করেছিল, অথবা হতেও পারে—সে সব জায়গায় সমস্যার কোনও বালাই ছিল না, শুধুই আনন্দ বা মজার লোভে এই সভাক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে সেটাই একটা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশদ ক্ষেত্রে পরিণত হল। অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এই সভার সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে যুক্ত হয়ে গেছেন রাজা। রাজা যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ধনী, মানী, প্রতিপত্তিশালী তথা সজ্জন বৃদ্ধরাও যুক্ত হয়ে গেছেন সভার সঙ্গে। এক কথায় সমাজের ওপর যাঁদের প্রভাব ছিল, তাঁরাই সভার পরিচালন-প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে গেলেন। এতে রাজারও সুবিধে হল। সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ে রাজা এঁদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করলেন, কারণ সমাজের ওপর যাঁদের প্রভাব অবিসংবাদিত তাঁদের কথা শুনে চললে রাজার কার্যভার লঘুতর হত। এই প্রয়োজনের বশেই সভা একদিন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। তুলনায় গেলে এসব কথার শেষে পণ্ডিতজনে বলবেন—The evolution of this body was similar to that of the council of chiefs of the teutons, to the Senate among the romans and the witangemot among the Anglo-Saxons.

অথর্ববেদে এসে আমরা যা দেখছি, তাতে সভা রীতিমতো একটা রাজনৈতিক 'ইনস্টিটিউশনে' পরিণত হয়েছে। আমাদের লোকসভায় নির্বাচিত একেকজন নামী-দামি সদস্য যেমন ভাল 'পার্লামেন্টেরিয়ান' হবার জনা দিনে দিনে নিজেকে তৈরি করেন, পরিণত করেন, তেমনই অথর্ববেদে দেখছি—নেতা ব্যক্তি, হয়তো বা তিনি রাজাই, তিনি সভার উদ্দেশেই প্রার্থনা জানাচ্ছেন, যাতে তিনি সভায় আগত সভ্যদের সহযোগিতা পান, এবং যাতে তিনি পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে সভায় ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন—যেনা সংগচ্ছা উপ মা সা শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেযু।

সভার এক নাম 'নরিষ্ঠা'। নেতা সভার কাছেই প্রার্থনা করছেন—ভাই, সভা আমার। তোমার এক নাম যে 'নরিষ্ঠা', তা আমরা ভাল করেই জানি। তা ভাই! তোমার ওখানে যাঁরা বসে আছেন, সেই সভাসদেরা যেন আমারৎঅনুকূলে কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে যেন আমাদের মত মিলে যায়—যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ। ওখানে যাঁরা বসে আছেন—সভাসীনানাম্—, তাঁদের সবার ক্ষমতা এবং জ্ঞান আত্মসাৎ করে আমি যেন এই সংসদে সফল হই—অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কুরু।

এই বৈদিক মন্ত্রগুলির ভাব এবং অর্থ থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে, 'সভা' বস্তুটি আর স্থানীয় সমাবেশের স্তরে নেই। এখানে এমন কিছু আলোচনা হয়, যাতে নিজের

মত অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সম্মান তো থাকেই না, উপরন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেরও অসুবিধে হয়। সভায় ভাল করে কথা বলার জন্য পিতাদের যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায়—সভাসদ বৃদ্ধেরা যথেষ্ট মান্যগণ্য লোক ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে ন্যায়যুক্তিতে পেরে ওঠাটা দক্ষতার ব্যাপার ছিল। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতরঃ' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়নাচার্য লিখেছেন—পিতা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে 'পালক' অথবা পিতৃকল্প সম্মানের অধিকারী যে সমস্ত সভাসদেরা আছেন, তাঁরাই এখানে 'পিতা' শব্দে সম্বোধিত হয়েছেন—হে পিতরঃ পালকাঃ...পিতৃভূতা বা হে সভাসদো জনাঃ।

সভা শব্দের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি কিন্তু 'নরিষ্ঠা', যা আগে একবার উচ্চারণ করেছি 'সভা' শব্দের পর্যায়বাচক শব্দ হিসেবে। সায়ন বলেছেন—এই শব্দের মানে হল, যেখানে অনেকে মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেন এবং সে সিদ্ধান্ত সবাইকে মেনে চলতে হবে। ইংরেজিতে যাকে বলি 'inviolability', সেই অলঙ্ঘনীয়তার একটা তাৎপর্য আছে 'নরিষ্ঠা' শব্দের মধ্যে—অনতিলঙ্ঘ্য-বাক্যত্বাৎ নরিষ্ঠেতি নাম।

হাইমরিখ জিমার সভা বলতে বুঝিয়েছেন 'Village assembly' কিন্তু শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার যে মন্ত্রটির প্রমাণে তিনি এ কথা বলেছেন, তার সঙ্গে গ্রাম্য-সভার সম্পর্ক নেই বলেই পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। মন্ত্রটিতে দেখা যাচ্ছে—জনৈক ব্যক্তি তার পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রার্থনা করে বলছে—আমরা গ্রামের মধ্যে যে পাপ করেছি, অরণ্যে যে পাপ করেছি, সভায় যে পাপ করেছি, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার জন্য যে পাপ করেছি অথবা কোনো শূদ্রের কাছে অথবা কোনো আর্যপুরুষের কাছে যে পাপ করেছি, তার জন্য যজন করছি আমরা।

এই মন্ত্রে গ্রামের সঙ্গে সভার কোনও সম্পর্কে নেই, কাজেই সভা বলতে গ্রাম্য সভা ভাবারও কোনও কারণ নেই। উলটে সভায় ঘটে যাওয়া যে অপরাধের জন্য এখানে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেখানে টীকাকার বলেছেন—সভায় বসা বড় বড় মানুষের সঙ্গে তর্ক- বিতর্ক করে যে অন্যায় করেছি—তথা সভায়াং স্থিতা যদেনো মহাজন-তিরস্কারাদিকং চকৃম—তার জন্য যজন করছি আমরা। সত্যি বলতে টীকাকারের কথা থেকে আরও বেশি করে মনে হয় 'মহাজন' বা বড় বড় মানুষের উক্তি-প্রত্যুক্তির আসরটিকে কোনওভাবেই গ্রাম্যসভার পরিধিতে আটকে রাখা যায় না। বরঞ্চ সভা যে রীতিমতো এক রাজনৈতিক অভিসন্ধি-সমন্বিত আলোচনার আসর, এটা ভেবে নেওয়াই ভাল।

রাধাকুমুদ মুখার্জি সভাকে প্রায় 'পার্লামেন্টে'র মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন বটে, তবে অতটা না হলেও সভা যে তৎকালীন বৈদিক সমাজের উক্তি-প্রত্যুক্তি অথবা আলাপ-আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের জায়গা সেটা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। ভাবতে ভাল লাগে—আমাদের লোকসভা বা বিধানসভায় ভোট দিতে হলে আঠেরো বছর

বয়স না হলে যেমন হয় না এবং ভোট দিয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন সুনাগরিক হিসেবে পরিচিত হয় তেমনই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখছি—একজন কিশোর যখন যুবকে পরিণত হচ্ছে, তখনই সে সভায় যাবার অধিকার পাচ্ছে এবং সভায় যাবার পরেই একজন যুবক সকলের মধ্যে প্রিয় হয়ে উঠছে।

উপনিষদ-মহাভারতের যুগে সভা শব্দটি পুরোপুরি রাজনৈতিক চরিত্র গঠন করে ফেলেছে এবং আমরা আপাতত তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা রাজা-নির্বাচনের প্রসঙ্গে সমিতির কথায় এসেছিলাম এবং সমিতির প্রসঙ্গে সভার কথা বললাম। এবারে সমিতির কথা। পণ্ডিতেরা মনে করেন—সভা ব্যাপারটা নির্দিষ্ট কিছু গুণিজনের আসরমাত্র, সমিতি হল আরও বড় এক 'public body', যেখানে সাধারণ লোকেরা যেমন আলোচনায় যোগ দিতেন, তেমনই যোগ দিতেন ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত ব্যক্তিরা, Ludwig-এর ভাষায়—The 'Samiti' was a more comprehensive conference including not only all the common people (বিশঃ) but also Brahmanas and rich aristocratic patrons known as 'maghavan'.

সমিতি শব্দটা এসেছে 'ই' ধাতু থেকে, যার অর্থ যাওয়া। কিন্তু 'ই' ধাতুর সঙ্গে 'সম্' উপসর্গ জুড়লেই তার অর্থ হবে একত্র মিলিত একটি সমাবেশ, যাকে 'collective body' বলা যায়। ঋগ্‌বেদে একটি মন্ত্রে সোমরস পাত্রে ঢালার সময় উপমা দেওয়া হচ্ছে—ঠিক যেমন একজন ঋগবেদী পুরোহিত যজ্ঞের পশুটি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন, যেমন রাজা প্রবেশ করেন সমিতিতে, তেমন করেই যেন সোমরস ঢুকছে নির্দিষ্ট পাত্রে—রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ। রাজা সমিতিতে যাচ্ছেন—এমন উপমা ঋগবেদে আরও আছে এবং একটি রাজ্যে তার সমিতির রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা, এমনকি সে গুরুত্ব একটা রাজ্যজয়ের চেয়েও বেশি কি না, তা একটি মন্ত্র থেকে বোঝা যাবে। রাজা সেখানে একটি রাজ্য জয় করার পর উদ্বাহু হয়ে শত্রুপক্ষকে উদ্দেশ করে বলছেন—আমি তোদের থেকে অনেক উঁচুতে আছি। আমি নিজের ক্ষমতায় তোদের দমিয়ে দিয়ে এখানে এসেছি। আমি তোদের মন জয় করব, তোদের কর্মপদ্ধতি জয় করব, এমনকি তোদের সমিতিটাও নিয়ে নেব আমার হাতে—আ বশ্চিত্তম্ আ ব্রতম্, আ বো' হঃ সমিতিং দদে।

রাজ্য জয় করলে সেই রাজ্যের সাধারণ এবং প্রভাবশালী লোকদের হাতে আনার জন্যই সমিতিটি রাজার প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, যে রাজা রাজ্য জয় করেছেন, তিনি প্রথমে একটু হম্বি-তম্বি করলেও—অভিভূরহম আগমম্—তিনি কিন্তু প্রজাদের মন চান, নিজের কাজে তাঁদের সকলকে পেতে চান এবং সেইজন্যই শত্রুরাজ্যের সমিতিটি তাঁর প্রয়োজন। কারণ, সমিতি এমনই এক সংস্থা যেখানে সমস্ত মানুষ তাদের মন্ত্রণাকে মিলিয়ে দিতে চায়, যেখানে মানুষ তাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনাকে একসুরে বাঁধতে চায়, যেখানে একমনা হবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করে দেবতার কাছে—সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।

সমিতি শব্দটির আরও কতগুলি পর্যায় শব্দ আছে—সঙ্গতি, এবং সংগ্রাম। সমস্ত মানুষই এই সমিতিগুলিতে মত প্রকাশ করতেন বিশেষত সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা। সমিতিতে আসার জন্য নিজেকে রীতিমতো প্রস্তুত করতে হত। যেখানে সকলে তর্ক-যুক্তি দিয়ে মত প্রকাশ করছেন, সেখানে নিজের তর্ক-যুক্তি যাতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, তার জন্য মানুষের চেষ্টা এবং আকুতি দুটোই ছিল—যে সংগ্রামা সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে। সমিতিতে যাঁরা যেতেন, তাঁরা যে শুধু ভাল বৃক্তৃতা করতে চাইতেন, তাই শুধু নয়, তাঁরা চাইতেন যাতে তাঁরা সকলের কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন, কেউ যাতে তাঁদের প্রতি বাক্য উচ্চারণ করতে না পারে—অভিভূরহম্ আগমম্ বিরাড় অপ্রতিবাশ্যাঃ।

'সমিতি'র গঠন-পরম্পরা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে জানি না, তবে বৈদিক যুগের প্রথম কল্পে অনেকগুলি গ্রামই বা অনেকগুলি গ্রামের প্রতিনিধিই হয়তো সমিতির প্রথম রূপ প্রকাশ করেছিল, এবং হয়তো সেইজন্যই সমিতির এক নাম সংগ্রাম। তৈত্তিরীয় সংহিতায় অনেকগুলি গ্রাম-প্রতিনিধিরা কোনও ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে চাইছেন, এমনটি দেখা গেছে—সংগ্রামে সংযত্তে সময়কামঃ। আবার সমিতিতে শুধু ধর্মীয় এবং দার্শনিক আলোচনা চলছে, এমনও দেখা গেছে ছান্দোগ্য উপনিষদে। তবে এখানেও একটা 'সিদ্ধান্তে'র ব্যাপার আছে। অর্থাৎ ধর্ম-দর্শনে পণ্ডিত মানুষকেও সমিতিতে এসে প্রায় জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। শ্বেতকেতু তাঁর বিদ্যা প্রকাশ করার জন্য পাঞ্চালদের সমিতিতে এসেছিলেন,—পাঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়—কিন্তু পাঞ্চাল-সমিতির প্রধান প্রাবাহণ জৈবলির দাপটে শ্বেতকেতুকে মথা নিচু করে ফিরতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ধর্ম-দর্শনের হলেও নিজের বক্তব্য ভাল করে বলা এবং তা নিয়ে বাদ, প্রতিবাদ এবং সিদ্ধান্তের প্রশ্নটা কিন্তু এখানেও সমিতির চরিত্রের অন্তর্গত। বৈদিক যুগের শেষ প্রান্তে যখন ঋগবেদের শেষ সূক্তগুলি লেখা হচ্ছে এবং অথর্ববেদ যে সমাজের দর্পণ হিসেবে ব্যবহৃত, সেই সমাজে এবং সেই সময়ে কিন্তু সমিতির রাজনৈতিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। সমিতি তখন এমনই এক রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, যেখানে রাজার নির্বাচনও এক অতিশয় প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। আমরা আগে জানিয়েছি—রাজার অভিষেক-মন্ত্রে কীভাবে সমিতি একজন মাননীয় ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে মনোনীত করছে এবং রথকার, কর্মার থেকে আরম্ভ করে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং পুরোহিতেরাও এই সমিতির সিদ্ধান্ত তৈরিতে সাহায্য করছেন—সমিতিঃ কল্পতামিহ।

পণ্ডিত জয়সোয়াল 'সমিতি'কে একটি National Assembly নামে অভিহিত করতে উদ্যত হয়েছেন। কারণ সমিতির রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি, তা হল—সমিতিতে সমস্ত জনপদবাসী, যাঁদের আগে আমরা 'বিশ' নামে অভিহিত করেছি, সেই 'বিশ'গণই রাজার মনোনয়ন দিতেন। ঋগ্‌বেদে যেখানে বলা

হচ্ছে—বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু (১০.১৭৩.১)—বিশগণ যেন তোমাকে রাজা হিসেবে পছন্দ করেন, সেখানে সমিতি শব্দটির মধ্যে জন-গণের সাংবিধানিক ইচ্ছার মতো কোনও ব্যাপার আছে। কালক্রমে সমিতির মধ্য থেকে এই জনেচ্ছার ব্যাপার লুপ্ত হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে পুরোহিতের মাধ্যমে। কারণ অথর্ববেদের একটি সূক্তে দেখতে পাচ্ছি—বীতহব্য এবং সৃঞ্জয়রা (পরবর্তী কালে বীতহব্য যাদবদের এবং সৃঞ্জয় পাঞ্চালদের নেতা বলে পরিচিত) ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অপব্যবহার করেছিলেন বলে পুরোহিতরা সেটাকে রাষ্ট্রের বিপদ বলে মনে করছেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন—সমিতি এঁকে আর চায় না এবং চায় না বলেই তিনি নিজের অনুকূলে কোনও বন্ধুও পাচ্ছেন না—নাস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে ন মিত্রং নয়তে বশম্।

তার মানে সমিতিকে যেমন রাজা নির্বাচন করতে দেখেছি, তেমন রাজাকে রাজত্ব-চ্যুত করতেও দেখছি সমিতিকে। আবার নির্বাসিত রাজাকেও যখন পুনরায় সিংহাসনে বসানো হয়েছে, সেখানেও সমিতি বা বিশ্‌গণের ভূমিকার কথা অথর্ববেদ বলেছে। পণ্ডিতদের ধারণা—সমিতি—'বিশ্'গুলির ভূমিকা ছিল এতটাই প্রবল যে বৈদিক সমাজে জমির মালিকানা এবং তার লেনদেনের বিষয়টাও 'বিশ্'গুলির অধিকারের মধ্যে ছিল, অথবা অধিকার যদি নাও বলি, এই জমি-সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে 'বিশ্' গুলিরও অনুমোদন লাগত। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা শতপথ ব্রাহ্মণের একটি পংক্তি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন। শতপথে আছে—'বিশ্' গুলির অনুমোদন নিয়ে একজন ক্ষত্রিয় যাকেই ভূমিদান করুন না কেন, বুঝতে হবে এই দান যথার্থ হয়েছে। ইউ এন ঘোষাল এই পংক্তির প্রমাণে বলেছেন—জমি দেবার ব্যাপারে রাজা যে এই ভাবে বিশ্-এর অনুমোদন চাইছেন, এটা অনেকটাই তখনকার দল-উপদলে বিভক্ত সমাজের দলীয় প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সমিতি শব্দটির সঙ্গে তৎকালীন যুদ্ধপরায়ণ আর্যজাতির একটা গভীর সম্পর্ক আছে বলেও অনেক পণ্ডিতের ধারণা। তাঁরা মনে করেন—The world Samiti was applied to mean originally a war-array of the tribesmen. এ কথা সত্যি যে মহাভারতে, রামায়ণে এবং ধ্রুপদী সাহিত্যগুলিতে 'সমিতি' বলতে যুদ্ধ এবং 'সমিতিঞ্জয়' বলতে যুদ্ধ-বিজেতাকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মহাভারত-রামায়ণের অনেক আগেই নিরুক্তের লেখক যাস্ক, যিনি অন্যতম প্রধান বৈদিক অভিধানকার বলে স্বীকৃত, তিনি সমিতি বলতে সংগ্রাম শব্দের পর্যায় বুঝিয়েছেন—রণঃ....সমিতিঃ..... সংগ্রামনামানি। অন্য দিকে সায়নাচার্যও সমিতি মানে করেছেন সংগ্রাম। আশ্চর্য ব্যাপার হল—সমিতি এবং সংগ্রাম—এই দুটি শব্দকেই যখন আমরা প্রায় রাজনৈতিক সংসদ অথবা পরিষদের মর্যাদা দিয়েছি, সেখানে দুটি শব্দই আবার যেহেতু যুদ্ধ বোঝায় তাই পণ্ডিতদের ধারণা প্রাচীন যুদ্ধ-সমাবেশের সঙ্গেই সমিতি এবং সংগ্রাম শব্দের প্রথম সম্পর্ক ছিল।

সভা এবং সমিতি—এই দুটির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখা সব সময়েই টানা

হয়। আমরা আপাতত তার মধ্যে যাচ্ছি না। বৈদিক যুগের রাজতন্ত্রের মূলে ঐশ্বরিকতা ছিল কি না অথবা রাজার সৃষ্টির মূলে বংশগত অধিকার কাজ করছিল কি না, আমাদের প্রসঙ্গ ছিল সেইখানেই। অপিচ রাজার সঙ্গে প্রজার যে সামাজিক চুক্তির কথা কেউ কেউ বলেছেন, সে প্রসঙ্গেও আমরা সভা এবং সমিতির কথায় এসেছি। জয়সোয়াল, বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আলটেকরের মতামত সবিশেষ আলোচনা করে পণ্ডিত ইউ এন ঘোষাল দেখিয়েছেন যে, রাজার মনোনয়নের পিছনে যেসব রত্নীদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই হলেন রাজার নিজের লোক বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের মনোনয়ন থেকে এমন প্রমাণ হয় না যে, রাজা কোনও সাংবিধানিক নিয়মে বাঁধা ছিলেন।

সভা-সমিতির মধ্যেও মানুষের বাক্-স্বাধীনতা অথবা কোনও বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের রেওয়াজটুকু ঠিকই আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যখন লেখা হয়েছে, সমিতির কোনও তাৎপর্য তখনই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে আর সভা পরিবর্তিত হয়েছে রাজার 'প্রিভি কাউন্সিলে'। আইন, বা যাকে আমরা ধর্ম বলেছি, সেই ধর্মেরও যে রাজার ক্ষমতার ওপরে কোনও কার্যকারিতা ছিল, তা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ ধর্মসূত্রগুলি তৈরি হবার আগে রাজা নিজেও যে কোনওভাবে প্রজাদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন, সে কথা ভাবা কষ্টকর। একই রকম যুক্তি আসে সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধেও। কারণ যজ্ঞের সময় পুরোহিত রাজাকে দিয়ে যে শপথ করাতেন, তা অনেকটা যজ্ঞের অঙ্গ হিসেবেই স্বীকৃত। তার মধ্যে কোনও 'Contractual agreement'বা সেই সূত্রে রাজাকে 'trust'হিসেবে ভাবারও কোনও কারণ নেই। সব কিছু ভাবনার পরে ঘোষাল তাই সিদ্ধান্ত করেছেন—Vedic Kingship in fact while enjoying high dignity and authority from the first, acquired higher authority and dignity in the later period, but it still remained subject to the older conceptions of the paramount authority of divine law and custom .

বস্তুত জয়সোয়াল-বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেমন একদিকে বৈদিক যুগে রাজা-নির্বাচনের মাহাত্ম্যে স্ফীত বোধ করেছেন, তেমনই ঘোষাল-শর্মারা সেটা একেবারে স্তব্ধ করে দেবার মধ্যেই সরসতা খুঁজে পেয়েছেন। বৈদিক মন্ত্রগুলির নিরিখে বৈদিক যুগের প্রথম কল্পে নির্বাচনের মতো কিছু একটা না মেনে পারা যায় না এবং তা ট্রাইব্যাল কালচারের সঙ্গে যথেষ্ট মেলে। এই নির্বাচনে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ এবং জনের ভূমিকাও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়, সভা এবং সমিতির ভূমিকাও তো যথেষ্টই শক্তিমান। সত্যি কথা বলতে কী বৈদিক যুগের অনুক্রমে পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের যে শক্তি বাড়ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মসূত্রগুলি তৈরি হবার আগে এঁরাই ছিলেন দুর্দম রাজশক্তির নিয়ন্তা।

রাজসূয় যজ্ঞের প্রক্রিয়ায় পুরোহিত যে দিন আপন দণ্ডের দ্বারা রাজাকে আঘাত করে তাঁকে সমস্ত সাধারণ দণ্ডের পরিধি থেকে মুক্ত করেছিলেন, সেই দিনই একই

সঙ্গে তাঁরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে,—দেখ বাপু, এ রাজ্য তোমার নিজের এবং তোমার পারিবারিক তোষণ-পোষণের জন্য নয়, এই রাজ্য তোমাকে দেওয়া হল কৃষির উন্নতির জন্য, সকলের ভালর জন্য, সকলের পোষণ-পালনের জন্য—

ইয়ং তে রাট্। যন্ত্রাসি যমনো ধ্রুবো'সি ধরুণঃ।
কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা।।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বৈদিক যুগের শেষ কল্পে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ই, হয়তো বা নিজেদের স্বার্থেই— তাঁরা সমস্ত সাধারণ প্রজাকে রাজার অনুগামী করার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এটাও বুঝতেন যে, রাজার চেষ্টায় রাষ্ট্রের যে মঙ্গল সিদ্ধ হয় সেটাই একটি রাষ্ট্রের কাছে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো। প্রজাদের মঙ্গলই তাঁর ব্রত, সেই ব্রত নিয়ে তিনি শুধু সেই কথাই বলতে পারেন যা প্রজার ভাল করে অথবা সেই কাজটাই করতে পারেন, যা প্রজার ভাল করে।

এত সব কথা থেকে মনে হয় যে, দুরকম প্রমাণই আছে। এক দিকে রাজা দুর্দম, স্বাধীন, অহিনের ঊর্ধ্বে, অন্য দিকে তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য 'ধৃতব্রত', রাষ্ট্রের কৃষি, ধনের সুরক্ষা এবং প্রজাদের পালন-পোষণই তাঁর প্রথম কর্তব্য। হয়তো এগুলি আচারহীন মৌখিকতামাত্র, তবে রাজার শক্তি, অহংকার এবং দুর্দমনীয়তা যে গ্রন্থ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর দায়, দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতার কথাও সেই গ্রন্থগুলি থেকেই প্রমাণ করা যায়। গরুর শৃঙ্গটিকে বিশ্বাস করব, আর তার দুগ্ধদায়িনী শক্তিটাকে বিশ্বাস করব না—এমনটি না হওয়াই ভাল। বরঞ্চ বৈদিক যুগের বিস্তার যদি একেবারে ঋগ্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে রাজার সৃষ্টি এবং শক্তির মূলে ঐশ্বরিকতা এবং মানুষের ইচ্ছে—এই দুয়েরই মিশ্রচারিতা লক্ষ করা যায়।

বৈদিক যুগে রাষ্ট্র এবং রাজতন্ত্রের স্বরূপ অবশ্য এক রকম নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজার পুনরভিষেকের প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এতে যে নামগুলি পাই সেগুলি হল—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বরাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য, মহারাজ্য, আধিপত্য, স্ববশতা এবং অতিতিষ্ঠত্ব। কীথ-সাহেবের ইংরেজি ভাষায় এগুলি যথাক্রমে—kingship, overlordship, paramount rule, self-rule, sovereignty, supreme authority, great kingship, suzereignty, supremacy and pre-eminence, বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে রাষ্ট্রবিভাগের এই বিভিন্ন স্বরূপ ভাল করে ব্যাখ্যা করা যায় না। কীথ সাহেবের ইংরেজি দিয়েও নয়, আবার সায়নাচার্যের টীকা দিয়েও নয়।

বৈদিক যুগের প্রথম কল্পে রাজা কিংবা সম্রাট এই সম্বোধনগুলি দেবতার মাহাত্ম্যেই অঙ্কিত ছিল। সোম, ইন্দ্র অথবা আদিত্যকে রাজা নামেই ডেকেছেন বৈদিকরা কিন্তু বরুণকে 'সম্রাট' বলে সম্বোধন করে। জনমেজয়, সোমক সাহদেব্য অথবা সৃঞ্জয়ের মতো সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক এবং মানুষ রাজাদের কপালে মহারাজা উপাধিও জুটেছে। তবে রাজা

যখন মহারাজের পদবিতে উন্নীত হতেন, তখন ধরেই নিতে হবে—তিনি কিছু রাজ্য জয় করেছেন এবং সেই সব রাজ্য থেকে তিনি করও আদায় করছেন—সর্বে হ্যৈব মহারাজাঃ...সর্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যো বলিমাহরন্তি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে— ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হত্যা করে তবে মহেন্দ্র হয়েছেন, তেমনই শত্রুরাজ্যের ওপর জয়লাভ করেই তবে মহারাজা হওয়া যায়। হয়তো তাঁরই রাজ্যের স্বরূপ হল মহারাজ্য।

উপরে উল্লিখিত 'পারমেষ্ঠ্য' বা 'স্ববশতা'র মতো শব্দকে আমাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। কিন্তু সার্বভৌম, স্বরাট্ট, বিরাট্ বা একরাট—এই রকম সার্বভৌমত্বের বাচক শব্দগুলি তবু বুঝি ব্যাখ্যা করা যায়। লক্ষনীয়, এই শব্দগুলি চয়ন করা হয়েছে রাজা এবং রাষ্ট্র—দুটির সঙ্গেই সঙ্গতি রেখে। অর্থাৎ যেমন মহারাজ্যের অধিকর্তাই মহারাজ, তেমনই স্বরাজ্য বা সাম্রাজ্যের অধিকারীই হলেন স্বরাট্ বা সম্রাট। এক্ষেত্রে একের চেয়ে অন্যটি কতটা উন্নত, সেটা বোঝা যাবে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির যাগ-যজ্ঞের প্রক্রিয়া থেকে।

যিনি যত বড় রাজা তিনি তত বড় যজ্ঞ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এক জায়গায় বলা হচ্ছে—রাজসূয় যজ্ঞ করলেই না তবে রাজা হওয়া যায়, তেমনই সম্রাট হওয়া যায় রাজপেয় যজ্ঞ করলে। কেন? না, রাজ্য অনেক ছোট ব্যাপার, সাম্রাজ্য হল অনেক বড় ব্যাপার। রাজা সব সময়ই সম্রাট হতে চান, কিন্তু সম্রাট কখনই রাজা হতে চান না—কাময়তে বৈ রাজা সম্রাট্ ভবিতুং, ন সম্রাট্ কাময়তে রাজা ভবিতুম্।

সম্রাট্, স্বরাট্, একরাট্—এই সব শব্দগুলি অনেকটাই ব্যবহৃত হয়েছে সক্ষম এবং আত্মনির্ভর রাজাদের বিষয়ে। এমনকি সার্বভৌম কথাটাও প্রায় একই অর্থে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত, কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে বৈদিক যুগের 'ইমপেরিয়ালিজম'-এর ধারণাটাও এই সার্বভৌম শব্দটির মধ্যেই আছে। কোনও সন্দেহ নেই, যে বৈদিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে, কেননা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছে—সার্বভৌম শব্দটি হল 'সামন্ত' শব্দের পর্যায় শব্দ, যাঁর রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত তিনিই সার্বভৌম নৃপতি, তিনিই একরাট্—অয়ং সামন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ সর্বায়ুষঃ....সমুদ্রপর্যন্তায়া একরাড়িতি।

এখানে সামন্ত শব্দটিকে ইয়োরোপীয় কায়দায় 'ফিউড্যালিজম', 'ফিউডেটারি', অথবা 'ফিউড্যালে'র ধারেকাছে না আনাই ভাল। অনেকেই মনে করেন প্রাচীন ভারতে 'ফিউড্যালিজম' সেই ভাবে ছিল না, যে অর্থে আমরা 'ফিউড্যালিজম' কথাটাকে ব্যবহার করি। অন্য পণ্ডিতদের মতে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'ফিউড্যাল' সম্পর্কের লক্ষণগুলি প্রকশ পেতে পেতে হর্ষের সময়ে সে লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ হয়। এই মত রামশরণ শর্মার। একটু-আধটু কাট-ছাঁট করে এই মত মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। শর্মা বলেছেন—অশোকের শিলালিপি এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—এই দুই জায়গাতেই 'সামন্ত' বলতে স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সন্দেহাতীতভাবে অশোকের পূর্বযুগের রচনা এবং এখানেই কিন্তু প্রথম সামন্ত শব্দটি সার্বভৌম রাজার বিশেষণ হিসেবে

চিহ্নিত। অর্থাৎ 'vassal' তো নয়ই, প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রও নয়, যিনি সার্বভৌম যার কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করার মতো কেউ নেই, যিনি একরাট্ তিনি সার্বভৌম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন—(ভূমির) অন্ত পর্যন্ত সার্বভৌম—সামন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ। অর্থাৎ যাঁর রাষ্ট্রের ভূমির অধিকার সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই সমুদ্রান্তা পৃথিবীর অধীশ্বরই 'সামন্তপর্যায়ী সার্বভৌম'। সামন্ত শব্দের প্রতিবেশী অর্থ ধরলেও এখানে অর্থ করতে হবে—সামন্তদের অধিকারে থাকা রাষ্ট্রের ওপরেও যাঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, তিনিই সার্বভৌম রাজা।

রাজা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বরূপ এবং সত্তার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত শব্দটি বোধহয় 'গণ', যাকে' republic বলেছেন জয়সোয়াল। পরবর্তী পণ্ডিতেরা এই মত সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারেননি এবং শর্মার মতো জয়সোয়ালবিরোধী মানুষও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে.—vedic gana was probably another primitive tribal democracy. বস্তুত বুদ্ধের সময়ে গণ-রাজ্যগুলির গঠন এবং প্রতিষ্ঠা এতই সুচারু যে, পূর্ববর্তী বৈদিক কালের গণ-রাজ্যগুলির সত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা যথেষ্টই কঠিন।

দুটি কথা এখানে বলা দরকার। এক, প্রথম বৈদিক কল্পে রাজা এবং রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে ভৌম (territoral) প্রাধান্য ততটা স্পষ্ট নয়, যতটা পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির সময়ে। রাজার শাসন-যন্ত্রে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন, তাঁরা যে ঠিক কী করতেন, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। যিনি গোষ্ঠীপতি, বা দলপতি (tribal chief) হতেন তিনি তাঁর গোষ্ঠী এবং বিজিত দাসদের ওপরে আধিপত্য ভোগ করতেন বটে. তবে তাঁর সম্পত্তির মধ্যে অধিক পশুর সমাহার, অধিক সংখক দাস, বেশ কিছু অনুগামী মানুষ এবং দু-একটি বাসযোগ্য গৃহই যথেষ্ট ছিল—যদ্ বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং, গৃহা ভদ্রং, প্রজা ভদ্রং, পশবো ভদ্রম্।

বৈদিক যুগের শেষ কল্পে যখন অথর্ববেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি লেখা হচ্ছে, তখনই কিন্তু রাষ্ট্র বলতে একটা ভৌম (territorial) সংজ্ঞা তৈরি হয়ে গেছে। রাজার নামের সঙ্গে তাঁর বংশ মাহাত্ম্য জুড়ে যাচ্ছে এবং রাজ্যের ওপর রাজার বংশগত অধিকার ভাল করে কায়েম হয়েছে এই সময়েই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রতীচ্য, নীচ্য, মধ্যদেশ, উত্তরদেশ ইত্যাদি স্থান নির্দেশ করে সে সব জায়গায় কী ধরনের রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, তার তালিকা দিয়েছে। এই তালিকায় সাত্বত, ভোজ, কুরু, পঞ্চাল, উশীনর, ভরত-দৌষ্যন্তি—ইত্যাদি গোষ্ঠীনাম এবং ব্যক্তিনামও রাজতন্ত্রের শক্ত বুনিয়াদ সূচনা করেছে।

রাজা বা রাজতন্ত্রের স্থিতি. সুরক্ষা এবং ভরণের জন্য কর আদায়ের যে নীতি পরবর্তী কালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বৈদিক যুগের প্রথম কল্পে সেই কর-গ্রহণের ভাবনা তত স্পষ্ট নয়। জনসাধারণ, বিশ্-ভুক্ত প্রজা তাদের উদ্বৃত্ত আয় থেকে রাজাদের নজরানা দিত, উপহার দিত। এই উপহৃত দ্রব্যের নাম 'বলি'। মহারাজ নহুষকে 'বলিভৃৎ' বলা হয়েছে এই অর্থেই, তবে 'বলি' বলতে ধন-সম্পত্তির নজরানা

বোঝাত না হয়তো। বৈদিক সমাজেই যেহেতু আস্তে আস্তে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে, তাই বৈদিক যুগের শেষ কল্পে রাষ্ট্রের ভৌম সংজ্ঞাও যেমন নির্ধারিত হয়ে গেল, তেমনই করগ্রহণের রীতিটাও অনেক স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজাকে যে 'বিশামত্তা' বলা হয়েছে তার একটাই মানে—'বিশ'গুলিই তাঁর খাবার জোগাড় অর্থাৎ কর দিত। আমরা এর আগে দেখিয়েছি যে, 'বিশ'গুলিকে রাজার খাবার হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে। 'বিশ' হচ্ছে যব, রাজা সেই যবভোক্তা হরিণ, অথবা রাষ্ট্রধারী রাজা, যিনি বিশকে খান—রাষ্ট্রী বিশমত্তি—এসব কথা থেকে একটি সুচারু করগ্রহণ-নীতির ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া 'ভাগদুঘ' বলে একটি শব্দ পাওয়া যায়, সেটা কর-গ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করে এবং এই শব্দটি শর্মা ঠিকমতো বোঝেননি।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার সময়ে রাজা তাঁর 'বিশ'গুলি থেকে যে অর্থ বা বস্তু কর হিসেবে গ্রহণ করতেন, তার একটা ভাগ নির্ধারিত হয়ে যায়। সেই ভাগটাকে যিনি আক্ষরিক অর্থে প্রজাদের কাছ থেকে দুধ দোয়ার মতো দুইয়ে আনতেন তিনিই ভাগদুঘ বা ভাগদুহ, বিশ্বস্ত পণ্ডিতজনের ইংরেজিতে 'milcher of the share'. অর্থশাস্ত্রে 'ভাগদুঘ' সমাহর্তা হয়ে গেছেন। তা ছাড়া যাদের আমরা 'রত্নী' বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেখানে 'সংগ্রহীতৃ' বলেও তো একজন রয়ে গেছেন। রাজকোশ যেহেতু তাঁরই ভার, সেখানে রাজার রাজযন্ত্রে করগ্রহীতা ভাগদুঘের ভূমিকাটা কোশ-সংগ্রহীতার পরিপূরক।

বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত প্রশাসকের নাম পাই, তাতে বোঝা যায়—খোদ বেদের যুগ থেকে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সময়ের মধ্যে 'রত্নী'দের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশাসকের সংখ্যা বাড়লেও এবং সেই সংখ্যার মধ্যে সেনা বা সেনানীর মতো সামরিক পদাধিকারীর একটা বিরাট মর্যাদা থাকলেও আমরা যাকে দণ্ডনীতি বলি, সেটা সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। ঋগ্‌বেদের যুগে কৃষিক্ষেত্র বা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সেভাবে পরিপুষ্ট না হওয়ায় দণ্ডের খুব একটা প্রয়োজনও হয়নি হয়তো। তাই বলে চুরি, ছিনতাই, পশুহরণ ইত্যাদি ব্যাপার যে ছিল না, তা মোটেই নয়। সে সব দেখার জন্য রাজার 'স্পশ' বা 'spy'রা ছিলেন। ছিলেন 'উগ্র' উপাধিকারী এক শাসক অথবা অপরাধীকে ধরে আনার জন্য 'জীবগৃভ', কিন্তু অপরাধীর চরম দণ্ড-বিষয়ে খুব বেশি কথা ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ অপরাধ মিটিয়ে দেবার জন্য 'মধ্যমশী'র ভূমিকা 'উগ্র' কিংবা 'জীবগৃভ'র চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বা অথর্ববেদের সময়ে একটা চুরির জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে, একে তাকে শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও আছে ভূরি ভূরি।

বস্তুত জমির মালিকানা, কৃষিক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং সবার ওপরে চতুর্বিধ বর্ণ-বিভাগ সম্পূর্ণ হবার পরেই রাজার কাছে দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যেমনটি দেখা যায়, তাতে নীতিগতভাবে জমি রাষ্ট্রের বিষয় হলেও

তার মালিকানা কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজার। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—ব্রাহ্মণ, রাজন্য (রাজার জ্ঞাতিবর্গ) এবং বৈশ্যকে রাজার কাছে জমি প্রার্থনা করতে দেখছি, কিন্তু রাজা নিজের জন্য জমি চাইছেন আদিত্য দেবতার কাছে। কারণ, ঐশ্বরিক নিয়মে আদিত্য হলেন দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়—আদিত্য বৈ দৈব-ক্ষত্রম্— এবং দেব-ক্ষত্রিয় আদিত্যের জমি ভূমি-ক্ষত্রিয় রাজার মালিকানায় এসেছেন ঐশ্বরিক নিয়মেই।

সে যাই হোক, এই জমি, কৃষিকর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যই একদিকে রাজাকে করসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করেছে। অন্য দিকে তাঁকে একভাবে রক্ষক (হয়তো দণ্ডদাতা পুরোপুরি নয়) হিসেবেও নিযুক্ত করেছে। রক্ষকের হাতে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে তাঁর রক্ষাকর্মই বৃথা হয়ে দাড়ায়। তাই পরবর্তী কালের দণ্ডনীতির সমান পর্যায়ের না হলেও শুধু সুরক্ষার জন্যই অন্যদের রাজার ওপরে নির্ভর করতে হত। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—একজন বৈশ্য যদি তাঁর ব্যবসা করার পশুগুলি ঠিকঠাক নিজের দখলে রাখতে চায় তবে তাকে রাজার বশেই থাকতে হবে—ক্ষত্রিয়স্যৈব বশে সতি বৈশ্যং পশব উপতিষ্ঠন্তে। হয়তো এই সুরক্ষার কারণেই বৈশ্যরা রাজাকে কর দিতেন এবং রাজ্যের মধ্যে প্রধান করদাতা যেহেতু ছিলেন বৈশ্যরাই অতএব কর ফাঁকি পড়লে তাঁদের যথেচ্ছভাবে অত্যাচারও করা যেত—যথাকাম-প্রযাপ্যঃ, অন্যস্য বলিকৃদ্, অন্যস্যাদ্যো, যথাকামজেয়ঃ। এর থেকেই বোঝা যায় সুরক্ষার ভাবনা থেকেই দণ্ডনীতির উদ্ভব, যে দণ্ডনীতি বেদ-ব্রাহ্মণের যুগে তেমন পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

উপসংহারে বলতে পারি, রাজা এবং রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সংজ্ঞার জন্য আমাদের মৌর্যযুগের অর্থশাস্ত্রের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বেদের যুগ থেকে অর্থশাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতির যে বিবর্তন ঘটেছে, তা পণ্ডিতদের মতে 'a phase of transition from tribal organisation to varna and territorial organisation. এবং এই অন্তর্বর্তী পর্যায়ের মধ্যেই আমাদের পুরাতন ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত রাজনীতি এবং মহাভারতীয় শান্তিপর্বের রাষ্ট্রনীতি ঢুকে পড়েছে যার পরিণতি ঘটেছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গীন তত্ত্বে।

ছয়

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি যখন একটি সুস্থ এবং বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে এসে পৌছল, তখন একটি রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল-ভাবনার সঙ্গে আরও কতগুলি ভাবনা জুড়ে গেল। রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র মাটি, বন, পাহাড় আর নদীর অচেতন সমষ্টিমাত্র নয়, সচেতন সমাজের অনুযোগে রাষ্ট্রকেও যে সম্পূর্ণ সচেতন এক নতুন সংজ্ঞায় সঞ্জিত করা যায়, সেই ভাবনাটাই পরবর্তী রাজশাস্ত্রের প্রধান মূলধন।

কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাজ্য বা রাজার সৃষ্টি হয়েছে সে কথা আমরা আগেই বলে নিয়েছি। সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা, মাৎস্যন্যায়, এবং উলটো দিকে সকলের সুরক্ষার তাগিদ থেকেই পৃথিবীতে ঐশ্বরিকভাবে পৃথু কিংবা মনুর মতো রাজার

আবির্ভাব হয়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, গ্রীক দার্শনিকদের হাতে রাজা বা রাষ্ট্রসৃষ্টির যে ধারণা আছে, তা ভারতবর্ষের সঙ্গে তেমন করে মেলে না। আর মেলে না যে, তার কারণ অন্য এবং সেইটাই স্বাভাবিক। একেক দেশের সামাজিক কাঠামো এবং তার বিবর্তন একেক রকম। একটি দেশের ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে সেই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতি প্রয়োজনীয়তা থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে বহির্জগতের প্রভাব।

সোসিওলজিস্টরা তো বলেইছেন যে, পৃথিবীর অন্তগর্ত বিভিন্ন দেশগুলি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ-নক্ষত্রের মতো একান্ত পৃথক এবং সম্বন্ধহীন হত, তাহলে রাষ্ট্রগত সামাজিক তত্ত্বগুলির বিকাশও হয়তো ঘটত একইভাবে। কিন্তু এক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যেহেতু অন্য মানবগোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে এবং সেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভাবনা-চিন্তা এবং প্রয়োজন যেহেতু বিভিন্ন, তাই তাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাও পরস্পর ভিন্ন ধরনের, সামাজিক এবং রাষ্ট্রতত্ত্বও তাই পরস্পরের থেকে ভিন্ন।

বাইরের কোনও শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত এক শক্তপোক্ত জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে যে সমাজ গ্রীস-দেশে তৈরি হয়েছিল, তাতে দার্শনিকরা প্রথমেই Polis অথবা এক নাগরিকের কথা ভাবতে পেরেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দুই-তিন খেপে আর্যদের আগমন, তাঁদের ছড়িয়ে পড়া, এবং পূর্ব নিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব, বিনিময়, গ্রহণ, বর্জন এবং অবশেষে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব—এই সব কিছু মিলে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, সেই সংকটের মধ্য থেকেই রাজা বা রাজ্যসৃষ্টির কথা ভাবতে হয়েছে। ফলত সেখানে একবার রাজসৃষ্টির মূলে ঐশ্বরিক মতবাদ, একবার সামাজিক চুক্তির মতো কিছু, একবার রাজার নির্বাচন—এমনতর অনেক ভাবনারই সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থাটার সঙ্গে গ্রীসদেশের ভিন্নতা বোঝাতে গেলে ড্রেকমেয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হবে যে, ভারতবর্ষে—The institution of kingship originated as a response to hostile pressure...a coercive institution that differs from the conception of Polis as the fulfilment of man.

মহাভারত, রামায়ণ, ধর্মসূত্রগুলি এবং অর্থশাস্ত্র—সর্বত্রই এমন এক অরাজকতার আতঙ্ক আছে যে, তাতে প্রজার সুরক্ষার ব্যাপারটাই রাজা বা রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে রাজার সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই অ্যারিস্টটলের Polis-এর পশ্চাৎ প্রেরণায় যে 'good purpose'-এর কথা বারবার এসেছে, তা আমরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত চেতনা হিসেবে অসংখ্যবার দেখতে পাব।

রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ, জনপদ—এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে State বোঝানো হয়েছে—এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়েই জানাই যে, 'রাজ্য' শব্দটাই State এর সবচেয়ে প্রচলিত প্রতিশব্দ এবং এই শব্দের অর্থের মধ্যেই সকলের জন্য

শুভৈষণা বা 'good purpose' লুকনো আছে। মূল যে ধাতু থেকে রাজা এবং রাজ্য—এই দুটি শব্দই আসছে, সেই ধাতুটা হল 'রঞ্জ্', যার অর্থ খুশি করা, 'রাঙিয়ে দেওয়া'! আরও গভীর অর্থ ধরলে কিন্তু 'রঞ্জ্' ধাতুর অর্থ শোভা পাওয়া (Shine), 'বিরাজতে', 'বিরাজমান'—এই সব শব্দের মধ্যে এই গভীরার্থটুকু পাওয়া যাবে। কিন্তু 'রঞ্জ্' ধাতু থেকে আসা রাজা এবং রাজ্য শব্দটা যে সাধারণ অর্থে রঞ্জন করা বা খুশি করাই বোঝায়, তা সব চেয়ে ভাল বোঝা যাবে মহাকবি কালিদাসের শব্দ ব্যবহারে।

দশরথের পিতামহ রঘুর রাজা নাম কতটা সার্থক সেটা বোঝানোর জন্য কালিদাস লিখেছেন—প্রকৃষ্টভাবে আনন্দ বা আহ্লাদ দেয় বলে যেমন চন্দ্রের চন্দ্র নামটি সার্থক, (সার্থক—connotative, চন্দ্র=আনন্দ), তাপ দান করে বলে সূর্যের 'তপন' নামটি যেমন সার্থক, তেমনই প্রজাদের রঞ্জন করার জন্যই রঘুর রাজা নামটি সার্থক—তথৈব সো'ভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ। রাজা বা রাজন্ শব্দের সঙ্গে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় যুক্ত করলেই আমরা রাজ্য শব্দটি পাব। রাজার ভাব এবং কর্ম যে বস্তুর মধ্যে নিহিত, তাকেই বলে রাজ্য। রাজা এবং রাজ্য শব্দ দুটি একই ধাতু থেকে আসার ফলে শুধু রাজ্য বলতে—রাজা, তার প্রশাসন এবং শাসিত প্রজাদের একই সঙ্গে বোঝানো যায়।

সংস্কৃতে রাজ্য শব্দটা বিভিন্ন আকর গ্রন্থে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; সেগুলির মধ্যে এমন অর্থও মিলবে, যা আমাদের মহামতি অ্যারিষ্টটলের কাছাকাছি চলে যাবে। অ্যারিষ্টটল লিখেছিলেন—Our own observation tells us that every polis is a community of persons formed with a view to some good purpose.

আমাদের কৌটিল্য লিখেছেন—একটি নির্দিষ্ট জনপদের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী না থাকে, তবে রাজ্য বা জনপদ আপন সংজ্ঞা লাভ করে না—না হ্যজনো জনপদো রাজ্যং জনপদং বা ভবতীতি কৌটিল্যঃ। 'জন' বলতে যে একটি গোষ্ঠী বা কমিউনিটি বোঝাত, সে আমরা বেদের আমলেই দেখেছি এবং দেখেছি—জন হল কতকগুলি 'বিশ্ এর সমষ্টি—স ইজ্ জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ (ঋগ্বেদ ২.২৬.৩)। কৌটিল্য যখন জন-বিশিষ্ট একটি জনপদকেই রাজ্যের আখ্যা দিচ্ছেন, তখন মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি রাজ্য বলতে বোঝাচ্ছেন—সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবাস—প্রজৈশ্বর্যং হি রাজ্যমুচ্যতে—অর্থাৎ যেখানে প্রজারা সুখে থাকে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, সেটাই রাজ্য এই রকম প্রজা না থাকলে কারই বা রাজ্য টিকবে—তাসু বিনশ্যত্তীষু কস্য বা রাজ্যং স্যাৎ। হয়তো এই দিক দিয়ে দেখলে আমাদের রাজ্যকেও Polis বলা যায় এবং এই রকম প্রজাদের বলা যায় Political.

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা অথবা মহাভারত কিন্তু এই রকম এক কথায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে রাজি নন। রাষ্ট্র বলতে তাঁরা সাতটি অঙ্গের কথা বলেছেন। মানব-শরীরের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, সেই রকম কয়েকটি অঙ্গের সমূহই রাষ্ট্র-শরীর। এই অঙ্গ সাতটি, যাকে মহাভারত এবং মনু বলেছেন সপ্তাঙ্গ এবং

অর্থশাস্ত্র বলেছে সপ্ত-প্রকৃতি। এই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতি যথাক্রমে—স্বামী (রাজা বা সার্বভৌম নৃপতি), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (রাষ্ট্র এবং প্রজা), দুর্গ (সংরক্ষিত নগর অথবা রাজধানী), কোশ (রাজকোশ, অর্থসঞ্চয়), দণ্ড (স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র শাসনের শক্তি তথা উপায়), এবং মিত্র (স্ব-অনুকূল পররাষ্ট্র-সমূহ)। মানব-শরীরের হাত-পা-মাথা যেমন, রাষ্ট্রের পক্ষেও স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি তেমনই। অঙ্গ বলতে বোঝায় শরীরের অংশ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'organ' আর প্রকৃতি মানে স্বভাব, nature, যেটাকে অপরার্ক তাঁর যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকায় বিশদ করে বলেছেন—যার থেকে কার্যের সৃষ্টি হয়, যাতে কার্যের অবস্থান এবং যাতে শৃঙ্খলা অনুসারে কার্য সম্পন্ন হয়, তাকেই বলে প্রকৃতি। কানের দুল বানাতে হলে সোনার যে ভূমিকা, সেই সোনা যেমন কুণ্ডলের 'প্রকৃতি' তেমনই স্বামী-অমাত্য ইত্যাদি ছাড়া রাজ্যের উৎপত্তি হয় না, যদি বা উৎপন্ন হয়, তবে স্বামী অমাত্য ছাড়া রাজ্য স্থায়ী হয় না এবং সেইজন্যই স্বামী-অমাত্য ইত্যাদি হল রাজ্যের অঙ্গ।

মেধাতিথি তাঁর মনুভাষ্যেও সপ্তাঙ্গ রাজ্য সম্বন্ধে ওই একই অঙ্গাঙ্গী-ভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন—স্বামী-অমাত্য এগুলি হল রাজ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ অবয়ব বা কারণ, যেমন ঘট বানাতে গেলে তার অবয়বগুলি। পরবর্তী সময়ে লেখা শুক্রনীতিসার রাজ্যের সাতটি অঙ্গকে একেবারে একটি মানব-শরীরের সঙ্গেই মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মাথাটা হলেন রাজা, চক্ষু হলেন মন্ত্রীরা, রাজার মিত্রস্থানীয়রা হলেন রাজার কান, রাজকোশ হল মুখ, মন হচ্ছে দণ্ড (বল), দুর্গ হল হাত আর পা হল জনপদ।

কৌটিল্য হয়তো তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের একেকটি অঙ্গ ব্যাখ্যা করে অন্যান্য অঙ্গগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমন করে ব্যাখ্যা করেননি, যেমন করেনি মনু-স্মৃতি বা মহাভারতও। কিন্তু ব্যাখ্যা না করলেও এই শারীর-তত্ত্বটি তাঁদের সকলের মনেই ছিল। ও দেশে এটাকে বলে organic theory যার মূল প্রবক্তা বোধহয় ছিলেন Bluntschilli প্রধানত ব্লুন্ট্শ্লির বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশে D R Bhandarkar মত প্রকাশ করেছিলেন যে, মনু-কৌটিল্যরা রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ প্রতিপাদন করে আসলে ওই শারীর-তত্ত্ব বা organic theoryই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের শরীর সম্বন্ধে একেবারে আধুনিক ভাবনাটা অবশ্য প্রথম চালু করেছেন হারবার্ট স্পেনসার, যদিও তাঁর রাষ্ট্র বস্তুটি খুব বিশেষণহীন নয়। একটি শিল্পরাষ্ট্র বা industrial state-এর অন্তর্নিহিত ঐক্য বোঝানোর জন্য সেই রাষ্ট্রের শৈল্পিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং আইনি দিকগুলিকে তিনি যথাক্রমে তুলনা করেছেন মানুষের সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্তসঞ্চালনকারী শিরা, নার্ভ এবং মগজের সঙ্গে।

আগেই বলে নিই এই অত্যাধুনিক দেহতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রশরীরকে মেলানো প্রায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভাঙা দরজা মেলানোর মতো কষ্টকর। আমরা এই অপচেষ্টা করছিও না। বরঞ্চ ব্লুন্টশ্লি এবং ভান্ডারকারের ভাবনা-বিনিময় থেকে যা

বোঝা গেছে, তাতে আগেই বলে নেওয়া দরকারা যে, ব্লুন্টশ্লি যেভাবে বলেছেন সেভাবেও প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে মানবশরীরের সাদৃশ্য দেখানোর কোনও দায়বদ্ধতা আমাদের নেই।

লক্ষ করে দেখুন, মহামতি অ্যারিস্টটল যেভাবে তাঁর Polis-এর শাসন-যন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে একবারও তিনি সোচ্চারভাবে organic theory-র কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু তবুও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে মানব-শরীরের সাদৃশ্যে বা ছকে ফেলেছেন পণ্ডিতেরা। R. G. Mulgan লিখেছেন—Aristotle is also said to have advanced the, or an 'organic' theory of the state. The phrase 'organic theory' or any close equivalent does not actually occur in Aristotle' s text, but this would not be a serious objection to calling Aristotle's theory 'organic', if it to do so were make his meaning clearer.

মনু-মহাভারত অথবা কৌটিল্য-যাজ্ঞবল্ক্যের সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্র সম্বন্ধেও আমরা ঠিক উপরিউক্ত কথাগুলিই বলতে চাই। যাঁরা বলেন—শারীর-তত্ত্বের (organism) বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক ঠিক মাথায় রাখলে প্রাচীন রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ কল্পনা একেবারেই বৃথা, তাঁরা ভুল বুঝেছেন। এঁরা বলেন শারীর-তত্ত্ব বা organism বলতে যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা চিন্তা করা হয়, সেগুলি রাষ্ট্রশরীরের সঙ্গে মেলাতে হলে অবয়ব-সংস্থানগুলি নিম্নলিখিতভাবে চিন্তা করা উচিত।

এক, প্রত্যেক অবয়বেরই নিজের মধ্যে নিজের বেড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকা চাই। দুই, যে কোনও একটি অবয়বের অত্যধিক বাড় সম্পূর্ণ মানবিক গঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা দুর্বল করে। তিন, যে কোনও অবয়ব বা অংশ অবয়বী শরীরের একাংশমাত্রই। অবয়বীর জন্যই সেই নির্দিষ্ট অবয়বের অস্তিত্ব। অবয়বকে অবয়বী থেকে পৃথক করে নিলে তার কোনো মূল্য থাকে না। চতুর্থ, একটি সম্পূর্ণ অবয়ব-সংস্থানের অংশ অবয়বগুলি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনই এগুলি পরস্পরের সহায়ভূত।

এইভাবে দেখলে প্রাচীন ভারতীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের ধারণাটাকে হয়তো জীবন্ত মানবদেহের সঙ্গে তেমন করে মেলানো যাবে না, যেমন মহামতি অ্যারিস্টটলের Polis কেও মেলানো কঠিন হয়ে পড়বে কিন্তু একটু-আধটু উদার হলে অ্যারিস্টটলের Polis এবং মনু-মহাভারত-কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গিক রাজ্যের সঙ্গেও দেহতত্ত্বের মিল ঘটানো যায়। মহাভারতেই বোধহয় প্রথম রাজ্যের সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। সেখানে মহারাজ জনকের সঙ্গে এক পণ্ডিতা রমণীর কথা হচ্ছিল। রমণী বলেছিলেন—একটি রাজ্যের রাজা হওয়ার সমস্যা অনেক, দুঃখও অপার। এমন দুঃখজনক রাজ্য কে চায়? আর কেই বা রাজ্য লাভ করেও শান্তি পায়। এই যে দেখছ, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোশ, অমাত্য—এগুলিকে কি কোনও রাজা শুধু নিজের বলে ভাবতে পারবেন—মমেদমিতি যচ্চেদং পুরং রাষ্ট্রং চ মন্যসে? অর্থাৎ তুমি রাজা এই ব্যক্তিবিশেষ না থাকলেও রাজ্য থেকেই যাবে, এবং সেখানে রাজাও একজন কেউ

প্রতিষ্ঠিত হবেন। কেননা, রাজ্যমাত্রেই রাজা থাকেন, কিন্তু রাজা না থাকলেও পুর, রাষ্ট্র, অমাত্য—এই রাজাঙ্গগুলি থেকে যায় বলে রাজ্যও ঠিক থেকে যায়।

রাজ্যলাভের দুঃখের কথা বলেই দার্শনিক রমণী জনককে বললেন—রাজ্য মানেই হল সপ্তাঙ্গ রাজ্য। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র , দণ্ড, কোশ, এবং রাজা—এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে অনেকটাই এক সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ডের মতো—সপ্তাঙ্গস্যাস্য রাষ্ট্রস্য ত্রিদণ্ডস্যেব তিষ্ঠতঃ। ত্রিদণ্ডী স্বামী সন্ন্যাসীর দণ্ডটি তিনটি দণ্ডের সমাহার হলেও সেটি একটি মাত্র দণ্ডের রূপ নিয়ে সন্ন্যাসীর হাতে বিরাজ করে। রাজ্যের প্রত্যেকটি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং গুণ আলাদা রকমের হলেও এই অঙ্গগুলি প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি জড়িয়ে আছে। এমন বলা যাবে না—এই অঙ্গের চেয়ে ওই অঙ্গের গুণ বেশি বা এর চেয়ে ওটা কম গুরুত্বপূর্ণ—অন্যোন্যগুণযুক্তস্য কঃ কেন গুণতোঽধিকঃ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব যেভাবে রাজ্যের সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বকে এমন এক সংশ্লিষ্ট এককের মাহাত্ম্যে বর্ণনা করেছে, যে এর মধ্যে শারীরিক সংস্থানের স্বতোবিভিন্নতা সত্ত্বেও অদ্ভুত এক সাম্যাবস্থার সূচনা করে। মহাভারতের শান্তিপর্বের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—রাজকোষের চেয়ে দণ্ডকে বড় বলা যাবে না অথবা দণ্ডের চেয়ে রাজকোষেরও গুরুত্ব বেশি বলে স্থাপন করা যাবে না। মহাভারত বলেছে—হ্যাঁ, এমন সময় আসতেই পারে যখন একটির চেয়ে আরেকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল, যেমন ধরুন শত্রুরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাজার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল দণ্ড। সেনা, সেনাপতি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—এইগুলিই দণ্ডের উপাদান এবং যুদ্ধের সময় এইগুলিরই প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশি। ফলত সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ দণ্ডই তখন বেশি প্রাধান্য লাভ করে, কারণ দণ্ডের দ্বারাই তখন রাষ্ট্রে কার্যসিদ্ধি ঘটছে—যেন সংসিধ্যতে কার্যং তৎ প্রাধান্যায় কল্পতে।

এ কথা যেমন মেনে নেওয়া গেল, তেমনই একই সঙ্গে ভাবতে হবে যে, দণ্ডের সমস্ত উপাদান—সৈন্য-সামন্ত, রথ, অশ্ব, পদতি—এগুলি সংগ্রহের জন্য রাজকোশের প্রয়োজনও কিছু কম নয়, একই সঙ্গে অন্তঃরাষ্ট্রীয় পৌর-জনপদবাসীর সাহায্য এবং সুস্থিতিও সেখানে প্রয়োজন। আপন রাজধানী বা দুর্গরক্ষা, অমাত্য-মন্ত্রীদের রাজকার্যে সমন্বয়ী বোধ এবং সর্বোপরি রাজার গুরুত্বও কিছুই কম নয়। তার মানে সময়কালে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অন্যতম একটি অঙ্গ প্রধান হয়ে উঠলেও অপর অঙ্গগুলির গুরুত্ব কিছু কমে না। দুর্ভিক্ষের সময় রাজকোষের প্রাধান্য বেড়ে উঠলেও প্রজাবিদ্রোহের সম্ভাবনায় দণ্ডকেও সদা জাগ্রত করে রাখতে হয়। কাজেই সর্বত্রই সেই একই যুক্তি; যার জন্য মহাভারতে সিদ্ধান্ত করতে হল—রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে গুরুত্ব দিলেও সপ্তাঙ্গ হল একটি একক, তার সমষ্টিগত মূল্যটাই বেশি—সপ্তাঙ্গস্যৈব সংঘাতঃ।

সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের শারীর-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মনুর বক্তব্য অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বকে একটি বৈজ্ঞানিক অনুক্রমে সাজিয়েছেন, যা

কৌটিল্য পরবর্তী কালে প্রায় হুবহু মেনে নিয়েছেন। পার্থক্য শুধু একটিতে। মনুর অনুক্রমটি হল—স্বামী, অমাত্য, পুর (কৌটিল্যে দুর্গ) রাষ্ট্র (কৌটিল্য জনপদ), কোশ, দণ্ড, সুহৃৎ (কৌটিল্যের মিত্র)। এই অনুক্রমে কৌটিল্য দুর্গকে (বা পুরকে) জনপদের (বা রাষ্ট্রের) পরে সাজিয়েছেন, অন্য কোনও তফাত নেই।

রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গকে এই অনুক্রমে সাজানোর পিছনে মনুর একটি যুক্তি আছে। মনু বলেছেন—স্বামী, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র ইত্যাদির যে ক্রমটি বলা হয়েছে, তার মধ্যে পূর্ব-পূর্বটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিপন্নতা বা সমস্যা উপস্থিত হলে যথাক্রমে পূর্ব-পূর্ব অঙ্গগুলি বেশি ক্ষতি করবে। তার মানে, শেষের দিক থেকে ধরলে, সুহৃৎ বা রাজার অনুকূল মিত্ররাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সমস্যা থেকে দণ্ডের সমস্যা বেশি গুরুতর কেননা রাজার যদি দণ্ড-শক্তি (সৈন্য-সামন্ত ইত্যাদি) অধিক থাকে তবে মিত্রশক্তিকে ঠিক রাখা অনেক সহজ। কিন্তু দণ্ড বা বল ঠিক না থাকলে কে কার বন্ধুরাষ্ট্র। একইভাবে কোশ এবং দণ্ডের সংঘাতে কোশই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজকোষে যার কিছু নেই, সে সৈন্য-সামন্ত, হস্তী-অশ্ব ঠিক রাখবে কী করে? অন্য দিকে রাষ্ট্র-কোষের দ্বৈরথে যদি রাষ্ট্রই বিনষ্ট হয় তবে কোষের উৎপত্তি কোথা থেকে হবে। দুর্গ এবং রাষ্ট্রের বিপত্তিতে দুর্গ বা রাজধানী আগে বাঁচাতে হবে, কারণ দুর্গের মধ্যে সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রকে বাঁচাবার সব উপায়ই একত্রিত থাকে। তাই দিয়ে আবার সব কিছু গড়ে তোলা সম্ভব। দুর্গের থেকেও মন্ত্রী-অমাত্য বেশি জরুরি, কারণ রাজ্যের মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নাশে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা।

এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন স্বামী বা রাজা। কারণ সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্র তাঁরই ওপর নির্ভর করছে। সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের একেকটি অঙ্গের বিপন্নতা উপস্থিত হলে ক্ষতি হয়, তাকে পারিভাষিক ভাষায় বলা হয়েছে 'ব্যসন'। কৌটিল্যের মতে—শ্রেয় বা কল্যাণের পথ থেকে মানুষকে যেটি ভ্রষ্ট করে, তাকে বলে ব্যসন। মনুও এই ব্যসনের কথা বলেছেন এবং আমরা তা আগে দেখিয়েছি। সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের অবয়বগুলির মধ্যে যে বিপন্নতা বা ব্যসন উপস্থিত হয়, তাতে পূর্বেরটি পরের চেয়ে গুরুতর—এই মত কৌটিল্যও মেনে নিয়েছেন, কিন্তু মনু যেভাবে সুহৃৎ-দণ্ড-কোশ ইত্যাদি নেতি-নেতি করে শেষে স্বামী অর্থাৎ রাজার কথায় এসেছেন, কৌটিল্য সেভাবে স্বামী-ব্যসনে আসেননি। তাঁর মতে রাজার ব্যসন বা সমস্যাটাই সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। কারণ, মন্ত্রী-পুরোহিত এবং অন্যান্য ভৃত্যদের রাজাই নিযুক্ত করেন, বিপন্ন সময়ে কীভাবে কোষ-বৃদ্ধি করতে হবে, তাও রাজাই জানেন। অমাত্য-ব্যসন উপস্থিত হলে রাজা যেমন তার প্রতিকার করতে পারেন, কোষ-ব্যসন হলেও তেমনই, তথা দণ্ড-ব্যসনের সময়েও রাজাই তার প্রতীকার করতে পারেন। কারণ সব কিছুর মূলে আছেন রাজা—কূটস্থানীয় হি স্বামীতি।

সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের একেকটি অবয়বে সমস্যা বা ব্যসন উপস্থিত হলে কোনটা কার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রসঙ্গেই কৌটিল্য সপ্তাঙ্গের পারস্পরিক এবং পরিপূরক

সম্পর্কের কথা বলেছেন। কাজেই মনুর মতো প্রথমেই সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে দেননি বলেই একথা বলা চলে না যে, রাষ্ট্রের শারীর-সংস্থান তত্ত্বটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সেভাবে নেই—শর্মার ভাষায়—which is not much in evidence in Kautilya. শর্মাজির কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। কেননা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, পূর্বাচার্যরা যে বিষয়ে বেশি আলোচনা করে গেছেন এবং সেই মতের পিছনে যদি কৌটিল্যের সমর্থন থাকে, তবে কৌটিল্য সে আলোচনার মধ্যে বেশি যানইনি। কিন্তু কৌটিল্য যেখানে রাষ্ট্রের সপ্ত প্রকৃতি স্বীকার করে নিচ্ছেন মনুর মতানুযায়ী, সেই সপ্তাঙ্গের একেকটির বিপন্নতায় পূর্ব-পূর্ব ব্যসন গুরুতর হবে—এই মনুকথিত নীতিই যখন তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিচ্ছেন, তখন সন্দেহ থাকে না যে, রাষ্ট্রের শরীরগঠন বা organism তিনি মনু বা মহাভারতের মতো করেই বুঝেছেন। বিশেষত একটি গোটা অধ্যায় জুড়ে বিভিন্ন আচার্যের মত উদ্ধার করে তিনি যখন তাঁদের প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করে সপ্তাঙ্গের একেকটির বিপন্নতায় কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত—সেটা দেখাচ্ছেন, তখনই কিন্তু সপ্তাঙ্গের একটির সঙ্গে আরেকটির নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; বিপ্রতীপভাবে হলেও তা হচ্ছে কৌটিল্যের কুটিল দক্ষতা এই রকমই। দুঃখের বিষয়, এই কুটিল দক্ষতা আধুনিক পণ্ডিতেরা ভাল করে ধরতে পারেননি এবং আরও দুঃখের বিষয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই।

শর্মাজির আরেকটি অনুমানও আমাদের মতে যথার্থ নয়। তিনি মৌর্যোত্তর যুগ, গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগের ছাঁচে ফেলে যেভাবে মনু, কৌটিল্য এবং কামন্দকের মন্তব্যগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন, তারপরে feaudalism এর জন্ম দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটা মোটেই যথার্থ ঠেকে না। সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই শর্মাজির মনে একটি ছক থেকে যাওয়ায় তাঁর সিদ্ধান্তও আমাদের কাছে পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। তিনি বুঝতে চাইলেন না যে, রাষ্ট্রের পরস্পর পরিপূরক সপ্তাঙ্গিক ভাবনায় মনু-কামন্দক যতই co-relation-এর সিদ্ধান্ত করুন, কৌটিল্য যেমন সবার ওপরে স্বামী বা রাজাকে রেখেছেন, মনু-কামন্দকও তাই। এ ব্যাপারে মনু-মহাভারত, কৌটিল্য-কামন্দক বা যাজ্ঞবল্ক্য-শুক্রে কোনও পার্থক্য নেই। এই আলোচনাও বিস্তারিতভাবে পরে করা যেতে পারে। বরঞ্চ আমরা এখানে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের কথায় আসি।

প্লেটো একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানব-শরীরের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে দেখিয়েছেন—একটি আঙুলে ব্যথা লাগলে যেমন সম্পূর্ণ শরীরেই সেই কষ্ট অনুভূত হয়, তেমনই রাষ্ট্রবাসী একজনের ক্ষতি হলে সকলেরই একভাবে ক্ষতি হয়। প্লেটোর এই ভাবনা জন ডানের সেই বিখ্যাত উক্তির মতোই কি না কে জানে—If a clod bee washed away by the sea, Europe is the lesse—কিন্তু প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টটল রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গ বা অংশের ভাবনা করতে গিয়ে আগে গুরুত্ব দিয়েছেন

অংশী বা অবয়বী রাষ্ট্রকেই। তাঁর মতে একটি হাত ততক্ষণ হাতই নয় যতক্ষণ না সেটি মানবশরীরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তেমনই একটি মনুষ্যও ততক্ষণ মনুষ্য নয় যতক্ষণ না সে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। এই ভাবধারায় রাষ্ট্রের কথায় এলে রাষ্ট্রের কোনও অঙ্গকেই এমনভাবে বাড়তে দেওয়া যাবে না যাতে অত্যধিক গুরুত্বের বশে তার স্বাতন্ত্র্যের উৎপত্তি হয়। তাতে রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটবে।

বস্তুত গ্রিসদেশের নাগরিক সভ্যতায় গণতন্ত্র এবং কতিপয়ের শাসনতন্ত্রের (oligarchy) মধ্যে যে সংঘাত চলছিল তাতেই তিনি এই ভাবনা ভেবেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, এই ভাবনা বা দুর্ভাবনা থেকে একেবারেই আলাদা। এখানে রাজাই সব। রাজ্যের সপ্ত অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়—সেও রাজা এবং তাঁর রাজ্যের স্বার্থেই। মনু মহারাজ এই প্রসঙ্গে মহাভারতের সেই সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ডের উপমা টেনে এনেছেন—বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ। অর্থাৎ সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের একের আধার অন্যটি। স্বামী-অমাত্য-দুর্গ ইত্যাদি একে অন্যের উপকারক বলে এগুলির সামগ্রিক সমন্বয়ই যেমন রাষ্ট্রের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আসে, তার বৃদ্ধি ঘটায় এবং বিনাশ থেকে বাঁচায়, তেমনই এগুলির একের অভাবে অন্যের বেঁচে থাকার স্বাতন্ত্র্যও কিছুকাল থাকে। একটি বৃক্ষের অঙ্কুর, জন্মানোর সময় মাটি-বীজ এবং জলের যে সামগ্রিক ভূমিকা, রাষ্ট্রের স্থিতিতে তেমনই সপ্তাঙ্গের ভূমিকা। কিন্তু মনু যখন বলছেন—সময়কালে একেকটি প্রকৃতি বা অঙ্গ যেমন প্রধান হয়ে দাঁড়ায় (যেমন যুদ্ধকালে দণ্ড), তখন তাকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। যার মাধ্যমে যে কাজটা যখন সুসম্পন্ন হয়, তখন সেটাই শ্রেষ্ঠ—যেন যৎ সাধ্যতে কার্যং তত্তস্মিন্ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

মনু মহারাজের এই মত মানলে শেষ পর্যন্ত কৌটিল্যের সঙ্গে তাঁর কোনও পার্থক্য থাকবে না। কারণ কৌটিল্য যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন—রাজা যেহেতু সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় সব কিছু সামাল দিতে পারেন, অতএব রাজাই রাষ্ট্রীয় সপ্তাঙ্গের মূলভূত ব্যক্তি। শুধুমাত্র এক রাজার নিরিখেই রাষ্ট্রের সপ্ত-প্রকৃতিকে বা সপ্তাঙ্গকে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়—রাজাই রাজ্য—রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃতিসংক্ষেপঃ। মনু হয়তো রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ-সাধনে অঙ্গ হিসেবে রাজার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব তেমন করে বলেননি, অন্তত কৌটিল্যের মতো জোর দিয়ে বলেননি। কিন্তু তাঁরও মতে রাজাই যে সপ্তাঙ্গের মূলভূত সে কথা রাজার মর্যাদা স্থাপনের সময়েই মনুর মুখ দিয়ে বেরোবে। তা ছাড়া সপ্তাঙ্গের পূর্ব-পূর্ব অঙ্গ পরেরটার চেয়ে গুরুতর একথা মনুই যেহেতু প্রথম বলেছেন, তাই সেদিক দিয়েও সব কিছুর শেষে রাজাতে এসেই ঠেকতে হবে। টীকাকার মেধাতিথি তাই পরস্পর অঙ্গগুলির তুলনা করতে করতে যখন রাজায় এসে ঠেকলেন, তখন আর কোনো আলোচনাই করলেন না। কারণটা এতই স্পষ্ট।

মনুর মতে রাজা সর্বতেজোময় এক ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সব করতে পারেন, তাঁর ওপরে আর কিছু থাকতে পারে না, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তাঁকে লঘু করতে পারে—তস্মাদভিভবত্যেব সর্বভূতানি তেজসা। হয়তো এই জন্যই মনু যখন

অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে রাষ্ট্রীয় সপ্তাঙ্গের সুষমতা নিরূপণ করছেন, তখন টীকাকার মেধাতিথি ছোট্ট করে মন্তব্য করছেন—এখানেও কিন্তু বড়-ছোটর ব্যাপার আছে, —অস্ত্যেবাত্র গুরুলঘুভাবঃ। এই ইঙ্গিতটা যে বড়র চেয়েও বড় রাজার দিকেই, সে কথা বুঝতে আমাদের দেরি হয় না।

রামায়ণের নীতি-ধর্ম

এক

সংস্কৃত সাহিত্যে 'অর্থগৌরব' বলে একটি শব্দ রসিক-সুজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। শব্দটির অর্থ—খুব কম সংখ্যক শব্দ প্রয়োগ করে বহু এবং গভীর অর্থের দ্যোতনা করা—অল্পীয়সাপি শব্দেন বহ্বর্থদ্যোতনম্। নীতি এবং ধর্ম শব্দদুটির আভিধানিক অর্থ নিশ্চয়ই আছে এবং তা আমরা জানিও, কিন্তু যে মুহূর্তে বলা হবে রামায়ণের নীতি এবং ধর্মের বিচার করতে হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই লেখক সমালোচক অথবা বক্তাকে রীতিমত অবহিত হয়ে বসতে হবে। কারণ লোক-সমাজে নীতি এবং ধর্ম শব্দ উচ্চারণ করলে যা বোঝানো যাবে, রামায়ণের নীতি এবং ধর্ম সেরকম নয়। মহাকাব্যের কবির মনোভূমি এমনই উচ্চাবাচ মনন-চিহ্নে চিহ্নিত যে, সেখানে 'নীতি' শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই কোনও আভিধানিক নৈতিকতা সংকেতিক হয় না, আবার কোথাও বা তা হয়ও। একইভাবে 'ধর্ম' শব্দের উচ্চারণেই যেমন লোক সমাজে ফুল-বেলপাতা, নৈবেদ্য অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ ওঁঙ্কার-বষট্‌কার মনে আসে, রামায়ণের সামাজিক পরিমণ্ডলে 'ধর্ম' শব্দের এই অভিধাবৃত্তি পদে পদে বিপর্যস্ত, আবার কোথাও বা তা নয়ও।

নীতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নী' ধাতু থেকে, যার অর্থ— যা নিয়ে যায়। অথবা আরও একটু বিশদ করে বললে বলা যায় যা টেনে নিয়ে যায়। বিশদর্থ বলার কারণ যিনি টেনে নিয়ে যান, তিনি হলেন 'নেতা', বস্তুত নেতা শব্দটিও এসেছে 'নী' ধাতু থেকেই। এবারে আরও বিশদর্থে 'নীতি' শব্দটা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— 'মানুষের তৈরি যে সমস্ত নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার নিজেকে এবং পরকে একটা সামান্য অধম স্তর থেকে উত্তম স্তরে উন্নীত করে বা টেনে নিয়ে যায়' সেটাই নীতি। 'নীতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ অনেকটা এইরকমই হওয়া উচিত।

অন্যদিকে ধাতুগতভাবে 'ধর্ম' শব্দটি আসছে 'ধৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ— যা ধারণ করে। ধর্মই মানুষকে ধারণ করে— ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। বিশদর্থে যে সমস্ত গুণ মানুষকে ধারণ করে, সেগুলির কথা বলতে গেলে মোটামুটি 'নীতি' শব্দের সাধারণ বিশেষণটাই প্রযুক্ত হবে। ধর্ম শব্দের বিশেষত্ব এইটুকু যে, নীতিশব্দের অন্তর্গত নিয়ম, শৃঙ্খলা, সদ্‌বৃত্তি, সদাচার, যা অনেকটাই ব্যক্তিগত স্তরে থাকে। সেইগুলি ধর্মশব্দের

প্রয়োগে এক বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে ধরা দেয়। অর্থাৎ ধর্ম ব্যাপারটা অনেকটাই বৃহত্তর সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় উপযোগী।

ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে যুগপৎ মুগ্ধ এবং ভাবিত, সেই ভাবনার দার্শনিকতার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন অর্জুন। তিনি বলেছেন—'ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা'। শুধু 'ধর্ম' নয়, শাশ্বত ধর্ম। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য হতেই পারেন। কিন্তু সেটা শাশ্বত ধর্ম নয়। দেশভেদে, কালভেদে, মনুষ্যভেদে যে ধর্ম বিভিন্ন, সেই ধর্মের কোন শাশ্বতিকতা নেই, কিন্তু দেশ, কাল, মনুষ্যের সমস্ত ভেদ অতিক্রম করে যে ধর্ম সমাজের উপকার সাধন করে, সেই ধর্মই শাশ্বত ধর্ম। অহিংসা, সত্য, ঋজুতা, সত্ত্ব—এই গুণগুলি যেহেতু সর্বকালের সর্বদেশের সকল মানুষই নীতিগতভাবে অতি উত্তম বলে মেনে নেবেন, তাই ধর্ম শব্দের উপলব্ধিতে এই শাশ্বতিকতা একান্তভাবেই ঈঙ্গিত। নীতিও তাই ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা ম্যাক্স হেবার 'মর‍্যালিটি' বলতে বুঝেছেন—only a strict compartmentalisation of private and social ethics.

কোন আলোচনার আগেই এটা বলে নেওয়া ভাল যে, ধর্মের নামে আজকে নিশ্চয়ই এক গভীর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই সংশয় মেটানোর জন্য আজকে অনেকেই স্বক্ষেত্র ছেড়ে জন-সমক্ষে ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাতে যন্ত্রণা আরও বাড়ছে। এঁদের স্বকপোল-কল্পিত ধর্মব্যাখ্যায় সরসতা যেমন আছে, তেমনই আছে 'অনুপাসিতগুরু'র অল্পজ্ঞতার যন্ত্রণা। এতে ধর্মও ব্যাখ্যাত হয় না, উপরন্তু অতিচতুরতার জ্বালায় স্বাভাবিক ধর্মচেতনা খণ্ডিত হয়। অন্যদিকে আছেন ধর্মজ্ঞ বলে পরিচিত সাম্প্রদায়িক মহান ব্যক্তিরা। তাঁদের চেতনা এতই দৃঢ়, তাঁদের ভাবনার মধ্যে কূপমণ্ডূকতার আপ্লুতি এতটাই বেশি যে, ধর্মের ব্যাখ্যায় তাঁরাও একই রকম বিকৃত। ঠিক এই রকম একটা দ্বৈরথের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে রামায়ণের নীতি-ধর্ম নিয়ে খানিকটা আলোচনা নিতান্তই অপেক্ষিত। এতে আর কিছু নয়, রামায়ণের নীতি এবং ধর্মবোধের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে যে জনচেতনা অনস্যূত হয়েছে, সেই চেতনাটুকু উত্তরাধিকারীর কৃতজ্ঞতায় অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, আর কিছুই নয়।

শুধু ধর্ম শব্দটিই আমাদের শাস্ত্রীয় পরম্পরায় কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও আগে একটু বুঝে নিই। প্রথম কথা, বেদ যে অখিল ধর্মের মূল অথবা ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-দর্শন থেকেও যে নানারূপ ধর্মের প্রসার ঘটেছে— এসব আমাদের প্রায় জানা কথা। মানুষ এবং সমাজের কথা যদি প্রথমে ভাবা যায়, তাহলে কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণের উপমাতেই সমাজ এবং ধর্মকে বুঝে নেওয়া সুবিধে। মানুষ যেমন আগে কথা বলেছে, তারপর মানুষের মুখ থেকে যথেচ্ছ উদগীর্ণ সেই ভাষাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে ব্যাকরণ, তেমনই আমাদের যে বিচলিত প্রাচীন সমাজ, তার মধ্যেও প্রথম শৃঙ্খলা এনেছে ধর্ম।

ধর্ম কেমন করে মনুষ্য-সমাজের সার্বত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে, তা উপনিষদে খুব সুন্দর করে বলা আছে, পরম ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন, তিনি নাকি একা একা এই দুনিয়াদারি রক্ষা করতে পারছিলেন না। তিনি সকলের ভালোর জন্য ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করলেন—তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্। ক্ষত্রিয়রা খুব বড়ো মানুষ হলেও, তাঁদের উৎকর্ষ সর্বাধিক হলেও তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় করবেন—এটাই ছিল ঈশ্বরের ঈপ্সিত। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় নিয়েও সমাজের ভাল চলছিল না বলেই তাঁকে বৈশ্য সৃষ্টি করতে হল— স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত, এবং এঁদের সবার পালন-পোষণের জন্য শূদ্রেরও সৃষ্টি করলেন পরিচারকের মতো, ইয়ং বৈ পূষয়েয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।

এই যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণের সৃষ্টি হল, তা কিন্তু দেবতার প্রতিরূপে। যেমন ক্ষত্রিয় দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, সোম ইত্যাদি। বৈশ্যরা হলেন গণদেবতা কারণ—প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জনে সমর্থাঃ—যেমন অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য। আর শূদ্র দেবতা হলেন পূষা। এই পৃথিবীই পূষা, কারণ পৃথিবীই সমস্ত মানুষকে পোষণ করে।

এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেও স্রষ্টার কিন্তু কোন তুষ্টি হল না, তাঁর দুশ্চিন্তাও রয়ে গেল যথেষ্টই। সমাজের কাজকর্ম চালানোও ভারী কঠিন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় স্রষ্টাকে আবারও বসতে হল সৃষ্টির তপস্যায়। সকলের ভালোর জন্যে এবার তিনি সৃষ্টি করলেন ধর্ম— শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ধর্মম্। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—শাসন-নিয়মনের জন্য তো ক্ষত্রিয় রাজারাই যথেষ্ট ছিলেন, আবার ধর্ম কেন? উপনিষদ বলল—ধর্ম হল ক্ষত্রেরও ক্ষত্র— তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্। দ্বিতীয় 'ক্ষত্র' শব্দটার অর্থ হল নিয়ামক। ক্ষত্রিয় রাজাকে ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষত্রিয়ের যে উগ্রতা তার চাইতেও ধর্মের উগ্রতা বেশি। আর এই উগ্রতা স্বভাবিক কারণেই মনুষ্য লোকে ব্যবহৃত 'উগ্র' শব্দটির কোনও আক্ষরিক অর্থ বহন করে না। এই উগ্রতার তেজ এমনই যাতে একজন দুর্বল, শক্তিহীন মানুষও বলবত্তর মানুষকে জয় করে নিতে পারে—অবলীয়ান্ বলীয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেণ। অর্থাৎ ধর্মের তেজ এমনই যে, একজন সাধারণ মানুষও শারীরিক এবং রাজনৈতিক শক্তিযুক্ত বলবত্তর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য ভাষায় এটাই হয়তো 'মর‍্যালকারেজ'।

লক্ষণীয়, এই শক্তির বলেই মহাভারতে এক সামান্য সারমেয় মহারাজ জনমেজয়ের সভায় নিজের প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিল, এই ধর্মের বলেই রামায়ণে ঈশ্বরের চিহ্নে চিহ্নিত রামচন্দ্রকে তিক্ততম ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন বালির স্ত্রী তারা। বস্তুত এই ধর্মকে সর্বনিয়ামক এবং সাংবিধানিক আইন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মনু মহারাজ এই ধর্মের নাম দিয়েছেন 'দণ্ড—দণ্ডং ধর্মং বিদু র্বুধাঃ। ধর্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য এই ধর্মের কথাই আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—ঈশ্বর ধর্মকেই দণ্ডের স্বরূপে তৈরি করেছিলেন—ধর্মো হি দণ্ডরূপেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।

উপনিষদ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করলে বোঝা যায়, এই ধর্মের চরিত্র যেহেতু সর্বতোভদ্রের ব্যাপ্তি বহন করে, বিশেষত এই ধর্মের প্রয়োগের ক্ষেত্রও যেহেতু বিশাল, তাই সমস্ত সমাজ এবং রাজনীতির নিয়ামক হিসেবেই এই ধর্মকে চিহ্নিত করা যায়। আমরা সময়মতো রামায়ণের ভিতরেও এই সর্ব-নিয়ামক ধর্মের প্রযুক্তি লক্ষ্য করব। একই সঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এই সাধারণ এক সর্বতো ব্যাপ্ত ধর্ম ছাড়াও আরও এক রকমের সাধারণ ধর্ম আছে— যাকে ধর্মশাস্ত্রকারেরা সাধারণ এবং সামান্য ধর্ম বলেন বলেই আমরাও তাঁকে সাধারণ ধর্ম বলছি। এই ধর্ম সবার ক্ষেত্রে একই রকমভাবে প্রযোজ্য এবং আমাদের বিচারে অনেকটাই নীতিঘেঁষা সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, পরোপকার, করুণা — ধর্মশাস্ত্রীয় বিচারে এইগুলিই সাধারণ ধর্ম। এর আগে আমরা এগুলিকে গীতার ভাষায় 'শাশ্বত' ধর্ম বলেছি।

এছাড়া যে সমস্ত নীতি এবং ধর্মের কথা রামায়ণের মধ্যে পাব, তার বেশির ভাগটাই নির্ভর করছে বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-ধর্মের ওপরে। এর ওপরে আছে অধিকারী-ভেদ, দেশ-ভেদ, কাল-ভেদ এবং যোনি-ভেদ। রাম যেটাকে ধর্ম মনে করছেন, লক্ষ্মণের কাছে সেটা ধর্ম নয়। আর্য-ভূখণ্ডে যেটা ধর্ম, বালি-সুগ্রীবের রাজ্যে সেটা ধর্ম নাও হতে পারে। পরশুরামের কাছে যেটা ধর্ম রামচন্দ্রের কাছে সেটা ধর্ম নয়। আবার যোনিভেদে, সীতার কাছে যেটা ধর্ম, সেটাও রামচন্দ্রের কাছে ধর্ম নয়।

এই স্বল্প-পরিসরে রামায়ণের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা নীতিধর্মের কূটস্থ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে উপরি-উক্ত সাধারণ এবং বিশেষ ধর্মের বিচার ছাড়াও আরও কিছু ধর্ম-প্রসঙ্গ আমাদের কথা প্রসঙ্গে উদাহৃত হবে, যা অমূলক তো নয়ই, বরঞ্চ রামায়ণ বলেই তা প্রাসঙ্গিক।

দুই.

সাধারণ নীতি ধর্ম

এই প্রসঙ্গে আগেই জানানো দরকার যে, রামায়ণে উচ্চারিত সত্য, ঋত, বা অহিংসার কথা বলতে গেলে তার অব্যবহিত পূর্বের যুগটি খেয়াল রাখতে হবে। এখানে আমরা অবশ্য রামায়ণের যুগ নিয়ে কোনো কথা বলব না। কেননা রামায়ণের পদাবন্ধ, সর্গবন্ধ, অধ্যায়কাল, এমনকি কান্ডগুলি নিয়েও প্রতিস্তর সমালোচনা যেমনটি চলে আসছে—অথবা যেমনটি শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধতিতে ব্রকিংটন সাহেব করে দেখিয়েছেন— তাতে গবেষকের নব-নবোন্মেষশালিনী প্রাজ্ঞমানিতা তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাতে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সযত্ন-লালিত কাব্যশরীরটি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে।

এর ওপরে আছে প্রক্ষেপবাদীদের অত্যাচার। এঁরা বিংশ শতাব্দীতে বসে, বিংশ শতাব্দীর রীতি-পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর ওপর শবসাধনা করেন। প্রক্ষেপবাদীদের এই প্রক্ষেপ-পঙ্ক একবার জমিয়ে তুললে গোটা রামায়ণটাকেই বেশ

একটা বড়ো পাঁক-পুকুর বলে মনে হবে। অপিচ সেই পাঁক খানিকটা হাতে তুলে বিংশ শতাব্দীর শত-সহস্র আকাঙ্ক্ষায় জর্জর, সংস্কৃত এবং সংস্কৃতির বর্ণহীন বালকদের প্রতি নিক্ষেপ করলে অতি মজার কৌতুক উপস্থাপন করা যায়, বালকেরা এই পঙ্ক উলটো দিকে প্রতিক্ষেপন করে। এতে আর কিছুই নয়, শুধু অযোধ্যার চেয়ে সত্য সেই কবির মনোভূমি, যা থেকে রস আহরণ করে কালিদাস-ভবভূতির 'কবিতা -কল্পনা-লতা' বিবর্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, কম্বন আলম্বন লাভ করেছেন, সেই মনোভূমি চিরকালের মতো এক পঙ্কোদ্ভেদে রূপান্তরিত হবে।

আমরা তাই রামায়ণের প্রতিস্তর আলোচনাতেও যাচ্ছি না, পঙ্কোদ্ধার-প্রক্রিয়াতেও আমরা নেই। বাল্মীকির রামায়ণ যেমনটি আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে সূত-মাগধদের স্থূল-হস্তাবলেপটুকু মেনে নিয়েই আমরা রামায়ণের নীতিধর্ম আলোচনা করব, এই নীতি ধর্মের পূর্বপরম্পরায় যেহেতু উপনিষদের কথা এসে পড়ে, তাই বলছিলাম—রামায়ণের সাধারণ নীতিধর্ম বুঝতে গেলে তার অব্যবহিত পূর্ব যুগের উপনিষদের কথাও আমাদের একটু শুনতে হবে।

উপনিষদ বলতে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকের মতো বড়ো বড়ো দার্শনিক ভাবযুক্তিতে ভরা কঠিন গ্রন্থগুলির পর্যালোচনার কোন প্রয়োজনও নেই এখানে। রামায়ণের মহাকবির হৃদয় বড়ো সরল, বড়োই সহজ। তমসার টলটলে জল দেখে তাঁর মনে হয়—এতটুকু কাদা নেই—অকর্দমমিদং তীর্থং— সৎ-মানুষের পরিস্কার মনের মতো নির্মল উদার এই জলরাশি,— রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা। বাল্মীকির হৃদয়ও তমসার জলের মতোই নির্মল, উদার, সরল। এখানে সামান্য পক্ষিনী তার সহচর থেকে বিযুক্ত হলে আমাদের মহাকবির মনে তার বিরহছায়া ভেসে ওঠে। রামায়ণের কবি তাই বড়ো বড়ো উপনিষদের 'মহাবাক্য' উচ্চারণের প্রযত্ন বাদ দিয়ে তিত্তিরী-পক্ষীর চঞ্চু-দষ্ট সাধারণ নীতি-ধর্মের অমৃত-ফলগুলি একটি একটি করে আমাদের আস্বাদ করতে দিয়েছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ আমরা পড়তাম ছোটবেলায়, যখন সুকুমার-মতি বালক-বালিকার নীতিবোধ তৈরি হয়। আমরা পড়তাম— সত্যং বদ, ধর্মং চর। অর্থাৎ প্রমাণ -পরীক্ষণের মাধ্যমে যাকে তুমি সত্য বলে জেনেছ, তুমি সেটাই বলবে। শাস্ত্র যে ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়েছে তুমি সেই ধর্ম পালন করবে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদপাঠে যেন অনবহিত হয়ো না। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হয়ো না। ধর্মানুষ্ঠানে অনবহিত হয়ো না— স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।... সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্

রামায়ণের সমাজে যে সাধারণ নীতি-ধর্ম, তার মধ্যে বেদবিহিত কর্মই প্রধান। প্রতিদিনের অগ্নিহোত্র, ত্রিসন্ধ্যা, স্নান, অথবা সন্ধ্যা-উপাসনার এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল যে, রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন, তখনও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি। মেয়েরাও যে এই বৈদিক নীতি-নিয়ম মেনে চলছেন, তার প্রমাণ পেয়েছি রামমাতা কৌশল্যার ব্যবহারে। কৈকেয়ীর মুখে বনবাসের প্রস্তাব শুনে রাম যখন জননী

কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন দেখেছি, তিনি ক্ষৌম বসন পরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য সমস্ত্র অগ্নিহোত্র করছেন— অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা। কে বলে মেয়েদের বেদে অধিকার ছিল না?

মায়েদেরই যখন এই অবস্থা তখন যথাবিধি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার লাভ করা ক্ষত্রিয়দের নিত্যক্রিয়া পদ্ধতিতে স্নান, আহ্নিক অগ্নিহোত্র যে থাকবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি? আরও আশ্চর্য হল বৈদিক নীতি-নিয়মের ওপর রামায়ণের সামাজিকদের নিষ্ঠা! কোথায় সেই নদ নদী পার হয়ে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাড়কা বধ করতে যাচ্ছেন, সেখানেও সকালের সূর্য উঠতে না উঠতেই বিশ্বামিত্র হাঁক ছেড়ে রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙাচ্ছেন— আরে রামচন্দ্র! ওঠ, ওঠ। সকাল হয়ে গেছে—পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। প্রতিদিনের স্নান-আহ্নিক করতে হবে না? ওঠ, শীগ্‌গীর ওঠ— উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্।

উপবীতী ব্রাহ্মণের বয়স যদি কম হয় অথবা তার প্রকৃতি যদি চঞ্চল হয়, তবে খেলার সাথী পেলে, বাড়িতে লোকজন এলে অথবা সে নিজে কোথাও বেড়াতে গেলে, অনেক সময় তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা ভুল হয়ে যায়। এরকম ভুল হলে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও গুরুজনেরা, পিতৃপুরুষেরা বালক ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা-বন্দনার কথা মনে করিয়ে দিতেন। এখানে এই নির্জন বনপথে বিশ্বামিত্র সেই গুরুজনের ভূমিকা পালন করছেন। মহর্ষির কথা শুনে রামচন্দ্র নদীতে স্নান করে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দিলেন। তারপর সন্ধ্যা করার জন্য জল তুলে আনলেন ঘট ভরে। সাবিত্রী মন্ত্র জপ করে, আহ্নিক সেরে সভ্রাতৃক রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির চরণ বন্দনা করলেন— কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

বলতে পারেন— আজকের সামাজিক বোধে সন্ধ্যা-আহ্নিক অগ্নিহোত্র কোন নীতি ধর্মের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রামায়ণের যুগে এগুলো নীতি না হলেও সামান্য ধর্মের মধ্যে পড়ে। অযোধ্যা নগরীর সাধারণ বর্ণনাতেই দেখতে পাই— অযোধ্যাতে আহিতাগ্নি ছাড়া ব্রাহ্মণ নেই, যাগযজ্ঞহীন অলসতা সেখানে ভাবাই যায় না, অথবা ক্ষত্রিয় পুরুষেরা সেখানে সবসময়ই ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা মেনে চলেন, এমন একটা জায়গায় মানুষের কাছে, সে তিনি সাধারণ মানুষই হোন, অথবা রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র, তাঁর কাছে এগুলি ধর্ম। বেদের বিধি অনুসারে পঞ্চ-মহাযজ্ঞের যে ইতিকর্তব্যতা আছে, সেগুলি হয়তো দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞের সঠিক অনুক্রমে রামায়ণে পাওয়া যাবে না, কিন্তু খাপছাড়া ভাবে দেবযজ্ঞের নমুনা অগ্নিহোত্র ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যাবে, পিতৃযজ্ঞের উদাহরণও তেমনই পিতৃপুরুষের তর্পণের মধ্যে পাওয়া যাবে। ব্রহ্মযজ্ঞের স্বাধ্যায় এবং সাবিত্রী মন্ত্র জপও ব্রাহ্মণ -ক্ষত্রিয়ের জীবনচর্যার প্রধান অঙ্গ হিসেবেই রামায়ণে পেয়েছি—স্নাত্বা কৃতৌদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্। এই শ্লোকে 'পরমং জপম্' বলতে গায়ত্রী জপ ছাড়া যে আর কিছুই বোঝা যায় না, তা টীকাকারদের ভাষণ

থেকেই সুপষ্ট বোধ হয়। তাঁরা বলেছেন, সাবিত্রী মন্ত্র ছাড়া পরম জপ বলতে আর কীই বা বোঝাতে পারে— তস্যা এব পরমত্বাৎ ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যমিতি বচনাৎ।

নৃযজ্ঞ অথবা নিত্য অতিথিসেবার বন্দোবস্ত রামায়ণের সমাজে গৃহ্যসূত্রের রীতি অনুসারেই করা হত। যিনি দয়া করে গৃহে আসবেন, তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য-মধুপর্ক দিয়ে বসানোটা সাধারণ নীতি ছিল। এমনকি অরণ্য-কান্ডে রাবণ যখন ব্রাহ্মণের বেশে সীতার কাছে এসেছেন, তখনও তাঁর অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি নষ্ট হয়নি। প্রথম দর্শনেই রাবণের মুখে নিজের শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেছিলেন সীতা, তাতে তাঁর সন্দেহের কারণ ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতিথিকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে তিনি অতিথির উপযুক্ত সেবায় মন দিয়েছিলেন— সর্বৈরতিথি-সৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী।

অতিথির যোগ্য অভিনন্দনের সঙ্গে সীতার তরফ থেকে আরও যা করণীয় ছিল, তা হল— এই আপনার কুশাসন। উপবেশন করুন আর্য। এই আপনার পা-ধোয়ার জল, আপনি গ্রহণ করুণ। বনজাত উত্তম অন্নও প্রস্তুত, আপনি ভোজন করুন। যেখানে নির্জন অরণ্য-কূটীরে বসে, কবে কখন কোন অতিথি এসে পড়েন সেই ভাবনায় সীতাকে পূর্বাহ্নেই সিদ্ধ বনজাত অন্ন প্রস্তুত করে রাখতে হয়েছে, সেখানে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অতিথি দেবের জন্য কতখানি দুশ্চিন্তা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অতিথি মান্যতা এতটা ছিল বলেই হয়তো সেই সুযোগে রাবণ শেষ পর্যন্ত সীতাকে হরণ করতে পেরেছিলেন।

রামায়ণে অতিথি সেবার মূল্য এতটাই যে, নৈমিত্তিক প্রয়োজন ঘটলে অতিথি-সেবার দৈনন্দিন আয়োজন বিরাট উৎসবের আকার ধারণ করত। একই ব্যক্তিকে উদাহরণ হিসাবে নিলে এ ব্যাপারটা বেশ ভালো বোঝা যায়। বনবাসের প্রথম দিনগুলিতে রামচন্দ্র যেদিন সস্ত্রীক সভ্রাতৃক মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে এসে উঠলেন, সেদিন মহর্ষির অতিথি-সেবার উপকরণের মধ্যে পা-ধোয়ার জল অথবা অর্ঘ্যোদক, বন্য ফল-মূল এবং নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি দুগ্ধবতী গাভীও ছিল, আর ছিল পরিধানের বস্ত্র।

অতিথিকে একটি গরু দেওয়া অথবা তাঁকে একটি পরিধেয় বসন দান করাটা এমন সাংঘাতিক বিশিষ্ট কোন ঘটনা নয়, তখনকার দিনের অতিথি-বাৎসল্যের উপকরণে এটুকু থাকতেই পারে। এমনকি 'অর্ঘ' শব্দের অর্থটা বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে পা-ধোয়ার জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চন্দন-কুঙ্কুমের অনুলেপন এবং তার সঙ্গে একটি ফুলের মালাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাতেও সেটা সাধারণ আতিথ্যই থেকে যায়। কিন্তু ওই একই ভরদ্বাজকে আবারও লক্ষ্য করুন, যখন ভরত-শত্রুঘ্ন বনবাসী রামচন্দ্রের অস্তানা খুঁজে বার করার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

প্রথম দিকে ভারতের গতিবিধি নিয়ে মহর্ষির কিছু সন্দেহ ছিল। কাজেই তাঁর আতিথেয়তার মধ্যেও ছিল সেই প্রথামাফিক ব্যবহার— অর্ঘ্য, পাদ্য, ফল-মূল। কিন্তু

যেই না ভরদ্বাজ বুঝলেন যে, ভরতের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তিনি বড় ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, তখন তিনি সানন্দে বললেন আরে! এখানে রাত্রিবাস তো তুমি করবেই কিন্তু আমাকে অন্তত অতিথি-সৎকারের সুযোগ দাও একটু। ভরত বললেন, এই বনের মধ্যে যা সম্ভব- পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল-মূল, সে সব তো আপনি যথেষ্টই আয়োজন করেছেন, আর কত— পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে। মহর্ষি বললেন, না, না ভরত! তুমি তোমার সেনাদের দূরে রেখে এসেছ কেন? তুমি ওদের নিয়ে এস। আমি ওদের একটু ভালো করে খাওয়াতে চাই—সেনায়াস্তু তথৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।

মহর্ষির কথা মানতেই হল ভরতকে। ভরত সেনা আনতে গেলেন। মহর্ষি ঢুকলেন অগ্নিশালায়। তপস্যার গৌরবে স্মরণ করলেন বিশ্বকর্মাকে—আতিথ্যস্য ক্রিয়া হেতো বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ। তিন লোকপাল ইন্দ্র, বরুণ, কুবেরকেও জানালেন মনের বাসনা। এখনকার দিন হলে বলতাম দেবতারা মহর্ষির অতিথি-সেবার কাজটি 'স্পনসর' করলেন, কিন্তু রামায়ণ যেহেতু বেদ এবং গৃহ্যসূত্রগুলির পরবর্তী কালের কবিকৃত, তাই বৈদিক দেবতাদের কাছে মহর্ষির এই আবেদনটুকু বড়োই যথার্থ মনে হয়। সেনাবাহিনীর আতিথ্য মানে মিলিটারি ফোর্সকে তুষ্ট করা। তাদের জন্য ভরদ্বাজের ব্যবস্থাও অন্যরকম। প্রসিদ্ধ মৈরয় মদ্য এবং অন্যান্য সুরার ব্যবস্থার সঙ্গে ঘৃতাচী-বিশ্বাচরী নৃত্য তথা অতি সুস্বাদু মাংস এবং অন্যান্য খাবার-দাবার—ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চুষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু— এই সব কিছু দিয়ে ভরদ্বাজ এমনই এক সাড়ম্বর আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন যে, ভরতের সৈন্যরা মদের ঝোঁকে ফতোয়া জারি করে দিল— ভরতের ভালো হোক, রামেরও ভালো হোক। আমরা অযোধ্যাতেও ফিরে যাব না, দন্ডকারণ্যেও যাব না, আমরা এখানেই থাকব—নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দন্ডকান্। সামান্য অতিথি-সৎকার মহোৎসবে পরিণত হল।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের চারটিই বলা হল, পঞ্চমটিই বা বাদ যায় কেন? পশুপক্ষীকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দেওয়াটা ভূতবলির মধ্যে পড়ে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে পশু-পক্ষীর জন্য কিছু খাদ্য বরাদ্দ থাকত এবং এই অভ্যাস নেমে আসছে রামায়ণের আমল থেকেই। রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশে একটি অরণ্য গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বস্তুত চিত্রকূটের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্মণকে তিনি বলেছিলেন, এখানেই কিছুদিন থাকা যাক, ভাই! জায়গাটা বেশ—অয়ং বাসো ভবেৎ তাত বয়মত্র বসেমহি।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে লক্ষ্মণ গাছ কেটে, কাঠ ফেড়ে পাতার ছাউনি তুলে বেশ সুন্দর একটি পর্ণকুটীর তৈরি করলেন। কিন্তু এই নির্জন পাহাড়ী জায়গায় অস্থায়ী পর্ণশালা তৈরি করলেও শাস্ত্রের বিধি-নিয়মে রীতিমত বাস্তুপূজা হল, হরিণ কেটে পশুবলি হল, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদিত হল, এমনকি বাড়ির সুরক্ষার জন্য

মঙ্গলমন্ত্রও উচ্চারিত হল। এর পরেই দেখছি চৈত্য এবং দেবালয় স্থাপন করে পশুদের জন্যও খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুমান করা যায়, বনের মধ্যে যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্মের এই নীতি-নিয়মগুলি পালন করে যাচ্ছেন, তাঁর আপন সমাজের মানুষেরা সেখানে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করার সময়- এই সমস্ত নীতিনিয়ম কত যত্ন করে মেনে চলত।

তবু বলি আধুনিক দৃষ্টিতে এগুলি কোন ধর্মও নয়, নীতিও নয়;এগুলি তৎকালীন সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কর্তব্যমাত্র। তবুও যে এই কর্তব্যরূপ নীতি-নিয়মের কথা বললাম, তার কারণ অমাদের যুগে না হলেও রামায়ণের যুগে এগুলি অন্তত ধর্মের মধ্যেই পড়ত। এটাকে যুগধর্ম বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ বর্তমান যুগের মানুষের অন্ন-পানের ব্যস্ততায় যে ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, আজ থেকে আড়াই/তিন হাজার বছর আগে সেটা ধর্মের সংজ্ঞায় অভিহিত করা অন্যায় নয়। মনু বলেছেন, মহাভারত বলেছে—সত্যযুগে যেটা ধর্ম ত্রেতায় সেটা ধর্ম নয়, আবার দ্বাপরে যা ধর্ম কলিযুগে তা নয়। যুগের পরিবর্তনে মানুষের শক্তি বুঝে ধর্মের পরিবর্তন হতেই পারে— অন্যে কলিযুগে নৃনাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।

সাধারণ ধর্মের মধ্যে রামায়ণে যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল বলে মনে হয়, সেটা হল সত্য, এই 'সত্য' বলতে যেমন সত্য কথা বলা বুঝি, তেমনই রামায়ণে তার থেকেও বেশি বুঝি সত্যরক্ষা। সত্য আর সত্যরক্ষা কে নয়। সত্য বলতে এমন একটা নৈতিকতা বোঝানো যায়, যার ভাই-বোন-বন্ধুরা হল অহিংসা, ক্ষমা, উপকার, শম, দম, শীল ইত্যাদি। কিন্তু সত্য রক্ষার মধ্যে যেন সত্যের সঙ্গে খানকিটা ক্ষত্রিয় বর্ণধর্ম মেশানো আছে। কথা দিয়েছি, কথা রাখতে হবে, প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে— তা সে যাই হোক, ধন, মান, প্রাণ, যাই যাক, সব কিছুর বিনিময়ে এই যে সত্যরক্ষার ধর্ম—এর মধ্যে স্নিগ্ধ সত্যের চেয়েও অন্য এক দৃঢ়তা আছে এবং এই দৃঢ়তা দিয়েই কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্যের জমি তৈরি হয়।

সত্য জিনিসটা যদি মনু-মহারাজের বিধি অনুযায়ী মানসিক শব্দ তাৎপর্যের কোনো উপকরণ মাত্র হত, তাহলে রামায়ণ মহাকাব্যের সাড়ম্বর ঐশ্বর্যের মধ্যে সে শুধুই এক নীতিসার উপদেশের প্রয়োজন মেটাত। তেমন উপদেশ অনেক আছে রামায়ণে। অথবা সত্য যদি বিজ্ঞানস্বরূপ অপার আনন্দময় কোন অবিকারী ব্রহ্মস্বরূপকে বোঝাত, তাহলে এই মহাকাব্যের মধ্যে তার স্থান হত মুনি-ঋষিদের মুখোদ্‌গীর্ণ কোন দার্শনিক তত্ত্বের মতো, যদিও রামায়ণে ব্রহ্মতত্ত্বের পর্যায় হিসেবে সত্যের উপদেশ প্রায় নেইই। রামায়ণে সত্য অনেকটাই সত্যরক্ষা অথবা প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তায় চিহ্নিত। এ সত্য যেন ঠিক ব্রাহ্মণের সত্য নয় এ যেন ক্ষত্রিয়ের সত্য। তবে এই সত্যও মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল— ব্যক্তি-চরিত্রের দৃঢ়তা বা শিথিলতা অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা বা সত্যপালনের ভিন্নতা দৃষ্ট হলেও, এই সত্যই কিন্তু রামায়ণের ধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে এই পৃথিবীতে ধর্মই

সবচেয়ে বড় কথা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ধর্মেই— ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

ব্যক্তি-চরিত্রের শিথিলতায় এই সত্যরক্ষার ধর্মও কেমন শিথিল হয়ে যায়, তার সবেচেয়ে বড় উদাহরণ হল দশরথ। একেবারে রামায়ণের আদিকান্ডের দিকে তাকান। রাম-লক্ষ্মণ তখন কেবল কৈশর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ওদিকে তাড়কার উপদ্রব ঠেকাতে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় উপস্থিত হলেন রাজা দশরথের কাছে। প্রথম দিকে আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিল না। বিশ্বামিত্র আসছেন শুনেই রাজা দশরথ পাত্র-মিত্র-পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে কত দূর পথ এগিয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে দশরথ বললেন—অমৃত লাভ করলে যেমনটি, খরার পরে বৃষ্টি হলে যেমনটি, পুত্রহীনের পুত্র হলে যেমনটি, হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেলে যেমনটি, আমার ঘরে আপনার এই আগমনও সেইরকম — তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।

স্বাগতভাষণ এবং অ্যাপায়ণের পরে দশরথ বেশ প্রফুল্লমনে, বেশ আনুষ্ঠানিকভাবেই বললেন, বলুন মহর্ষি! আপনার কাজটা কি? আমি খুশি হয়েই সে কাজ করব—কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ। আজকে আপনি এখানে এসেছেন, আমার জন্ম সার্থক' জীবনও সার্থক। আপনাকে চোখে দেখতে পেলাম, আজকের দিন বড়ো শুভ— সুপ্রভাতো নিশো মম।

মুনির আগমনে দশরথ কৃতকৃতার্থ বোধ করছেন, একথা বলাই বাহুল্য। যে মুনি আপন উগ্র তপস্যার প্রভাবে রাজর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষির পদবী লাভ করেছেন, তাঁর তপস্যার উগ্রতা কখনও যদি বা অভিশাপের উগ্রতায় পর্যবসিত হয়— সেই ভয়ও হয়তো একটু তাঁর ছিল। কাজেই আপন স্বভাবের উদ্বেল উচ্ছাসের সঙ্গে ভক্তি এবং অভিশাপের ভয় মিশে যাওয়ায় দশরথ বলেই ফেললেন, বলুন কি চান, কিজন্যই বা আপনি এখানে শুভাগমন করেছেন? আপনার কাজটা করা সম্ভব কি অসম্ভব, সেসব ভাবনা আপনার নয় মুনিবর!—কার্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত— আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব। আপনি আমার দেবতা, যা বলবেন, তাই করব।

এমন কথা শুনতে কার খারাপ লাগে? বিশ্বামিত্রের খুব ভাল লাগল। এই কথা ভেবেই ভাল লাগল যে, তিনি যা চান, তাই পাবেন, অন্তত রাজার কথা শুনে তাই মনে হয়েছে তাঁর— ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং/শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্। কিন্তু রাজার এই সাবেগ অঙ্গীকার শুনেছেন বলেই বিশ্বামিত্রের মনে কিছু সন্দেহ আছে।

রাজা দশরথকে তিনি তাই বেশ সতর্ক করে বললেন, আমার কিন্তু সত্যিই একটা প্রার্থনা আছে, মহারাজ। আপনি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে বলুন, আমার কথা রাখবেন—কুরুষ্ব রাজশার্দুল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ।

বিশ্বামিত্র তাঁর সমস্যার কথা সবিস্তারে বললেন। বললেন, অনার্য রাক্ষসদের

কথা, যাঁরা সব সময় মুনিদের যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন করে। বিশেষত তিনি বললেন, মারীচ এবং সুবাহুর কথা, যারা নিরন্তর বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলে রক্ত ফেলে, নোংরা ফেলে অপবিত্র করে দেয় যজ্ঞক্রিয়ায় ব্রতী হয়ে বিশ্বামিত্র এদের অভিশাপ দিয়েও অভিভূত করতে চান না, কারণ অহিংসা-মণ্ডিত যজ্ঞচর্যার মধ্যে ক্রোধমূলক অভিশাপের উচ্চারণ শমপ্রধান মুনিকে মানায় না— তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।

সমস্ত ঘটনা নিবেদন করে মুনিঋষিদের তপোবিঘ্ন নিবারণের জন্য বিশ্বামিত্র এবার দশরথকে বলেলেন— মুনি-ঋষিদের যজ্ঞনাশী এই রাক্ষসদের বিতাড়নের জন্য আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবক রামচন্দ্রকে আমার হাতে কিছু দিনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, রাজা—স্বপুত্রং রাজশার্দুল রামং... মে দাতুমর্হসি। বিশ্বামিত্র অন্বয়- ব্যতিরেকের পদ্ধিতিতে আগেই বুঝিয়ে দিলেন রামচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ গেলে তাঁর চলবে না, কারণ রাম ছাড়া অন্য কেউ সেই দুই রাক্ষসকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন না— ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্। বিশ্বামিত্র তাঁর সময়সীমা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে বললেন, দশ দিন ধরে এই যজ্ঞ চলবে, অতএব অন্তত দশ দিনের জন্য রামচন্দ্রের উপর আপনার স্নেহধারা রুদ্ধ করতে হবে— ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব। সবার শেষে বিশ্বামিত্র দশরথকে তাঁর পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথাও প্রকারন্তরে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যদি এই সংসারে ধর্মলাভ করতে চান অপিচ প্রতিজ্ঞাত সত্যের পালনে যে যশোলাভ হয়, সেই যশেও যদি আপনার লিপ্সা থাকে— যদি তে ধর্মলাভস্তু ফলশ্চ পরমংভুবি—তাহলে রামকে ছেড়ে দিন আমার হাতে।

দশরথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মহূর্তের জন্য তিনি যেন সংজ্ঞ হারালেন। তারপর বিশ্বামিত্রের কাছে অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করলেন সপ্রবন্ধে . সনির্বন্ধে। পনেরো বছরের বালক রামচন্দ্র যে কোনমতেই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না, তার যে কোন অস্ত্রজ্ঞান নেই, কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই— ইত্যাদি নঞর্থক বাক্যে রামচন্দ্রের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করে দশরথ চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী নিয়ে নিজে যেতে চাইলেন রাক্ষসবধের জন্য। ক্রৌঞ্চ-বিরহী কবি একপাদ শ্লোকাংশমাত্র— ন রামং নেতুমর্হসি—বারবার ব্যবহার করে পুত্রের জন্য দশরথের স্নেহ, প্রীতি, হৃদয়-যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি যে সত্যরক্ষায় অক্ষম এক ক্ষত্রিয়, স্নেহ-মমতায় আকুল এক জীর্ণ মনুষ্য— সেটাও ফুটিয়ে তুললেন কারুণ্যের ব্যঞ্জনায়।

দশরথের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র মুনি রঘুবংশের সর্বাঙ্গীন মাহাত্ম্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, আগে প্রতিজ্ঞা করে এখন সেই সত্য থেকে আপনি সরে আসছেন— পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি? এই কি রঘুবংশের কোন জাতকের উপযুক্ত ব্যবহার? রঘুকুলের এ কি বিপর্যয় ঘটল? বিশ্বামিত্র রঘুবংশীয় রাজার প্রতি কোন অভিশাপ উচ্চারণ করলেন না, এমনকি সাংঘাতিক কোন কটু কথাও বললেন না, যেমনটি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বরঞ্চ তির্যক ভঙ্গীতে অত্যন্ত

দার্শনিকভাবে দশরথকে জানালেন, আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা না পালন করাটাই শ্রেয় মনে করেন, তাহলে বেশ, আমি চলি। আপনি পূর্বকৃত সত্য থেকে চ্যুত হয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরমানন্দে কাল যাপন করুন।

বিশ্বামিত্র দশরথকে সম্বোধন করেছেন —'কাকুৎস্থ' বলে যাতে এই মহান বংশের ঊর্ধ্বতন সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজাদের পূর্ব ব্যবহার তাঁর স্মরণে আসে, যাতে ব্রাহ্মণ মুনিঋষির কারণে কাকুৎস্থ থেকে আরম্ভ করে ইক্ষাকু-রঘুদের সবার আত্মত্যাগ তাঁকে লজ্জিত করে। কোন রঘুবংশীয় রাজা যদি পুত্র-পরিবারের মমতায় সঙ্কুচিত হয়ে হীনপ্রতিজ্ঞ বা মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হন, তা যে কত বড় অধর্ম এবং অপমানের কথা হবে, সেটা তির্যকভাবে বিশ্বামিত্র বুঝিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ দশরথ যে তাতে খুব বিপর্যস্ত বোধ করলেন, তা মোটেই নয়। শেষে বিশ্বামিত্র যখন চলে যাচ্ছেন, সেই অবস্থায় তাঁর কুলপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার সূত্র ধরেই দশরথকে বললেন— মহারাজ! আপনি না ইক্ষ্বাকুর বংশে জন্মেছেন! লোকে আপনাকে ধর্মের স্বরূপ বলে মনে করে। আপনার মতো ধীর-স্থির এক রাজার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা কি মানায়?

যে দশরথকে ধর্মের স্বরূপ বলা হচ্ছে, ইক্ষ্বাকু-রঘুদের বংশধর্মের যিনি অধস্তন আধার, তাঁরই ধর্মলোপের প্রসঙ্গ আসছে কেন? কোন ধর্মের বিচ্যুতি ঘটছে এখানে? বশিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—প্রতিশ্রুতা করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ— যে কাজ আপনি করবেন বলে বিশ্বামিত্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে কাজ এখন না করলে আপনার যে ইষ্টাপূর্তের সমস্ত ফলই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এখনই রামকে পাঠান।

'ইষ্টাপূর্ত' শব্দটি পারিভাষিক। 'ইষ্ট' মানে অশ্বমেধাদি যাগ, আর 'পূর্ত' মানে জনকল্যাণমূলক কর্ম, যেমন পুকুর কাটা, কুয়ো খোঁড়া, ব্রিজ বানানো ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অগ্নিষ্টোম থেকে আরম্ভ করে অশ্বমেধ পর্যন্ত যাগের যে অপূর্ব ফল, তথা গুণকীর্তন করা হয়েছে, তার থেকেও ক্ষত্রিয়ের সত্যরক্ষার ধর্ম বড়ো। সেই ধর্ম থেকে চ্যুত হলে বহুপুণ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দ্বারা পূর্ব সঞ্চিত অপূর্ব ফলও নষ্ট হয়ে যায়। পুকুর কেটে, বৃক্ষরোপণ করে, কুয়ো খুঁড়ে রাজারা যে প্রজাদের হিতসাধন করতেন, সেই পুণ্যও নষ্ট হয়ে যায় ক্ষত্রিয়ের সত্য প্রতিজ্ঞা নষ্ট হলে। ইক্ষ্বাকুবংশের অতুল কীর্তি এবং সত্যপ্রতিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুজনেই দশরথকে ধর্ম ত্যাগ করতে বারণ করেছেন এবং এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ইক্ষ্বাকুদের সত্যপ্রতিজ্ঞতায়। অর্থাৎ ধর্ম মানেই এখানে প্রতিজ্ঞা পালন। স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজারা কেউ কোনদিন মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ বলে প্রমাণিত হননি, কিন্তু ইক্ষ্বাকু দশরথ যা পূর্বে বলেছেন, কেন তা করছেন না, এতে যে শুধু ক্ষত্রিয়ের সত্যধর্ম নষ্ট হচ্ছে তাই নয়, অত্যন্ত রূঢ় অর্থে যে ক্রিয়াকল্যাণকে আমরা ধর্ম বলি, সেই যাগ-যজ্ঞের পুণ্যফল এবং পরোপকারের পুণ্যধর্মও এখানে বিপন্ন।

আমরা জানি দশরথ বশিষ্ঠের কথা মেনে শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে

পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ সে যাত্রায় তাঁর সত্যরক্ষার ধর্ম রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে যে সত্যপ্রতিজ্ঞতা সম্বন্ধে দশরথ এত সচেতন কখনই ছিলেন না, বরঞ্চ বলা ভাল, এ বিষয়ে তিনি একটু বেশি আবেগপ্রবণই ছিলন। সোজা কথায়, প্রতিজ্ঞা করতে তাঁর সময় লাগত না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা-পালনের কাল এলে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে দুর্বল করে তুলত। এই দ্বিধার জন্যই সত্য পালনের ধর্ম তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে একাধিকবার, এবং এই বিড়ম্বনার চরম প্রকাশ ঘটেছে কৈকেয়ীর সামনে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক -প্রক্রিয়া যখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই কুব্জা মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়ে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। মহারাজ দশরথের ইচ্ছা এবং অযোধ্যার সামগ্রিক জনমতের বিরুদ্ধে কৈকেয়ী যে এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ একটাই—তাঁর একটা সুযোগ ছিল। পূর্বে রাজা দশরথ তাঁকে দুটি বর দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই বর কৈকেয়ী সেই সময় নেননি, পরে চেয়ে নেবেন বলে রাজাকে জানিয়েছিলেন। রাজাও সেই মতো কথা দিয়েছিলেন।

বরযাচনার পরিস্থিতি তখন যেমন ছিল, তাতে কৈকেয়ীর মনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না। দানব শম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মহারাজ দশরথ দেবপক্ষ সমর্থন করেন এবং দেবতাদের অনুরোধে শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহারাজ দশরথ ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হলে মহারাণী কৈকেয়ী তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাতেও তাঁর দানবদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কৈকেয়ী দ্বিতীয়বার যুদ্ধশ্রান্ত দশরথকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একদিকে যেমন তাঁর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁকে শুশ্রূষা করে, ক্ষত-মুক্ত করেন। সকৃতজ্ঞ দশরথ কৈকেয়ীকে একসঙ্গে দুটো বর দিতে চাইলেন—তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌবরৌ শুভদর্শনে। কৈকেয়ী তখন যে মানসিক অবস্থায় ছিলেন, তাতে তাঁর একান্ত করণীয় সেবা-শুশ্রূষার জন্য এই প্রতিদান নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।। বর দুটি তিনি পরে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন।

আজও সেই মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। বরের কথা তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টা মন্থরা বরের কথা ভোলেননি। তারই কুপরামর্শে উত্তেজিত হয়ে আজ তিনি বর লাভ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেই প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হয়ে বিস্রস্তবাসে একা বসেছিলেন, আর তখনই দশরথ এসে তাঁর মান ভাঙানোর চেষ্টা আরম্ভ করেছেন। এতকাল পরে বিস্মৃত দুটি বর চাইবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য কৈকেয়ীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। এমনিতেই রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন এবং ক্রৌঞ্চবিরহী কবির ভাষায় এটাকে কামোন্মত্ততা বলাই ভাল—তং মন্মথ শরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্। অতএব দশরথ যখন বললেন, আমি ধর্ম সাক্ষী করে বলছি—সুকৃতেনাপি তে শপে, আমি আমার ছেলের নামে শপথ করে বলছি—তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে চ বচনক্রিয়াম্,

তখন কৈকেয়ীও সোচ্চারে বলতে আরম্ভ করলেন, সাক্ষী থাকুন দেবতারা, সূর্য-চন্দ্র সাক্ষী থাকুক, গন্ধর্ব-রাক্ষস এই জীবজগতের মানুষও সাক্ষী থাকুক, কেননা সত্যসন্ধ, সত্যবাদী ধর্মজ্ঞ দশরথ কথা দিচ্ছেন যে, তিনি আমায় বর দেবেন—বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দেবতাঃ।

দেবতাদের সবাইকে সাক্ষী মেনে কৈকেয়ী এবার তাঁর স্বামীকে সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এখনকার বর-দানের প্রসঙ্গটা যদি তাঁর কান্নাকাটি এবং বায়নার জন্যই মেনে নিতে হচ্ছে বলে পরে উড়িয়ে দেন দশরথ, অতএব দশরথেরই পূর্ব-প্রতিশ্রুত বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কৈকেয়ী। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, তুমি ধর্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন যদি তুমি সেই বর না দাও—তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেন ন চেদ্ দাস্যসি মে বরম্—তাহলে আজকেই আমি আত্মহত্যা করব। সঙ্গীতমুগ্ধ হরিণ যেমন ব্যাধের মায়াপাশে বাঁধা পড়ে, দশরথও তেমনই কৈকেয়ীর কথার মায়ায় তাঁর জালে ধরা পড়লেন। কৈকেয়ী তাঁর ঈপ্সিত বর-দুটির কথা দশরথকে শোনালেন, রামকে বনবাসে পাঠাতে হবে এবং ভরতকে রাজা করতে হবে। পরিশেষে আবারও একবার মহারাজার সত্যপ্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করেই কৈকেয়ী বললেন, আমি আজই কিন্তু দেখতে চাই যে, রাম বনে চলে গেছে—অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে।

দশরথ কৈকেয়ীকে অনেক বোঝালেন, রামের অসংখ্য গুণাবলী প্রকাশ করে, কৈকেয়ীর ওপর রামচন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে দশরথ অনেক বোঝালেন কৈকেয়ীকে। তিনি পূর্বে বরদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এখন সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে যে বড়ো অধর্ম হবে সে সম্বন্ধেও দশরথের নিশ্চিত ধারণা আছে। এই অধর্ম যাতে না হয়, সেজন্য তিনি কৈকেয়ীর পায়ে ধরে বলেছেন—অঞ্জলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে—তুমি এই বর চাওয়া থেকে বিরত হও, তুমি রামের আশ্রয় হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন কর। এই বর-যাচনা প্রত্যাহার করলে আমি হীনপ্রতিজ্ঞতার অধর্ম থেকে বাঁচতে পারি কৈকেয়ী—মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ।

সত্যি কথা বলতে কি, দশরথকে যতই 'কামমোহিত' বলি, কৈকেয়ীর সামান্য ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারেন, এ কথাও না হয় বিশ্বাস করে নিতে পারি, কিন্তু কৈকেয়ীর মুখে তাঁর অদ্ভুত বায়না শোনার পর তিনি মোটেই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি রাগ করেছেন, গালমন্দ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, আবার অনুনয়ও করেছেন, ভালবাসার কথাও বলেছেন, পায়েও ধরেছেন। অতএব কোন কিছুরই পিছনেই এখন তাঁর কামাতুরতা প্রমাণ করা যায় না। কেননা কৈকেয়ীর কথা তিনি মেনে নেননি, তিনি নিজেরই প্রতিজ্ঞার ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন অতর্কিতভাবে। কৈকেয়ীর প্রতি দুর্বলতার থেকেও তাঁর সরল স্বাভাবিক মানসিক দুর্বলতাই তাঁকে আজ বিপদে ফেলেছে।

বিপন্নতার সময় সুরক্ষিত শুশ্রূষিত হয়ে হটহাট করে দশরথ বরদানের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে যে খুব অন্যায়ও ছিল তাও তো নয়। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি যে এমন বিপরীতভাবে কোনদিন ফিরে আসবে, কৈকেয়ী যে কোনদিন এমন মৃত্যুর মতো বর চেয়ে বসবেন, দশরথ একথা বোধকরি স্বপ্নেও কখনও ভাবেননি। প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, সত্য, সত্যরক্ষার বন্ধন যে কোনদিন এমন কঠিন শৃঙ্খলে দশরথকে বেঁধে ফেলবে, তা অতি-আবেগপ্রবণ দশরথের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই দশরথ আজ বিপদে পড়েছেন। রাগ দেখিয়েই হোক অথবা কৈকেয়ীর পায়ে ধরেই হোক, তিনি এখন কোনও মতে হীনপ্রতিজ্ঞতার দায় থেকে বাঁচতে চাইছেন। কৈকেয়ী আপাতত তাঁর বর চাওয়া থেকে বিরত হলেই দশরথ তাঁর সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

কিন্তু কৈকেয়ীর মাথায় তখন মন্থরার কুবুদ্ধি ঢুকেছে। তিনি বিরত হবেন কেন? অতএব সত্যরক্ষার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েই কৈকেয়ী বললেন—তুমি আগে বরদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন অনুতাপ করছ, তুমি কি মনে কর এর পরেও পৃথিবীর কোন মানুষ তোমাকে ধার্মিক বলে মানবে, নাকি তুমি নিজেও নিজেকে ধার্মিক বলে প্রমাণ করতে পারবে কখনও—ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি? তোমার কাছে যখন রাজ-রাজড়ারা, রাজর্ষি-মহর্ষিরা এসে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন—তখন কি তুমি বলবে যে, আমি যাঁর জন্য বেঁচে আছি, যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, সেই কৈকেয়ীর কাছে আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি তা পালন করিনি—তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকেয্যা ইতি বক্ষ্যসি?

কৈকেয়ীর মুখে এই সব কথা শুনে দশরথের বিলাপ করা ছাড়া অন্য কোন গতি ছিল না। অনুনয়, বিনয়, ক্রোধ, গালাগালি—সব কিছুই বিফল হয়ে গেলে মানুষ বিলাপ করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারে? দশরথও তাই করেছেন। কৈকেয়ী দশরথের সত্যরক্ষার দুর্বল জায়গাটা দৃঢ় করে ধরেছেন। পূর্ব পূর্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাদের কথা, শিবি-অলর্ক ইত্যাদি সত্যপরায়ণ রাজাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৈকেয়ী দশরথের প্রতিজ্ঞার সত্যকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের অপর পর্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কৈকেয়ী বলেছেন, সত্যকেই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম ধর্ম বলে জানে, আর আমি সেই সত্যকে আশ্রয় করেই তোমাকে ধর্মের পথে চালিত করার চেষ্টা করেছি—সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতি চোদিতঃ।

অর্থাৎ অতিতির্যকভাবে বিচার করলেও রামচন্দ্রকে বনে পাঠানো অথবা ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে কৈকেয়ী যেন ততটা চিন্তিত নন, এই ব্যাপারগুলো যেন তেমন বড়ো কিছু নয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেহেতু প্রতিশ্রুত সত্য পালন করার সুযোগ পাচ্ছেন দশরথ, অতএব কৈকেয়ী স্বামীকে সেই সুযোগ দিয়ে তাঁর ধর্মসহায় হবার চেষ্টা করছেন। একজন আদর্শ ধর্মসঙ্গিনীর মতো কৈকেয়ী তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন—যদি ধর্মেই তোমার অভিনিবেশ থাকে তবে সত্যকে সম্যকভাবে অনুসরণ কর— সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ। কেননা, 'সত্য' নামক

একপদেই পরব্রহ্মের প্রকাশ, সত্যের মধ্যেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সত্যই বেদ, এবং সত্যের দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার পরম পদবী লাভ করা যায়।

কৈকেয়ী যে সত্যের কথা বলছেন, সেই সত্যই পর-ব্রহ্ম অথবা বেদ কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু এই সত্য যে এখনকার দিনের নীতিতে ধর্ম অবশ্যই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৈকেয়ী অবশ্য এই সত্যধর্মের উপদেশ দিয়েই বিরত হননি, সঙ্গে বারংবার সেই তাড়না ছিল—রামকে বনে পাঠাতেই হবে, ভরতকে রাজ্য দিতেই হবে, নইলে তোমার নিস্তার নেই। দশরথ সে কথা বুঝেছেন। কৈকেয়ীর প্রতি অতি কামাবেশ নয়, অতি মোহও নয় তিনি নিজেরই জালে নিজে আটকে পড়েছেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার ধর্মই তাঁকে সবচেয়ে বড়ো ফাঁদে ফেলেছে। তিনি নিজেও বলেছেন, ধর্মের ফাঁসে বাঁধা পড়েছি আমি, আমার চেতনাটাই বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে—ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।

আমরা জানি—দশরথের এই সত্যপ্রতিজ্ঞা ঠিক রাখবার জন্যই রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল। অর্থাৎ পিতার সত্য পালনের দায় রামচন্দ্রের ঘাড়ে বর্তেছিল। রামচন্দ্রকে বনে যাবার কথা দশরথ নিজমুখে বলতে পারেননি। সেটা বলেছেন কৈকেয়ী। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছেও নিজের ঈপ্সিত প্রকট করার আগে তাঁর কাছেও ওই একই ধর্মের গান গেয়েছেন কৈকেয়ী। তিনি রামচন্দ্রের কাছে দশরথের নামে মৃদু অনুযোগ করে বলেছেন, রাজা দশরথ আমার কাছে যা শপথ করে বলেছিলেন, এখন সেটা অন্যথা করার চেষ্টা করছেন। জল বেরিয়ে গেলে যেমন বাঁধ বাঁধার মানে হয় না, তেমনই একবার 'দেব' বলে পরে 'দেব না'—অতিসৃজ্য দদামীতি—বলাটাও অর্থহীন এক কপটতা। কেননা, তুমি তো বেশ ভালই জান যে, সত্য হল সমস্ত ধর্মের মূল—ধর্মমূলমিদং রাম বিদ্বিতঞ্চ সতামপি। তাছাড়া তোমার বাবা তোমারই জন্য আমার ওপর রাগ করে যাতে অন্তত সত্য পরিত্যাগ না করেন, সেটাও তোমার ভাবা উচিত।

কৈকেয়ীর এই কথা শুনে রামচন্দ্র ধিক্ শব্দ উচ্চারণ করে বলেছিলেন—এমন করে বলবেন না, দেবী। পিতার কথায় আমি অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, ডুবতে পারি অতল সমুদ্রে। তার ওপরে তিনি শুধু আমার পিতাই নন, তিনি আমার গুরু এবং রাজা। আপনি বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, পিতা যা চান আমি তাই করব, কারণ, রামচন্দ্র কখনও দুরকম কথা বলে না—করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে।[১১]

'রামো দ্বির্নাভিভাষতে'—এই একটি মাত্র পংক্তির মধ্যেই পূর্ববর্তী সত্যরক্ষার বিষয়ে দশরথের দ্বিচারিতা যেমন বিপ্রতীপভাবে ফুটে ওঠে, তেমনই অন্যদিকে রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি যে কত অমোঘ, প্রতিজ্ঞাত সত্য রক্ষার জন্য তাঁর দায়বদ্ধতা যে কত প্রসারিত, সে কথাও বড়ো বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র দু-রকম কথা বলেন না, তিনি মিথ্যা কথা বলেন না—এই শব্দগুলি প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছলেও দুর্জনেরা রামচন্দ্রের দ্বিচারিতার প্রশ্ন তোলেন শূর্পনখার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে। তাঁরা

বলেন রামচন্দ্র শূর্পনখার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিলেন সমস্ত সততা এবং ঋজুতার মাত্রা বহন করে। স্বয়ং মহাকাব্যের কবি সেখানে বলেছেন। মিথ্যা ব্যাপারটা রামচন্দ্রের মোটে পছন্দ নয়—অনৃতং ন হি রামস্য কদাচিদপি সম্মতম্। অথচ সেই রামচন্দ্র শূর্পনখার কাছে নিজের ভাই সম্বন্ধে নিপাট মিথ্যে কথা বললেন? তিনি বললেন, আমার ভাই অবিবাহিত। দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনই তার চরিত্রগুণ—শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্। তোমার সঙ্গে ভারী ভাল মানাবে।

রামায়ণের টীকাকারেরা রামচন্দ্রের সত্যবাদিতার নীতি-নিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্য রামায়ণের কবির স্বেচ্ছাব্যবহৃত শব্দগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে সত্যবাদী রামচন্দ্রের কথা মিথ্যে না হয়ে যায় তাঁরা বলেছেন—'অকৃতদার' শব্দের অর্থ করেছেন 'অসহকৃতদারঃ'—অর্থাৎ এর বিয়ে হয়েছে বটে, বউ তাঁর সঙ্গে নেই। টীকাকারেরা রামায়ণের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, রামচন্দ্র পরিহাস করবার সময়েও বিফল মিথ্যে কথা বলেন না—ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি। এই প্রসঙ্গে সুগ্রীবের কাছে রাম যে বলেছিলেন আমি অনেক বিপদে পড়েও কখনও মিথ্যে কথা বলিনি—অনৃতং নোক্তপূর্বং মে বীর কৃচ্ছ্রেঽপি তিষ্ঠতা—সেই প্রমাণও টীকাকারেরা উদ্ধার করেছেন।

আমরা যারা রামায়ণের পাঠক, আমরা যারা বাল্মীকির কবিকৃতিকে মহাকাব্যের সম্মান দিয়ে থাকি, তাঁরা কিন্তু মনে মনে জানি যে, রামচন্দ্র যত বড়ো সত্যবাদী, সত্যসন্ধ ব্যক্তিই হোন না কেন তিনিও যেহেতু মানুষ, তাই পরিহাস-বিজল্পনে সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেই পারেন। বাল্মীকি রামায়ণে শূর্পনখা-রামচন্দ্র-লক্ষ্মণের সমস্ত কথোপকথনই সেই পরিহাসের মাত্রাতেই ধরা আছে। রাম-লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে না পেরে, শূর্পনখা যখন লক্ষ্মণ এবং সীতাকে খেয়ে ফেলতে চাইল এবং তাঁদের মরণের মূল্যে রামের একান্ত সাহচর্য কামনা করল, রামচন্দ্র কিন্তু তখন লক্ষ্মণকে সাবধান করে বলেছেন—অবুঝ অভদ্র লোকের সঙ্গে আর বেশি পরিহাস করতে যেও না লক্ষ্মণ— ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন। ন কার্যঃ—আমাদের এই ঠাট্টা তামাশার ফলে সীতার অবস্থাটা কী হয়েছে, দেখ।

যেখানে স্বয়ং মহাকাব্যের নায়কের মুখে সম্পূর্ণ ঘটনাটাই পরিহাস হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে, সেখানে এটাকে রামচন্দ্রের দ্বিচারিতা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশিষ্ট টীকাকার নাগোজী ভট্টও ঘটনার মধ্যে কোন মিথ্যাচরণের দোষ দেখতে পাননি। পূর্ববর্তী টীকাকারদের শব্দার্থ-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি এবং ব্যাকরণের ব্যায়াম নিরস্ত করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, অন্তত এইভাবে রামচন্দ্রের সত্যবাদিতা সার্থক করে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। পরিহাসকে পরিহাস হিসেবে ভাবাই শ্রেয়, তাতে সত্যবাদিতার হানি হয় না।

বস্তুত সত্যবাদিতা, সত্যরক্ষা অথবা সত্যনিষ্ঠা—এই সমস্ত সাধারণ নীতিধর্মের কথা রামায়ণের মধ্যে রামচন্দ্রকেই আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজের সত্যে তিনি

সর্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন বা থাকবেন—এটা নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। লক্ষণীয় ব্যাপার হল শুধু নিজের সত্য নয়, তাঁর আপন বংশের ঘনিষ্ঠজনেরাও যাতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তার জন্যও তিনি বিব্রত হন। পিতার প্রতি পুত্রের দায়বদ্ধতায় পিতার সত্যরক্ষার দায় নিজের মাথায় নিয়ে তিনি চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে দ্বিধা করেন না। নিজের নয়, পিতার সত্যরক্ষার ভার বহন করে তিনি হয়তো অতি-বিশদর্থে পিতৃঋণ শোধ করছেন। কৈকেয়ী এমনভাবেই রামচন্দ্রের কাছে তাঁর বনবাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন যাতে মনে হবে রামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়াটা কোন বড়ো ঘটনাই নয়, এর জন্য যেন তাঁর তেমন কোন মাথাব্যথাই নেই, কিন্তু নেহাৎ দশরথের সত্যরক্ষার জন্য, তিনি যাতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে ধর্মচ্যুত না হন, পাপে নিমজ্জিত না হন, তার জন্যই কৈকেয়ী যেন বেশি চিন্তিত।

রামচন্দ্র বিনা দ্বিধায় কৈকেয়ীর বাক্য পিতা দশরথের অভিপ্রেত মনে করে বনগমনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন আরও এক ধর্মের সূচনা করেছেন যার নাম উপনিষদের ভাষায়—পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব—পিতাকে দেবতাজ্ঞানে মান্য কর, মাতাকে দেবতাজ্ঞানে মান্য কর। কৈকেয়ী দশরথের তথাকথিত অভিলাষ রামচন্দ্রকে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্র বলেছেন দেবী। আমি স্বার্থপরের মতো এই জগতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করি না। আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি পিতার প্রিয়কার্য কিছু সম্পন্ন করতে পারি, তবে তাই আমার করা উচিত। তাছাড়া আমার কাছে পিতার শুশ্রূষা এবং তাঁর কথা মেনে চলার থেকে বড়ো ধর্ম কিছু নেই। কৈকেয়ী ধারণা করতে পারেন না, এমন কথাও রামচন্দ্র বলেছেন শুধু গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায়, শুধু পিতার কথা শুনে বনগমন নয়, রামচন্দ্র বলেছেন, আমার পূজনীয় পিতা কেন, এমনকি আপনিও যদি বলেন—অনুক্রো'প্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্—তাহলেও আমি চোদ্দ বছর বনে কাটিয়ে আসতে পারি।

আমরা জানি, রামচন্দ্রের সমস্ত জীবনই কেটেছে সত্য রক্ষায়, সত্যের প্রতিষ্ঠায়। অপিচ রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের নীতিজ্ঞতা এবং ধর্মজ্ঞতার কথাগুলি এতই বাহুল্যের মতো শোনাবে যে, নিউক্যাসেলে কয়লা টেনে নিয়ে যাবার ঘটনাও সেখানে ম্লান হয়ে যাবে। বাস্তবে রামচন্দ্রের ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে আলোচনাটা এতটাই বোকা বোকা হবে যে, যে কোন প্রাবন্ধিকের কাছে সেটা মারাত্মক একটা সমস্যা। বাল্মীকি যেহেতু ধর্ম এবং নীতির আধারভূত একটি পূর্ণ মানুষ খুঁজতে গিয়েই রামচন্দ্রের কাহিনি লিখে ফেলেন, তাই—রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ—অথবা ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ—এই ধরনের মাহাত্ম্য আখ্যাপন করে রামায়ণে রামচন্দ্রের নীতি-ধর্মজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়াটা আমাদের মতে নেহাতই বোকা-বোকা। আমরা তাই রামচন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁর সত্যরক্ষার নিষ্ঠা, তাঁর অজস্র গুণ, প্রজা-সাধারণের দুঃখ-সুখে তাঁর দুঃখ-সুখের বিকার নিয়ে আপাতত একটা কথাও বলব না। বরঞ্চ নীতিধর্মের বিমূর্ত ক্ষেত্রে আমরা যখন রামায়ণের

নরচন্দ্রমার ওপর অনীতি-অধর্মের আপাত রাহুচ্ছায়া দেখতে পাব, তার সম্বন্ধে দু-এক ছত্র আলোচনা করতে পারি।

এখানে প্রথম কথাটাই আসবে রামচন্দ্রের বনগমন প্রসঙ্গে। যে রামচন্দ্রকে কৈকেয়ী-দশরথের সামনে একান্ত অনুগত হিসেবে আমরা দেখেছি, বনগমনের পরে আমরা কিন্তু তাঁকে দশরথের ব্যবহারে বিষাদ এবং অনুতাপগ্রস্তও হতে দেখেছি। বনের মধ্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে একান্ত আলাপে পিতা দশরথকে 'কামাত্মা' অথবা কৈকেয়ীর আঁচল-ধরা এক অথর্ব পুরুষ বলে তিরস্কার করতে রামচন্দ্রের বাধেনি। চিরকালের বশংবদ পুত্রকে এমন অন্যায়ভাবে বনে পাঠানোর মধ্যে যে বৃদ্ধরাজার মতিভ্রম এবং স্ত্রৈণতাই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে একথা রামায়ণের পিতৃদেব-পুত্রটির মুখ দিয়েই বেরিয়েছে।

যাঁরা রামচন্দ্রকে নীতিধর্মের চরম কোটিতে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে ত্রুটিলেশহীন এক অবতার পুরুষে পরিণত করেন, তাঁদের কাছে রামচন্দ্রের এই কথাবার্তাগুলি চরম বিপাকের সূচনা করবে। কিন্তু যাঁরা মানুষ রামচন্দ্রের প্রতি চরম আস্থাবান এবং অবতারকল্প এই পুরুষটিকে যাঁরা মনুষ্যচরিত্রের পরম আদর্শ এবং প্রতিফলন বলে মনে করেন, তাঁরা রামচন্দ্রের এই কথাবার্তার মধ্যেও একটা পূর্ণ মানুষকেই খুঁজে পান। পণ্ডিতজনা কেউ কেউ রামচন্দ্রের এই দ্বৈতাচার দেখে একই রামচন্দ্রের মধ্যে 'higher nature' এবং 'lower nature' এর পূর্বপক্ষ তৈরি করেছেন। তারপর সমস্যার সমাধান করে বলেছেন ক্ষণিকের তরে রামচন্দ্রের এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেলেও তাঁর এই মলিন চিত্তকে রামচন্দ্র জয় করেছেন অসীম ক্ষমায়, ধৈর্যে, এবং ধর্মদৃষ্টিতে।

আমরা অবশ্য এই সব বিপরীত ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সহজ চরিত্রকে অনর্থকভাবে জটিল করে তুলি না। কারণ চরম পিতৃভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি অনুগত পুত্রের ভাগ্যে যদি চরম বঞ্চনা নেমে আসে তাহলে নির্জন অরণ্য ভূমিতে একান্ত আলাপে প্রথম রাত্রিটি কাটানোর সময় এই রকম মনের কথা, মনের দুঃখ বেরিয়ে আসাটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হয়। কারণ, মানুষের মনেই এমনটি হয় এবং রামচন্দ্রও মানুষ, অন্তত তিনি নিজেকে মানুষ ভাবতেই ভালবাসতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে দেবতারা যখন তাঁকে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলেছিলেন—অমন করে বলবেন না, মহান দেবতারা। আমি নিজেকে সাধারণ একটি মানুষ বলেই মনে করি। আমি দশরথের রামচন্দ্র—এই আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।

রামচন্দ্রের সার্বিক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পিতার প্রতি আনুগত্য অথবা ভাইয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ, অন্য সকলের পিতৃভক্তি বা ভ্রাতৃপ্রীতির সমস্ত আদর্শকেই ম্লান করে দেয়। নীতি-ধর্মের বিষয়ে রামচন্দ্রে সার্বিক চরিত্র খেয়াল রাখলেই বোঝা যাবে—প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং সত্যচ্যুতির ভয়েই যে শেষ পর্যন্ত তার পিতা তাঁকে অন্যায়ভাবে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন, সেটা রামচন্দ্রও যথেষ্টই

অনুভব করেন। কথাটা অধ্যাত্ম-রামায়ণে তাই খুব স্পষ্ট করেই রামের মুখে বসানো হয়েছে—

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্য সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ।।

ভরতের সম্বন্ধেও কিছু সোপহাস বিপরীত শব্দ রামচন্দ্রের মুখে শোনা যাবে। বিশেষত সীতার সামনে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন—তুমি ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোর না, কেননা সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনতে পারেন না —এই কথাটাও রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থার নিরিখেই দেখতে হবে। এই কিছুক্ষণ আগেই তিনি কৈকেয়ীর মুখে বনবাসের আদেশ শুনেছেন। তারপরেই তিনি সীতার কাছে সেই দুঃসংবাদ দিয়ে তাঁকে অযোধ্যাতেই থেকে যেতে বলছেন। ঠিক এইরকম একটা মুহূর্তে ভরতের সম্বন্ধে তাঁর সাভিমান কটূক্তি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ভরতের সম্বন্ধে তাঁর আসল ধারণাটা পাওয়া যাবে একেবারে বনপর্বে গিয়ে।

ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সদলবলে এসেছিলেন বনে। ভরতের সৈন্যবাহিনী দেখে লক্ষ্মণ ভেবেছিলেন ভরত চিরকালের জন্য নিঃশত্রুক হবার আশায় বনবাসী রামচন্দ্রকে মারতে আসছেন। লক্ষ্মণ রামকে বলেছিলেন, ভরত পূর্বে আমাদের অপকার করেছে, অতএব তাকে হত্যা করাই আমাদের ধর্ম,—পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগে ধর্মশ্চ রাঘবঃ। রামচন্দ্র হাজার চিন্তা করেও ভরতের কোন দোষ দেখতে পেলেন না। প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণকে তিনি বলেছিলেন—আমি পিতৃসত্য পালন করার জন্য বনে এসেছি। সেখানে ভরতকে মেরে লোকের অপবাদ কুড়িয়ে যে রাজ্য আমি পাব, সেই রাজ্য দিয়ে আমি কি করব? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে হারিয়ে কোন বস্তুই আমি চাই না। যদি সব ভাইরা এক জায়গায় থাকতে পারি, যদি সব ভাইদের সুখ হয়, তবেই না আমার রাজ্য নিয়ে লাভ—ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থঞ্চাপি লক্ষ্মণ।

ভ্রাতৃপ্রীতির এই পরাকাষ্ঠার মধ্যেই ভরতের প্রসঙ্গ এসেছে। রামচন্দ্র বলেছেন—এমন সুখে ছাই পড়ুক আমার, যে সুখের মধ্যে শত্রুঘ্ন নেই, তুমি নেই অথবা ভরত নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমাকে বনবাসী জেনে কষ্ট পেয়েই ভরত আমাকে দেখতে এসেছে। মনে মনেও ভরত আমাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করছে এমন চিন্তা আমি করতেও পারি না। তা ছাড়া কোনদিন কি এমন হয়েছে যে ভরত আমাদের কোন অপ্রিয় আচরণ করেছে—বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্? তাহলে আজকেই বা কেন তাকে সন্দেহ করছ, কেনই বা ভয় করছ? কোন বিপদের সময়েও কি কোন পুত্র পিতাকে হত্যা করতে পারে কিংবা ভাই হত্যা করতে পারে প্রাণের সমান ভাইকে? আর তুমি যদি শুধু রাজ্যের জন্য এসব কথা বলে থাক, তবে ভরতকে আমি বলে দেব, রাজ্যটা যেন তোমাকেই দিয়ে দেয়—বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্। আমি জানি ভরত তোমাকে রাজ্য দিয়ে দেবে।

পিতা, ভাই বা বন্ধুর প্রতি রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস এবং ভালবাসা এতটাই সার্বিক এবং চিরন্তন যে, সেগুলি ভারতবর্ষের সামগ্রিক গার্হস্থ নীতির আদর্শ হয়ে গেছে। আমরা যেহেতু রামায়ণে সাধারণ নীতি-ধর্মের কথাটা প্রথমেই বলে নিতে চেয়েছি, তাই পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি বা বন্ধুবাৎসল্যের পরিসরে রামচন্দ্রের ব্যক্তিগত উদাহরণ খানিকটা এসে পড়েছে। একইভাবে লক্ষ্মণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্টো দিক দিয়ে আসতে পারে, আসতে পারে ভরতের কথাও। ভ্রাতৃপ্রীতির ব্যাপার রামচন্দ্রের যত বড়ো উদাহরণ, বিপ্রতীপভাবে লক্ষ্মণ কিংবা ভরত এখানে রামচন্দ্রের চেয়েও বড়ো উদাহরণ। ভ্রাতৃপ্রীতির সঙ্গে জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য এখানে এমনভাবেই মিশে গেছে যে, লক্ষ্মণ কিংবা ভরতের ত্যাগ বিপ্রতীপভাবে রামচন্দ্রের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র যদি আগুন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমাদের বুঝতে হবে লক্ষ্মণ সেখানে আগে থেকেই আছেন। অন্যদিকে রামচন্দ্রের পাদুকাশ্রয়ী স্বেচ্ছা-সন্ন্যাসী সেই ভরতের সম্বন্ধেই বা কত উদার শব্দরাশি ব্যবহার করা যায়, যাতে তাঁকেই ভ্রাতৃপ্রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা সংসার ধর্মের এই আদর্শভূমির প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। কেননা এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত সংসারে পিতৃভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রীতি রামায়ণের আদর্শেই চলে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য অথবা সাধারণভাবে পুত্রস্নেহের জন্য দশরথ যেমন বিখ্যাত, ভ্রাতৃপ্রীতির জন্য, রামচন্দ্র, ভরত এবং লক্ষ্মণও তেমনই বিখ্যাত। বন্ধু-বাৎসল্যে রামচন্দ্র-সুগ্রীব অথবা রামচন্দ্র-বিভীষণ যেমন উদাহরণ হয়ে গেছেন, ভৃত্যজনোচিত সেবার আদর্শে হনুমানও তেমনই এক উদাহরণ।

সাধারণ নীতি-ধর্মের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বিষয় আমরা এতক্ষণ উল্লেখ করিনি, কারণ সেখানেও ব্যাপারটা একঘেয়েই হয়ে যাবে। স্ত্রীলোকের সাধারণ ধর্ম হিসেবে স্বামীসেবা এবং সতীত্বের যে গুণগান আমরা গোটা রামায়ণ জুড়ে শুনেছি, তাতে বোঝা যায় রামায়ণের সমাজে স্ত্রীধর্মের চরম এবং পরম আদর্শে চারিত্রিক শিথিলতার কোন স্থান নেই। রামায়ণের সীতা এমন উগ্র এবং সোচ্চারভাবে সতীত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, পরপুরুষের সামান্য স্পর্শমাত্রেও যেন ভীষণ এক পতন ঘটে যেতে পারত। সীতা আপন সতীত্বের তেজে রাবণকে কোন দিন কাছে ঘেঁষতে দেননি এবং সেই সতীত্বের মধ্যে এমনই এক অনতিক্রমনীয়তা ছিল যে, সতীত্বের গুণেই যেন তার মধ্যে অলৌকিকতা অনস্যূত হয়েছে। রাবণ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। সীতাহরণের সময় হরণের প্রক্রিয়ায় যতটুকু অঙ্গস্পর্শ ঘটেছে তারও দায় বহন করেছেন স্বয়ং অগ্নিদেব। সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রামচন্দ্র স্বয়ং অনুভব করেছেন যে, রাবণ তাঁকে মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারেননি।

ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি চ মৈথেলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।।

সতীত্বের এই ভয়ঙ্কর ব্যাপ্তি একটি স্ত্রীলোকের মন এতটাই অধিকার করে থাকত

যে, সীতা পুত্রকল্প হনুমানের পিঠে পর্যন্ত ওঠেননি। হনুমান তাঁকে নিয়ে যাবার সামর্থ্য জানিয়েছিলেন, কিন্তু লঙ্কাপুরীর হাজারও বিপন্নতার মধ্যেও সীতা তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁর দিক থেকে যুক্তি-তর্কের অভাব ছিল না, যদিও অন্যান্য পরিণত যুক্তির চেয়েও দ্বিতীয় কোন পুরুষের স্পর্শ তাঁর কাছে মরণের চেয়েও বেশি অপ্রিয় ছিল। রাবণ তাঁর গাত্রস্পর্শ করেছেন, সেখানে তাঁর যুক্তি ছিল—আমার কোন উপায় ছিল না। আমার স্বামী কাছে ছিলেন না, অন্যদিকে রাবণের শক্তির কাছে আমার কোন শক্তিই খাটেনি। কিন্তু হনুমান। স্বামীর প্রতি আমার বিশ্বাস এতটাই যে, তিনি ছাড়া অন্য ব্যক্তির দেহ আমি স্পর্শ করতেও পারব না—নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম।

কোন সন্দেহ নেই যে, সীতার সতীত্বের এই আদর্শই রামায়ণে স্ত্রীলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়েছে; কিন্তু একই সঙ্গে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির সর্বতোভদ্র দৃষ্টিভঙ্গীটাও এখানে বুঝে নেওয়া দরকার। বাল্মীকি যখন পরগৃহবাসিনী সীতার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তখন সীতাপতি রামচন্দ্রের কথাবার্তার মধ্যে কোন সংবেদনশীলতা কাজ করেনি। প্রিয়তম স্বামী বিরহিনী সীতাকে পরীক্ষা করার জন্য যে সব কটুকথা বলেছেন, রামচন্দ্রকে তা মানায় না। দ্বিতীয়বার দুর্মুখ জনগণের অপরাধে রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করেন। সেখানেও সীতার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ কাজ করেছে। লক্ষণীয় ক্রৌঞ্চবিরহী কবি স্বয়ং এই সময় অপবাদ-দীর্ণা সীতাকে আশ্রয় দেন। তৃতীয়বার আবারও সীতার সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে। সীতা রামচন্দ্রের সম্মুখে পাতালে প্রবেশ করেন।

তিন-তিনবার এই সতীত্বের বঞ্চনা দেখিয়ে বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন সতীত্বের ধর্ম মোটেই স্বামীর একান্ত বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত নয়। অপিচ সতীত্ব নিয়ে সাধারণের সন্দেহ এমনই এক অনন্তপার অবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে অবিশ্বাসের কোন শেষ নেই; বারবার সতীত্বের পরীক্ষা দিয়েও সেই অবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। অবিরাম সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত এক সাধ্বী রমণীকে পাতাল প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, জনগণ না বুঝলে অথবা স্বামী নামে মহান পুরুষটি না বুঝলেও, মহাকাব্যের কবি কিন্তু তাঁকে নিজেই আশ্রয় দিয়েছিলেন তপোবনে। সতীত্বের বাহ্যিক পরীক্ষায় তাঁর নিজের বিশ্বাস নেই অথচ সমস্ত মানুষই যে সেই বাহ্যিক পরীক্ষাতেই বিশ্বাসী, মহাকবির ব্যঞ্জনাটা এখানেই।

তিন

সত্যবাদিতা, সত্যরক্ষা পিতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রীতি অথবা স্ত্রীলোকের সতীত্ব—এই সব সাধারণ নীতি-ধর্ম যদিও অনেকটাই সংসার এবং ব্যক্তিগত নীতিবোধের পরিসর তবুও এগুলিকেই বৃহত্তর সমাজনীতির আরোহ-সোপান বলেই মনে করা যেতে পারে। ভারী আশ্চর্যের কথা হল স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিশ্বাস অথবা স্বামীর ওপর স্ত্রীর বিশ্বাসটা সাধারণ

নীতি বা ধর্মের মধ্যে পড়লেও ভালবাসা বা প্রেম ব্যাপারটাকে কেউ নীতি-ধর্মের মধ্যে উল্লেখও করেন না। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা কখনও বা করুণা, দয়া বা সহৃদয়তার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভালবাসার মত এক অতিসংবেদনশীল বস্তু কখনই ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রকারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। হয়তো বা অতি-গভীর অতিসংবেদনশীল এবং সেই কারণেই অতিকঠিন বলেই ভালবাসা কখনও নীতি-ধর্মের ভৈরব-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করেনি। কিন্তু ভালবাসাকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে এসে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা-পরিত্যাগের ঘটনাটিকে আমরা যদি খুব কষে তিরস্কার করি, যা অনেকেই আজকাল করেন, সেটা কিন্তু মোটেই ঠিক হবে না।

ক্রৌঞ্চবিরহী কবির মনোভূমি ঠিকমতো বিচার করলে দেখা যাবে—সীতা পরিত্যাগের পিছনে দুর্মুখ মানুষের কুৎসা ছাড়াও আরও অন্য কিছু ছিল এবং সে ব্যাপারটা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চেয়েও এক বৃহত্তম স্বার্থ। পিতা দশরথ কৈকেয়ীর প্রেমে রাজার ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। লোকরঞ্জন এবং প্রজাপালনের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি। সীতাকে ভালবাসতে গিয়ে প্রজারা রামচন্দ্রকে দশরথের মতোই এক কামমুগ্ধ রাজা ভাবুক, এটা রামচন্দ্র চাননি। বস্তুত পিতা দশরথের অত্যুৎকট প্রেম রামচন্দ্রের মনোজগতে এমনই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল যে, সীতার একান্ত প্রেমিক সীতাপতি হওয়ার থেকেও রাজা রামচন্দ্র হওয়াকে তিনি বড়ো মনে করেছেন। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা সাঙ্গ হবার পর অগ্নিদেব যখন স্বয়ং সীতার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলেছিলেন—সীতা যে সর্বতোশুদ্ধ, সেটাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু আমি যদি রাবণান্তঃপুরবাসিনী সীতাকে পরীক্ষা করে না নিই—জানকীমবিশোধ্য হি—তাহলে লোকে আমাকে বলত—দশরথের ছেলে এই রামচন্দ্রটাও নিতান্তই কামুক এবং মূর্খ—বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।

এখানে 'দশরথের ছেলে রামচন্দ্র'—এই শব্দটা দশরথের কামপরতন্ত্রতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তাছাড়া দশরথের কামাত্মতা রামচন্দ্রের নিজের মুখ দিয়ে যেমন বেরিয়েছে, তেমনই বেরিয়েছে সুগ্রীব, হনুমান কিংবা অন্যান্যদের মুখেও। তাঁরা রামচন্দ্রের মুখেই এমনটি শুনে থাকবেন। রাজা হিসেবে রামচন্দ্রের জীবনের একটা দায় ছিল তাঁর পিতা দশরথের কামপরতন্ত্রতার ঊর্ধ্বে ওঠা। সীতা-পরিত্যাগের মধ্যে রামচন্দ্রের এই বিপরীত-মনন বেশ খানিকটা দায়ী। নইলে সীতার প্রতি ভালবাসা তাঁর অন্য অনেকের চেয়েই বেশি ছিল, তার উদাহরণ দিতে পারি ভূরি ভূরি; আর ঠিক সেই কারণেই অতি বিপ্রতীপভাবে সীতা-পরিত্যাগের ঘটনাটি রামচন্দ্রের প্রেমহীনতার চরম উদাহরণ হিসেবে আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা জানি, প্রগতিবাদী অনেক নব্য শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক বেধে যেতে পারে, তবে তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণ নেই। কারণ মহাকাব্যের কবি বা নায়কের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি একদেশিনী, কবির মনোভূমির চেয়ে আপন রুক্ষ তর্কের প্রতি তাঁদের আসক্তি বেশি।

বস্তুত সীতার প্রতি রামচন্দ্রের ভালবাসার কথা এবং শেষ পর্যন্ত সীতা পরিত্যাগের বিষয়ে রামচন্দ্রের কঠিন নিরাসক্ত ব্যবহারের কথাটাও উল্লেখ করলাম একটি বিশেষ কারণে। সামান্য নীতি-ধর্ম ছাড়াও রামায়ণের মধ্যে যে বিশেষ নীতি-ধর্মের পরিসর আছে, সেটা বোঝানোর জন্যই এই রামচন্দ্রের রাজধর্মের অবতারণা।

রাজধর্ম কথাটা অবশ্য বিশেষেরও বিশেষ। কেননা রাজধর্মের ভিত্তি হল ক্ষত্রিয়-ধর্ম যা আবার বর্ণধর্মের একটা প্রকারমাত্র। পণ্ডিত জনেরা লিখেছেন সাধারণ ধর্ম বা সামান্য ধর্ম ছাড়া আর যা কিছুই আছে, তার ভিত্তিই হল বর্ণধর্ম এবং আশ্রয়ধর্ম। এই দুটির সঙ্গেই আবার যোগ আছে চতুর্বিধ পুরুষার্থের। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারটির কোনটার না কোনটার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণও যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনই জড়িয়ে আছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল—ভারতবর্ষের মানুষরা রামায়ণকে যতখানি না মহাকাব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে। অথচ কী আশ্চর্য রামায়ণ মহাকাব্যে মোক্ষাভিসন্ধির কথা বড়ো বেশি নেই। এই দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অপর মহাকাব্য মহাভারতের অসংখ্য শ্লোক মোক্ষচিন্তায় আবিষ্ট। একদিকে মহাভারতকে চতুর্বর্গের আধারভূত এক শাস্ত্র হিসেবে মানা হচ্ছে, অন্যদিকে মহাভারতের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মোক্ষ। অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথায় আনন্দবর্ধনের মতো ব্যক্তি মহাভারতের অঙ্গী রসটাকেও বলেছেন শান্ত, অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিই এই মহাকাব্যের পরম উদ্দেশ্য।

এই নিরিখে দেখতে গেলে মোক্ষের চিন্তায় ক্রৌঞ্চবিরহী কবির কোন আবেশ নেই। চতুর্বর্গের চরম বর্গ মোক্ষকে বাদ দিয়ে তিনি প্রায়ই ত্রিবর্গের কথা বলেন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম। মোক্ষ বা জ্ঞানযোগের ইঙ্গিতমাত্রও রামায়ণে নেই—এ কথা নিশ্চয়ই বলা ঠিক হবে না, তবে সে এতই বেশি সূক্ষ্ম, এতই তা গভীর যে, রামায়ণের মধ্যে তার মুখ্য কোন কারকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের অপর মহাকাব্য মহাভারতে অথবা ভগবদগীতায় সুখদুঃখে সমান, লাভালাভ, জয়াজয়ে সমদর্শী স্থিতধী মানুষটির কথা আছে, তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে রামচন্দ্রকেই নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় এমনকি সেই মর্মে রামচন্দ্রকে বিশেষিতও করা হয়েছে। তবু আলাদা করে এই নির্বিঘ্ন, নিত্যসত্ত্বস্থ ব্যক্তির পুরুষার্থই যে মোক্ষ অথবা সেই মোক্ষের সাধন যে জ্ঞান—এ কথা রামায়ণে তেমন করে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাকে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির ভাষায় 'সমাধি' বলা যায় মাত্র, কিন্তু কোনক্রমেই সেটা মোক্ষ নয়।

রামায়ণে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তখন রামচন্দ্রের শোকের ইয়ত্তা রইল না। একবার তিনি শোকে বিলাপ করছেন, একবার পাগলের মতো সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, একবার নিজের ধনুক-বাণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে সমস্ত জগৎ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন। রাবণের সঙ্গে পক্ষিরাজ জটায়ুর যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই

যুদ্ধে ব্যবহৃত ধনুক-বাণের খণ্ডাংশ, রথ-ছত্রের অবশিষ্টাংশ দেখে রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করলেন যে, সীতার অধিকার নিয়ে দুটি রাক্ষসে বুঝি যুদ্ধ হয়েছিল। কথাটা ভেবে রামচন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং শরানলে সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়ে দেবার শপথ নিলেন—দগ্ধুকামং জগৎ সর্বং যুগান্তে চ যথা হরম্।

রামচন্দ্রের এই ক্রোধমূর্ছিত চেহারা দেখে ছোট ভাই লক্ষ্মণ বলেছিলেন—চিরকাল দেখে আসছি—তোমার স্বভাব হল কোমল, সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার বশীভূত এবং সকলের ভালর জন্য চিরকাল তুমি চিন্তা করেছ—পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্ত সর্বভূতহিতে রতঃ। এখন সেই তুমি শুধু ক্রোধের বশে নিজের স্বভাবটাও ত্যাগ করবে, তা তো হতে পারে না। চন্দ্রের যেমন আহ্লাদকত্ব, সূর্যের যেমন তাপ, বায়ুর যেমন গতি, পৃথিবীর যেমন ক্ষমা—এইসব স্বাভাবিক গুণের মতো তোমারও স্বভাব হল মৃদু এবং সকলের হিতৈষণায় তুমি নিরত। সেখানে তোমার মতো লোক যদি ক্রোধমূর্ছিত হয়ে স্বভাব নষ্ট করে, তবে তোমার চিরকালের যশটাই নষ্ট হয়ে যাবে—এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ।

লক্ষ্মণ যে যশের কথা বলেছেন, সে যশ অনেকটাই প্রখ্যাত রাজার গুণ। এই গুণের মধ্যে কোন দার্শনিক প্রতিপত্তি নেই। কিন্তু এর পরেই আরও দুচার কথা বলার পর লক্ষ্মণের বক্তব্য ধীরে ধীরে স্থিতধীর সংজ্ঞা স্পর্শ করছে। লক্ষ্মণ বললেন—তোমার মতো মানুষও যদি এই বর্তমান দুঃখ সহ্য করতে না পারে, তবে সাধারণ লোকেরা কেমন করে দুঃখ সইবে—প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যাতি! বিপদ তো মানুষের আসেই, সে বিপদ আবার চলেও যায়।

লক্ষ্মণ মহারাজ নহুষের উদাহরণ দিলেন। উদাহরণ দিলেন ইক্ষ্বাকু-বংশের কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের। তাঁর একশ ছেলে একদিনে মারা গিয়েছিল। লক্ষ্মণের মতে এইসব দৈবকৃত বিপদ দেবতাদেরও আছে। কিন্তু রামচন্দ্র, যিনি সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার, তাঁর কি এই শোক সাজে? লক্ষ্মণ বললেন—তুমি সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ, তোমার মতো শুভদর্শী সমদর্শী ব্যক্তিরা কি ঘোর বিপদেও এমন শোকগ্রস্ত হতে পারেন—তদ্বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্বদর্শনাঃ।

কথাটা অনেকটাই সেই অর্জুনের সামনে উচ্চারিত গীতোক্ত 'ন বিকম্পিতুমর্হসি'-এর মতো। রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ এখানে 'সর্বদর্শনাঃ', 'অনির্বিণ্ণদর্শনাঃ' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, উপস্থাপন করেছেন কর্মের কথা। লক্ষ্মণ বলেছেন বুদ্ধি দিয়ে এই বিপৎপাতের তাত্ত্বিক বিচার করতে হবে তোমাকে। কৃতকর্মের গুণদোষেই তো এমনটি ঘটে, নইলে এমন দুর্ঘটনা সম্ভব কি—নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টঞ্চ বর্ততে? পরিশেষে, আমরা যেমন বলি—'আই অ্যাপিল টু ইয়োর প্লেজার' ঠিক সেইভাবেই লক্ষণ বললেন, আমি তোমার জ্ঞানের কাছে আবেদন করছি—শোকেনাভিপ্রগুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্—শোকে তোমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

তবু জানি—এই জ্ঞানও ঠিক মোক্ষসাধন সেই জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান অনেকটাই বুদ্ধির অপর পর্যায়ে। শোকাচ্ছন্ন রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের তাত্ত্বিক সান্ত্বনা চরম পর্যায়ে ওঠে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে। যখন প্রকৃতির রাজ্যে শরৎ ঋতু তার পূর্ণ শোভা বিকশিত করেছেন। ওদিকে সুগ্রীব বালির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু রামের কাছে তিনি যে শপথ করেছিলেন, সে শপথ ভুলে তিনি আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়েছেন। শরৎকাল মানেই রাজাদের যুদ্ধযাত্রার সময়, অথচ সীতা অন্বেষণের ব্যাপারে সুগ্রীবের কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। রামচন্দ্র আবার শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। বিশেষত উন্মাদিনী শরৎ প্রকৃতি তাঁকে খানিকটা কামনাচ্ছন্নও করে তুলল।

রামচন্দ্রের মনোবিকারের কথা লক্ষ্মণের কাছে চাপা রইল না। লক্ষ্মণ আবারও শোকক্লিন্ন রামচন্দ্রকে সত্ত্বস্থ করা চেষ্টা করলেন। লক্ষ্মণ বললেন— আর্য! তুমি কামনার বশে নিজের বীরত্ব নষ্ট করছ। কামনার থেকেই তোমার এই শোক উৎপন্ন হয়েছে—যে শোকে মনের সমাধি নষ্ট হয়ে যায়— অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ—সুতরাং তুমি যোগ অবলম্বন করে সেই সমাধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছ না কেন—কিমত্র যোগেন নিবর্ততে। তুমি চিত্তের প্রসাদ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর, শুচি-আচার এবং স্নানাদির মাধ্যমে নিরন্তর কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। দেবতার পূজা ইত্যাদির দ্বারা নিজের পৌরুষবৃদ্ধির চেষ্টা কর।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন—তুমি যা বলেছ ভাই, একেবারে ঠিক বলেছ। সেই কর্মের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করতে হবে, যাতে আমার অভিপ্সীত ফল মেলে—নিঃসংশয়ং কার্য্যমবেক্ষিতব্যং/ক্রিয়াবিশেষো'প্যনুবর্তিতব্যঃ।

এই শ্লোকের অন্তিম পংক্তিটি টীকাকারেরা এবং অনুবাদকারী পণ্ডিতজনেরা এমনভাবেই পরিবেশন করেছেন, যাতে মনে হয়—যেন কর্ম এবং জ্ঞানযোগ বাদ দিয়ে কর্মের ফল অনুসন্ধান করাও কঠিন। পরবর্তী কালের দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করলে বোঝা যাবে কর্মের ফলানুসন্ধান জ্ঞানযোগের পরিপন্থী। কাজেই জ্ঞান নয়, কর্মানুষ্ঠানই লক্ষ্ম ণ এবং রামচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে। বস্তুত বৈদিক যুগে এবং তার অব্যবহিত পরের যুগে যে ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিভিন্ন শৌচাচার, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দেবপূজার অনুষ্ঠান করা হত, এখানে সেই কর্মযোগই প্রধান হয়ে উঠেছে। এমনকি লক্ষ্মণ যে 'সমাধি'র কথা বলেছেন, তাও যোগসিদ্ধ চরম কোন সমাধি বলে মনে হয় না। এই সমাধি অনেকটাই মনঃসংযোগের চরম অবস্থা, যাতে অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটে। এ সমাধি কর্মের সহায়ক এক পরম স্থিতিশীল মানসাবস্থা, এতে মোক্ষলাভ হয় না বটে, তবে অভীপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভব হয়, শ্লোকের অর্থ সহজভাবে নিলে অন্তত জ্ঞানের চেয়ে কর্মই রামায়ণের মুখ্যগ্রন্থি হয়ে ওঠে।

চতুর্বর্গের চরম পুরুষার্থ মোক্ষ, অতএব সেটা রামায়ণের অভিসন্ধিত নয়, যতটা ধর্ম অর্থ এবং কাম। লক্ষণীয় বিষয় মনুসংহিতার রাজধর্মাধ্যায়ে একজন আদর্শ রাজার কাছেও মোক্ষানুসন্ধানের কোন তাৎপর্য নেই। কেননা মোক্ষকামী রাজার রাজ্যপাট

চুলোয় যাবে। 'প্রজারঞ্জন' তাঁর কাছে শুধু কর্তব্যের ভার হিসেবে চিহ্নিত হবে। আদর্শ রাজার কাছেও তাই ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কামই শুধু প্রণিধানযোগ্য, আর রামায়ণের ঠিক এই ধর্মার্থ-কামেরই জয়কার ঘোষিত হয়েছে। মোক্ষসাধন সেখানে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। রামায়ণের এই ত্রিবর্গনিষ্ঠাই সীতাপতি রামচন্দ্রের চেয়ে রঘুপতি-রাঘব-রাজা রামের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে তুলেছে, আর এই রাজধর্মের সিদ্ধি লাভ করতে গিয়েই সীতা পরিত্যাগের মতো ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনই ঘটেছে শম্বুক-বধ। এ কথায় পরে আবার আসব, আপাতত রামায়ণে ত্রিবর্গের মাহাত্ম্যটা আগে বুঝে নিই।

খবরটা খুব ভাল করে পাওয়া যাবে কাশ্যপ-মধ্যম কুম্ভকর্ণের মুখে। রামচন্দ্রের কাছে যুদ্ধে হেরে রাবণ কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা করেছেন। অকালে ঘুম থেকে উঠে রাবণের প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করতে তিনি পিছুপা হননি; কিন্তু রণসজ্জার আগে তিনি রাবণকে কিছু অযাচিত উপদেশ দিয়ে গেছেন। কুম্ভকর্ণ বলেছেন, রাক্ষসরাজ! তুমি মঙ্গলের কথা আগে শোননি, কাজেই তোমার পাপটা এতদিনে ফলেছে। তুমি এটা ভেব না যে, একটা কাজের পূর্বাপর বিচার না করে শুধুমাত্র নিজের বলদর্পিতার ওপর ভরসা করলেই চলবে—কেবলং বীর্যদর্পেণ নানুবন্ধো বিচারিতঃ।

কুম্ভকর্ণ একেবারে রাজনীতির সারকথা উল্লেখ করে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড ইত্যাদি চতুরুপায়, রাষ্ট্রের ক্ষতি, বৃদ্ধি, স্থিতি-নির্ণয় এবং আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতীকার এবং কার্যসিদ্ধি ইত্যাদি পাঁচ রকমের রাজনৈতিক মন্ত্রণার উল্লেখ করে শেষে বললেন—লোকেরা কেউ সকাল, দুপুর এবং রাত্রির সময় বুঝে ধর্ম অর্থ এবং কামের সেবা করেন, কেউ বা সেই কালে ধর্ম এবং কাম, কেউ বা একই কালে ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটির সাধনা করেন। কিন্তু এই ধর্মার্থকামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কোনটা এটা যে শুনেও বোঝে না, সে রাজাই হোক অথবা রাজপুত্র, তার সমস্ত নীতিজ্ঞানই বিফল—

ত্রিষু চৈতেষু যচ্ছ্রেষ্ঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে।
রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্যর্থং তস্য বহুশ্রুতম্।।

কুম্ভকর্ণ রাবণকে আরও বলেছিলেন যে, ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটার কখন উপযোগ ঘটবে—সেটা যদি আগে থেকেই মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে জীবনে তার বিপদ ঘটবে না। কুম্ভকর্ণ নিজমুখে স্পষ্ট করে না বললেও পরিষ্কার বোঝা যায় রাবণ ধর্ম বাদ দিয়ে অর্থ এবং প্রধানত কামেরই সাধনা করেছেন। ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই যে অর্থ এবং কামের মূলভূত এ কথা রামায়ণের অন্যত্র স্পষ্ট করে বলা আছে এবং আমরা সে কথায় পরে আসছি।

ধর্মার্থকামের এই রামায়ণীয় বিভাজন পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়। মিলে যায় মনুসংহিতার বচনের সঙ্গেও। মনু বলেছেন—তেমন অর্থ বা কামের সেবাই করবে না, যার সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই—পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।

সাধারণ লোকাচার এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যেও ধর্মেরই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে—সুখস্য মূলং ধর্মঃ—যদিও ধর্মার্থকামের সম-সাধনই একজন আদর্শ রাজার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল—ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ/যো হ্যেকসক্তঃ জনো জঘন্যঃ।

রামায়ণ মহাকাব্যের ধর্ম-দর্শনের সূত্রগুলি পর্যালোচনা করে বোঝা যায়—মোক্ষ-সাধনের তেমন কোন প্রাধান্য এখানে তেমন বিবেচ্য না হলেও ত্রিবর্গের প্রথম কল্প ধর্মই কিন্তু রামায়ণের মুখ্যতম নীতি-নির্ধারক। অবশ্য তার আগে ত্রিবর্গের সাধারণ মাত্রাটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

ধর্ম বলতে এখানেও কোন পূজার্চনা দৈব-সাধন বোঝায় না। বোঝায় সেই ধরনের নিয়মশৃঙ্খলাকে যা একটি মানুষের মধ্যে সমস্ত জগতের জন্য শুভৈষণা তৈরি করে। এই শৃঙ্খলা মানুষের অন্তর্জাত না হলে সে স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ঠিক এই অর্থে মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠেছে কিনা সেটা বুঝতে হলে কিন্তু সেই চিরন্তন নীতিগুলির দিকেই আমাদের তাকাতে হবে। অর্থাৎ সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, প্রিয়বাদিতা, সমদর্শিতা—এই সব শাশ্বত গুণ ঘনীভূত হয়ে যখন এক চরম মহত্ত্বের জন্ম দেয়, তখনই বুঝতে হবে মানুষ ত্রিবর্গের প্রথম বর্গে স্থিত অর্থাৎ মানুষটি ধর্মের পথে আছে। যা যা নিজের ভাল লাগে, তা অন্যেরও হোক অথবা যা নিজের কাছে অপ্রিয় তা যেন অন্যের ভাগ্যেও না ঘটে—এইরকম এক সর্বতোমুখী হিতৈষণা এবং নিজের ওপর সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণই ত্রিবর্গমুখ্য ধর্মের চালিকা শক্তি। রামায়ণে এই ধর্মই মূল সাধন এমনকি সাধ্য হিসেবেও চিহ্নিত এবং তাও সেটা আদর্শ রাজারই সাধ্য-সাধন হিসেবে চিহ্নিত।

ত্রিবর্গের দ্বিতীয়টি হল অর্থ। আভিধানিক অর্থে 'অর্থ' শব্দের অন্যতম অর্থ হল প্রয়োজন। রাজারা রাজ্য বিস্তার করবেন, পুর-রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটাবেন, রাজকোষে পরিপূর্ণতা আসবে, এক কথায় ঐহিক যত সমৃদ্ধি—সবই এই অর্থের পরিসর। অন্যদিকে 'কাম' ব্যাপারটা অনেকটাই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধক। কোন সন্দেহ নেই—অনাদি অনন্ত এই সংসার-চক্রের গতিশীলতা সম্পূর্ণভাবেই কামনির্ভর এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের ইন্দ্রিয়-সাধনই বৃহত্তর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বর্গ অর্থসাধনে রূপান্তরিত হয়।

ত্রিবর্গের অন্তর্গত 'কাম' শব্দটা ব্যবহারের সময় এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কাম মানে এখানে শুধুই ভোগ নয় অথবা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাও নয়। ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে অনন্ত সংসার-চক্রের প্রবর্তনাই কিন্তু ত্রিবর্গীয় কামের উদ্দেশ্য। কামকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই কিন্তু ধর্ম শব্দটা এসে পড়ে। ঠিক যেমন ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পত্তির উপার্জনের মধ্যেও ন্যায়-নীতির প্রশ্নটা থেকেই যায় এবং সেখানেও ধর্মের অন্তর্গতি ঘটে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় সাধারণ গৃহস্থের ঘরেই হোক অথবা একনায়ক রাজার ঘরেই হোক কামনা-পূর্তি এবং ঐহিক সমৃদ্ধির সমস্ত পর্যায়গুলির মধ্যেই ধর্ম অনুস্যূত থাকবে ত্রিবর্গের বোধটা এই রকমই। কুম্ভকর্ণ এটাকেই বলেছেন—রাজাই

হও আর রাজপুত্রই হও, ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটি মুখ্য, সেটা না বুঝলে সব কিছুই বিফল।

আমাদের অন্যতর মহাকাব্য মহাভারতে মধ্যে ধর্মার্থকামের ত্রিবর্গস্থিতির মধ্যে ধর্মের মাহাত্ম্যটা অনেক স্পষ্ট করে দেখানো আছে বলে আমরা মনে করি—ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ সে কিমর্থং সেব্যতে। কিন্তু রামায়ণে মোক্ষ সাধনের মাত্রাটা একেবারেই ক্ষীণ হওয়ায় ত্রিবর্গস্থিত ধর্মের সাধনই এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামায়ণের চরিত্রগুলির দিকে তাকালেও ধর্মার্থকামের এই নীতি খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রামায়ণের আদি প্রান্ত কৈকেয়ীর বশম্বদ কামাত্মা নৃপতি দশরথের অন্যায় আদেশ দিয়ে আরম্ভ; রামায়ণের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন অন্য আরেক কামাত্মা পুরুষ, রাক্ষসরাজ রাবণ—দশরথের কামাত্মতার ফল আদিকাণ্ড থেকে রামের বনবাস পর্যন্ত বিস্তৃত, আর রাবণের কামাত্মতার ফল রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কামাত্মতা ধর্মের শৃঙ্খলায় পরিসীমিত নয়। রামানুজ লক্ষ্মণ নিজেই নিজেকে দ্বিতীয় বর্গ অর্থের পক্ষপাতী রূপে স্থাপন করেছেন, যদিও তাঁর অর্থাত্মতা নিজের কারণে অভিব্যক্ত হয়নি। অগ্রজ রামচন্দ্রের শুভৈষণায় তাঁর অর্থাত্মতা প্রবর্তিত হয়েছে বলেই লক্ষ্মণকে আমরা তেমন করে চিহ্নিত করতে পারি না। সুগ্রীব অবশ্যই ধর্মাবিরুদ্ধ অথৈষণার উদাহরণ এবং অবশ্যই অগ্রজ বালিও তাই। বিভীষণের মধ্যে ধর্মাত্মতাই বেশি, কিন্তু রাজা হিসেবে তাঁকে তেমন করে যাচাই করা যায় না বলেই তিনি আলোচ্যও নন।

এঁদের মধ্যে সর্বতোভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্র— যাঁর কাছে কামও মিথ্যা বস্তু নয়। অথৈর্ষণা বা রাজসমৃদ্ধিও কোন বিরাগের বস্তু নয়। কিন্তু সবার ওপরে আছে তাঁর ধর্ম — যে ধর্ম তাঁর কামনার সঙ্গেও সম্পৃক্ত, আবার তাঁর রাজপদবীর সঙ্গেও তা সমানভাবে সংযুক্ত। ক্রৌঞ্চবিরহী কবি যখন একটিও শ্লোক রচনা করেননি, তখন তিনি আপ্লুত ছিলেন শুধু এই চিন্তায় যে, কেমন করে আদর্শ মানুষের দেখা পাবেন। এমন মানুষ যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ। যিনি সত্য কথা বলেন এবং কর্তব্য কার্যটি করেন সমস্ত দৃঢ়তা নিয়ে। যিনি অসাধারণ চরিত্রবান এবং সমস্ত প্রাণীর হিতকার্যে রত।

এমন একটি আদর্শ মানুষকে যেখানে 'আইডিয়াল' কিংবা ইউটোপিয়ার স্তরেই রাখতে হত, ক্রৌঞ্চবিরহী কবি সেখানে সেই আদর্শ চরিত্রের অঙ্কন করেছেন শিল্পীজনোচিত সমব্যথায়। আসলে ত্রিবর্গের বিবেচনায় ধর্ম বলতে বিশদর্থে যা বোঝায়, তার মধ্যে সমস্ত মহদ্‌গুণগুলিই আছে। অহিংসা, সত্য, ঋজুতা, জিতেন্দ্রিয়চতা, সচ্চরিত্রতা—এগুলি যেমন একটি আদর্শ মানুষের স্বভাবের মধ্যে পড়ে, তেমনই একটি মানুষ সদা-সর্বদা ধর্ম অনুসারে চলেন— একথা বললে বুঝতে হবে যে উপরোক্ত গুণগুলিই সেই মানুষের মধ্যে আছে বলেই তিনি ধর্মজ্ঞ এবং ধর্মানুসারে চলেন। অথচ রামচন্দ্রের ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে অর্থ বা ঐহিক সমৃদ্ধির কোন বিরোধ নেই। কারণ অর্থকে তিনি ন্যায় এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

আপনারা অযোধ্যাকাণ্ডে সেই সভাস্থলটি স্মরণ করুন। রাজ্যের তাবৎ গুণী ব্যক্তিরা দশরথের সভায় মিলিত হয়েছিলেন অযোধ্যানগরীর পরবর্তী রাজার মনোনয়নের জন্য। সেই মহতী সভায় রামচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হলে পৌর-জনপদবাসীরা পর্যন্ত সম্মিলিত সুরে বলেছিলেন রামচন্দ্র যেন সাক্ষাৎ ধর্ম এবং অর্থের আধার— সাক্ষাদ্ রামাদ্বিনিবৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ। রামের অসংখ্য গুণ এখানে উচ্চারিত হয়েছে। একটি জ্ঞানী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে একটি সামান্য প্রজাও তাঁর প্রিয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট— পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি। শাস্তি পাবার যোগ্য মানুষকে যদি বধও করতে হয়, তবে সেখানেও রামচন্দ্র যুদ্ধের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করেন না। এতটাই তাঁর নীতি-জ্ঞান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং কামনা কখনও তাঁকে পীড়িত করে না বলেই ত্রিবর্গের অধম কামবৃত্তির প্রকাশ তাঁর মধ্যে নেইই— ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ। সীতার প্রতি তাঁর অনুরাগের কোন অভাব নেই। চতুর্দশ বৎসরের অরণ্য-বসতিতে সীতার সাহচর্যে তিনি কত সুখে কাল কাটাবেন, তার সম্বন্ধে রীতিমত সোচ্ছ্বাস বর্ণনা আছে রামচন্দ্রের মুখে। সীতার অকারণ আবদার মানতে গিয়ে সোনার হরিণ ধরতে যাওয়াটাও এক প্রেমিক পুরুষের চরমতম নমনীয়তা হিসেবেই আমরা মনে করেছি এবং এই নমনীয়তা আমরা রামচন্দ্রের মধ্যে দেখছি, কিন্তু তবু সেই নমনীয়তাকে কামাত্মতা বলতে প্রবৃত্তি হবে না কারও। আর যদি এই প্রবৃত্তি হয়, তবে রাবণের বিশেষণ কী হবে?

বস্তুত কাম এবং অর্থ এমনভাবেই ধর্মান্বিত হয়েছে রামচন্দ্রের মধ্যে, যাতে করে ধর্মের মধ্যেই তাঁর অর্থ-কাম গুণীভূত সত্তা হিসেবে পরিগ্রহণ করেছে। অর্থ-কামের ভাবনা তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু প্রকটভাবে নেই। সর্বাত্মক ধর্ম তাঁর অর্থৈষণা এবং কামকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে— স্মিতপূর্বাভিভাষী চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ।

ধর্মশাস্ত্রকারেরা কিংবা পুরাণ ইতিহাসও স্পষ্ট করে বলেনি যে, আদর্শ রাজার জীবনে ধর্মার্থকামের ক্রমিক গুরুত্বটা কীভাবে অবরোহের পন্থায় গৌণ হতে থাকে। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনেই এই ক্রমিক গৌণতা টের পাওয়া যায়। অর্থের জন্য কামকে এবং ধর্মের জন্য অর্থকে যে বিসর্জনও দেওয়া যায়, রামায়ণের চরম নীতিধর্মও তাই। পূর্বোক্ত সীতা পরিত্যাগের কথাটাই এখানে আবার আসবে। আমাদের অন্যতর মহাবাক্য বলেছে — কাম এবং কাম প্রতিহত হলে যে ক্রোধ হয়, সেই ক্রোধ — এই দুটোকেই বাদ দিয়ে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। কারণ, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার অস্তিত্ব, কাম-বিলাসের জন্য নয় — ধর্মায় রাজা ভবতি ন কাম-করণায় তু। যে ধর্মের জন্য রাজার অস্তিত্ব, রাজার সার্থকতা, সেই ধর্ম হল প্রজারঞ্জন। রাজা ঠিকমতো প্রজা পালন করছেন মানেই তিনি ধর্ম লাভ করছেন — ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্যতে পালনে রতঃ— এ কথাটা ঋগ্বেদ থেকে রামায়ণ, মহাভারত থেকে মনুসংহিতা সর্বত্রই একরকম।

প্রজার কাছে রাজার ধর্ম প্রমাণ করার জন্যই রামচন্দ্রকে সীতা পরিত্যাগ করতে

হয়েছে, অর্থাৎ প্রজার মুখে রামচন্দ্রের কামাত্মতার প্রশ্ন জেগেছে। রাবণের গৃহবাসিনী স্ত্রীকেও তিনি গ্রহণ করলেন — এই গ্রহণের মধ্যে রাবণের সম্বন্ধে প্রজাদের সন্দেহ যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে রামচন্দ্রের দুর্বলতা নিয়ে সন্দেহ। তৎকালীন বিশ্বাস অনুযায়ী প্রজারা যেমন শুদ্ধস্বভাবা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করেছে, তেমনই সন্দেহ করেছে রামচন্দ্রের দুর্বল মোহগ্রস্ততার প্রতি। রামচন্দ্রকে তাই ধর্মের কারণে, বিশেষত রাজ-ঋদ্ধি 'অর্থে'র কারণে সীতাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। রামচন্দ্রকে তথাকথিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠতে হয়েছে অর্থ এবং ধর্মের কারণে। নইলে লোকে তাঁর পিতার সম্বন্ধে যে নিন্দামন্দ করত এবং যা তাঁর নিজের মুখ দিয়েও বেরিয়েছে, সেই অর্থ-ধর্মের দ্বারা অসম্পৃক্ত কাম রামচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াত, ঠিক যে বৈশিষ্ট্য দশরথ-চরিত্রের প্রধান ব্যপদেশ—

অর্থধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা।।

অতএব রামচন্দ্র পিতা দশরথের বৈপরীত্যে নিজেকে অর্থধর্মের প্রকোষ্ঠে স্থাপন করেছেন এবং সে কারণে প্রাণপ্রিয়া সীতাকেও পরিত্যাগ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।

অথচ ওই একই রামচন্দ্রের সামনে যখন রাজ্যলাভের হাতছানি ছিল, 'অর্থ'-সম্পত্তি যখন তাঁর করতলগত বদরীর প্রায়, সে সময় তিনি তাঁর এই অর্থৈষণা পরিত্যাগ করে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে দ্বিতীয় বর্গ অর্থলাভের মূল উপায় হল উত্থান— অর্থস্য মূলমুত্থানম্। রাজ্যলাভের জন্য সদা-জাগ্রত চেতনা এবং উৎসাহ শক্তির বলেই একজন রাজা অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। রাজধর্মের মূল ভিত্তিই হল এই উত্থান শক্তি। কিন্তু উত্থান শক্তির মাধ্যমে রাজসমৃদ্ধি লাভ বা অর্থলাভের মধ্যে যদি কোন অন্যায় থাকে, তবে সেটি রাজধর্মের মাহাত্ম্য থেকে চ্যুত হয়, কারণ সেখানে অর্থই শুধু আছে ধর্ম নেই।

এই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থকেও যে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে রামায়ণের রামচরিত্রেই। লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ যখন বানর সৈন্যদের সামনে মায়া-সীতা বধ করে চলে গেলেন, তখন সেই খবর শুনে রামচন্দ্র ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের দুর্দশা দেখে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতার উদ্দেশে বললেন, আর্য। তুমি তো চিরকাল সৎপথে থেকেছ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও তোমার বশীভূত, কিন্তু যে ধর্ম রক্ষার জন্য তোমার এত প্রয়াস, সেই ধর্ম কিন্তু তোমাকে কোন বিপদ থেকেই রক্ষা করতে পারল না— অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ। অতএব তোমার এই ধর্ম মিথ্যা।

ধর্ম পথে থেকেও লোকের সর্বনাশ এবং অধর্ম আচরণ করেও লোকের অনুপম শ্রীবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে লক্ষ্মণ বেশ বিশাল একটা বক্তৃতা দিলেন।একথাও বললেন যে,

যাদের অর্থ আছে তাদেরই লোকে পুরুষ বলে, পণ্ডিত বলে, বীর বলে এবং বুদ্ধিমানও বলে। অর্থসাধন পরিত্যাগ করে ধর্ম করতে যাওয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধিই নেই — অর্থস্যেতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া। তুমি পিতার আদেশে বনবাসী হয়ে এত দুঃখ পেলে তার মধ্যে তোমার স্ত্রীকেও হরণ করে নিয়ে গেল রাক্ষস রাবণ। কাজেই তোমার প্রাপ্য রাজ্য ছেড়ে এসে কোন ধর্মের ফল তুমি পেলে, অথবা কী মহতী বুদ্ধির পরিচয় তুমি দিলে, তা বোঝা গেল না — রাজ্যমুৎসৃজতা বীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়া কৃতা।

লক্ষ্মণের প্রকৃতি অর্থসাধনের অনুকূল। রামচন্দ্র যখন পিতার আদেশে বনযাত্রায় প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তিনি অর্থশাস্ত্রের নিয়মমতো সদ্যোত্থায়ী উৎসাহযুক্ত রাজার বুদ্ধিতেই কথা বলেছিলেন। তাঁর ধারণা দুর্বল লোকেরাই ধর্ম-ধর্ম করে এবং সেই দুর্বল মর্যাদাহীন ধর্মের সেবা বাদ দিয়ে পৌরুষেরই অনুবর্তন করা উচিত, অর্থাৎ ধর্মের প্রতি তোমার আনুগত্য থাকে থাকুক, কিন্তু একই আনুগত্য থাকা দরকার অর্থের প্রতিও—ধর্মউৎসৃজ্য বর্তস্ব যথা ধর্মে তথা বলে। এই মতের অনুপন্থী হয়েই লক্ষ্মণ তাঁর ধনুকবাণ হাতে তুলে নিয়েছিলেন অযোধ্যাকাণ্ডে। দশরথ অথবা ভরতকে উচিত শিক্ষা দিয়ে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসানোর কাজটা তিনি করতে চেয়েছিলেন উৎসাহ, উত্থান এবং অর্থের অভিসন্ধিতেই। কিন্তু রামচন্দ্র এই অর্থের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন সর্বাত্মক ভাবে। তিনি পিতার সত্য রক্ষার ধর্ম, তাঁর আদেশ এবং সর্বোপরি যাতে সপুত্রা কৈকেয়ী বঞ্চিত বোধ না করেন, সেই কারণে রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

কুমার লক্ষ্মণের বৈপরীত্যে ধর্মার্থকামের প্রাধান্য কোনখানে— সে বিষয়ে রামচন্দ্রের দৃষ্টিটাই সর্বতোভাবে রামায়ণের ধর্মনীতি। বনবাসের সংবাদক্লিষ্টা জননী কৌশল্যা এবং সদোত্থায়ী লক্ষ্মণকে শান্ত করে তিনি বলেছিলেন—লক্ষ্মণ! আমার মায়ের মতো তুমিও একইরকম অবুঝ হয়েছ ভাই! তোমরা কেউ আমাকে বোঝার চেষ্টা করছ না — মম ত্বভিপ্রায়মসম্নিরীক্ষ্য। মাত্রা সহাভ্যর্দসি মাং সুদুঃখম্। রাম বললেন, ধর্ম, অর্থ এবং কাম — এই তিনটিকেই সমস্ত লৌকিক সুখের কারণ বলে মনে করা হলেও এই তিনটিই একমাত্র ধর্মেরই অন্তর্গত। এই যেমন ধর, একই স্ত্রী আমার বশীভূত হয়ে আমার ধর্মাচরণের সহায় হতে পারে, তেমনই আমাকে রঞ্জিত করে আমার কামনা পূর্তি করতে পারে আবার পুত্রবতী হয়ে আমার অর্থসাধনের সহায় হতে পারে। এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় — ধর্ম, অর্থ এবং কামের ওপরে আরও এক কঠিন ধর্ম আছে, যা কার্যকালে ধর্মার্থকামের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করে।

রামচন্দ্র মনে করেন যে সমস্ত কাজের মধ্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম — এই তিনের সমাবেশ নেই, সেই সব কাজের মধ্যে যেখানে শুধু ধর্ম আছে, সেই কাজটাই করা উচিত। কেননা যে সমস্ত কাজে শুধু অর্থের প্রাধান্য, শুধু সেগুলিরই অনুষ্ঠান করলে লোকের বিদ্বেষভাজন হতে হয়। আবার যে সমস্ত কাজের মধ্যে শুধু কাম আছে, সেগুলির অনুষ্ঠানও লোকের প্রশংসাই হয় না।

ধর্মার্থকামের এই সংবিভাগের ক্রমিক অন্বয়ে কখন কোনটা গুরুতর হয়ে ওঠার কথা, সেটা যেমন রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তে রামায়ণ থেকে স্পষ্ট করে দেখানো যায়, তেমনই এই ধর্মার্থকামের ওপরেও আরও বড়ো এক ধর্ম আছে, যে ধর্ম রামচন্দ্রকে অর্থাভিসন্ধিহীন এক সমদর্শী ঋষির তুল্য করে তুলেছে। যে ধর্মের সাধন ধর্মার্থকামের ওপরেও পিতার সত্য, ভাইদের ভালবাসা, বন্ধুত্বের মান্যতা এবং সবার ওপর শত্রুরও কল্যাণ কামনা করে, সেই ধর্মই রামায়ণের মূল ধর্মনীতি। এই নীতির বলে একটি সাধারণ প্রজাও কষ্ট পেলে রামচন্দ্র কষ্ট পান এবং সে সুখী হলে রাজা রামচন্দ্র সুখী হন— রামায়ণ সবার ওপরে এই ধর্মেরই উপদেশ দিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল রামায়ণে রামচন্দ্রের এই সমদর্শিতার প্রমাণ যেখানে সর্বত্র পাওয়া গেছে, সেখানে পণ্ডিতজনেরা কী করে শূদ্র শম্বুকের হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাস করেন, তা আমাদের মাথায় আসে না। আরেক দল পণ্ডিত আছেন যাঁরা একদিকে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডকে সর্বতোভাবে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন অন্যদিকে আবার রামচন্দ্রকে শম্বুক-বধের জন্য যথেষ্ট নিন্দামন্দও করেন। আমরা এঁদের দ্বিচারিতার ভাষা বুঝি না। উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষেপবাদে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে শম্বুকবধের ব্যাপারটাকে এক বিরাট ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে মানার কোন দরকার পড়ে না। রামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতাতেও যাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁরা হঠাৎ শম্বুকবধের ঘটনায় কেমন করে ঐতিহাসিক হয়ে পড়েন— সেটা ভাবলে এই পণ্ডিতমশাইদের মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সমগ্র রামায়ণ জুড়ে যে রামচন্দ্রকে ক্রোধবশে কখনও ধৈর্যচ্যুত হতে দেখিনি, সেই রামচন্দ্র শম্বুকের তপস্যার কথা শোনামাত্র তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং শম্বুকের মস্তক ছেদন করলেন— এ কথা তেমন আদরণীয় নয়। শম্বুকের উপাখ্যান এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড এমনই এক সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে, যা পড়লেই বোঝা যায় যে, ওই ঘটনাগুলি অক্ষম ব্রাহ্মণের ধর্মবোধহীন প্রচারমাত্র। এই ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রকে জড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম আদর্শ পুরুষটিকে তাঁরা কলঙ্কিত করেছেন, হয়তো বা আমাদের আরাধ্য দেবতাকেও তাঁরা পরমোদার মনুষ্যত্বের মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছেন। শম্বুকবধের যাথার্থ্য এবং অযাথার্থ্য কোনটাই তাই আমাদের প্রতিপাদ্য নয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে চিরন্তন রাজধর্মের নিরিখে এটা বলতেই হবে যে, রাজাই হলেন বর্ণ এবং আশ্রমধর্মের রক্ষক। রামায়ণের সমাজ বর্ণধর্মে বিশ্বাস করত এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের তর-তমতেও যথেষ্ট বিশ্বাস করত। কিন্তু বিশ্বাসটা এমন দৃঢ় এবং ক্রূর ছিল না যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের মানুষ তপস্যা আচরণ করলেই তিনি রাজার বধ্য হতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, শম্বুক বধের বিপ্রতিপত্তিও বোঝা যাবে। তবে তার আগে শম্বুক বধের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করতে হবে। রামায়ণের

উত্তরকাণ্ডে এক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য রাজা রামচন্দ্রকে দায়ী করলেন। তিনি বলেছিলেন — নরবর! আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন কুকর্ম সংঘটিত হচ্ছে, আপনি ভাল করে খুঁজে দেখুন এবং সেই কুকর্মের প্রতিবিধান করুন—দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর। এইভাবে আপনার ধর্মেরও উন্নতি হবে এই বালকও বেঁচে উঠবে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনেই রামচন্দ্র মুনি-ঋষি-মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুনি-ঋষিরা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি— এই চতুর্যুগে তপস্যার বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করে বললেন, এই ত্রেতাযুগে যাঁরা শুধু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁরাই শুধু তপস্যা করবেন। আর বৈশ্য এবং শূদ্রেরা শুধু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করবেন— এটাই তাঁদের স্বধর্ম। রামচন্দ্রের তথাকথিত পরামর্শদাতারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, শূদ্রেরা একমাত্র কলিযুগেই তপস্যাচরণ করতে পারে, কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোথা থেকে এই বিপর্যয় ঘটল? আপনার রাজ্যে নিশয়ই কোন শূদ্র তপস্যা করেছে যার ফলে এই ব্রাহ্মণ বালক মারা গেছে— অদ্য তপতি দুর্বুদ্ধি-র্যেন বালবধো হ্যয়ম্।

উক্ত পরিচ্ছেদে মনে রাখতে হবে শুধু একটা কথা। ব্রাহ্মণদের মুখে আমরা শুনেছি যে, তাঁদের ত্রেতাযুগে বৈশ্য এবং শূদ্র এই দুই বর্ণই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে — শুশ্রূষামপরে জনাঃ। অর্থাৎ এঁদের সময়ে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যদেরও মর্যাদাচ্যুতি ঘটেছে, শূদ্রের সঙ্গে তাঁরাও একই শুশ্রূষার হীনকর্মে নিযুক্ত। এইবার আমাদের প্রত্যুদাহরণের কথা বলি।

রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে বিলাপ করেছিলেন। দশরথ নিজেই তাঁর মৃগয়াব্যসনিতার উচ্চারণ করে বিলাপ করেছিলেন কৌশল্যার কাছে। অন্তত এই অংশটিকে কেউই প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না। রামচন্দ্র তখন বনবাসী। দশরথ মৃত্যুপথযাত্রী। এই অবস্থায় তিনি তাঁর পূর্বের অপরাধ স্মরণ করে সকরুণ বিলাপ করেছেন আবার। কৌশল্যাকে তিনি বললেন বাণ নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটি মানুষের পতন-শব্দ শুনতে পেলাম। মানুষটি কথা বলছিল— বাগভূৎ তত্র মানুষী। সে বলছিল আমাদের মতো তপস্বীর গায়ে কে এমন করে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে — কথমস্মদ্‌বিধে শস্ত্রং নিপাতেচ্চ তপস্বিনি।

লক্ষণীয়, দশরথ যাঁর গায়ে অস্ত্রনিক্ষেপ করেছেন, তিনি নিজেকে নিজেই তপস্বী বলে চিহ্নিত করেছেন। এর পরেই অন্ধমুনির সেই মরণোন্মুখ পুত্রটি বলেছেন, আমরা বনে বাস করি। বনের ফলমূল খাই। কারও সঙ্গে আমাদের কোন হিংসা-দ্বেষও নেই, সেই আমাদের মতো ঋষিকে অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ করাটা কি উচিত হল? আমার মাথায় জটাভার, পরিধানে মৃগচর্ম, বিশেষত আমি কারও কোন অপকারও করিনি, তাহলে কে, কী কারণে আমাকে এইভাবে অস্ত্রাঘাত করল? অর্থাৎ অন্ধমুনির পুত্র নিজেকে শুধু তপস্বী এবং ঋষি বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি যে ঋষিত্বের বাহ্য আচার হিসেবে জটাচীরও ধারণ করেন, সেটাও রাজা দশরথকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

দশরথ কৌশল্যাকে বলেছেন রাত্রিশেষে সেই ঋষির করুণ বিলাপ শুনে — তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষে বির্লপতো নিশি — আমি শোকবেগে ত্রস্ত হলাম। পরে সরযূনদীর তীরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলাম সেই তপস্বী আমার অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত ধূলোর মধ্যে মাটিতে পড়ে আছেন জটাভার আলুলায়িত করে — অপশ্যমিষুণা তীরে সরযবাস্তাপসং হতম্।

লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমরা এখানে রামায়ণের সেই শ্লোকগুলিই উদ্ধার করছি, যেগুলির মধ্যে অন্ধমুনির পুত্র নিজেকে ঋষি, ঋষিপুত্র বা জটা-বল্কলধারী তপস্বী বলে চিহ্নিত করেছেন। ঋষিকুমার এমনও বলেছেন যে, আমার অন্ধ পিতা-মাতা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছেলে ফিরলেই জল খাব এই আশা নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে তপস্যা বা বেদ-অধ্যয়নের কোন ফলই নেই, নইলে আমি যে এমন করে অস্ত্রদগ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছি সে কথা আমার পিতা জানতে পারছেন না কেন — ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা।

দশরথ যখন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অন্ধমুনির কাছে নিবেদন করেছেন, তখনও তাঁদের মুনি বলেই সম্বোধন করেছেন এবং ক্রৌঞ্চবিরহী কবিও নিজের বর্ণনায় এই মৃতপুত্রক অন্ধ পিতা-মাতাকে কখনও মুনি, কখনও ঋষি, কখনও ব্রহ্মবাদী তপস্বী বলতে দ্বিধা করেননি। সাঙ্গ বেদ-অধ্যয়ন এবং তপস্যা এই বনবাসী সংসারের বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই দশরথও অন্ধমুনিকে ব্রাহ্মণ ভেবেই কথা বলেছেন।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল— অন্ধমুনির জাতিবর্ণ সম্বন্ধে যদি কোন ব্রাহ্মণের ধারণা দশরথের তৈরিও হয়ে থাকে, তবে সেই ভ্রান্তি ভেঙে দিয়েছিলেন মরণোন্মুখ মুনিকুমারই। মুনিকুমারের দেহে যে শব্দভেদী বাণটি প্রবেশ করেছিল, সেটিকে বার করে দেবার জন্য তিনি দশরথকে অনুরোধ করেন। তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল এবং মুনিকুমার ভাবছিলেন যে, বাণটি দেহ থেকে বের করে নিলেই তাঁর যন্ত্রণা মুক্তি হবে। কিন্তু দশরথ জানতেন বাণটি বার করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত আরও বাড়বে এবং তাঁর মৃত্যু হবে, এর চেয়ে যন্ত্রণাও হয়তো ভাল — সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি। অস্ত্রাঘাতে যা ঘটেছে, ঘটেছে। আপাতত নিজের হাতেই অন্তত ব্রহ্মহত্যা না ঘটে, তার জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন দশরথ।

দশরথের দ্বৈধীভাব মুনিকুমার সহজেই বুঝতে পারলেন এবং শক্তিহীন অবসন্ন অবস্থাতেও মুনিকুমার দশরথের উদ্দেশে বললেন, আমি আমার ধৈর্য দিয়ে আমার এই দুরন্ত কষ্ট সহ্য করে নিয়েছি। আপনিও আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় মন থেকে দূর করুন। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ নই। আমার পিতা একজন বৈশ্য এবং মা শূদ্রাণী। অতএব আপনি নির্ভয়ে আমার শরীর বাণমুক্ত করুন। আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না—

ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভুৎ তে মনসো ব্যথা
শূদ্রায়ামাস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।

আমাদের জিজ্ঞাসা, এই অন্ধ মুনি এবং অন্ধ মুনিপত্নী এই দুজনে একজন বৈশ্য এবং শূদ্রাণী হওয়া সত্ত্বেও একেবারে ত্রেতাযুগে বসেই তো দিব্যি তপস্যা করছিলেন বৈশ্য এবং শূদ্রাণীর সংকরজন্মা পুত্রটিও তো মুনি-ঋষি এবং তপস্বীর মর্যাদায় সর্বত্র চিহ্নিত। স্বাধ্যায়, অধ্যয়ন, তপশ্চরণ, অগ্নিহোত্র — কোন ব্রাহ্মণ্য আচরণই এঁদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেনি এবং তাঁদের তপশ্চারণের ফলে দশরথের রাজ্যে কারও মৃত্যুও ঘটেনি। যে সংকরজন্মা ঋষি বালকটি দশরথের হাতে মারা গেলেন বৈশ্য পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন যাঁরা নিয়ত বেদ অধ্যায়ন করেন এবং তপশ্চরণ করেন, যাঁরা নিয়ত অগ্নিহোত্র করেন, তুমি তাঁদের সদ্‌গতি লাভ কর, বাবা — তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক।

দশরথের রাজ্যে যখন একটি বৈশ্য-শূদ্রের মিশ্র সন্তানের জন্যও এই শুভাকাঙ্ক্ষা করা যায়, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় যে, বৈশ্য-শূদ্রেরা তখনও সেই ঘৃণার পর্যায়ে এসে পৌঁছননি, যতখানি আমরা শম্বুকের উপখ্যানে দেখতে পাচ্ছি। রামায়ণের সমাজে চতুর্বর্ণের বিভাগ নিশ্চয়ই ছিল, তাঁদের ক্রিয়াকর্মও নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যের পারস্পরিক সম্পর্কে এমন কোন ক্রূরতা ছিল না, যাতে শম্বুকের উপাখ্যান যুক্তিসহ মনে হয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, রামচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন নিষাদ গুহ। ভুলে গেলে চলবে না মতঙ্গ মুনির পরিচারিকা ছিলেন এক শবরী এবং তিনি আত্মগুণে তাঁর ঈশ্বরকল্প রামচন্দ্রের দেখা পেয়েছিলেন তথাকথিত তির্যকযোনি অথবা অনার্যকল্প বানর, ভল্লুক, রাক্ষসেরাও রামচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্মান লাভ করেছিলেন। ঠিক এই নিরিখে দেখতে গেলে শম্বুকবধে শূদ্রবর্ণের প্রতি এই ক্রূরতা আক্ষেপ স্বার্থাভিলাষীদের চক্রান্ত বলেই মনে হয়। অন্তত রামায়ণের নীতিধর্ম এটা নয়।

রামায়ণের নীতিধর্মে রাজধর্মের নীতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই আরও একটা কথা না বলে পারছি না। আমরা আগে বলেছি দেশভেদে, কালভেদে, যোনিভেদে নীতিধর্মের ভিন্নতা ঘটে। এই ভিন্নতাটুকু দেখিয়েই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব। কালভেদে নীতিধর্মের যে কতটা ভিন্নতা ঘটে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হয়ে গেছে শম্বুক-বধের উপাখ্যানেই। দেশভেদে নীতিধর্মের ভিন্নতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়বে মরণোন্মুখ বালীর সঙ্গে রামচন্দ্রের কথোপকথনে।

সুগ্রীবের যুদ্ধাহ্বান শুনে বালী যখন যুদ্ধ করার জন্য পা বাড়ালেন, তখন বালীর স্ত্রী তারা তাঁকে বারণ করেছিলেন। অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র যে সুগ্রীবকে সাহায্য করছেন, সে কথাও তিনি বালীকে জানিয়েছিলেন। বালী রামচন্দ্রকে অবিশ্বাস করেননি। রামচন্দ্রের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল এতটাই যে তিনি তারাকে ধমকে দিয়ে বলেছিলেন, রামচন্দ্রকে সন্দেহ কোর না, তাঁর কথা ভেবে বিষাদগ্রস্তও হয়ো না। তিনি ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি এবং অন্যেরা তাঁর প্রতি কী ব্যবহার করেছেন বা করেন, সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। তিনি কখনও পাপকার্য করতে পারেন না—ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি? কিন্তু বালীর এই বিশ্বাস সত্য হয়নি। রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করেছিলেন। ধর্মার্থকামের যে সব গূঢ় তত্ত্বকথা রামচন্দ্র জানেন, তা বালীরও কিছু

কিছু অজানা নয় রামচন্দ্রের মতে বালীর দোষ ছিল—তিনি সুগ্রীবের স্ত্রী রুমার সঙ্গে সংসর্গ করেছেন। কিন্তু বানর-রাজ্যে এই ব্যবহার কিছু অসঙ্গত নয়।

বালী বলেছিলেন — সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য এবং পরাক্রম — এগুলি হল রাজার গুণ। তাছাড়া অপকারী ব্যক্তির ওপর দণ্ডবিধান করাটাই তো ঔচিত্যের মধ্যে পড়ে। তা আমি তোমার কী অপকার করেছি? আমরা বনে থাকি, বনের ফল-মূল খাই। আমাদের জমি উর্বর নয়, সোনা রুপোও তেমন কিছু নেই। কাজেই আমাদের সঙ্গে তোমার বিরোধের কারণটা কি? বালী রামচন্দ্রকে চিরন্তন রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন রাজধর্ম ব্যাপারটা এত সংকীর্ণ নয়। ন্যায়ের জায়গায় অন্যায় করা অথবা অনুগ্রহের জায়গায় নিগ্রহ করা — এমন সংকীর্ণ ব্যবহার রাজারা করেন না এবং তাঁরা স্বেচ্ছাচারীও হতে পারেন না— রাজবৃত্তিরসংকীর্ণা ন নৃপ কামবৃত্তয়ঃ।

বালীর মতে রামচন্দ্র অর্থ-ধর্ম কোনটাই বোঝেন না, তিনি কামপ্রধান এবং লোভী, নইলে এমন অন্যায়ভাবে তিনি বালীকে বধ করবেন কেন? রামচন্দ্র বালীকে তাঁর যুক্তি শুনিয়েছেন। যুক্তিগুলো যে খুব জোরালো ছিল, তা মোটেই নয়। পরবর্তী কালের পণ্ডিতসজ্জনরাও রামকৃত বালিবধ সমর্থন করতে পারেননি। শুদ্ধশীল রামচন্দ্রের চরিত্রে বালিবধের কলঙ্ক দুরপনেয় এবং তার কারণ একটাই। দেশভেদে যে নীতিভেদ, ধর্মভেদ ঘটে, সে সম্বন্ধে রামচন্দ্রের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না। একই কথা বলতে হবে অন্য আরও একটি ক্ষেত্রেও কিন্তু সেখানে রামচন্দ্রের নিজস্ব ন্যায়-নীতি তাঁর চিরাভ্যস্ত রাজধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ব্যক্ত হয়েছে।

রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ছেড়ে দণ্ডকারণ্যের পথে যাবেন, তখন আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিরা বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তপস্বীরা রামচন্দ্রের কাছে অনুনয় করে বললেন, আপনি ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান পুরুষই শুধু নন, আমাদের কাছে আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো — দেবানাং মঘবানিব। অতুল কীর্তি এবং বিক্রমে আপনি সর্বত্র বিখ্যাত। সত্য এবং ধর্ম আপনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। আপনি নিজে ধর্মজ্ঞ এবং যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁদের আপনি ভালবাসেন; আর ঠিক সেইজন্যই আপনার কাছে আমাদের একটি প্রার্থনা আছে। ঋষিরা রামচন্দ্রকে যতই ভাল-ভাল কথা বলুন, তাঁরা কিন্তু এখানকার গণতন্ত্রের নাগরিকের মতোই সচেতন। তাঁরা রাজার সঙ্গে প্রজার লেন-দেনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, প্রজারা তাদের রাজাকে তাদের আয়ের একের ছয় ভাগ কর হিসেবে দেন। সেই কর রাজা যদি আত্মসাৎ করেন এবং প্রজারা যদি তাঁর কাছে কর দিয়েও পালনীয় পুত্রের মর্যাদা লাভ না করেন, তবে রাজার ভীষণ অধর্ম হয়—

অধর্মঃ সুমহান্ নাথ ভবেৎ তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্‌বলিষড়্‌ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ।।

আমরা জানি সেকালের রাজারা ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে কর নিতেন না। সেকালের বিশ্বাস ছিল মুনি-ঋষিদের তপস্যার পুণ্যফল রাজারাও পান কিছুটা এবং তারও ভাগ আছে। রামায়ণের মতে এই তপস্যার ফলের ভাগ এক-চতুর্থাংশ। ঋষিরা সেটাকেও কর হিসেবেই মনে করেন। কারণ তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে আমরা এই বনের ফল-মূল খেয়ে, এত কষ্ট করে যে তপঃসাধন করছি; তার একের চারভাগ পুণ্যফল রাজারা সিংহাসনে বসেই পাচ্ছেন, এর জন্য তাঁকে তো কোন পরিশ্রমই করতে হচ্ছে না। অতএব এর পরিবর্তে মুনি-ঋষিরা রাজার কাছে অন্তত শারীরিক সুরক্ষাটুকু তো আশা করবেন।

ঋষিরা রামচন্দ্রের কাছে অনুনয় করে বললেন, আমাদের মধ্যে বানপ্রস্থী তপস্বীই বেশি এবং তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কিন্তু দেখুন, আপনার মতো একজন বীর রক্ষক থাকতেও রাক্ষসেরা আমাদের মেরে ফেলছে— ত্বন্নাথেনাথবদ্রাম রাক্ষসৈ র্হন্যতে ভৃশম্। ঋষিরা রামচন্দ্রকে রাক্ষসদের আক্রমণের কিছু নমুনা দেখালেন। ঋষি মুনিদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ এবং কিছু মৃত মুনির শরীর। রাক্ষসদের আক্রমণের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধেও রামচন্দ্রকে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করলেন আশ্রমবাসী ঋষিরা। বললেন — ওই পম্পা-নদীর তীর, মন্দাকিনীর তটভূমি আর চিত্রকূট পাহাড়ের এপাশ-ওপাশে আর থাকবার জো রইল না — চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ। রাক্ষসরা এইভাবে আমাদের মারছে, আর আপনি আমাদের রক্ষা করবেন না? তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে কার কাছে আমরা আশ্রয় ভিক্ষা করব— পরা ত্বত্তো গতি র্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।

তপস্বীদের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে রাম তাঁদের কথা দিলেন যে, তিনি তপস্বীদের শত্রু রাক্ষসদের যুদ্ধে হত্যা করবেন— তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্। রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রম ছেড়ে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গেলেন। তার পরের দিনই দণ্ডকারণ্যের পথ ধরলেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। এদিকে সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে যাবার সময় দুই ভাই মুনির কাছ থেকে দুটি তূণ, ধনুক এবং খড়্গের উপহার লাভ করলেন। শরভঙ্গের আশ্রমে বানপ্রস্থী তপস্বীদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রামচন্দ্র, এই অস্ত্রগুলি যেন সেই প্রতিজ্ঞার করণস্বরূপ। মুনিদের কাছে রামের প্রতিজ্ঞা, তাঁর অস্ত্র লাভ এই সম্পূর্ণ ঘটনাগুলির ওপর সীতাদেবী তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। রামচন্দ্র সস্ত্রীক সভ্রাতৃক দণ্ডকারণ্যের পথে চলেছেন সেই সময়ে একদিন সীতাদেবী প্রিয় স্বামীকে তর্কযুক্তির জালে আবদ্ধ করলেন।

সীতা বললেন, আমার মন বলছে তুমি কিন্তু মোটেই ভাল কাজ করছ না। যদি খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখ, তাহলে বুঝবে তুমি খুব মহান ব্যক্তি হয়েও অনেক অধর্ম সঞ্চয় করছ। দেখ, রাজাদের কামজ ও ক্রোধজ দোষ থাকেই, কিন্তু তার মধ্যে তিনটে দোষ বড়ো সাংঘাতিক। প্রথমটা হল মিথ্যা কথা বলা, দ্বিতীয়টা পরস্ত্রীগমন, আর তৃতীয়টা হল বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা। সীতা যে কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের কথা

বলেছেন, তা পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এবং মহাভারতেও অনেক সবিস্তারে বলা আছে। সীতা তার মধ্যে তিনটি ধরেছেন নিজের বিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী।

তিনটি ব্যসনের কথা বললেও রামচন্দ্রের মধ্যে যে তিনটিই আছে, তা নয়, সীতা বললেন, মিথ্যার প্রসঙ্গে বলি তুমি জীবনে মিথ্যা কথা বলনি, ভবিষ্যতেও বলবে না — মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘবঃ। অধর্মজনক যে পরস্ত্রীগমন — সেও তুমি কোনদিন করনি, ভবিষ্যতেও করবে না, তা জানি। তুমি চিরকাল নিজের স্ত্রী ছাড়া কাউকে জান না। তুমি ধার্মিক, সত্যবাদী; পিতার আদেশমাত্র তুমি বনে এসেছ। তোমার মতো জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আর কে আছে? কিন্তু একটাই সাংঘাতিক দোষ তোমার ঘটছে। তা হল বিনা কারণে অন্য প্রাণীদের তুমি হিংসা করার কথা ভাবছ। এটা তোমার মোহ ছাড়া কিছু নয় — নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপস্থিতম্।

রামচন্দ্র বলতে পারেন আর্ত ঋষিদের কথা কি ভুলে যেতে হবে? রামচন্দ্রের দিক থেকে এই যুক্তি ধরে নিয়েই সীতা বললেন, আমি জানি ঋষিদের কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যে, রাক্ষসদের বধ করবে তুমি। এমনকি সেই কারণেই যে তুমি দণ্ডক-বনের দিকে চলেছ তাও আমি জানি — এতন্নিমিত্তঞ্চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্। কিন্তু আমার তো তোমার ইহকাল-পরকাল দুইই চিন্তা করতে হবে। তোমরা দণ্ডকবনে যাও — এটা কিন্তু মোটেই আমি চাই না। তার কারণটাও শোন। তুমি যদি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বনচারীদের ওপর অকারণ অস্ত্রক্ষয় কর সেটা মোটেই ভাল হবে না। জান তো শুকনো ঘাস অথবা কাঠ আগুনের কাছে থাকলে আগুনের তেজ বৃদ্ধি হয়, তেমনই ক্ষত্রিয়ের কাছে যদি ধনুক আর অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে তার মেজাজটা বেড়ে যায় — ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশনস্যোদ্ধনানি চ।

সীতা তাঁর প্রিয় স্বামীকে একটা গল্প বললেন। বললেন, এক মুনির কাছে দেবরাজ ইন্দ্র একটি খড়্গ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। পরে সেই খড়্গ আর নিতে আসেননি। কালক্রমে সেই খড়্গের ওপর মুনির এমন অভিনিবেশ হল যে, তাঁর জপ-যজ্ঞ, হোম-তপস্যা মাথায় উঠল। পরে তিনি সেই অস্ত্রের সাহায্যে প্রাণিহিংসা আরম্ভ করলেন এবং নরকে গেলেন। পণ্ডিতেরা তাই বলেন, অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে চলা মানেই আগুন নিয়ে চলা, এ হল এক বিকার — অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে। সীতা বললেন, তুমি আমার ভালবাসার জন, তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি না, তবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি বিনা শত্রুতায় ধনুর্ধারণ করে দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের বিনষ্ট করার চেষ্টা কোর না। বিনা অপরাধে কাউকে বধ করাকে কেউ ভাল বলে না — অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে।

অনেকক্ষণ নিয়ন্ত্রিতভাবে কথা বলার পর সীতা একটু কঠিনভাবেই বলার চেষ্টা করলেন। বললেন, ক্ষত্রিয়দের ধনুক হল আর্তদের রক্ষার জন্য। কোথায় তোমার এই অস্ত্র-শস্ত্র আর কোথায় এই বন? কোথায় তোমার ক্ষাত্রতেজ আর কোথায় এই বনবাসীর তপস্যা —ক্ক চ শস্ত্রং ক্ক চ বনং ক্ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ক চ— আমাদের অনুষ্ঠেয়

কাজগুলো কেমন পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠেছে। তুমি যখন আবার অযোধ্যায় ফিরে যাবে, তখন আবার তোমার ক্ষাত্রতেজ প্রদর্শন কোর। এখন তুমি রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হয়েছ। অতএব বনে থেকে তুমি যদি মুনিদের পালনীয় অহিংসা, ব্রত-নিয়ম পালন কর— তবে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই খুশি হবেন— যদি রাজ্যং হি সন্নস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ।

সীতা এবার চিরন্তন ধর্মার্থকামের সুচিন্তিত নীতির কথা বললেন। তিনি জানেন ধর্মার্থকামের মধ্যে ধর্মের ওপরেই রামচন্দ্রের দুর্বলতা। অতএব সুযোগ বুঝেই তিনি বলেন ধর্মের থেকেই অর্থ আর ধর্মের থেকেই মানুষের সুখ, ধর্মের মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে সমস্ত অলভ্য লাভ করা যায় এবং এ জগতে ধর্মই সব। অতএব এই তপোবনে এসে তপোবনের অনুষ্ঠেয় যে আচরণ, তুমি সেই আচরণ কর। তুমি বৃথা হিংসা কোর না — নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।

রামচন্দ্র সীতার শুভৈষণা, স্বামীর জন্য তার চিন্তা, সব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথাটা শোনেননি। নানা কথার ফাঁকে সীতা বলেছিলেন ক্ষত্রিয়ের ধনুকের কাজ হল আর্তদের রক্ষা করা — ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্। রামচন্দ্র সেই কথাটাই ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন তুমি তো নিজেই একথা বলেছ — ত্বয়ৈবোক্তম্ ইদং বচঃ। তা তুমি কি দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওনি? রাক্ষসরা তাঁদের মেরে ফেলছে, আর আমি ক্ষত্রিয় হয়ে তাঁদের চিৎকার শুনব? মুনিরা তপস্যার বলেই রাক্ষস-নিধন করতে পারেন, কিন্তু এই হিংসার কাজে তাঁরা তাঁদের সুচিরলব্ধ তপস্যার শক্তি ব্যয় করতে চান না। তাঁরা বলেছেন — চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বয়ম্।

রামচন্দ্র এবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উল্লেখ করে বলেছেন আমি ক্ষত্রিয় হয়ে মুনিদের সামনে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে এখন সত্যচ্যুত হতে পারি না। রামচন্দ্রের কথা শুনে বোঝা যায় একজন ক্ষত্রিয় জটাচীর ধারণ করে বনবাসী হলেও তাঁর মূল বর্ণধর্ম ধর্মের মাহাত্ম্য বহন করেই তার অনুষঙ্গী হয়ে থাকে। রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন সকারণে, বনবাসীর ধর্ম তাঁর নিশ্চয় পালনীয় কিন্তু তা মূল বর্ণধর্মকে অতিক্রম করে নয়। সীতাকে তিনি বলেছেন, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমনকি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারি, বিশেষ আমি আর্ত ব্রাহ্মণদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনমতেই তার অন্যথা করতে পারি না — ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।

রামায়ণের সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্যের কথা এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। রামচন্দ্র বলেছেন, যদি আমি প্রতিজ্ঞা নাও করতাম, তবুও ঋষিদের রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। বোঝা যাচ্ছে, বনবাসে এসে বনবাসীর অনুষ্ঠেয় কর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্মে যে বিরোধ হচ্ছে, যে বিরোধের কথা সীতা উল্লেখ করেছেন, তার চেয়েও এখানে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বড়ো হয়ে উঠছে। পরবর্তীকালে রামায়ণের অনুবর্তী মহাকাব্য

রঘুবংশেও ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন বলেই ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণধর্মের প্রতি এই আবেশ রামায়ণের সমাজেই সোচ্চারে বলা হয়েছে বলেই বুঝতে পারি বর্ণধর্মের ন্যায়-নীতিটাই রামায়ণের নীতি-ধর্মের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। অন্যান্য সমস্ত ধর্মনীতি, সে সাধারণ ধর্মনীতিই হোক আর বিশেষ ধর্মনীতিই হোক, স্ত্রী-ধর্মই হোক অথবা যুগধর্ম, কোনটাই বর্ণধর্মকে অতিক্রম করে নয়। আবার অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম — এইগুলিই সমস্ত নীতি-ধর্মের আধার হলেও রামায়ণের সমাজে বর্ণাশ্রমধর্মের নীতি এত কঠোর-কঠিন ছিল না, যাতে হীনবর্ণ, অন্ত্যজ বা অনার্য পুরুষেরাও নিজেদের মর্যাদা থেকে চ্যুত বোধ করেছেন।

বাস্তবিকপক্ষে রামায়ণের নীতি-ধর্ম যদি খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বৃহৎ এক দর্শন অথবা মহান কোন তন্ত্র-মন্ত্রগত ধর্মের বিচার এর মধ্যে খুঁজতে না যাওয়াই ভাল। এমনকি রাষ্ট্রের মতো বিরাট, সমাজের মতো বিশাল কোন বস্তুও রামায়ণের মধ্যে যদি খুঁজতে যাই, তবে তার একটি আদর্শ পরিবারকে আমাদের মাথায় রাখা উচিত। রামায়ণের সেই পরিবার ভারতবর্ষে শত শত আদর্শ পরিবারের জন্ম দিয়েছে। শত শত সেই রকম পরিবার ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন এবং রাষ্ট্রকেও অনুপ্রাণিত করেছে। রামায়ণের সহজবোধ্য ধর্মনীতি মেনে ভারতবর্ষের একটি স্ত্রী রামের মতো পতি লাভ করতে চেয়েছে, আর নিজে সীতার মতো সতী হতে চেয়েছে। রামায়ণের আদর্শ মেনে একটি কৈশোরগন্ধী বালকও বনে যেতে ভয় পায় না, তবে তার শর্ত হল, 'লক্ষ্মণভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে'। আর আজ থেকে অন্তত দেড় হাজার বছর আগেও যদি কোন প্রাকৃত মানুষ তার বউদিদির দিকে অন্য নজরে তাকাত, তবে স্নেহময়ী বউদিদি তাকে লক্ষ্মণের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দিতেন— অন্তত 'গাহাসত্তসই'র কবি হাল তাই জানিয়েছেন।

দিঅরস্স অসুদ্ধ-মণস্স কুল-বহু নিঅঅ-কুড্ড লিহি আইং।
দিঅহং কহেই রামাণুলগ্ন-সোমিত্তি-চরিআইং।।

রামায়ণের নীতি-ধর্মের প্রধান ব্যপদেশ অতএব সেইটাই, যাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নীতি বলি, সত্য বলি, শাশ্বত ধর্ম বলি অথবা এককথায় আদর্শ বলি।